# মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

⚠⚠ সতর্কতা: এই বইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে

# মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (১ খণ্ড)

(এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি)

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অরজিনাল বই ডাউনলোড : link

বিনীত সতর্কতা: এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি, তাই এতে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আকিদা বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল বই যাচাই করার অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ রইল। এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার পাঠকের নিজের। যদি যাচাই করে বা বুঝে-শুনে পড়া সম্ভব না হয়, তবে বইটি না পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

https://t.me/BoierSomahar

## □□ পাঠকের প্রতি সতর্কতা

এই অনুবাদটি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর শব্দচয়ন, বাক্য গঠন কিংবা ভাবানুবাদে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অসংগতি থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

বইটি পড়া শুরু করার আগে দয়া করে মনে এই বিষয়টি গেঁথে নিন যে— "আমি বইটি কেবল জানার ও শেখার উদ্দেশ্যে পড়ছি। পড়ার সময় কোনো কথায় সন্দেহ বা খটকা লাগলে, তা আমি যাচাই না করে গ্রহণ করব না।"

বিশেষ করে আকিদা, ফতোয়া বা স্পর্শকাতর কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই অনুবাদের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করবেন না। যেকোনো আমল বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অবশ্যই মূল বই মিলিয়ে দেখবেন অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হবেন।

এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া যেকোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার একান্তই পাঠকের। তাই বিনীত অনুরোধ, নিজে যাচাই-বাছাই করে পড়ার মানসিকতা থাকলেই কেবল বইটি অধ্যয়ন করবেন।

https://t.me/BoierSomahar

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা

সৃষ্টির সূচনা থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত পর্যন্ত

- ইতিহাসের মূলনীতি
- পূর্ববর্তী নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এবং তাঁদের সমসাময়িক সাম্রাজ্যসমূহ
- ইসলাম-পূর্ব বিশ্বের অবস্থা
- সীরাতে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
- খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, বিজয়াভিযানের সময়কাল (হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত পর্যন্ত)
- উম্মাহাতুল মুমিনীন, আশারায়ে মুবাশশারা এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি
- ইতিহাসের শিক্ষা

অভিমত

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার সাহেব

সংকলন

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)
উস্তাদ, ইসলামি ইতিহাস, জামিয়া আর-রশীদ করাচি

আল-মানহাল পাবলিশার্স

## তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ইতিহাস বিজ্ঞানের পরিচিতি ও মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত ভূমিকা

আদম (আ.) থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত পূর্ববর্তী নবীগণের

সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য সীরাতে নববী (মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুযায়ী)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান গনি (রা.)-এর সীরাত ও অবদান

**প্রথম খণ্ড**

তাহকীক

ঐতিহাসিক ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলিস্তান-ই-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অভিমতসমূহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জামিয়া উলূম ইসলামিয়া
(ইউনিভার্সিটি অফ ইসলামিক সায়েন্সেস)
আল্লামা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী টাউন
করাচি - ৭৪৮০০ - পাকিস্তান।

তারিখ: .....

রেফারেন্স নং: .....

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

আম্মা বাদ:

প্রথাগত জ্ঞানসমূহের মধ্যে ইতিহাস এমন একটি বিষয় যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা কঠিন এবং এর ওপর পূর্ণ আস্থার সুযোগও কম। এর দুটি মৌলিক কারণ রয়েছে: এক হলো ঐতিহাসিক বর্ণনার সনদ হাদিস বর্ণনার মতো সতর্কতা ও মানদণ্ড থেকে সাধারণত বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক বর্ণনায় ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব অনেক সময় সংরক্ষিত থেকে যায়। তাই বাছবিচারহীনভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনাকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করে কোনো চিন্তাধারা বা মতাদর্শ তৈরি করা সাধারণত বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়। এজন্য ইতিহাসের শিক্ষার্থীকে ইতিহাস অধ্যয়নের আগে অন্তত তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরি:

১. ইতিহাস অধ্যয়নের আগে ইতিহাসের এমন মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন, যার মধ্যে উম্মতে মুসলিমার স্বীকৃত চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির বর্ণনা রয়েছে। ইতিহাসের মৌলিক মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।
২. ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য উৎস এবং ঐতিহাসিকদের মেজাজ ও ঝোঁক সম্পর্কেও অবগত থাকা উচিত।
৩. অনেক সময় প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের কাছেও প্রসিদ্ধ উৎসসমূহে আলোচনার খাতিরে অনেক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা চলে আসে, তাই ঐতিহাসিক উৎসের গুণাগুণ ও ত্রুটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকাও জরুরি।

ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য মৌলিক বিষয়াদি এবং ইতিহাসের কিতাবসমূহের মধ্যে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে লিখিত কিতাব খুব কমই পাওয়া যায়। তবে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানি যে, কোনো যুগই এই ইলমে পারদর্শী ব্যক্তিদের থেকে শূন্য থাকে না। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে "তারিখ উম্মতে মুসলিমা" নামে একটি সংকলন আমাদের সামনে এসেছে, যাতে উল্লিখিত মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

অধিকন্তু (যতটুকু আমি দেখেছি), এই সংকলনে চিন্তা ও ঝোঁকের ক্ষেত্রে সতর্কতা, বর্ণনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য, চমৎকার বিন্যাস এবং সাবলীল ও মানসম্মত উপস্থাপনার এক অনন্য প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আশা করা যায় এই সংকলন সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের জন্য সমানভাবে উপকারী হবে। ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে কবুলিয়ত ও জনপ্রিয়তা দান করেন। আমিন! ওয়া মা যালিকা আলাল্লাহি বি আজিজ।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামা আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

ফাকাত ওয়াস সালাম

(স্বাক্ষর)

(মাওলানা ডক্টর) আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার
মুহতামিম, জামিয়া উলূম ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নুরী টাউন, করাচি।

পি.ও. বক্স: ৩৪৬৫ করাচি, কোড নং: ৭৪৮০০, ফোন: (০০৯২-২১)- ৩৪৯১৩৫৭০ - ৩৪৯১২৬৮৩ - ৩৪৯১৫৯৬৬ - ৩৪১২৩৩৪৬ - ৩৪১২১১৫২।
ফ্যাক্স: (০০৯২-২১)- ৩৪৯১৯৫৩১, করাচি পাকিস্তান। ইউআরএল: www.banuri.edu.pk, ই-মেইল: info@banuri.edu.pk

https://t.me/BoierSomahar

অভিমতসমূহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত মাওলানা ডাক্তার মনজুর আহমদ মেঙ্গল সাহেব

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালাতু আলা নাবিয়্যিহি

আম্মা বাদ!

নিশ্চিতভাবেই আজ উম্মতে মুসলিমা বাহ্যিক আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণে অত্যন্ত ভয়াবহ এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং দিন দিন মুক্তির পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। যার সবচেয়ে বড় কারণ একদিকে যেমন কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও আমল থেকে দূরত্ব, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের আকাবির ও আসলাফদের বীরত্বগাথা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাও বটে, যা কোনো বড় দুর্ঘটনা বা দুরারোগ্য যন্ত্রণাদায়ক আধ্যাত্মিক ব্যাধির চেয়ে কম নয়।

তদুপরি, যদি কোনো ব্যক্তি ইতিহাসের প্রতি কিছুটা আগ্রহও রাখে, তবে তাকে এমন ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয় যা তার মনে আসলাফদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষ উগরে দেয় এবং এই তথাকথিত ইসলামী ইতিহাস দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষার পরিবর্তে ইসলামের দুর্গে ফাটল ধরানোর কাজ করে, বরং এর চেয়েও বেশি আল-ইয়াযু বিল্লাহ ইসলামী ইতিহাসে এমন সব মনগড়া ইসরাঈলী বর্ণনা রয়েছে যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক; এমন সব বর্ণনা থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মতো নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বরাও নিরাপদ থাকেননি।

এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসের সাথে পরিচিতি অত্যন্ত জরুরি, যাতে আমরা জানতে পারি যে উম্মতের ওপর পরিস্থিতির কঠোরতা ও অবনতি, বাহ্যিক আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, পারস্পরিক অনৈক্য ও বিবাদ এবং ইসলামের শত্রুদের সূক্ষ্ম চালসমূহ সম্পর্কে এবং এগুলোর সাথে সাথে এই সবকিছুর প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে ইসলাম কী বলে এবং এ বিষয়ে আমাদের আকাবির ও আসলাফদের আমল কী ছিল; এই সবকিছু আমাদের জন্য ইসলামের ইতিহাস থেকেই জানা সম্ভব, যার জন্য সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং আজেবাজে কথা থেকে মুক্ত কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী ইতিহাসের জ্ঞান থাকা জরুরি ছিল।

যার জন্য আমাদের সম্মানিত ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদ্দাজিল্লুহু, উস্তাদ, তারিখ-এ-ইসলাম, জামিয়াতুর রশীদ করাচি, যিনি বেশ কিছু কিতাবের লেখকও বটে, উক্ত মহোদয় মাশা-আল্লাহ যথেষ্ট উত্তম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যা অধমের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে এবং উম্মতে মুসলিমার পক্ষ থেকে সাধারণভাবে প্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য।

আল্লাহ তাআলা উক্ত মহোদয়ের এই প্রচেষ্টাকে উভয় জগতে মুক্তি ও উন্নতির কারণ বানান এবং পাঠকদের জন্য ব্যাপক উপকারের মাধ্যম বানান।

মনজুর আহমদ

https://t.me/BoierSomahar

**প্রশংসা** বাণী

**“তারিখে উম্মতে মুসলিমা”-এর জন্য কাব্যিক প্রশংসা**

পক্ষ থেকে: শায়েরে ইসলাম, হযরত আসার জৌনপুরী (দা.বা.)

প্রচেষ্টা, সংকল্প ও অবিচলতার দ্বার যখন উন্মুক্ত হলো,
তখন একনিষ্ঠ বান্দার প্রতি মাওলা মেহেরবান হলেন।
একজন ঐতিহাসিক পুনরায় প্রাণপণ কোমর বাঁধলেন,
বছরের পর বছরের প্রচেষ্টা অবশেষে মহিমার সাথে সার্থকতা পেল।
সরকার (সা.)-এর উম্মতকে এক অমূল্য উপহার দিয়ে গেলেন,
সেই যুবক এমন যে প্রবীণদের কাছ থেকেও বাজি জিতে নিলেন।
কাগজ ও কলম নিজেই অবাক হয়ে রইল, কী বলব,
এমন এক কীর্তি সম্পন্ন হলো, কী বলব।
চিন্তার উড্ডয়ন মঙ্গলের উচ্চতায় পৌঁছে গেল,
যখন তিনি ইতিহাসের পাখির ওপর কলম ধরলেন।
তর্ক-বিতর্কের কাঁটাগুলো হার মেনে অস্ত্র ত্যাগ করল,
এভাবেই ইসমাইল জ্ঞানের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিলেন।
অতীতের স্মৃতির নির্যাস এমনভাবে সাজিয়ে রাখলেন,
যেন মুসলমানদের সামনে একটি আয়না এনে রাখলেন।

**প্রশংসা বাণী**

যাতে সকল ঈমানদার ব্যক্তিরা নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়
সাইয়্যেদুল আবরার ﷺ কীভাবে কষ্ট সহ্য করেছেন
কীভাবে অন্ধকারের মাঝে হেদায়েতের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে
একদিকে সুরাইয়া নক্ষত্রের উচ্চতার মহিমান্বিত দৃশ্য
একদিকে আত্মত্যাগ, তাকওয়া এবং অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব
প্রথম দলটি দুনিয়া ও দ্বীনের নেয়ামতের হকদার
হে আল্লাহ! প্রভাব বিস্তারকারী দীর্ঘশ্বাসের ওপর প্রভাবের দরজা খুলে দিন
ইসলামের শৌর্য-বীর্যের সেই স্বর্ণযুগ আবারও দেখান
ইসমাইল রেহানের এই প্রচেষ্টাকে হে আল্লাহ কবুল করুন

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস
কীভাবে মুশকিলগুলো সহজ হয়ে যায় তা দেখতে পায়
আমার সরকার ﷺ কীভাবে দ্বীনের পতাকা উড়িয়েছেন
কীভাবে সাহাবীগণ নিজেদের রক্ত দিয়ে দ্বীনের বাগান সিঞ্চন করেছেন
অন্যদিকে পাতালের প্রাণঘাতী কণ্টকাকীর্ণ পথ
অন্যদিকে গোঁড়ামি, লোভ এবং সম্পদের মোহ
দ্বিতীয় দলটির কোনো কেন্দ্র বা অক্ষ নেই
যেন জীবদ্দশাতেই প্রভাবের স্বপ্ন দ্রুত বাস্তবায়িত হয়
আবারও যেন পৃথিবীতে আপনার নামের ডঙ্কা বেজে ওঠে
ইখলাসের এই কুঁড়িকে জান্নাতুল ফেরদাউসের ফুলে পরিণত করুন

সূচিপত্র

এই পৃষ্ঠাগুলো সম্পর্কে কিছু কথা ..... ২২

চিহ্ন, সংকেত এবং উদ্ধৃতি পর্যালোচনার জন্য ..... ৩০

ইঙ্গিতসমূহ ..... ৩১

**ইতিহাস কী?**

**ইতিহাস বিজ্ঞানের পরিচিতি** ..... ৩২

**ইতিহাসের মূলনীতি** ..... ৩২

আভিধানিক অর্থে ইতিহাস ..... ৩২

পারিভাষিক অর্থে ইতিহাস ..... ৩২

ইতিহাস বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ..... ৩২

ইতিহাস এবং অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ..... ৩৩

বিষয়বস্তু ..... ৩৩

ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ..... ৩৪

**ইতিহাসের ইতিহাস**

পঞ্জিকা ..... ৩৫

আরবদের ইতিহাসে মাস ও বছরের পার্থক্য কেন? ..... ৩৮

বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা এবং বিকৃত 'চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা' ..... ৩৮

ইতিহাস রচনার চারটি পর্যায় ..... ৪১

**ইতিহাসের ইসলামী যুগ**

ইসলামী ইতিহাস রচনার দুটি ভিত্তি ..... ৪৩

সীরাত রচনা ..... ৪৩

আসমাউর রিজাল শাস্ত্র ..... ৪৫

ইতিহাস রচনার সূচনা ..... ৪৫

জালিয়াত বর্ণনাকারী ..... ৪৫

সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার যুগ ..... ৪৫

ইতিহাস রচনার ওপর ভ্রান্ত আকিদার শাসকদের প্রভাব ..... ৪৬

ইসলামী ইতিহাস রচনার স্বর্ণযুগ ..... ৪৬

ভূগোল শাস্ত্র এবং ভ্রমণকাহিনী ..... ৪৭

তবকাত শাস্ত্র ..... ৪৮

জীবনী রচনা ..... ৪৮

ইসলামী ইতিহাস এবং অন্যান্য ইতিহাসের পার্থক্য ..... ৪৮

মুসলমানদের নিকট ইতিহাস বিজ্ঞানের পতনের কারণসমূহ ..... ৪৯

**ইতিহাস বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও উপকারিতা**

কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে ইতিহাসের গুরুত্ব ..... ৫১

হাদিসে ইতিহাসের গুরুত্ব ..... ৫২

ফকীহদের নিকট ইতিহাসের বিধান ..... ৫৩

বিদ্বানদের নিকট ইতিহাসের গুরুত্ব ..... ৫৩

ইতিহাসের উপকারিতা ..... ৫৩

ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা ..... ৫৫

উলামা ও ফকীহদের জন্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ..... ৫৬

ইতিহাসের মাধ্যমে মিথ্যা বর্ণনাকারীদের পাকড়াও ..... ৫৭

ইতিহাসের মাধ্যমে জাল বর্ণনার পর্দা উন্মোচন ..... ৫৭

ইতিহাসে পারদর্শিতার মাধ্যমে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা ..... ৫৭

ইতিহাসের মূলনীতির পরিপন্থী পাঠের ক্ষতিসমূহ ..... ৫৮

শেখ আলী তানতাবীর দৃষ্টিতে ইসলামী ঐতিহাসিকের গুণাবলী ..... ৬০

**ইতিহাসের প্রকারভেদ**

ইসলামের ইতিহাস নাকি মুসলিমদের ইতিহাস ..... ৬১

https://t.me/BoierSomahar

ইতিহাসের অন্যান্য প্রকার ..... ৬১

**ইতিহাস রচনার উৎসসমূহ**

ঐতিহাসিকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ..... ৬২

বর্ণিত নিদর্শন (মৌখিক বর্ণনা) ..... ৬২

সুসংহত নিদর্শন অর্থাৎ লিখিত উপকরণ ..... ৬২

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ..... ৬২

**ইতিহাস রচনার শৈলী**

বর্ণনাভিত্তিক ইতিহাস (তারিখ বির-রিওয়ায়াহ) ..... ৬৩

যুক্তিভিত্তিক ইতিহাস (তারিখ বিদ-দিরায়াহ) ..... ৬৩

বর্ণনা ও যুক্তিভিত্তিক ইতিহাস (তারিখ বির-রিওয়ায়াহ ওয়াদ-দিরায়াহ) ..... ৬৪

**ইতিহাস রচনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা**

ঐতিহাসিকের গুণাবলি ..... ৬৫

ঐতিহাসিক বর্ণনা স্থানান্তরের শর্তাবলি ..... ৬৫

জীবনী রচনার শর্তাবলি ..... ৬৫

ইতিহাসের বর্ণনা এবং হাদিসের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য ..... ৬৬

**ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ**

রাসায়েল ওয়াকিদি ..... ৬৬

আল-মাআরিফ ..... ৬৭

আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ ..... ৬৭

তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত ..... ৬৭

আত-তাবাকাতুল কুবরা ..... ৬৮

ফুতুহুল বুলদান - আনসাবুল আশরাফ ..... ৬৮

আল-আখবারুত তিওয়াল ..... ৬৮

তারিখ ইয়াকুবি ..... ৬৮

**ইতিহাসের বিশ্বকোষসমূহ**

তারিখ তাবারী ..... ৬৯

তারিখ তাবারীর কিছু বৈশিষ্ট্য ..... ৭০

দুর্বলতাসমূহ ..... ৭০

তারিখ তাবারী সম্পর্কিত কিছু সন্দেহের নিরসন ..... ৭১

আল-কামিল ফিত-তারিখ ..... ৭৩

আল-কামিল ফিত-তারিখের বৈশিষ্ট্যসমূহ ..... ৭৩

দুর্বলতাসমূহ ..... ৭৪

তারিখুল ইসলাম জাহাবি ..... ৭৫

ভালো দিকসমূহ ..... ৭৫

দুর্বলতাসমূহ ..... ৭৫

আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ..... ৭৬

ভালো দিকসমূহ ..... ৭৬

দুর্বলতাসমূহ ..... ৭৬

তারিখ ইবনে খালদুন ..... ৭৭

ভালো দিকসমূহ ..... ৭৭

দুর্বলতাসমূহ ..... ৭৮

দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস যা সাধারণত উপেক্ষা করা হয় ..... ৭৮

**প্রথম অধ্যায়: ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস**

**আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ঊর্ধ্বগমন পর্যন্ত** .....

৭৯

**এই পৃথিবী** ..... ৮১

পৃথিবী কখন সৃষ্টি হয়েছে? ..... ৮২

**হযরত আদম আলাইহিস সালাম** ..... ৮৩

**হযরত নূহ আলাইহিস সালাম** ..... ৮৬

আদ ও সামুদ ..... ৮৬

**ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াত** ..... ৮৭

https://t.me/BoierSomahar

জমজম ..... ৯১
ছেলের কোরবানি ..... ৯১
কাবা ঘর নির্মাণ ..... ৯২
হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.) ..... ৯৪
হযরত লুত (আ.) ..... ৯৪
হযরত আইয়ুব (আ.) ..... ৯৪
হযরত ইউসুফ (আ.) ..... ৯৫
মিশর ও মিশরের ফেরাউনগণ ..... ৯৬
ওয়ালিদ বিন মুসআব, খোদাদ্রীয়ার দাবিদার মিশরের প্রথম ফেরাউন ..... ৯৬
হযরত মুসা (আ.) ..... ৯৭
বনী ইসরাঈলের নবীগণ: বিচারকদের যুগ, রাজাদের যুগ ..... ৯৮
অনারব রাজাগণ ..... ৯৯
বনী ইসরাঈলের পতন ও নির্বাসন ..... ১০০
হযরত ঈসা (আ.) ..... ১০১
ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন ..... ১০১
খ্রিস্টধর্মে বিকৃতি ..... ১০২
জাযিরাতুল আরবে ফাতরাত বা বিরতিকাল ..... ১০৩
হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর ..... ১০৪
সাবা জাতি, হিময়ার ও তুব্বা রাজাগণ ..... ১০৫
ইয়েমেনে হাবশীদের আধিপত্য এবং সাইফ বিন যি-ইয়াযানের আন্দোলন ..... ১০৬
স্বাধীনতা ..... ১০৭
জাহেলিয়াত যুগের অন্যান্য আরব সরকার ..... ১০৭
হীরা রাজ্য ..... ১০৮
মাজদাকিয়াত ও হীরার রাজত্ব ..... ১০৮
বনু গাসসান ..... ১০৯
আরব বহিঃশক্তির আক্রমণের মুখে ..... ১১০
মক্কা উপত্যকা ..... ১১১
বনু জুরহুমের উচ্ছেদ এবং বনু খুযাআ-র দখল ..... ১১১
মূর্তিপূজার সূচনা ..... ১১২
কুরাইশদের আবির্ভাব ..... ১১২
হাশিম ..... ১১৪
কুরাইশদের উত্থান ..... ১১৫
ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন ..... ১১৫
ইয়াসরিবে আউস ও খাযরাজ এবং ইহুদিদের দ্বন্দ্ব ..... ১১৭
তায়েফ ..... ১১৮
ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৃথিবী ..... ১১৮
হিন্দুস্তান ..... ১১৮
বৌদ্ধ ধর্ম ..... ১১৯
ইরানের ধর্মীয় বিপর্যয় ..... ১২০
চীনের বিশ্বাসগত অবস্থা ..... ১২১
ইউরোপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলা ..... ১২১
গ্রিসের দার্শনিকগণ ..... ১২৩
শব্দসর্বস্বতা ..... ১২৪
ইহুদিদের পথভ্রষ্টতা ..... ১২৫
আরববাসীদের ধর্মীয় অবস্থা ..... ১২৬
আরবদের নৈতিক অবস্থা ..... ১২৮
আবদুল মুত্তালিব ..... ১২৯
আবদুল্লাহ ..... ১৩০
জাযিরাতুল আরবের ওপর কেন আসমানী অনুগ্রহ? ..... ১৩১
ইতিহাসের শিক্ষা ..... ১৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: সীরাতে পয়গম্বর আখেরুজ্জামান ..... ১৩৫

... থেকে বড় বিপ্লব
... শোকের সময়
... এর নগ্ন লক্ষণসমূহ
... একটি নেক নিদর্শন
**মহাবিশ্বের সুবহে সাদিক**
পবিত্র শৈশব ..... ১৩৭
দুগ্ধপানের সাথে ইয়াছরিব সফর ..... ১৩৮
হযরত আমেনার ইন্তেকাল এবং আবদুল মুত্তালিবের অভিভাবকত্ব ..... ১৩৯
আবদুল মুত্তালিবের পর ..... ১৪১
সৌভাগ্যময় কৈশোর ..... ১৪৩
শাম সফর এবং বুহাইরা রাহিবের সাক্ষ্য ..... ১৪৫
হারবুল ফিজারে অংশগ্রহণ ..... ১৪৬
সাইফ যি ইয়াযানের মৃত্যু এবং দক্ষিণ আরবে পারস্যের আধিপত্য ..... ১৪৬
হালাল রিযিকের জন্য পরিশ্রম ..... ১৪৭
হিলফুল ফুযুল ..... ১৪৮
ঈর্ষণীয় যৌবন, ব্যবসা ও বিবাহ ..... ১৪৮
দাম্পত্য জীবন ..... ১৪৯
হযরত যায়েদ বিন হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর লালন-পালন ..... ১৫০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামাজিক ব্যস্ততা ..... ১৫০
কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ ..... ১৫১
পারিবারিক দায়িত্বসমূহ ..... ১৫১
উম্মে আয়মানের সাথে যায়েদ বিন হারিসার বিবাহ ..... ১৫২
জনসেবা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ..... ১৫২
বনু হাশিমের সূর্য ..... ১৫৩
**যখন নবুওয়াতের আমানত অর্পিত হলো** ..... ১৫৪
জিনদের আসমানি ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ..... ১৫৫

প্রথম ওহী (১ম নববী বর্ষ) ..... ১৫৮
পৃথিবীতে জ্ঞান ও কলমের ধারণা ..... ১৫৯
দায়িত্বের গুরুভার ..... ১৬০
ওহী স্থগিত হওয়া এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অস্থিরতা ..... ১৬১
**গোপন দাওয়াত (১ম থেকে ৩য় নববী বর্ষ)** ..... ১৬১
ইসলামের দাওয়াত কী ছিল? ..... ১৬১
ইসলামের দাওয়াতে গোপনীয়তা ও সতর্কতা ..... ১৬২
আবু যর গিফারী ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন ..... ১৬৩
তাওহীদের ঘোষণা এবং ঈমানদারদের পরীক্ষা ..... ১৬৫
**প্রকাশ্য তাবলীঘ (৩য় নববী বর্ষ)** ..... ১৬৬
আবু লাহাবের ধৃষ্টতার জবাব - সূরা লাহাব নাযিল হওয়া ..... ১৬৬
আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর নির্যাতন ..... ১৬৭
আবু তালিবের ওপর কুরাইশদের চাপ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাব ..... ১৬৭
সাহাবায়ে কেরামের ওপর জুলুম-নির্যাতন ..... ১৬৮
হযরত সিদ্দিকে আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর নির্যাতন ..... ১৬৯
হযরত সিদ্দিকে আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণের চেয়েও প্রিয় ..... ১৬৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবমাননা ..... ১৬৯
আবু জাহেলের অপকর্মসমূহ ..... ১৭০
নবুওয়াতের পরিবার আপনার পাশে ..... ১৭১
পুত্র সন্তানদের ইন্তেকাল এবং মুশরিকদের বিদ্রূপ ..... ১৭৩
পুত্র সন্তানদের ইন্তেকালে খোদায়ী হিকমত ..... ১৭৩
একটি নতুন উম্মত গঠন ..... ১৭৩
**দাওয়াতি কার্যক্রম** ..... ১৭৫
উকায মেলায় ইসলামের দাওয়াত (শাওয়াল ৪ নববী) ..... ১৭৫
যিমাদ আযদীর ইসলাম গ্রহণ ..... ১৭৬
মুশরিকদের কুরআনের প্রভাব স্বীকার করা ..... ১৭৭

উতবা বিন রাবিআহ-এর সাথে কথোপকথন ..... ১৭৮

তুফাইল বিন আমর দাওসীর ইসলাম গ্রহণ ..... ১৭৯

আশ্রয়স্থলের সন্ধান: হিজরতে হাবশা ..... ১৮০

**প্রথম হিজরতে হাবশা (রজব ৫ নববী)** ..... ১৮১

উম্মে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহা এবং উমর বিন খাত্তাব-এর কথোপকথন ..... ১৮১

হাবশায় আশ্রয় ..... ১৮২

সাহাবীদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার নির্দেশ ..... ১৮৩

**ইসলামের নতুন সাহায্যকারী** ..... ১৮৪

যখন হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু ইসলামে দীক্ষিত হলেন (জিলহজ ৫ নববী)

..... ১৮৪

সাফল্যের কথা ..... ১৮৫

হযরত উমর গোপনে নববী তিলাওয়াত শুনছেন ..... ১৮৫

প্রথম হিজরতে হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন (মধ্য ৬ নববী) ..... ১৮৮

আরও একবার নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া ..... ১৯০

দ্বিতীয় হিজরতে হাবশা (শেষ ৬ নববী) ..... ১৯০

নাজাশীর দরবারে কুরাইশদের প্রতিনিধি দল (শুরু ৭ নববী) ..... ১৯১

নাজাশীকে সাহায্যের জন্য মুসলমানদের প্রস্তুতি ও তৎপরতা ..... ১৯২

হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের সময়কাল ..... ১৯২

হিজরতে হাবশার প্রভাব ..... ১৯৩

হিজরতে হাবশার শিক্ষা ..... ১৯৪

**সামাজিক বয়কট (মহরম ৮ নববী)** ..... ১৯৪

শিআবে আবু তালিবের যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি ..... ১৯৫

অনাহারের একটি দৃশ্য ..... ১৯৫

রোম ও পারস্যের যুদ্ধ এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ..... ১৯৬

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু-এর হাবশার দিকে হিজরত এবং পথ থেকে

প্রত্যাবর্তন (৯ নববী) ..... ১৯৬

শিআবে আবু তালিব থেকে মুক্তি ..... ১৯৮

হযরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা-এর ইন্তেকাল ..... ১৯৯

জনাব আবু তালিবের প্রস্থান ..... ১৯৯

হযরত সাওদা এবং হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহুমা-এর সাথে বিবাহ ..... ২০০

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিজা ..... ২০০

তায়েফ সফরের বেদনাদায়ক ঘটনা ..... ২০১

জিনদের ইসলাম গ্রহণ ..... ২০৩

মক্কায় পুনরায় প্রবেশ ..... ২০৪

**দারুল হিজরত** ..... ২০৫

ইয়াসরিবের প্রথম মুসলমান ..... ২০৫

বুয়াস যুদ্ধ এবং এর প্রভাব ..... ২০৬

ইয়াসরিববাসীদের প্রথম কাফেলার ইসলাম গ্রহণ (১০ নববী) ..... ২০৬

প্রথম বাইয়াতে আকাবা (১১ নববী) ..... ২০৭

মেরাজ সফর ..... ২০৯

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা (১২ নববী) ..... ২১১

বাইয়াতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ..... ২১১

সাহাবীদের হিজরত ..... ২১২

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত সফর** ..... ২১৩

হত্যামূলক হামলার ষড়যন্ত্র ..... ২১৪

হিজরতের নির্দেশ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দিক আকবর রাদিআল্লাহু

আনহু-এর ঘরে ..... ২১৪

হিজরত সফরের কৌশল ..... ২১৫

যদি আমার কওম আমাকে বের করে না দিত! ..... ২১৫

সওর গুহায় আত্মগোপন এবং কুরাইশদের দৌড়ঝাঁপ ..... ২১৬

সওর গুহা থেকে দারুল হিজরতের অভিমুখে ..... ২১৭

সুরাকা বিন মালিককে সুসংবাদ ..... ২১৯

https://t.me/BoierSomahar

আয়াত-এ-গারের আলোকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মর্যাদা ..... ২২০

ইমাম রাজীর সূক্ষ্মদর্শিতা ..... ২২০

**প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র**

কুবায় শুভাগমন ..... ২২২

মসজিদে কুবায় ভিত্তি স্থাপন ..... ২২২

মদিনা মুনাওয়ারায় স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা ..... ২২৩

বনু নাজ্জারের বালিকাদের সংগীত ..... ২২৩

ইয়াসরিব 'মদিনাতুন নবী' (সা.)-এ পরিণত হওয়া ..... ২২৪

মসজিদে নববী, ইসলামের নতুন কেন্দ্র ..... ২২৪

মুয়াখাত, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ..... ২২৫

পরিবার-পরিজনকে মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর এবং তাদের আবাসের ব্যবস্থা ..... ২২৫

আসহাবে সুফফাহ, প্রথম ইসলামী মাদ্রাসা ..... ২২৬

যোহর, আসর ও এশার নামাজে চার রাকাত ফরজ হওয়া ..... ২২৬

আযানের বিধান ..... ২২৬

ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মুখীন বিপদসমূহ ..... ২২৭

আবদুল্লাহ বিন উবাই, মুনাফিকদের সর্দার ..... ২২৭

ইয়াহুদি ..... ২২৮

মদিনা সনদ ..... ২২৯

কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার প্রচেষ্টা ..... ২৩০

কুরাইশদের পক্ষ থেকে পথ অবরোধ ..... ২৩০

মদিনায় কুরাইশদের আক্রমণের আশঙ্কা ..... ২৩০

জিহাদের অনুমতি ..... ২৩১

মক্কায় কেন জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি? ..... ২৩১

জিহাদের উদ্দেশ্য ..... ২৩২

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদসমূহ ..... ২৩৩

প্রাথমিক অভিযানসমূহ ..... ২৩৩

কুরাইশদের দুর্বল দিক: অনিরাপদ বাণিজ্যিক পথ ..... ২৩৪

গাযওয়া ও সারিয়াসমূহ ..... ২৩৪

সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা ..... ২৩৬

সারিয়াহ আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.) ..... ২৩৭

কাবা কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হওয়া ..... ২৩৮

আশুরার রোজা ..... ২৩৮

রমজানের রোজা ফরজ হওয়া ..... ২৩৯

**বদর যুদ্ধ (রমজান ২ হিজরি / মে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)** ..... ২৪০

শিশুদের জিহাদের আগ্রহ ..... ২৪০

কাফেলার পরিবর্তে মক্কার বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া ..... ২৪১

ব্যক্তিগত লড়াই ..... ২৪৩

ভয়াবহ যুদ্ধ, উমাইর বিন হুমামের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ..... ২৪৪

আনসারী যুবকদের জিহাদের জযবা, আবু জাহেলের জাহান্নাম যাত্রা ..... ২৪৪

মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ..... ২৪৬

ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য, সাহাবায়ে কেরামের কারামত ..... ২৪৭

উমাইয়া বিন খালাফের হত্যা ..... ২৪৮

এই উম্মতের ফেরাউন ..... ২৪৮

যুদ্ধ চলাকালীন নববী মোজেজাসমূহ ..... ২৪৯

রক্তের সম্পর্কের কোরবানি ..... ২৪৯

আনন্দ ও বেদনা - হযরত রুকাইয়াহ (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... ২৫০

রোমের কাছে পারস্যের পরাজয়, কুরআনি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ..... ২৫০

বদরের শহীদ এবং নিহত কাফেরদের সংখ্যা ..... ২৫০

বন্দীদের সাথে আচরণ ..... ২৫১

জামাতার গ্রেফতারি ..... ২৫১

সদকাতুল ফিতরের বিধান ..... ২৫২

https://t.me/BoierSomahar

নামাজ-ই-ঈদের বিধান ..... ২৫২

ঈদগাহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলসমূহ ..... ২৫২

নারীদের প্রতি বিশেষ ভাষণ ..... ২৫২

যাকাত ফরয হওয়া ..... ২৫৩

বদর যুদ্ধের প্রভাব: প্রতিশোধের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র ..... ২৫৩

হাবশায় কুরাইশদের প্রতিনিধি দল ..... ২৫৩

হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর বিবাহ ..... ২৫৪

ইয়াহুদীদের সাথে প্রথম যুদ্ধ: গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা ..... ২৫৫

গাযওয়ায়ে সাভীক ..... ২৫৫

বিশেষ গোপন অভিযান: ইয়াহুদী কাব বিন আশরাফের হত্যা ..... ২৫৬

উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিবাহ ..... ২৫৭

ইরাকের রাজপথে কুরাইশদের প্রতিরোধ: সারিয়্যা যায়েদ বিন হারিসা ..... ২৫৭

**গাযওয়ায়ে উহুদ (শাওয়াল ৩ হিজরী)** ..... ২৫৮

উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং মুনাফিকদের ইসলাম বিদ্বেষ ..... ২৫৯

প্রতিরক্ষামূলক রণকৌশল ..... ২৫৯

কুরাইশ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ..... ২৬১

মুসলিমদের কাতারবন্দীর সামরিক দিকসমূহ ..... ২৬১

আবু দুজানা (রা.)-এর বীরত্ব ও ব্যক্তিগত লড়াই ..... ২৬২

সাধারণ আক্রমণ ও মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ..... ২৬৩

পরিস্থিতি পাল্টে গেল ..... ২৬৩

নবী করীম ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় আত্মত্যাগ ..... ২৬৪

বিক্ষিপ্ত মুসলিমদের সাহস ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ..... ২৬৫

হুজুর ﷺ-কে চিনে নেওয়া: সাহাবীদের আনন্দ ..... ২৬৬

উহুদ পাহাড়ের দিকে পশ্চাদপসরণ: সাহাবীদের কুরবানী ..... ২৬৭

উবাই বিন খালাফ জাহান্নামবাসী হলো ..... ২৬৭

উহুদ পাহাড়ে নূরানী চেহারা ..... ২৬৮

আহতদের সেবা: সাকীনাহ নাযিল হওয়া ..... ২৬৮

আবু সুফিয়ানের সাথে কথোপকথন ..... ২৬৯

গোয়েন্দাগিরির জন্য হযরত আলী (রা.)-এর যাত্রা ..... ২৭০

উহুদের শহীদগণ ..... ২৭০

আমর বিন আল-জামুহ (রা.) ..... ২৭০

হযরত হানযালা গাসীলুল মালাইকা (রা.) ..... ২৭১

হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.)-এর অপূর্ণ কাফন ..... ২৭১

একজন শহীদের শেষ কথাগুলো ..... ২৭১

হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ ..... ২৭১

কে জিতল? কে হারল? ..... ২৭২

**গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ** ..... ২৭২

উম্মে আম্মারার জযবা ..... ২৭৩

কয়েকটি গভীর ক্ষত ..... ২৭৪

রাজী'র ঘটনা ..... ২৭৪

উচ্চতর ইসলামী আখলাকের একটি উদাহরণ ..... ২৭৫

রাসূলুল্লাহর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার এক অদ্ভুত ঝলক ..... ২৭৫

**বি'রে মাউনার ঘটনা** ..... ২৬৭

**পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানসমূহ: জিহাদের ময়দান আরও প্রশস্ত হওয়া** ..... ২৭৮

গাযওয়ায়ে বনী লিহিয়ান ..... ২৭৮

মক্কার উপকণ্ঠ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.)-এর আক্রমণ ..... ২৭৮

নজদ ও বাতনে উরনায় অতর্কিত হামলা ..... ২৭৮

এই অভিযানসমূহের প্রভাব ..... ২৭৯

জিহাদের সময় ইসলামের দাওয়াত ..... ২৭৯

ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান: গাযওয়ায়ে বনু নাযীর ..... ২৮০

গাযওয়ায়ে বদরুল মাওঈদ (যিলকদ ৪ হিজরী) ..... ২৮০

https://t.me/BoierSomahar

আবু রাফে-র হত্যা (জিলহজ ৪ হিজরি) ..... ২৮০

**উত্তরের দিকে অভিযানসমূহ (৫ হিজরি)**

গাজওয়া দুমাতুল জান্দাল ..... ২৮১

**গাজওয়া বনু মুস্তালিক এবং ইফক-এর ঘটনা (শাবান ৫ হিজরি)** ..... ২৮২

মুনাফিকদের কারসাজি ..... ২৮২

ইফক-এর দুর্ঘটনা ..... ২৮৪

**গাজওয়া খন্দক (শাওয়াল ৫ হিজরি / ফেব্রুয়ারি ৬২৭ খ্রি.)** ..... ২৮৬

খন্দকের নকশা প্রণয়ন ও খনন ..... ২৮৭

রাত্রিকালীন অতর্কিত আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ..... ২৮৮

সাহাবীদের বীরত্বগাথা ও নাতিয়া কবিতা ..... ২৮৯

পূর্ব ও পশ্চিম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ..... ২৮৯

একজন সাহাবীর বাড়িতে দাওয়াত এবং মোজেজার প্রকাশ ..... ২৯০

আহজাব বাহিনীর আগমন এবং মদিনা অবরোধ ..... ২৯০

বনু কুরাইজার ষড়যন্ত্র ..... ২৯১

হযরত সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব এবং জুবায়ের বিন আওয়াম-এর বীরত্ব ..... ২৯২

নওফেল বিন আব্দুল্লাহ নিহত ..... ২৯৩

কুরাইশদের সামনে মাথা নত করতে আনসারদের অস্বীকার ..... ২৯৪

সাদ বিন মুয়াজ-এর জখম ..... ২৯৪

আমর বিন আবদে উদ-এর হত্যা ..... ২৯৫

মিত্রবাহিনীর মধ্যে ফাটল ..... ২৯৫

ঝড়ো আবহাওয়া এবং আহজাব বাহিনীর ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন ..... ২৯৭

**গাজওয়া বনু কুরাইজা (জিলকদ ৫ হিজরি)** ..... ২৯৮

**গাজওয়া খন্দকের পর সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা** ..... ৩০১

রাসুলুল্লাহ-র জয়নব বিনতে জাহাশ-এর সাথে বিবাহ (জিলকদ ৫ হিজরি) ..... ৩০১

রাসুলুল্লাহ-র উম্মে হাবিবা-র সাথে বিবাহ ..... ৩০২

সারিয়া আবু উবাইদাহ (সাইফুল বাহর) ..... ৩০৩

মক্কার তিনজন নির্যাতিত মুসলমানের মুক্তি ..... ৩০৩

সারিয়া উকাশা বিন মিহসান - সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা ..... ৩০৪

সারিয়া জায়েদ বিন হারিসা এবং আবুল আস বিন রাবি-র ইসলাম গ্রহণ ..... ৩০৫

সারিয়া জায়েদ বিন হারিসা এবং উম্মে কিরফা-র হত্যা ..... ৩০৬

মুরতাদদের শাস্তি (৬ হিজরি) ..... ৩০৬

**হুদাইবিয়ার সন্ধি (জিলকদ ৬ হিজরি)** ..... ৩০৭

কুরাইশদের সাথে আলোচনা ..... ৩০৭

বাইয়াতে রিদওয়ান ..... ৩০৮

কুরাইশদের সমঝোতায় সম্মতি ..... ৩০৯

সন্ধির শর্তাবলি এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ ..... ৩০৯

সন্ধিপত্র লেখার ক্ষেত্রে কুরাইশদের আপত্তি এবং হুজুর-এর চরম সহনশীলতা ..... ৩১১

ধৈর্য ও আনুগত্যের এক কঠিন পরীক্ষা ..... ৩১২

আবু বাসির-এর তৎপরতা ..... ৩১৩

আবু বাসির-এর অভিযানসমূহের ওপর ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমরির গবেষণামূলক মন্তব্য ..... ৩১৪

সন্ধির প্রভাবসমূহ ..... ৩১৫

খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর বিন আস-এর ইসলাম গ্রহণ ..... ৩১৫

**আক্রমণাত্মক জিহাদের সূচনা** ..... ৩১৬

খাইবার ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ..... ৩১৬

গাজওয়া খাইবারের ভূমিকা: ইয়াসির বিন রাজাম-এর হত্যা ..... ৩১৬

গাজওয়া জি-করাদ: একজন অল্পবয়সী সাহাবীর সাহস ও বীরত্বের ঐতিহাসিক ঘটনা ..... ৩১৭

https://t.me/BoierSomahar

**গজওয়ায়ে খায়বার (মুহাররম ৭ হিজরী)** ..... ৩১৯

কামুস বিজয় এবং মারহাবের হত্যা ..... ৩১৯

হযরত আলী (রা.)-এর হাতে মারহাবের হত্যা ..... ৩২০

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)-এর হাতে ইয়াসির ইহুদির হত্যা ..... ৩২০

খায়বারের অন্যান্য দুর্গের বিজয় ..... ৩২১

হযরত সাফিয়া (রা.)-এর সাথে বিবাহ ..... ৩২২

ফাদাক এবং ওয়াদিউল কুরার বিজয় ..... ৩২২

ইহুদীদের একটি অপবিত্র ষড়যন্ত্র ..... ৩২২

ইহুদীদের সাথে জমি বর্গা দেওয়ার চুক্তি ..... ৩২৩

হাবশার মুহাজিরদের আগমন ..... ৩২৩

যখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হলেন ..... ৩২৪

সুলহে হুদায়বিয়া এবং গজওয়ায়ে খায়বারের পর মদীনা রাষ্ট্রের মর্যাদা ..... ৩২৫

গজওয়ায়ে জাতুর রিকা ..... ৩২৫

সালাতুল খওফ ..... ৩২৬

নাজ্জাশী আসহামার ইন্তেকাল ..... ৩২৬

সুমামা বিন উসালের গ্রেফতারি, ইসলাম গ্রহণ এবং মক্কার খাদ্য অবরোধ ..... ৩২৬

শত্রুতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ ..... ৩২৭

**সুলতানদের ইসলামের দাওয়াত** ..... ৩২৮

বাদশাহদের নিকট প্রেরিত পত্রাবলীতে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ..... ৩২৮

হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের দাওয়াত ..... ৩২৯

হিরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফিয়ানের কথোপকথন ..... ৩২৯

হিরাক্লিয়াসের সামনে পবিত্র পত্র এবং হিরাক্লিয়াসের নিজ জাতির প্রতি ভাষণ ..... ৩৩২

হিরাক্লিয়াসের ফিরতি পত্র এবং উপহারসামগ্রী ..... ৩৩৩

রোমানদের নিকট মাকতুব-ই-নববীর হেফাজত ..... ৩৩৪

হারিস বিন আবি শিমারের নিকট মাকতুব-ই-নববী ..... ৩৩৪

মিশরের শাহ মুকাওকিসের নামে সম্মানিত পত্র ..... ৩৩৪

কিসরা পারভেজের নামে সম্মানিত পত্র ..... ৩৩৫

নাজ্জাশীর নামে সম্মানিত পত্র ..... ৩৩৭

আরব আমিরদের নামে পত্রাবলী ..... ৩৩৭

**উমরাতুল কাযা** ..... ৩৩৭

হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রা.)-এর সাথে বিবাহ ..... ৩৩৯

হযরত যয়নব বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকাল ..... ৩৩৯

**বাইজেন্টাইন রোমের সাথে প্রথম সংঘর্ষ: জঙ্গে মুতা** ..... ৩৪০

মারকা-ই-জাতুস সালাসিল ..... ৩৪৩

কুরাইশদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ হওয়া ..... ৩৪৪

**ফাতহে মক্কা (রমজান ৮ হিজরী)** ..... ৩৪৫

মক্কার দিকে যাত্রা ..... ৩৪৬

হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ ..... ৩৪৭

আবু সুফিয়ান বিন হারিসের ইসলাম গ্রহণ ..... ৩৪৭

আবু সুফিয়ান বিন হারবের ইসলাম গ্রহণ ..... ৩৪৭

ইসলামী লশকারের মহড়া ..... ৩৪৯

মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ ..... ৩৪৯

জান হরণকারীরা জান উৎসর্গকারী হয়ে গেল ..... ৩৫০

জীবন-মরণ একসাথে ..... ৩৫১

**গজওয়ায়ে হুনাইন** ..... ৩৫৩

তায়েফ অবরোধ ..... ৩৫৪

দুধবোন শায়মা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ ..... ৩৫৫

হালিমা সাদিয়া (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁদের সম্মান প্রদর্শন ..... ৩৫৬

বনু হাওয়াজিনের বন্দীদের মুক্তি ..... ৩৫৭

গজওয়ায়ে হুনাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ..... ৩৫৭

https://t.me/BoierSomahar

আবু মাহযুরার ইসলাম গ্রহণ ..... ৩৫৭

মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন ..... ৩৫৬

আত্তাব বিন আসীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে হজ ..... ৩৫৮

**গাযওয়ায়ে তাবুক (৯ হিজরি)** ..... ৩৫৯

ইসলামী বাহিনীর তাবুকের দিকে যাত্রা ..... ৩৬১

সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আল্লাহভীতি ..... ৩৬২

তাবুকে অবস্থান এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো দখল ..... ৩৬২

জিযিয়ার বিধান প্রবর্তন ..... ৩৬৩

হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ ..... ৩৬৩

কায়সারের দূতের প্রতি ইসলামের দাওয়াত ..... ৩৬৩

গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মসজিদে যিরার ধ্বংসকরণ ..... ৩৬৪

মদিনায় শুভাগমন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... ৩৬৫

কয়েকজন মুখলিস সাহাবীর পরীক্ষা। হযরত আবু লুবাবা (রা.)-এর তওবা ..... ৩৬৫

কা'ব বিন মালিক (রা.) এবং তাঁর সাথীদের তওবা ..... ৩৬৬

প্রতিনিধিদলের আগমন ..... ৩৬৭

তায়েফের প্রতিনিধিদল ..... ৩৬৭

বনু তামীমের প্রতিনিধিদল ..... ৩৬৮

আদী বিন হাতিমের ইসলাম গ্রহণ ..... ৩৬৯

আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু ..... ৩৭০

গোত্রসমূহের ক্রমাগত আগমন ..... ৩৭০

হজ ফরয হওয়া এবং প্রথম হজ (৯ হিজরি) ..... ৩৭১

নাজরানের পাদ্রীদের সাথে মুনাযারা ..... ৩৭৩

যাকাত আদায়কারীদের নিয়োগ ..... ৩৭৪

আরও প্রতিনিধিদলের আগমন ..... ৩৭৪

কিছু দুর্ভাগা লোক ..... ৩৭৪

বিদায় হজ (১০ হিজরি) ..... ৩৭৬

গাদীরে খুমের ভাষণ ..... ৩৮০

**পরকালের সফর** ..... ৩৮১

রোমানদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযানের প্রস্তুতি ..... ৩৮১

উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্ব ..... ৩৮২

মৃত্যু-রোগের সূচনা ..... ৩৮২

উসামার বাহিনীর যাত্রা ..... ৩৮৩

আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় স্থায়ী অবস্থান ..... ৩৮৩

উম্মতকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ ..... ৩৮৪

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেষবারের মতো সালাতে ইমামতি ..... ৩৮৪

হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমামতির নির্দেশ এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ইঙ্গিতসমূহ ..... ৩৮৪

রাসূলুল্লাহ (সা.) কী কী ওসিয়ত লিখে দিতে চেয়েছিলেন? ..... ৩৮৬

হযরত আলী (রা.)-কে ওসিয়ত ..... ৩৮৭

মসজিদে নববীতে শেষবারের মতো শুভাগমন ..... ৩৮৭

উম্মতের প্রতি শেষ ভাষণ ..... ৩৮৮

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইহসানের আলোচনা ..... ৩৮৮

উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা ..... ৩৮৮

কবরকে সিজদাহগাহ বানানোর নিষেধাজ্ঞা ..... ৩৮৯

আনসারদের সাথে সদাচরণের তাকিদ ..... ৩৮৯

উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর জন্য নিরব দুআ ..... ৩৯০

পার্থিব উপায়-উপকরণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ..... ৩৯০

মুবারক জীবনের শেষ দিন ..... ওফাতের দিন ..... ৩৯১

শেষ ওসিয়ত: সালাতের গুরুত্ব এবং দুর্বলদের প্রতি দয়া ..... ৩৯২

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর শোকাতুর অবস্থা ..... ৩৯৪

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইতিহাস সৃষ্টিকারী খুতবা ..... ৩৯৫

https://t.me/BoierSomahar

উম্মতের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্ন ..... ৩৯৬

সোমবার সন্ধ্যায় সকিফাহ বনী সা'দাহ-তে কী ঘটেছিল? ..... ৩৯৭

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বায়আত সম্পন্ন হওয়া ..... ৪০০

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন বায়আত গ্রহণ করলেন? ..... ৪০০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোসল ও কাফন ..... ৪০১

রাসূলের নায়েবের আনুষ্ঠানিক বায়আত ..... ৪০১

হযরত আলী এবং হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বায়আত গ্রহণে কেন বিলম্ব করেছিলেন? ..... ৪০২

বায়আতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম ভাষণ ..... ৪০৪

যখন নবুওয়াতের প্রদীপ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ..... ৪০৫

জানাজার নামাজ ও দাফনে কেন বিলম্ব হলো? ..... ৪০৬

দাফন-কাফনের পূর্বে খিলাফতের সমস্যার সমাধান করা কেন জরুরি মনে করা হয়েছিল? ..... ৪০৭

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের শোক ও দুঃখ ..... ৪০৭

**শামায়েলে মুস্তফা ﷺ** ..... ৪০৯

হুলিয়া মুবারক ..... ৪০৯

উন্নত চরিত্র ..... ৪১১

অনন্য গুণাবলী ..... ৪১২

মজলিসের সৌন্দর্য ও মাধুর্য ..... ৪১৩

প্রফুল্লতা ও সদালাপ ..... ৪১৪

অসুস্থদের সেবা ও দেখতে যাওয়া ..... ৪১৫

জিকির ও ইবাদত ..... ৪১৫

আল্লাহর জিকির ও আল্লাহভীতি ..... ৪১৫

পারিবারিক জীবন ..... ৪১৬

কথোপকথনের ভঙ্গি ..... ৪১৭

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ..... ৪১৭

রসিকতার চমৎকার ভঙ্গি ..... ৪১৯

শ্রদ্ধার্ঘ্য ..... ৪২২

খাইরুল আনাম ﷺ-এর দরবারে সালাম ..... ৪২৩

**হায়াতে তাইয়্যেবার মূল্যবান রূপরেখা** ..... ৪২৪

মক্কী জীবন... নবুওয়াতের পূর্বে ..... ৪২৪

মক্কী জীবন... নবুওয়াতের পরে ..... ৪২৬

মাদানী জীবন ..... ৪৩০

হিজরী সালসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কিছু ঝলক ..... ৪৪১

১ হিজরী (৬২২, ৬২৩ খ্রি.) ..... ৪৪২

২ হিজরী (৬২৩, ৬২৪ খ্রি.) ..... ৪৪২

৩ হিজরী (৬২৪, ৬২৫ খ্রি.) ..... ৪৪২

৪ হিজরী (৬২৫, ৬২৬ খ্রি.) ..... ৪৪৩

৫ হিজরী (৬২৬, ৬২৭ খ্রি.) ..... ৪৪৩

৬ হিজরী (৬২৭, ৬২৮ খ্রি.) ..... ৪৪৩

৭ হিজরী (৬২৮, ৬২৯ খ্রি.) ..... ৪৪৪

৮ হিজরী (৬২৯, ৬৩০ খ্রি.) ..... ৪৪৪

৯ হিজরী (৬৩০, ৬৩১ খ্রি.) ..... ৪৪৪

১০ হিজরী (৬৩১, ৬৩২ খ্রি.) ..... ৪৪৫

১১ হিজরী (৬৩২, ৬৩৩ খ্রি.) ..... ৪৪৫

দ্রষ্টব্য ..... ৪৪৫

**সীরাতে মুস্তফার বাণী** ..... ৪৪৬

**ইসলাম কি জোরপূর্বক প্রচার করা হয়েছে?** ..... ৪৪৮

ন্যূনতম জানমালের ক্ষতি - সর্বোচ্চ সুফল ..... ৪৫০

**ইতিহাসের শিক্ষা** ..... ৪৫১

**তৃতীয় অধ্যায়: খিলাফতে রাশেদা উত্থান ও বিজয়ের যুগ** ..... ৪৫৩

**হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত**

খিলাফতে রাশিদা বলতে কী বোঝায়? ..... ৪৫৬

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ..... ৪৫৮

সায়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখীন হওয়া পরীক্ষাসমূহ ..... ৪৫৯

নবীজীর মিরাস: একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ়তা ..... ৪৬০

হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অসন্তুষ্টির বর্ণনা এবং এর ব্যাখ্যাসমূহ ..... ৪৬৩

হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সন্তুষ্টির প্রমাণ ..... ৪৬৪

হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল ..... ৪৬৪

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ ..... ৪৬৪

হযরত ফাতিমা আয-যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল ..... ৪৬৪

**তিনটি বড় ফিতনা**

যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ ..... ৪৬৬

জাইশে উসামার রওয়ানা হওয়া ..... ৪৬৬

উসামার বাহিনী চলে যাওয়ার পর মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষা ..... ৪৬৬

বিদ্রোহীদের দমন ..... ৪৬৮

খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ..... ৪৬৯

তুলাইহার দমন ..... ৪৬৯

উম্মে জিমলের দমন ..... ৪৬৯

আসওয়াদ আনসীর ফিতনা ..... ৪৭১

মালিক বিন নুওয়াইরার হত্যা ..... ৪৭২

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর একটি অন্যায় অভিযোগ এবং তার জবাব ..... ৪৭৪

মুসাইলামা কাযযাবের ফিতনা ..... ৪৭৫

মুসাইলামার বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযান ..... ৪৭৫

চূড়ান্ত যুদ্ধ ..... ৪৭৭

কুরআন মাজীদের হিফাযত ..... ৪৭৯

আলা বিন আল-হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু, বাহরাইন রণাঙ্গনে ..... ৪৮০

**বৈদেশিক যুদ্ধসমূহ... ইরান ও রোম**

ইরানে সৈন্য অভিযানের সুযোগ ..... ৪৮২

ইরানীদের প্রতি বার্তা ..... ৪৮৩

অগ্নিপূজকদের সাথে প্রথম যুদ্ধ... যাতুস সালাসিল ..... ৪৮৪

ছানির যুদ্ধ ..... ৪৮৪

ওয়ালাজার যুদ্ধ ..... ৪৮৫

আমগিশিয়ার গনীমতের মাল ..... ৪৮৫

হীরা বিজয় ..... ৪৮৬

আইনুত তামরের যুদ্ধ ..... ৪৮৬

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু দূমাতুল জান্দালে ..... ৪৮৭

ফারাযের যুদ্ধ ..... ৪৮৭

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হজ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সতর্কবাণী ..... ৪৮৮

**রোমান সাম্রাজ্য**

রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান ..... ৪৮৯

নতুন বাহিনী বিন্যাস ..... ৪৮৯

ঐতিহাসিক ওসিয়ত ..... ৪৯০

পরাজয় এবং নতুন কৌশল ..... ৪৯০

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সিরিয়া যাত্রা ..... ৪৯১

মরুভূমি, তৃষ্ণা এবং ঝর্ণা ..... ৪৯২

(অস্পষ্ট পৃষ্ঠা নম্বর) ..... ৪৯৩

https://t.me/BoierSomahar

বসরা বিজয় ..... ৪৯৩
আজনাদাইনের যুদ্ধ ..... ৪৯৩
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর ওফাত ..... ৪৯৪
উত্তরাধিকারী নিয়োগের জন্য পরামর্শ ..... ৪৯৫
হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুকে বিশেষ অসিয়তসমূহ ..... ৪৯৬
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্বের ওপর এক নজর ..... ৪৯৬
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর কিছু গুণাবলি ..... ৪৯৭
রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনায় খোদাপ্রদত্ত দক্ষতা ..... ৪৯৯
পরীক্ষাসমূহের দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা ..... ৪৯৯
ইসলাম আগে মুসলমান পরে ..... ৫০০
**হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর খিলাফত** ..... ৫০১
হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু ..... ৫০২
ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ ..... ৫০৪
হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহু... ইসলামের প্রথম প্রধান সেনাপতি ..... ৫০৮
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ..... ৫০৮
দামেস্ক বিজয় ..... ৫০৯
ফাহলের যুদ্ধ ..... ৫১০
বাইজেন্টাইন রাজধানী হিমসের অবরোধ ..... ৫১১
ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ ..... ৫১২
**ইরান ফ্রন্ট** ..... ৫১৯
হযরত মুসান্না বিন হারিসা রাদিআল্লাহু আনহু মদিনায় ..... ৫১৯
ইরানি অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ ..... ৫২০
জিসরের যুদ্ধ ..... ৫২১
জিসরের প্রতিশোধ: বুওয়াইব যুদ্ধ ..... ৫২৩
ইয়াজদগিরদ, শেষ কিসরা ..... ৫২৪
হযরত মুসান্না রাদিআল্লাহু আনহুর মৃত্যু ..... ৫২৬
ইরান দরবারে ইসলামের দূতগণ ..... ৫২৭
রুস্তমের দরবারে ..... ৫২৯
**কাদিসিয়ার যুদ্ধ** ..... ৫৩৩
ইয়াওমে আরমাস ..... ৫৩৪
ইয়াওমে আগওয়াস ..... ৫৩৫
আবু মাহজান রাদিআল্লাহু আনহুর বীরত্ব ..... ৫৩৬
আবু মাহজানের ওপর মদ্যপানের অভিযোগ এবং এর বাস্তবতা ..... ৫৩৭
খানসা বিনতে আমরের জিহাদের জযবা ..... ৫৩৮
ইয়াওমে আমাস ..... ৫৩৯
লাইলাতুল হারির ..... ৫৪০
ইয়াওমে কাদিসিয়া ..... ৫৪০
আমি কোনো বাদশাহ নই ..... ৫৪১
বাবেল থেকে মাদায়েন পর্যন্ত ..... ৫৪২
দজলা নদীর ঢেউয়ের মাঝে ইসলামী বাহিনী ..... ৫৪৩
মুজাহিদের পেয়ালা এবং নদীর আমানতদারি ..... ৫৪৪
কিসরার ধনভাণ্ডার পদতলে ..... ৫৪৪
আমানত ও বিশ্বস্ততার অনন্য দৃষ্টান্ত ..... ৫৪৫
কালীনে নও বাহার ..... ৫৪৬
কিসরার মুকুট ও কঙ্কণ - নববী মুজিজা ..... ৫৪৭
জালুলার যুদ্ধ ..... ৫৪৭
ইরাকের উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা ..... ৫৪৮
**হুরমুজান..... তুসতার যুদ্ধ** ..... ৫৪৯
গাসসানি রাজপুত্র..... জাবালা বিন আইহাম ..... ৫৫২
জাবালা বিন আইহামের করুণ পরিণতি ..... ৫৫৩
**উত্তর সিরিয়ায়** ..... ৫৫৬
বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ..... ৫৫৬
কায়সারের শেষ চেষ্টা ..... ৫৫৯
খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর বরখাস্তের আসল কারণ ..... ৫৬০
দুর্ভিক্ষ ..... ৫৬২
আমওয়াসের প্লেগ ..... ৫৬৩
**মিসর বিজয়** ..... ৫৬৫
নীল নদের কনে ..... ৫৬৮
ইয়াজদগিরদের শেষ চেষ্টা - নেহাওয়ান্দের যুদ্ধ ..... ৫৬৯
ইয়াজদগিরদের আত্মগোপন ..... ৫৭১
ইসলামি বাহিনীর অগ্রযাত্রায় বাধা প্রদান ..... ৫৭২
**হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে মুসলিম বিশ্ব** ..... ৫৭৩
**শাহাদাতের ঘটনা** ..... ৫৭৮
খলিফার দোয়া ..... ৫৭৮
গোপন ষড়যন্ত্র ..... ৫৭৯
ঘাতক হামলা... কেন... কীভাবে? ..... ৫৭৯
হযরত উমর (রা.)-এর হত্যাকারী, ব্যক্তিগত ক্ষোভ নাকি ষড়যন্ত্র? ..... ৫৮১
ঘাতক হামলা ..... ৫৮৩
শেষ অসিয়তসমূহ ..... ৫৮৪
অসিয়ত ..... ৫৮৫
শেষ ইচ্ছা ..... ৫৮৬
ইন্তেকাল ..... ৫৮৬
উত্তরাধিকার ..... ৫৮৭
**হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর খিলাফত** ..... ৫৯০
খিলাফতের দায়িত্বসমূহ ..... ৫৯৩
হরমুজানের হত্যাকারী - একটি নাজুক বিষয় ..... ৫৯৩
প্রথম খুতবা ..... ৫৯৬
ফিতনার অনুভূতি ..... ৫৯৭
হযরত উসমান গনি (রা.)-এর সর্বোত্তম নীতি ..... ৫৯৮
নীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ ..... ৫৯৯
জিহাদের ময়দানে হযরত উসমান গনি (রা.)-এর জানবাজগণ ..... ৬০৩
রোমান সরদারের তাঁবুতে ..... ৬০৩
**আফ্রিকা বিজয়** ..... ৬০৫
**নৌযুদ্ধ** ..... ৬০৯
জাতুস সাওয়ারির যুদ্ধ ..... ৬১১
কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনা ..... ৬১৩
**পূর্ব রণাঙ্গন** ..... ৬১৪
ইয়াজদগিরদের মৃত্যু কীভাবে হলো? ..... ৬১৪
খুরাসান বিজয় ..... ৬১৫
**চতুর্থ অধ্যায়: খিলাফতে রাশেদাহর গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র দিক এবং ইসলামি রাজনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ** ..... ৬১৭
খিলাফতে রাশেদাহর রাজনীতির মূলনীতিসমূহ ..... ৬১৮
ইসলামি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহ ..... ৬১৯
সরকারের উদ্দেশ্য ..... ৬১৯
খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ..... ৬১৯
শুরার মৌলিক মর্যাদা ..... ৬২০
যোগ্যতার ভিত্তিতে পদের জন্য নির্বাচন ..... ৬২০
পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা ..... ৬২০
শাসকদের আনুগত্য ..... ৬২১
শাসনকার্য একটি কঠিন দায়িত্ব যার ওপর শাসকের মুক্তি বা ধ্বংস নির্ভরশীল ..... ৬২২
বিদ্রোহের অপরাধী কঠোর শাস্তির যোগ্য ..... ৬২২
ইজতিহাদি ভুল ক্ষমাযোগ্য ..... ৬২২
শাসকদের সংশোধন - আহলে ইলমের দায়িত্ব ..... ৬২২
**খিলাফতে রাশেদাহতে মুসলিম বিশ্ব** ..... ৬২৪

শুরায়িত ..... ৬২৪

ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতিমালা ..... ৬২৪

কর্মকর্তাদের নিয়োগ ..... ৬২৪

বদলি ও বরখাস্ত ..... ৬২৫

কেন্দ্রীয় পদসমূহ ..... ৬২৫

আমিলের দায়িত্বসমূহ ..... ৬২৫

আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা ..... ৬২৬

নির্দেশনা ও শাসন সম্বলিত পত্রাবলি ..... ৬২৭

রাষ্ট্রের বিভাজন... কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর যোগাযোগ ..... ৬২৭

বাণিজ্যিক বিভাগ ..... ৬২৭

ভরণপোষণ ব্যবস্থা - ইদারাতুল ফুরকা ..... ৬২৮

বিচার বিভাগ ..... ৬২৮

ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকা ..... ৬২৯

আয়ের উৎসসমূহ ..... ৬২৯

কৃষি উন্নয়ন - আর্থিক সচ্ছলতা ..... ৬৩০

বাইতুল মালের ব্যয়সমূহ ..... ৬৩০

হারামাইন শরিফাইন ও মসজিদসমূহের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ..... ৬৩১

তরুণদের যোগ্যতার পরীক্ষা ..... ৬৩২

খিলাফতে রাশিদাহ-তে জ্ঞানতাত্ত্বিক কার্যক্রম ..... ৬৩৩

কুরআন মাজিদের হিফাযত ..... ৬৩৩

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে কুরআন হিফাযত ..... ৬৩৪

কুরআন মাজিদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ..... ৬৩৪

সুন্নাহ হিফাযতের প্রচেষ্টা ..... ৬৩৫

ফিকহ-এর প্রতি মনোযোগ ..... ৬৩৬

ইফতা ..... ৬৩৭

কবিতা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাজ্ঞান ..... ৬৩৭

বিজয় অভিযানকাল - সাহাবী যুগ - গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এক নজরে ..... ৬৩৮

ইতিহাসের শিক্ষা ..... ৬৪৩

**পঞ্চম অধ্যায়: রিসালাত যুগ ও খিলাফতে রাশিদাহ যুগের মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ** ..... ৬৪৫

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার: উম্মাহাতুল মুমিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহুন্ন** ..... ৬৪৬

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৪৭

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৪৯

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বিনতে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৫১

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৫৪

হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া, উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৫৭

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৬১

উম্মুল মুমিনীন রামলা বিনতে আবি সুফিয়ান, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৬৩

উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৬৪

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৬৪

উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৬৫

উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৬৫

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের সাথে কোনো উম্মতীর বিবাহ কেন বৈধ ছিল না? ..... ৬৬৬

সীরাতে নববী ও বহুবিবাহ ..... ৬৬৭

**পবিত্র সন্তানসন্ততি** ..... ৬৬৯

সম্মানিত পুত্রগণ ..... ৬৬৯

মর্যাদাবান কন্যাগণ ..... ৬৭০

হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৭১

হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ..... ৬৭২

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ..... ৬৭৩

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা.) ..... ৬৭৪

নাতি ও নাতনিগণ ..... ৬৭৮

হযরত যয়নব (রা.)-এর সন্তানাদি ..... ৬৭৮

হযরত রুকাইয়্যাহ (রা.)-এর সন্তানাদি ..... ৬৭৯

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সন্তানাদি ..... ৬৭৯

চাচা ও ফুফুগণ ..... ৬৮০

**আকাবিরে সাহাবা... আশারায়ে মুবাশশারা** ..... ৬৮১

আশারায়ে মুবাশশারার পরিচিতি ..... ৬৮২

আমীনুল উম্মাহ আমির বিন আব্দুল্লাহ আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ (রা.) ..... ৬৮২

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.) ..... ৬৮৬

হযরত যুবাইর বিন আল-আওয়াম (রা.) ..... ৬৮৯

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) ..... ৬৯৪

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ..... ৬৯৯

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ..... ৭০১

**কতিপয় আকাবিরে সাহাবার আলোচনা** ..... ৭০৫

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ..... ৭০৫

হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) ..... ৭১১

হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.) ..... ৭১৩

হযরত সাদ বিন মুআয (রা.) ..... ৭১৪

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ..... ৭১৬

ইসলামের যুবকদের প্রতি সম্বোধন (আল্লামা ইকবাল মরহুম) ..... ৭১৯

আহলে নজর সাহাবা (জনাব আছর জৌনপুরী) ..... ৭২০

গ্রন্থপঞ্জি ..... ৭২১

https://t.me/BoierSomahar

“তারিখ উম্মতে মুসলিমা”-এর বৈশিষ্ট্য এক নজরে

- সীরাতুন নবী এবং সীরাতে সাহাবা সম্পর্কে অনির্ভরযোগ্য উপাদান থেকে মুক্ত।
- হযরত আদম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রথম বিস্তারিত উর্দু ইতিহাস।
- প্রথম খণ্ডে ইতিহাস বিজ্ঞানের পরিচিতি ও মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে একটি ভূমিকা।
- দ্বিতীয় খণ্ডে ইতিহাসের গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের নিয়ম-কানুন সম্বলিত একটি পুস্তিকা।
- মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুযায়ী ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর গবেষণা ও যাচাই-বাছাই।
- মাগাযী এবং মতপার্থক্য বিষয়ক বর্ণনাগুলোর ওপর হাদীসের শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত দরকারী ব্যাখ্যামূলক আলোচনা।
- ইলমুর রিজালের আলোকে বর্ণনার সনদসমূহের পর্যালোচনা এবং বর্ণনাকারীদের নিয়ে আলোচনা।
- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত্যপূর্ণ আকিদা ও মতাদর্শের সমর্থনে সময়োপযোগী শক্তিশালী যৌক্তিক ও উদ্ধৃতিমূলক প্রমাণাদি।
- বিভিন্ন ফিরকার উদ্ভব নিয়ে গবেষণা এবং তাদের ভুল আকিদা ও মতাদর্শের ওপর নীতিগত সমালোচনা।
- সন্দেহজনক ঘটনাবলির সনদ ও মতন এবং রেওয়ায়েত ও দেরায়াতগত বিশ্লেষণ।
- দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ঘটনাবলি বিস্তারিতভাবে।
- ইসলামী ইতিহাসের সকল বড় যুদ্ধ ও সংঘাতের বিস্তারিত আলোচনা।
- ঘটনাবলি, বিশেষ করে সীরাত ও মাগাযীর সঠিক সময়কাল নির্ধারণ এবং ঈসায়ী ক্যালেন্ডারের সাথে তার সামঞ্জস্য বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা।
- মূল, প্রাচীনতম এবং নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- প্রতিটি কথা পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্সসহ।
- গৌরবময় মুসলিম খলিফা, সুলতান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাতিল ফিরকা, সেকুলার ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচারের দালিলিক খণ্ডন।
- ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর সময়োপযোগী উল্লেখ।
- বিভিন্ন যুগে ইলমী, সংস্কারমূলক ও জাতীয় খেদমত আঞ্জামদানকারী মহান ব্যক্তিত্বদের বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা।
- কঠিন শব্দ পরিহার করে সাবলীল ও সহজবোধ্য ইবারত।
- পাঠকদের ধরে রাখার মতো আকর্ষণীয় লিখনশৈলী।
- টীকাসমূহে আলেম ও ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ইলমী আলোচনা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## এই পৃষ্ঠাগুলো সম্পর্কে কিছু কথা

নিজের ইতিহাস অধ্যয়ন করা জীবন্ত জাতিগুলোর নিদর্শন। ইতিহাসই সেই শিকল যা আমাদের অতীতের সাথে যুক্ত করে। বর্তমানে পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চরম শিখরে। পৃথিবী আল্লাহ-বিশ্বাসী এবং বস্তুবাদী—এই দুটি বড় দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বস্তুবাদী যারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের অনুসারী, তারা আল্লাহর বান্দাদের সেই সত্য, আসল এবং শিক্ষণীয় ইতিহাস থেকে গাফেল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যা ইসলামের বদৌলতে বিশ্বের সামনে এসেছিল। এর পরিবর্তে ভোগ-বিলাসী বাদশাহ, অর্থলোভী নেতা এবং বাহ্যিক চাকচিক্যপ্রিয় জাতিগুলোর অবস্থা ও ঘটনাবলিকে বীরত্বগাথা হিসেবে অতিরঞ্জিত করে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, ইতিহাস ও অতীতের প্রতি আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তির চোখ ধাঁধিয়ে যায় এবং সেও আল্লাহ, রাসূল, শরীয়ত ও আখেরাতকে বিস্মৃত হয়ে অন্ধভাবে দুনিয়াপূজা ও সম্পদ আহরণের পথে দৌড়াতে শুরু করে।

ইতিহাস বিকৃত করার এই ষড়যন্ত্র প্রাচ্যবিদ, পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় শিষ্যদের মাধ্যমে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে পূর্ণ দমে চলছে। এদিকে মুসলমানদের অবস্থা এই যে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। নিরক্ষর ব্যক্তিদের কথা তো বলাই বাহুল্য, যথেষ্ট শিক্ষিত লোকেরাও ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নয়।

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহর বান্দাদের জন্য জরুরি হলো তারা যেন মুসলমানদের আসল ইতিহাস সামনে নিয়ে আসে। তাদের ওপর আবশ্যক হলো তারা যেন সত্যকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেয় এবং সত্য বিকৃত করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে নিজেদের সমস্ত সক্ষমতা কাজে লাগায়।

গত সতেরো-আঠারো বছর ধরে আমি “রোজনামা ইসলাম” এবং সাপ্তাহিক “যরবে মুমিন” সহ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর ওপর লিখে আসছি। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক ও চিন্তামূলক প্রোগ্রামগুলোতে ইসলামী ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগও হয়েছে। এই সময়ে আমার কাছে সরাসরি, ফোন, ডাক বা ই-মেইলের মাধ্যমে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি করা হয়েছে তা হলো: “ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য কোন কিতাব পড়া উচিত?” অথবা... “এমন একটি কিতাবের নাম বলুন যাতে আজ পর্যন্তকার পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ইতিহাস পাওয়া যায়।” এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে সর্বদা বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ হলো এই মুহূর্তে বাজারে এমন কোনো

এমন কোনো কিতাব পাওয়া যায় না যাতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলমানদের ইতিহাস এক জায়গায় জমা করা হয়েছে। তাছাড়া যেসব কিতাব বিদ্যমান আছে সেগুলোর প্রতিটি অধ্যায় ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তিতে কলুষিত। কারো মধ্যে কম আবার কারো মধ্যে বেশি দুর্বলতা অবশ্যই আছে। এই দুর্বলতা সীরাতে তাইয়্যেবা এবং সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সীরাত সম্পর্কে এমন অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা গবেষণালব্ধ মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত, সেগুলো এই ইতিহাসগুলোতে শামিল রয়েছে। অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত হাসনাইন কারীমাঈন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমের জীবনবৃত্তান্তকেও কিছু যঈফ ও সন্দেহজনক বর্ণনার মাধ্যমে অনেক বিকৃত করা হয়েছে। যথাযথ গবেষণা না করার কারণে এই ভুল বর্ণনাগুলো ইতিহাসের এক বড় অংশে পরিণত হয়েছে।

এর একটি বড় কারণ হলো আরবি ও ফারসি ইতিহাসসমূহ যা ইসলামী খিলাফতের পতন এবং আহলে ইলমদের মধ্যে গবেষণার উপাদান কমে যাওয়ার পর সামনে এসেছে, সেগুলোতে সনদসমূহ বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, অথচ বর্ণনাভঙ্গি আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এই কারণে সেগুলো বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। উপনিবেশবাদের সময় যখন ইউরোপীয় ভাষায় মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস রচনার ধারা শুরু হলো তখন এই উপাদানগুলোকেই হুবহু গ্রহণ করা হলো। অধিকাংশ উর্দু ও ইংরেজি ইতিহাস এই ধরনেরই, অর্থাৎ অনুবাদ মাত্র, গবেষণা নয়। বরং কিছু ঐতিহাসিক তো অনুবাদের সাথে এমন বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছেন যা ইসলামী ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোকে কলঙ্কিত করে দেয়। তাছাড়া মুসলিম খলিফা ও সুলতানদের মধ্যে অনেক প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্বকে প্রচলিত ইতিহাসগুলোতে দয়াহীন, লোভী ও জালিম শাসক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে যা বাস্তব সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সামগ্রিকভাবে প্রচলিত ইসলামী ইতিহাসের কিতাবগুলোতে চারটি বড় দুর্বলতা রয়েছে:

- ১. অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থ নবুওয়াতী যুগ থেকে শুরু করে বনু আব্বাস পর্যন্ত ঘটনাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর চেয়ে সামনে এগোয়নি। কিছু কিতাব তুর্কি উসমানী খিলাফতের সমাপ্তি পর্যন্ত রয়েছে। কিন্তু সেই সময়ও এখন প্রায় এক শতাব্দী হয়ে গেছে। উর্দুতে বর্তমান সময় পর্যন্ত একত্রিত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজন হলো এমন একটি ইতিহাস সংকলন করা যা বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলে।

- ২. এই কিতাবগুলো সন্দেহজনক উপাদানে কলুষিত। যদিও উর্দুতে দুটি কিতাব মানদণ্ডের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো: একটি শাহ মঈনুদ্দীন নদভীর তারীখে ইসলাম এবং দ্বিতীয়টি তারীখে মিল্লাত। এই কিতাবগুলোতে তথ্যের যে মূল্যবান ভাণ্ডার পাওয়া যায় তা অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এগুলোতে এই দুর্বলতা বিদ্যমান যে, সীরাত ও সাহাবা যুগের ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়নি এবং সন্দেহজনক বর্ণনাগুলোর সনদ যাচাই করার চেষ্টা করা হয়নি। এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, পবিত্র সীরাতে মুতাহহারা ও সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র সম্পর্কে অনেক ভিত্তিহীন বর্ণনা সেগুলোর অংশ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস এবং পরবর্তী মুসলিম সুলতানদের সম্পর্কেও কিছু সন্দেহজনক উপাদান এই কিতাবগুলোর অংশ। তাই নিজেদের উপকারিতা সত্ত্বেও এই কিতাবগুলোর কিছু স্থান গবেষণার দিক থেকে মানসম্মত নয়। আকবর শাহ নজীবাবাদীর তারীখে ইসলাম-ও অনেক প্রসিদ্ধ কিন্তু এই সমস্ত দুর্বলতা তাতেও বিদ্যমান। আবার এতে কোনো রেফারেন্স একেবারেই দেওয়া হয়নি যা একটি বড় ত্রুটি।

- ৩. এই কিতাবগুলোর ভাষা পুরনো এবং সাধারণ পাঠকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া এতে এমন কিছু বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা বর্তমান...

...এর দিক থেকে অপ্রয়োজনীয়।

এই বইগুলো আধুনিক যুগের মানুষের সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে সেই সব সংশয়ের অধিকাংশ নিরসন হয় না যা নতুন প্রজন্মের মনে সৃষ্টি হয়েছে, বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে এই ইতিহাস পাঠ করলে এ ধরনের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে, এই ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক বিবরণ উল্লেখ নেই যা একজন সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মুসলমানের প্রয়োজন এবং যা পাঠ করে সে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে কাউকে এটা বলা খুব কঠিন যে:

"আপনি অমুক ইতিহাসটি কোনো দ্বিধা ছাড়াই অধ্যয়ন করুন কারণ এটি পূর্ণাঙ্গ এবং সব দিক থেকে নির্ভরযোগ্য।"

অন্যদিকে বর্তমান যুগে যেমন ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন এবং দ্বীনি মাদ্রাসা ও মক্তবগুলোর প্রচেষ্টায় যুবসমাজ বিপুল সংখ্যায় দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, তেমনি তাদের মধ্যে নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহও বাড়ছে। এই যুবকদের মধ্যে দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্ররা ছাড়াও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা এই বিষয়ে কোনো সঠিক দিকনির্দেশনা না পাওয়ার কারণে বিভ্রান্তিতে থাকে। তারা সবাই জিজ্ঞাসা করে যে আমরা আমাদের ইতিহাস কোথা থেকে এবং কীভাবে অধ্যয়ন করব?

ওলামায়ে কেরাম বা আরবি জানা ছাত্রদের প্রতি আমার পরামর্শ ছিল যে তারা যেন তারিখ ইবনে খালদুন বা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া অধ্যয়ন করেন, কারণ এগুলো অনেকখানি ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত, যদিও কিছু দুর্বলতা এগুলোতেও রয়েছে। উর্দু জানা যুবকদের আমি এই পরামর্শ দিতাম যে আপনারা তারিখ-ই-মিল্লাত বা শাহ মঈনুদ্দিন নদভীর তারিখ-ই-ইসলাম অধ্যয়ন করুন, তবে সীরাতে নববী বা সাহাবায়ে কেরামের যুগ সম্পর্কিত যে কথাটি সন্দেহজনক বা অদ্ভুত মনে হবে তা নোট করে ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে তার বাস্তবতা জেনে নিন অথবা আমাদের আকাবিরগণ সীরাতুন্নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের ওপর আলাদাভাবে যে বইগুলো লিখেছেন সেগুলো অধ্যয়ন করে নিন।

তবে আমার কাছে এই প্রয়োজনটি ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে যে আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন করে আমাদের ইতিহাস সংকলনের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করুক। এমন ইতিহাস উপস্থাপন করুক যা গবেষণাবিরোধী উপাদান থেকে মুক্ত, তথ্যসূত্র সমৃদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য হবে, যা সবাই পড়তে পারবে এবং উপকৃত হতে পারবে এবং যা বর্তমান সময়ের অবস্থা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে।

বছরের পর বছর এই অপেক্ষায় কেটে গেল যে কোনো প্রতিষ্ঠান এই কাজ শুরু করবে। আমি নিজে এই সময়ে সুলতান জালালুদ্দিন এবং সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর কাজ করছিলাম, তাই এই বিষয়ে আলাদাভাবে কাজ করার সময় বের করতে পারছিলাম না। তারপর সাংবাদিকতা এবং শিক্ষকতার দায়িত্বও কাঁধে ছিল, অথচ এই ময়দানটি এমন ছিল যে এর জন্য সমস্ত কাজ থেকে অবসর নিয়ে দিনে অন্তত আট-দশ ঘণ্টা বইয়ের সমুদ্রে ডুবে থাকা এবং বেশ কয়েক বছর বিরতিহীনভাবে কাজ করা জরুরি ছিল।

অনেক বছর কেটে গেল। এই সময়ে আলেমদের সাথে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। সবাই পূর্ণ সমর্থন করতেন যে এই কাজ হওয়া উচিত, কিন্তু এই কাজ শুরু করার পথগুলো খুলছিল না। আসলে প্রকৃত মালিক প্রতিটি কাজের শুরু ও শেষের একটি...

সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ লাখো চাক কিন্তু যতক্ষণ তাঁর হুকুম না হয়, আমাদের সংকল্প ও স্বপ্নে প্রাণ সঞ্চার হয় না এবং কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

যখন আমি 'শের-এ-খোয়ারিজম'-এর সংশোধন এবং সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর পাণ্ডুলিপির কাজ থেকে অবসর হলাম, তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের পর আল্লাহর ওপর ভরসা করে এই কাজের জন্য কোমর বাঁধলাম। কারণ:

- আমার হৃদয়ে এই কাজের তাগিদ এত তীব্র ছিল যে অন্যান্য কাজ আমার দৃষ্টিতে গৌণ হয়ে গিয়েছিল।

- এই কাজ না করার ক্ষেত্রে পরকালীন জবাবদিহিতার আশঙ্কা ছিল। নিজের সমাজের বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণীকে শত শত ঐতিহাসিক গবেষণায় ভুল ধারণায় নিমজ্জিত দেখে আমার ওপর এটি আবশ্যক হয়ে পড়েছিল যে সঠিক ইতিহাস সামনে আনার চেষ্টা করি। এটি একটি জাতীয় সহানুভূতি এবং ধর্মীয় দায়িত্বের দাবি ছিল যা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

- মৃত্যুর কোনো নির্ধারিত সময় নেই। আশঙ্কা ছিল যে কাজ দ্রুত শুরু না করলে হয়তো হায়াত শেষ হয়ে যাবে।

- নিজের মুরুব্বি, উস্তাদ এবং বড়দের কাছে এই সংকল্প প্রকাশ করলে সবাই উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং দোয়া করেছেন।

- এই কাজের জন্য যে অবসরের প্রয়োজন ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপকরণ তৈরি হতে থাকল।

রব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে এই কাজের সূচনার সময় যখন এল, তখন আমার একনিষ্ঠ বন্ধু এবং পুরাতন বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ আলতাফ ইয়াসিনকে আমার চিন্তার সঙ্গী করে দিলেন। জামিয়া মা'হাদুল খলীল আল-ইসলামীতে ছাত্রজীবনের সময় থেকে তাঁর সাথে সম্পর্ক চলে আসছে। জামিয়া আর-রশীদ করাচিতে পাঠদান সেবার সময়ও আমরা একসাথে ছিলাম। এই সম্পর্ক যা বিশ বছরেরও বেশি পুরনো, আল্লাহ তাআলা একে এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি খিদমতের সূচনার মাধ্যম বানিয়ে দিলেন। এমন বন্ধুদের সহযোগিতা এবং উস্তাদ ও বড়দের দোয়ার সাথে ১৪৩৩ হিজরি (২০১১ খ্রিষ্টাব্দে) এই অধম আল্লাহর নাম নিয়ে এই বিষয়ের ওপর কলম ধরলাম। আমার সামনে প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাস ছিল যাতে আমাকে ডুব দিতে হয়েছিল। শত শত কিতাব এবং লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার ওপর ভিত্তি করে উপাদান থেকে উদ্ধৃতি নির্বাচন করতে হতো এবং সেগুলোকে উর্দুতে ঢেলে সর্বোত্তম বিন্যাসে পাঠকদের সামনে পেশ করতে হতো।

যতক্ষণ আমি করাচিতে ছিলাম, এই কাজের সাথে সাথে 'রোজনামা ইসলাম'-এ 'খাওয়াতীন কা ইসলাম'-এর সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করছিলাম। এর পাশাপাশি 'জামিয়া আর-রশীদ, আহসানাবাদ, করাচি'-তে পাঠদান সেবাও অব্যাহত ছিল। তা সত্ত্বেও এই কাজের জন্য দৈনিক চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা বের করতাম। তবে করাচির প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমার স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভেঙে পড়ছিল, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই হয়তো স্নায়ু জবাব দিয়ে দেবে।

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে স্বাস্থ্যের অবনতি, শহরের হট্টগোলপূর্ণ পরিবেশ এবং কিছু অন্যান্য কারণে আমি পাঞ্জাবে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে এসে শান্ত পরিবেশে স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো এবং কাজ পূর্ণ একাগ্রতার সাথে শুরু হলো। দৈনিক আট থেকে বারো ঘণ্টা কাজ করা রুটিনে পরিণত হলো। দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে এর সমাপ্তির তাওফিক দান করেন।

কিছু আহলে ইলমের পরামর্শে এই প্রচেষ্টাকে 'তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমাহ' নাম দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি 'উম্মতে মুসলিমা'রই...

ইতিহাস। আজ পর্যন্ত "তারিখে ইসলাম" নামে যা কিছু বিষয়বস্তু পেশ করা হয়েছে, তা আসলে ইসলামের নয়, বরং মুসলমানদের ইতিহাস। ধর্মের নয়, বরং ধর্মের অনুসারীদের ইতিহাস। ভালো হতো যদি "তারিখে ইসলাম"-কে "তারিখে মুসলিমিন" বলা হতো, যাতে কারো মনে কিছু মুসলমানের ভুল আচরণের কারণে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা জন্মানোর আশঙ্কা না থাকে। কিন্তু এখন এই পরিভাষাটি এমনভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, একে বর্জন করা বা পরিবর্তন করা সম্ভবত অত্যন্ত কঠিন।

যা-ই হোক, আমরা এই বিষয়টি মাথায় রেখে একে "তারিখে উম্মতে মুসলিমা" নাম দিয়েছি। "তারিখে উম্মতে মুসলিমা" ছয়টি খণ্ডের ওপর ভিত্তি করে হবে, যার বিন্যাস নিম্নরূপ:

- ১. প্রথম খণ্ড "ইতিহাস শাস্ত্রের পরিচিতি ও মূলনীতি" বিষয়ক একটি পুস্তিকা এবং পাঁচটি অধ্যায়ের ওপর مشتمل:
- প্রথম অধ্যায়: পূর্ববর্তী নবীগণ আলাইহিমুস সালাম, প্রাচীন জাতিসমূহ এবং ইসলাম-পূর্ব বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কিত।
- দ্বিতীয় অধ্যায়: সিরাত-উন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর।
- তৃতীয় অধ্যায়: খিলাফতে রাশিদাহর বিজয়সমূহ এবং উন্নতির বিবরণ সম্বলিত।
- চতুর্থ অধ্যায়: খিলাফতে রাশিদাহর বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থার নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করে।
- পঞ্চম অধ্যায়: নবুওয়াতের যুগ এবং খিলাফতে রাশিদাহর আমলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও আহলে বাইতের অবস্থা সম্বলিত।
- ২. দ্বিতীয় খণ্ডে উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত, জঙ্গে জামাল ও সিফফিন, তাহকিমে দুমাতুল জান্দাল, খারেজিদের উদ্ভব, সাবায়ি ফিতনা এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের মতো বিষয়গুলোর ওপর গবেষণামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া এতে উন্নতি ও বিজয়ের সেই দ্বিতীয় যুগকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিশ বছরে মুসলিম উম্মাহ লাভ করেছিল।

এই খণ্ডেই ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার যুগ থেকে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত পর্যন্ত ঘটনাবলির ওপর গবেষণা করা হয়েছে এবং এই সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা ও দুঃখ-কষ্ট, রাজনৈতিক বিবাদ এবং গৃহযুদ্ধগুলোর অত্যন্ত সতর্কতা ও বর্ণনার পূর্ণ যাচাই-বাছাইয়ের সাথে পর্যালোচনা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ সম্পর্কিত সন্দেহ ও সংশয়গুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- ৩. তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান থেকে শুরু করে বনু উমাইয়ার খিলাফতের সমাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাবলি রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় বনু আব্বাস খিলাফতের উত্থান ও পতন সম্পর্কিত।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী খিলাফতের বিপরীতে বিভিন্ন ফিরকার শাসনব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে।

- ৪. চতুর্থ খণ্ডে সেলজুক, আইয়ুবি, খাওয়ারিজম শাহী, গজনভি, ঘুরি, খিলজি এবং তুঘলক সুলতানগণ এবং মুসলিম স্পেনের ইতিহাস রয়েছে।
- ৫. পঞ্চম খণ্ডে উসমানীয় খিলাফত, ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আধিপত্যের ইতিবৃত্ত রয়েছে।
- ৬. ষষ্ঠ খণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ এবং আধুনিক মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত হবে।

যেখানে উৎসের ব্যাপার রয়েছে, সেখানে পূর্ববর্তী নবীগণ, সিরাতে নববী এবং সাহাবায়ে কেরামের বিজয়ের ঘটনাবলি যা এই খণ্ডে পেশ করা হয়েছে, তা মূলত হাদিসের ভাণ্ডার, সিরাত-উন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সিয়ারুস সাহাবা এবং ইতিহাসের প্রচলিত কিতাবসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী নবীদের জীবনীর ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাস ইসরায়েলি বর্ণনা দ্বারা ব্যাপকভাবে কলুষিত। যদিও মূলনীতিবিদদের মতে প্রতিটি ইসরায়েলি বর্ণনা বর্জনীয় নয়, বরং কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে সেগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে, তবুও অনেক ইসরায়েলি বর্ণনা এই শর্ত উপেক্ষা করে আমাদের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লেখক পূর্ণ চেষ্টা করেছেন যেন এ ধরনের বর্ণনা পরিহার করা হয় এবং যথাসম্ভব আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনীর অধিকাংশ অংশ কুরআন মাজীদ ও হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে পেশ করা হয়।

সীরাতের অধ্যায়েও এটি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন অধিকাংশ উপাদান হাদীসের কিতাব এবং সহীহ বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়। তবে বুখারী, মুসলিম ও সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য কিতাব ছাড়াও দালায়েলুন নুবুওয়াহ বায়হাকী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সহীহ সীরাতে নববীয়্যাহ ইবনে কাসীর, সীরাতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাতে ইবনে হিব্বান, সীরাতে হালাবিয়্যাহ, যাদুল মাআদ, আল-ইসাবাহ, উসদুল গাবাহ, তাবাকাতে ইবনে সাদ, আল-ইসতিয়াব, তারিখে তাবারী, ফুতুহুল বুলদান, ফুতুহুল শাম আযদী, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল-কামিল ফিত তারিখ, তারিখে ইবনে খালদুন, তারিখে ইসলাম যাহাবী, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, আল-মুনতাযাম লি-ইবনিল জাওযী, তারিখুল খুলাফা এবং আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার-ও সামনে রাখা হয়েছে।

উপমহাদেশের গবেষকদের মধ্যে আল্লামা শিবলী নোমানী রহ.-এর সীরাতুন্নবী (সা.), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলভী রহ.-এর সীরাতে মুস্তফা (সা.), হযরত কাজী সুলাইমান মনসুরপুরী রহ.-এর রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.), হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর নবীয়ে রহমত (সা.) এবং রইসুল তাবলীগ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী রহ.-এর হায়াতুস সাহাবাহ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া হয়েছে। বর্তমান ও নিকট অতীতের আরব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে: ডক্টর আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী এবং ডক্টর আকরাম জিয়া উমরীর কিতাবসমূহও সামনে রাখা হয়েছে। শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ.-এর মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (সা.)-ও অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিজয়াভিযানগুলোর জন্য লেখক বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা প্রশস্ততা অবলম্বন করেছেন, কারণ এই ঘটনাগুলোতে কয়েকটি স্থান ব্যতীত কারো কোনো দ্বিমত নেই। তাছাড়া এ বিষয়ে জালিয়াতির সম্ভাবনাও কম, কারণ এই বিজয়গুলো এমন এক বাস্তব সত্য যে, কোনো সহীহ বর্ণনা না থাকলেও কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এমনও নয় যে, প্রতিটি ভিত্তিহীন বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে, বরং মুহাদ্দিস ও সীরাত লেখকদের মূলনীতি ও নিয়মাবলী বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব যাচাই-বাছাই ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। নিজের কিছু উস্তাদ, মুরুব্বী ও বন্ধুদের সাথে কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে পরামর্শও হয়েছে। এই ব্যক্তিদের দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ এই কাজটিকে উন্নত করতে অসাধারণ সাহায্য করেছে।

পাঠকরা এই প্রচেষ্টায় কিছু বিষয় নতুন বিন্যাসে বা ভিন্ন রূপে দেখতে পাবেন। আমার অনুরোধ হলো, এ ধরনের স্থানে কোনো মানসিক বিভ্রান্তিতে না পড়ে রেফারেন্সের কিতাবগুলো সামনে রেখে নিরপেক্ষভাবে দলীলগুলোর ওপর লক্ষ্য করুন। ইনশাআল্লাহ আপনারা সন্তুষ্ট হবেন।

এখানে আমি বিশেষভাবে আরজ করতে চাই যে, এই পৃষ্ঠাগুলো কেবল একটি ইতিহাস বা একটি গবেষণা নয়, বরং একটি দ্বীনি দাওয়াতও বটে। তাই পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে যেন সহীহ ও পরিমার্জিত ইতিহাসের মাধ্যমে পাঠকদের ইসলামের রাজনৈতিক ও দাওয়াতি মেজাজের সাথে

যথাযথভাবে পরিচিত করানো যায়। ইসলাম কঠিনতম পরিস্থিতিতে কীভাবে সাহস ও বীরত্ব এবং কৌশল ও বিচক্ষণতার সমন্বয়ের শিক্ষা দেয়? আসলাফদের জীবন কীভাবে ইসলামের প্রচার ও সুরক্ষা এবং জিহাদের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল? ইসলাম কীভাবে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গৃহযুদ্ধ থেকে বিরত রাখে? ইসলামী রাজনীতির মূলনীতিগুলো কী? এগুলোর লঙ্ঘনের কারণে উম্মতে মুসলিমাকে কী কী সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে? ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পূর্ণ গুরুত্বের সাথে দেওয়া হয়েছে। এভাবে সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে যেন পাঠকদের মধ্যে এমন এক চেতনা জাগ্রত করা যায় যাতে তারা আসলাফদের মতো ইসলামের পথে চলতে এবং এর খাতিরে বড় থেকে বড় কোরবানি দিতে প্রস্তুত হয়। এই কারণেই পাঠকরা সিরাতে নববী এবং খিলাফতে রাশেদার যুগে দাওয়াত ও জিহাদের ঘটনাবলি তুলনামূলকভাবে অধিক বিস্তারিতভাবে পাবেন।

দ্বিতীয় অংশে পাঠকরা উম্মতে মুসলিমার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাবেন। যেহেতু এই বিষয়গুলোতে ঐতিহাসিক মতপার্থক্য প্রচুর, তাই ঘটনাবলি পূর্ণ যাচাই-বাছাইয়ের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভুল বর্ণনাগুলোর ওপর সমালোচনা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী জাতিসমূহের অবস্থা শাসকদের অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়, লেখকও শাসক ও সরকারগুলোর অধীনে অধ্যায়সমূহ বিন্যস্ত করেছেন। তবে এটিও একটি জীবন্ত বাস্তবতা যে, উম্মতের সুরক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং এর উন্নতি ও বিকাশে সেই মহান ব্যক্তিদের ভূমিকা শাসকদের চেয়ে কম নয়, যারা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝরনার পরিবেশক, আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার কাফেলার পথপ্রদর্শক এবং দাওয়াত ও সংকল্পের ময়দানের নেতা। এই প্রেক্ষাপটে উম্মত কখনোই তাদের অবদানকে উপেক্ষা করতে পারে না। তাই এমন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিত্বদের জীবনী বিশেষভাবে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে পাঠকরা তাদের জীবন থেকে প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা নিতে পারেন। এটি আমাদের এই প্রচেষ্টার একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ এই যে, এই ইতিহাসকে কেবল তথ্য সংগ্রহের জন্য পড়বেন না, বরং এখান থেকে নিজের জীবনের জন্য কর্মপন্থা বেছে নিন এবং একে নিজের মেজাজ ও চরিত্রে পরিবর্তন আনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করুন।

সিরাতে নববী উপস্থাপনের সময় লেখক যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন যেন ঘটনাবলির "তওকীত" এর বিষয়ে সর্বোচ্চ গবেষণা এবং সঠিকতম সময় নির্ধারণ করা যায়। লেখকের পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার কোনো দাবি নেই। তবে এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের কিতাবসমূহ সামনে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে লেখক বিশেষভাবে নিচের কিতাবগুলো থেকে بطور خاص উপকৃত হয়েছেন:

- সিরাতে নববী তওকীত কি রোশনি মে (মাওলানা ইসহাকুন নবী আলভী মরহুম)
- তাকভীমে তারিখি (মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশেমী মরহুম)
- তাকভীমে আহদে নববী (জনাব আলী মুহাম্মদ খান মরহুম)

মাওলানা ইসহাকুন নবী আলভী ভারতের রামপুরের একজন গবেষক আলেম ছিলেন। আমার জানামতে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি সিরাতের তওকীত-এ "শামসি কামারি তাকভীম" এবং "খালেস কামারি তাকভীম"-এর পার্থক্যকে প্রথমবারের মতো দলিলের মাধ্যমে এমনভাবে স্পষ্ট করেছেন যে অস্বীকারের কোনো অবকাশ থাকে না। হাদিস ও সিরাতের তওকীত-এর অনেক জটিলতা এই তত্ত্বের মাধ্যমে সমাধান হয়ে যায়।

https://t.me/BoierSomahar

মাওলানা ইসহাক আল-নবী আলভী ১৯৬০-এর দশকে এই কাজ করেছিলেন। গত দশকে মরহুম আলী মুহাম্মদ খান এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশমীও 'তাকভীমে তারিখী' নামে চমৎকার কাজ করেছেন, যার ভূমিকাটিও অত্যন্ত তথ্যবহুল। হিজরি ও ঈসায়ী তারিখ বের করার জন্য লেখক বিভিন্ন সময়ে কিছু সফটওয়্যারও ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও 'তাকভীত'-এর গণনায় ভুলের সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে এবং এখানেও রয়েছে।

লেখক ইতিহাসের পরিচিতির ওপর নিজের একটি পুস্তিকা ভূমিকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাতে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় ও প্রয়োজনীয় নীতিগুলো আত্মস্থ হয়ে যায়। এভাবে ইতিহাস পড়তে ও বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের শেষে 'আসবাকে তারিখ' পেশ করা হয়েছে যা গুণগ্রাহী পাঠকদের জন্য পুরো বইয়ের নির্যাস হিসেবে প্রমাণিত হবে।

আমি যদি আমার বন্ধু, 'আল-মানহাল'-এর পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আলতাফ মেমন, কম্পিউটার মুফতি ভাই হামিদ আলী খোখর এবং 'ইদারা আন-নূর'-এর ম্যানেজার মাওলানা মুহাম্মদ আলীর শুকরিয়া আদায় না করি তবে তা অকৃতজ্ঞতা হবে, যাদের সহযোগিতা, আগ্রহ ও উৎসাহের কারণে আমি এই কাজের জন্য নিজেকে নিবিষ্ট করতে পেরেছি।

এত বড় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র এক জায়গায় সংগ্রহ করা সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু অনেক দয়ালু মুরুব্বি ও দরদী বন্ধু এই সিলসিলায় অসাধারণ সহযোগিতা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র সরবরাহ করেছেন। যদি তাদের সবার পক্ষ থেকে এমন জোরালো সহযোগিতা না থাকত তবে আমার পক্ষে এত বই পাওয়া সম্ভব হতো না। পাণ্ডুলিপি সংশোধন এবং গবেষণা ও যাচাইয়ের কাজে মুফতি আব্দুল খালেক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ অসাধারণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। আল্লাহ এই সকল ব্যক্তিকে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার শান অনুযায়ী উত্তম প্রতিদান দান করুন। 'তারিখে উম্মতে মুসলিমা'-এর বর্তমান অংশের কাজ ২০১১ সালে শুরু হয়েছিল এবং এক বছরেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুনঃনিরীক্ষণ, সংশোধন, পরিবর্ধন, টীকা তৈরির কাজ এবং প্রুফ রিডিংয়ের ধারা ২০১৭ সালের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

ইদারা আল-মানহাল, যারা এই প্রচেষ্টাটি প্রকাশ করছে, তারা এই সংকল্প করেছে যে, ইসলামী ইতিহাসকে গবেষণা-বিরোধী বিষয়াদি থেকে মুক্ত করে সহজ ও আকর্ষণীয় রূপে জাতির প্রতিটি স্তরের মানুষের সামনে পেশ করতে থাকবে। পাঠকদের কাছে আবেদন এই যে, এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, আল্লাহর দরবারে এর কাজের কবুলিয়ত, এর মালিকপক্ষ, কর্মকর্তা ও সহযোগীদের সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য এবং এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিশেষ দোয়া করবেন। বিজ্ঞজনদের প্রতি অনুরোধ, যদি কোনো বিচ্যুতি, ভুল বা গবেষণামূলক দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করতে চান অথবা কোনো পরামর্শ দিতে চান তবে ইমেইলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। এই অধম অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞ থাকবে।

ওয়াল্লাহুল মুস্তাআন

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

(rehanbhai@gmail.com)

৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি

২৫ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

https://t.me/BoierSomahar

চিহ্ন ও সংকেত এবং তথ্যসূত্র দেখার জন্য নির্দেশিকা

- ম ..... মুতাওয়াফ্ফি/মুতাওয়াফ্ফা (মৃত্যুর তারিখ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য) [১]
- তর ..... তরজমা (জীবনবৃত্তান্ত)
- ৩/১২২ ..... খণ্ড নম্বর তিন, পৃষ্ঠা নম্বর ১২২ (/ চিহ্নের ডান দিকে খণ্ড নম্বর, বাম দিকে পৃষ্ঠা নম্বর)
- ২ পৃ ৩৩৩ ..... খণ্ড নম্বর দুই, পৃষ্ঠা ৩৩৩ (পৃ-এর ডান দিকে খণ্ড নম্বর, বাম দিকে পৃষ্ঠা নম্বর)
- পৃ ..... পৃষ্ঠা নম্বর
- খ ..... খণ্ড নম্বর
- হা ..... হাদিস নম্বর, বর্ণনা নম্বর
- মু ..... মুদ্রণালয়, প্রকাশক
- তাখ ..... তাখরিজ
- তাহ ..... তাহকিক

সতর্কবার্তা:

১. অনেক স্থানে একসাথে দুই বা ততোধিক কিতাবের তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত এটি এই কারণে করা হয়েছে যাতে পাঠকদের কাছে যে উৎসটি সহজলভ্য হয়, তারা সেটি দেখে নিতে পারেন। তবে কখনো কখনো এই প্রয়োজনেও একাধিক উৎসের তথ্যসূত্র একসাথে দেওয়া হয়েছে যে, ঘটনার অংশগুলো বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এক উৎসে এবং কিছু অন্য উৎসে রয়েছে। তাই তথ্যসূত্র দেখার সময় পাঠকরা যদি একটি উৎসে পুরো ঘটনাটি মূল পাঠে উপস্থাপিত রূপ অনুযায়ী না পান, তবে বাকি উৎসগুলোও দেখে নেওয়া উচিত। ইনশাআল্লাহ সামান্য পরিশ্রমে পুরো ঘটনাটি সেই রূপেই সামনে চলে আসবে।

২. চেষ্টা করা হয়েছে যেন তথ্যসূত্রের জন্য কিতাবসমূহের নতুন, তাহকিককৃত এবং অধিক প্রচলিত সংস্করণগুলো বিবেচনায় রাখা হয়। শেষে ‘গ্রন্থপঞ্জি’ থেকে জানা যাবে কোন মুদ্রণালয়ের সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠকরা সেই মুদ্রণালয়ের সংস্করণ দেখলে ইনশাআল্লাহ দ্রুত তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি পেয়ে যাবেন। তবে কখনো কখনো একই মুদ্রণালয়ের কোনো কিতাবের নতুন সংস্করণে দুই-চার পৃষ্ঠার কমবেশি হয়ে থাকে, তাই পাঠকরা উল্লেখিত পৃষ্ঠায় কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তু না পেলে দুই-চার পৃষ্ঠা আগে-পিছেও দেখে নিতে পারেন।

৩. যদি সংস্করণের পার্থক্যের কারণে কোনো ঘটনা উল্লেখিত খণ্ড ও পৃষ্ঠায় না পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে তা হিজরি সনের অধীনে তালাশ করা যেতে পারে। অথবা শাসনকাল ও শাসকদের অধীনে তালাশ করে নিন। ইনশাআল্লাহ ব্যর্থ হবেন না।

---

[১] এই শব্দটি মুতাওয়াফ্ফি এবং মুতাওয়াফ্ফা (ফ-এর নিচে যের বা উপরে যবর দিয়ে) উভয়ভাবেই পড়া সঠিক, যেমনটি আল্লামা সাখাভি এর ব্যাখ্যা করেছেন। দেখুন: (আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মাত-তারিখ লিস-সাখাভি, পৃ. ৮৫, মু. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত)

# ইতিহাস কী?

## ইতিহাস বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খল পুস্তিকা

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রিহান

উস্তাদ, ইসলামের ইতিহাস, জামিয়াতুর রশীদ করাচি

https://t.me/BoierSomahar

## ইলমে তারিখের পরিচিতি

ইতিহাস হলো এমন এক বিদ্যা যাতে সময়ের দুর্ঘটনা ও ঘটনাবলিকে সময়ের ক্রমধারা বজায় রেখে আলোচনা করা হয় এবং জাতি, দেশ, বাদশাহ ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়।

ইতিহাসের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো অতীত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া। ইতিহাস অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য উন্নত কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে। যে জাতিই বিশ্বে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে চায়, তারা নিজেদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। যে জাতি নিজের অতীত ভুলে যায়, তারা বিশ্বে কোনো স্থান পাওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের পরিচয় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারে না।

## ইতিহাসের মূলনীতি

আভিধানিক অর্থে ইতিহাস:

আরবি ভাষায় তারিখ (ইতিহাস) এর আভিধানিক অর্থ হলো: “সময় জানানো” (আল-ইলাম বিল ওয়াক্ত)।

আরববাসীরা বলে থাকে: “أَرَّخَ الْكِتَابَ يَأْرِخُه أَرْخًا” (আরও ارّ اخاً এবং تأريخاً) অর্থাৎ চিঠিতে সময় লিখল (তারিখ লিপিবদ্ধ করল)। এটি বনু কায়স গোত্রের ভাষা। বনু তামীম গোত্রের অভিধানে হামজার স্থলে ওয়াও আসে। [১]

পারিভাষিক অর্থে ইতিহাস:

ইতিহাসের পারিভাষিক সংজ্ঞায় অনেক উক্তি রয়েছে। আল্লামা ইবনে খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“إِخْبَارٌ عَنِ الْأَيَّامِ وَ الدُّوَلِ وَ السَّوَابِقِ مِنَ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى”

“অতীত দিনসমূহ, অতীত সরকারসমূহ এবং গত হওয়া যুগের মানুষের সংবাদ।” [২]

ইলমে তারিখের সংজ্ঞা:

“هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الزَّمَانِ وَ أَحْوَالِهِ وَ عَنْ أَحْوَالِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حَيْثُ تَعْيِيْنُ ذٰلِكَ وَ تَوْقِيْتُه”

“এমন এক বিদ্যা যাতে সময় নির্ধারণের সাথে সাথে কাল, তার অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।” [৩]

---

[১] আল-ই’লান বিত-তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারিখ: পৃষ্ঠা ১৩; আল-মিসবাহুল মুনীর লিল ফায়্যুমী, মূলশব্দ: আরখ: ১/৩১৮, তাবা দারুল ইলম।

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ১/৬, মুকাদ্দিমা, তাবা দারুল ফিকর।

[৩] আল-মুখতাসার ফী ইলমিত তারিখ লিল কাফীজী: পৃষ্ঠা ৫৫।

আল্লামা সাখাভী (রহ.) এই সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করেছেন: “اَلْبَحْثُ عَنْ وَقَائِعِ الزَّمَانِ بِالتَّوْقِيْتِ”

“সময়ের বিন্যাস ও নির্ধারণের সাথে যুগের ঘটনাবলি অনুসন্ধান করা।” [১]

**ইতিহাস এবং অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য:**

আপনারা জানেন যে ঘটনাবলি তো সাহিত্যের কিতাবসমূহেও বর্ণনা করা হয়। হাদিসেও অনেক ঘটনা আসে কিন্তু সেগুলোকে ইতিহাসের কিতাব বলা হয় না; কারণ হাদিস বা সাহিত্যে ঘটনাবলি সময়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার মাস বা বছরও উল্লেখ করা হয় না। সাহিত্যে উদ্দেশ্য থাকে যে একটি ঘটনা সামনে আসুক এবং তা থেকে পাঠক কোনো শিক্ষা গ্রহণ করুক। হাদিসে ঘটনাবলিকে ফিকহি আহকাম ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি, সনদের মর্যাদা বা বর্ণনাকারীদের নামের ভিত্তিতে সংকলন করা হয়, যেমনটি হাদিস শাস্ত্রের প্রত্যেক সংকলকের সামনে নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে।

ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ঘটনাবলিকে এমনভাবে ধারাবাহিকভাবে সংকলন করে উপস্থাপনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে যে ঘটনা আগে ঘটেছে তা আগে আসে এবং যা পরে ঘটেছে তা পরে আসে। অধিকাংশ ইতিহাসের ধরন হলো এই যে, প্রথমে ১ হিজরি সনের মহররম মাসের ঘটনাবলি বর্ণনা করা হবে, তারপর সফর এবং রবিউল আউয়াল মাসের। পুরো বছরের ঘটনাবলি বর্ণনা করার পর ২ হিজরি সনের ঘটনাবলি শুরু করা হবে। এই ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিক তার নিজ সময় পর্যন্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করে যাবেন।

**বিষয়বস্তু:**

ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ সেই উপাদান যার ওপর একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ থাকে, তা হলো জাতি, দেশ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবস্থা। আল্লামা সাখাভী (রহ.) একে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

“مَوْضُوْعُهُ الْإِنْسَانُ وَالزَّمَانُ।”

ইতিহাসের বিষয়বস্তু হলো “মানুষ এবং সময়”। [২]

অর্থাৎ কোন যুগে মানুষের সামনে কী কী ঘটনা ও পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। একজন ঐতিহাসিক সর্বদা এরই সন্ধানে থাকেন, সুতরাং এটাই এই শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু। সকল আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু এটাই।

তবে এ কথা স্পষ্ট যে ইতিহাসে প্রত্যেক মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অনিবার্যভাবে বিশেষ মানুষদের নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচনও স্বাভাবিকভাবে সেই সব মানুষেরই হতে পারে যারা কোনো না কোনো দিক থেকে অসাধারণ, যারা পরিস্থিতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন অথবা যাদের জীবনে কোনো বিস্ময়কর কৃতিত্ব বা কোনো দরকারী শিক্ষা রয়েছে। এমন অসাধারণ মানুষ সাধারণত কোনো বড়...

---

[১] আল-ই’লান বিত-তাওবিখ, পৃ. ১৭

[২] আল-ই’লান বিত-তাওবিখ, পৃ. ১৭

মর্যাদা সম্পন্ন হন অথবা পরবর্তীতে কোনো বড় পদ লাভ করেন, তাই ইতিহাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদশাহ, উজির, সালতানাতের আমির, সেনাপতি, আলেম, বুদ্ধিজীবী এবং হেকিমদের আলোচনা থাকে। সাধারণ মানুষ এতে স্থান পায় না। যদি দৈবাৎ তাদের আলোচনা আসেও, তবে তা কোনো বড় ব্যক্তিত্বের অবস্থার অনুষঙ্গ হিসেবে। এজন্যই বলা হয়:

"ইতিহাস হলো বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবস্থার জ্ঞান।" আর এই কথাটি নিজ স্থানে সম্পূর্ণ সঠিক।

**ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:**

প্রতিটি বিদ্যার কিছু উপকারিতা থাকে, তবে সেই উপকারিতাগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই বিদ্যার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মানুষ কোনো বিদ্যায় মেধা ব্যয় করে। ইতিহাস পড়া ও পড়ানোর মৌলিক উদ্দেশ্য দুটি:

- মানুষের এবং সময়ের অবস্থা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা।
- জাতীয় ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি সম্পর্কে অবগত থাকা এবং সেগুলো বজায় রাখা। [১]

এই দুটি উদ্দেশ্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে কোনো মুসলমানের জন্য নিজের ইতিহাস সম্পর্কে গাফেল থাকা শোভা পায় না। বিশেষ করে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিকে সামনে রাখলে ইতিহাসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে যায়। [২]

## ইতিহাসের ইতিহাস

ইতিহাস রচনার প্রাথমিক রূপ প্রাচীন রোমান, গ্রিক, চীনা, সিরীয়, মিশরীয় এবং ভারতীয় সভ্যতায় দেখা যায়। প্রাচীন যুগের মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়ার সাথে পরিচিত ছিল না, তখনও তারা গত হয়ে যাওয়া মানুষ, বিশেষ করে তাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী শোনার শৌখিন ছিল। গোত্রগুলোর মায়েরা তাদের সন্তানদের বিগত যুগের বীর ও নামী ব্যক্তিদের ঘটনাবলি শুনিয়ে তাদের লালন-পালন করত। জাতি বা গোত্রের ইতিহাসকে সংরক্ষিত রাখার একটি বিখ্যাত পদ্ধতি ছিল কবিতা ও কাব্য। কবি ও গায়করা সাধারণ মজলিসে পুরনো কাহিনীগুলো ছন্দবদ্ধভাবে পেশ করত এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারীরা সেই কবিতাগুলো মুখস্থ করে নিত। এই কবিতাগুলো বংশপরম্পরায় স্থানান্তরিত হতে থাকত। সাধারণত এই কবিতাগুলো হতো বীরত্বগাথা, অর্থাৎ এতে জাতির বীরদের কীর্তিনামাসমূহ বর্ণনা করা হতো। ইতিহাসের প্রাচীনতম চীনা, আর্য এবং আরবি উৎসগুলো কবিতার আকারেই পাওয়া যায়। আজও যাযাবর গোত্র এবং অসভ্য এলাকাগুলোতে এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

---

[১] জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নৈতিকতা ও আদব, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক আচরণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভবিষ্যতের চিন্তা এবং অতীতের সাথে সম্পর্ক—সবই অন্তর্ভুক্ত।

[২] আল-ই'লান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মাত তারিখ, পৃষ্ঠা ৫০ থেকে ৮০।

আল্লামা সাখাভি এখানে ইতিহাস শাস্ত্রের গুরুত্বের ওপর কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রুচিশীল ব্যক্তিদের তা অধ্যয়ন করা উচিত। আমরা এই পুরো আলোচনার নির্যাস হিসেবে দুটি মৌলিক পয়েন্ট পেশ করেছি।

যখন লেখা ও পড়ার শিল্প কিছুটা উন্নতি লাভ করল, তখন সভ্য ও সুসংস্কৃত রাজত্বগুলোতে ইতিহাসের কিছু ঘটনা শাসকদের নির্দেশে লিপিবদ্ধ করা হতে লাগল। ধর্মীয় কিতাবসমূহ এবং আসমানী সহীফাসমূহেও কিছু জাতির অবস্থার কিছু অংশ সংরক্ষিত হয়ে গেল।

কবিতা ছাড়াও এই যুগের ঐতিহাসিক উৎসগুলোর মধ্যে বাইবেল অর্থাৎ পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ভগবদ গীতা, মহাভারত এবং রামায়ণ ইত্যাদি বিখ্যাত। এই উৎসগুলো তাদের বিকৃতি সত্ত্বেও প্রাচীন যুগের অবস্থার মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই যুগকে আমরা নিয়মিত ইতিহাস রচনার যুগ বলতে পারি না, তবে এই যুগের উৎসগুলোর গুরুত্ব পরবর্তী যুগে অনেক বেড়ে গিয়েছিল কারণ প্রাচীন যুগের মানুষের অবস্থা জানার মাধ্যম এগুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

রোম ও গ্রিসের ইতিহাসে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশ বছর এবং তার পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলি সংরক্ষিত বলে মনে করা হয় কারণ এটি ছিল গ্রিক দার্শনিক অর্থাৎ সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের যুগ, যে সময়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে লেখা-পড়া প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং হ্যানিবালের মতো রাজাদের অবস্থার বড় অংশ তাদের কাছে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এটি ভিন্ন কথা যে, এই ইতিহাস ধারাবাহিক সনদ বা প্রমাণ থেকে বঞ্চিত। ইউরোপে ইতিহাস রচনার এই উন্নতি সত্ত্বেও প্রাচ্যে দীর্ঘকাল অন্ধকার ছেয়ে ছিল। হিন্দুস্তানের ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশ বছরেও অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়। অশোক, গৌতম বুদ্ধ এবং কনিষ্ক দ্য গ্রেট সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ ও ভিত্তিহীন কাহিনী ছাড়া এখানে আর কিছুই পাওয়া যায় না।

ইতিহাস রচনা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল যখন বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে লেখা-পড়ার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ঘটনাপঞ্জি রচনার (ওয়াকায়ে নিগারি) সূচনা হলো। ঘটনাপঞ্জি লেখক ছিলেন সেই সব সংবাদদাতা বা লিপিকার যারা দেশের বিভিন্ন অংশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লিপিবদ্ধ করে শাসকের কাছে পাঠাতেন। তাদের রোজনামচার রেকর্ড ঐতিহাসিকদের অতীতের অবস্থা সংগ্রহ করতে অনেক সাহায্য করত।

**পঞ্জিকা**

কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার সময় মনে রাখার সহজ উপায় হলো একে এমন কোনো বড় ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া যা সবার জানা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির জন্ম তারিখ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ; যেহেতু সে একশর বেশি গণনা জানে না, তাই সে নিজের জন্ম তারিখ মনে রাখতে পারে না, কিন্তু সে তার জন্ম তারিখ এভাবে বলতে পারে যে, আমি পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হওয়ার এক মাস আগে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। প্রাচীন যুগে সাধারণ ও বিশিষ্ট সবার কাছে এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল; কারণ পঞ্জিকা (ক্যালেন্ডার)-এর কোনো প্রচলন ছিল না। মানুষ বিখ্যাত ঘটনাবলি থেকে তারিখের আন্দাজ করত।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন যে, শুরুতে মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ থেকে তারিখের হিসাব করত। যখন নূহের প্লাবনে সৃষ্টিজগত ধ্বংস হয়ে গেল, তখন অবশিষ্ট লোকেরা নূহের প্লাবন থেকে তারিখের সূচনা করল।

হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পদ্ধতিতে তারিখ মনে রাখা শুরু করে। আরবরা ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার সময় থেকে হিসাব রাখত। এরপর বনী ইসহাক (ইয়াহুদী) বছরের হিসাব করার জন্য ইউসুফ (আ.) থেকে মূসা (আ.) পর্যন্ত, এরপর মূসা (আ.) থেকে সুলাইমান (আ.) পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে সুলাইমান (আ.) থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত সময়ের হিসাব করতে থাকে। বনী ইসমাঈল কাবা ঘর নির্মাণের সময় থেকে তারিখ শুরু করে। পরবর্তী লোকেরা কাব বিন লুয়াই-এর মৃত্যু থেকে নতুন হিসাব রাখে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমসাময়িক কুরাইশরা আমুল ফীল (হস্তীবর্ষ) থেকে বছর গণনা শুরু করে। পরবর্তীতে মুসলমানরা হিজরতে নববী থেকে হিজরী সনের হিসাব শুরু করে।

অন্যদিকে রোমবাসীরা সিকান্দার আজমের যুগ থেকে তারিখ গণনা করত। পারস্যবাসীরা তাদের প্রত্যেক বাদশাহর সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে বছরের হিসাব করত। [১]

পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের সূচনা ইতিহাস রচনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। বিভিন্ন জাতি ও সরকার বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ ক্যালেন্ডার চালু করেছে, তবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি পেয়েছে মাত্র দুটি পঞ্জিকা: একটি ঈসায়ী পঞ্জিকা যা খ্রিস্টান পাদ্রী ও সরকারগুলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের বছর থেকে শুরু করেছে। এটি একটি সৌর পঞ্জিকা। দ্বিতীয়টি হিজরী পঞ্জিকা যা মুসলমানরা হিজরতে মদীনা থেকে শুরু করেছে, এটি চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী।

আরবরা নিজেদের সুবিধার জন্য চান্দ্র মাস: মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল ইত্যাদি গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের জন্য বছরের গণনা রাখা হতো না বরং বছরগুলোকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নামে স্মরণ করা হতো। যেমন: অমুক যুদ্ধের পর, অমুক মহররম এবং অমুক চুক্তির আগের রমজান। এতে তাদের সাধারণ সভ্যতার প্রয়োজন মিটে যেত। অধিকাংশ বিষয় মৌখিকভাবে সম্পন্ন হতো। নথিপত্র, চিরকুট এবং চিঠিপত্রের ব্যবহার তো ছিল কিন্তু সেগুলো দীর্ঘকাল সংরক্ষিত রাখার রেওয়াজ ছিল না, তাই সেগুলোতে আলাদাভাবে বছর লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ত না, ফলে এ বিষয়ে কখনো কোনো জটিলতা দেখা দেয়নি।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে যখন আরবরা প্রথমবার বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হলো এবং সরকারি দপ্তরগুলোতে চিঠিপত্র, রসিদ ও অন্যান্য নথিপত্রের স্তূপ জমতে শুরু করল, তখন এটি জানা কঠিন হয়ে পড়ল যে কোন লেখাটি কোন বছরের। এমন পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রা.)-কে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বার্তা পাঠান যে, আমাদের কাছে আপনার এমন সব চিঠি আসে যেগুলোতে তারিখ উল্লেখ থাকে না। আপনি কোনো তারিখ নির্ধারণ করুন।

এমন বর্ণনাও রয়েছে যে, ইয়ামেন থেকে আসা এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-কে পরামর্শ দেন যে, ইয়ামেনবাসীরা তাদের চিঠিপত্রে তারিখ লেখে, আপনিও এমন কোনো ব্যবস্থা করুন। [২]

একটি বর্ণনা আছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর কাছে একটি চিঠি এল যাতে শুধু শাবান লেখা ছিল। হযরত উমর (রা.) বললেন: “এটি কীভাবে জানা যাবে যে এটি কোন বছরের শাবান?”

---

[১] আশ-শামারেখ ফি ইলমিত তারিখ লিস-সুয়ূতী: পৃ. ৭ থেকে ১০, ত. মাকতাবাতুল আদাব।

[২] আশ-শামারেখ: পৃ. ১৩, ১৫।

প্রথম অংশ

তারপর হযরত উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বললেন: মানুষের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিন, যেখান থেকে তারা তারিখ গণনা করবে।

কেউ কেউ বললেন: রোমবাসীদের তারিখ গ্রহণ করা হোক।

হযরত উমর (রা.) বললেন: রোমীয়দের তারিখ গণনা অনেক দীর্ঘ, তারা সিকান্দারের যুগ থেকে গণনা করে।

কেউ বললেন: পারস্যবাসীদের তারিখ গ্রহণ করে নিন।

হযরত উমর (রা.) বললেন: তাদের কাছে প্রত্যেক বাদশাহর সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে নতুন করে তারিখ শুরু হয়। [১]

অবশেষে এটি স্থির হলো যে, নিজেদের একটি স্বতন্ত্র পঞ্জিকা রাখা হবে। এখন প্রশ্ন উঠল যে, কবে থেকে? তিনটি মতামত সামনে এল: হুজুর আকরাম (সা.)-এর জন্ম থেকে, হিজরত থেকে, ওফাত থেকে।

হযরত উমর (রা.) ফয়সালা শুনিয়ে বললেন: "হিজরত থেকে পঞ্জিকা শুরু করা হোক; কারণ এর মাধ্যমেই সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে।" [২]

এই প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) ইবনে শিহাব জুহরীর বরাতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর হিজরত থেকেই বছর গণনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [৩]

আল্লামা সুয়ূতী হুজুর আকরাম (সা.)-এর একটি পত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন, যাতে তাঁর (সা.) পক্ষ থেকে ৫ হিজরী লিখানো প্রমাণিত। [৪]

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন যে, এর দ্বারা জানা গেল হিজরী সনের প্রকৃত প্রবর্তকও হুজুর আকরাম (সা.) এবং হযরত উমর (রা.) এই সুন্নতেরই অনুসরণ করেছিলেন। [৫]

যখন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, ইসলামী তারিখ হুজুর নবী আকরাম (সা.)-এর হিজরত থেকে শুরু করা হবে, তখন পরবর্তী প্রশ্ন দেখা দিল যে, কোন মাস থেকে? যেহেতু হিজরত রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল, তাই কিছু হযরতের অভিমত ছিল এই মাসকেই হিজরী বছরের শুরু হিসেবে নির্ধারণ করার। কেউ কেউ মাহে রমজানের ফজিলতের কারণে এর পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু ফয়সালা হযরত উসমান (রা.)-এর মতামতের ভিত্তিতে হলো, যিনি মহররমের ফজিলত বর্ণনা করে বলেছিলেন: "মহররম থেকে পঞ্জিকা শুরু করা হোক, কারণ এটি একটি সম্মানিত মাস। এটিই বছরের প্রথম মাস। এতে মানুষ হজ থেকে ফিরে আসে।"

এভাবে এটি স্থির হলো যে, হিজরী বছর মহররম থেকে শুরু হবে। এই ঘটনাটি ১৭ হিজরী বা ১৮ হিজরীর। [৬]

এটিই ছিল হিজরী পঞ্জিকার সূচনা, যা ইসলামী ইতিহাস রচনার মৌলিক মানদণ্ড।

---

[১] আশ-শামারিখ, পৃ. ১৭

[২] আশ-শামারিখ, পৃ. ১৩

[৩] আশ-শামারিখ, পৃ. ১২

[৪] দেখুন আশ-শামারিখ, পৃ. ১১

[৫] আশ-শামারিখ, পৃ. ১৩; তারিখুত তাবারী: ২/২৮৮

[৬] আশ-শামারিখ, পৃ. ১৫

আরবদের ইতিহাসে মাস ও বছরের পার্থক্য কেন?

ইসলামী ইতিহাসের মাস ও বছর নির্ধারণে মাঝে মাঝে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যার প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. বর্ণনাকারীরা সেই সময়ের অনেক ঘটনার তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেননি।
২. কিছু ক্ষেত্রে একই ঘটনার তারিখ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে যার মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, এই মতপার্থক্য মাস এবং বছরের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
৩. প্রাচীন ঐতিহাসিকদের কাছে প্রসিদ্ধ কিছু তারিখ (যেমন: মিলাদুন্নবীর তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল) কোনোভাবেই ক্যালেন্ডারের হিসাবের সাথে মেলে না।
৪. একটি বড় কারণ হলো মুশরিকদের চন্দ্র ক্যালেন্ডারে কারচুপি করা, যাকে কুরআন মজিদ "আন-নাসি" (النسی) বলে অভিহিত করে নিন্দা করেছে এবং যার ফলে বিশুদ্ধ চন্দ্র ক্যালেন্ডারের বিপরীতে বিকৃত "চন্দ্র-সৌর ক্যালেন্ডার" অস্তিত্বে এসেছিল। [১]

বিশুদ্ধ চন্দ্র ক্যালেন্ডার এবং বিকৃত "চন্দ্র-সৌর ক্যালেন্ডার":

মুশরিকরা চন্দ্র ক্যালেন্ডারকে সৌর হিসাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য বিকৃতি ঘটিয়েছিল যাকে "আন-নাসি" বলা হতো। আমরা জানি যে চন্দ্র ক্যালেন্ডারের মাসগুলো সবসময় একই ঋতুতে আসে না। প্রতিটি চান্দ্র মাস ধীরে ধীরে (৩৩ চান্দ্র বছরে) শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ এবং বসন্তের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়। এর বিপরীতে সৌর মাসগুলো সবসময় একই ঋতুতে আসে, অর্থাৎ জানুয়ারি সবসময় শীতে, মার্চ সবসময় বসন্তে, জুন সবসময় গ্রীষ্মে এবং অক্টোবর সবসময় শরতে আসে।

যদি চান্দ্র মাসগুলোকেও সবসময় একই ঋতুতে রাখতে হয়, তবে এর জন্য কিছু চান্দ্র বছরকে তেরো মাসের করতে হবে। কারণ চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে প্রায় এগারো দিন কম হয়, তাই উভয়কে সমান রাখার জন্য প্রায় তিন বছর পর এবং কখনো কখনো দুই বছর পর তেরোতম মাস যোগ করে উভয় ক্যালেন্ডারকে সমান করা যেতে পারে। কিন্তু স্পষ্টতই যখন তেরোতম মাস বাড়ানো হবে, তখন বিশুদ্ধ চন্দ্র ক্যালেন্ডারের মাসগুলো তাদের আসল অবস্থানে বজায় থাকবে না।

মুশরিকরা হিজরতের প্রায় ২২০ বছর আগে বিশুদ্ধ চন্দ্র ক্যালেন্ডারে এই বিকৃতি ঘটিয়েছিল। কারণ ছিল এই যে, হজ তাদের জন্য একটি বড় বাণিজ্যিক মৌসুমও ছিল যার সময় বড় বড় বাণিজ্যিক মেলা বসত। কিন্তু তারা দেখল যে হজ কখনো গ্রীষ্মে আসে আবার কখনো শীতে। যার ফলে খেজুর এবং ভেড়া-ছাগলের ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফসল এখনো পাকেনি, পশুর বাচ্চাও বিক্রির জন্য প্রস্তুত হয়নি, এর মধ্যেই হজ চলে আসে এবং সবকিছু ছেড়ে হজের প্রস্তুতিতে লেগে পড়তে হয়। মুশরিকরা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এতেই মনে করল যে হজ যেন সবসময় গ্রীষ্মকালে আসে। ফলে বনু কিনানার এক নেতা 'কালাম্মাস' হজের মাসকে একটি বিশেষ ঋতু অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে নির্দিষ্ট করার...

---

[১] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৭।

জন্য ‘নাসি’ (অধিবর্ষ) পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল। [১] যার ফলে চান্দ্র মাসগুলো কৃত্রিমভাবে সৌর মাসের সমান হয়ে গিয়েছিল। প্রতি বছর মহরম মাস সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের শুরুতে আসতে শুরু করে। রমজান প্রতি বছর মে-জুন মাসে এবং হজ প্রতি বছর গ্রীষ্মের শেষ মাস আগস্টে অনুষ্ঠিত হতে থাকে, যখন ফসলি উৎপাদন কেটে বিক্রির জন্য প্রচুর পরিমাণে মজুদ থাকত। [২]

সম্ভবত কিছু চান্দ্র মাসের নাম এই নতুন সময় গণনার যুগে রাখা হয়েছিল। প্রতি বছর জুমাদাল উলা এবং জুমাদাল আখিরাহ শীতকালে আসত। তাদের নামের মধ্যে ‘জুমদ’ (জমাট বাঁধা) মূল শব্দটি ইঙ্গিত দেয় যে, ঋতুর বিবেচনায় তাদের এই নাম রাখা হয়েছিল। রমজান ‘রামাদ’ থেকে উদ্ভূত, এর এই নাম এজন্য রাখা হয়েছিল যে এই মাসটি গ্রীষ্মকালে আসত। [৩]

বনু কিনানা গোত্রের সরদারদের এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল যে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রয়োদশ মাস বৃদ্ধি করবেন। এই গোত্রের সরদার প্রতি বছর হজের সময় স্পষ্ট করে দিতেন যে পরবর্তী হজ বারো মাস পরে হবে নাকি তেরো মাস পরে, এবং অতিরিক্ত মাসটি কোন মাসের সাথে বৃদ্ধি করা হবে। [৪]

আরববাসীরা ‘আশহুরে হুরুম’ (সম্মানিত মাসসমূহ)-এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। অর্থাৎ চারটি মাস: রজব, জিলকদ, জিলহজ এবং মহরমকে তারা সম্মানের মাস হিসেবে গণ্য করত। হজের মাসগুলো পরিবর্তিত হওয়ার কারণে অনিবার্যভাবে সম্মানের এই চারটি মাসও তাদের মূল স্থান থেকে সরে...

---

[১] তাফসীর আল-রাজি ৩০/৭০-৭১, দার এহিয়া আত-তুরাস আল-আরাবি; আত-তাহরির ওয়াত তানভির লিল শায়খ মুহাম্মদ বিন তাহের আল-আশুর ১০/১৯১, তিউনিস। কিছু হাদিস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি ৫/২৯০৯, ত দারুল হারামাইন। কিছু সীরাত লেখকও এটি উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বুরহানুদ্দিন হালাবি লেখেন: “জাহেলিয়াতের লোকেরা হজের সময় পিছিয়ে দিত, ফলে প্রতি বছর তারা একদিন এগারো দিন পিছিয়ে যেত যতক্ষণ না তা তিন বছর পর ঘুরে আবার তার সঠিক সময়ে ফিরে আসত।” (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ ৩/৩২০, ত আল-ইলমিয়্যাহ)।
আল্লামা শিবলি লেখেন: “কিন্তু তারা প্রতি বছর একদিন এগারো দিন বা তার কিছু বেশি পিছিয়ে দিত যতক্ষণ না তা তেত্রিশ বছর পর ঘুরে আবার তার সঠিক সময়ে ফিরে আসত।” (আর-রওদুল উনুফ ১/১৩৯, দার এহিয়া আত-তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত, ত উমর আবদুস সালাম সালামি)।
অনেক মুফাসসিরও এটি বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর আবদুর রাজ্জাক, আত-তাওবাহ ২/৩৯৪, ত আল-ইলমিয়্যাহ; তাফসীর তাবারী ১১/৪৫৩, ত দারুল হিজর; তাফসীর কুরতুবী ৩/৩১৫, ত দার এহিয়া আত-তুরাস আল-আরাবি)।
ইউরোপে একে ‘লিপ ইয়ার’ বলা হয়। লিপ ইয়ারে প্রতি চার বছর পর এপ্রিলের শেষে একদিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল বৃদ্ধি করা হয়। ভারতের বিক্রমী ক্যালেন্ডারেও এটি করা হয় এবং একে ‘লুন্দ’ বলা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি মাসের সাথে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়, যেমন আষাঢ়ের সাথে একটি মাস বাড়ালে তাকে ‘দোসাড় আষাঢ়’ বলা হয়। পরের বার বৈশাখের সাথে এক মাস বাড়ানো হয়। তাকে ‘দোসাড় বৈশাখ’ নাম দেওয়া হয়। (তাকভীমে তারিখি, হাশমি, পৃষ্ঠা ১৮)।
[২] দ্রষ্টব্য: মাওলানা ইসহাক নবী আলভি মরহুমের নিবন্ধ: “সীরাতে নববী ও সময় গণনার আলোকে” (নুকুশ, রসূল নম্বর, খণ্ড ১০, ডিসেম্বর ১৯৮২)। লেখক মরহুমের গবেষণাকে গভীরভাবে দেখেছেন এবং ব্যাপক যাচাই-বাছাইয়ের পর একে সঠিক মনে করেছেন। যদিও কিছু সীরাত লেখকের ধারণা যে এই ক্যালেন্ডার বসন্তকাল থেকে শুরু হতো, কিন্তু তা সঠিক নয়। বরং আরবে একটি চান্দ্র-সৌর ক্যালেন্ডার প্রচলিত ছিল যা প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়েছিল কিন্তু এর গণনা শরৎকাল থেকে শুরু হতো।
[৩] যেমন তারা প্রাচীন ভাষা থেকে মাসের নামগুলো গ্রহণ করেছিল এবং সেগুলোকে সেই সময়ের সাথে নামকরণ করেছিল যে সময়ে সেগুলো সংঘটিত হয়েছিল। ফলে এই মাসটি প্রচণ্ড গরমের সময় আসার কারণে এর নাম রমজান রাখা হয়েছিল। (আস-সিহাহ তাজুল লুগাহ লিল জাওহারি ৩/১০৮১)। আর জুমাদাল উলা ও জুমাদাল আখিরাহ মাসের নাম রাখার কারণ ছিল সেই সময় পানির জমাট বেঁধে যাওয়া। (লিসানুল আরব ১৩/১০৩)।
এ থেকে বোঝা যায় যে চান্দ্র মাসগুলোর প্রাচীন আরবি নাম অন্য কিছু ছিল। ইমাম আবু মনসুর আল-আজহারি (মৃত্যু ৩৭০ হিজরি) এর কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি লেখেন: “আরবদের কাছে জুমাদাল আখিরাহ ছিল ‘রুব্বা’, জিলকদ ছিল ‘ওয়ারনাহ’ এবং জিলহজ ছিল ‘বারাক’।” (তাহজিবুল লুগাহ ১৫/১৭)।
[৪] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩১। “কাল্লামাস”-এর পর এই দায়িত্ব বনু কিনানা পালন করত। সরদারকে “কালামাস” বলা হতো, এটি একটি উপাধি ছিল যার বহুবচন “কালামিস”। ঐতিহাসিক বর্ণনায় “কালামাসাহ” নামেও পাওয়া যায়। (আর-রওদুল উনুফ ১/৩৯১)।
দ্রষ্টব্য: “নাসি”-এর প্রথা সম্পর্কে ডক্টর জাওয়াদ আলীর “আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কুবলাল ইসলাম” (৬/৪২৮, ৪৩০) অধ্যয়ন করুন।

গেল। ফলে হজের সময় এই ঘোষণাও দেওয়া হতো যে, আগামী বছর অমুক অমুক মাস 'আশহুরে হুরম' হবে। এভাবে 'আন-নাসি'-তে এই উভয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ: [১] হজের সময়ে পরিবর্তন [২] আশহুরে হুরম-এ পরিবর্তন।

এই পরিবর্তনের ফলে মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে পঞ্জিকা প্রচলিত হলো তা বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা রইল না বরং 'চান্দ্র-সৌর' পঞ্জিকায় পরিণত হলো। অন্যদিকে মদিনা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী আরব গোত্রগুলো বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকাকে কিছুটা বজায় রেখেছিল। এভাবে আরবে একই সময়ে 'চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা' (মাক্কি পঞ্জিকা) এবং 'বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা' (মাদানি পঞ্জিকা) উভয়েরই প্রচলন ছিল। [২]

এই দুটি ছাড়াও আরবে আরও একটি 'চান্দ্র পঞ্জিকা' প্রচলিত ছিল যা বসন্তকাল থেকে শুরু হতো, তবে সম্ভবত এর প্রচলন খুব কম ছিল। একে আমরা 'চান্দ্র-সৌর বসন্তকালীন' বলতে পারি। [৩]

যদিও 'চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা' (মাক্কি পঞ্জিকা) ৩৩ বছর পর এক চক্র পূর্ণ করে পুনরায় 'বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা' (মাদানি পঞ্জিকা)-র সমান হয়ে যেত, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ চান্দ্র বছর পুরোপুরি হারিয়ে যেত। এই কারণে যখন ইসলাম বিজয়ী হলো, তখন হজ্জাতুল বিদা-তে রাসুলুল্লাহ (সা.) 'আন-নাসি'-র প্রথা চিরতরে বন্ধ করার ঘোষণা দিলেন, যার পর আরবে পুনরায় বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা প্রচলিত হলো এবং আজ পর্যন্ত সেটিই চলে আসছে। [৪]

যাই হোক, মধ্যবর্তী সময়ে (যে সময়ে 'আন-নাসি'-র বিকৃতি জারি ছিল) তারিখ নির্ধারণ করা এই কারণে কঠিন হয়ে পড়েছে যে, প্রাচীন বর্ণনাকারীরা সিরাতের ঘটনাবলি কোথাও মাক্কি পঞ্জিকা অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন আবার কোথাও মাদানি পঞ্জিকা অনুযায়ী। এই কারণে সাধারণত সঠিক তারিখ নির্ধারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সিরাতে নববির তারিখসমূহে মতভেদের এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

---

[১] এটি দুই প্রকার ছিল: একটি হলো মহররম মাসকে সফর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া যাতে তারা আক্রমণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পায়, আর দ্বিতীয়টি হলো হজের সময়কে তার নির্ধারিত সময় থেকে পিছিয়ে দেওয়া। (আর-রওজুল উনুফ: ১/১৩৯)

নোট: সাধারণ মুফাসসিরগণ 'আন-নাসি'-র অর্থ 'আশহুরে হুরম'-এ পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছেন যে, আরবদের কাছে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ করা হারাম ছিল, কিন্তু তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পারত না, তাই তারা পবিত্র মাসগুলোকে আগে-পিছে করে নিত। যেমন: যদি তাদের মহররম মাসে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতো, তবে তারা বলত যে মহররম এই বছর রবিউল আউয়াল মাসে হবে এবং তারা যুদ্ধ শুরু করে দিত। এই তাফসির ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। (সিরাত ইবনে হিশাম: ২২৩/১, ত: আল-হালাবি)

অনেক মুফাসসির এটিই গ্রহণ করেছেন যদিও ইবনে ইসহাকের এই মতটি সনদের দিক থেকে দুর্বল এবং এর বিপরীতে নিচের সহিহ বর্ণনাটি রয়েছে:

"জুনদুব ইবনে শুয়াইব তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আরবরা দুই বছর হজ করত এক মাসে এবং দুই বছর হজ করত অন্য মাসে, আর তারা হজের জন্য বিশ বছর ছাড়া একই মাসে ফিরে আসত না, আর এটিই হলো সেই 'নাসি' যার কথা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।" (আল-মু'জামুল আওসাত লিত-তাবারানি, হা: ২৯০৯, ত: দারুল হারামাইন)

পবিত্র কুরআনের শব্দ 'ইউহিল্লুনাহু আমান ওয়া ইউহাররিমুনাহু আমান'-এর অর্থ হলো মুশরিকদের এই বিকৃতির কারণে পবিত্র মাসগুলো সাধারণ মাসে পরিণত হতো এবং কোনো কোনো বছর আশহুরে হুরম-এ যখন কোনো গোত্রকে লুটতরাজ করতে হতো এবং সেই মাসটি প্রকৃতপক্ষে আশহুরে হুরম হতো, তখন তারা একে হালাল করে নিত এবং যারা আপত্তি করত তাদের সামনে এই অজুহাত পেশ করত যে, আমরা একে হারাম মাস গণ্য করছি না। এটি বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকার বিচারে হারাম হতে পারে কিন্তু আমাদের পঞ্জিকায় এটি হালাল। এতে আমাদের কোনো দোষ নেই।

[২] তাকউইমে তারিখি, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাশমি, পৃ. ১৮ এবং ইদারা-এ-তাহকিকাতে ইসলামি ইসলামাবাদ, ১৯৮৮।

[৩] তাকউইমে আহদে নববি, আলি মুহাম্মদ খান, পৃ. ২।

[৪] এই উপলক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছিলেন: "নিশ্চয়ই সময় ঘুরে পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে যে অবস্থায় আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টির সময় একে সৃষ্টি করেছিলেন।" (সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাফসির, অনুচ্ছেদ: ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুর, হা: ৪৬৬২, ত: তওকুন নাজাত)। এই হাদিস থেকে অনেক হাদিস বিশারদ এটি বুঝেছেন যে, হজ্জাতুল বিদা-র সময় বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা এবং সৌর পঞ্জিকা... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

## ইতিহাস রচনার চারটি পর্যায়

যেকোনো ইমারত নির্মাণের কাজ কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়: প্রথমে নকশা অনুযায়ী তার ভিত্তি খনন করা হয়। তারপর দেয়াল তোলা হয় এবং ছাদ ঢালাই করা হয়। এরপর প্লাস্টার করা হয় এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিমেন্ট ও বালু পরিষ্কার করা হয়। সবশেষে রঙ করা, পাখা, বাল্ব এবং অন্যান্য জিনিস লাগিয়ে তা পুরোপুরি বসবাসের উপযোগী করে তোলা হয়।

যেকোনো জ্ঞান ও শিল্পও একইভাবে চারটি পর্যায় অতিক্রম করে পূর্ণতা লাভ করে:

- তأسيس (ভিত্তি স্থাপন): ভিত্তি রাখা।
- তদউইন (সংকলন): তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- তানকীহ ও তাহযীব (পরিশোধন ও বিন্যাস): দুর্বল তথ্য বর্জন করা এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলোকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা।
- তাকমীল (পূর্ণতা দান): শিল্পকে উত্তরোত্তর উন্নত ও সহজতর করা।

প্রথম পর্যায়কে তأسيس বলা হয়। এটি ইমারতের ভিত্তি স্থাপনের মতো। এই যুগে কিছু মানুষ এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এর একটি নকশা তৈরি করেন এবং এমন সীমারেখা নির্ধারণ করেন যার মাধ্যমে এটি অন্যান্য জ্ঞান থেকে পৃথক হতে পারে।

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)..... উভয়টি এক হয়ে গিয়েছিল এবং এটিই সেদিকে ইঙ্গিত। তবে এটি সঠিক নয়। গাণিতিক নিয়ম ছাড়াও অনেক প্রমাণ বিদ্যমান যে হজ্জ 'জুমাদাল আখিরা' মাসে হয়নি। কারণ ঈসায়ী ক্যালেন্ডারের হিসেবে এটি মার্চ মাস ছিল না। কোনো কোনো ক্যালেন্ডারে চান্দ্র বছর অস্বাভাবিকভাবে সৌর বছরের সাথে মিলে যায়। হজ্জাতুল বিদা সাধারণত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের শুরুতে অথবা আগস্টের শেষে আসত। যেহেতু হজ্জাতুল বিদা বিশুদ্ধ চান্দ্র ক্যালেন্ডারের যিলহজ্জ মাসে হয়েছিল, তাই সাধারণ ঈসায়ী ক্যালেন্ডারে মার্চ মাস হওয়া অসম্ভব ছিল। বরং এটি চান্দ্র ক্যালেন্ডারের ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হয়েছিল, অর্থাৎ জুমাদাল আখিরা ছিল, যেমনটি সাধারণত ঈসায়ী ক্যালেন্ডারের মার্চ মাসে হয়ে থাকে। এই ইরশাদ-ই-পাকের সঠিক অর্থ হাফেজ ইবনে হাজার এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حقت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار

"এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ৯ই যিলহজ্জ এমন সময়ে সংঘটিত হওয়া যখন সূর্য মেষ রাশিতে (Aries) প্রবেশ করে, যে সময়ে দিন ও রাত সমান হয়।" (ফাতহুল বারী: ৮/৩৩৩)

হাফেজ ইবনে হাজার-এর এই টীকাটি আরও স্পষ্ট করার জন্য আমরা ইসহাক নবী আলভীর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি লিখেন: "তাকভীম-ই-কউয়িম-কে সামনে রেখে চান্দ্র মহররম লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ২৪শে মার্চ অর্থাৎ বসন্তকালীন বিষুব (Vernal Equinox) এর সাথে মিলে শুরু হয়েছিল। এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে প্রাচীন আহলে বাবেল, আহলে ইরান এবং দক্ষিণ আরবের বাদশাহদের হাশেমী ও অন্যান্য রাজবংশের ক্যালেন্ডার বসন্তকালীন বিষুব থেকে বছর শুরু করত, যার প্রচলন হিন্দুস্তানে আজও বিদ্যমান। ইহুদিদের ধর্মীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস 'নিসান'ও এই সময় থেকেই শুরু হতো। আর প্রবল ধারণা এই যে, প্রাচীন আরবদের মধ্যেও বছরের সূচনা বসন্তকালীন বিষুব থেকেই হতো। কারণ আরবদের ধারণা ছিল যে সৃষ্টির সূচনা বসন্তকালীন বিষুব সময়ে হয়েছিল।" ইবনে তাইমিয়া-এর বক্তব্য হলো: "বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলা যখন সূর্যকে মেষ রাশিতে সৃষ্টি করেছিলেন তখন দিন ও রাত সমান ছিল।" (সীরাত-উন-নবী ও সময় নিরূপণের আলোকে, নকশ-ই-রাসূল নম্বর, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৮২, পৃ. ২০০)

উল্লিখিত হাদীস-ই-নববীর আরেকটি অর্থ যা সহজ ও বোধগম্য এবং আগে থেকেই প্রচলিত, তা হলো:

ان الزمان قد استدار يعنى امر الله تعالىٰ ان يكون الحجة فى هذا الوقت فاحفظوه واجعلو الحج فى هذا الوقت ولا تبدلوه شهراً بشهر كما فعل اهل الجاهلية

"নিশ্চয়ই সময় আবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে হজ্জ এই সময়েই হবে। সুতরাং তোমরা এটি স্মরণ রাখো এবং এই সময়েই হজ্জ আদায় করো। জাহেলিয়াতের যুগের লোকদের মতো এক মাসের পরিবর্তে অন্য মাসে হজ্জ করে পরিবর্তন করো না।" (আউনুল মাবুদ ও শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ, ইবনুল কায়্যিম: ৫/২৯৩)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, এখানে 'বিশুদ্ধ চান্দ্র ক্যালেন্ডার' আরবদের সেই 'তাকভীম-ই-রবী' (বসন্তকালীন ক্যালেন্ডার) এর সাথে মিলে গিয়েছিল যা বসন্তকাল থেকে শুরু হতো। আলী মুহাম্মদ খানের গবেষণা হলো যে, হজ্জাতুল বিদা-তে বিশুদ্ধ চান্দ্র ক্যালেন্ডার আরবদের 'তাকভীম-ই-রবী' এর সাথে মিলে গিয়েছিল। (তাকভীম-ই-মুহাম্মদী, পৃ. ১২) চিন্তা করলে এই কথাটিই সঠিক মনে হয়। কারণ হজ্জাতুল বিদা বসন্তকালে আদায় করা হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জমহুর মুহাদ্দিসগণের বক্তব্যও নিজ স্থানে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় যুগ যাকে সংকলন (তদউইন) যুগ বলা হয়, তা ইমারতের দেয়াল তোলা এবং ছাদ দেওয়ার সমতুল্য। এতে এই ইলমের মৌলিক নীতি ও নিয়মাবলী নির্ধারিত হয়। এছাড়াও এই ইলম সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক উপাদানসমূহকে অপরিপক্ক অবস্থায় একত্রিত করা হয়।
তৃতীয় যুগ হলো পরিমার্জন ও সংস্কার (তানকিহ ও তাহজিব)-এর যুগ। এটি ইমারতের প্লাস্টার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মতো। এতে ইলমের ভাণ্ডারকে মজবুত করা হয় এবং পূর্ববর্তী কাজের সময় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ উপাদান এবং অসম্পূর্ণ ধারণা ও মতবাদসমূহ বের করে একে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

চতুর্থ যুগ হলো পূর্ণতা (তাকমিল)-এর যুগ, যা ইমারতে বাল্ব ও পাখা লাগানোর মতো। এতে ইলমের কাঠামোকে সুশোভিত করা হয়, নতুন নতুন গবেষণা চালানো হয় এবং এর প্রচার-প্রসার করা হয়।
যেহেতু এরপর এতে আর বাড়তি কিছু করার কাজ বাকি থাকে না, তাই এই উত্তরাধিকার রক্ষা করা এবং এর প্রচার-প্রসারই মূল লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। যদি এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা হয়, তবে এটি একটি ধ্বংসস্তূপের রূপ ধারণ করে, যার ফলে চোরেরা এর সুযোগ নেয় অথবা ভূত-প্রেত এসে সেখানে আস্তানা গেড়ে বসে।

ইতিহাস রচনার ধারাও একইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এর ভিত্তি ইসলামি যুগের পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের ময়দানে আসার পর এর সংকলনের (তদউইন) যুগ শুরু হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ হিজরি শতাব্দী হলো ইতিহাস সংকলনের যুগ। সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে এর পরিমার্জন ও সংস্কারের (তানকিহ ও তাহজিব) সময় শুরু হয়, যার সূচনা হাফেজ যাহাবী (রহ.) 'তারিখুল ইসলাম' এবং হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-এর মাধ্যমে করেছিলেন। তবে পরিমার্জন (তানকিহ)-এর কাজ পূর্ণ হতে পারেনি, অর্থাৎ ইতিহাসকে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ উপাদান থেকে মুক্ত করা এবং ইতিহাসের তাত্ত্বিক আলোচনায় বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলো দূর করার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালের লোকেরা পরিমার্জনের পরিবর্তে সংস্কারের (তাহজিব) দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন।

অষ্টম হিজরি শতাব্দীকে ইতিহাস রচনার 'সংস্কার' (তাহজিব)-এর চরম উৎকর্ষের যুগ বলা যেতে পারে; কারণ এই যুগেই ইবনে খালদুনের ইতিহাস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এরপর এই ইলম আপনজনদের অবহেলার শিকারে পরিণত হওয়ার কারণে পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। প্রয়োজন হলো এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করা এবং আবারও পূর্বসূরিদের (সালাফ) মতো ইতিহাস রচনার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।
মনোযোগ দেওয়ার অর্থ হলো প্রাচীন সীরাতকার, ঐতিহাসিক এবং উলামায়ে কেরাম বর্ণনা ও অনুধাবনের (রিওয়ায়াত ও দিরায়াত) যে মূলনীতি ও নিয়মাবলী নির্ধারণ করে গেছেন, সে অনুযায়ী অত্যন্ত সতর্কতা ও গাম্ভীর্যের সাথে ঘটনাবলী ও বর্ণনাগুলোকে ইলমি মানদণ্ডে যাচাই করা।

এর অর্থ এই নয় যে, সীরাত ও ইতিহাসকে 'রূপকথা' হিসেবে বিশ্বাস করানো হবে, অথবা সেই প্রাচীন বর্ণনাকারী, মুহাদ্দিস, সীরাতকার এবং ঐতিহাসিকদের সমালোচনা করা হবে, যাদেরকে ইলমে তারিখ এবং ইলমে আসমাউর রিজালের ইমামগণ সর্বসম্মতিক্রমে জালেম, ফাসেক ও পাপাচারী সাব্যস্ত করেছেন, তাদেরকে 'হযরত', 'রহমাতুল্লাহ' এমনকি 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উপাধিতে ভূষিত করা হবে এবং যাদেরকে পূর্বসূরি ও আকাবিরগণ ইমাম ও হুজ্জত (প্রমাণ) হিসেবে মেনেছেন, তাদেরকে মুনাফিক ও দ্বীনহীন প্রমাণ করে নিজেকে চৌদ্দশ বছরের সবচেয়ে বড় গবেষক হিসেবে জাহির করা হবে।

## ইতিহাসের ইসলামী যুগ

ইসলামের পূর্বে প্রতিটি জাতির ইতিহাস কাব্যিক কল্পনা এবং অতিরঞ্জিত স্বরচিত কাহিনীতে ভরপুর ছিল। ইতিহাস যাচাই করার কোনো মূলনীতি ছিল না। মানুষ যা চাইত ইতিহাসের নামে চালিয়ে দিতে পারত। মুসলমানরা এই শাস্ত্রের মূলনীতি ও নিয়মকানুন নির্ধারণ করে একে একটি নিয়মিত বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছে। বর্তমান যুগে কোনো জাতির মধ্যে যদি ইতিহাস রচনায় কোনো আমানত ও দিয়ানতের অস্তিত্ব থাকে, তবে তা সেই নিয়ম ও মূলনীতির বদৌলতে যার প্রাথমিক পাঠ মুসলিম ঐতিহাসিকরা শিখিয়েছিলেন। তাই এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, ইতিহাস রচনার প্রকৃত যুগ মুসলমানদের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে।

## ইসলামী ইতিহাস রচনার দুটি ভিত্তি

ইসলামী ইতিহাস রচনার ভিত্তি হলো দুটি শাস্ত্র:

- ১. সীরাত রচনা
- ২. ফন-এ-রিজাল

এই উভয় শাস্ত্রই ইলমে হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। সীরাত রচনা ইলমে হাদীসের একটি আনুষঙ্গিক শাখা ছিল যাকে সিয়ার ও মাগাযী বলা হতো। সীরাত রচয়িতারা একে প্রশস্ত করে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছেন। হাদীস ও ইতিহাসকে সংরক্ষিত করার জন্য ফন-এ-রিজাল বা বর্ণনাকারীদের জীবনী শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বর্ণনাকারীদের অবস্থা সংকলিত হয়েছে। আমরা এই উভয় শাস্ত্রের আলাদা আলাদা পর্যালোচনা করছি।

## সীরাত রচনা

ইসলামী ইতিহাস রচনার ভিত্তি হলো সীরাত রচনা। প্রথম যুগের মুসলমানরা অত্যন্ত মহব্বত, মর্যাদা ও সতর্কতার সাথে জনাব রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর অবস্থা ও বাণীসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন, যার ফলে হাদীসের ভাণ্ডার অস্তিত্ব লাভ করে। হাদীসের এই ভাণ্ডারের একটি অংশ সিয়ার ও মাগাযী শিরোনামে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, যাতে নবী صلى الله عليه وسلم-এর যুদ্ধবিগ্রহ, অভিযান এবং দাওয়াতী ও রাজনৈতিক সফরের উল্লেখ ছিল। একে আনুষঙ্গিক মর্যাদা এই জন্য দেওয়া হয়েছিল যে, মুহাদ্দিসগণের আসল উদ্দেশ্য ছিল সেই সব হাদীস সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করা যা থেকে আকীদা ও আমলী মাসআলা সমাধান হয়। কিন্তু কিছু আশেক এমন ছিলেন যারা নবী صلى الله عليه وسلم-এর জীবনের ঘটনাবলীকে জীবনচরিতের ক্রমানুসারে জানতে, বলতে এবং সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাদীসের ভাণ্ডারে নবী صلى الله عليه وسلم-এর জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রচুর বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। তাই উলামায়ে কেরাম সীরাতের স্বতন্ত্র শাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কিছু ব্যক্তি নবী صلى الله عليه وسلم-এর জীবনের ঘটনাবলী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে সংকলন করা শুরু করেন। এই ব্যক্তিরাই আসহাবে সীরাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন; তারাই সীরাত রচনার প্রতিষ্ঠাতা। কেউ কেউ সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য সমসাময়িক ব্যক্তিদের অবস্থা সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিলেন। তাদেরকে আসহাবে খবর বা আখবারী বলা হতো। খলীফাগণও অন্যান্য শাস্ত্রের মতো এই শাস্ত্রের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন এবং এভাবে ইসলামী ইতিহাস রচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই সিলসিলায় সর্বপ্রথম চেষ্টা হযরত মুয়াবিয়া رضي الله عنه-এর পক্ষ থেকে হয়েছিল, যাঁর ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। এশার পর তিনি আহলে সিয়ার এবং আখবারী ব্যক্তিদের একত্রিত করে তাঁদের কাছ থেকে অতীতের ঘটনাবলী শুনতেন। তিনি বিখ্যাত...

আখবারী উবাইদ বিন শারিয়াকে ইয়ামেন থেকে ডেকে পাঠিয়ে সিনা ব সিনা বর্ণিত ইতিহাসের একটি আরবি সংকলন তৈরি করানো হয়েছিল যা 'আল-মুলুক ওয়া আখবারুল মাদীন' নামে পরিচিত। [১] একইভাবে 'মাজমুআতুল আমসাল' নামে একটি সংকলনও তৈরি করা হয়েছিল। এই বইগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য।

তাদের পর উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) মাগাজি ও সিয়ারের পাঠদানের জন্য হালকা কায়েম করেন। আসিম বিন কাতাদা আনসারি (মৃত্যু ১২১ হিজরি)-কে তাকিদ করেন যেন তিনি দামেস্কের জামে মসজিদে সীরাত, মাগাজি ও মানাকিব-এর পাঠদান করেন। এই সময়েই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে শিহাব জুহরি (মৃত্যু ১২৪ হিজরি), যিনি প্রথম উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর নির্দেশে হাদিসের ভাণ্ডার সংকলন করছিলেন, মাগাজির ওপরও একটি বই লিখেছিলেন যাকে মাগাজির প্রথম রচনা বলা হয়। এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

জুহরির ছাত্রদের মধ্যে মুসা বিন উকবা (মৃত্যু ১৪১ হিজরি) এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হিজরি) এই শাস্ত্রকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করেন। মুসা বিন উকবা সীরাত বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন, তাই তার বর্ণনার সংকলনটি সংক্ষিপ্ত। সীরাতের বইগুলোতে তার উদ্ধৃতি প্রচুর পাওয়া যায়, তবে এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

ইবনে ইসহাক বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের বিশুদ্ধতার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি এবং সব ধরণের বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন, তাই তার বর্ণনার সংখ্যা অনেক বেশি। মাগাজির ওপর তার বইটি বিশাল। ইসলামি বিশ্বের ওপর ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সময় এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি কয়েকজন গবেষকের প্রচেষ্টায় সংশোধন ও গবেষণার পর এটি পুনরায় জনসমক্ষে এসেছে।

ইবনে ইসহাকের পর ইয়ামেনি ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখক আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৩ হিজরি) এই শাস্ত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি হিময়ারের রাজাদের ইতিহাসও সংকলন করেন এবং ইবনে ইসহাকের রচনাকে তার গ্রহণযোগ্যতার কারণে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সাজান, এর কঠিন শব্দগুলোর ব্যাখ্যাও করেন। এভাবে 'সীরাতে ইবনে হিশাম' অস্তিত্বে আসে যা সীরাতের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উৎস।

দক্ষিণ আফগানিস্তানের 'বস্ত' শহরের মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম ইবনে হিব্বান (মৃত্যু ৩৫৪ হিজরি)-এর 'আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ওয়া আখবারুল খুলাফা'ও সীরাতের একটি মৌলিক উৎস। এরপর সীরাত রচনা উলামায়ে কেরামের প্রিয় ব্যস্ততায় পরিণত হয়। সীরাত লেখকরা এই বিষয়ে জ্ঞানের সমুদ্র বইয়ে দিয়েছেন, অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় হাজার হাজার কিতাব রচিত হয়েছে, যেগুলোর তালিকার জন্যই একটি বিশাল কিতাব প্রয়োজন।

**ফন আসমাউর রিজাল:**

হাদিসের ভাণ্ডার ও ইতিহাসকে সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে ফন আসমাউর রিজালের কাজ শুরু হয়। একজন দক্ষ মুহাদ্দিসের জন্য আসমাউর রিজালের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য সাব্যস্ত হয়। রিজাল শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনার ধারা যা তৃতীয় হিজরি শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল তা অষ্টম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণামূলক কাজ হিসেবে চলতে থাকে। আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ইজলি (মৃত্যু ২৬১ হিজরি)-এর আসমাউর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থ 'আস-সিকাত' এই শাস্ত্রের প্রাথমিক বইগুলোর অন্যতম। এরপর উকাইলি, ইবনে হিব্বান, ইমাম দারাকুতনি এবং ইবনে আদি (রহ.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ এই শাস্ত্রকে আরও উন্নত করেন। পরিশেষে আল্লামা মিজ্জি (রহ.)-এর 'তাহজিবুল কামাল', হাফেজ জাহাবি (রহ.)-এর 'মিজানুল ইতিদাল' এবং হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর 'তাহজিবুত তাহজিব'-এর মতো মহান গ্রন্থগুলো জনসমক্ষে আসে।

---

[১] আল-মুসলিমুন ওয়া কিতাবাতুত তারিখ: পৃ. ৯০; আল-ফিহরিস্ত লি ইবনিন নাদিম, পৃ. ১১৮।

## ইতিহাস রচনার সূচনা

এটি ছিল সেই যুগ যখন মুসলিম ইতিহাসবিদগণ সীরাতের গণ্ডি পেরিয়ে মুসলমানদের একটি নিয়মিত ইতিহাস সংকলনের জন্য কোমর বেঁধেছিলেন। ফলে এই যুগেই মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি (মৃত্যু ২০৭ হিজরি) ইতিহাসবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কিতাবুস সিরাহ, কিতাবুত তারিখ ওয়াল মাগাজি, ফুতুহুল শাম এবং আখবারে মক্কা-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থসমূহ রেখে গেছেন। তবে ওয়াকিদি বর্ণনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো মানদণ্ড সামনে রাখেননি এবং ভালো-মন্দের পাশাপাশি বানোয়াট বিষয়ও সংগ্রহ করেছেন। তাঁর রচনাবলি নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে কোনো উচ্চমানের নয়, তবে ভাষা ও বর্ণনার সাবলীলতা এবং ঘটনার খুঁটিনাটির অসাধারণ স্পষ্টতার কারণে তা সাধারণ ও বিশিষ্ট সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ওয়াকিদির ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন সাদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরি) অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদের বিপরীতে তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করতেন। তিনি 'আত-তাবাকাতুল কুবরা'-এর মতো এক অনন্য কিতাব রচনা করেন। এটি বারো খণ্ডে সমাপ্ত এবং সীরাতে নববী ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর এক বিশাল উৎস।

এই যুগেই ইলমে হাদিসের সম্রাট ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারিও ইতিহাসের শিরোনামে দুটি কিতাব লিখেছেন: একটি 'আত-তারিখুল আওসাত', অন্যটি 'আত-তারিখুল কাবির'। মূলত এগুলো আসমাউর রিজাল বা বর্ণনাকারীদের পরিচিতি বিষয়ক কিতাব। এগুলোতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি কোনো ধারাবাহিকতা ছাড়াই উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিদ্যমান রয়েছে।

## জালিয়াত বর্ণনাকারী

এর আগেই খারেজি ও রাফেজিদের মতো ফেরকাগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল, যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে স্বীকার করত না। এই ফেরকাগুলোর মধ্যে আলেম ও জাহেল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। জাহেলরা তাদের নিজস্ব কায়দায় রক্তপাত ঘটিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এবং আলেমগণ ইলমি ও তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি ছড়াতে কোনো ত্রুটি করেননি। এই আলেমদের মধ্যে হাদিসের প্রতি অনুরাগী যেমন ছিল, তেমনি ইতিহাসের প্রতি আগ্রহীও ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কায়দায় কাজ করেছে। যেভাবে নিজেদের মতবাদের সমর্থনে বানোয়াট হাদিস প্রচার করা হয়েছিল, একইভাবে ইতিহাসকে নিজেদের পক্ষে প্রমাণ করার জন্য নানা ধরনের ঐতিহাসিক বর্ণনাও জাল করা হয়েছিল। হাদিসের জালিয়াতি উন্মোচনের জন্য হাদিস বিশারদগণ খুব দ্রুত ময়দানে নেমে আসেন এবং এই ফিতনার পথ রোধ করেন, কিন্তু ইতিহাস রচনায় জালিয়াতি রোধ সেই পর্যায়ে সম্ভব হয়নি। তবে গবেষকগণ নিজ নিজ জায়গা থেকে চেষ্টা অবশ্যই করেছেন, যার উল্লেখ সামনে আসছে।

## সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার যুগ

এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোয়ারের মধ্যেই সুসংবদ্ধ ইসলামি ইতিহাস রচনার যুগ শুরু হয়, যা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে ইতিহাস রচনার বিবর্তনের দিকে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ছিল। এই যুগ তৃতীয় হিজরি শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়। এই যুগেই 'তারিখ' শব্দটি সীরাত ও মাগাজির কিতাবসমূহের শিরোনাম হতে শুরু করে। এর একটি প্রাথমিক উদাহরণ হলো উমর বিন শাব্বাহ আল-বাসরি (মৃত্যু ২৬২ হিজরি)-এর...

https://t.me/BoierSomahar

“তারিখ মদিনা আল-মুনাওয়ারা”। এই যুগেই ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারী (মৃত্যু ২৭৬ হিজরি) “আল-মাআরিফ” রচনা করেন, যা সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম থেকে সেই সময় পর্যন্ত ঘটনাবলি সম্বলিত ছিল। আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারী (মৃত্যু ২৮২ হিজরি) “আল-আখবার আত-তিওয়াল” লিখে বিশ্ব ইতিহাস রচনার প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তবে এই বইগুলোতে দুর্বল উপাদানের আধিক্য রয়েছে।

এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো হলো আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি (মৃত্যু ২৮৯ হিজরি)-এর “ফুতুহুল বুলদান” এবং “আনসাবুল আশরাফ”, যেগুলোকে ইসলামি ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিজরি)-এর বিশ্বখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ “তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক” একটি ব্যাপক প্রয়াস, যাকে ইসলামি ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উৎস হিসেবে মানা হয়। একে সাধারণত “তারিখ-এ-তাবারী” বলা হয়। পরবর্তী অধিকাংশ ইসলামি ইতিহাসের প্রধান উৎস এই “তারিখ-এ-তাবারী”। “তারিখ-এ-তাবারী” এবং “আনসাবুল আশরাফ” সহ প্রাথমিক যুগের প্রায় সব বইয়েই গবেষণা-বিরোধী বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

**ইতিহাস রচনার ওপর ভ্রান্ত আকিদার শাসকদের প্রভাব:**

এই প্রাথমিক দুই-তিন শতাব্দীর ইতিহাসে সংমিশ্রণ তো করা হয়েছে কিন্তু যাচাই-বাছাইয়ের কাজ মোটেও হতে পারেনি। এই সংমিশ্রণে শিয়া সরকারগুলো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। বনু আব্বাসের মধ্যে মামুনসহ কিছু খলিফা শিয়া মতবাদ ও মুতাজিলা মতবাদের দিকে ঝুঁকে ছিলেন এবং শিয়া আলেমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আহলে তাশাইয়ু-এর বনু উবায়েদ রাষ্ট্র ২৯৭ হিজরি থেকে ৫৬৭ হিজরি পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে শাসন করেছে। বনু বুওয়াইহ রাষ্ট্র ছিল ইসনা আশারি, যারা ৩২০ হিজরি থেকে ৪৭৭ হিজরি পর্যন্ত খোরাসান ও ইরানে শাসন করেছে। ইসমাইলি শিয়াদের বাতেনিয়া ফেরকা পঞ্চম হিজরি শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ থেকে সপ্তম হিজরি শতাব্দীর অর্ধেক পর্যন্ত উত্তর ইরান, কুর্দিস্তান এবং উত্তর সিরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। এই সরকারগুলোর অধীনে এমন ডজন ডজন ঐতিহাসিক ছিলেন যারা সত্যকে শিয়া শাসকদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিকৃত করতেন। এই শিয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে কারো কারো বই চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভ করেছে। আহমদ বিন আবু ইয়াকুব (২৮৪ হিজরি) “তারিখ-এ-ইয়াকুবি” রচনা করেন এবং গ্রিস, রোম, পারস্য ও ভারতের ইতিহাস একত্রিত করে ইসলামি ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে দেন। আল-মাসউদী (মৃত্যু ৩৪৬ হিজরি)-এর “মুরুজুজ জাহাব”ও অনেক খ্যাতি অর্জন করেছে। এই ধরনের বইগুলোতে সাহাবায়ে কেরামের যুগের অংশটি বিশেষভাবে বানোয়াট বর্ণনায় কলুষিত।

**ইসলামি ইতিহাস রচনার স্বর্ণযুগ:**

পরবর্তী শতাব্দীগুলোর আলেমগণ ইসলামি ইতিহাসের ওপর অসংখ্য বই লিখেছেন, যার মধ্যে খতিব বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি)-এর “তারিখ-এ-বাগদাদ”, ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হিজরি)-এর “তারিখ-এ-দামেস্ক”, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি)-এর “আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম” এবং আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ৬৩০ হিজরি)-এর “আল-কামিল ফিত তারিখ” অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই সময়েই সাহাবায়ে কেরামের জীবনী সম্পর্কে ব্যাপক সংকলনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে ইবনে আব্দুল বার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর “আল-ইসতিয়াব”, ইবনুল আসির জাযারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর “উসদুল গাবাহ” এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর “আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ”-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো জনসমক্ষে আসে।

তাতারীদের আক্রমণের পর মুসলিম বিশ্বের নবজাগরণ ঘটলে প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অনেক বিজ্ঞ...

ওলামায়ে কেরাম পূর্ণ উদ্যমের সাথে ইসলামী ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হলেন এবং তাঁদের কলম থেকে ইসলামী ইতিহাসের ব্যাপক গ্রন্থসমূহ অস্তিত্ব লাভ করল। হাফিজ যাহাবী (রহ.) (মৃ. ৭৪৮ হি.)-এর "তারিখুল ইসলাম", হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) (মৃ. ৭৭৪ হি.)-এর "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া", আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) (মৃ. ৮০৮ হি.)-এর "দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর" এবং ইবনে ইমাদ হাম্বলী (মৃ. ১০৮৯ হি.)-এর "শাযারাতুয যাহাব" এমনই অতুলনীয় গ্রন্থ। সংক্ষেপে, সপ্তম হিজরী শতাব্দী থেকে নবম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস রচনার চরম উৎকর্ষের যুগ ছিল, যাতে এই ক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

ইলমুল বুলদান এবং সফরনামা:

শহর ও দেশসমূহের ভূগোল, তাদের ইতিহাস, সেখানকার বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এবং তাহযীব ও তামাদ্দুন (সভ্যতা ও সংস্কৃতি) সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। ইবনে শাব্বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) "তারিখুল মদিনা" লিখেছেন। ইমাম ফাকিহী (মৃ. ২৭২ হি.) এবং ইমাম আযরাকী (মৃ. ২৫০ হি.) একই নামে "আখবারে মক্কা" শিরোনামে দুটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের পর ইবনে খুরদাদবিহ (মৃ. ২৮০ হি.)-এর "আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক", ইবনে হাইয়িক হামদানী (মৃ. ৩৩৪ হি.)-এর "সিফাতু জাযিরাতিল আরব", আল-বিরুনী (মৃ. ৪৪০ হি.)-এর "কিতাবুল হিন্দ", ইবনে আল-ফারযী (মৃ. ৪০৩ হি.)-এর "তারিখু উলামাইল আন্দালুস", আবু নুয়াইম আসফাহানী (মৃ. ৪০৫ হি.)-এর "তারিখু নাইসাপুর", হামযা জুরজানী (মৃ. ৪২৭ হি.)-এর "তারিখু জুরজান", আল-ইদ্রিসী (মৃ. ৫৬০ হি.)-এর "নুযহাতুল মুশতাক", ইবনে আল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.)-এর "তারিখু বাইতিল মাকদিস" এবং ইয়াকুত হামাভী (মৃ. ৬২৬ হি.)-এর "মু'জামুল বুলদান" এই ক্ষেত্রের কিছু উদাহরণ। এই বিভাগটিকে তাঁরা আরও মহিমান্বিত করেছেন যাঁরা দেশে দেশে ঘুরে সফরনামা (ভ্রমণকাহিনী) লিখেছেন, ফলে ইবনে জুবায়ের আন্দালুসী (মৃ. ৬১৪ হি.) এবং ইবনে বতুতা (মৃ. ৭৭৯ হি.)-এর সফরনামাগুলো আজও বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে।

ইলমুত তাবাকাত:

ইতিহাস এবং রিজাল শাস্ত্রের এই কাজের পাশাপাশি অন্যান্য মুসলিম মনীষী ও বুজুর্গদের অবস্থা সংরক্ষণের চর্চাও শিখরে পৌঁছেছিল। ফলে খলিফা বিন খাইয়াত-এর "আত-তাবাকাত", আল-আযদি-এর "তাবাকাতুস সুফিয়া", ইবনে জাওযী (রহ.)-এর "সাফওয়াতুস সাফওয়াহ", হাফিজ যাহাবী (রহ.)-এর "সিয়ারু আলামিন নুবালা", ইমাম সুয়ূতী (রহ.)-এর "তাবাকাতুল হুফফায", আবু ইসহাক শিরাযী-এর "তাবাকাতুল ফুকাহা", ইয়াকুত হামাভী-এর "মু'জামুল উদাবা" এবং ইবনে আল-মু'তায-এর "তাবাকাতুশ শুয়ারা"-এর মতো অতুলনীয় সংকলনসমূহ ইসলামী কুতুবখানাগুলোর শোভাবর্ধন করেছে। এভাবে ফন-এ-রিজাল এবং ইতিহাসের সাথে ইলমুত তাবাকাতও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই বিদ্যায় কোনো বিশেষ যুগ বা কোনো বিশেষ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত এমনভাবে সংগ্রহ করা হয় যে, প্রথমে এক প্রজন্ম বা এক যুগে অতিবাহিত ব্যক্তিদের আলোচনা করা হয়। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম বা যুগের ব্যক্তিদের আলোচনা করা হয়। একটি স্তরের (তাবাকাত) আলোচনায় কখনো তাঁদের মর্যাদা, কখনো এলাকা, কখনো পেশা এবং কখনো বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস রক্ষা করা হয়।

ইলমুত তাবাকাত ইতিহাস শাস্ত্রের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, ইতিহাসে মূল গুরুত্ব দেওয়া হয় ঘটনাবলি এবং বিপ্লবসমূহকে, জাতিসমূহের উত্থান-পতন, সরকার পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক নেতাদের উত্থান-পতনের...

...আসল গুরুত্ব ব্যক্তিত্বের হয়, রাজনৈতিক...

ইতিহাসে এটি একটি ট্র্যাজেডি হয়ে রয়েছে যে, সেই যুগেও মানবিক...

আদমের জন্ম সত্ত্বেও...

তারা (ইতিহাস রচনার) শিল্পকেও নতুন জীবন দান করেছেন এবং উম্মাহর জন্য...

রচনা করে তাদের উজ্জ্বল জীবনের প্রতিটি দিক আমাদের...

যেমন 'সীরাতে উমর ইবনে আবদুল আজিজ', আবুল ফজল সালেহ (৩৬০ হিজরি)-এর...

আবু হানিফা' এবং বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদের 'আন-নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া' সীরাত ও জীবনী...

উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী ইতিহাস রচনার স্বর্ণযুগে দেশ, শহর, জাতি, গোত্র...

এমনকি পেশাজীবীদের পর্যন্ত শত শত আলাদা আলাদা ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে।

ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের...

জন্য 'তাবাকাতুল আহনাফ', 'তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ' এবং 'তাবাকাতুল হানাবিলাহ'-এর মতো কিতাবসমূহ রচনা করা...

হয়েছে। 'হিলয়াতুল আউলিয়া' এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থা 'ওয়াফায়াতুল আইয়ান'-এর মতো কিতাবসমূহে সংরক্ষিত হয়ে গেছে।

নাহুবিদ, সরফবিদ, কবি ও সাহিত্যিকদের অবস্থার ওপর 'মু'জামুল উদাবা', 'তাবাকাতুশ শুআরা'...

এবং 'আখবারুল কুদাত'-এর মতো স্বতন্ত্র কিতাবসমূহ রচনা করা হয়েছে।

এই ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারগণ ইসলামী বিশ্বের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং ভূগোলসহ প্রতিটি বিষয়কে...

এমনভাবে সংরক্ষিত করেছেন যার ফল এই যে, আজ নিজের পতন যুগেও উম্মাহ তার স্বর্ণযুগের উজ্জ্বল...

দৃশ্যগুলো এমনভাবে দেখতে পারে যেন মনে হয় সে সব তার চোখের সামনে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে।

## ইসলামী ইতিহাস ও অন্যান্য ইতিহাসের পার্থক্য

ইসলামী ইতিহাস একটি নিয়মিত শিল্পের ঢঙে সংকলিত হয়েছে যার মূলনীতি ও নিয়মাবলী নির্ধারিত। অন্যান্য ইতিহাসের বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্যতা ও প্রমাণের দিক থেকে কোনো স্তরেই পৌঁছাতে পারে না।

১. ইসলামী ইতিহাসে ইসনাদ (বর্ণনাসূত্র) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা রাখে। অন্যান্য ইতিহাসে ইসনাদের কোনো স্থান নেই। সেখানে বর্ণনা গ্রহণ বা বর্জন করার কোনো মূলনীতি নেই। কিছু ব্যক্তিত্বের প্রতি অন্ধ ভক্তি এবং কিছু ব্যক্তির প্রতি অহেতুক ঘৃণা কার্যকর দেখা যায়।

২. ইসলামী ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর মান যাচাই-বাছাই করা সম্ভব; কারণ ফন-এ-রিজাল (বর্ণনাকারীদের জীবনী শাস্ত্র)-এর কিতাবসমূহে ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীদের অবস্থাও সংরক্ষিত আছে, তাই বর্ণনাকারীদের অবস্থা অনুসন্ধান করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই বর্ণনার মান নির্ণয় করা যায়। অন্যান্য জাতির ইতিহাসে বর্ণনা যাচাইয়ের কোনো মূলনীতি নেই। ইউরোপীয়দের আধুনিক ইতিহাস রচনা...

...এও কিয়াস ছাড়া বর্ণনা গ্রহণ বা বর্জনের কোনো মানদণ্ড বিদ্যমান নেই।

ইসলামি ইতিহাসে বর্ণনার (রিওয়ায়াত) পাশাপাশি বিচার-বিশ্লেষণের (দরায়াত) নীতিও বিবেচনায় রাখা হয়। অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসে দরায়াত বা বিচার-বিশ্লেষণকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। এই কারণেই হিন্দুরা আজও রামায়ণ ও ভগবদ্গীতার অতিপ্রাকৃত কাহিনীগুলোকে এবং গ্রীকরা হারকিউলিসের অবোধ্য উপাখ্যানগুলোকে বিশ্বাস করে আসছে।

ইসলামি ও অনৈসলামি ইতিহাসের মানদণ্ডের পার্থক্য এই কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা আজও 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-কে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস বলে মনে করেন এবং হিন্দুরা 'রামায়ণ'-কে তাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বলে গর্ব করে, যদিও এগুলোর বিষয়বস্তু প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথায় ভরপুর এবং প্রামাণিক দিক থেকে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে, মুসলিম ঐতিহাসিকরা ইবনে কুতায়বার 'আল-মাআরিফ'-এর মতো রচনাকেও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন। মুসলিম গবেষকরা ওয়াকিদির ওপরও—যিনি বাগদাদের কাজী ছিলেন—অন্ধভাবে আস্থা রাখেন না।

## মুসলমানদের মাঝে ইতিহাস চর্চার পতনের কারণসমূহ

মুসলমানদের পতন এবং ইতিহাস চর্চার অবনতি প্রায় একই সাথে ঘটেছে। এভাবে এই কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, যে জাতি নিজের ইতিহাস ভুলে যায়, তারা নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে। গত তিন-চার শতাব্দী ধরে আমরা অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসেও পতনের শিকার। যদিও আরব বিশ্বে এ বিষয়ে সচেতনতার একটি ঢেউ এসেছে এবং সেখানে ইতিহাসের বিষয়টিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু উপমহাদেশীয় মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা কমছে না।

ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের এই অজ্ঞতার অনেক কারণ থাকলেও তার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করা হলো:

- ইতিহাসের প্রকৃত সংরক্ষক ছিলেন উলামায়ে কেরাম; আট-নয় শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং ফকিহগণ এই শিল্পে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং একে সর্বোচ্চ উন্নতি দান করেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইতিহাসের ওপর ইসলামি চিন্তাধারার অধিকারী শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে থাকে। এটি দরবারি মোসাহেব এবং কবি ও সাহিত্যিকদের শখে পরিণত হয়। এরপর আরও অবনতি ঘটলে এর ওপর বিজাতীয়রা দখল কায়েম করে। প্রাচ্যবিদরা (ওরিয়েন্টালিস্ট) ইসলামি ইতিহাসকে শিশুদের খেলার বস্তুতে পরিণত করে ফেলে। এরপর তাদের ছাত্ররা ময়দানে আসে যারা সেকুলার চিন্তাধারার অধিকারী ছিল; তাদের হাতে ইসলামি ইতিহাস এমনভাবে পদদলিত হয়েছে যে, বিগত শতাব্দীগুলোতে এর কোনো নজির নেই। এখন ইতিহাসের ওপর সেই সেকুলার লবির একচেটিয়া আধিপত্য, যারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতি চরম শত্রুতার প্রমাণ দিচ্ছে। এই লোকেরা ইতিহাস বিকৃত করতে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলোর (مشاجرات صحابہ) ভুল ব্যাখ্যা দিতে, পূর্বসূরিদের (আসলাফ) কলঙ্কিত করতে এবং মুসলিম বিজয়ীদের দস্যু ও লুণ্ঠনকারী হিসেবে সাব্যস্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অবহেলা সাধারণ হয়ে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে একটি বিকল্প ও ভুল ইতিহাস জন্ম নিচ্ছে।

•

২. সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ইলমের প্রতি আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। দুনিয়াপূজা, আখেরাতের চিন্তা থেকে গাফিলতি এবং এর পাশাপাশি দারিদ্র্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও অন্যান্য সমস্যা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্ত সক্ষমতাকে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কার কাছে সময় আছে যে নিজের ইতিহাস পড়ার জন্য সময় বের করবে এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার চিন্তা করবে।

•

৩. মুসলিম বিশ্বে অন্যান্য ইলমের মতো ইতিহাস শিক্ষার সুযোগও কম, বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে এর সুযোগ-সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। দ্বীনি মাদরাসাগুলোতেও এ বিষয়ে কোনো কাজ হয়নি। ইতিহাসে বিশেষায়িত (তাখাসসুস) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিহাসকে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা আমাদের অনেক পরে এসেছে।

•

৪. আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামের ইতিহাস একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে, কিন্তু এই বিষয়টি নামমাত্র পড়ানো হচ্ছে।

•

৫. আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিহাসের অনেক শিক্ষকই সেক্যুলার। তাই সুলতান মাহমুদ গজনভী এবং আলমগীরের মতো শাসকদের জীবনী পড়ানোর সময় তারা যেকোনো মূল্যে তাদেরকে জালেম, নির্দয় এবং জনগণের শত্রু হিসেবে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর থাকেন; তাদেরকে ডাকাত ও লুটেরা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কারণ তারা হিন্দু ঐতিহাসিকদের ভিত্তিহীন গবেষণা, ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সিনেমাগুলোতে এটাই দেখেছেন, শুনেছেন এবং পড়েছেন। একইভাবে তারা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলোর (মুশাজারাতে সাহাবা) অত্যন্ত জঘন্য চিত্র উপস্থাপন করে সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের স্বার্থপর, দুনিয়াদার এবং ক্ষমতার লোভে মত্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেন; কারণ তাদের সম্পর্কে পশ্চিমা ঐতিহাসিক গোল্ডজিহার, পাদ্রী জুইমার, জোসেফ শাখত এবং উইলিয়াম ম্যুর তাদের বইগুলোতে এই ধারণাই দিয়েছেন।

•

৬. ইলমের পরিবর্তে উচ্চতর সনদ নিজেই একটি লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। মানসম্মত কাজের প্রতি মনোযোগ খুবই কম। কপি-পেস্ট ধরনের প্রবন্ধের (থিসিস) ওপরও পিএইচডি ডিগ্রি পাওয়া যায়। অন্যদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি নেওয়াও এখন সাধারণ বিষয়।

•

৭. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ নিতেই জীবনের সেরা অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় এবং কোনো বড় ইলমি কাজ করার জন্য খুব কম সময় অবশিষ্ট থাকে।

•

৮. ইলমি ও গবেষণামূলক কাজের সাধারণত কোনো মূল্যায়ন হয় না। ইতিহাসের ওপর গবেষণাকারীর চেয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসিকের গুরুত্ব বেশি থাকে।

•

৯. ইসলামের ইতিহাসে পিএইচডি করা ব্যক্তিরাও সাধারণত ইসলামী ইতিহাসের মৌলিক ভাষা অর্থাৎ আরবি ও ফারসি জানেন না। তারা প্রাচ্যবিদদের (ওরিয়েন্টালিস্ট) ইংরেজি বই অথবা সেগুলোর উর্দু অনুবাদ থেকে ইতিহাস অধ্যয়ন করে ভ্রান্ত চিন্তাধারার শিকার হন। এরপর তারা এই বিকৃত ইতিহাসই সামনে পৌঁছে দেন এবং ইলমের পরিবর্তে মূর্খতা ছড়ানোর কারণ হয়ে দাঁড়ান। এগুলোই সেই কারণ যার ফলে আমাদের এখানে ইতিহাস চর্চা পতনের মুখে। যতক্ষণ না এই কারণগুলো দূর করা হচ্ছে, মূর্খতার এই অন্ধকার আমাদের ওপর চেপে থাকবে।

## ইতিহাস বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও উপকারিতা

### কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে ইতিহাসের গুরুত্ব:

কুরআন মাজীদ থেকে ইতিহাসের গুরুত্ব প্রমাণিত। আল্লাহর কালামে পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সাবলীল ও প্রভাবশালী ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে সত্যের অনুসারীরা সাহস পায় এবং অস্বীকারকারীরা পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [১]

"আর নবীদের সেই সব সংবাদ যা আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি, তা দিয়ে আমরা আপনার অন্তরকে মজবুত করি।"

কুরআন মাজীদের ডজন ডজন সূরা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাহিনী বর্ণনা করে যাতে তাদের মন্দ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [২]

"নিশ্চয়ই তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষার উপকরণ রয়েছে।"

কুরআন মাজীদ ইতিহাসের কোনো কিতাব নয়, বরং হিদায়াতের লিপি। কুরআন পাক ইতিহাস নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করে যাতে মানুষ হিদায়াত পায় এবং তাদের সম্পর্ক তাদের স্রষ্টার সাথে জুড়ে যায়।

### আহাদীসে ইতিহাসের গুরুত্ব:

হাদীস থেকেও ইতিহাসের গুরুত্ব জানা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এবং পূর্ববর্তী নবীদের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা হাদীসের ভাণ্ডারে বিদ্যমান। এগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সেটাই যা কুরআন মাজীদের। অর্থাৎ শিক্ষা ও উপদেশ। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজ ছাড়াও সেই বরকতময় যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, গাযওয়াত এবং অন্যান্য অবস্থা এজন্যই বর্ণনা করেছেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষ সেগুলো থেকে হিদায়াতের নূর লাভ করতে পারে।

তাবিঈন এবং হাদীস শরীফের বর্ণনাকারীগণও সীরাতুন্নবী এবং সীরাতে সাহাবাকে এই উদ্দেশ্যেই সংরক্ষিত রেখেছেন।

সীরাত এবং সাহাবীগণের যুগের অবস্থার একটি বড় ভাণ্ডার আমরা হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে পাই। হাদীস যদিও ইতিহাসের সংকলন নয়, তবে এতে আনুষঙ্গিকভাবে ইতিহাসের অনেক ঘটনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসের এই অংশ যা হাদীসের কিতাবসমূহে রয়েছে, তা বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে ইতিহাসের সমস্ত উৎসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। হাদীসের ভাণ্ডারে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপস্থিতি এই কথার প্রমাণ যে, ইতিহাস বিজ্ঞানের গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ এবং খাইরুল কুরূনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীদের নিকট স্বীকৃত ছিল।

---

[১] সূরা হুদ, আয়াত: ১২০

[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১

ফকিহগণের নিকট ইতিহাসের বিধান:

অন্যান্য শিল্প ও জ্ঞানের মতো ইতিহাসেরও দুটি দিক রয়েছে: একটি উপকারী, অন্যটি ক্ষতিকর। আবার উপকারী দিকগুলোর মধ্যে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে কিছু কম ক্ষতিকর এবং কিছু বেশি ক্ষতিকর বরং ধ্বংসাত্মক।

আল্লাহ তাআলা ইসলামের ফকিহগণকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যে, তারা যেভাবে জীবনের প্রতিটি দিকের শরয়ী বিধান কুরআন ও হাদিস থেকে উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে স্পষ্ট করেছেন, তেমনিভাবে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারা বৈধ ও অবৈধের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইতিহাস চর্চার বিষয়ে ইসলামের ফকিহগণের অভিমত নিম্নরূপ:

- ১. ইতিহাসের কিছু অধ্যায়ের জ্ঞান অর্জন করা ফরজে আইন, কিছু ফরজে কিফায়া, কিছু ওয়াজিব, কিছু মানদুব (উত্তম), কিছু মুবাহ (বৈধ), কিছু মাকরুহ এবং কিছু হারাম।

- ২. সিরাতে নববীর ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা যার মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট তাদের নবী ﷺ-এর পরিচয় স্পষ্ট হয়, তা ফরজে আইন।

- ৩. এমন সব ঘটনাবলী জানা যার ওপর আকিদাগত ও ফিকহি মাসআলা এবং মুসলমানদের কল্যাণ নির্ভরশীল, তা ওয়াজিব। এজন্য উম্মতের একটি দলের ওপর এই পরিমাণ ইতিহাস চর্চা করা ফরজে কিফায়া।

আকিদাগত ও আমলি মাসআলার জ্ঞান ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থ হলো, অনেক আকিদাগত ও আমলি মাসআলা হাদিস থেকে গৃহীত, যেগুলোর বর্ণনাকারী ও সংকলকদের অবস্থা ইতিহাস সম্পর্কে অবগত না হওয়া পর্যন্ত জানা সম্ভব নয়। একইভাবে কোনো হাদিসের সনদ মুত্তাসিল (সংযুক্ত) হওয়া, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং বংশপরম্পরা ও উত্তরাধিকারের অনেক মাসআলা ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল। তাই ইতিহাসের এ অংশের জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কিফায়া।

- ৪. আল্লামা সাখাভী (রহ.) আবুল হুসাইন ফাবিস-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সিরাতে নববী স্মরণ রাখা আলেম ও আরিফদের জন্য ওয়াজিব।

- ৫. সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া এবং নেককার ব্যক্তিদের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যার মাধ্যমে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তা মানদুব।

- ৬. বাদশাহ, উজির, শাহজাদা, কবি, সাহিত্যিক এবং অন্যান্য মানুষের অবস্থা ও ঘটনাবলী জানা (যার দ্বারা দ্বীনের কোনো ক্ষতি হয় না বরং দুনিয়াবী দিক থেকে ফায়দা হয়) তা মুবাহ।

- ৭. এমন সব অনর্থক ঘটনাবলী পড়া যাতে কোনো দ্বীনি বা দুনিয়াবী উপকার নেই, তা মাকরুহ।

- ৮. প্রেম-ভালোবাসার কাহিনী, নৈতিকতা বিবর্জিত গল্প এবং ফাসিক ও ফাজির লোকদের এমন সব ঘটনা পড়া যার মাধ্যমে আকিদাগত বা আমলি ত্রুটিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা যা দ্বারা মন্দের প্রতি উস্কানি পাওয়া যায়, তা হারাম। [১]

- ৯. বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ বা যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা বা আলোচনা করা মাকরুহ। [২] কারণ এতে কোনো দুনিয়াবী বা পরকালীন ফায়দা নেই, বরং ওই মহান ব্যক্তিদের আদব ও সম্মানে ঘাটতি আসার সম্ভাবনা থাকে। যদি আকিদায় বিচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা থাকে।

---

[১] মুলাখখাস আয আল-ইলান বিত-তাওবিখ, পৃ. ৮৬-৯০

[২] আল-ইলান বিত-তাওবিখ, পৃ. ৮৮

...হলে তা হারাম। [১] তবে সাহাবীদের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের অপপ্রচারের জবাব জানতে এবং অন্যদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত করার জন্য এই বিষয়ের অধ্যয়ন এবং এ নিয়ে আলোচনা করা জায়েজ, বরং প্রয়োজনের সময় ওয়াজিব হয়ে যায়। [২]

**আলেমদের নিকট ইতিহাসের গুরুত্ব:**

আলেমদের নিকট ইতিহাস শাস্ত্রের মর্যাদা কী? এবং এই শাস্ত্রের কী কী উপকারিতা রয়েছে? নিচে আমরা এর একটি ঝলক পেশ করছি:

- ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী (রহ.) বলেন: হাদিসের মর্ম বোঝা হলো অর্ধেক জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বদের চেনা হলো অর্ধেক জ্ঞান। [৩]

- হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানি (রহ.) লিখেছেন যে, দুনিয়াবি উন্নতির জন্য চারটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি: অতীতের সাথে সম্পর্ক, চিন্তা ও কর্মের ঐক্য, শক্তির উপকরণ সংগ্রহ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। [৪]

আপনি যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন যে, উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ এই চারটি বিষয়ের জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চারটি বিষয় পর্যায়ক্রমে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ইতিহাস হলো এগুলোর প্রথম যোগসূত্র, তাই নিজের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে এই চারটি বিষয়কে বাস্তবে রূপদান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

**ইতিহাসের উপকারিতা:**

ইতিহাস অধ্যয়নের এছাড়া অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে যার মধ্যে কয়েকটি হলো:

- ইতিহাস আমাদের পরিস্থিতির অন্তর্দৃষ্টি দান করে। কোনো সম্মুখস্থ ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ করতে এবং কোনো নতুন পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে তোলে; কারণ ইতিহাস পাঠকারী অতীতে ঘটে যাওয়া এমন অনেক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকে। সে কোনো পরিস্থিতিকেই কখনো অসম্ভব বা অদ্ভুত মনে করে না, বরং অতীতে এর কোনো উদাহরণ তৎক্ষণাৎ তার সামনে ভেসে ওঠে। এমন মুহূর্তে একজন ইতিহাসবিদ এই প্রবাদটি আওড়ে নিজের মনোবল ধরে রাখেন যে: مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَ بِالْبَارِحَةِ. "এই রাতটিও গত রাতের মতোই।" ইউরোপীয়রা এমন মুহূর্তে বলে থাকে: "ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে।"

- ইতিহাস মানুষকে অভিজ্ঞ করে তোলে। একজন সেনাপতি একজন সাধারণ সৈনিকের চেয়ে এজন্য শ্রেষ্ঠ নন যে তার শক্তি ও ক্ষিপ্রতা বেশি। শক্তিতে অনেক সাধারণ সৈনিক সেনাপতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। মৌলিক পার্থক্য হলো অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার। ইতিহাস অতীতের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত করে মানুষকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শতাব্দীর অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

---

[১] আল-ইবানা আন শারিয়াতিল ফিরকাতিন নাজিয়াহ লি-ইবনে বাত্তাহ, পৃ. ২৩৫, ত. দারুর রাইয়াহ।

[২] তানভীরুল ঈমান, তরজমা তাতহীরুল জানান লি-ইবনে হাজার আল-হাইতামী, পৃ. ৭৫।

[৩] ফিতনা-এ-ইস্তিশরাক, পৃ. ৪, ত. সিদ্দিকী ট্রাস্ট করাচি।

[৪] আল্লামা ইবনে হাজার হাইতামী (রহ.) তাঁর গ্রন্থসমূহে বিবাদের বহু বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেন: "আমাদের ইমামগণ উসূলের কিতাবসমূহে স্পষ্ট করেছেন যে, সাহাবীদের মধ্যে আপোসে যে লড়াই হয়েছে, তা উল্লেখ করা উচিত নয়। তবে কেউ যেন আমাদের ওপর এই আপত্তি না করে যে, তোমরা কেন এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করলে; কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হলো সঠিক ঘটনা বর্ণনা করা এবং সেগুলো থেকে সঠিক ফলাফল বের করা।" এরপর তিনি বলেন: "আমি যা কিছু উল্লেখ করেছি, তা হকের খাতিরে বাস্তবতা অনুযায়ী উদ্ধৃত করেছি। এমন আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব এবং অত্যন্ত জরুরি বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এর মাধ্যমে সাহাবীদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ পায়।" (তানভীরুল ঈমান, তরজমা তাতহীরুল জানান, পৃ. ৭৪, ৭৫)

এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি প্রদান করে। একজন বয়োবৃদ্ধ নেতারও বড়জোর ষাট-সত্তর বছরের অভিজ্ঞতা থাকে, কিন্তু ইতিহাস শতাব্দীর অভিজ্ঞতার নির্যাস পেশ করে। জাতির নেতৃত্ব দানকারীদের জন্য ইতিহাসের অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি।

আমরা বই থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূলনীতি, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের উক্তি এবং হিকমতের কথা শিখি; কিন্তু বাস্তব জীবনে এই নিয়ম ও উক্তিগুলোর প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করা সহজ নয়। ইতিহাস পাঠকারী বাস্তব জীবনে খুঁটিনাটি বিষয়ে মূলনীতির প্রয়োগ সহজেই করতে পারে; কারণ তার সামনে পূর্ববর্তী লোক এবং সৎ নেতাদের অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান থাকে। সে জানে যে, এই ধরনের বিষয়গুলো তারা কীভাবে সামলেছিলেন।

ইতিহাস মানুষকে সচেতন রাখে। সতর্কতা ও সাবধানতার শিক্ষা দেয়। দূরদর্শিতা তৈরি করে। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ বোঝায়। শত্রুর কৌশল থেকে বাঁচার উপায় বাতলে দেয়।

আল্লামা সাখাভী (রহ.) কিছু বুজুর্গের উক্তি নকল করেছেন যে, বুদ্ধি ও জ্ঞান শেখার দুটি মাধ্যম রয়েছে: একটি লিখিত কথা, অন্যটি শোনা কথা। আর শোনা কথা যতক্ষণ পর্যন্ত লেখা না হয়, ততক্ষণ তা উপকারী হয় না; কারণ তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। [১] সুতরাং বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জনের জন্য ইতিহাস পাঠ করা অপরিহার্য।

ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা তৈরি হয়। কঠিন সময়ে পূর্ববর্তী নেতা, শাসক, বিজয়ী এবং সেনাপতিদের কর্মপন্থা চোখের সামনে থাকে।

ইতিহাস নিজের পূর্বসূরিদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে জাতীয় আত্মমর্যাদা ও গায়রাত তৈরি করে, যা সমস্ত মহৎ গুণের প্রাণ। এর বিপরীতে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা সমস্ত নিকৃষ্ট আচরণের মূল। নবীজির বাণী হলো:

“ইযা লাম তাসতাহয়ি ফাসনা’ মা শি’তা”: “যখন তোমার মধ্যে লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা করো।” [২]

যদি এই আত্মমর্যাদা ও গায়রাত না থাকে, তবে মানুষ খারাপ থেকে খারাপ কাজ করতেও লজ্জা পায় না। যদি একজন সৈয়দজাদা জানতেই না পারে যে সৈয়দ কারা এবং সে কোন খানদানের সন্তান, তবে সম্ভব যে সে যেকোনো নিচ কাজ করে ফেলবে। কিন্তু সে যদি নিজের বংশীয় আভিজাত্য সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে মরে গেলেও নিজের পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদায় কলঙ্ক লাগতে দেবে না।

জাতির সামষ্টিক বিবেকের অবস্থাও এমনই হয়। যদি জাতি জানতে পারে যে সে কোন পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকারী, তবে সে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষায় অটল থাকবে এবং বড় থেকে বড় শক্তির সামনে মাথা নত করবে না। কিন্তু যদি এই অনুভূতি মরে যায়, তবে সেই জাতির প্রতিটি ঘরে গাদ্দার ও নিচ লোক জন্ম নিতে শুরু করে এবং সেই জাতির তরী ডুবে যায়।

ইতিহাস বিগত সময়ের দুর্ঘটনা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, ধ্বংসলীলা এবং হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য দেখিয়ে মানুষের মধ্যে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি সহ্য করার সাহস তৈরি করে। মানুষ বুঝতে পারে যে দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা, মুমিনের জন্য জেলখানা।

---

[১] আল-ই’লান বিত-তাওবিখ, পৃ. ৩২

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: ৪১৮৩

এখানকার বিপদ-আপদ থেকে কারো নিস্তার নেই।

- ইতিহাস অধ্যয়ন ব্যতীত আমরা ইহুদি ও নাসারা এবং অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র, ধূর্ততা ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারি না।

- ইতিহাসের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমেই আমরা পথভ্রষ্ট দলসমূহ, সেকুলার ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদদের সেই তথাকথিত গবেষণার জাল ছিন্নভিন্ন করতে পারি যা তারা ইতিহাসের নামে উপস্থাপন করছে।

- ইতিহাস পূর্বসূরিদের ঘটনাবলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে নেক আমল এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার উদ্দীপনা ও আবেগ জাগ্রত করে।

- নিজের যোগ্যতাকে বিকশিত করার জন্য উত্তম সঙ্গ এবং মহান ব্যক্তিদের সাহচর্যের চেয়ে বেশি উপকারী আর কিছু নেই। ইতিহাস আমাদের কোনো কষ্ট ছাড়াই কখনো নবুওয়াতের যুগে নিয়ে যায়, কখনো সাহাবায়ে কেরামের যুগের বসন্ত দেখায়, কখনো শিবলী ও জুনাইদ বাগদাদীর মজলিসে বসিয়ে দেয়, আবার কখনো সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ও সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর দরবারে পৌঁছে দেয়।

হ্যাঁ, হে কল্পনা! তুমি আবার সেই সকাল-সন্ধ্যা দেখাও

হে কালের আবর্তন! তুমি পেছনের দিকে দৌড়াও

- ইতিহাস তার আগ্রহের কারণে বৈধ ও চমৎকার বিনোদন প্রদান করে, আনন্দ ও প্রশান্তি দান করে।

- ইতিহাস মানুষকে মৃত্যুর পরেও জীবিত রাখে। আল্লামা সাখাভী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, মানুষের মর্যাদা কথার মতোই। প্রবাদ আছে যে, মৃত ব্যক্তি মারা যায় কিন্তু তার আলোচনা তাকে জীবিত রাখে। রাজা-বাদশাহ ও অভিজাতরা এই অট্টালিকা, প্রাসাদ ও দুর্গ এজন্যই নির্মাণ করেন যাতে তাদের আলোচনা অবশিষ্ট থাকে। [১] এই উপকারটি ইতিহাসের মাধ্যমে আরও পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়।

- আল্লামা সাখাভী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, ইতিহাসের অনুষঙ্গে মানুষ আরও অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন—রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধরন, প্রয়োজনীয়তা এবং সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় জানতে পারে। একইভাবে নীতিশাস্ত্র একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র এবং তা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। তেমনিভাবে মন্দ অভ্যাস এবং তা থেকে বেঁচে থাকার কৌশলও বোঝা যায়। [২]

**ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা:**

অনেক উপকারিতা এমন রয়েছে যা সাধারণ ইতিহাস থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়, কেবল ইসলামী ইতিহাসের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। যেমন—ইসলামী ইতিহাস তাওহীদের দলিল; কারণ এটি কুরআন ও হাদীস থেকে ঘটনাবলি গ্রহণ করে বলে যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল মানুষ তাওহীদের আকিদা পোষণ করতেন, এরপরে শয়তান শিরক ছড়িয়েছে। [৩]

---

[১] আল-ইলান বিত-তওবীখ, পৃ. ৩৮, ৩৬

[২] আল-ইলান বিত-তওবীখ, পৃ. ৮৪

[৩] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৩, ১৩৭; সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯, ৮১; সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৪৮

এর থেকে জানা গেল যে, মানুষ তার মূল ফিতরাতে তাওহীদে বিশ্বাসী, পক্ষান্তরে শিরক হলো পরবর্তীতে আক্রমণকারী একটি কলবি ও আকিদাগত ব্যাধি। অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর ইতিহাসও সঠিক রূপে কেবল ইসলামী ইতিহাসেই পাওয়া যায়; এই সঠিক ইতিহাস বলে যে, সকল নবীই তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন।

ইসলামী ইতিহাস রিসালাতের ওপর ঈমানের দৃঢ়তারও একটি মাধ্যম; কারণ আমরা দেখি যে, মানবতা বারবার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই অল্প সময় পরপর তাদের কোনো না কোনো আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন পড়েছে। আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে এই প্রয়োজন পূরণ করেছেন। এই ঘটনাবলি ইসলামী ইতিহাসেই সঠিক রূপে সংরক্ষিত আছে।

ইসলামী ইতিহাস আমাদের সত্যের পথে সবর ও ইস্তেকামাতের শিক্ষা দেয়; কারণ এটি জানায় যে, কীভাবে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের উম্মতদের কষ্ট ও যাতনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সুতরাং আমাদের তো শেষ উম্মত হিসেবে আরও বেশি সবর ও সহনশীলতার প্রমাণ দেওয়া উচিত। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন মক্কার কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারের অভিযোগ করা হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত উম্মতদের লোহার চিরুনি দিয়ে এমনভাবে আঁচড়ানো হয়েছে যে গোশত ও হাড় আলাদা হয়ে গেছে, তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে, তবুও তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়নি। [১]

ইসলামী ইতিহাস, সীরাতে আম্বিয়া এবং সীরাতে খাতামুন নাবিয়্যীন অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর মহব্বত, তাঁর খশিয়ত, জাতির চিন্তা, দ্বীনের জন্য কোরবানি, মাখলুকের প্রতি মমতা এবং মানুষের কল্যাণকামিতাসহ অসংখ্য সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করি, যা ইতিহাসের অন্য কোনো অধ্যায় থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়।

**উলামা ও ফুকাহাদের জন্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা:**

উলামা ও ফুকাহাদের জন্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়, এর কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- ১. এই ব্যক্তিবর্গ জাতির নেতা। একজন নেতার যে অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, তা ইতিহাস অধ্যয়ন ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না।
- ১. অনেক দ্বীনি মাসআলার বুঝও ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, সীরাত এবং মানাকিবে সাহাবার অধ্যায়গুলোতে এমন অনেক ক্ষেত্র আসে যেখানে ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে।

যেমন একটি আয়াতের নাসিখ এবং অন্যটির মানসুখ হওয়া তখনই জানা সম্ভব, যখন তাদের মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। স্পষ্টতই এর জন্য ইতিহাস জানা জরুরি হবে।

একইভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যও অনেক সময় ইতিহাসের জ্ঞান উপকারে আসে। যেমন আগুনে রান্না করা খাবার খেলে অজু ভেঙে যাওয়ার মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ ছিল, কিন্তু একটি রেওয়ায়েত জানিয়ে দিয়েছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ আমল ছিল আগুনে রান্না করা জিনিসের কারণে অজু না করা। এভাবে বিরোধ দূর হয়ে গেল।

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ, হা: ৩৬১২

সনদের যাচাই-বাছাই ইলমে তারিখ (ইতিহাস বিজ্ঞান) ব্যতীত অসম্ভব। ইতিহাসই বলে দেয় যে, রাবী (বর্ণনাকারী) যে মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি কি তাঁর যুগে জীবিত ছিলেন কি না। যদি তাঁরা সমসাময়িক হন, তবে তাঁরা কি কোনো স্থানে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি না? দূর-দূরান্তে বসবাসকারী দুই রাবীর পারস্পরিক সাক্ষাৎ বা ইজাযতে হাদীস কীভাবে সম্ভব হলো? ইতিহাসের ওপর গভীর দৃষ্টি থাকলে এই সমস্ত জটিলতা দূর হয়ে যায়। [১]

**ইতিহাসের মাধ্যমে মিথ্যা রাবীদের পাকড়াও:**

ইতিহাসের মাধ্যমে মিথ্যা রাবীদের বর্ণনার অসারতাও তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হলো:

"لَمَّا اسْتَعْمَلَ الرُّوَاةُ الْكَذِبَ اسْتَعْمَلْنَا لَهُمُ التَّارِيْخَ"

"যখন রাবীরা মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করতে শুরু করল, তখন আমরা তাদের যাচাইয়ের জন্য ইতিহাসের সাহায্য নিলাম।"

হাফস বিন গিয়াস (রহ.) বলেন:

"إِذَا اتَّهَمْتُمْ فَحَاسِبُوْهُ بِالسِّنِيْنَ"

"যখন তোমরা কোনো রাবীর ব্যাপারে সন্দেহ করবে, তখন ইতিহাসের (সন-তারিখের) মাধ্যমে তাকে যাচাই করো।"

হাম্মাদ বিন যায়েদ (রহ.)-এর উক্তি হলো:

"لَمْ يُسْتَعَنْ عَلَى الْكَذَّابِيْنَ بِمِثْلِ التَّارِيْخِ"

"মিথ্যা বর্ণনা তৈরিকারীদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের চেয়ে বড় কোনো সাহায্যকারী নেই। [২]"

**ইতিহাসের মাধ্যমে জাল বর্ণনার পর্দা ফাঁস:**

ইতিহাস কীভাবে জাল বর্ণনার পর্দা ফাঁস করে দেয়, তার একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন: কিছু রাবী ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দিকে এই কথাটি সম্বন্ধ করেছেন যে, একবার হারুনুর রশীদ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য এত বেশি নাবীয (এক প্রকার পানীয়) পান করালেন যা একজন সাধারণ মানুষকে মাতাল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইমাম সাহেবের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়েনি।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) 'লিসানুল মিজান'-এ ঐতিহাসিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এই বর্ণনাটি জাল; কারণ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সাথে হারুনুর রশীদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয়। তাছাড়া তিনি দিরায়াত (যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি) থেকে কাজ নিয়ে বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সেই ব্যক্তিত্ব যিনি বলতেন: "যদি আমার এই আশঙ্কা হতো যে ঠান্ডা পানি পান করলে আমার গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বে ব্যাঘাত ঘটবে, তবে আমি সারা জীবন গরম পানি পান করেই কাটিয়ে দিতাম।" সুতরাং এমন এক মহান ব্যক্তির ব্যাপারে উল্লিখিত বর্ণনার ওপর কীভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে!! [৩]

**ইতিহাসে পারদর্শিতার মাধ্যমে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ:**

উপযুক্ত হবে যে এখানে ইতিহাসের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখা একজন মহান আলেমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাক, যা থেকে আন্দাজ করা যাবে যে, যে ব্যক্তি ইতিহাসের জ্ঞানে পারদর্শী, তিনি দ্বীনি বিষয়েও উম্মতে মুসলিমাহকে অনেক বেশি উপকার পৌঁছাতে পারেন।

---

[১] আল-ই'লান বিত-তাওবীখ, পৃ. ১৮-১৯

[২] আশ-শামারীখ, পৃ. ১৮

[৩] আল-ই'লান বিত-তাওবীখ, পৃ. ২২, বরাতে লিসানুল মিজান: ৭/৬

পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে বাগদাদের ইহুদিরা সরকারকে একটি প্রাচীন দলিল পেশ করে, যার ভিত্তিতে নবী আকরাম (সা.) খায়বার বিজয়ের পর ইহুদিদের জিযিয়া মাফ করে দিয়েছিলেন। এই দলিলে হযরত আলী, হযরত সাদ বিন মুয়াজ এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর স্বাক্ষর ছিল। এটি দেখে মুসলমানরা স্থির করে ফেলেছিল যে ইহুদিদের জিযিয়া থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের আগে এই দলিল ইমাম আবু বকর খতিব বাগদাদী (রহ.)-কে দেখানো হয়। তিনি এক নজর দেখেই এটিকে জাল ঘোষণা করেন এবং এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন:

- এই দলিলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর স্বাক্ষর রয়েছে, অথচ তিনি ফাতহে মক্কার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। [১]
- এতে সাদ বিন মুয়াজ (রা.)-এর স্বাক্ষর রয়েছে, অথচ তিনি খায়বার বিজয়ের অনেক আগে গাযওয়ায়ে খন্দকে শহীদ হয়েছিলেন। [২]

এভাবে একজন আলেমের ইতিহাস জ্ঞান ইহুদিদের প্রতারণা ও চক্রান্তের পর্দা ফাঁস করে দিল।

## নীতিমালা পরিপন্থী ইতিহাস পাঠের অপকারিতা

যেকোনো ভালো জিনিসও যদি নীতিমালার পরিপন্থী ব্যবহার করা হয়, তবে তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। মধুর মতো শেফাদানকারী বস্তুও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়, তবে তার ক্ষতিকর দিক রয়েছে। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। সেগুলো খেয়াল না করার কারণে ইতিহাস পাঠকারীরা তাদের অতীত এবং পূর্বসূরিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর কারণগুলো হলো:

- ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে পথভ্রষ্ট দলগুলোর বর্ণনাকারীরা স্থানে স্থানে নিজেদের মনগড়া বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে, যাদের স্বরূপ উন্মোচন করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। এ ধরনের বিষয়বস্তু কেবল বিজ্ঞ আলেমরাই বুঝতে পারেন। সাধারণ জ্ঞান বা সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই বর্ণনাগুলোকে বিশ্বাস করে নেয় এবং কোনো না কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির শিকার হয়।
- ইতিহাসের বিপজ্জনক বাঁকগুলোর মধ্যে একটি কারণ এটিও যে, ইতিহাস ঘটনা বর্ণনা করে কিন্তু ঘটনার কারণ, প্রেক্ষাপট এবং যৌক্তিকতার ওপর খুব কমই আলোকপাত করে, যার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

---

[১] এ বিষয়ে দ্বিতীয় মতটি হলো তিনি ৭ হিজরিতে গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন, তবে হিজরত করতে পারেননি। তবে দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করা হলেও কথাটি একই থাকে; কারণ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সর্বসম্মতিক্রমে গাযওয়ায়ে খায়বারে শরিক ছিলেন না বরং ওই সময়ে মক্কাতেই ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/৪০৬)

[২] খতিব বাগদাদীর এই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণটি ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) উদ্ধৃত করেছেন। (আল-মুনতাযাম লি ইবনিল জাওযী: ১৬/১২৯)

এর থেকে অনেক বেশি পরিচিত ঘটনা অষ্টম হিজরি শতাব্দীর, যা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদিরা সাহাবায়ে কেরামের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দলিল পেশ করেছিল যাতে খায়বারের ইহুদিদের জিযিয়া মাফ করার কথা ছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই দলিলটি জাল হওয়ার বেশ কিছু প্রমাণ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি দলিল ছিল এই যে, দলিলে জিযিয়া মাফ করার কথা উল্লেখ আছে অথচ জিযিয়া ৯ হিজরিতে গাযওয়ায়ে তাবুকের সময় প্রবর্তিত হয়েছিল। আরেকটি দলিল ছিল এই যে, এই দলিলে ইহুদিদের থেকে বেগার না নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল, অথচ মুসলমানদের মধ্যে ইহুদি বা অন্য কারো থেকে বেগার নেওয়ার কোনো রেওয়াজ ছিল না। নবী আকরাম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম এই জুলুম ও জবরদস্তি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। বেগার নেওয়ার প্রথা পরবর্তীকালের জালেম বাদশাহদের যুগে শুরু হয়েছে। (যাদুল মাআদ: ৩/১৩৮)

সতর্কতা, সূক্ষ্মদর্শিতা এবং ইনসাফের পথ অবলম্বন না করলে বাস্তব-বিরোধী কল্পকাহিনী জন্ম নিতে পারে। নিজের অনুমান থেকে তিলকে তাল বানানো সম্ভব। এ ধরণের বিশৃঙ্খলা সাধারণত দুটি কারণে হয়ে থাকে:

- (ক) কোনো ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে

- (খ) বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে

উদাহরণস্বরূপ, একজন ভদ্র চেহারার মানুষকে প্রতিদিন দুপুর একটায় বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। একজন ব্যক্তি এটি দেখে অনুমান করেন যে, তিনি একজন গোয়েন্দা পুলিশের কর্মী যিনি কাউকে নজরদারি করছেন। দ্বিতীয় এক ব্যক্তির মন্তব্য হলো, তিনি একজন সাধারণ মানুষ যিনি পায়চারি করতে বের হয়েছেন। কেউ এও বলতে পারেন যে, তিনি একজন মানসিক রোগী যিনি এই সময়ে অহেতুক এখানে এসে হাজির হন। কোনো ব্যক্তি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এও বলতে পারেন যে, তিনি একজন সন্ত্রাসী এবং নাশকতার সুযোগ খুঁজছেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে এই সবগুলিই ভুল। তিনি হয়তো একজন চাকুরিজীবী, সেই সময়ে অফিসে যাওয়ার জন্য বাসের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। জানা গেল যে, একটি ঘটনা থেকে অনেক ধরণের অনুমান করা যেতে পারে এবং অনেক কল্পকাহিনীও তৈরি হতে পারে। ইতিহাস হলো ঘটনাবলির সমষ্টির নাম। কোনো ঘটনা থেকে কী ফলাফল বের করা উচিত এবং সঠিকতম মন্তব্য কী হতে পারে? এর সিদ্ধান্ত গভীর অধ্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ অবগতির পরেই নেওয়া উচিত। মন্তব্যের এই পর্যায়টি ঐতিহাসিককেই অতিক্রম করতে হয়। যদি তিনি সতর্ক এবং ইনসাফপ্রিয় না হন, তবে এমন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর ধারণা দেওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেন।

- ৩. মানুষ ইতিহাস এবং ইতিহাসের দর্শন (যার বড় একটি অংশ ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত) পড়ে এবং পড়ায়, কিন্তু ইতিহাসের সেই মূলনীতিগুলো সম্পর্কে সাধারণত অজ্ঞ থাকে যা মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রণয়ন করেছেন। যেকোনো জ্ঞান ও শিল্পকে যদি তার মূলনীতির লঙ্ঘন করে গ্রহণ করা হয়, তবে অবশ্যই তা বিভ্রান্তি ও বক্র চিন্তারই জন্ম দেবে।

- ৪. ইতিহাস এবং ইতিহাসের মূলনীতিরও আগে একজন মুসলমানের আকিদা, শরয়ী বিধান, সীরাতে রাসূল, উসূলে হাদীস এবং ফন-এ-রিজাল এর প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু এখানে অবস্থা এই যে, মানুষ সঠিক আকিদা সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকে। অথচ যেকোনো ইসলামী বিষয়ের ওপর কাজ করার জন্য উল্লিখিত জ্ঞানসমূহ অপরিহার্য। যখন এই মূলনীতিগুলো বর্জন করা হয়, তখন ইতিহাসের আঁকাবাঁকা গিরিপথে পথ হারানো এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির শিকার হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক।

- ৫. আমাদের অধিকাংশ ইতিহাসবিদ আরবি ও ফারসি না জানার কারণে ইতিহাসের মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না এবং উর্দু বা ইংরেজি অনুবাদের ওপর নির্ভর করেন। এভাবে জ্ঞানের গভীরতা অর্জিত হয় না।

- ৬. ইংরেজি পড়ার অভ্যাসের কারণে ইতিহাস অধ্যয়নকারী অধিকাংশ মানুষ প্রাচ্যবিদদের (মস্তাশরিকিন) বই থেকে উপকৃত হতে শুরু করেন, যা জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণার আড়ালে আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষে ভরা থাকে। এরপর দ্বীন ও ঈমানের আল্লাহই হাফেজ।

- ৭. কিছু ব্যক্তি ইলমে আসমাউর রিজাল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকেও ওহীর মর্যাদা দিতে শুরু করেন।

কিছু লোক বর্ণনা শাস্ত্রের (ফন-এ রিওয়ায়াত) অজ্ঞতার কারণে কোনো বর্ণনায় উদ্বেগজনক বিষয় দেখে বর্ণনাকারীর ব্যাপারে কঠোর মতামত পোষণ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সীরাত ও ইতিহাসের মৌলিক উৎসগুলোকেই মুনাফিক ও মজুসীদের (অগ্নিউপাসক) রূপকথা বলে আখ্যায়িত করে এবং কেউ কেউ হাদীস ভাণ্ডারে এই ধরণের বিষয়বস্তু পেয়ে হাদীস অস্বীকার পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

**ইসলামী ঐতিহাসিকের গুণাবলী শেখ আলী তানতাভী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে:**

ইতিহাসের এই সকল বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে প্রখ্যাত মিশরীয় আলেম শেখ আলী তানতাভী (রহ.) বলেন:

“ঐতিহাসিকদের বর্ণনা সাধারণ মানের হয়ে থাকে, ইলমী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বর্ণনা হলো মুহাদ্দিসগণের। এই কারণেই আমাদের ইতিহাসের প্রথম উৎস হলো তা-ই যা মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা ও ইলম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তাকে ঐতিহাসিক হিসেবে গণ্য করা যায় না।”

আরও তিনি লিখেন:

“প্রত্যেক সেই বিশ্লেষক যে কোনো আলোচনার শেষে তাবারীর পৃষ্ঠাগুলোর উদ্ধৃতি দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে, সে মূলত এই কথাই প্রকাশ করছে যে সে অন্ধকার রাতে হাতড়ে বেড়ানোর অভ্যস্ত। সে জানে না কী গ্রহণ করতে হবে আর কী বর্জন করতে হবে। ইসলামী ঐতিহাসিক বা ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক কেবল সেই ব্যক্তিই হতে পারে যে ফন-এ রিজাল (বর্ণনাকারীদের জীবনী শাস্ত্র) সম্পর্কে অবগত, তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, ইলমে হাদীস ও এর মূলনীতিসমূহ জানে, আরবি ভাষায় দক্ষ, আরবদের বাচনভঙ্গির প্রকাশ্য অর্থ ও অন্তর্নিহিত মর্মের পার্থক্য করতে পারে, এর ইঙ্গিত ও ইশারা বুঝতে পারে, গোঁড়ামি ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত এবং সত্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষী হয়।”

যদি সে এই গুণাবলী বর্জিত হয়, তবে সে ইতিহাসের ক্ষেত্রে জাহেল (অজ্ঞ) বরং প্রতারক হিসেবে গণ্য হবে, চাই সে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক হোক বা বড় বড় ডিগ্রির অধিকারী হোক। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তো যেকোনো ব্যক্তিকে ডিগ্রি দেখে শিক্ষক নিযুক্ত করে দেয় এবং এই ধরণের ডিগ্রি জালিয়াতির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু কোনো সরকার এটা করতে পারে না যে, একজন জাহেলকে আলেম বানিয়ে দেবে, একজন সংকীর্ণমনা ব্যক্তিকে পবিত্র করবে অথবা একজন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মানুষ বানিয়ে দেবে। [১]

**ইতিহাসের প্রকারভেদ**

ইতিহাসের মৌলিকভাবে দুটি প্রকার রয়েছে: সাধারণ ইতিহাস (তারিখে আম) এবং বিশেষ ইতিহাস (তারিখে খাস)। সাধারণ ইতিহাসে সারা বিশ্বের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেমন আমরা তারিখে ইয়াকুবীকে সাধারণ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। বিশেষ ইতিহাস হলো কোনো বিশেষ জাতি, রাজত্ব বা দেশের ইতিহাস। যেমন: ইসলামের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, চীনের ইতিহাস, তুরস্কের ইতিহাস ইত্যাদি।

---

[১] কাসাস মিনাত তারিখ লিত-তানতাভী, মুকাদ্দিমা, পৃষ্ঠা ১৩, ১৪, তবা (প্রকাশনা) দারুল মানারা আস-সাউদিয়া।

**ইসলামের ইতিহাস নাকি মুসলিমদের ইতিহাস:**

ইতিহাসে বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো "ইসলামের ইতিহাস"। "ইসলামের ইতিহাস" প্রকৃতপক্ষে "মুসলিমদের ইতিহাস"; কারণ এটি কোনো বিশুদ্ধ ধর্মের ইতিহাস নয় যেমনটি "ইসলামের ইতিহাস" এর বাহ্যিক শব্দ থেকে অনুভূত হয়। ধর্মের ইতিহাস সেটিই হয় যাতে কোনো ধর্মের সূচনা, তার প্রসার, তার প্রতিষ্ঠাতার জীবনকাল এবং তার সেই গুরুত্বপূর্ণ অনুসারীদের আলোচনা থাকে যারা ধর্ম প্রচারে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া কোনো ধর্ম থেকে মানুষের বিমুখ হওয়া, তার গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য হওয়া এবং তার দল-উপদলের বিন্যাসও সময়ের ক্রমানুসারে পর্যালোচনা করা হয়। যেমন আল্লামা শাহরাস্তানির 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল', বিভিন্ন ধর্মীয় ফেরকার ইতিহাস। বর্তমান যুগে হযরত মুফতি তাকি উসমানি দা.বা. এর সংকলন 'ঈসায়িয়াত কেয়া হ্যায়?' (খ্রিস্টধর্ম কী?) খ্রিস্টধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

"ধর্মের ইতিহাস" এর মর্মার্থ বুঝে নেওয়ার পর যদি চিন্তা করি, তবে সীরাতুন্নবী এবং সীরাতে সাহাবাকে নিঃসন্দেহে ধর্মের ইতিহাস বলা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী যুগের মুসলমানদের অবস্থাকে ধর্মের ইতিহাস বলা যায় না।

মানছি যে পরবর্তী যুগগুলোতেও ধর্মের অনেক কাজ হয়েছে যেমন ইসলামের প্রসারের প্রচেষ্টা, অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো, মাদরাসা, মসজিদ এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা, ইলমি প্রচেষ্টা। কিন্তু সালতানাত ও রাজনীতির বাকি বিষয়গুলো নিছক পার্থিব বিষয় ছিল এবং সেগুলোকে ইতিহাসেও সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত। সুতরাং আমরা মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ, রাজনৈতিক বিপ্লব, পারিবারিক কলহ এবং ফাসেক ও জালেম বাদশাহদের অবস্থাকে ধর্মের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না।

ন্যায়সঙ্গত কথা হলো, এটি ইসলাম বিশ্বাসীদের ইতিহাস যাতে উত্থানও আছে আবার পতনও আছে; ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততাও আছে আবার ধর্ম থেকে দূরত্বও আছে।

চৌদ্দ শতাব্দীতে যে সকল অসাধারণ ভালো বা মন্দ পরিস্থিতি সামনে এসেছে এবং কল্যাণ বা অকল্যাণের যে কাজই মুসলমানরা সম্পাদন করেছে, যখন কোনো ইসলামী ইতিহাসের কিতাবে সেগুলোর উল্লেখ আসে, তখন তা মুসলিমদের ইতিহাস হিসেবেই আসে। এজন্য ইসলামের সাধারণ ইতিহাসের কিতাবসমূহ যেমন: 'তারিখে তাবারী', 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' এবং 'আল-কামিল ফিত তারিখ' ইত্যাদিকে একটি জাতির ইতিহাস হিসেবে পড়া উচিত, ধর্মের ইতিহাস হিসেবে নয়।

**ইতিহাসের অন্যান্য প্রকার:**

ইতিহাসের অনেক উপ-প্রকার রয়েছে, যেমন:

- তারিখে সাহাবা, তারিখে খুলাফা, তারিখুল মুলুক, তারিখুদ দুওয়াল, তারিখে তামাদ্দুন।
- ফেরকার দিক থেকেও বিভাজন রয়েছে: তারিখে সুন্নাহ, তারিখে শিয়া, তারিখে খাওয়ারিজ, তারিখে কারামিতা, তারিখে মুতাজিলা।
- তবকাতের (স্তর) দিক থেকেও অনেক প্রকার রয়েছে: তবকাতে আহনাফ, তবকাতে শাফেয়িয়া, তবকাতে মালিকিয়া, তবকাতে হানাবিলা।
- পদমর্যাদা ও পেশার দিক থেকেও অনেক শাখা রয়েছে: তারিখে উযারা, তারিখে ফুকাহা, তারিখে কুযাত, তারিখে নুহাত, তারিখে...

প্রথম অংশ

আউলিয়া, কবিদের ইতিহাস, সাহিত্যিকদের ইতিহাস।

ইতিহাসের কিছু আধুনিক বিষয় হলো: মুসলিম বিশ্বের অবস্থা, ইসলামী আন্দোলনসমূহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ইসলামী মিডিয়া, প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস, বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিহাস।

□□□

**ইতিহাস রচনার উৎসসমূহ**

ঐতিহাসিক উপাদান সর্বদা চার প্রকার উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়:

(২) বর্ণিত নিদর্শন অর্থাৎ বংশপরম্পরায় চলে আসা বর্ণনা

(৪) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

(১) ঐতিহাসিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ

(৩) সুসংবদ্ধ নিদর্শন অর্থাৎ লিখিত উপাদান

**১. ঐতিহাসিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ:**

ঐতিহাসিক যখন তার নিজের জীবন বা তার সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাকে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ বলা হয়। যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন বাবরের 'তুজুক-ই-বাবরি' এবং আফগানিস্তানের শাসক আমির আব্দুর রহমানের 'তাজুত তাওয়ারিখ' তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রচিত। ঐতিহাসিকের সেই বর্ণনা যা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে হয়, তাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়, যদি তা অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের ঐক্যমত্যপূর্ণ বর্ণনা এবং অন্যান্য স্পষ্ট আলামত ও প্রমাণের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

**২. বর্ণিত নিদর্শন (বংশপরম্পরায় চলে আসা বর্ণনা):**

ঐতিহাসিক উৎসের দ্বিতীয় প্রকারকে বর্ণিত নিদর্শন বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই উপাদান যা ঐতিহাসিক তার সমসাময়িক লোকদের কাছ থেকে শোনেন। এদের মধ্যে দরবারের আমীর-ওমরাহ, শাসক, রাষ্ট্রদূত, আলেম, সেনা কর্মকর্তা, সৈনিক, ব্যবসায়ী, পর্যটক, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সেই সাধারণ মানুষও অন্তর্ভুক্ত থাকে যারা বর্তমান অবস্থা বা নিকট অতীত সম্পর্কে সরাসরি অবগত থাকেন এবং যাদের ওপর আস্থা রাখা যায়।

**৩. সুসংবদ্ধ নিদর্শন অর্থাৎ লিখিত উপাদান:**

এটা স্পষ্ট যে, ঐতিহাসিক প্রতিটি বিষয় নিজে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না, আবার প্রতিটি কথা কোনো বর্ণনাকারীর কাছ থেকেও শুনতে পারেন না। তাকে বিস্তারিত জানার জন্য অন্যান্য উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়, বিশেষ করে নিজের আগের সময়ের ইতিহাস তো তিনি অন্যান্য উৎস থেকেই গ্রহণ করেন। এই উৎসগুলো লিখিত আকারে থাকলে সেগুলোকে সুসংবদ্ধ নিদর্শন বলা হয়। এর মধ্যে চিঠিপত্র, ফরমান, রসিদ, পত্রালাপ, চুক্তিপত্র, সরকারি রেকর্ড এবং সব ধরনের লিখিত উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঐতিহাসিকদের জন্য গত সময়ের বইপত্র থেকে উপকৃত হওয়া অপরিহার্য; কারণ প্রায়শই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের কারণে গত সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জানার আর কোনো মাধ্যম থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে গত সময়ের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো থেকেই উপকৃত হওয়া হয়, যেমন ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম হিজরি শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ: আল্লামা ইবনুল জাওজি, আল্লামা ইবনুল আসির এবং হাফেজ জাহাবি রহিমাহুল্লাহ চতুর্থ হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত...

...এর অবস্থার অধিকাংশ বর্ণনা 'তারিখে তাবারী' থেকে নেওয়া হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'-তে সপ্তম শতাব্দীর তাতার ফিতনার বর্ণনার বিশেষ অংশ আল্লামা ইবনে আসীর রহ.-এর 'আল-কামিল ফিত-তারিখ' থেকে নিয়েছেন। একজন ভালো ঐতিহাসিক সব ধরনের লিখিত উপাদানকে গুরুত্ব দেন, শুধুমাত্র লাইব্রেরিতে উপলব্ধ বই থেকে উপাদান নকল করার ওপর নির্ভর করেন না। এছাড়া তিনি প্রতিটি সেই লেখা বা বইয়ের রেফারেন্স অবশ্যই দেন যেখান থেকে উপাদান নেওয়া হয়েছে।

**৪. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন:**

ঐতিহাসিক উৎসের চতুর্থ মাধ্যম হলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, যার মধ্যে প্রাচীন প্রাসাদ, পুরনো কেল্লা, ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি, খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার নিদর্শনসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে কোনো ঘটনার আলামত গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজ নেওয়া যেতে পারে, তবে এগুলো থেকে কোনো সুসংগত ঘটনা গঠন করা অসম্ভব হয়।

□□□

**ইতিহাস রচনার পদ্ধতিসমূহ**

ইতিহাস রচনা তিন পদ্ধতির হয়ে থাকে:

**১. তারিখ বির-রিওয়ায়াহ (বর্ণনাভিত্তিক ইতিহাস):**

এতে বর্ণনাগুলোকে হুবহু নকল করে দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক নিজের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা বা মন্তব্য করেন না। তারিখ বির-রিওয়ায়াহ এই দিক থেকে উপকারী যে, এতে ঐতিহাসিকের পক্ষ থেকে কোনো কমবেশি বা খেয়ানতের সম্ভাবনা কম থাকে, ঐতিহাসিকের অবস্থান থাকে কেবল একজন বর্ণনাকারীর। ঘটনা থেকে ফলাফল বের করা পাঠকদের কাজ। এভাবে অতীতের ইলমি ঐতিহ্য হুবহু পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে যায়। প্রাচীন ইতিহাসের বই যেমন 'তাবাকাতে ইবনে সাদ', 'তারিখে তাবারী', 'আনসাবুল আশরাফ' এবং 'ফুতুহুল বুলদান' ইত্যাদি এই পদ্ধতির। এগুলোতে কেবল বর্ণনাকে সনদের সাথে নকল করে দেওয়া হয়েছে। সনদ এবং ঘটনার নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য হওয়ার ফয়সালা পাঠকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তারিখ বির-রিওয়ায়াহ-এর দুর্বল দিক হলো এই যে, এতে অনেক সময় বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী এবং অকল্পনীয় বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পাঠকরা যদি সঠিক বিচারবুদ্ধির অধিকারী না হন, বর্ণনা ও যুক্তির মূলনীতির (উসূলে রিওয়ায়াত ও দিরায়াত) ওপর তাদের দৃষ্টি না থাকে এবং তারা সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারেন, তবে তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন তারিখে তাবারী, আনসাবুল আশরাফ এবং তাবাকাতে ইবনে সাদ ইত্যাদিতে এমন ডজন ডজন দুর্বল বর্ণনা রয়েছে যেগুলোকে অন্যান্য বর্ণনার সাথে তুলনা না করে দেখলে চরম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষকে এ ধরনের বড় ঐতিহাসিক কিতাবগুলো পড়তে নিষেধ করেন; কারণ সেগুলো বিশেষজ্ঞদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য নয়। যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমের অনুবাদ পড়ে নিজে প্রতিটি হাদিস থেকে ইচ্ছামতো ফলাফল বের করতে শুরু করলে তার পদে পদে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে, ঠিক তেমনি তারিখে তাবারী এবং তাবাকাতে ইবনে সাদের মতো কিতাবগুলোর অনুবাদ...

পড়েও সাধারণ মানুষ মারাত্মক পদস্খলনের শিকার হতে পারে।

**তারিখ বিদ-দিরায়াহ:**

এতে ঐতিহাসিক কিছু বর্ণনা বা আলামত গ্রহণ করে কোনো ঘটনার যোগসূত্র মেলাতে থাকেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, অন্যান্য প্রমাণ এবং কিছু অনুমানের ভিত্তিতে একটি ইতিহাস সংকলন করেন।

তারিখ বিদ-দিরায়াহ-এর ইতিবাচক দিক হলো এতে অবিশ্বাস্য কথার অবকাশ থাকে না। নেতিবাচক দিক হলো, অনেক সময় এভাবে সংকলিত ইতিহাসের কোনো মজবুত ভিত্তি থাকে না। এর পুরো কৃতিত্ব ঐতিহাসিকের নিজস্ব ধারণা ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে। তিনি নিজের ধারণা অনুযায়ী যে বর্ণনা ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যা ইচ্ছা বর্জন করেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে মিশর, ব্যাবিলন, হরপ্পা, ট্যাক্সিলা, মহেঞ্জোদারো এবং প্রাক-সভ্যতা যুগের যে ইতিহাসগুলো সংকলন করেছেন, যাতে মানুষকে লক্ষ লক্ষ বছর আগের সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেগুলো তারিখ বিদ-দিরায়াহ-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর কোনো মজবুত ভিত্তি একেবারেই নেই।

যেহেতু মানুষ পক্ষপাতিত্ব ও সংকীর্ণতা থেকে খুব কমই মুক্ত থাকে, তাই 'দিরায়াহ' বা যুক্তির ব্যবহার ইনসাফের সাথে খুব কমই হয়ে থাকে। সাধারণত দিরায়াহ-এর নামে নিজের রুচি, ঝোঁক এবং আবেগের অনুকূল দিকগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এজন্য জরুরি হলো যে, বর্ণনা বা রিওয়ায়াতের ওপর অনুমান ও দিরায়াহ-কে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। দিরায়াহ-কে শর্ত ও নিয়মনীতির অনুসারী করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, মুতাওয়াতির বা সহীহ বর্ণনাগুলোকে দিরায়াহ-এর ভিত্তিতে বর্জন করা যাবে না। একইভাবে যঈফ বর্ণনাগুলোকেও দিরায়াহ-এর ভিত্তিতে কেবল তখনই প্রত্যাখ্যান করা যাবে যখন তাতে কোনো অসম্ভব বা অত্যন্ত অযৌক্তিক বিষয়ের উল্লেখ থাকবে। কোনো বিষয় অদ্ভুত, খারাপ, অস্বাভাবিক বা প্রথা-বিরুদ্ধ হওয়া কোনো বর্ণনা প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে না; কারণ ইতিহাসে সাধারণত অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোই লিপিবদ্ধ করা হয়।

যদি দিরায়াহ-এর ভিত্তিতে বর্ণনাগুলো প্রত্যাখ্যান করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে ইতিহাসের একটি বড় অংশ বর্জন করে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে, যা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। এমন অনুমাননির্ভর ইতিহাসে এত বেশি মতভেদ সৃষ্টি হবে যে, কোনো ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট রূপে প্রমাণ করা কঠিনই নয় বরং অসম্ভব হয়ে পড়বে।

**তারিখ বির-রিওয়ায়াহ ওয়াদ-দিরায়াহ:**

তারিখ বির-রিওয়ায়াহ ওয়াদ-দিরায়াহ হলো বর্ণনা এবং যৌক্তিক সম্ভাবনা উভয়কে সাথে নিয়ে চলা। মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর রাখা হবে, তবে ভিত্তিহীন কথাগুলো সংগ্রহ করা হবে না। যেখানে কোনো সন্দেহজনক বর্ণনা উদ্ধৃত করতে হবে, সেখানে পাঠকদের সতর্ক করে দিতে হবে। প্রতিটি বর্ণনাকে বুদ্ধির তুলাদণ্ডে পরিমাপ করতে হবে। ঘটনার বাস্তবতার কাছাকাছি এবং নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। এটি ইতিহাস রচনার সর্বোত্তম পদ্ধতি। হাফিজ ইবনে কাসীরের 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া', হাফিজ যাহাবীর 'তারিখুল ইসলাম' এবং আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে খালদুনের 'তারিখ ইবনে খালদুন' অনেকাংশেই এই পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে।

## ইতিহাস রচনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

ইতিহাস রচনা একটি অত্যন্ত বড় দায়িত্ব, তাই ইতিহাসবিদগণ ঐতিহাসিকের গুণাবলী ও শর্তাবলী অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে ঐতিহাসিক তার কর্তব্যের প্রতি সুবিচার করতে পারেন।

### ঐতিহাসিকের গুণাবলী:

ইতিহাসবিদদের বক্তব্য হলো, ঐতিহাসিককে লিখন ও বক্তৃতার আদব সম্পর্কে অবগত হতে হবে। ভাষা ও বর্ণনার শৈলীর ওপর পূর্ণ দখল থাকতে হবে। পক্ষপাতিত্ব, মিথ্যা, প্রতারণা ও অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত হতে হবে। কবিতার সাথে এমন সামঞ্জস্য থাকা জরুরি যাতে কবিতার মূল মর্ম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন; কারণ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা কাব্যিক আকারে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকের জন্য জরুরি হলো তিনি বলা ও লেখায় পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত কথোপকথনে অভ্যস্ত হবেন, অসার কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন। পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হবেন। বর্ণনাগুলোর অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার সাহস রাখবেন। এর পাশাপাশি ঐতিহাসিককে ভূগোল, সভ্যতা, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, সামরিক বিষয়াবলী এবং সামরিক পরিভাষা সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

ঐতিহাসিককে বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। বিশেষ করে সেই জাতির ভাষা জানা আবশ্যক যার ইতিহাস তিনি সংকলন করতে চান। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের ইতিহাস সংকলন করার জন্য আরবি জানা জরুরি, মুঘল সালতানাতে হিন্দের ইতিহাস লেখার জন্য ফারসি জানা জরুরি, অন্যথায় মূল উৎসসমূহ পড়া সম্ভব হবে না।

### ঐতিহাসিক বর্ণনা উদ্ধৃত করার শর্তাবলী:

- (১) ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীর মূল শব্দগুলো উদ্ধৃত করবেন, নিজের শব্দে মর্ম বর্ণনা করবেন না।
- (৪) ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীর নাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। (যদি কোনো কিতাব হয় তবে তার স্পষ্ট রেফারেন্স থাকতে হবে।)
- (২) ঘটনাটি যে শব্দে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, ইতিহাস রচয়িতার কাছে সেগুলোর মর্ম ভালোভাবে স্পষ্ট হতে হবে।
- (৩) ঘটনার ব্যাখ্যায় ভারসাম্য ও নিরপেক্ষ ভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে।
- (৫) যদি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো কিছু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর বিশ্বাস রাখা হবে এবং সেই বর্ণনাটি বর্জন করা হবে; কারণ যে গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রম কুরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে হয়েছে, তা ইতিহাসে হতে পারে না।
- (৫) যেখানে পূর্বসূরীদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের ওপর কোনো নিন্দা, অপবাদ বা বিদ্রূপ প্রকাশ পায়, তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং সেখানে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার সাথে ফয়সালা করুন; কারণ এমন লোক যাদের নেক ও নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তাদেরকে কোনো একজন ব্যক্তির অপবাদের কারণে অভিযুক্ত মনে করা যাবে না। [১]

---

[১] কায়িদাতুন ফিল মুয়াররিখীন লিল আল্লামা তাজউদ্দীন আস-সুবকী, পৃ. ৩০, ত. দারুল বাশায়ের বৈরুত।

**জীবনী রচনার শর্তাবলি:**

(১) যার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, তার ইলমি, দ্বীনি, আদর্শিক অবস্থা এবং অন্যান্য গুণাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

(২) তার সম্পর্কে প্রশংসামূলক বা নিন্দামূলক শব্দ এবং উপাধি ও আদব ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

(৩) জীবনীকারের মেজাজ ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া জরুরি, অর্থাৎ তিনি যেন কারো প্রতি ভালোবাসার কারণে তার প্রশংসা করতে গিয়ে অথবা কারো প্রতি ঘৃণার কারণে তার নিন্দা করতে গিয়ে আবেগ দ্বারা প্রভাবিত না হন। ঐতিহাসিকের কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব থাকা উচিত নয় যার কারণে তিনি তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন, আবার এমন শত্রুতাও থাকা উচিত নয় যার কারণে তিনি তার মর্যাদা কমিয়ে দেন।

(৪) জীবনীকারের স্মরণশক্তি ভালো হওয়া জরুরি। [১]

**ইতিহাস বর্ণনা এবং হাদিস বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য:**

হাদিস বর্ণনা এবং ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত অভিন্ন। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর বিবেকবান হওয়া, প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়া, নির্ভুল হওয়া এবং আমানতদার হওয়া। তবে কিছু ক্ষেত্রে ইতিহাস বর্ণনা হাদিস বর্ণনা থেকে ভিন্ন।

উদাহরণস্বরূপ, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের তাহকিক বা অনুসন্ধানের ওপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে কেবল বিশেষ কিছু স্থানে সনদের তাহকিক জরুরি। সেগুলো ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে নয়। যেসব স্থানে সনদের তাহকিক আবশ্যক সেগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- এমন সব বর্ণনার ক্ষেত্রে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র ও গুণাবলি সম্পর্কিত।
- এমন সব বর্ণনার ক্ষেত্রে যা থেকে ইসলামি ব্যক্তিত্ব, সালাফে সালেহীন এবং ইসলামের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের ওপর আপত্তির দিক উন্মোচিত হতে পারে।
- এমন সব বর্ণনার ক্ষেত্রে যার কারণে আকিদা এবং হালাল-হারামের মাসআলার ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া ঐতিহাসিক বর্ণনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা অবলম্বন করা যেতে পারে এবং দুর্বল বর্ণনাও গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত থাকে। ঐতিহাসিক মানুষকে কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং অকল্যাণ থেকে সতর্ক করার জন্যও দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করতে পারেন, তবে তার উচিত হবে এমন বর্ণনার দুর্বলতা স্পষ্ট করে দেওয়া। [২] এই কারণেই গবেষক উলামায়ে কেরাম ওয়াকিদি এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মতো ঐতিহাসিক বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকে শরয়ি বিষয়ের আলোচনায় গ্রহণ করেন না, তবে সিরাত ও মাগাজির খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের বর্ণনা থেকে উপকৃত হওয়া যেতে পারে। [৩]

ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি বিষয়ে (সাধারণ তথ্য) অমুসলিমদের থেকেও বর্ণনা নেওয়া যেতে পারে। নববী ইরশাদ হলো: “তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই।” [৪]

---

[১] আল-ই’লান বিত-তাওবিখ, পৃ. ১৩০; কায়িদাতুন ফিল মুয়াররিখিন লিল আল্লামা তাজউদ্দীন আস-সুবকি, পৃ. ৬, ৭, তাবা দারুল বাশাইর বৈরুত।

[২] আল-মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ, আল্লামা কাফীজি, পৃ. ৭১; দিরাসাত তারিখিয়্যাহ লিদ-দুকতুর আকরাম জিয়া আল-উমারি, পৃ. ২৭।

[৩] এই কারণেই ইমাম বুখারীর মতো অত্যন্ত কঠোর মুহাদ্দিস সহীহ বুখারীতে মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে ২৩টি স্থানে তালীকান বর্ণনা নিয়েছেন এবং তার ঐতিহাসিক উক্তিগুলো থেকে দলিল পেশ করেছেন।

[৪] আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন: “বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করো এবং এতে কোনো দোষ নেই।” (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৪৬১, কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া, বাব মা যুকিরা আন বনী ইসরাঈল)।

## ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ

### রাসায়েল ওয়াকিদি:

মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি ইতিহাসের বড় হাফেজদের মধ্যে গণ্য হন। তাঁর নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো প্রসিদ্ধ:

- আল-মাগাজি
- আস-সিরাহ
- আজওয়াজুন নবী
- আর-রিদ্দাহ
- আখবারু মক্কাহ
- আত-তাবাকাত
- ফুতুহুল ইরাক
- ফুতুহুল শাম
- মাকতালুল হুসাইন
- আল-জামাল
- সিফফিন

ওয়াকিদি ১৩০ হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফিয়ান সাওরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘ সময় হাদিস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা সংগ্রহে অতিবাহিত করেন। ১৮০ হিজরিতে তিনি বাগদাদে চলে যান। ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি ঐতিহাসিক স্থানগুলোর সাথে সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো যাচাই করার জন্য সেখানে যেতেন। হারুনুর রশিদ এমন একজন আলেমের সন্ধানে ছিলেন যিনি সীরাত এবং নবুওয়াতের যুগের নিদর্শন সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। উজির খালিদ বিন ইয়াহইয়া বারমাকি ওয়াকিদির সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবে ওয়াকিদি আব্বাসীয় দরবারে প্রবেশের সুযোগ পান। মামুনের যুগে ওয়াকিদির মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বাগদাদের কাজি নিযুক্ত হন। ২০৭ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ওয়াকিদির গ্রন্থসমূহ উত্তম বর্ণনায় ভরপুর। "আল-মাগাজি" বিশেষ করে জিহাদি অভিযানসমূহের ঘটনাবলির এমন এক উচ্চমানের সংকলন যে, এর যত প্রশংসাই করা হোক না কেন তা কম হবে। কিন্তু অন্যদিকে "মাকতালুল হুসাইন", "আল-জামাল" এবং "কিতাবুস সিফফিন"-এ অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে প্রচুর পরিমাণে উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ওয়াকিদিকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং ইবনে নাদিম (যিনি নিজে শিয়া ছিলেন) তাঁকে শিয়া বলে অভিহিত করেছেন। যদিও ইবনে নাদিমের এই বক্তব্য সঠিক নয় এবং গবেষকগণ এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তবে বাস্তবতা হলো ওয়াকিদির অনেক বর্ণনা সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের অনুপযুক্ত চিত্র তুলে ধরে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ সাধারণত ওয়াকিদির নিকট থেকে হাদিস গ্রহণ করতে সতর্কতা অবলম্বন করতেন, তবে তাঁরা ওয়াকিদির সেই ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর ওপর নির্ভর করতেন যা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সমালোচনা থেকে মুক্ত ছিল।

আল্লামা খায়রুদ্দিন আজ-জিরিকলির মতে, অধিকাংশ পুস্তিকা ভুলভাবে ওয়াকিদির দিকে নিসবত করা হয়েছে। তবে সেই বর্ণনাগুলো নিঃসন্দেহে ওয়াকিদির যা তাঁর ছাত্র মুহাম্মদ বিন সাদ "তাবাকাত ইবনে সাদ"-এ বর্ণনা করেছেন। [১]

### আল-মাআরিফ:

এর লেখক ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি। তিনি ২১৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। কিছু লোক তাঁকে কাররামিয়া ফেরকার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন, কিন্তু খতিব বাগদাদির মতে তিনি ফাজিল এবং সিকাহ ছিলেন। "আল-মাআরিফ"-এ তিনি আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম থেকে শুরু করে নিজের সময় পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস এবং আরবদের ইতিহাস সংক্ষেপে একত্রিত করেছেন।

### আল-ইমামাহ ওয়াস-সিয়াসাহ:

এটিও ইবনে কুতাইবার দিকে নিসবত করা হয়। এতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর থেকে ঘটনাবলির ধারা শুরু করা হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগের খলিফা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলো একত্রিত করা হয়েছে। "আল-মাআরিফ"-এর মতো এতেও

---

[১] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৩১১/৬

দুর্বল বর্ণনার আধিক্য রয়েছে। ইবনে কুতায়বার আরেকটি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রচনা 'উয়ুনুল আখবার'ও প্রসিদ্ধ।

তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত:

এটি ইমাম খলিফা বিন খাইয়াত (মৃত্যু ২৪০ হিজরি)-এর রচনা। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম থেকে খলিফা মুতাওয়াক্কিল আব্বাসীর যুগ পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বছরের ক্রমবিন্যাসের পূর্ণ অনুসরণ এবং শৈলীতে সংক্ষিপ্ততা এই বইটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে নেওয়া হয়েছে। একে মুসলমানদের প্রথম বিধিবদ্ধ ইতিহাস হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

আত-তাবাকাতুল কুবরা:

এটি মুহাম্মদ বিন সাদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরি)-এর রচনা। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ওয়াকিদির লেখক (কাতিব) ছিলেন। তাঁর মহান রচনাটি 'তাবাকাত ইবনে সাদ' নামে স্মরণ করা হয়। এটি কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বরং এতে গোত্র এবং স্তর (তাবাকাত) অনুযায়ী ব্যক্তিদের জীবনী সংকলন করা হয়েছে। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর ঐতিহাসিক বর্ণনার এক বিশাল ভাণ্ডার সনদসহ সংগৃহীত হয়েছে। তাই কোনো ঐতিহাসিকই এই বইটির মুখাপেক্ষীহীন থাকতে পারেন না।

ফুতুহুল বুলদান - আনসাবুল আশরাফ:

এই দুটিই আবু জাফর ইয়াহইয়া আল-বালাযুরীর রচনা, যিনি দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আরবির পাশাপাশি ফারসি ভাষার ওপরও তাঁর দখল ছিল, তাই তিনি অনারবদের ইতিহাস থেকেও উপকৃত হয়েছেন। 'ফুতুহুল বুলদান'-এ তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও সংক্ষিপ্ততার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত প্রতিটি শহরের বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভূগোল এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলিও পর্যালোচনা করেছেন।

'আনসাবুল আশরাফ' তাবাকাত ইবনে সাদের আদলে রচিত। এটিও ঐতিহাসিক বর্ণনার এক বিশাল ভাণ্ডার।

আল-আখবারুত তিওয়াল:

এটি আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারীর রচনা, যিনি পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং ২৮২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচনার প্রথম অংশে তিনি আদম (আ.) থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে ইরান ও রোমের রাজতন্ত্রের অবস্থা লিখেছেন। তৃতীয় অংশে মুসলমান ও ইরানিদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন, সেইসাথে কারবালা, জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধের বিবরণও লিখেছেন যা বেশিরভাগ শিয়া বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। এর কিছু অংশ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

তারিখ ইয়াকুবি:

আহমদ বিন আবি ইয়াকুব (মৃত্যু ২৯৫ হিজরি)-এর এই রচনায় সংক্ষিপ্ততার সাথে সারা বিশ্বের ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে। রোম, পারস্য, তুর্কিস্তান, চীন, গ্রিস, ভারত, ব্যাবিলন, মিশর, আরব, আবিসিনিয়া এবং আফ্রিকা পর্যন্ত যে সব বর্ণনাই পেয়েছেন তা তিনি উদ্ধৃত করেছেন। আহমদ বিন আবি ইয়াকুব একজন শিয়া ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর কিছু বর্ণনা সন্দেহজনক এবং কিছু বানোয়াটও।

https://t.me/BoierSomahar

## ইতিহাসের বিশ্বকোষসমূহ

ইতিহাসে কিছু কিতাবের মর্যাদা 'বিশ্বকোষ' (মওসুআত) হিসেবে। অর্থাৎ এগুলোর সংকলকগণ লভ্য ঐতিহাসিক কিতাব ও রিসালাসমূহকে একটি বিশেষ বিন্যাসে একত্রিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি কিতাব তালিকার শীর্ষে রয়েছে:

- ১. তারিখ-ই-তাবারী
- ২. আল-কামিল ফিত-তারিখ
- ৩. তারিখ-ই-ইসলাম
- ৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া
- ৫. তারিখ ইবনে খালদুন

নিচে এই কিতাবসমূহ এবং এদের সংকলকদের পরিচিতির সাথে তাদের সংকলন পদ্ধতির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হচ্ছে।

### ১. তারিখ-ই-তাবারী

এর আসল নাম 'তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক', একে 'তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক'-ও বলা হয়। এর সংকলক হলেন আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াজিদ আত-তাবারী রহ., তিনি আহলে সুন্নাতের উলামাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরই সমনামের একজন শিয়া ঐতিহাসিক হলেন আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুস্তম আত-তাবারী। নামের সাদৃশ্যের কারণে অনেক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। সুন্নি তাবারীকে শিয়া মনে করা হয়। চেনার জন্য আপনি এটি মনে রাখুন যে, যে তাবারী ইয়াজিদ নামক আরব ব্যক্তির নাতি তিনি সুন্নি, আর যে তাবারী রুস্তম নামক পারস্য ব্যক্তির বংশধর তিনি আহলে তাশাইয়ু সম্প্রদায়ের।

মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াজিদ আত-তাবারী রহ. ২২৪ হিজরিতে তাবারিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মিসর, সিরিয়া এবং অন্যান্য শহরের মাশায়েখদের থেকে হাদিস, কিরাত এবং ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। পরিশেষে বাগদাদে চলে আসেন, এখানে দরস, হাদিস, ফতোয়া লিখন এবং গ্রন্থ রচনার কাজ বেছে নেন। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং অনেক অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ উপহার দেন। এই কাজে তিনি এতটাই মগ্ন ছিলেন যে সারাজীবন বিবাহ করেননি। ৩১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে জারির তাবারী অত্যন্ত মুত্তাকি, আবেদ ও জাহিদ বুজুর্গ ছিলেন। সারাজীবন সরকারি পদ ও শাসকদের থেকে দূরে থেকে এক কোণে ইলমি কাজ করে গেছেন। আসহাবে জারহ ও তাদিলের মতে তিনি আল্লামায়ে ওয়াক্ত এবং ফকিহে জামানা ছিলেন। তাফসির, হাদিস, ইলমুর রিজাল, ফিকহ এবং ইতিহাসে অতুলনীয় দক্ষতা রাখতেন। তাফসিরে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ হলো 'তাফসিরে তাবারী', ফিকহ, হাদিস এবং ইলমুর রিজালে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ হলো 'তাহজিবুল আসার', আর ইতিহাসের ওপর দক্ষতার প্রমাণ 'তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক' থেকে পাওয়া যায়। [১]

ইমাম তাবারী এই ইতিহাস আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম থেকে শুরু করে ৩০২ হিজরির ঘটনাবলির ওপর শেষ করেছেন। এতে রিসালাত যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং উমাইয়া খিলাফত ছাড়াও আব্বাসীয় যুগের প্রথম আট দশকের বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। যেহেতু এই ইতিহাস পরবর্তীতে আসা অধিকাংশ ইসলামি ইতিহাসের জন্য দ্বিতীয় হিজরি পর্যন্ত ঘটনাবলির মৌলিক উৎস, তাই আমাদের এটি জানা উচিত যে তাবারীর উৎসসমূহ (মাসাদির) কী কী।

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/ ২৬৭, ত. আর-রিসালা... নোট: ইবনে জারির তাবারীর বিস্তারিত অবস্থা "তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা" তৃতীয় খণ্ডে আসবে।

এই বইটি আটটি অংশের ওপর ভিত্তি করে রচিত যার উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

- ১. আম্বিয়ায়ে কেরামের সীরাত: এর জন্য তাফসীর ও হাদীসের কিতাব এবং ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে উপাদান নেওয়া হয়েছে।
- ২. ইরান ও পারস্যের ইতিহাস: এর উৎস হলো পারস্যবাসীদের কিতাব, ইবনে মুকাফফা এবং হিশাম কালবীর বর্ণনা।
- ৩. রোমবাসীদের ইতিহাস: ইউরোপীয়দের রচনার আরবি অনুবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- ৪. প্রাক-ইসলামী আরবের ইতিহাস: উবাইদ বিন শারিয়া, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, মুহাম্মদ বিন কাব কুরাজি এবং হিশাম কালবীর বর্ণনা।
- ৫. সীরাতুন্নবী: আবান বিন উসমান, উরওয়া বিন যুবায়ের, ইবনে শিহাব, আসিম বিন উমর বিন কাতাদা এবং ইবনে ইসহাকের বর্ণনা।
- ৬. মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিজয়সমূহ: বেশিরভাগই সাইফ বিন উমর এবং আল-মাদাইনীর বর্ণনা।
- ৭. জঙ্গে জামাল ও সিফফীন: আবু মুখনাফ, সাইফ বিন উমর এবং আল-মাদাইনীর বর্ণনা সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ৮. উমাইয়াদের ইতিহাস: আওয়ানা বিন হাকাম, আল-মাদাইনী, ওয়াকিদী এবং হিশাম কালবীর বর্ণনা।
- ৯. আব্বাসীয়দের ইতিহাস: আহমদ বিন আবি খাইসামা, আহমদ বিন যুহাইর, মাদাইনী এবং হাইসাম বিন যুহাইরের বর্ণনা।

**তারিখে তাবারীর কিছু বৈশিষ্ট্য:**

- ১. প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থগুলোর মধ্যে এর সংকলনকাল নবুওয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের সবচেয়ে নিকটবর্তী।
- ২. এতে প্রতিটি বর্ণনার সনদ উল্লেখ করা হয়েছে যাতে পাঠকরা এর মান সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন।
- ৩. ঐতিহাসিক নিজে একজন অনেক বড় ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির, তাই অন্য যেকোনো ঐতিহাসিকের তুলনায় তাঁর ওপর বেশি আস্থা রাখা যায়।
- ৪. তাবারী উৎসসমূহ থেকে বর্ণনাগুলো হুবহু গ্রহণ করেছেন, কোনো প্রকার পরিবর্তন করেননি, তাই তাবারী পাঠকারী যেন পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাসগুলো শব্দে শব্দে পাঠ করেন।

**দুর্বলতাসমূহ:**

তাবারী বর্ণনাগুলোকে কোনো প্রকার মন্তব্য ছাড়াই পেশ করেছেন, রাবীদের ওপর কোনো আলোচনা করেননি এবং কোনো বর্ণনার ব্যাখ্যাও দেননি। এ কারণে অনেক সময় এই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় যে, তাবারী সব ধরনের বর্ণনার সাথে একমত। আবার যেহেতু ইবনে জরীর তাবারী রহ. শিয়া ঐতিহাসিক ইবনে জরীর তাবারীর সমনামীয়, এর পাশাপাশি তাঁর ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামের ওপর অপবাদমূলক অনেক বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই তাঁর সম্পর্কে এই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে যে তিনি শিয়া ছিলেন। এই কারণেই তাঁর ওপর এই অভিযোগও আনা হয়েছে যে তিনি শিয়াদের জন্য বর্ণনা তৈরি করতেন, কিন্তু এই অভিযোগ সঠিক নয়। হাফেজ যাহাবী রহ. এই অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন:

“هذا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار أئمة الاسلام المعتمدين.”

“এটি নিছক একটি অনুমান এবং মিথ্যা ধারণা, ইবনে জরীর তো ইসলামের বড় নির্ভরযোগ্য ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।” [১]

---

[১] মীযানুল ইতিদাল: ৩/৪৯৯, দারুল মা’রিফাহ বৈরুত।

অবশ্য হাফেজ যাহাবী (রহ.) এতটুকু স্বীকার করেন যে, তাঁর মধ্যে সামগ্রিকভাবে শিয়া মতবাদের প্রভাব ছিল যা ক্ষতিকর ছিল না। এর অর্থ হলো, রাজনৈতিক সমর্থনের দিক থেকে ইমাম তাবারী (রহ.)-এর ঝোঁক আলবীদের প্রতি ছিল, অন্যথায় আহলে সুন্নাত থেকে বিচ্যুত কোনো আকিদা বা পথ অবলম্বন করা তাঁর ব্যাপারে প্রমাণিত নয়। এই কারণেই ইমাম তাবারী (রহ.)-কে একজন মহান আলেম এবং তাঁর ইতিহাস গ্রন্থকে প্রতিটি যুগে ইসলামী ইতিহাসের মৌলিক উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

**তারিখ তাবারী সম্পর্কিত কিছু সন্দেহের জবাব:**

রইল এই কথা যে, এতে এমন কিছু অনুপযুক্ত বর্ণনা রয়েছে যা থেকে বিভ্রান্ত দলগুলো দলিল পেশ করে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে এর উত্তর স্বয়ং ইমাম তাবারী কিতাবের ভূমিকায় দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

“আমার এই কিতাবে এমন কোনো বর্ণনা যদি থাকে যা পাঠক অদ্ভুত মনে করে অথবা শ্রোতা অপছন্দ করে যে, এর সঠিক হওয়ার কোনো যুক্তি বুঝে আসছে না, তবে এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, এই ধরনের বর্ণনাগুলো আমাদের উদ্ভাবন নয় বরং বর্ণনাকারীদের থেকে আমাদের কাছে এভাবেই পৌঁছেছে। আমরা এগুলো সেভাবেই পেশ করেছি যেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল।” [১]

এর পরিষ্কার অর্থ হলো, লেখক বর্ণনাগুলোর সঠিক বা ভুল হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি সব ধরনের বর্ণনা সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ পাঠক এবং পরবর্তী আলেমদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এই দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পণ করেছেন যেন তাঁরা এর মধ্য থেকে সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা চিনে নেন। অন্য কথায়, ইমাম তাবারী ‘তারিখ বির-রিওয়ায়াহ’ (বর্ণনাভিত্তিক ইতিহাস) পেশ করেছেন। সেই সময়ের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসের পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তাঁরা বর্ণনাগুলো নকল করে দিতেন, দলিল পেশ করতেন না।

রইল এই কথা যে, কোনো বর্ণনার নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য হওয়ার ফয়সালা পরবর্তী লোকেরা কীভাবে করবেন? এর জন্য তাবারী প্রতিটি বর্ণনার সনদ (সূত্র) বর্ণনা করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারীদের অবস্থা যাচাই করে ফয়সালা করা যেতে পারে যে, কোন বর্ণনা কতটা নির্ভরযোগ্য।

কেউ বলতে পারে যে, দুর্বল বর্ণনার সংমিশ্রণের চেয়ে ভালো ছিল তাবারী এই কিতাব লিখতেনই না। কিন্তু আমাদের সেই যুগের দিকেও নজর দেওয়া উচিত যখন ইমাম তাবারী ইতিহাসের এই সংকলনটি তৈরি করেছিলেন। সেই সময় নিম্নোক্ত কারণে এই কাজটি এই ঢঙে করা হয়েছিল:

- ১. এই যুগটি ছিল হাদিস ও ইতিহাস সংকলনের যুগ অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণ সকলেই নিজেদের কিছু শর্ত নির্ধারণ করে তার অধীনে অধিক থেকে অধিকতর বর্ণনা শোনা, সংগ্রহ করা এবং লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। শুধুমাত্র সহিহ বর্ণনা সংগ্রহ করার গুরুত্ব অধিকাংশ মুহাদ্দিসও দেননি। এমন পরিস্থিতিতে ইমাম তাবারীও বর্ণনাগুলোকে একেবারে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে এই সংকলনটি তৈরি করেছেন।

- ২. সেই যুগে ফন-এ-রিজাল (বর্ণনাকারী শাস্ত্র)-এর বিশেষজ্ঞদের আধিক্যের কারণে সহিহ, যয়িফ এবং অগ্রহণযোগ্য বর্ণনার ফয়সালা করা সহজ ছিল। ইমাম তাবারীর সামনে আমাদের যুগের মতো ইলমি অবনতি ছিল না যেখানে বর্ণনাকারীদের চেনা তো দূরের কথা, বর্ণনার জ্ঞানও হাতেগোনা কয়েকজনের আছে। আর যদি কেউ বর্ণনার দিকে মনোযোগ দেয়ও, তবে কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই ইতিহাসের আল্লামা বনে যায় এবং পূর্ণ ধৃষ্টতার সাথে সকল সাহাবী ও আসলাফদের ওপর এবং কখনো ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখকদের ওপর কাদা ছোড়াছুড়ি করতে শুরু করে।

---

[১] “আমার এই কিতাবে এমন কোনো সংবাদ যদি থাকে যা এর পাঠক অস্বীকার করে অথবা এর শ্রোতা ঘৃণা করে এই কারণে যে, সে এর সঠিক হওয়ার কোনো দিক খুঁজে পাচ্ছে না, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, এটি আমাদের পক্ষ থেকে আসেনি, বরং এটি আমাদের কাছে বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে এসেছে। আমরা এটি সেভাবেই পৌঁছে দিয়েছি যেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।” (তারিখুত তাবারী: ১/৭-৮)

(৩) এই যুগে শিয়া ঐতিহাসিক এবং বিভ্রান্ত বর্ণনাকারীদের এমন সব রচনা প্রকাশিত হয়েছিল যাতে দুর্বল বর্ণনা তো ছিল, কিন্তু ছবির অন্য পিঠ দেখানোর মতো সহিহ বর্ণনাগুলো অনুপস্থিত ছিল। ইমাম তাবারী উভয় প্রকারের বর্ণনা সংগ্রহ করে উভয় দিক সামনে তুলে ধরেছেন যাতে গবেষকগণ সঠিক বিষয়টি গ্রহণ করতে পারেন এবং ভুল কথাটি বর্জন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আজ আমাদের কাছে সহিহ এবং যঈফ বর্ণনার তুলনামূলক বিচারের কোনো মাধ্যম যদি থাকে, তবে তা হলো এই গ্রন্থটি। যদি ইমাম তাবারী এই কিতাবটি না লিখতেন, তবে আমাদের অন্যান্য সাহাবী এবং তাবেয়ীদের অবস্থা জানার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আহলে তাশাইয়ু-এর কিতাবসমূহের ওপরই নির্ভর করতে হতো; কারণ আহলে সুন্নাত সেই সময় পর্যন্ত অন্য যেসব ইতিহাস লিখেছিলেন, সেগুলো ব্যাপকতা এবং বিস্তারিত বর্ণনায় তাবারীর চার ভাগের এক ভাগও ছিল না।

এখন কথা হলো, শিয়া বর্ণনাকারীদের বর্ণনা গ্রহণ করার প্রয়োজনই বা কী ছিল? তো আসলে কখনো কখনো কোনো বর্ণনা এটি দেখানোর জন্যও উদ্ধৃত করা হয় যে, অমুক শ্রেণির লোকেরা কী বলে। কখনো কখনো উদ্দেশ্য থাকে কেবল এটি প্রকাশ করা যে, বিরোধী পক্ষের লোকেরা এই পর্যায় পর্যন্তও বক্তব্য দিতে পারে। কখনো কখনো বর্ণনার প্রতিটি অংশের সাথে মোটেও একমত হওয়া যায় না, কিন্তু বর্ণনার কিছু অংশ উপকারী হয়; যেমন কিছু এমন খুঁটিনাটি বিষয় থাকে যা দ্বারা কোনো ঘটনার যোগসূত্র মেলাতে সাহায্য পাওয়া যায়। মূল উদ্দেশ্য থাকে সেই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সামনে আনা, কিন্তু উদ্ধৃতিতে সতর্কতার প্রমাণ দিতে এবং কাটছাঁট করার অভিযোগ থেকে বাঁচতে পুরো বর্ণনাটি হুবহু উদ্ধৃত করা হয় এবং পাঠকদের ওপর আস্থা রেখে এটি ধরে নেওয়া হয় যে, তারা নিজেরাই অর্থ বুঝে নেবেন এবং অসার কথার প্রতি কর্ণপাত করবেন না।

এই বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন। কয়েক বছর আগে মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে হামলা হয়েছিল। সংবাদপত্রে কয়েক সপ্তাহ ধরে এর খবর এবং রিপোর্টের ভিড় লেগে ছিল। এই সময়ে পাকিস্তানের অনেক সংবাদপত্রে ভারতীয় সাংবাদিকদের নিবন্ধ এবং কলামও প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলোতে পরিষ্কারভাবে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, এটি আইএসআই-এর কাজ। এর পাশাপাশি সেগুলোতে বিভিন্ন বিবরণও সামনে আনা হয়েছিল যে, হামলাকারীরা নৌকায় করে কীভাবে এসেছিল, তাদের ফোন থেকে কোন কথাগুলো রেকর্ড করা হয়েছিল, হামলার পরিকল্পনা কীভাবে হয়েছিল ইত্যাদি। স্পষ্টতই এই ধরনের নিবন্ধ প্রকাশের অর্থ এটি ছিল না যে, পাকিস্তানি সংবাদপত্রের সম্পাদকরাও এই দাবি করছেন যে, এই হামলা আইএসআই করিয়েছে। বরং তারা কেবল ভারতীয় মিডিয়ার ছবির অন্য পিঠ দেখানোর শিরোনামে এই ধরনের নিবন্ধগুলো প্রকাশ করছিলেন।

কখনো কখনো এমন সন্দেহজনক বা মিথ্যা বিষয় সামনে আনার ইতিবাচক দিকটি হলো এই যে, মিথ্যার সেই স্তূপের মধ্যেও দুই-চারটি সত্য কথা থাকে। পাঠকরা সেগুলো থেকে এমন কিছু আসল খুঁটিনাটি বিষয়ও জানতে পারেন যা আগে গোপন ছিল। অনেক সময় এই ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে খোদ বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হয়। কিছু বুদ্ধিমান সাংবাদিক এই ধরনের রিপোর্ট এবং নিবন্ধের বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বিরোধীদের স্বীকৃত সত্যগুলোকে তাদেরই দাবির বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে দাঁড় করান, যার ফলে বিরোধী পক্ষ নিরুত্তর হতে বাধ্য হয়। এটিও সবাই জানেন যে, এই ধরনের রিপোর্টের শুরুতে সাধারণত সম্পাদক আলাদাভাবে একটি ব্যাখ্যামূলক নোট দিয়ে দেন যে, প্রতিষ্ঠানের এই বিষয়বস্তুর সাথে একমত হওয়া জরুরি নয়; এরপর সম্পাদকের ওপর আর কারো...

...অঙ্গুলি নির্দেশের কোনো অধিকার থাকে না। আবু জাফর তাবারী এবং অন্যান্য ইসলামী ঐতিহাসিকগণ তাঁদের ইতিহাসে বর্ণিত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে ইতিপূর্বেই এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

২. শেষ কথা হলো এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ব্যস্ততা ও দায়িত্ব থাকে। তিনি সেই গণ্ডির মধ্যে থেকেই কাজ করেন। আমরা একটি চারতলা ভবন নির্মাণ করতে চাই, কিন্তু সময় বা পুঁজি আমাদের দুই তলার বেশি অনুমতি দেয় না। বাকি কাজ পরবর্তী প্রজন্ম সম্পন্ন করে। এভাবে অনেক কাজ পরবর্তীদের জিম্মায় থেকে যায়। সম্ভব যে, ইমাম তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) এত সময় পাননি যে তিনি বর্ণনাকারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন অথবা প্রতিটি বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার মান বর্ণনা করবেন।

সুতরাং এই সকল দিক সামনে রাখার পর ইমাম তাবারী বা অন্যান্য মহান উলামায়ে কেরামের সংকলিত ইতিহাসে এ ধরনের দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা চলে আসার অর্থ এই নেওয়া যাবে না যে, এই ব্যক্তিবর্গ এই বর্ণনাগুলো দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণতার বিরুদ্ধে দলিল পেশ করছিলেন, অথবা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে কোনো ভুল যুক্তির দিকে প্ররোচিত করা।

□□□

**২. আল-কামিল ফিত-তারিখ**

‘আল-কামিল ফিত-তারিখ’ আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আসীর আল-জাযারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর একটি রচনা। তিনি ৫৫৫ হিজরীতে মসুলের নিকটবর্তী, তিন দিক থেকে দজলা নদী দ্বারা বেষ্টিত জাযিরা ইবনে উমরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে আসীর (রাহিমাহুল্লাহ) জ্ঞান অর্জনের জন্য মসুল, সিরিয়া ও আল-কুদস সফর করেন। যৌবনকালে তিনি সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সাথে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে জিহাদেও শরিক ছিলেন। যখন তিনি হালাব (আলেপ্পো) যান, তখন আল্লামা ইবনে খাল্লিকান (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিশেষে তিনি মসুলে চলে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই লেখালেখি ও সংকলনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। ৬৩০ হিজরীতে তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন।

আল-কামিল ফিত-তারিখ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সংকলন যা প্রতিটি যুগে জ্ঞানপিপাসুদের নিকট থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে মুসলিম বিশ্বের ওপর চেঙ্গিস খানের আক্রমণের ঘটনাবলী অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিগত শতাব্দীগুলোতে সংকলিত আরবি ও ফারসি উৎসগুলো থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপকৃত হওয়া হয়েছে।

**আল-কামিল ফিত-তারিখের বৈশিষ্ট্যসমূহ:**

১. ঘটনাবলীতে কালানুক্রমিক বিন্যাসকে মূল ভিত্তি হিসেবে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এক বছরের ঘটনাবলী তা আরবের হোক কিংবা পারস্য ও ভারতের, একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পরবর্তী বছরের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এর সুবিধা হলো এই যে, কোনো ঘটনা পড়ার সময় আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে তার সংঘটিত হওয়ার সাল সম্পর্কে অবগত থাকি।

---

[১] তাঁর বড় ভাই মুবারক বিন মুহাম্মদও ‘ইবনে আসীর আল-জাযারী’ নামে পরিচিত, যিনি নির্জনবাস অবস্থায় ইলমে হাদীসে ‘জামি আল-উসুল’-এর মতো বিশাল ও মহান হাদীস সংকলন প্রস্তুত করেছেন। জাযিরা ইবনে উমরের আরও এক ব্যক্তিত্ব আল্লামা আল-জাযারী নামে প্রসিদ্ধ, তিনি হলেন মুকাদ্দিমা আল-জাযারী ও হিসনে হাসিন-এর লেখক মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-জাযারী, যিনি অষ্টম হিজরী শতাব্দীর ব্যক্তিত্ব। পাঠকগণ ‘আল-জাযারী’ নামের এই তিন লেখকের পার্থক্য লক্ষ্য রাখবেন।

দ্বিতীয় ফায়দা হলো এই যে, যদি আমাদের কোনো ঘটনার বছর জানা থাকে এবং আমরা 'আল-কামিল ফিত তারিখ'-এ তার বিস্তারিত দেখতে চাই, তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি খুঁজে পেতে পারি।

- ২. অধিকাংশ উপাদান মজবুত আছার (লিখিত ভাণ্ডার) থেকে নেওয়া হয়েছে। হারুনুর রশিদের যুগ পর্যন্ত অধিকাংশ বর্ণনা তাবারী থেকে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী যুগগুলোতে বিভিন্ন কিতাব থেকে উপাদান নেওয়া হয়েছে। নিজের যুগের অবস্থার ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে বর্ণিত বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছেন।

- ৩. বিগত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বর্ণনাগুলোকে হুবহু লিপিবদ্ধ করার রীতি প্রচলিত ছিল, যার ফলে কলেবর বৃদ্ধি পেত এবং পাঠকরা বিরক্ত হতো। ইবনুল আসীর এটি বর্জন করে বর্ণনার মূল নির্যাস গ্রহণ করেছেন এবং সেই ঘটনাগুলো নির্বাচন করেছেন যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী।

- ৪. প্রতি বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনা পূর্ণ গুরুত্বের সাথে করেছেন।

- ৫. বছরের শেষে বিরল ও আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলোও উদ্ধৃত করেছেন।

- ৬. গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করার বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। স্থানে স্থানে উলামা, বিজয়ী এবং বাদশাহদের শিক্ষণীয় ঘটনা ও আনন্দদায়ক কিচ্ছা বর্ণনা করেছেন।

- ৭. শাসকদের ভুল সিদ্ধান্তের ওপর সমালোচনাও রয়েছে এবং সুযোগ বুঝে ইতিহাস থেকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্বলতাসমূহ:

- ১. 'আল-কামিল ফিত তারিখ'-এ বছরওয়ারি ধারাবাহিকতায় ঘটনা বর্ণনা করার বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা হয়েছে, যার কারণে আরব, পারস্য, ভারত, সিরিয়া এবং মিশরের বিভিন্ন রাজবংশের ঘটনাগুলো খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণিত হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে কেবল একটি রাজবংশের অবস্থা দেখতে চায়, তবে তাকে বেশ বেগ পেতে হবে।

- ২. ইবনুল আসীর রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এতটাই উদার যে, যয়ীফ এমনকি জাল বর্ণনাও কোনো দ্বিধা ছাড়াই গ্রহণ করে নেন। কোনো তাহকীক বা গবেষণার প্রয়োজন মনে করেন না।

- ৩. বর্ণনার সনদ কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, তাই উপাদানগুলো কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন।

- ৪. ইবনুল আসীর রহমতুল্লাহি আলাইহি সমসাময়িক বাদশাহদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে কঠোর, এমনকি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মতো ব্যক্তিরাও তাঁর সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছেন। কিছু স্থানে এই সমালোচনা সঠিক এবং কিছু স্থানে একেবারেই অযৌক্তিক। এতে প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে তাঁর ভারসাম্যহীনতার অনুভূতি হয়, তবে এর দ্বারা এটিও বোঝা যায় যে তিনি একজন নির্ভীক মানুষ ছিলেন; যে বিষয়টিকে সত্য মনে করতেন তা বর্ণনা করতে কোনো সরকার বা সাম্রাজ্যের ভয় করতেন না।

সামগ্রিকভাবে এটি একটি দরকারী সংকলন। যদি এতে বর্ণনার মান কিছুটা উন্নত রাখা হতো তবে অনেক ভালো হতো।

(৩) তারিখ আল-ইসলাম

এর রচয়িতা হাফেজ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আয-যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ৬৭৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন। শেষ জীবনে দামেস্কে বসবাস শুরু করেন এবং রচনা ও পাঠদানে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর ইলমি ও কলমি শাহকার (অসামান্য কাজ) প্রায় একশ'র কাছাকাছি। তাঁকে 'খাতিমাতুল হুফফাজ' বলা হয়। আল্লামা সাখাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে, হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রের লোকেরা চারজন ব্যক্তিত্বের সন্তান: মিযযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইরাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

রিজাল শাস্ত্রের ওপর সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন হাফেজ যাহাবী যখন ইতিহাসের ওপর কলম ধরলেন, তখন 'তারিখ আল-ইসলাম', 'দুওয়াল আল-ইসলাম', 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' এবং 'আল-ইবার'-এর মতো রচনা লিখে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন। তাঁর 'তারিখ আল-ইসলাম'-এর পূর্ণ নাম হলো 'তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম'। এটি 'তারিখ দামেস্ক'-এর পর ইসলামি ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। [১]

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ১. তারিখ আল-ইসলাম-এ সময়কাল এবং ব্যক্তিত্বদের স্তরে (তাবাকাত) বিভক্ত করা হয়েছে।
- ২. প্রতিটি স্তরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমে সেই সময়ের ঘটনাবলি 'হাওয়াদিস' শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর সেই সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী 'ওয়াফায়াত' শিরোনামে পেশ করা হয়েছে। এভাবে এতে তিনটি শাস্ত্র: ইতিহাস, রিজাল এবং তাবাকাতকে একত্রিত করা হয়েছে।
- ৩. ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর প্রয়োজন অনুযায়ী মন্তব্যও করা হয়েছে এবং ইতিহাসবিদ ও বর্ণনাকারীদের ওপর জেরা (সমালোচনা) করা হয়েছে।
- ৪. হাফেজ যাহাবী মধ্যপন্থী মেজাজ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন, তাই বর্ণনা ও ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও সূক্ষ্ম মতামত প্রদান করেন যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ওজনদার হয়।
- ৫. হাফেজ যাহাবী বর্ণনার নির্বাচনেও পূর্ববর্তী সকল ইতিহাসবিদের তুলনায় উত্তম ও সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, এজন্য তাঁর ইতিহাস আজেবাজে এবং বানোয়াট কথা থেকে প্রায় মুক্ত। গবেষকদের জন্য এটি অত্যন্ত মূল্যবান উৎস।

দুর্বলতাসমূহ:

- ১. এর অস্বাভাবিক বিশালতা, যার কারণে এটি কেনা এবং এর থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
- ২. এতে 'ওয়াফায়াত' অংশ মূল ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে, যার ফলে ঘটনার গতিতে অনেক দীর্ঘ বিরতি চলে আসে।

---

[১] তারিখ দামেস্ক-এর প্রচলিত সংস্করণ যা দারুল ফিকর প্রকাশ করেছে, তা ৮০ খণ্ডে বিভক্ত, এতে ৭৪ খণ্ড মূল পাঠ এবং ছয় খণ্ড সূচিপত্র ও নির্ঘণ্টের ওপর مشتمل (অন্তর্ভুক্ত)। হাফেজ যাহাবীর তারিখ আল-ইসলাম-এর প্রসিদ্ধ সংস্করণ যা ডক্টর বাশার আওয়াদ মারুফ-এর গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে, তা ৫২ খণ্ডে সমাপ্ত।

৩ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

এটি হাফিজ ইসমাঈল বিন উমর বিন কাসীর আদ-দিমাশকী (রহ.)-এর রচনা, যিনি একাধারে মুহাদ্দিস, সমালোচক, মুফাসসির এবং ফকীহ ছিলেন। ৭০১ হিজরিতে সিরিয়ার বুসরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭৪ হিজরিতে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-তে যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য রেখেছেন তা হলো:

১. সীরাতুন নববীতে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোতে সনদের সাথে সমালোচনা ও পর্যালোচনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্যদের বর্ণনার ওপর কেবল নির্ভর করেননি।

২. সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং ফিতনার সময়ের অধিকাংশ বর্ণনা তাবারী বা আল-কামিল ফিত-তারিখ থেকে নিয়েছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জরাহ (সমালোচনা) করেছেন।

৩. তাবারী বা 'আল-কামিল ফিত-তারিখ' থেকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা প্রায় ছয় শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত। সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যাতে পাঠকরা ক্লান্ত না হয়ে পড়েন এবং কেউ যদি বিস্তারিত জানতে চান তবে যেন মূল কিতাবগুলোর দিকে রুজু করেন।

৪. নিজের সময়ের ঘটনাবলী, যা বাগদাদে হালাকু খানের আক্রমণ থেকে শুরু করে মিসর ও শামের মামলুক সুলতানদের বিজয় পর্যন্ত বিস্তৃত, অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন; কারণ এই ঘটনাবলী অন্য কোনো বিস্তারিত ইতিহাসে এভাবে সংকলিত ছিল না।

দুর্বলতাসমূহ:

১. সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনায় কিছু অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা কোনো মন্তব্য ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে যা একটি দুর্বল দিক।

২. ঘটনা ও অবস্থা পৃথক পৃথক বছরে উল্লেখ করার কারণে ঘটনার ধারাবাহিকতা বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩. বর্ণনার অনুপাত সমান নয়। কোথাও অত্যন্ত বিস্তারিত আবার কোথাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আম্বিয়ায়ে সালেহীন, সীরাতুন নববী এবং ইসলামী বিজয়ের ঘটনাবলী (১৫ হিজরি পর্যন্ত) অসাধারণ বিস্তারিত ও গবেষণার সাথে কয়েক খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আমরা যত সামনে অগ্রসর হই, ঘটনায় সংক্ষিপ্ততার অনুপাত বাড়তে থাকে, এমনকি শেষ পাঁচ শতাব্দীর ঘটনাবলী তিন খণ্ডে সংকুচিত করা হয়েছে। তবে একেবারে শেষে আবার কিছুটা বিস্তারিত ভঙ্গি রয়েছে অর্থাৎ ৭০১ হিজরি থেকে ৭৪৮ হিজরি পর্যন্ত ঘটনাবলী যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে এক খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলত হাফিজ ইবনে কাসীর আম্বিয়ায়ে কেরাম, সীরাতুন নববী এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেখানে গবেষণা ও বিস্তারিত বর্ণনা থেকে কাজ নিয়েছেন, যাতে এই বিষয়ে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাগুলো একত্রিত হয়ে যায়। সুলতান ও খলিফা, বনু উমাইয়া এবং বনু আব্বাসের অবস্থা তিনি এজন্য সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যে এই বিষয়গুলো অন্যান্য উৎস (আল-কামিল, তাবারী)-তে বিস্তারিতভাবে চলে এসেছিল।

৫ তারিখ ইবনে খালদুন

এই কিতাবের আসল নাম "তারীখুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়ামিল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবার"। এর লেখক আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন রহ.। ৭৩২ হিজরিতে তাঁর জন্ম এবং ৮০৮ হিজরিতে মৃত্যু হয়। ইসলামী সালতানাতগুলোতে তিনি রিয়াসত ও কাজা (বিচার বিভাগ) এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই রাজনৈতিক উত্থান-পতন দেখা এবং শাসনের রহস্য বোঝার ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

তারিখ ইবনে খালদুন পূর্ববর্তী সকল ঐতিহাসিক কিতাব থেকে আলাদা। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

১. এর শুরুতে একটি বিস্তৃত মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) আছে যাতে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজের গঠন, উন্নতি ও অবনতির কারণ এবং তামাদ্দুনিক (সাংস্কৃতিক) সত্যের ওপর এমন আলোকপাত করা হয়েছে যার কোনো পূর্ব উদাহরণ ছিল না। তারিখ ইবনে খালদুন এই মুকাদ্দিমার কারণেই বেশি প্রসিদ্ধ হয়েছে। একে "মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন" বলা হয়, যার গভীর ইলমি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের (উমরানিয়াত) জনক গণ্য করা হয়।

২. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিন্যাসে সময়ের ওপর নির্ভর করা হয়নি বরং আলাদা আলাদা বাদশাহ ও খানদানগুলোকে নিয়ে তাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে একটি ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে পাঠকদের মন বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

৩. ভঙ্গি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। ভাষা সহজ ও দালিলিক। কারো ওপর সমালোচনা নেই, নেই কোনো আপত্তি। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা নিজের স্বভাবজাত ঝোঁকের কোনো প্রভাব কোথাও অনুভূত হয় না।

৪. ঘটনাবলিকে এমনভাবে জোড়া হয়েছে যে নিজে থেকেই বোঝা যায় প্রতিটি ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তী ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৫. বর্ণনায় দিরায়াত (যুক্তি ও বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া) এর বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। এই কারণেই এমন অনেক বর্ণনা বর্জন করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা গ্রহণ করে আসছিলেন।

৬. বর্ণনার নির্যাস পেশ করা হয়েছে এবং মূল মর্ম বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

৭. নেকনাম (সুনামধন্য) ব্যক্তিদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা হয়েছে; কারণ এমন বর্ণনা শত্রুতা বা গোঁড়ামির ওপর ভিত্তি করে হতে পারে।

৮. বড় বড় ঘটনার উত্থান-পতনকে সংক্ষিপ্ত শব্দে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়েনি এবং কম সময়ে বেশি থেকে বেশি ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন হয়। আপনি তারিখ ইবনে খালদুনের দশটি পাতা পড়ে অন্য কোনো ইতিহাসের পঞ্চাশ পৃষ্ঠার চেয়ে বেশি তথ্য আয়ত্ত করতে পারেন।

https://t.me/BoierSomahar

৯. এটি এমন একটি ইতিহাস যার অধ্যয়নের পরামর্শ যে কাউকে দেওয়া যেতে পারে; এতে এমন দুর্বল বর্ণনা খুব কমই আছে যা থেকে পূর্বসূরিদের বিশেষ করে প্রথম যুগের ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভুল চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়।

দুর্বলতাসমূহ:

- কিছু জায়গায় ইবনে খালদুনের মন্তব্য জমহুর ওলামাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা এবং দুর্বল, যার ওপর সমালোচনা করা হয়েছে।
- বর্ণনার ভঙ্গি শুষ্ক ও নিরস। এজন্য 'আল-কামিল ফিত-তারিখ' বা 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র মতো আগ্রহ অনুভূত হয় না। তবে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন যে ইতিহাস রচনার এটাই চরম উৎকর্ষ যে ব্যক্তিগত অবস্থা, আবেগ এবং প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে ঘটনাগুলোকে বর্ণনায় রূপ দেওয়া হোক।

সামগ্রিকভাবে তারিখ ইবনে খালদুনকে ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে গর্বিত শাহকার (মাস্টারপিস) বলা যেতে পারে। [১]

□□□

দুটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস যা সাধারণত উপেক্ষা করা হয়?

উল্লিখিত পাঁচটি কিতাব ছাড়াও আরও দুটি কিতাব রয়েছে যা "বিশ্বকোষ" (Encyclopedia) এর আদলে সংকলিত হয়েছে। যদিও এগুলোকে সাধারণত উপেক্ষা করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো গবেষক ও সত্যানুসন্ধানীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ।

- আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম
- মিরাত উজ-জামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান

"আল-মুনতাজাম" আল্লামা আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.)-এর রচনা যা "১৯" খণ্ডে সমাপ্ত। অন্যদিকে "মিরাত উজ-জামান" তাঁরই বংশধর আল্লামা সিবত ইবনুল জাওযী (মৃ. ৬৫৪ হি.) সংকলন করেছেন।

"আল-মুনতাজাম" মানদণ্ডের দিক থেকে তারিখুত তাবারী থেকে উত্তম। একইভাবে "মিরাত উজ-জামান" ইতিহাসের শিল্পের বিচারে "আল-কামিল ফিত-তারিখ" এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। তবে আল্লাহর শান যে এই দুটি কিতাব সেই জনপ্রিয়তা পায়নি যা "তারিখুত তাবারী" এবং "আল-কামিল ফিত-তারিখ" নসিব হয়েছে। হ্যাঁ, জহুরিরা অবশ্যই এই রত্নগুলোর কদর করেছেন। হাফেজ যাহাবী "তারিখুল ইসলাম" এবং হাফেজ ইবনে কাসীর "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া"-তে এই উভয় কিতাব থেকে প্রচুর উপকৃত হয়েছেন। আলেমদের এই উভয় কিতাব নিজেদের কুতুবখানায় অবশ্যই রাখা উচিত। "মিরাত উজ-জামান" কয়েক শতাব্দী ধরে দুষ্প্রাপ্য ছিল। গত শতাব্দীতে এর কিছু অংশ হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি কিতাব পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে আরব গবেষকদের একটি দল সারা বিশ্বের কুতুবখানা থেকে এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো খুঁজে বের করে এবং সেগুলোকে একত্রিত করে গবেষণামূলক টীকা সহ এর একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি তৈরি করে যা আলহামদুলিল্লাহ ২০১৩ সালে "আর-রিসালাতুল আলমিয়্যাহ দামেস্ক" থেকে ২৫টি বিশাল খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

□□□

## প্রথম অধ্যায়

উম্মতে মুসলিমার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস

আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আসমানে উত্তোলন পর্যন্ত

https://t.me/BoierSomahar

হে হিমালয়! সেই সময়ের কোনো কাহিনী শোনাও

যখন তোমার কোল মানব পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল হয়েছিল

সেই সহজ-সরল জীবনের কিছু ঘটনা বলো

যার ওপর কৃত্রিমতার রঙের কোনো প্রলেপ ছিল না

হ্যাঁ, হে কল্পনা! সেই সকাল ও সন্ধ্যাগুলো আবার দেখাও

হে কালের আবর্তন! তুমি পেছনের দিকে দৌড়াও

□□□

(আল্লামা ইকবাল মরহুম)

https://t.me/BoierSomahar

প্রথম অধ্যায়

এই দুনিয়া

## এই দুনিয়া

এই দুনিয়া ঠিক ততটাই অদ্ভুত যতটা আমাদের এই জীবন এবং দেহ ও প্রাণ। আমরা রক্ত-মাংসের একটি দেহ যা চিন্তা করে, কথা বলে এবং নড়াচড়া করে, যার মধ্যে আমাদের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বিরতি ছাড়াই একটি ছোট হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হয়ে চলেছে, যার মধ্যে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ চুলের মতো সূক্ষ্ম ধমনী প্রতিটি কোষে রক্ত সরবরাহের কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের এই অস্তিত্ব একশ বছর আগে নিশ্চিতভাবেই ছিল না এবং একশ বছর পর নিশ্চিতভাবেই থাকবে না। সুতরাং আমরা যেমন নশ্বর, তেমনি এই দুনিয়াও একটি অস্থায়ী স্থান যা চিরকাল ছিল না, থাকবেও না; কিন্তু এই অস্থায়ী স্থানকেও কতই না পরিপক্ক প্রজ্ঞা, অদ্ভুত সূক্ষ্মতা এবং পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার সাথে তৈরি করা হয়েছে যে, যত বেশি চিন্তা ও গবেষণা করা যায় বুদ্ধি তত বেশি হতবাক হতে থাকে এবং এই প্রশ্ন আগের চেয়ে আরও বেশি তীব্রতার সাথে জাগতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত এই দুনিয়া কে তৈরি করেছেন এবং এর উদ্দেশ্য কী? যারা এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য ওহীর নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না এবং 'গায়েব'-এর ওপর বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়, তারা সবসময় এ বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার হয়ে এসেছে এবং কোনো গবেষণাই তাদের এই রহস্য সমাধান করে দিতে পারে না।

হ্যাঁ, যে বান্দারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে, রাসূলদের মর্যাদা স্বীকার করে এবং আসমানী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেয়, তাদের জন্য এই প্রশ্নগুলো কখনো রহস্য হয়ে থাকেনি; কারণ প্রতিটি নবীর প্রাথমিক শিক্ষা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে থাকে। এই দুনিয়া এক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, তিনি অনাদি ও অনন্ত, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি, তাঁর কোনো সন্তান নেই। তিনি সবকিছু জানেন, প্রতিটি বস্তু তাঁর কুদরতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তিনি মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এই দুনিয়াকে পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন, সফল ব্যক্তিদের জন্য পুরস্কার হিসেবে জান্নাত প্রস্তুত করেছেন এবং ব্যর্থ ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করেছেন।

জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কিত এই হলো সেই সত্য যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ তাআলার শেষ কিতাব কুরআন মাজীদে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এই বিষয়গুলো আকিদার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলো জানা ছাড়া মানুষের অস্থির আত্মা কখনো প্রশান্ত হতে পারে না, তাই ওহী-ই-ইলাহী নিজেই এগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে।

এমন কিছু প্রশ্নও রয়েছে যার চালিকাশক্তি হলো তথ্যের আগ্রহ এবং জানার উদ্দীপনা। মানুষের কৌতূহলী মন তাকে এই বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ কারা ছিলেন, কেমন ছিলেন? তাদের আগে কারা বসবাস করত, দুনিয়া কতদিন ধরে আবাদ হয়ে আসছে, এতে কোন কোন জাতি এসেছিল? তাদের সভ্যতা কেমন ছিল? জীবনযাত্রা কেমন ছিল? এই প্রশ্নগুলো ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত, যার কিছু উত্তর আল্লাহর কিতাবসমূহে এবং রাসূলদের বাণীতে সংক্ষেপে...

https://t.me/BoierSomahar

মিলে যায়। অতীতের চেতনা মানুষের তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত উপকারী, তাই ওহী এবং রাসূলদের বাণীতে আমরা অতীত সম্পর্কে অনেক সত্য খুঁজে পাই, তবে ওহী এবং রিসালাতের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের হেদায়েত, গত হওয়া লোকদের অবস্থা সংগ্রহ করা নয়। তাই অতীতের বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য আমাদের সেই জ্ঞানের দিকে ফিরে যেতে হবে যাতে প্রতিটি যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বিন্যস্ত করা হয়, এই জ্ঞানকেই ইতিহাস শাস্ত্র বলা হয়।

ইতিহাসবিদদের মতে: "ইতিহাস হলো সেই জ্ঞান যাতে অতীত জাতিসমূহ, সরকার, দেশ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের ঘটনাবলী সময়ের ক্রমানুসারে সংগ্রহ করা হয়।"

## পৃথিবী কবে সৃষ্টি হয়েছে?

পৃথিবী কবে সৃষ্টি হয়েছে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব কবে থেকে শুরু হয়েছে—এই বিষয়টি শুরু থেকেই বিতর্কিত। বর্তমান যুগের ভূতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর অস্তিত্বকে কোটি কোটি বছর এবং মানুষের অস্তিত্বকে লক্ষ লক্ষ বছর আগের বলে মনে করেন, তবে এটি কেবল একটি অনুমান যার কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা সমর্থন করে না। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মাওলানা হাফিজুর রহমান সিওহারভী (রহ.) পৃথিবীর সূচনা সম্পর্কে আলেমদের মতপার্থক্য উল্লেখ করে এই কথাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, সৃষ্টির সূচনা ছয় হাজার বছর আগে হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি তিনি লিখেছেন:

"এই সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন, কারণ আমাদের কাছে জ্ঞানের মাধ্যম খুব কম এবং এই বাস্তবতার চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য তা অপর্যাপ্ত। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও এর কোনো নিশ্চিত ফয়সালা হতে পারে না। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে চীনা, হিন্দু এবং মিশরীয়রা সবচেয়ে প্রাচীন জাতি এবং ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের দাবি হলো যে, ভূপৃষ্ঠে এই জাতিগুলোর অস্তিত্ব প্রায় ছয় থেকে দশ হাজার বছরের মধ্যে প্রমাণিত। এছাড়াও এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও কোনো জাতির অবস্থা ও ঘটনাবলীর ইতিহাসের সন্ধান সাত হাজার বছরের আগে পাওয়া যায় না।" [১]

হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ.) এ বিষয়ে অনেকগুলো উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) পর্যন্ত এক হাজার দুইশ বছর, নূহ (আ.) থেকে ইব্রাহিম (আ.) পর্যন্ত এক হাজার বিয়াল্লিশ বছর, ইব্রাহিম (আ.) থেকে মুসা (আ.) পর্যন্ত পাঁচশ পঁয়ষট্টি বছর, মুসা (আ.) থেকে দাউদ (আ.) পর্যন্ত পাঁচশ বাহাত্তর বছর, দাউদ (আ.) থেকে ঈসা (আ.) পর্যন্ত তেরশ ছাপ্পান্ন বছর এবং ঈসা (আ.) থেকে মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) পর্যন্ত ছয়শ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এভাবে আদম (আ.)-এর মৃত্যু থেকে মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত পাঁচ হাজার বিশ বছর হয়। যেহেতু আদম (আ.) দুনিয়াতে নয়শ ষাট বছর কাটিয়েছেন, তাই সেগুলো গণনা করলে আদম (আ.)-এর দুনিয়াতে আগমন থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শুভ জন্ম পর্যন্ত ছয় হাজার দুইশ পঁচানব্বই বছর হয়। [২]

---

[১] মুকাদ্দিমা নূরুল বাসার ফি সিরাতি খাইরিল বাশার: পৃ. ১৮

[২] তারিখু দামেশক লি ইবনি আসাকির: ১/৩১, তাবা দারুল ফিকর

হযরত আদম আলাইহিস সালাম:

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটি ছিল "প্রথম মানুষ"-এর সৃষ্টি, যার গঠনে মহাবিশ্বের স্রষ্টা সেই উপাদান ও গুণাবলি ব্যবহার করেছেন যা এর আগে অন্য কোনো সৃষ্টির উৎপত্তিতে ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর অস্তিত্বে চিন্তা করা, বোঝা, আবেগ প্রকাশ করা, সমস্যা অনুধাবন করা এবং চারপাশের উপায়-উপকরণ কাজে লাগানোর ক্ষমতা ছিল অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে বেশি। এগুলো নির্মাণ ও ধ্বংস উভয় ক্ষেত্রেই অসাধারণ ফলাফল ও প্রভাব দেখাতে পারত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফেরেশতাদের মতো আনুগত্যে বাধ্য করেননি, না জিনদের মতো মন্দের কাছে পরাভূত করেছেন, বরং তাঁকে ভালো ও মন্দ উভয় শক্তির অধিকারী করেছেন। ফেরেশতারা মানুষের গঠন দেখে তাঁর কর্মক্ষমতা অনুমান করে নিয়েছিলেন, তাঁদের এও মনে ছিল যে এর আগে পৃথিবীতে বসবাসকারী জিনরা কতটা ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল; তাই তাঁরা আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে আরজ করলেন যে তাঁর প্রশংসা ও ইবাদতের জন্য আমরাই তো উপস্থিত আছি। আল্লাহ বললেন:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।" [১]

মানুষকে ভালো ও মন্দ উভয় শক্তি এজন্য দেওয়া হচ্ছিল যে আল্লাহ দুনিয়ার পরীক্ষাগারে তাঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যদি তিনি মন্দের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে মন্দ থেকে বিরত থাকেন এবং ভালোর যোগ্যতা ব্যবহার করেন তবে তিনি সফল হবেন। যদি তিনি আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়ে মন্দের যোগ্যতা ব্যবহার করেন এবং ভালোর শক্তি ত্যাগ করেন তবে তিনি ব্যর্থ হবেন। এই রহস্য সেই সময় ফেরেশতারা বুঝতে পারেননি।

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের দিয়ে তাঁকে সম্মানসূচক সিজদাহ করালেন যাতে সারা দুনিয়ায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ পড়ে যায়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গ দেওয়ার জন্য মানুষের কোমল লিঙ্গকেও সৃষ্টি করা হলো, যার সূচনা হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম থেকে হয়েছিল। উভয়কে বসবাসের জন্য জান্নাতে পাঠানো হলো। দুনিয়ার প্রথম পুরুষ ও নারী জান্নাতে অল্প সময় অতিবাহিত করেছিলেন কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রশান্তি ও শান্তি মানব আত্মার গভীরতায় এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে পরবর্তীতে আগত মানুষ নিজের ভেতরে জান্নাতের মতো কোনো জায়গার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে থাকে, যেখানে কেবল সুখ আর সুখ থাকবে, দুঃখ-কষ্টের নামনিশানা থাকবে না, যেখানে প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ হবে এবং প্রতিটি নেয়ামত অর্জিত হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যারা ঈমান এনেছে তারা জেনে নিয়েছে যে তাদের আসল গন্তব্য জান্নাত; তাই তারা নেক আমলে অগ্রগামী হতে থাকে যাতে তারা তাদের আসল গন্তব্যে ফিরে যেতে পারে। আল্লাহ ও রাসূলদের ওপর যারা ঈমান আনেনি তারা জান্নাতকে একটি কাল্পনিক বিষয় মনে করে তা অস্বীকার করেছে কিন্তু তারা তাদের প্রকৃতিতে বিদ্যমান জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। তাই তারা দুনিয়ার সীমিত উপায়-উপকরণ ছিনিয়ে নিতে মগ্ন হয়ে গেল যাতে এই নশ্বর জীবনেই জান্নাতের স্বাদ নিতে পারে। এই কাড়াকাড়িতে দুনিয়া ফিতনা ও ফাসাদের চারণভূমিতে পরিণত হলো।

---

[১] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩০

আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে এখন পর্যন্ত মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে ইবলিস সবচেয়ে বড় শয়তানের ভূমিকা পালন করছে। শয়তানদের সর্দার ইবলিস জিনদের বংশ থেকে। আদম আলাইহিস সালাম-এর আগে সে ফেরেশতাদের সঙ্গী এবং আল্লাহর দরবারের নৈকট্যশীল সদস্য ছিল। আদম আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে দেখে সে ঘৃণা ও হিংসার আগুনে জ্বলতে শুরু করল। সে আদম আলাইহিস সালাম-কে সিজদা করতে অস্বীকার করল; কারণ সে নিজেকে আদম আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত, আর তা কেবল এই কারণে যে সে আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং আদম আলাইহিস সালাম মাটি থেকে। এই ধৃষ্টতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর দরবার থেকে বিতাড়িত করে দিলেন। শয়তান উদ্ধত ছিল, সে ক্ষমাও চায়নি। বরং সে আল্লাহ তাআলার কাছে এই অবকাশ চাইল যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত আদম ও তার সন্তানদের পথভ্রষ্ট করতে পারি। আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন। আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সন্তানদের পরীক্ষা সঠিক অর্থে তখনই হতে পারত যখন তারা শয়তানের প্রভাব থেকে বেঁচে থেকে নিজেদের স্রষ্টা ও মালিকের সাথে সম্পৃক্ত থাকত, এজন্য শয়তানকে মানুষকে প্রলুব্ধ করার অবকাশ ও সুযোগও দেওয়া হয়েছে।

শয়তানের আদম আলাইহিস সালাম-এর সাথে শত্রুতা আরও বেড়ে গেল। এখন সে আদম আলাইহিস সালাম-কেও আল্লাহর কাছে অপরাধী করার চেষ্টা শুরু করল। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে সে অন্যদের মন ও চিন্তায় হস্তক্ষেপ করতে পারত। সে এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে প্রথমে হাওয়া এবং তারপর আদম আলাইহিস সালাম-কে এমন একটি গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল যার ব্যবহার আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। যখন আদম ফলটি ব্যবহার করলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত থেকে বের হওয়ার নির্দেশ এল। জান্নাতের পোশাক কেড়ে নেওয়া হলো। দুজনেই জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের সতর ঢাকলেন এবং নিজেদের সহজাত লজ্জা ও হায়ার মর্যাদা রক্ষা করলেন। শীঘ্রই উভয়কে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হলো। এই মুহূর্তে মানুষ ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। হযরত আদম ও হাওয়া কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন, অন্যদিকে শয়তান তার অবাধ্যতায় অটল রইল।

আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়ার তওবা কবুল করলেন এবং তাঁদের সতর্ক করে দিলেন যে এখন শয়তান সর্বদা তোমাদের শত্রু হয়ে থাকবে, তাই তার থেকে সাবধান থেকো। এটিও জানানো হলো যে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য এবং শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য আসমানি হিদায়াতের ধারা অব্যাহত থাকবে। যে এই হিদায়াত অনুসরণ করবে সে ইহকাল ও পরকালে নির্ভয় থাকবে। আর যে একে অস্বীকার করবে সে কঠোর আজাবের যোগ্য হবে।

যেহেতু আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি এবং দুনিয়াতে তাঁদের আগমনের কাহিনী মানুষকে তার আসল উৎস, উদ্দেশ্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করে, তাই কুরআন মাজিদ ও হাদিসে নববীতে এই ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। [১]

জানা গেল যে দুনিয়াতে মানুষের আগমনের পেছনে আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ, তাঁর সান্নিধ্য অর্জন, তাঁর হুকুম পালন এবং শয়তানের জাল থেকে বেঁচে থাকার পরীক্ষাই উদ্দেশ্য ছিল। এটাই ছিল সেই রহস্য যার জন্য আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁর বংশধারা পরিচালিত হয়েছিল।

---

[১] লক্ষ্য করুন: সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩০ থেকে ৩৯; সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১১ থেকে ২৫; সূরা আল-হিজর, আয়াত: ২৬ থেকে ৪২।

হযরত আদম (আ.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বংশধরের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছিল। [১]

এখানে আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির এই কাহিনী যা কুরআন মাজীদ ও হাদীস মুবারাকায় বর্ণিত হয়েছে (এবং যার সমর্থন তাওরাত ও ইঞ্জিল তাদের বর্তমান বিকৃত অবস্থায়ও করে থাকে), তা এই সত্যকে স্পষ্ট করে যে সমস্ত মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান; সবাই এক পিতার সন্তান এবং মানুষ হওয়ার খাতিরে একে অপরের ভাই। এর মাধ্যমে এই সত্যও সামনে আসে যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মানুষের বানরের বংশধর হওয়ার ধারণাটি নিছক গালগল্প, যা সমস্ত আসমানী ধর্মের পরিপন্থী এবং ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার পাশাপাশি বিবেকেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি প্রাচীনকালের বানর বিবর্তিত হতে হতে মানুষ হতে পারত, তবে বর্তমান যুগের বানর কেন বানরই রয়ে গেল, মানুষ কেন হলো না? মানুষ হাজার হাজার বছরে অন্য কোনো সৃষ্টিতে কেন পরিণত হলো না? বিড়াল কেন সিংহ হতে পারল না এবং গাধা আজ পর্যন্ত কেন ঘোড়ায় রূপান্তরিত হলো না?

হযরত আদম (আ.) দুনিয়াতে যখন আসলেন, তখন এখানে জান্নাতের মতো নেয়ামত ও আরাম-আয়েশ ছিল না, তবুও এই দুনিয়া মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। পানাহার, সতর ঢাকা এবং বসবাস করার উপকরণ এখানে বিদ্যমান ছিল। মহাবিশ্বের স্রষ্টা এই প্রথম মানুষকে সেই উপকরণগুলো ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) গমের দানা নিয়ে আসলেন এবং হযরত আদম (আ.) সেগুলো জমিতে চাষ করে শস্য লাভ করলেন, তা পিষলেন এবং খামির তৈরি করে রুটি প্রস্তুত করলেন। [২]

জান্নাত থেকে বের হওয়ার সময় হযরত আদম ও হাওয়া গাছের পাতা দিয়ে সতর ঢেকেছিলেন। দুনিয়াতে এর স্থায়ী ব্যবস্থা এভাবে করা হলো যে, দুম্বার লোম থেকে পশমি কাপড় তৈরি করা হলো; তা দিয়ে হযরত আদম (আ.)-এর জুব্বা এবং হযরত হাওয়ার কামিজ ও ওড়না তৈরি হলো। [৩]

হযরত আদম (আ.) ও হাওয়ার সন্তানাদি হলে তাদের মধ্যে নিকাহর সিলসিলা শুরু হলো এবং এভাবেই আদম সন্তানের বংশবৃদ্ধি হলো। [৪]

বর্তমান যুগে পশ্চিমা গবেষকরা যেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন বলে অভিহিত করেছেন, সেখানে এই দাবিও করেছেন যে, শুরুতে মানুষ পশুর মতো উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত, কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত, নিকাহর কোনো ধারণা ছিল না, নারী-পুরুষ কোনো রীতি ও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই কামবাসনা পূরণ করত। হাজার হাজার বছর পর তারা খাবার রান্না করা, পোশাক পরা এবং নিকাহর অভ্যস্ত হয়েছে। এই দাবিগুলো নিছক অনুমানের ফসল, ইতিহাস এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে।

দুনিয়াতে আসার কয়েকশ বছর পর আদম সন্তানরা স্রষ্টার মৌলিক শিক্ষা ভুলে গেল এবং কুসংস্কারের গর্তে পতিত হতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য আম্বিয়া ও রাসূলগণের সিলসিলা শুরু করে দিলেন।

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার লি-আবুল ফিদা: ১/৯, ত: আল-হাবিবিয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ

[২] তারিখুত তাবারী: ১/৯০ ইবনে আব্বাস-এর বর্ণনায়, আল-মুনতাযাম: ১/২১১, ২১২

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/১০৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/১০৩

**হযরত নূহ আলাইহিস সালাম:**

পথভ্রষ্ট মানবতাকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদানকারী প্রথম নবী ছিলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, যিনি হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের এক হাজার বছর পর প্রেরিত হয়েছিলেন। [১] এক হাজার বছর পর্যন্ত মানুষ তাদের পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের দ্বীন ও ধর্মের ওপর ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে শয়তানের প্ররোচনায় তারা কয়েকজন মৃত বুজুর্গের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা শুরু করে দেয়। এই বুজুর্গরা ছিলেন ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর। কওম অন্ধ ভক্তির শিকার হয়ে তাদেরকে হাজত রওয়া এবং মুশকিল কুশা মনে করে তাদের মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়। এভাবে প্রথমবারের মতো বান্দাদের সাথে তাদের রবের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এই সম্পর্ক জোড়া লাগাতে এসেছিলেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি অসীম কষ্ট সহ্য করেছেন। অবশেষে সাড়ে নয়শ বছর নিরবচ্ছিন্ন তাবলীগের পরেও যখন কওমের অধিকাংশ তাদের জেদ, অবাধ্যতা এবং গোমরাহির ওপর অটল রইল, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন এক তুফান আসল যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শুধুমাত্র হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের আল্লাহ তাআলা নৌকায় আরোহণ করিয়ে নিরাপদ রাখলেন। [২]

তুফান থেকে বেঁচে যাওয়া ঈমানদাররা ছিলেন মাত্র আশি জন নর-নারী। তাদের মাধ্যমেই দুনিয়ার আবাদি নতুন করে শুরু হয়। তাঁর পুত্রদের: সাম, হাম এবং ইয়াফাসের বংশধর সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সামের বংশ থেকে আরব, পারস্য এবং রোম (ইউরোপ) আবাদ হয়েছে। ইয়াফাসের বংশধর থেকে তুর্কি, (চীনা) এবং ইয়াজুজ মাজুজ জন্ম নিয়েছে। হামের বংশধর আফ্রিকা আবাদ করেছে; হাবশি, সুদানি, কিবতি এবং বারবারি—সবই তাঁর বংশধর। [৩]

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানদের সেই আকিদার ওপর রেখে গিয়েছিলেন যা হযরত আদম আলাইহিস সালামের মিরাস ছিল, যার মাধ্যমে মানুষ তার আত্মা ও হৃদয়ের গভীর থেকে জেগে ওঠা এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যায় যে, এই মহাবিশ্বে আমার অবস্থান কী? মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো, কে সৃষ্টি করেছেন, আমি কীভাবে সৃষ্টি হলাম এবং কেন? সৃষ্টিকর্তা কে, এত বড় বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টির পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য কী? মৃত্যুর পর কী হয়? ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিদান পাওয়া যায় কি না? পাওয়া গেলে কোথায় এবং কীভাবে? সঠিক আকিদা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং একে হৃদয়ের গভীর থেকে বিশ্বাস করে মানবজাতি মৌলিক চিন্তার দিক থেকে একটি পরিবারে পরিণত হয়, তখন ভাষাগত, আঞ্চলিক এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য তাদের মধ্যে পরকীয়ার দেয়াল দাঁড় করাতে পারে না।

**আদ ও সামুদ:**

কিন্তু হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কয়েকশ বছর পর মানবতা আবার গোমরাহির পথে চলতে শুরু করেছিল। ফলে আবারও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালামের প্রেরণের ধারা শুরু হলো, একের পর এক রাসূল পাঠানো হলো। জাজিরাতুল আরবের উপত্যকায় আবাদ...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১৩/১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১৮/১, ১২৫

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২৯/১

মূর্তিপূজারী ‘আদ’ জাতির প্রতি হযরত হুদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। এই জাতি শক্তি, শারীরিক গঠন এবং যুদ্ধবিদ্যায় অতুলনীয় ছিল এবং এই অহংকারে তারা হযরত হুদ (আ.)-কে অস্বীকার করেছিল, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তীব্র ঝড়ের আযাব আসল, যা তাদের নির্মূল করে দিল।

হিজাজ থেকে সিরিয়া যাওয়ার মহাসড়কে ওয়াদিয়ে হিজরে বসবাসকারী ‘সামুদ’ জাতি স্থাপত্যবিদ্যায় নিজেদের উপমা নিজেরাই ছিল। পাহাড় কেটে মজবুত ঘর তৈরি করা তাদের বাঁ হাতের খেল ছিল। তাদের সংশোধনের জন্য হযরত সালেহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। জাতি তাকে অস্বীকার করল এবং নিজেদের কুসংস্কার ত্যাগ করল না। অবশেষে এক বিকট শব্দ এবং ভূমিকম্প তাদের ধ্বংস করে দিল। [১]

আদ ও সামুদ জাতিসহ আরবের এমন অনেক জাতি ছিল যাদের নাম-নিশানা একেবারেই মুছে গেছে। তাদের ‘আরবে বায়িদা’ বলা হয়, তাদের উল্লেখ কেবল আসমানী কিতাবসমূহ, লোকগাথা এবং প্রাচীন কবিতায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

**দাওয়াত ইবরাহীম (আ.):**

বিভিন্ন জাতির প্রতি আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন অব্যাহত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত পৃথিবীতে জনসংখ্যার আধিক্য ঘটেছিল, পূর্ব ও পশ্চিমে ডজন ডজন সাম্রাজ্য এবং শত শত শহর অস্তিত্বে এসেছিল। তাই নবীদের সিলসিলাও বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। একই সময়ে বিভিন্ন এলাকা, জাতি ও দেশের জন্য একাধিক নবী পাঠানো হতো। প্রত্যেক নবীকে বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কোরবানি, আত্মবিস্মৃতি, খোদা-পরিচিতি এবং আত্মোৎসর্গের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ইরাকের বাবেল শহরের নিকটবর্তী জনপদ ‘কুসা’-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নূহের প্লাবনের তখন এক হাজার একাশি বছর অতিবাহিত হয়েছিল, সেই সময়ে ইরাক এবং এর আশপাশে নমরূদ নামক এক জালিম ও স্বৈরাচারী বাদশাহর শাসন ছিল যে খোদায়ীর দাবিদার ছিল। ‘বাবেল’ ছিল তার রাজধানী। ইরাকের লোকেরা একদিকে তাকে খোদা মানত, অন্যদিকে তারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং প্রকৃতির শক্তিসমূহের খোদায়ীরও প্রবক্তা ছিল। এর পাশাপাশি তারা মূর্তিপূজারীও ছিল, খোদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা আজর ছিল মূর্তি নির্মাতা। যেন শিরক এবং কুসংস্কারের সমস্ত ব্যাধি এই জাতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। [২]

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা সত্যের পরিচয় দান করেন এবং নবুওয়াতের মর্যাদা দিয়ে জাতির সংশোধনের নির্দেশ দেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) সেই লোকদের বোঝালেন এবং তাদের সামনে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের অসারতা প্রকাশ করলেন যে, এগুলো নিজের ইচ্ছায় উদিত হয় না আর না অস্ত যায়। এগুলো রব কীভাবে হতে পারে? যখন লোকেরা মানল না, তখন একদিন তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে বললেন: “যদি এরা কথা বলতে পারে তবে এদেরকেই জিজ্ঞেস করো।”

জাতি হতভম্ব হয়ে গেল এবং কোনো উত্তর না পেয়ে লজ্জিত হয়ে বলল: “ইবরাহীম! তুমি তো জানো, এরা কথা বলতে পারে না।”

---

[১] সূরা হুদ, আয়াত: ৫০ থেকে ৬৮; সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৭৫ থেকে ৮২; আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/ ১০ থেকে ১৩; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ৮২ থেকে ৮৫

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ৮৬; আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/ ১২, ১৫

হযরত ইবরাহিম (আ.) বললেন: “তবে কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের ইবাদত করছ যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর তাদের প্রতি।”

কওম এই দলীলসমূহের কোনো জবাব দিতে পারল না। তারা শোরগোল শুরু করল যে, নিজেদের উপাস্যদের সম্মান রক্ষার্থে এই ব্যক্তিকে ধরে পুড়িয়ে দাও। [১]

হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে নমরূদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সে প্রভাব বিস্তার করার জন্য সওয়াল-জওয়াব করল। হযরত ইবরাহিম (আ.) নির্ভীকভাবে তাঁর রবের তাওহীদ বর্ণনা করলেন এবং বললেন: “আমার রব তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।”

নমরূদ বলল: “আমিও জীবন দান করতে পারি এবং মারতে পারি।”

এই কথা বলে সে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন কয়েদিকে মুক্তি দিল এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ডেকে এনে হত্যা করাল। অথচ কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া তাকে সৃষ্টি করার শামিল নয়। একইভাবে কাউকে হত্যা করার মাধ্যমে কোনো মানুষ বান্দাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক হয়ে যায় না। কারণ এভাবে তো প্রত্যেক মানুষ যে কাউকে হত্যা করে, তাকে জীবন ও মৃত্যুর ওপর ক্ষমতাবান গণ্য করা উচিত এবং তার নিজেরও কখনো মৃত্যু আসা উচিত নয়। কিন্তু নমরূদের মতো জ্ঞানান্ধকে এসব দলীল দেওয়া বৃথা ছিল। তাই হযরত ইবরাহিম (আ.) একটি অত্যন্ত স্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করলেন যে, আমার রব সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি যদি রব হও তবে তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও। নমরূদ হতভম্ব হয়ে গেল এবং কোনো জবাব দিতে পারল না। [২]

অবশেষে সেও তার কওমের মতো হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হলো এবং হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে মিনজানিকের মাধ্যমে তাতে নিক্ষেপ করা হলো। সেই সময়েও হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর মুখে এই ধ্বনি ছিল:

“اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتَ الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ”

“হে আল্লাহ! আসমানেও আপনি একক এবং জমিনেও আপনি একক। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।”

এরই মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) আবির্ভূত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: “কোনো প্রয়োজন থাকলে আদেশ করুন।”

তিনি বললেন: “তোমার কাছে প্রয়োজন পেশ করার প্রয়োজন নেই।”

সেই আগুনের উত্তাপ এমন ছিল যে, উঁচুতে উড়ন্ত পাখিও পুড়ে কাবাব হয়ে যেত। কিন্তু হযরত ইবরাহিম (আ.) যখন তাতে নিক্ষিপ্ত হলেন, তখন তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এল:

“يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ [৩]”

“হে আগুন! তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও!”

সেই মুহূর্তেই আগুন হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জন্য একটি বাগানে পরিণত হলো। হযরত ইবরাহিম (আ.) চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করেন।

---

[১] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৫১ থেকে ৬৮

[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৮

[৩] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯

থাকলেন, তিনি বলতেন: “এই দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সেরা এবং সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দিন।” [১]

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতাকেও তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: “আপনি কেন এমন জিনিসের ইবাদত করেন যা শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেও আসতে পারে না?” পিতা উত্তর দিয়েছিলেন: “ইব্রাহিম! তুমি কি আমার উপাস্যদের অস্বীকারকারী? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব।” [২]

অবশেষে কওম ও পরিবারকে গোমরাহীর ওপর অটল দেখে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম স্বদেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর চাচাতো বোন ‘সারা’ ঈমান এনেছিলেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাঁকে বিবাহ করলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর সাথে তাঁর ভাতিজা লুতও ছিলেন, তিনিও ঈমান এনেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর ভাগ্যেও নবুওয়াতের সম্মান লিখে দিয়েছিলেন। [৩]

আল্লাহ এটি নির্ধারণ করেছিলেন যে, পথভ্রষ্ট মানুষ এবং বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে একত্বের সুতোয় গেঁথে একটি উম্মত তৈরি করা হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাওহীদের প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আগুনে ঝাঁপ দিয়ে এবং নিজের উদ্দেশ্যের জন্য পিতা, পরিবার, গোত্র ও দেশ ত্যাগ করে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি এই সম্মানের যোগ্য যে তাঁকে আল্লাহর মনোনীত শেষ উম্মতের আদি পিতা বানানো হবে। কিন্তু এখনও পরীক্ষার কিছু ধাপ বাকি ছিল, প্রেম ও বিশ্বস্ততার আরও কিছু কাহিনী রচিত হওয়া বাকি ছিল।

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাওহীদের দাওয়াতের বীজ বপন করার জন্য উপযুক্ত ভূমির সন্ধানে সফর করতে থাকেন। তিনি কিছুকাল শামে থাকার পর তাঁর স্ত্রী সারার সাথে মিশরে চলে যান, যেখানে শাসক তওয়াইস (বেনান বিন আলওয়ান) তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ একজন তরুণীকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। [৪]

সিনান বিন আলওয়ানের সম্পর্ক ছিল হাইকোস (রাখাল শাসক) পরিবারের সাথে, যারা মূলত আরব ছিল। যে তরুণী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর বিবাহে এসেছিলেন, প্রবাসে এসে তিনি ‘হা জার’ অর্থাৎ অপরিচিত নারী হিসেবে পরিচিত হন, এই শব্দটি আরবিতে ‘হাজেরা’ হয়ে যায়। [৫]

হযরত হাজেরার গর্ভে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর একটি পুত্র সন্তান ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি যে, আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন তাঁর স্ত্রী হাজেরা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাইলকে মক্কার একটি উপত্যকায় রেখে আসতে। এটি ছিল দ্বিতীয় বড় পরীক্ষা, যাতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একা ছিলেন না, তাঁর স্ত্রীও এই পরীক্ষায় সমান অংশীদার ছিলেন, কারণ শেষ উম্মতের মুকুটধারীর মা হওয়ার জন্য কঠিন পরীক্ষায় অবিচল থাকা শর্ত ছিল।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ৮৫ থেকে ৮৭

[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪২ থেকে ৪৮ (৩) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/ ১৬৮, ১৬৯

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৩৫৮, কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ৮৮; আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/ ১৩

সহীহ বুখারীর এই বর্ণনায় ‘ফামা খাদামাহা হাজারা’ শব্দ থেকে ঐতিহাসিকগণ সাধারণত বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে সাইয়্যেদা হাজেরাকে দাসী হিসেবে গণ্য করেন, কিন্তু কাজী সুলাইমান মনসুরপুরী বিস্তারিতভাবে দলিল সংগ্রহ করে প্রমাণ করেছেন যে তিনি দাসী ছিলেন না বরং মিশরের বাদশাহর কন্যা ছিলেন। (রাহমাতুল্লিল আলামীন: ২/ ৩০৯ থেকে ৩১১, মারকাজুল হারামাইন আল-ইসলামী)

[৪] তাঁর হিব্রু নাম ছিল ‘হাফার’। যখন মিশরের ফেরাউন সাইয়্যেদা সারার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে হযরত হাজেরাকে সাথে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ‘আজর’, অর্থাৎ এটি সেই বিপদের প্রতিদান যা বাদশাহর জুলুমের কারণে সহ্য করতে হয়েছিল। তারপর যখন হিজরত করলেন এবং মক্কায় বসতি স্থাপন করলেন, তখন তাঁর নাম হলো ‘হাজেরা’। (রাহমাতুল্লিল আলামীন: ২/ ৩০৮)

হযরত ইব্রাহিম (আ.) এক দীর্ঘ সফর শেষে সিরিয়া থেকে জাজিরাতুল আরবে পৌঁছালেন এবং স্ত্রী ও সন্তানকে মক্কার তপ্ত মরু প্রান্তরে আল্লাহর ওপর ভরসা করে রেখে ফিরে যেতে লাগলেন। স্ত্রীর কাছে পাথেয় হিসেবে কেবল একটি পানির মশক এবং এক থলে খেজুর রেখে দিলেন। বিস্মিত ও চিন্তিত হযরত হাজেরা তাঁর পিছু পিছু চললেন এবং ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: "ইব্রাহিম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমাদের এই জনমানবহীন ও উদ্ভিদহীন উপত্যকায় কার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছেন?"

হযরত ইব্রাহিম (আ.) জানতেন যে, এই পরীক্ষা কেবল তাঁর নয়, বরং তাঁর স্ত্রীরও। তাঁর নিজেরই বোঝা উচিত যে, আমার মতো একজন স্বামী কেন তাঁর মতো স্ত্রী এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এমন নির্জন স্থানে রেখে যেতে পারেন। যখন হযরত হাজেরা বারবার একই প্রশ্ন করলেন এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.) নীরবে নিজের পথে চলতে থাকলেন, তখন স্ত্রী বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন এবং উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন: "আল্লাহ কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন?" খলিলুল্লাহ (আ.) বললেন: "হ্যাঁ, এটাই সত্য।"

হযরত হাজেরার মন শান্ত হয়ে গেল, কারণ আল্লাহর ওপর তাঁর তেমন ভরসা ছিল যেমন একজন দৃঢ় ঈমানদার বান্দার থাকা উচিত। "আমি তাঁর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট," এই কথা বলে হাজেরা ফিরে গেলেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন মক্কার গিরিপথ অতিক্রম করলেন এবং জীবনসঙ্গিনী ও সন্তান দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন তিনি ঘুরে সেই উপত্যকার দিকে মুখ করলেন যেখানে তিনি স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে এসেছিলেন। [১] তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী, তিনি জানতেন যে পাহাড়বেষ্টিত মক্কার এই উপত্যকা মহাবিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র স্থান, যেখানে আজও আল্লাহর প্রথম ঘরের নিদর্শন বালির স্তরের নিচে লুকায়িত আছে এবং শত শত বছর ধরে নবী ও রাসূলগণ এর জিয়ারত করতে এবং এর বরকত হাসিল করতে এখানে আসতেন।

তখন একজন অনুগত মুমিন এবং একজন স্নেহময় পিতার মতো তিনি হাত তুলে আল্লাহর দরবারে এই ব্যাকুল প্রার্থনা পেশ করলেন:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

(হে আমাদের রব! আমি আমার সন্তানদের আপনার মহিমান্বিত ঘরের নিকট এমন এক প্রান্তরে আবাদ করছি যা চাষাবাদের যোগ্য নয়; হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূল আহার করতে দিন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।) [২]

হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত হাজেরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করা, তাঁর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর সন্তুষ্টির সামনে মাথা নত করা এবং তাঁর খাতিরে বড় থেকে বড় কোরবানি দেওয়ার এক চিরন্তন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটি ছিল বিশ্বাসের সেই সম্পদ যার ওপর ভিত্তি করে শেষ উম্মতকে অস্তিত্বে আনার প্রস্তুতি চলছিল এবং এর উপাদানগুলো হাজার হাজার বছর আগে থেকেই একত্রিত করা হচ্ছিল।

---

[১] সহীহ বুখারী: হা: ৩৩৬৪, ৩৩৬৫, কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: ওয়াত্তখাযাল্লাহু ইব্রাহিমা খলিলা।

[২] সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৭।

আল্লাহ হযরত হাজেরা এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর কোরবানিকে সফল করেছেন, যেমনটি হযরত হাজেরা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ধ্বংস করেননি বরং তাঁদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বল করে দিয়েছেন।

**জমজম:**

হযরত ইব্রাহিম (আ.) চলে যাওয়ার পর হযরত হাজেরা তাঁর সন্তানকে দুধ পান করাতে থাকলেন এবং নিজে সেই মশক থেকে পানি পান করতে থাকলেন যা তাঁর কাছে ছিল। কিন্তু তপ্ত মরুভূমিতে এই সামান্য পানি কতক্ষণই বা চলত, শীঘ্রই তা শেষ হয়ে গেল। মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেল, ছোট শিশুটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ছটফট করতে লাগল। হযরত হাজেরা তাঁর অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং সাহায্যের সন্ধানে বারবার উপত্যকার দুই পাহাড় সাফা ও মারওয়ার ওপর চড়ে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। এদিকে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। তখন হঠাৎ একটি আওয়াজ ভেসে এল যেন কেউ আসছে। হযরত হাজেরা আগন্তুককে দেখার আগেই চিৎকার করে বললেন: "সাহায্য করো, যদি তোমার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে।"

পরের মুহূর্তেই ফেরেশতাদের সরদার হযরত জিবরাঈল (আ.) আবির্ভূত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উপত্যকার এক কোণে তাঁর ডানা দিয়ে আঘাত করলেন এবং দেখতে দেখতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পা ঘষতে থাকা দুগ্ধপোষ্য ইসমাইলের জন্য জমজমের সেই ঝরনা প্রবাহিত হয়ে গেল, যার পানির মিষ্টতা, পুষ্টিগুণ, নিরাময় ক্ষমতা এবং অস্বাভাবিক পরিমাণ আজও সারা বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করে রেখেছে। [১]

এই মোজেজার প্রভাবে এবং জমজমের এই ঝরনার বরকতে মরুভূমিতে জীবনের উৎস ফুটে উঠল। ইয়েমেনের এক যাযাবর গোত্র বনু জুরহুম এখান দিয়ে যাচ্ছিল যারা পানি ও পশুখাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গোত্রের লোকেরা দূর থেকে আকাশে পাখিদের উড়তে দেখে বুঝতে পারল যে নিকটবর্তী এলাকায় পানি পাওয়া যাচ্ছে। তখন তাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবাক হয়ে বলতে লাগল, "আমরা আগেও এখান দিয়ে যাতায়াত করেছি কিন্তু কোথাও পানির নামনিশানাও দেখিনি।" তারা কাছে পৌঁছালে জমজমের ঝরনা এবং তার পাশে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাইলকে দেখতে পেল। তারা বলল: "আমাদের এখানে বসবাসের অনুমতি দিন।" হযরত হাজেরা অনুমতি দিলেন। এভাবে বনু জুরহুম এখানে বসতি স্থাপন করল। তাদের বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনু কাহতানের সাথে যাদেরকে "আরবে আরিবা" বলা হয়। এরা ছিল আসল ও খাঁটি আরব, যাদের আদি নিবাস ছিল ইয়েমেন। হযরত ইসমাইল (আ.)-এর ভাষা ছিল সুরয়ানি কিন্তু বনু জুরহুমের মধ্যে লালিত-পালিত হয়ে তিনিও আরবি ভাষা শিখে নেন। হযরত ইসমাইল (আ.) থেকে যে বংশধারা চলেছে তাকে "আরবে মুসতারিবা" বলা হয়, অর্থাৎ এরা ছিল অন্য বংশের সাথে মিশ্রিত আরব। [২]

**পুত্রের কোরবানি:**

এখনও হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর একটি পরীক্ষা বাকি ছিল যা পূর্ববর্তী উভয় পরীক্ষার চেয়েও কঠিন ছিল; কারণ এবার এতে খোদ সন্তানের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। স্বপ্নে আল্লাহর নির্দেশ এল, "হে ইব্রাহিম! তোমার পুত্রকে কোরবানি করো।" এভাবে হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত হাজেরা এবং অল্পবয়সী ইসমাইল—তিনজনকেই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো।

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৩৬৪, কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৯০

তৌফিকে আযলি তাদের সঙ্গী হলো এবং তারা তিনজনই আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন। শয়তান এই সুযোগে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল যাতে কোনোভাবে মহাবিশ্বের এই পবিত্রতম বান্দাদের সংকল্পে ফাটল ধরানো যায়। তাদের আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করা যায়, কিন্তু মা, বাবা এবং ছেলে তিনজনই নিজ নিজ অবস্থানে আল্লাহর প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তারা শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিলেন। আর পরিশেষে মিনার প্রান্তরে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানি করার জন্য তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা এলো, 'ইব্রাহিম! তুমি সত্যের পরীক্ষায় সফল হয়েছ।' দেখা গেল হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর স্থলে একটি দুম্বা জবেহ হয়ে গেছে। [১]

সময়ের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর জীবনের তিনটি বড় পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। এখন এই মনোনীত নবী এবং তাঁর পরিবারকে পুরস্কারে ভূষিত করার পর্যায় চলে এসেছিল।

**কাবা ঘরের নির্মাণ:**

আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সেই সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার যোগ্য ব্যক্তির জন্য ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষায় ছিল। এই সম্মান ছিল সেই ঘর নির্মাণের, যা ছিল পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রথম ইবাদতখানা। যখন আল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে নামিয়েছিলেন, তখনই তাঁকে এই ঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের নির্দেশনায় বাইতুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি আল্লাহর শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী তা তাওয়াফ করেছিলেন এবং আরাফাতের ময়দানে গিয়ে হজের অন্যান্য রোকন আদায় করেছিলেন। তাঁর পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ইবাদতখানা আল্লাহর তাওহীদের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর সময়ে যখন তুফান এলো, তখন বাইতুল্লাহর ইমারত তুলে নেওয়া হলো, কেবল ভিত্তিগুলোই অবশিষ্ট রইল। [২]

সময়ের আবর্তনে সেই ভিত্তিগুলোর ওপরও বালির স্তূপ জমে গেল এবং কাবা পুরোপুরি আড়ালে চলে গেল। আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে এই সম্মান দান করলেন যে, বাইতুল্লাহকে তাঁর এবং তাঁর পুত্রের হাতে আবারও এমনভাবে নির্মাণ করালেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত এর মহিমা ও সম্মানের খ্যাতি ছড়িয়ে থাকে। আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে বাইতুল্লাহর সীমানা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে এটি নতুন করে নির্মাণ করতে। কুরআন মাজিদে আছে:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

"আর যখন আমি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর জন্য সেই ঘরের (কাবা ঘরের) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং তাকে এই নির্দেশনা দিয়েছিলাম যে, দেখো তুমি আমার সাথে কাউকে শরিক করো না, আর আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাওয়াফকারীদের জন্য, কিয়ামকারীদের জন্য এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য।" [৩]

---

[১] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০৩ থেকে ১০৭

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৫০, ৫১

[৩] সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৬

সুতরাং এখন বাইতুল্লাহ পুনরায় তাওহীদের প্রচার এবং আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতের কেন্দ্রে পরিণত হতে যাচ্ছিল।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই মহান উদ্দেশ্যে আরও একবার ফিলিস্তিন হয়ে মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌঁছালেন। তাঁর যুবক পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম, যিনি তীরন্দাজি এবং তীর নির্মাণে পারদর্শী ছিলেন, সেই সময় যমযম কূপের পাশে বসে তীর তৈরি করছিলেন। পিতাকে আসতে দেখে তিনি মহব্বত ও উষ্ণতার সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললেন: "বৎস! আল্লাহ আমাকে একটি বিশেষ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।"

হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম আরজ করলেন: "আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তা পালন করুন।"

তিনি বললেন: "এতে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?" তিনি আরজ করলেন: "হ্যাঁ! আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সামনের একটি টিলার দিকে ইশারা করে বললেন: "আল্লাহর নির্দেশ হলো আমি এখানে তাঁর একটি ঘর নির্মাণ করি।"

এখন পিতা ও পুত্র মিলে আল্লাহর বাতলে দেওয়া সীমানা ও পরিমাপ অনুযায়ী ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম পাথর এনে দিতেন এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ভিত্তি গেঁথে যেতেন। যখন ভিত্তি কিছুটা উঁচু হলো তখন এক কোণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা হলো। পিতা ও পুত্র উভয়েরই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা এমন এক কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করছেন যেখান থেকে আল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকের তাওহীদের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, যা ভগ্ন হৃদয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন দল, পথভ্রষ্ট মানুষ এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাতিগুলোকে তাওহীদের এক বিন্দুতে সমবেত করবে, যা শত শত মিল্লাত এবং হাজার হাজার ফেরকাকে একত্রিত করে "উম্মতে ওয়াহিদা" বা এক উম্মতের মর্যাদা দান করবে।

উদ্দেশ্যের এই মহত্ত্বের কথা মাথায় রেখে পিতা ও পুত্র উভয়েই কাবার চারপাশে ঘুরতেন এবং আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করতেন:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।) [১]

যখন কাবা নির্মাণ সম্পন্ন হলো তখন মানব ইতিহাসের এই দুই মহান নবী সেই দোয়া করলেন যা নিজের মধ্যে বিশ্বের শেষ রাসূল এবং শেষ উম্মতের সাথে বিশেষ নিসবত বা সম্পর্ক লাভের আকুতি বহন করছিল:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।) [২]

দোয়া কবুল হলো। শেষ নবীর আবির্ভাব আওলাদে ইসমাইল থেকে হওয়া নির্ধারিত হয়ে গেল, তবে এর সাথে সাথে ইহাও ফয়সালা হয়ে গেল যে ইসমাইলের বংশধর...

---

[১] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৭; সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৩৬৫, কিতাব আহাদীসিল আম্বিয়া

[২] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৯

...সেই একজন নবীই আসবেন যিনি এক হয়েও সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন। যার হাতে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব সংঘটিত হবে।

**হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমাস সালাম:**

সিরিয়ায় বসবাসকারী হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত সারাহ-এর গর্ভে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের বিশাল ভূখণ্ডে মানবতার সংস্কারের কাজ তাঁর সন্তানদের ওপর অর্পণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে বড় বড় মর্যাদাবান রাসূল জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত মুসা, হযরত ইউশা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত উযাইর, হযরত যাকারিয়া এবং হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালাম।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর পরবর্তী সকল পয়গম্বর ও আম্বিয়ায়ে কেরাম বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত ছিলেন; কারণ তাঁদের নবুওয়াত হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর বারো ছেলের বংশ থেকে জন্ম নেওয়া গোত্রগুলোর মধ্যে হতে থাকে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর নাম ছিল 'ইসরাঈল' (আল্লাহর বান্দা), তাই তাঁর বংশধরদের নবীদের 'আম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল' বলা হতো।

**হযরত লুত আলাইহিস সালাম:**

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ওপর শুরুতেই যারা ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর ভাতিজা লুত আলাইহিস সালাম অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সাথেই হিজরত করেছিলেন এবং জর্ডানে কওমে সদূম-এর এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। [১]

আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেন এবং এই পথভ্রষ্ট জাতির সংস্কারের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন, যারা যৌন তৃপ্তির অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত লুত আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের বোঝাতে থাকেন, কিন্তু এই নির্লজ্জ লোকেরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁদের ওপর শিক্ষণীয় আযাব নাযিল হলো। কওমে সদূম-এর জনপদগুলো উল্টে দেওয়া হলো, আকাশ থেকে তাঁদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হলো। হযরত লুত আলাইহিস সালাম এবং অল্প কয়েকজন ঈমানদার ব্যতীত, যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আযাব আসার আগে জনপদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কোনো প্রাণধারীই জীবিত বাঁচেনি। [২]

কওমে সদূম-এর জনপদগুলো এমনভাবে নাম-নিশানাহীন হয়ে গেল যে, আজও সেখানে একটি অত্যন্ত তিক্ত সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, যাকে 'মৃত সাগর' (Dead Sea) বলা হয়। এই সমুদ্রে কোনো প্রাণী জন্ম নেয়নি এবং নিতেও পারে না।

**হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম:**

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালাম সিরিয়ায় তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর পূর্ণ চেষ্টা ছিল যেন তাঁর বংশধররা মিল্লাতে ইবরাহিমির ওপর অটল থাকে এবং হেদায়েতের এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতাকে উপকৃত করতে থাকে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে ইসরাঈল ও আইস অত্যন্ত খ্যাতিমান হন। আইস-এর বংশধরদের মধ্য থেকে হযরত আইয়ুবকে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত দান করেন। তিনি অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন; বাগান, গবাদি পশু, অট্টালিকা—সবকিছুই তাঁর ছিল।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/১০৫, ১০৯

[২] সূরা হুদ, আয়াত: ৭০ থেকে ৮৩; আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/১৫

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘকাল সুখ ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করেন, তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে একের পর এক পরীক্ষায় ফেলেন। তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন। পরিবার-পরিজনও দুর্ঘটনার শিকার হয়। কেউ খোঁজখবর নেওয়ার ছিল না কিন্তু তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সেবা করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ অনুগ্রহ করেন এবং ১৮ বছর অসুস্থ থাকার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবন সুখে শুকরিয়া এবং বিপদে সবরের এক সর্বোত্তম উদাহরণ হয়ে আছে। [১]

**হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম:**

হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইয়াকুবকেও আল্লাহ নবুওয়াত দান করেন এবং তাঁর বংশ থেকে মহান পয়গম্বরদের একটি ধারা জারি রাখেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর বারো জন পুত্র ছিল, যাদের মধ্যে হযরত ইউসুফ সবচেয়ে প্রিয় ও প্রতিভাবান ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অতুলনীয় সৌন্দর্যও দান করেছিলেন। অন্য ভাইয়েরা হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং একটি কূপে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রক্ষা করেন। নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী একটি কাফেলা তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করে এবং মিশরের বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। মিশরের উজির যাকে "আজিজ" বলা হতো, তাঁকে কিনে ঘরের ব্যবস্থাপক বানিয়ে দেন। আজিজের স্ত্রী তাঁর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাঁকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে। যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার জালে পা দিলেন না, তখন সে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কারাগারে যেতে বাধ্য করে, যেখানে চৌদ্দ বছর কাটানোর পর অবশেষে তিনি তখন মুক্তি পান যখন মিশরের বাদশাহ রায়ান বিন ওয়ালিদ একটি অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে অক্ষম হন। এই ব্যাখ্যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রদান করেন এবং বাদশাহ তাঁর জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কেবল মুক্তি দেওয়ার নির্দেশই দেননি বরং নিজের অর্থমন্ত্রী বানিয়ে দেন। ক্ষমতা লাভের পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদের এবং পিতাকেও নিজের কাছে মিশরে ডেকে নেন। [২] হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ১১০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এর চৌষট্টি বছর পর বনী ইসরাঈলের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়। [৩]

**মিশর এবং মিশরের ফেরাউনগণ:**

মিশরীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে একটি ছিল। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর পৌত্র বাইসার বিন হাম নূহের প্লাবনের পর তাঁর পরিবারের ত্রিশ জন সদস্যের সাথে নীল উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং বর্তমান কায়রো থেকে বারো মাইল (১৯ কিলোমিটার) দূরে "মানফ" শহর আবাদ করেন। বাইসারের পুত্র "মিশর" দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং গোত্রকে সংগঠিত করেন। তাঁর কীর্তির কারণে এই অঞ্চলটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। মিশরে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকই ছিল বিদেশি, তাদের মধ্যে কিবতিও ছিল, আমালিকাও ছিল এবং গ্রিকও ছিল। তবে কিবতিরা সংখ্যাগুরু ছিল।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/ ২৩৫ থেকে ২৩৯

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ১২৪ থেকে ১৩৭

[৩] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/ ৮০, ৮১

এই অঞ্চলটি প্রবাসীদের জন্য একটি চমৎকার আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রমাণিত হতে থাকে। স্থায়ী শান্তি এবং নীল নদ উপত্যকার কৃষি সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিল। মিশরের অধিবাসীরা কিমিয়া বিদ্যা, নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। আকিদার দিক থেকে তারা পথভ্রষ্ট ছিল এবং সূর্যের পূজা করত। শয়তানি বিদ্যা তাদের মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল। মিশরের জাদু সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। মিশরের শাসন ক্ষমতা প্রথমে মিশরেই আবর্তিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে সিনান বিন আলওয়ান (তুলিস) ছিলেন সেই শাসক যার আমলে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মিশরে এসেছিলেন এবং এখানে হাজেরা (হাজর) তাঁর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

সিনানের পর এই বংশের পতন শুরু হয়। একের পর এক দুইজন নারী ক্ষমতায় আসেন, যাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিরিয়ার আমালেকা সম্প্রদায় মিশর দখল করে নেয়।

মিশরে আমালেকাদের প্রথম রাজা ছিলেন ওয়ালিদ বিন দৌমা, যিনি গরুর পূজারি ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম "ফেরাউন" উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মিশরে আসা প্রত্যেক রাজাকেই ফেরাউন বলা হতে থাকে, এমনকি কিছু ঐতিহাসিক মিশরের পূর্ববর্তী রাজাদেরও ফেরাউন বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তারা এই উপাধি গ্রহণ করেননি। ওয়ালিদের পুত্র রাইয়ানের সময়ে মিশরের মাটিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো উজিরের সৌভাগ্য লাভ হয়। [১] সম্ভবত মিশরের এই ফেরাউনরা মুমিন না হওয়া সত্ত্বেও খোদায়িত্বের দাবিদার ছিল না এবং সাধারণ মানুষের প্রতি তারা নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিল না, অন্যথায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করতেন না।

রাইয়ানের পুত্র দারুমের রাজত্বকালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইন্তেকাল হয়। মিশরের স্থানীয় মানুষ এই মহান নবীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল তো লাভ করেছিল, কিন্তু তারা তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি। বরং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর তারা মনে করেছিল যে ঈমানি ফয়েজের এই ঝরনাধারা বন্ধ হয়ে গেছে, তারা বলেছিল: "তাঁর পর আল্লাহ আর কোনো রাসূল পাঠাবেন না।" [২]

এর পাশাপাশি মিশরের অধিবাসীরা পার্থিব জীবিকা ও নির্মাণকাজে আরও বেশি মগ্ন হয়ে পড়ে এবং তারা আল্লাহর পথ থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

**ওয়ালিদ বিন মুসআব, খোদায়িত্বের দাবিদার মিশরের প্রথম ফেরাউন:**

অপকর্ম ও কুআকিদার ফলে মিশর রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়। কিবতিদের একজন ব্যক্তি ওয়ালিদ বিন মুসআব, যিনি একজন সরকারি পুলিশ অফিসার ছিলেন, আমালেকাদের শাসনের অবসান ঘটান। যেহেতু মিশরে কিবতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা ওয়ালিদ বিন মুসআবের নেতৃত্বে খুব খুশি হয়েছিল। তারা জানত না যে এই ব্যক্তিটিই তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের কারণ হবে। রাজত্ব কিবতিদের হাতে চলে যাওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে মিশর স্থিতিশীলতা লাভ করে। ওয়ালিদ বিন মুসআব মিশরের সবচেয়ে শক্তিশালী ফেরাউন হয়ে ওঠেন। তিনি নির্মাণ কাজ করান, বাহিনীকে অত্যন্ত শক্তিশালী করেন এবং অবশেষে নিজের শক্তি ও জনপ্রিয়তা দেখে খোদায়িত্বের দাবি করেন। [৩]

অন্যদিকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ভাইদের সন্তানরা বাড়তে বাড়তে বারোটি গোত্রে পরিণত হয়েছিল, যাদের "বনী ইসরাঈল" নামে ডাকা হতো। এই লোকেরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মিশরের শিরকপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা ছিল।

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/৯৮, ৫৮, ৫৭

[২] সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ৩৪

[৩] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/৫৭

সুরক্ষিত ছিলেন। যদিও পূর্ববর্তী ফেরাউনরাও তাদের সঠিক আকিদা থেকে বিচ্যুত করার জন্য বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত এবং তাদের রাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করে জোরপূর্বক শ্রম আদায় করত, কিন্তু যখন ওয়ালিদ বিন মুসআব অবাধ্যতা ও অহংকারের চরম সীমায় পৌঁছে খোদায়ি দাবি করল এবং জাতির ওপর নিজের আধিপত্য বাড়িয়ে দিল, তখন বনী ইসরাঈল পুরোপুরি দাসের পর্যায়ে চলে গেল। [১]

**হযরত মুসা আলাইহিস সালাম:**

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। তিনি বনী ইসরাঈলের একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্বে ফেরাউন একটি স্বপ্ন দেখেছিল যার ব্যাখ্যা জ্যোতিষীরা এই দিয়েছিল যে, বনী ইসরাঈল বংশের একটি শিশু ফেরাউনি সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেবে। ফেরাউন সেই শিশুকে নির্মূল করার জন্য অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করল এবং বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক শিশুকে হত্যা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সুরক্ষার এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মায়ের অন্তরে এই কথা ঢেলে দিলেন যে, তিনি যেন তাঁকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। এই সিন্দুক ভাসতে ভাসতে নীল নদের সেই খালে চলে গেল যা ফেরাউনের প্রাসাদে যেত। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া সিন্দুকটি খুললেন এবং সেই শিশুকে দত্তক নিলেন। এভাবে ফেরাউনি সাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রতীক হয়ে আসা এই মহান পয়গম্বর ফেরাউনের প্রাসাদেই লালিত-পালিত হলেন। যৌবনকালে তাঁর হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে একজন স্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয়, যার ফলে তাঁকে দেশ ছেড়ে মাদইয়ানে চলে যেতে হয়। সেখানে তিনি হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের সেবা ও সান্নিধ্যে ছিলেন এবং পরিশেষে তাঁর জামাতা হন। অবশেষে সেই সময় এল যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে তূর পাহাড়ে কথোপকথনের মর্যাদা দান করলেন এবং নবুওয়াত প্রদান করে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ফেরাউনের দরবারে তাওহীদের বাণী শোনালেন এবং দাবি করলেন যেন বনী ইসরাঈলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে প্রকাশ্য মোজেজাও দেখালেন কিন্তু সে তার জেদ ও শত্রুতার ওপর অটল রইল। পরিশেষে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে শামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মিসর ও সিনাই উপত্যকার মাঝে অবস্থিত লোহিত সাগরের কয়েক মাইল প্রশস্ত অংশ দিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির সাথে এক মোজেজা হিসেবে সমুদ্র পার হলেন। ফেরাউন তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সেই সমুদ্রেই ডুবে মরল।

ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই বনী ইসরাঈল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের অবাধ্যতা শুরু করে দিল। যেহেতু তারা মূর্তিনির্মাণ ও কারুকার্যে আসক্ত কিবতিদের সাথে শতাব্দীকাল ধরে বসবাস করে আসছিল, কিবতিদের জীবনধারা তাদের স্বভাবে বাহ্যিকতা ও বস্তুবাদী প্রবণতাকে এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, তারা বারবার এমন কোনো খোদা খুঁজত যাকে দেখা যায়। লোহিত সাগর পার হয়ে তারা এমন এক জাতিকে দেখল যারা মূর্তিপূজা করত। তারা তৎক্ষণাৎ মুসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবি করল যে, আমাদের জন্যও এমন একজন খোদা বানিয়ে দিন যাকে দেখা যায়, আমরা তার সামনে মাথা নত করব।

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/৫৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৯

মূসা (আ.) রাগান্বিত হয়ে বললেন: “তোমরা অত্যন্ত মূর্খ লোক।” [১]

মূসা (আ.) যখন তওরাত নিতে তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর কওমের এক ধূর্ত ব্যক্তি সামেরী বনী ইসরাঈলকে একটি স্বর্ণের বাছুরের মূর্তির ইবাদতের দিকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করল। বাহ্যিক পূজার মোহে পড়ে হাজার হাজার বনী ইসরাঈলী এই প্রতারণায় পড়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং পরে এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তারা নিহত হলো।

যখন মূসা (আ.) তওরাত নিয়ে ফিরে এলেন, তখন বনী ইসরাঈলের নেতারা আবারও সন্দেহ পোষণ করল যে, তারা না দেখে আল্লাহর কিতাবের ওপর কেন ঈমান আনবে। তাই তারা আবারও দাবি করল যে, আমাদের প্রকাশ্যে আল্লাহর দর্শন করাতে হবে। এর ফলে তাদের ওপর আসমানি বিদ্যুৎ চমকাল এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেল। মূসা (আ.)-এর আকুল দোয়ার পর আল্লাহ তাদের পুনরায় জীবিত করলেন, কিন্তু বনী ইসরাঈলের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর বাকি জীবন বনী ইসরাঈলের তাত্ত্বিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণে অতিবাহিত করেন। এই কাজে তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.) তাঁর সহযোগী ছিলেন। উভয়কেই কওমের পক্ষ থেকে বারবার অকৃতজ্ঞতা ও অবুঝপনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বনী ইসরাঈল তওরাতের অনেক বিধানকে কঠিন মনে করে তা অস্বীকার করত। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে বনী ইসরাঈলকে বহুবার আসমানি সতর্কবার্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। [২]

হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে তাদের পৈতৃক জন্মভূমি ফিলিস্তিনে নিয়ে গিয়ে আবাদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে এক মুশরিক কওম ‘আমালেকা’ দখলদার ছিল। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ.) যখন এই নির্দেশ শোনালেন, তখন বনী ইসরাঈল বলল, “আপনি এবং আপনার রব গিয়ে জিহাদ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।” [৩]

এই হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বদেশ ভূমির নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখলেন এবং তারা মিসর ও শামের মধ্যবর্তী ‘তীহ’ প্রান্তরের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হযরত মূসা (আ.) তাদের সংশোধনে নিরন্তর নিয়োজিত ছিলেন। কওমের প্রশিক্ষণের কাজ চলাকালেই হযরত মূসা (আ.) ইন্তেকাল করেন। [৪]

**আম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল: আহদে কুজাত (বিচারকদের যুগ), আহদে মুলুক (রাজাদের যুগ):**

হযরত মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ইউশা বিন নুন (আ.) নতুন প্রজন্মের সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বনী ইসরাঈল তাদের অতীতের ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য তাঁর পতাকাতলে সমবেত হলো এবং আমালেকা কওমের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদের কেন্দ্রীয় শহর ‘আরীহা’ জয় করল। আমালেকা পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেকে আফ্রিকায় চলে গেল এবং ‘বারবার’ নামে পরিচিত হলো। [৫]

হযরত ইউশা বিন নুন (আ.)-এর ইন্তেকালের পর প্রায় চারশ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের রাজনীতি তাদের ওলামাদের হাতে ছিল। এই যুগকে ‘আহদে কুজাত’ (বিচারকদের যুগ) বলা হয়। এর পরবর্তী ইতিহাস ‘আহদে মুলুক’ (রাজাদের যুগ) নামে পরিচিত, যাতে হযরত শামুয়েল (আ.), হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর মতো মহান নবীগণ বাদশাহ ছিলেন। তালুতের নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল...

---

[১] সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৩৮ থেকে ১৩৯, সাথে তাফসীরে ইবনে কাসীর।

[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৫৬।

[৩] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ২৪।

[৪] সূরা ত্বহা, সূরা আল-কাসাস, সূরা আশ-শুআরা; আল-কামিল ফিত-তারিখ: ১/১৬৯ থেকে ১৭২।

[৫] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ১/১৭৩ থেকে ১৭৬।

জালুত সদৃশ শত্রুকে পরাজিত করে তিনি জর্ডান নদীর ওপারের এলাকাও জয় করে নেন। হযরত দাউদ এবং হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর শাসনকাল ছিল বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যাতে ইসরাঈলিরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি হিসেবে গণ্য হতো। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর শাসন জিন, পাখি এবং বাতাসের ওপরও ছিল। সুলাইমানি সিংহাসন, যাতে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর দরবারীদের নিয়ে উপবিষ্ট হতেন, চোখের পলকে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে যেত। শেষ বয়সে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি ইবাদতগাহ নির্মাণ শুরু করান যাতে জিনরাও শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল, এই নির্মাণ চলাকালীন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। [১]

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পর বনী ইসরাঈলিরা আবারও আদর্শিক ও নৈতিক বিচ্যুতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা জবুর-এর বিষয়বস্তু বিকৃত করে দেয়। তাদের মন্দ স্বভাবের লোকেরা শয়তানি বিদ্যা, জাদু এবং গণকগিরি অত্যন্ত গর্বের সাথে শিখতে শুরু করে এবং এই দাবি করতে থাকে যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-ও জাদুর মাধ্যমে জিনদের বশীভূত করে রেখেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ) [২] আকিদা ও আদর্শের সংমিশ্রণ জাতিকে টুকরো টুকরো করে দেয় এবং তাদের আদর্শিক সংহতি শেষ হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক ঐক্যও ভেঙে পড়ে।

**শাহান-এ আজম:**

এই সময়ে প্রাচ্যে আজমের বাদশাহরা অঢেল শান-শওকত অর্জন করেছিলেন এবং ইরানিদের শাসন অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আজমের বাদশাহদের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়:

প্রথম শ্রেণি "পিশদাদিয়া" নামে পরিচিত, তাদের প্রত্যেক বাদশাহর উপাধি ছিল "পিশদাদ" যার অর্থ "ন্যায়পরায়ণ"। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাদশাহ ছিলেন "ওশহাঞ্জ"। অবশিষ্ট বাদশাহদের মধ্যে তহমুরস, জমশিদ, বিউরাসব (দাহহাক), আফরিদুন, মানুচেহর এবং আফরাসিয়াব বিখ্যাত। মানুচেহর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর সমসাময়িক ছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি "কিয়ানি" নামে পরিচিত, তাদের প্রত্যেক বাদশাহর নামের শুরুতে "কে" আসত, যার অর্থ হলো "পবিত্র"। কিয়ানিদের মধ্যে কে কুবাদ (কায়কোবাদ), কে কাউস, কে খসরু, লোহরাস্প এবং দারা অত্যন্ত নামকরা ছিলেন। কায়কোবাদ হযরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম-এর সমসাময়িক ছিলেন। দারা হলেন তিনি যিনি সিকান্দার-এ আজমের কাছে পরাজিত হয়ে নিহত হন।

তৃতীয় শ্রেণি "মুলুকুত তাওয়ায়েফ" নামে পরিচিত। এরা ছিলেন ডজন ডজন বাদশাহ যারা কিয়ানি সালতানাতের পতনের পর গ্রিকদের অধীনে ছোট ছোট রাষ্ট্র শাসন করতেন। মুলুকুত তাওয়ায়েফের সবচেয়ে নামকরা পরিবার ছিল আশগানি, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন "আশগা" (আশক) যিনি সিকান্দার-এ আজমের দুইশ ছেচল্লিশ বছর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় আশগানি বাদশাহ ছিলেন শাপুর যার শাসনের অবসান সিকান্দার-এ আজমের ৩১৬ বছর পর হয়েছিল এবং এর কিছুকাল পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়েছিল। আশগানিরা প্রায় তিনশ বছর শাসন করেন। অবশেষে সাসানি যোদ্ধা সর্দার আরদাশির বিন বাবক...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/২০০ থেকে ২১০

[২] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০২

তাদের হুকুমতের অবসান ঘটান।

এখান থেকে চতুর্থ স্তর 'ساسانی' (সাসানি)-র যুগ শুরু হয় যার প্রত্যেক বাদশাহকে খসরু (কিসরা) বলা হতো। সাসানিদের প্রথম শাসক ছিলেন আরদাশির বিন বাবাক এবং শেষ ছিলেন ইয়াজদগিরদ, যিনি হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে সিংহাসনচ্যুত হন। [১]

**বনী ইসরাঈলের পতন ও নির্বাসনের যুগ:**

আমরা বনী ইসরাঈলের সেই যুগের ওপর দৃষ্টিপাত করি যখন আকিদাগত পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে কেবল স্থায়ী ফেরকাই তৈরি হয়নি বরং তারা দুটি স্থায়ী হুকুমতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক ফেরকা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা মানত, তারা ফিলিস্তিনের দক্ষিণে 'ইয়াহুদা' নামে হুকুমত গঠন করে। দ্বিতীয় ফেরকা 'সামেরা পাহাড়'কে কিবলা বলত। তারা ফিলিস্তিনের উত্তরে 'ইসরাঈল' নামে আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে। এই যুগ যাকে 'বিভক্তির যুগ' বলা হয়, বনী ইসরাঈলের জন্য অন্যদের গোলামির ভূমিকা ছিল। এই যুগে হযরত ইরমিয়া (আ.) বনী ইসরাঈলের সংশোধনের জন্য তৎপর ছিলেন এবং তাদের আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকেন, কিন্তু এই লোকেরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। অবশেষে তাদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে পারস্যের বাদশাহ 'লোহরাসপ'-এর নায়েব বুখত নসর, যে ইরাকের শাসক ছিল, সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। জাজিরাতুল আরবের সীমান্ত দিয়ে অতিক্রম করার সময় বুখত নসর আরব গোত্রগুলোর সরদারদের সহযোগিতা লাভ করে যাদের মধ্যে কুরাইশদের পূর্বপুরুষ মা'দ বিন আদনানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুখত নসর ফিলিস্তিন আক্রমণ করে বায়তুল মুকাদ্দাসকে উজাড় করে দেয়, তাওরাতের পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়িয়ে দেয়, মা'বাদ-এ-সুলাইমানি ধ্বংস করে দেয়, হাজার হাজার বনী ইসরাঈলিকে হত্যা করে এবং প্রায় সত্তর হাজার লোককে বন্দি করে বাবেলে নিয়ে যায়। আরব গোত্রগুলোর সহযোগিতার প্রতিদান হিসেবে সে অনেক গোত্রকে ইরাকের সীমান্তে এনে বসবাস করায়। এটি হযরত মুসা (আ.)-এর ইন্তেকালের নয়শত সাতানব্বই বছর পরের ঘটনা। [২] যেখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সময়কাল তখনও পাঁচশত পঁচাশি বছর দূরে ছিল।

সত্তর বছর পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস জনশূন্য ছিল। অবশেষে পারস্যে যখন বাহমান (কুরোশ) ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি নির্বাসিত বনী ইসরাঈলিদের ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। এর পাশাপাশি তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকেও নতুন করে নির্মাণ করিয়ে দেন। বাবেল থেকে ফিরে আসা লোকদের মধ্যে হযরত উযাইর (আ.)-ও ছিলেন, যিনি নিজের মুখস্থ শক্তির সাহায্যে তাওরাত পুনরায় লিখিয়েছিলেন। এভাবে ইহুদিরা দীর্ঘ সময় পর শরীয়তের উৎস পুনরায় ফিরে পায়।

ইহুদিরা দীর্ঘ সময় পারস্যের বাদশাহদের অধীনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে যতক্ষণ না গ্রিক বিজয়ী আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এশিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং বুখত নসরের আক্রমণের চারশত পঁয়ত্রিশ বছর পর সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে কায়ানি সালতানাতের অবসান ঘটান।

এভাবে ইহুদিরা গ্রিক বাদশাহদের প্রতিনিধিদের গোলামিতে চলে যায় যাদের ফিলিস্তিনে 'হেরোডস' বলা হতো। এই অধঃপতন ও লাঞ্ছনার যুগেও বনী ইসরাঈলের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের ধারা অব্যাহত ছিল কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/ ৪৭ থেকে ৫৬

[২] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/ ৩১, ৩২

হচ্ছিল। ইহুদি আলেমরা তাওরাতকে নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিকৃত করে নবীদের সংস্কারমূলক ও পুনর্জাগরণমূলক প্রচেষ্টার কঠোর বিরোধিতা শুরু করেছিল। এ ছাড়া এই নবীদের ইউরোপীয় শাসকদের বাধা ও কঠোরতারও সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ৬৪ বছর আগে রোমান শাসক পম্পি গ্রীকদের পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করে নেন। এভাবে ইহুদিরা গ্রীকদের পর রোমানদের গোলামিতে চলে আসে। রোমানদের যুগে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর মতো দয়ালু নবীরা উম্মতের সংশোধনের জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু ইহুদিরা হযরত জাকারিয়া (আ.)-কে করাত দিয়ে চিরে হত্যা করে এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে রোমান শাসক হেরোডাস এই কারণে হত্যা করে যে, সে তার ভাতিজিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তাকে এই গুনাহ থেকে নিষেধ করেছিলেন। [১]

## হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ছয় মাস পর হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে কুমারী হযরত মারইয়াম (আ.)-এর গর্ভে পিতা ছাড়াই জন্ম দেন। তিনি ত্রিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। তিনি ফিলিস্তিনের শহরগুলোতে ঘুরে ঘুরে বনী ইসরাঈলকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহ তাকে 'ইনজিল' দান করেছিলেন যা হিকমত ও নসিহতে ভরপুর আসমানি কিতাব ছিল। কিন্তু ইহুদিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শুধু ইনজিলকেই অস্বীকার করেনি বরং হযরত ঈসা (আ.)-কেও জাদুকর আখ্যা দেয় এবং স্থানীয় রোমান শাসকের সাথে মিলে বনী ইসরাঈলের এই শেষ নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-কে ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কবল থেকে রক্ষা করে আসমানে তুলে নেন এবং ইহুদিরা তাদের নিজেদের 'খবরদাতা' 'ইয়াহুদা'-কে, যাকে আল্লাহর নির্দেশে সেই মুহূর্তে হযরত ঈসা (আ.)-এর সদৃশ করে দেওয়া হয়েছিল, গ্রেপ্তার করে ফেলে। আদালতে যথাযথ বিচারকার্য চালিয়ে সেই ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। [২]

ইহুদিরা তখন থেকেই এই ভুল ধারণায় লিপ্ত যে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছে, যদিও কুরআন মাজিদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে: "তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি।" [৩]

## ইহুদিদের ইয়াসরিবে আগমন

হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ইহুদিদের অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যায়। তারা অন্যান্য জাতির আধিপত্য থেকে বের হতে এবং তাদের বশীভূত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান শাসক টাইটাস (Titus) তাদের ব্যাপক গণহত্যা চালায় এবং হাইকালে সুলাইমানি (সলোমন টেম্পল) ধ্বংস করে দেয়। ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে আরেক শাসক আদ্রিয়ান তাদের ওপর আরও জুলুম চালায় এবং তাদের বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দেয়। ইহুদিরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কিছু লোক জাজিরাতুল আরবের 'ইয়াসরিব' শহরে এসে বসতি স্থাপন করে।

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/ ৩৩, ৩৪

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ২৭৩ থেকে ২৮৬

[৩] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১৫৭

## খ্রিস্টধর্মে অনুপ্রবেশ

এই সময়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর অধিকাংশ অনুসারী, যারা আগে থেকেই সংখ্যায় খুব কম ছিলেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। যারা অবশিষ্ট ছিলেন, তারা রোমান শাসকদের ধরপাকড়ের কারণে ঈসায়ী দ্বীনের খুব বেশি প্রচার করতে পারছিলেন না। তাদের অনেক অনুসারী নিজেদের ধর্ম গোপন করে বনে-জঙ্গলে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং তারা রাহিব হিসেবে পরিচিত হতে থাকেন। তবে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈসায়ী দ্বীনের ব্যাপক প্রচার করতে থাকেন। তার আসল নাম ছিল সাউল, কিন্তু তিনি পল নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন একজন কট্টর ইহুদি। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়ার কিছুকাল পর তিনি তাঁর ওপর ঈমান আনার দাবি করতে শুরু করেন। এরপর তিনি খ্রিস্টধর্মের এমন কিছু নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি প্রণয়ন করেন যা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শিক্ষার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এবং আল্লাহর সমন্বয়ে তিন খোদার মতবাদ পেশ করেন; আল্লাহকে পিতা এবং ঈসাকে পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করেন। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আকিদা প্রচার করেন, যেমনটি ইহুদিদের ধারণা ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রকৃত সঙ্গীরা এতে বিশ্বাস করতেন না, কারণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে তাদের চোখের সামনেই আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পল শুধু এই আকিদাই জনপ্রিয় করেননি, বরং এই কথারও প্রচার করেন যে, আল্লাহর পুত্র ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর অনুসারীদের পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা আদায় করে দিয়েছেন।

ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সত্যবাদী হাওয়ারিগণ পলের মতাদর্শের তীব্র বিরোধিতা করেন। এভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেকগুলো ফেরকা তৈরি হয়ে যায়। পলের ধর্মই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে। তিনি নিজে ইউরোপে গিয়ে তাঁর আকিদাসমূহ প্রচার করেন। যেহেতু তাঁর মতাদর্শ রোমান ও গ্রিক পৌরাণিক ধারণার কাছাকাছি ছিল, তাই মানুষ গোপনে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। পলের পর তাঁর শিষ্যরা প্রচার কাজ অব্যাহত রাখেন এবং এভাবে ধীরে ধীরে প্রকৃত ঈসায়ী দ্বীনের স্থলাভিষিক্ত হয় পলের মতাদর্শ। এই ধর্ম ”খ্রিস্টধর্ম“ নামে সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর, কনস্টান্টিনোপল এবং রোমে ছড়িয়ে পড়ে।

চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে এই পরিবর্তিত খ্রিস্টধর্ম রোমের সম্রাট কনস্টানটাইন বিন কনস্টানস-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এই সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে বিকল্প শাসক আনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সম্রাট একটি রাজনৈতিক চাল হিসেবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা গোপনে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল, তারা তাঁর সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের সাথে নিয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের মোকাবিলা করেন, যারা প্রাচীন গ্রিক পৌরাণিক ধর্মে অটল ছিল এবং তাদের পরাজিত করে নিজের নতুন ধর্মের পাল্লা ভারী করেন। [১]

৩২৫ খ্রিস্টাব্দে ”নিসিয়া“ (বর্তমান তুরস্কের একটি শহর)-তে এই নতুন ধর্মের আলেমদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে ত্রিত্ববাদ, কাফফারা আকিদা এবং আল্লাহর পিতা হওয়া ও ঈসার পুত্র হওয়ার আকিদাকে খ্রিস্টধর্মের অপরিহার্য মূলনীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। এভাবে ইঞ্জিলের সেই বিকৃত পাণ্ডুলিপিগুলোকে আসমানী কিতাব হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার আসল হওয়ার কোনো প্রমাণ বিদ্যমান ছিল না।

---

(১) আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/২৯৮, ২৯৯

এভাবে খ্রিস্টধর্ম আল্লাহর তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে শিরকপূর্ণ আকিদার সমষ্টিতে পরিণত হয়। কেবল নাসারিয়া (Nazarenes) নামক একটি ছোট দল এমন ছিল যারা রোমান সরকারের জুলুম, পাদ্রিদের পথভ্রষ্টতা এবং ইহুদিদের প্রতারণা সত্ত্বেও তাওহীদের ওপর অটল ছিল। তারা ছাড়াও কিছু সন্ন্যাসী ও বুজুর্গ এমন ছিলেন যারা সঠিক আকিদার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ইহুদিদের ভয়ে নিজেদের চিন্তাধারা দুনিয়া থেকে গোপন রাখতেন। তাদেরই একজন ছিলেন নাজরানের সেই বুজুর্গ ব্যক্তি, যিনি আবদুল্লাহ বিন তামির নামক এক যুবকের হেদায়েতের মাধ্যম হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ বিন তামিরের প্রচেষ্টায় পুরো জাতি তাওহীদের কালিমা পাঠ করে নেয়, কিন্তু স্থানীয় ইহুদি শাসক ইউসুফ যু-নুওয়াস সেই সমস্ত মুমিনদের আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করে শহীদ করে দেয়। এটি নবুওয়াত প্রাপ্তির সত্তর বছর আগের ঘটনা। [১]

এরপর সঠিক খ্রিস্টধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে মক্কার খ্রিস্টান আলেম ওরাকা বিন নওফলের মতো দু-একজন ব্যক্তি ছিলেন যারা নিজেদের অন্তরে হেদায়েতের প্রদীপ জ্বালিয়ে কোনো শুভ সময়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। সাধারণ অবস্থার কথা বলতে গেলে, খ্রিস্টান বিশ্বে সর্বত্র কুফর ও শিরকের জয়জয়কার ছিল।

**“ফাতরাতের যুগে জাজিরাতুল আরব”**

জাজিরাতুল আরব এই পুরো সময়কালে বাকি সভ্য পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন দেখা যায়। এখানে না ছিল বিভিন্ন ধর্মের সংঘাত, না ছিল বিদেশি শক্তির একাধিপত্য। আরবের মরুবাসীরা তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি অনুযায়ী অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করে আসছিল। তারা কোনো বিদেশি শক্তির আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, আর অন্য কোনো সংস্কৃতি বা মতাদর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারেও তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। এই উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানও এমন ছিল যে, বাইরের পরিস্থিতি এর ওপর খুব কমই প্রভাব ফেলতে পারত। এর পূর্বে পারস্য উপসাগরের জলরাশি রয়েছে, যা একে ইরান থেকে পৃথক করে রেখেছে। পশ্চিমে লোহিত সাগর রয়েছে যা একে আফ্রিকার সাথে মিশতে দেয় না। দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের বিশাল বিস্তৃতি রয়েছে, যা পাড়ি দিয়ে ভারতের উপকূলে পৌঁছানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কেবল উত্তরে এটি স্থলভাগের সাথে যুক্ত, এখানে সিরিয়া অঞ্চল এর এবং ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে আছে। এভাবে কোনো ইউরোপীয় নাবিক সরাসরি আরবের উপকূলে নামতে পারত না।

এই উপদ্বীপে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর পর থেকে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কোনো নবীর আগমনের খবর পাওয়া যায় না। তবে এর চারপাশের এলাকাগুলোতে আম্বিয়া ও রাসুলদের আগমন অব্যাহত ছিল। এই সময়ে আরবের মরুবাসীরা হযরত ইব্রাহিম এবং হযরত ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম-এর দ্বীনের অবশিষ্টাংশকে (যার মধ্যে পরিবর্তন ও পরিমার্জনের কারণে অসংখ্য শিরকি বিষয় প্রবেশ করেছিল) বুকে আগলে রেখে ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত মরুভূমিতে বিচরণ করতে দেখা যায়। আরবরা হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর পুত্র সাম-এর বংশধর ছিল। তাদের প্রাচীনতম গোষ্ঠী ছিল “আরবে বায়েদাহ”, যারা হাজার হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আদ, সামুদ,

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-বুরুজ

তাসম ও জাদিস-এর মতো দুই-চারটি জাতি ছাড়া আর কারো ইতিহাস সংরক্ষিত নেই। তাদের দ্বিতীয় স্তর ছিল "আরবে আরেবা", যারা কাহতান বিন আবেরের বংশধর ছিল। ভাষায় দক্ষতা এবং প্রাঞ্জলতা ও অলঙ্কারিতার কারণে তাদেরকে "আরেবা" (স্পষ্টভাষী) বলা হতে থাকে। তাদের আদি জন্মভূমি ছিল ইয়ামেন এবং এর আশপাশের এলাকা। জাজিরাতুল আরবের আদি প্রাচীন বাসিন্দা ছিল এই লোকেরাই এবং আরব হিসেবে তাদের বংশধারা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ। তারা বড় বড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং শহর আবাদ করেছিল, যাদের শান-শওকতের কাহিনী প্রাচীন আরবের ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। আরবদের তৃতীয় স্তর ছিল "মুসতারেবা" (মুতাআরেবা)। এই লোকেরা ছিল হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। [১]

**হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর বংশধর:**

হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম কাহতানিদের বনু জুরহুম গোত্রের সরদার মুদাদের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যার গর্ভে বারোটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে নাবিত এবং কাইদার অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। নাবিত হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাবা ঘর এবং যমযম কূপের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর বংশে অনেক বরকত দান করেন, শীঘ্রই তাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে জীবিকার সন্ধানে তাদেরকে মক্কার বাইরে বেরিয়ে যেতে হয়। অবশেষে ইসমাইলের বংশে আদনানের আবির্ভাব ঘটে, যিনি যোগ্যতা ও খ্যাতির দিক থেকে আরবের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বংশপরম্পরা সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত বলে মনে করা হয়। আদনানের পরেই আরবদের মধ্যে বনু কাহতান এবং বনু আদনানের বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা সময়ের সাথে সাথে আরও ঘনীভূত হতে থাকে, এমনকি তা প্রকাশ্য শত্রুতায় রূপ নেয়। তাদের যুদ্ধের প্রতীকগুলোও ছিল আলাদা। কাহতানিরা হলুদ পতাকা এবং হলুদ পাগড়ি ব্যবহার করত। আদনানিরা লাল পতাকা এবং লাল পাগড়ির মাধ্যমে পরিচিত ছিল। [২]

আদনানের বংশধরদের মধ্যে মা'আদ বিন আদনান অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। বুখতে নাসারের আমলে সিরিয়ার ওপর বুখতে নাসারের আক্রমণ হয়েছিল, যাতে আরবরাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহযোগী হয়েছিল। মা'আদের পুত্রদের মধ্যে মুদারের নাম ইতিহাসের পাতায় বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর বংশে ফিহর বিন মালিক এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর বংশধররা "কুরাইশ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। [৩]

জাজিরাতুল আরবের মধ্যভাগে বসবাসকারী আরবদের রাজনৈতিক কাঠামো ছিল মূলত গোত্রীয় পর্যায়ের। মাঝে মাঝে দুই বা ততোধিক গোত্র কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হতো। নিয়মিত সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেবল জাজিরাতুল আরবের প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে ছিল, যেমন দক্ষিণ আরবে ইয়ামেন সালতানাত, উত্তর-পূর্বে হীরা রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিমে গাসসান রাজ্য। এই রাজ্যগুলো কিছু নির্দিষ্ট পরিবারের অধীনে পরিচালিত হতো, যেমন ইয়ামেনে সাবা রাজ্য ছিল আল-কাহতানের অধীনে। গোত্রগুলোর নেতৃত্বেও কিছু বিশেষ পরিবার বিখ্যাত ছিল, যেমন বনু আদনানের নেতৃত্ব ছিল কুরাইশদের হাতে। [৪]

---

[১] নিহায়াতুল আরাব ফি মা'রিফাতি আনসাবিল আরাব লিল কালকাশান্দি, পৃষ্ঠা ১১ থেকে ১৩, তবা' দারুল কিতাব আল-লুবনানি।

[২] ফাজরুল ইসলাম লি আহমাদ আমিন, পৃষ্ঠা ৬, তবা' দারুল কিতাব আল-আরাবি।

[৩] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৯০ থেকে ৯৫, তবা' আল-বাবি আল-হালাবি, আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম লি আলি ইবরাহিম হাসান, পৃষ্ঠা ২৫, তবা' মাতবাআতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ।

[৪] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, লি আবিল ফিদা: ১/১৬, ২৬।

সাবা জাতি, হিমইয়ারের রাজন্যবর্গ এবং তুব্বা সম্প্রদায়:

জাযিরাতুল আরবের দক্ষিণে সাবা রাজ্য আট শতাব্দী (৯৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১১৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা কাহতান বিন আবের, নূহ (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইয়ামেনে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে তার প্রপৌত্র "সাবা" ক্রমাগত বিজয়ের মাধ্যমে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনিই মা'রিব নামক স্থানে একটি বিশ্ববিখ্যাত বাঁধ নির্মাণ করে তা থেকে সত্তরটি খাল খনন করেন এবং এভাবে ইয়ামেনের এক বিশাল এলাকা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত হয়ে সাবা রাজ্যের সমৃদ্ধি ও উন্নতির মাধ্যম হয়ে ওঠে।

সাবার পুত্র হিমইয়ার তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পরবর্তীতে সাবার অনেক নামী-দামী বাদশাহ তার বংশ থেকেই হন। সাবার চতুর্থ প্রজন্মে তুব্বা আউয়াল হারিস অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তার পুত্র "সা'ব" পূর্ব ও পশ্চিমে বড় বড় দেশ জয় করেন এবং যুলকারনাইন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে কুরআন মাজীদে এই যুলকারনাইনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সাবা জাতির উত্থান বাড়তে থাকে। কৃষির পাশাপাশি বাণিজ্যেও এই জাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জলে ও স্থলে ইয়ামেন থেকে শাম পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার ভিড় লেগে থাকত। হিন্দুস্তান ও প্রাচ্যের পণ্য ইয়ামেনের উপকূলে নামত এবং স্থানীয় লোকেরা তা শামে নিয়ে গিয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। [১]

সাবার বংশধরদের মধ্যে নবম প্রজন্মে বিলকিস বিনতে শারাহবিল সাবা রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং পুরো বিশ বছর অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শাসন করেন। সাবা জাতি সূর্যের পূজা করত কিন্তু বিলকিস হযরত সুলাইমান (আ.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন, যার উল্লেখ কুরআন মাজীদে রয়েছে। [২]

কিন্তু সাধারণভাবে সাবা জাতি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর অটল ছিল। ধন-সম্পদ ও সচ্ছলতা তাদের উদাসীনতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতির জন্য সফর ও আবাসে ভোগ-বিলাসের এত সরঞ্জাম বিদ্যমান ছিল যে, লোকেরা অকৃতজ্ঞতা করে কষ্ট ও ক্লেশের কামনা করতে শুরু করেছিল। অবশেষে এই অকৃতজ্ঞতার অভিশাপ নেমে এল। তাদের সেই বিশ্ববিখ্যাত বাঁধ 'সাদ্দে মা'রিব' ভেঙে গেল। রাজ্যের রাজধানী "মা'রিব" পানির স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে নাম-নিশানা মুছে গেল। বন্যা সাবা রাজ্যের জনপদ ও অর্থনীতিকে এমনভাবে তছনছ করে দিল যে, মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হলো। এভাবে সাবা রাজ্যের সমাপ্তি ঘটল। [৩]

সাবা রাজ্যের পতনের পর ইয়ামেনে সাবা বংশের বিভিন্ন গোত্রপতিরা ছোট ছোট দুর্গ ও জনপদে আলাদা আলাদা সরকার কায়েম করে। তাদের মধ্যে হিমইয়ার রাজন্যবর্গের "তুব্বা সাম্রাজ্য" ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যা ১১৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর প্রত্যেক বাদশাহকে "তুব্বা" বলা হতো। লোহিত সাগরের উপকূল থেকে "হাযরামাউত" পর্যন্ত তাদের শাসন ছিল যা পরবর্তীতে শুধু ইয়ামামা ও হিজায নয় বরং এক সময় ইরান, খুরাসান এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সাবা রাজন্যবর্গের বিপরীতে তুব্বা সম্প্রদায়ের ঝোঁক কৃষি ও বাণিজ্যের দিকে ছিল না বরং বিজয় ও সামরিক অভিযানের দিকে ছিল। তুব্বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শাম্মার, আবু কারিব, তুব্বা আওসাত,

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/৬৬, ৬৭

[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আন-নামল, আয়াত: ২০ থেকে ৪৪

[৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা সাবা, আয়াত: ১৫ থেকে ১৯

তুব্বা বিন হাসসান (তুব্বা আসগর) এবং হারিস বিন আমর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। হারিস বিন আমর ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যার কারণে ইয়ামেনে সরকারি ধর্ম 'ইয়াহুদিয়াত' সাব্যস্ত হয়েছিল। এই কারণে এই বংশের পরবর্তী বাদশাহ ইউসুফ যু-নাওয়াস হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শিক্ষা অনুযায়ী খাঁটি তাওহীদের আকিদা পোষণকারী নাজরানের হাজার হাজার নাগরিককে আগুনের গর্তে ফেলে হত্যা করেছিলেন। এই ভয়াবহ জুলুম হিময়ার রাজাদের পূর্ণ পতনের পূর্বাভাস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং এভাবেই যু-নাওয়াসের শাসন হাবশাবাসীদের আক্রমণের মুখে দম ভেঙে দিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জন্মের প্রায় সত্তর বছর আগের। [১]

এভাবে বনু হিময়ারের শাসনের সময়কাল ১১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ছয়শ পনের বছর হয়। এই সময়ে মোট ছাব্বিশজন বাদশাহ শাসন করেছিলেন। [২]

**ইয়ামেনে হাবশীদের আধিপত্য এবং সাইফ বিন যি-ইয়াযানের স্বাধীনতা আন্দোলন:**

বনু হিময়ারের পর ইয়ামেনে হাবশাবাসীদের শাসন ৭২ বছর পর্যন্ত ছিল যাতে চারজন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন: প্রথম শাসক ছিলেন আরিবাত, দ্বিতীয় আবরাহা, যে মক্কার ওপর আক্রমণ করেছিল। এই দুজনের শাসন দীর্ঘ ছিল।

আবরাহার পর তার ছেলে ইয়াকসুম এবং তারপর দ্বিতীয় ছেলে মাসরুক শাসক হন। দুজনেই অল্প সময় পেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে ইয়ামেনের এই হাবশী শাসকরা স্বাধীন ছিলেন না বরং তাদের মর্যাদা হাবশার বাদশাহর গভর্নরের মতো ছিল। স্বয়ং হাবশার বাদশাহ খ্রিস্টান হওয়ার কারণে কায়সারের করদাতা ছিলেন।

পরিশেষে ইয়ামেনের এক সরদার সাইফ বিন যি-ইয়াযান হাবশীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেন। আরবরা তার সাথে যোগ দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের দুই বছর পর সাইফ বিন যি-ইয়াযানের হাতে হাবশীদের শাসনের অবসান ঘটে। [৩]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৩৮৮ থেকে ৩৯২

[২] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/৬৮

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৩৯৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৭৩

## জাহিলিয়াত যুগের অন্যান্য আরব সরকারসমূহ

হীরা আমিরাত:

প্রাচীন কুফার দক্ষিণে তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) দূরে যেখানে এখন 'নাজাফ' অবস্থিত, সেখানে 'হীরা' নামক একটি শহর ছিল। এখানে 'তানুখি' আরবরা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আক্রমণের কিছুকাল পরে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। 'তানুখি' ছিল সেই সব আরব যারা ইয়েমেন থেকে হিজরত করে বাহরাইনে এসেছিল। এখানেই তারা 'তানুখি' নামে একটি আলাদা গোত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আক্রমণের পর যখন ইরাক ও পারস্যে গোত্রীয় শাসনের (তাওয়াইফ আল-মুলুক) যুগ শুরু হয়, তখন এই আরবরা সুযোগ পেয়ে জাজিরাতুল আরবের সীমান্তে অবস্থিত ইরাকি শহরগুলো দখল করার চেষ্টা করে। এভাবে তারা কেবল হীরা নয় বরং আনবার থেকে শুরু করে ফোরাত নদী পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। হীরার আরবরা যেহেতু পারস্য ও রোম উভয়ের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত ছিল, তাই উভয় বৃহৎ শক্তির আদর্শিক প্রভাব তাদের ওপর পড়তে থাকে, যার ফলে অনেক তানুখি আরব খ্রিস্টান হয়ে যায়। তাদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাদের নামের সাথে 'আবদ' যুক্ত থাকত, যেমন: আবদ আল-মাসীহ, আবদ ইয়াইল এবং আবদুল্লাহ, তাই তাদের 'ইবাদ'ও বলা হতো। [১]

এই সরকারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আযদ গোত্রের এক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি মালিক বিন ফাহম। তিনি হীরায় প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং বাগান তৈরি করেন, কিন্তু সেখানে থাকার পরিবর্তে 'আনবার'কে নিজের কেন্দ্র বানান। [২]

তার পুত্র জাযিমা আল-আবরাশ তার বীরত্ব, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে আরবদের গল্পের অংশে পরিণত হন। তিনি ষাট বছর হীরা শাসন করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি আরব রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে কঠোর এবং সবচেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন। [৩]

আল-জাজিরার আরব শাসক আমর বিন যারিবের সাথে তার যুদ্ধ বিখ্যাত, যাতে আমর নিহত হন। তার মেয়ে যাব্বা তার বাবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করেন যে, তিনি জাযিমাকে সন্ধি ও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নিজের কাছে আমন্ত্রণ জানান এবং তারপর তাকে হত্যা করেন। [৪] জাযিমার পর তার ভাগ্নে আমর বিন আদি ইরাকি আরবদের শাসক হন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি হীরাকে রাজধানী বানান। তিনি জাযিমার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার বন্ধু কুসাইরকে যাব্বার কাছে পাঠান। কুসাইর নিজের নাক কেটে যাব্বার দরবারে উপস্থিত হন এবং প্রকাশ করেন যে আমর বিন আদি তার ওপর এই জুলুম করেছেন। তিনি নিজের নির্যাতিত অবস্থা প্রকাশ করে যাব্বার আস্থা অর্জন করেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই তিনি নিজের বাহিনীকে যাব্বার শহরে প্রবেশ করান, যাব্বাকে হত্যা করেন এবং শহরের ইট দিয়ে ইট বাজিয়ে দেন (শহর ধ্বংস করে দেন)। [৫]

---

[১] আত-তারিখ আল-ইসলামি আল-আম, পৃ. ৬১

[২] মু'জামুল বুলদান: ২/৩২৮, হীরা, ত. দার সাদির

[৩] তারিখুত তাবারী: ১/৬১৩

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৩১৩ থেকে ৩১৭

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৩১৮ থেকে ৩২০

আমর ইবনে আদীর পর তার উত্তরসূরি ইমরুল কায়েস প্রথমের আমলে হিরার রাজাদের (মুলুক-ই-হিরা) প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ইমরুল কায়েস সাসানীয় সম্রাটদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের শাসনকে সুরক্ষিত করেন। এটি চতুর্থ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শুরুর দিকের ঘটনা। ইমরুল কায়েসের নাতি নুমান প্রথম হিরার রাজাদের নাম আরও উজ্জ্বল করেন। তার আমলে হিরা আমিরাতের কাছে আরব ও পারস্যের সৈন্যদের দুটি আলাদা বাহিনী ছিল, যার মাধ্যমে তিনি বড় বড় আরব গোত্রগুলোকে অনুগত করে নিয়েছিলেন। নুমানের পর তার পুত্র মুনজির ইবনে নুমান সিংহাসনে বসেন, যার ওপর পারস্য সম্রাটদের এতই আস্থা ছিল যে খসরু ইয়াজদগিরদ আসিম তার পুত্র বাহরাম গুরকে প্রশিক্ষণের জন্য তার কাছে রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মুনজির ইবনে নুমান বাহরামকে তার পিতার সিংহাসন ও মুকুট ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। [১]

**মাজদাকবাদ ও হিরা আমিরাত:**

পঞ্চম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শুরুতে ইরানে “মাজদাকবাদ” নামক একটি নতুন ধর্মের জন্ম হয়েছিল, যার প্রতিষ্ঠাতা মাজদাক মানুষকে ধন-সম্পদ, জমি এবং নারীদের ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশীদারিত্বের আহ্বান জানাতেন। প্রবৃত্তিপূজার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই নতুন দর্শন ইরানি সম্রাট কিসরা কুবাদ পছন্দ করেন এবং তিনি এটি গ্রহণ করে কেবল এর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাই শুরু করেননি, বরং যারা এটি গ্রহণ করেনি তাদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু করেন। হিরার শাসক মুনজির ইবনে মাউস সামা মাজদাকবাদ গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় কিসরা শক্তির জোরে তার কাছ থেকে সিংহাসন ও মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে অন্য এক আরব রাজপুত্র হারিস ইবনে আমরের হাতে তুলে দেন, যে মাজদাকবাদ গ্রহণ করেছিল। তবে কিসরা কুবাদ মারা যাওয়ার পর নওশেরওয়ান ক্ষমতায় এলে তিনি মাজদাকবাদের বিরোধিতা করেন এবং হিরার শাসনভারও মুনজির ইবনে মাউস সামাকে ফিরিয়ে দেন।

হুজুর নবী আকরাম ﷺ-এর জন্মের সময় “হিরা”র ওপর মুনজিরের পুত্র আমরের শাসন ছিল, যাকে রাজনৈতিক বিষয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণে “মুদাররিতুল হিজারা” বলা হতো। [২]

**বনু গাসসান:**

যেভাবে আরবের পূর্ব সীমান্তে “মুলুক-ই-হিরা” পারস্য সম্রাটদের অধীনে আরবের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করত, ঠিক তেমনি রোমান সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব উপদ্বীপের সেই সীমান্তগুলোতে যা সিরিয়ার সাথে সংযুক্ত ছিল, “বনু গাসসান” ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করছিল।

বনু গাসসান, বনু কাহলানের শাখা আজদ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই লোকেরা মাআরিব বাঁধের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ইয়েমেন থেকে সিরিয়ার সীমান্তে “গাসসান” নামক একটি ঝরনার পাড়ে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তাই তাদের নাম “বনু গাসসান” হয়ে যায়। তাদের প্রথম নেতা ছিল জাফনাহ ইবনে আমর, যিনি হুজুর আকরাম ﷺ-এর চারশ বছর আগে গত হয়েছেন। আলে জাফনাহ সিরিয়ার সীমান্তে দীর্ঘকাল শাসন করেছে এবং তাদের ডজন ডজন শাসক অতিবাহিত হয়েছে। তাদের প্রখ্যাত সর্দার হারিস ইবনে জাবালা ইয়াকুবী ফেরকার খ্রিস্টান ছিল, যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে মহান ও শ্রেষ্ঠ খোদা মনে করত। হারিস ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের নিয়মিত আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল যাতে হিরা...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৩৬৫, ৩৭০

[২] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/৭০, ৭১

আরবের শাসক মুনজির বিন মাউস সামা-এর মোকাবিলা করতে পারেনি। এরপর ৫৩১ খ্রিস্টাব্দে রোমের সমর্থনে দজলা নদী পার হয়ে ইরাক আক্রমণ করে বিজয় লাভ করে। এভাবে 'গাসসান'-এর শাসন শক্তিশালী হয়। রোমানদের অধীনে থাকার কারণে গাসসানি আরবরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খ্রিস্টান হয়ে যায়। গাসসানিদের শেষ শাসক ছিলেন জাবালা বিন আইহাম, যিনি হযরত উমর ফারুক-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কিছুকাল পর মুরতাদ হয়ে যান। [১]

আরব বহিঃশক্তির আক্রমণের মুখে:

জাজিরাতুল আরব পারস্য উপসাগর এবং লোহিত সাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জলপথের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে বিশ্বের মানচিত্রে এক অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে আসছে। প্রতিবেশী দেশগুলো এই ঊষর ভূমির ওপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ খুঁজত, কিন্তু আরবদের প্রকৃতিতে স্বাধীনতা এমনভাবে মিশে ছিল যে তারা কখনো সমসাময়িক বিশ্বশক্তিগুলোর কাছে নতি স্বীকার করেনি। শুধু মিশরের ফেরাউন এবং ইরাক ও পারস্যের কিসরা আরবের এই ভূখণ্ডকে নিজেদের অধীনে রাখতে চায়নি, বরং ইউরোপীয় শক্তিগুলোরও এই আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তাদের এই ইচ্ছা কখনো পূরণ হয়নি। গ্রিক বিজেতা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইরান ও ভারত বিজয়ের পর ফেরার পথে জাজিরাতুল আরবের দিকে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যু আরবদের এক বড় যুদ্ধ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সেই সময় আলেকজান্ডারের বয়স ছিল ৩৩ বছর, তিনি ১৩ বছর শাসন করেছিলেন। [২]

আলেকজান্ডারের পর গ্রিক শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্যদিকে ইরানের কায়ানি রাজবংশের শেষ শাসক দারা (যাকে আলেকজান্ডার হত্যা করেছিলেন)-এর পর ইরান খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব গির্জার প্রতিনিধি কনস্টান্টিনোপলের রোমান সাম্রাজ্য দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। রোমান সম্রাট অগাস্টাস খ্রিস্টপূর্ব ২৪ সালে আরবের ভূখণ্ড দখলের চেষ্টায় এক বিশাল বাহিনী পাঠান, কিন্তু মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ এবং পানির অভাবের কারণে রোমান বাহিনী পথেই সাহস হারিয়ে ফেলে এবং এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

প্রায় তিনশ বছর পর যখন রোম সরকারিভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, তখন আরবদের বশীভূত করার জন্য এক নতুন প্রচেষ্টা চালানো হয়, যার জন্য ধর্ম প্রচারের পথ বেছে নেওয়া হয়। রোমান গির্জা তাদের পাদ্রি ও সন্ন্যাসীদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আরবে পাঠায়। এর আগে লোহিত সাগরের ওপারে আবিসিনিয়া রোমানদের দখলে চলে এসেছিল এবং সেখানে খ্রিস্টধর্মের প্রচার পুরোদমে চলছিল।

কিন্তু জাজিরাতুল আরবে রোমানদের ধর্ম প্রচার খুব একটা সফল হতে পারেনি। ইয়েমেনের হিময়ারি রাজারা খ্রিস্টধর্মের আড়ালে রোমানদের ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে ইয়েমেনের কিছু মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। নাজরানে এক বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত ঈসা-এর সঠিক শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন তামির নামক এক বালক তার অনুসারী হয়। তার বরকত ও কারামত দেখে নাজরানের সমস্ত অধিবাসী তাওহিদের সুধা পান করে।

---

[১] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম: পৃষ্ঠা ৮৩ থেকে ৮৮

[২] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/২৫; আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম: পৃষ্ঠা ৪৩

পিয়ে নিল। হিময়ারি বাদশাহ ইউসুফ যু-নুওয়াস এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নাজরানের লোকদের আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করালেন। [১]

এর ফলাফল কেবল হিময়ারি রাজত্বের জন্যই নয় বরং জাজিরাতুল আরবের রাজনৈতিক ঐক্যের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো। রোমান সম্রাট জাস্টিনাস (Justinus) যখন এই দুর্ঘটনার খবর পেলেন, তখন তিনি হাবশার (আবিসিনিয়া) তার প্রতিনিধি, যাকে নাজ্জাশি বলা হতো, তাকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন ইয়েমেনে আক্রমণ করে নাজরানের নিহতদের প্রতিশোধ নেন। ফলে নাজ্জাশি তার সেনাপতি 'আরিয়াত'-কে সত্তর হাজার হাবশি সৈন্যসহ ইয়েমেনে অভিযান চালানোর জন্য পাঠালেন, যার ফলে ইয়েমেনে 'হিময়ার' রাজত্বের অবসান ঘটে এবং সেখানে রোমের অধীনে একটি হাবশি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যার স্থানীয় প্রধান ছিলেন 'আরিয়াত'। এই ঘটনা নবী করীম (সা.)-এর জন্মের সত্তর বছর আগের।

আরিয়াতের কাছ থেকে ইয়েমেনের শাসনভার অন্য এক হাবশি সর্দার 'আবরাহা আল-আশরাম' ছিনিয়ে নেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া খ্রিস্টান। আরবদের কা'বা আল্লাহর প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা ও ভক্তি তার সহ্য হলো না, তাই তিনি প্রথমে ইয়েমেনে একটি জাঁকজমকপূর্ণ গির্জা নির্মাণ করে আরবদের সেখানে হজ্জ করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু যখন আরবরা তাকে কোনো গুরুত্বই দিল না, তখন তিনি কা'বা ধ্বংস করার অপবিত্র উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে অভিযান চালালেন এবং পরিণামে তার পুরো বাহিনীসহ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলেন। [২]

**মক্কা উপত্যকা:**

শাম ও ইয়েমেনের বাণিজ্যিক মহাসড়কে অবস্থিত 'মক্কা' হিজাজে মুকাদ্দাসের কেন্দ্রে একটি নিচু ভূমিতে অবস্থিত, যা পাহাড় ও টিলা দ্বারা বেষ্টিত। মক্কা উপত্যকা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই মাইল (সাড়ে তিন কিলোমিটার) দীর্ঘ এবং আধা মাইল (৮০০ মিটার) প্রশস্ত। নিচু হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি দ্রুত এই উপত্যকায় নেমে আসে। এই কারণে শহরের জনবসতিকে বারবার বন্যার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো। গরম আবহাওয়া সম্পন্ন এই শহরটি হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর স্মৃতি হওয়ার কারণে আরবদের কাছে অসাধারণ গুরুত্ব রাখত। এখানে হজ্জের মৌসুমে আরবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হতো এবং হজ্জের রীতিনীতি পালন করত।

মক্কার নেতৃত্ব বনু জুরহুমের হাতে ছিল, আর কা'বা শরীফের চাবি ও এর খিদমত বনু ইসমাইলের ওপর ন্যস্ত ছিল। এই পদটি হযরত ইসমাইল (আ.)-এর পর তার বড় ছেলে নাবিদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নাবিদের পর বনু জুরহুমের কিছু লোভী লোক বনু ইসমাইলের সন্তানদের এই পদ থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনু জুরহুম মক্কা ও কা'বার সমস্ত বিষয়ের মালিক ছিল, কিন্তু তারা কা'বার পবিত্রতার হক আদায় করেনি এবং অনেক বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত ছিল।

যখন ইয়েমেনে মা'রিব বাঁধ ভেঙে বন্যা এলো এবং বিভিন্ন কাহতানি গোত্র উত্তরের দিকে হিজরত করল, তখন তাদের একটি কাফেলা তাদের বৃদ্ধ সর্দার আমর বিন আমিরের নেতৃত্বে মক্কায় এলো, কিন্তু বনু জুরহুম তাদের জায়গা দিতে অস্বীকার করল, যার পর...

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-বুরুজ।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১/৫৬৩; সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৪৩ থেকে ৪৭।

আমর বিন আমিরের দুই নাতি: আউস এবং খাজরাজ নিজ নিজ পরিবারসহ ইয়াসরিব (মদিনা মুনাওয়ারা) চলে যান, তবে তৃতীয় নাতি রাবিআ বিন হারিসা মক্কাতেই জায়গা করে নিতে সক্ষম হন এবং তার বংশধররা বনু খুজাআ নামে পরিচিত হয়। [১]

**বনু জুরহুমের বহিষ্কার এবং বনু খুজাআর দখল:**

বনু খুজাআর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা বনু জুরহুমকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধান নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এই ঘটনা ২০৭ খ্রিস্টাব্দের বলে জানানো হয়। [২]

বনু জুরহুম তাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও কাবা ঘরের প্রতি চরম ভালোবাসা পোষণ করত। যখন তারা মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাদের পৈতৃক দেশ ইয়েমেনে যেতে শুরু করল, তখন কাবার জন্য জমাকৃত সম্পদ জমজম কূপে ফেলে দিয়ে তা মাটি দিয়ে ভরাট করে দিল। এই উপলক্ষে তাদের কবি আমর বিন হারিস এই অবিস্মরণীয় কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন:

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إِلَى صَفَا
أَنِيْسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ

“মনে হয় যেন হাজুন থেকে সাফা পর্যন্ত কোনো বন্ধু নেই এবং মক্কায় কোনো গল্পকার কখনো কোনো গল্প শোনাননি।”

بَلْ نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالَنَا
صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ

“আমরাই তো এই শহরের বাসিন্দা ছিলাম, কিন্তু রাতের আবর্তন এবং আকস্মিক বিপদ আমাদের এখান থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে।”

وَكُنَّا وُلَاةَ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ
نَطُوفُ فَمَا تُحْظَى لَدَيْنَا الْمَكَاثِرُ

“নাবিত (বিন ইসমাইল আলাইহিস সালাম)-এর পর আমরাই বাইতুল্লাহর রক্ষক ছিলাম, যখন আমরা এটি তাওয়াফ করতাম তখন আমাদের কাছে ধন-সম্পদের ভাণ্ডারের কোনো গুরুত্ব থাকত না।” [৩]

মক্কা থেকে বনু জুরহুমের বহিষ্কার এবং বাইতুল্লাহর ওপর বনু খুজাআর দখল মক্কার জন্য আরও ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো। বনু খুজাআ এই ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে তাওহীদের এই কেন্দ্রকে শিরকের আস্তানায় পরিণত করল। শিরকের অভিশাপের সূচনা বনু খুজাআর সরদার আমর বিন লুহাই-এর হাতে হয়েছিল। এই ব্যক্তি আরবদের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার নেতা হিসেবে বিবেচিত হতো, তার রাজকীয় সম্মান করা হতো কারণ সে ধন-সম্পদে তার সমসাময়িক সরদারদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। তার উটের সংখ্যা বিশ হাজার পর্যন্ত বলা হয়। এই শান-শওকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তার প্রতিটি কথা অন্ধভাবে মেনে নেওয়া হতো। [৪]

---

[১] আখবারু মক্কা ওয়া মা জাআ ফিহা মিনাল আসার লি আবিল ওয়ালিদ আল-আযরাকি: ১/ ৮০ থেকে ৯০, ত দারুল আন্দালুস

[২] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ. ১৯২; তারিখু মক্কাতিল মুশাররাফাহ লি ইবনি যিয়া, পৃ. ৫৬, ৫৭

[৩] ইবনে খালদুন: ২/ ৩৯, দারুল ফিকর

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনি কাসির আদ-দিমাশকি: ১/ ৫৮৩, দারু হাজার

## মূর্তিপূজার সূচনা

আমর ইবনে লুহাই সিরিয়া সফরের সময় সেখানকার স্থানীয় লোকদের মূর্তিপূজা করতে দেখেন। মূর্তিপূজারীরা তাকে বিশ্বাস করায় যে, এই মূর্তিগুলো রিজিক দেয় এবং বৃষ্টি বর্ষণ করে, এদের কাছে যা চাওয়া হয় তা পূরণ হয়। শয়তানও এই শিরকি কর্মকাণ্ডকে তার কাছে আকর্ষণীয় করে দেখায়। অবশেষে আমর ইবনে লুহাই একটি মূর্তি, যার নাম দেওয়া হয়েছিল "হুবাল", নিজের সাথে মক্কায় নিয়ে আসে এবং একে কাবায় স্থাপন করে কওমকে এর ইবাদতের দাওয়াত দেয়। অধিকাংশ লোক অন্ধভাবে তার অনুসরণ করে। এরপর দেখতে দেখতেই কাবা ঘরের প্রাঙ্গণ বিভিন্ন ধরনের মূর্তিতে কলুষিত হয়ে যায় এবং আরবরা মূর্তিপূজার নেশায় এমনভাবে মত্ত হয় যে, ইব্রাহিমি দ্বীন যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল, তা ধীরে ধীরে পুরোপুরি মুছে যায়। [১]

হ্যাঁ, কিছু লোক এমন ছিল যারা শুরু থেকেই মূর্তিপূজার এই মারাত্মক ঢেউয়ের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যেমন, বনু জুরহামের একজন কবি শুহনা ইবনে খালাফ আমর ইবনে লুহাইয়ের কাজের সমালোচনা করে বলেছিলেন:

হে আমর! তুমি কি বিভিন্ন উপাস্য তৈরি করে সেগুলোকে মক্কায় বাইতুল্লাহর চারপাশে স্থাপন করে দিলে?
এই ঘরের রব তো সর্বদা একজনই ছিলেন, কিন্তু তুমি তাঁর পরিবর্তে মানুষের মাঝে অনেক উপাস্য পরিচিত করালে।
তুমি জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাকে অবকাশ দিচ্ছেন। তিনি তোমাদের পরিবর্তে তাঁর ঘরের জন্য অন্য রক্ষক নির্বাচন করবেন। [২]

## কুরাইশদের আবির্ভাব

কাবার ওপর বনু খুজাআ-র কর্তৃত্বের সময়কাল ছিল প্রায় তিনশ বছর। এই সময়ে আলে ইসমাইলের প্রখ্যাত ব্যক্তি আদনানের সন্তানদের মধ্য থেকে রাবিআ এবং মুদার দুটি স্বতন্ত্র বড় গোত্র হিসেবে অনেকগুলো উপ-গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এরপর মুদারের বংশধরদের মধ্যে তার প্রপৌত্র খুজাইমার পুত্র কিনানা খুব বিখ্যাত হন। কিনানার বংশ তার পুত্র "নজর" থেকে শুরু হয় এবং অনেক বিস্তার লাভ করে। কিনানার প্রপৌত্র ফিহর ইবনে মালিকের যুগে এই লোকেরা একটি আলাদা গোত্রের রূপ ধারণ করে, যাকে "বনু কিনানা" বলা হতো। কিন্তু বনু কিনানার মধ্যে অনেক প্রজন্ম পর্যন্ত এই সাহস তৈরি হয়নি যে তারা বনু খুজাআ-র কাছ থেকে কাবা আল্লাহর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশেষে ফিহরের পঞ্চম পুরুষে "কুসাই ইবনে কিলাব" নামক সেই প্রখ্যাত সর্দার জন্মগ্রহণ করেন যিনি তার পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কোমর বাঁধেন।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৫৮৩

[২] আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব, ডক্টর জাওয়াদ আলী: ১১/৮০

কুসাই-এর শৈশব পিতৃহীন অবস্থায় কাটছিল। তার মা বনু উজরা গোত্রে দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন, তাই তার শৈশব বনু উজরা গোত্রেই অতিবাহিত হয়। যুবক হওয়ার পর যখন তিনি তার আসল বংশের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি হিজাজের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নিলেন। এখানে এসে দেখলেন যে, তার গোত্রের লোকেরা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় হিজাজের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল না, বরং তারা নজর বিন কিনানার সন্তান হিসেবে পরিচিত ছিল এবং কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পরিবারের ন্যায় ছিল। কুসাই তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার সৌভাগ্য ছিল যে, বনু খুজাআ গোত্রের প্রধান হুলাইল খুজায়ি তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখে তাকে নিজের জামাতা বানিয়ে নেন এবং মৃত্যুর আগে কাবা ঘরের চাবিও তার হাতে তুলে দেন। এভাবে শত শত বছর পর বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের কাছে ফিরে আসে। [১]

কুসাই এখন মক্কায় একজন বড় নেতার মর্যাদা লাভ করলেন। তিনি মক্কার শাসনভার গ্রহণ করে নিজের গোত্র বনু কিনানাকে সাথে নিলেন এবং তাদের সাহায্যে বনু খুজাআকে হারামের সীমানা থেকে বহিষ্কার করলেন। এরপর তিনি মক্কার আশপাশ এবং হিজাজের বিভিন্ন স্থান থেকে তার গোত্রকে একত্রিত করে মক্কায় আবাদ করলেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুসংগঠিত গোত্রের রূপ দিলেন যার নাম "কুরাইশ" হয়ে গেল। এই নাম হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, "কুরাইশ" শব্দটি "তাকাররুশ" থেকে এসেছে যার অর্থ হলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যেহেতু নজর বিন কিনানার বিচ্ছিন্ন সন্তানদের কুসাই ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তাই এই নতুন ঐক্যের নাম "কুরাইশ" হয়ে যায়। এও বলা হয়েছে যে, "নজর"-কে কুরাইশ বলা হতো, তাই তার সন্তানরাও এই নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, ফিহর বিন মালিকের উপাধি ছিল "কুরাইশ", যা মূলত একটি শক্তিশালী সামুদ্রিক প্রাণীর নাম। এরপর বনু কিনানাকেও তাদের শক্তি ও শৌর্যের কারণে "কুরাইশ" বলা হতে থাকে। [২]

কুসাই-এর নেতৃত্বে মক্কা কুরাইশদের একটি ছোট রাষ্ট্রে পরিণত হলো। কুসাই একজন বড় রাজনীতিবিদের মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কার প্রশাসনিক কাজগুলোকে ধর্মীয়, বিচারিক এবং সামরিক বিভাগে বিভক্ত করে দেন। কাবা ঘর, মসজিদুল হারাম এবং হাজীদের সেবার পাশাপাশি নাগরিক ব্যবস্থাপনা ও সেবাগুলোকে উন্নত করেন। এই সেবাগুলো ছয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল:

- হিজাবা বা সাদানা: অর্থাৎ কাবা ঘরের চাবি রক্ষা করা: এর তত্ত্বাবধায়কের কাছে বাইতুল্লাহর চাবি থাকত। তার অনুমতি ছাড়া কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারত না।
- সিকায়া: অর্থাৎ হজের দিনগুলোতে হাজীদের মিষ্টি পানি পান করানো।
- রিফাদা: অর্থাৎ হাজীদের খাবার খাওয়ানো।
- লিওয়া: অর্থাৎ পতাকা স্থাপন করা যার অধীনে সেনাবাহিনী সমবেত হতো।
- কিয়াদা: অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া।

---

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১১৭/১, ১১৮

[২] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১২৩/১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২০১/২

৬ নদওয়াহ: অর্থাৎ পরামর্শ সভা: মসজিদুল হারামের সাথে সংলগ্ন একটি প্রশস্ত ঘরে এই সভা অনুষ্ঠিত হতো। এই ঘরকে 'দারুন নদওয়াহ' বলা হতো। কুরাইশ সরদাররা এখানে সমবেত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। যুদ্ধের জন্য সৈন্য এবং বাণিজ্যিক কাফেলার বিদায় এখান থেকেই হতো। বিবাহের অনুষ্ঠানও এখানেই সম্পন্ন হতো। মেয়ের বা ছেলের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সত্যায়নও এখানেই করা হতো যাতে গোত্রের যুবক-যুবতীদের আদমশুমারি সংরক্ষিত থাকে।

এই ছয়টি বিভাগ যেন কুরাইশ সরকারের ছয়টি মন্ত্রণালয় ছিল যেগুলোর অর্জন অত্যন্ত সম্মান ও আভিজাত্যের বিষয় মনে করা হতো। কুসাই-এর জীবদ্দশাতেই তিনি এগুলো তাঁর দুই ছেলে আবদুদ দার এবং আবদু মানাফের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

কুসাই হাজীদের পানি পান করানো, খাবার খাওয়ানো এবং যুদ্ধের নেতৃত্বের দায়িত্ব আবদু মানাফের শাখার হাতে সোপর্দ করেছিলেন এবং বাইতুল্লাহর চাবি বহন, দারুন নদওয়াহর তদারকি এবং পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব আবদুদ দারের হাতে অর্পণ করেছিলেন। [১]

বাইতুল্লাহর চাবি বহনের সম্মান বনু আবদুদ দারের কাছে আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম (সা.) এই পরিবারের সদস্য হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)-কে কেবল এই পদে বহালই রাখেননি বরং সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে এই দায়িত্ব তাদের বংশধরদের মধ্যেই চিরকাল থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নেবে, সে হবে জালিম। [২]

**হাশিম:**

আবদু মানাফের দুই ছেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন—হাশিম এবং আবদু শামস। আবদু শামস অত্যন্ত কর্মঠ এবং সাহসী লোক ছিলেন, তাঁর ছেলেও অনেক ছিল, তাই তিনি কুরাইশ বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন। আবদু শামসের পর তাঁর ছেলে উমাইয়া কুরাইশদের সেনাপতি হন এবং পরে উমাইয়ার বংশধরদের মধ্যে যারা 'বনু উমাইয়া' নামে পরিচিত হয়, দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব বহাল থাকে।

হাশিম সম্পদশালী এবং সচ্ছল হওয়ার হক আদায় করে হাজীদের খাওয়ানো ও পান করানোর দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তাঁর নাম 'হাশিম' এই জন্য রাখা হয়েছিল যে তিনি রুটির ছোট ছোট টুকরো করে সেগুলো ঝোলে ভিজিয়ে অভাবীদের খাওয়াতেন। [৩]

কুরাইশরা ব্যবসায়ী জাতি ছিল কিন্তু তাদের ব্যবসা কেবল আশেপাশের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। হাশিম এই ব্যবসার পরিধি অন্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করার সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নিজে সিরিয়ার শহর 'কায়সারিয়া'য় যান, যেখানে কায়সার অবস্থান করছিলেন। সেখানে হাশিম এই নিয়ম করে নেন যে প্রতিদিন একটি ছাগল জবাই করে তার আশেপাশের লোকদের আপ্যায়ন করতেন। কায়সার যখন এই খবর পেলেন তখন তিনি তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন:

"বাদশাহ সালামত! আমরা আরবের ব্যবসায়ী জাতি, আপনি যদি পছন্দ করেন তবে আমাদের একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিন যাতে আমাদের জাতির লোকেরা হিজাজের মালামাল নিয়ে এসে আপনার কাছে বিক্রি করতে পারে। এভাবে এই জিনিসগুলো আপনার কাছে সস্তায় পৌঁছাবে।"

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/১২৫, ১২৯, ১৩০; আর-রওজুল উনফ: ২/৩৩, ৩৪, তাবা দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি।

[২] আখবারু মক্কা লি আবি ওয়ালিদ আল-আযরাকি: ১/২৬৫।

[৩] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/১৩৬।

কায়সার অবিলম্বে একটি নিরাপত্তা পত্র (আমান নামা) লিখিয়ে দিলেন। এরপর কুরাইশদের কাফেলাগুলো নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে সিরিয়া পর্যন্ত যাতায়াত করতে শুরু করল এবং তাদের মধ্যে সমৃদ্ধির হার বাড়তে থাকল। [১]

**কুরাইশদের উত্থান:**

এগুলো ছিল কুরাইশদের উত্থানের দিন। সিরিয়া ও ইয়েমেনের বাণিজ্যিক মহাসড়কে অবস্থিত হওয়ার কারণে মক্কার বাজারগুলো সারা বছর জমজমাট থাকত। কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে এবং শীতকালে ইয়েমেনের দিকে বের হতো, কারণ শীতকালে ইয়েমেনের উপকূলীয় সমভূমি এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ থাকে। এভাবে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সারা বছর অব্যাহত থাকত। বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী ও রক্ষক হওয়ার কারণে কোনো গোত্র কুরাইশদের কাফেলার দিকে বাঁকা চোখে তাকাত না। এই কাফেলাগুলোর মালামাল কখনো কখনো আড়াই হাজার উটের ওপর বোঝাই থাকত, যাদের সাথে একশ-দুইশ লোক অবশ্যই থাকত। [২]

ধর্মীয় কেন্দ্র হওয়ার কারণে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ মক্কার দিকে আসত, বিশেষ করে হজের মাসগুলোতে মক্কা হাজীদের ভিড়ে ঠাসা থাকত। কুরাইশরা প্রাণপণ হাজীদের সেবা করত এবং এই সুযোগে বেশ বাণিজ্যিক মুনাফাও অর্জন করত। নিজেদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও বাণিজ্যিক আয়ের পাশাপাশি কুরাইশরা সামরিক বিষয় এবং রাজনৈতিক কূটকৌশলেও দক্ষ ছিল। তারা সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হতো বনু গিফার থেকে, যারা হারামের কাছে সিরিয়ার পথে বসবাস করত। তারা আকিদাহ বা বিশ্বাসের দিক থেকেও আলাদা ছিল। তারা কুরাইশদের মূর্তি, কাবা এবং হারামের ধারণায় বিশ্বাস করত না, তাই তারা কেবল ব্যবসায়ীদেরই নয় বরং হাজীদেরও লুটতরাজ করত। এমনকি তাদের উপাধিই হয়ে গিয়েছিল "সুররাকুল হাজিজ" (হাজীদের লুণ্ঠনকারী)। [৩]

কুরাইশরা এই বিপদগুলো মোকাবিলা করার জন্য অত্যন্ত রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিত। তারা তাদের জনবল বৃদ্ধির জন্য মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনু কিনানা এবং বনু মুদরিকাহর সেই গোত্রগুলোকে নিজেদের মিত্র বানিয়ে নিয়েছিল যাদের "আহাবিশ" নামে স্মরণ করা হতো। [৪]

এগুলো ছাড়াও গোলামদের একটি আলাদা বাহিনী গঠন করা হয়েছিল যাকে "আবদান" বলা হতো। [৫]

**ইয়াসরিবে ইহুদিদের আগমন:**

মক্কার পর জাজিরাতুল আরবের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল "ইয়াসরিব"। এটি ছিল একটি কৃষিপ্রধান এলাকা যেখানে প্রচুর বাগান ও কূপ ছিল। খেজুর ও আঙুর ছিল এখানকার বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য। মক্কায় গরম ও শীত অত্যন্ত তীব্র হতো কিন্তু "ইয়াসরিব"-এর আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে ভালো ও নাতিশীতোষ্ণ ছিল। মানুষের প্রধান পেশা ছিল চাষাবাদ ও বাগান করা। কিছু লোক ব্যবসাও করত। এই ময়দানে...

---

[১] আল-আওয়াইল, আবু হিলাল আসকারি, পৃ. ৩৬; আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ. ১০১

[২] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ. ১০১

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ. ১০৬; আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি-ডক্টর আলি মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি: ১/৫৭১

[৪] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ. ১০৮

[৫] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৭৭, জিকর মা'রাকাতু উহুদ

ইহুদিদের একটি বড় অংশ ছিল যারা শিল্প ও কারুশিল্পে বিখ্যাত এবং অস্ত্র ও অলঙ্কার তৈরিতে দক্ষ ছিল। ইহুদিদের একটি মহল্লা "বনু কাইনুকা" ঢালাই কাজের কেন্দ্র ছিল। [১] তবে ইহুদিদের মধ্যে খুব কম পরিবার ছিল যারা বংশগতভাবে ইসরায়েলি ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল আরব, যাদের সম্পর্ক ছিল "জুযাম" গোত্রের সাথে। এই লোকেরা হযরত মুসা (আ.)-এর শরীয়তের ওপর ঈমান এনেছিল এবং পরে যখন আমালিকা জাতি (যারা ইহুদিদের শত্রু এবং মূর্তিপূজারী ছিল) তাদের ওপর অত্যাচার শুরু করল, তখন তারা সিরিয়া ত্যাগ করে হিজাজের দিকে চলে আসে। [২]

বনু ইসরায়েলের আগমনের আগেও ইয়াসরিব জনবসতিপূর্ণ ছিল এবং তখন এখানে স্থানীয় অধিবাসী বনু সাদ, বনু আরিক এবং বনু মাতরুফ ছিল, যারা "আমালিকা" গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমালিকা সেই সময়ে মক্কা সহ হিজাজের অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলেও বসবাস করত। জুযাম বংশের আরব ইহুদিরা যখন ইয়াসরিবে আসে, তখন তারা এখানে আমালিকার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই আরব ইহুদিদের ইয়াসরিবে আসার একটি বড় কারণ আরও ছিল। তাদের আলেমগণ তাওরাতে পড়েছিলেন যে, শেষ নবী এমন এক খেজুর বাগানে হিজরত করে আসবেন যার দুই পাশে ঝলসানো পাথুরে ভূমি থাকবে। ইয়াসরিব এই লক্ষণগুলোর সাথে হুবহু মিলে যেত, তাই অনেক ইহুদি এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এটি ছিল ইয়াসরিবে ইহুদিদের প্রথম আগমন। [৩]

দীর্ঘকাল ধরে ইয়াসরিবে ইহুদিদের আধিপত্য বজায় ছিল। কয়েক শতাব্দী পর যখন ইয়েমেনে মা'রিবের বিখ্যাত বাঁধ ভেঙে যায় এবং সাবার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন সেখান থেকে কাহতানি আরবদের দুটি গোত্র হিজরত করে ইয়াসরিবে চলে আসে। এই গোত্রগুলো ছিল আউস এবং খাযরাজ। আউস গোত্রের লোকেরা ইয়াসরিবের কৃষি অঞ্চলের ইহুদি জনবসতির কাছে বসবাস শুরু করে। খাযরাজ ইয়াসরিবের মাঝখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে। ধীরে ধীরে আউস ও খাযরাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তারা ইয়াসরিবের একটি বড় শক্তিতে পরিণত হয়। তবে ইহুদিরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বজায় রাখে। বাণিজ্যিক ও শিল্পগত দিক থেকে তারা যাই হোক না কেন শ্রেষ্ঠ ছিল, বিভিন্ন কৌশল এবং প্রতারণার মাধ্যমে তারা আউস ও খাযরাজকে কখনও নিজেদের ওপর বিজয়ী হতে দেয়নি। এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ, চুক্তি, আলোচনা এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারা চলতেই থাকে।

৭০ খ্রিস্টাব্দে যখন রোমানরা সিরিয়ায় ইহুদিদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, তখন আবারও ইহুদিদের অনেক পরিবার ইয়াসরিবে এসে বসতি স্থাপন করে, যাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল বনু নাযির এবং বনু কুরাইজা গোত্রের লোক। এই উভয় গোত্রই আরব বংশোদ্ভূত ইহুদি ছিল এবং "জুযাম"-এর শাখা ছিল। [৪]

এটি ছিল "আরব জাতীয়তাবাদের" প্রভাব যে, ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও এই লোকেরা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে অত্যন্ত সম্মান করত, মক্কা এবং কাবা শরীফের প্রতি অগাধ ভক্তি রাখত। ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত ইহুদিরা সাধারণত প্রতারক এবং ভীরু ছিল, কিন্তু এই আরব...

---

[১] আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব: ৭/২৯৩, আরবিতে কামারকে 'কাইন' বলা হয়, যেখানে কাইনুকা-এর অর্থ 'কামারদের গলি' হতে পারে।

[২] আত-তানবিহ ওয়াল আশরাফ লিল মাসউদি, পৃ: ২১৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৩৩৩। তবে তাদের মধ্যে সঠিক বংশীয় ইহুদিও ছিল যেমন উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা.)-এর পিতা-মাতা। এজন্যই নবী করীম (সা.) তাকে বলেছিলেন: "তুমি নবীর কন্যা এবং তোমার চাচাও নবী।" (অর্থাৎ হযরত হারুন এবং হযরত মুসা (আ.)) [সুনান আত-তিরমিজি, হা: ৩৮৯২, বাবু ফাদলি আযওয়াজিন নবী (সা.)]

[৩] মু'জামুল বুলদান: ৫/৮২, মদিনাতু ইয়াসরিব।

[৪] তারিখ ইয়াকুবি, ১/৬৯, ৮০; বাবু মুলুকিশ শাম; ১/২৩১, ২৩২; বাবু বনু নাযির, বনু কুরাইজা।

ইহুদিরা চালাক হওয়ার পাশাপাশি বড় যোদ্ধা ছিল। তাদের নামগুলোও আরবদের মতোই ছিল। পরবর্তীতে আউস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকও তাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। [১]

এই যোদ্ধা ইহুদিরা 'ইয়াসরিব'-এ প্রাচীরবেষ্টিত বসতি ও দুর্গ তৈরি করে ইহুদি জনপদকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করেছিল। [২] ইয়াসরিবকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আসা আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। যখন ইয়েমেনের তুব্বা বাদশাহদের উত্থান হলো, তখন শেষ তুব্বা আসআদ আবু কারিব, যাকে 'হাসসান তুব্বা'ও বলা হয়, ইয়াসরিব আক্রমণ করেন। ইয়াসরিবের লোকেরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করে, বিশেষ করে আউস ও খাযরাজ গোত্র বীরত্বের সাথে লড়াই করে। হাসসান তুব্বা ইয়াসরিবকে ধ্বংস করার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু শহরের প্রতিরক্ষার জন্য ইহুদি ও আরবরা একজোট ছিল। এমতাবস্থায় দুইজন ইহুদি আলেম হাসসানকে সতর্ক করে বললেন: "এমনটি করবেন না, কারণ এই জায়গাটিই শেষ নবীর হিজরতগাহ হবে।"

এ কথা শুনে হাসসান তুব্বা শুধু তার সংকল্প থেকেই বিরত হননি, বরং ফেরার পথে মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার ইহুদি আলেমদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাবার তাওয়াফ করেন এবং তাতে নতুন গিলাফ পরান। [৩] তিনি বনু জুরহুমকে, যারা সে সময় কাবার তত্ত্বাবধায়ক ছিল, নির্দেশ দেন যেন তারা বাইতুল্লাহ ও মসজিদে হারামকে সব ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করে। [৪]

**ইয়াসরিবে আউস ও খাযরাজ এবং ইহুদিদের দ্বন্দ্ব:**

পরবর্তী সময়ে ইয়াসরিবের ইহুদি ও আরবদের মধ্যকার সম্পর্ক, যা শুরুতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে ছিল, তিক্ত হতে শুরু করে। এর বড় কারণ ছিল এই যে, আউস ও খাযরাজ তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এখন ইয়াসরিবের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ইহুদিরা তাদের নিজস্ব বসতি ও দুর্গে স্বায়ত্তশাসিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষ থেকে বিপদ অনুভব করছিল; তাই তারা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তারা সহজেই এই সুযোগ পেয়ে যায়; কারণ আউস ও খাযরাজ উভয়েই পূর্ণ আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষী ছিল। উন্নতির দিকে ধাবিত এই দুই আরব গোত্রের প্রত্যেকে যখন নিজের শক্তি বাড়াতে সচেষ্ট হলো, তখন ঐক্য ও সংহতির বন্ধন ভেঙে গেল। এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে সামান্য অজুহাতে উভয়ের মধ্যে তলোয়ার চলতে শুরু করল। অন্যান্য আরব গোত্রও মিত্র হিসেবে এই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই ধারাবাহিক লড়াইয়ের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ ছিল 'সুফাইনা'। এরপর ইয়াওমে হাতিব, ইয়াওমে বুকাঈ এবং ইয়াওমে দারের মতো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধগুলোর আগুন উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহুদিদের ভূমিকা কারো কাছে গোপন ছিল না। তাদের কিছু গোত্র এক পক্ষকে সমর্থন দিত এবং কিছু অন্য পক্ষকে।

---

[১] নবী রহমত, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ২৩৩

[২] তারিখ ইবনে খালদুন ২/৩৩৩; নবী রহমত, পৃ. ২২২ বরাতে তারিখুল ইয়াহুদ ফি বিলাদিল আরব, ইসরাঈল উলফেনসন, পৃ. ৯

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৬১

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/১৬৩

হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন:

“আউস ও খাযরাজ (মদীনার আরব অধিবাসী) এবং ইহুদিদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যক্তিগত স্বার্থ ও শোষণের ওপর ভিত্তি করে ছিল। ইহুদিরা এই দুই গোত্রকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিজেদের স্বার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করত, যেমনটি তারা আউস ও খাযরাজের মধ্যকার অসংখ্য যুদ্ধে করেছিল, যার ফলে এই দুই গোত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। তাদের সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল মদীনার ওপর তাদের আর্থিক আধিপত্য বজায় রাখা।” [১]

তায়েফ:

মক্কা ও ইয়াসরিবের পর জাযিরাতুল আরবের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল ‘তায়েফ’, যা মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৭৫ মাইল (১২০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত ছিল, যেখানে বনু সাকিফ গোত্র বসবাস করত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই শহরটি তার মনোরম আবহাওয়া, সজীবতা ও ফলমূলের প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। মক্কার অভিজাতরা এখানে অনেক বাগান কিনে রেখেছিল এবং গ্রীষ্মকাল এখানেই কাটাত। নিজের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির কারণে এই শহরটি মক্কার সমকক্ষ মনে করা হতো। [২] আরবদের মধ্যে শহরগুলোর চারপাশে প্রাচীর নির্মাণের প্রথা ছিল না। মক্কা ও ইয়াসরিবের মতো শহরগুলো প্রাচীর ও দুর্গ থেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু তায়েফের চারপাশে উঁচু প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। [৩] এভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে এটি আরবের সমস্ত শহরের চেয়ে বেশি সুসংহত ছিল।

## ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৃথিবী

ষষ্ঠ ঈসায়ী শতাব্দীর অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবী তার সমস্ত চাকচিক্য ও বিলাসিতা সত্ত্বেও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ছিল। আসমানি নির্দেশনার কোনো নামনিশানা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাওয়া যেত না। হিন্দুধর্ম হোক বা বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম হোক বা ইহুদিধর্ম, প্রতিটি ধর্মই নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির সংকীর্ণ চিন্তাধারার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মীয় নেতারা হেদায়েতের অন্বেষণ, খোদাভীতি এবং আখেরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। যে ধর্মগুলো একসময় পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার বাহক ছিল, সেগুলো এখন বিকৃতি ও পরিবর্তনের শিকার হয়ে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়েছিল। আম্বিয়ায়ে কেরামের কিতাব ও সহীফাগুলো তাদের মূল রূপে সংরক্ষিত ছিল না।

হিন্দুধর্ম:

এই যুগে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন ছিল হিন্দুধর্ম, যা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে প্রায় পুরো দক্ষিণ এশিয়াকে নিজের কবজায় নিয়েছিল। এটি ছিল এমন এক গোলকধাঁধা যা এই ধর্মের নেতারাও বুঝতে ও বোঝাতে অক্ষম ছিল।

---

[১] নবী রহমত (সা.), সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ২৩১

[২] মু’জামুল বুলদান: ৩/৯০৮, তায়েফ

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৬০৬

হিমালয় থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত ৩৩ কোটি দেবী-দেবতার পূজা করা হচ্ছিল; গরু, বানর ও সাপ থেকে শুরু করে ইঁদুর পর্যন্ত উপাসনা করা হচ্ছিল। প্রতিটি পাড়ায় এমনকি প্রতিটি অলিগলিতে আলাদা আলাদা উপাস্য ছিল।

একজন হিন্দু ঐতিহাসিকের মতে, দেবতাদের সংখ্যা হিন্দুস্তানের জনসংখ্যার চেয়েও বেড়ে গিয়েছিল। এক দেবীর পূজারি অন্য দেবীর উপাস্যদের মান্য করাকে নিজের অপমান মনে করত, ফলে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত যে হিন্দু কাকে বলে? তবে হয়তো উত্তরে বলা হতো যে প্রত্যেক মূর্তিপূজারিই হিন্দু, কিন্তু এই উত্তরটিও তখন ভুল মনে হতো যখন মানুষ দেখত যে হিন্দু নেতারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদেরও 'নাস্তিক' নাম দিয়ে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং শূদ্রদেরও হিন্দু হিসেবে গণ্য করেছে, যদিও তাদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পর্যন্ত ছিল না।

নিকৃষ্টতম বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির পর বর্ণপ্রথা বা জাতপাতের বৈষম্য ছিল হিন্দু সমাজের দ্বিতীয় হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডি। হিন্দুদের নিকট ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের সন্তান, সকল পাপ থেকে মুক্ত এবং সবকিছুর মালিক বলে গণ্য হতো, কারণ তারা ছিল ধর্মীয় নেতা। ক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ের মালিক ছিল। তারা ব্রাহ্মণদের জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল এবং বাকি জাতিকে জুলুম ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট করাকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছিল। বৈশ্যরা, যারা ছিল তৃতীয় স্তরের বর্ণ, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি এবং শিল্প-কারখানার মাধ্যমে উভয় উচ্চবিত্ত শ্রেণির জন্য সম্পদ আহরণে নিয়োজিত থাকত। অন্যদিকে চতুর্থ স্তরের বর্ণ শূদ্রদের অবস্থা পশুদের চেয়েও অধম ছিল। তারা উচ্চবর্ণের লোকদের সাথে বসা তো দূরের কথা, তাদের কোনো কিছু স্পর্শও করতে পারত না। তাদের জন্মগত পাপী, চিরন্তন অপরাধী এবং দেবতাদের অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাদের প্রতিটি ব্যক্তি জন্মমাত্রই উচ্চবর্ণের লোকদের দাসে পরিণত হতো। তাদের ওপর সব ধরনের জুলুম-অত্যাচার করা বৈধ ছিল এবং তাদের প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা ছিল জঘন্যতম অপরাধ। [১]

শাহ মঈনুদ্দিন নদভী রহ. লিখেছেন:

"ব্রাহ্মণদের জন্য কোনো অবস্থাতেই কোনো শাস্তি ছিল না, কিন্তু যদি অস্পৃশ্যরা উচ্চবর্ণের কাউকে স্পর্শ করত তবে তাদের শাস্তি ছিল মৃত্যু। নিম্নবর্ণের স্তরগুলো ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আইনত বঞ্চিত ছিল। নৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। একেকজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারত, মদ্যপান ছিল মজ্জাগত, মাতলামির ঘোরে প্রতিটি পাপ সওয়াবের কাজে পরিণত হতো... মন্দিরের পূজারিরা ছিল অনৈতিকতার মূর্ত প্রতীক। দেবদাসীদের নৈতিক অবস্থা লজ্জাজনক পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। নারীদের কোনো মূল্য ছিল না... কোনো কোনো শ্রেণিতে কন্যা সন্তানদের হত্যা করা হতো... স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে সমস্ত পার্থিব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হতো, তাই সে স্বামীর সাথে পুড়ে মরাকে বেঁচে থাকার চেয়ে শ্রেয় মনে করত।" [২]

**বৌদ্ধ ধর্ম:**

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম ছিল "বৌদ্ধ ধর্ম", যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ, যাকে গৌতম বুদ্ধ নামে স্মরণ করা হয়।

---

[১] মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন, আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ৪৮, ৫৩।

[২] তারিখ-ই-ইসলাম, শাহ মঈনুদ্দিন নদভী: ১/২৪, ত. দারুল ইশাআত।

https://t.me/BoierSomahar

...। হিন্দু ধর্মে বর্ণপ্রথার অমানবিক সীমাবদ্ধতায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি নির্জনে ধ্যান ও ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার পর একটি নতুন নৈতিক ব্যবস্থা পেশ করেন যেখানে সকল মানুষ সমান ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের প্রতিক্রিয়ায় তিনি কোটি কোটি দেবী-দেবতাকে এমনভাবে অস্বীকার করেন যে, এক খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেও প্রয়োজনীয় মনে করেননি। বুদ্ধ বর্ণপ্রথার বন্দিত্ব থেকে মুক্তির স্লোগান দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে চমকে দিয়েছিলেন, কিন্তু খোদার ধারণার ঘরটি শূন্য থাকার কারণে এই ধর্ম দীর্ঘকাল মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেনি। গৌতম বুদ্ধের পর বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগুরুরা যখন ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করলেন, তখন একজন দৃশ্যমান খোদার উপাসনা করার জনআকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে গৌতম বুদ্ধকেই খোদা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তাঁর মূর্তিপূজাকে এতটাই প্রচলিত করেন যে হিন্দুদের মূর্তিনির্মাণ ও প্রতিমাপূজাও পেছনে পড়ে যায়। বুদ্ধের মূর্তি মধ্য এশিয়া থেকে দূরপ্রাচ্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত স্থাপিত হয়। এভাবে ওহীর নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে একটি নতুন সংস্কারবাদী আন্দোলন স্থায়ী গোমরাহীর জালে পরিণত হয়। [১]

ইরানের ধর্মীয় বিপর্যয়:

প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ইরান, খোরাসান এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সাসানীয় সাম্রাজ্য। ইরানের সম্রাটরা ছিলেন মজুসী এবং তারা শতাব্দীকাল ধরে অগ্নিপূজাকে উৎসাহিত করে আসছিলেন। মজুসী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জরথুস্ত্র (জর্দশত), যিনি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি আলো ও অন্ধকার, ভালো ও মন্দ এবং মঙ্গলের খোদা ও অমঙ্গলের খোদার মধ্যে যুদ্ধের ধারণা পেশ করে মানুষকে অগ্নিপূজায় অভ্যস্ত করেন। মজুসীরা সূর্য ও চন্দ্রকেও পূজা করত। এ ছাড়া স্বয়ং ইরানি সম্রাট কিসরাও নিজেকে খোদা বলে দাবি করতেন। খসরু পারভেজের নামের সাথে এই উপাধিগুলো লাগানো হতো: “দেবতাদের মধ্যে অমর মানুষ এবং মানুষদের মধ্যে অতুলনীয় খোদা”। [২]

এই সমস্ত খোদার ঊর্ধ্বে তারা ভালো ও মন্দের জন্য দুটি আলাদা খোদাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করত; কল্যাণ বিস্তারকারী খোদাকে বলা হতো ‘ইয়াজদান’ এবং অকল্যাণের মালিক খোদাকে বলা হতো ‘আহরিমান’, যা ছিল শয়তানের একটি বিকৃত ধারণা। তাদের মতে, সৃষ্টির শুরু থেকেই ইয়াজদান ও আহরিমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল এবং এই কারণেই মহাবিশ্বে কল্যাণ ও অকল্যাণ, সৃষ্টি ও ধ্বংস এবং জয় ও পরাজয়ের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেত। এটিই ছিল ইরানিদের আকিদার ভিত্তি, যার ওপর অদ্ভুত সব বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল যা সময়ে সময়ে রূপ পরিবর্তন করত।

মজুসী ধর্ম ছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, যা বিশেষ সময়ে অগ্নিমন্দিরে পালন করা হতো। অগ্নিমন্দিরের বাইরে প্রত্যেক মজুসী শরয়ী ও নৈতিক সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সুদখোরি, মদ্যপান এবং ব্যভিচারের মতো গুনাহ যা অধিকাংশ সমাজে মন্দ বলে বিবেচিত হতো, তাদের কাছে তা সম্পূর্ণ বৈধ ছিল; এমনকি মাহরামদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাও তাদের কাছে সঠিক ছিল। যেহেতু এই ধর্ম নৈতিক শিক্ষা থেকে একেবারেই শূন্য ছিল, তাই এর এক হাজার বছর পর (খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে) ‘মানি’ মজুসী ধর্মে সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পৃথিবী থেকে মন্দ দূর করার জন্য মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করার,

---

১. মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন, আবুল হাসান আলী নদভী: পৃ. ৩৬ থেকে ৩৮

২. নবীয়ে রহমত (সা.): পৃ. ৪৭

যুদ্ধে যাওয়ার অজুহাতে বিবাহ ও সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব থেকে দূরে থাকার উৎসাহ দেওয়া হতো। এটি ছিল আরেকটি চরমপন্থা যা মানবিক সমাজের চাহিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এজন্য পঞ্চম খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে যখন আল-সাসানের শাসনামলে সূর্য মধ্যগগনে ছিল, তখন 'মাজদাক' নতুন কিছু সংস্কার পেশ করেন, যার অধীনে মানুষকে সব ধরণের বিলাসিতার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শুধু খাওয়া-দাওয়া, সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষেত্রেই নয়, বরং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সকল পুরুষকে নারীদের ওপর সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, মানুষ একে অপরের ঘরে ঢুকে পড়তে লাগল, ক্ষেত-খামার ও সহায়-সম্পত্তি দখল করতে লাগল এবং যে ব্যক্তি যেখানে চাইত, যে নারীকে চাইত নিজের যৌন লালসা মেটানোর জন্য ধরে নিত।

মোটকথা, ইরানি সালতানাত ও সমাজ যা বেলুচিস্তান থেকে সমরকন্দ ও বুখারা পর্যন্ত এবং খোরাসান থেকে এশীয় মাইনরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তা কখনোই সেই ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারেনি যা একটি সফল ও শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য অপরিহার্য। এর বিপরীতে সেখানে বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা, জুলুম ও শোষণের রাজত্ব ছিল। সাধারণ মানুষ চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশার শিকার ছিল, অথচ শাসকরা এই পৃথিবীকে জান্নাত বানাতে ব্যস্ত ছিল। ইরানি শাহেনশাহিয়াতের অধীনে থাকা ডজনখানেক সালতানাতের আয়ের সিংহভাগ বাদশাহ ও রাজকীয় অভিজাতদের বিনোদন ও বিলাসিতায় ব্যয় হতো। রাজধানী মাদায়েনে কসর-ই-কিসরার রাজকীয় বাবুর্চিখানায় বাবুর্চির সংখ্যা ছিল এক হাজারের বেশি, এছাড়া গায়ক, নর্তকী, সংগীতশিল্পী, শিকারি চিতা, কুকুর এবং তাদের দেখাশোনা করার লোকের সংখ্যা ছিল এর চেয়েও অনেক বেশি। গ্রীষ্মকালকে বসন্তকাল বানানোর জন্য কিসরা সেই সময়ের বিখ্যাত 'কালীন-এ-বাহার' (বসন্তের গালিচা) তৈরি করিয়েছিলেন, যার প্রতি বর্গফুটে হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। [১]

## চীনের বিশ্বাসগত অবস্থা:

প্রাচ্যের শেষ প্রান্তের এই বিশাল দেশ চীন তার সমস্ত ভৌগোলিক বিস্তৃতি, খনিজ সম্পদ এবং অসাধারণ মানসিক সক্ষমতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও 'কনফুসিয়াস'-এর দর্শনের বাইরে এগোতে পারেনি। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পাঁচশ বছর আগে চীনের শানতুং এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একজন দার্শনিক হিসেবে পরিচিত হয়ে তিন হাজারের বেশি ছাত্র তৈরি করেছিলেন। এই প্রাচ্য চিন্তাবিদ কিছু নৈতিক শিক্ষাকে দার্শনিক রঙে উপস্থাপন করে মানুষের চিন্তাশক্তিকে একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। তিনি মানুষের আত্মা ও মানব সমাজের সামনে আসা বৈশ্বিক সমস্যাবলির সমাধান পেশ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন, যা মানবতার সামষ্টিক বিবেকের জন্য একটি ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছিল। [২]

## ইউরোপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন:

প্রাচ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক ধরণের পতন অবশ্যই ছিল, কিন্তু পশ্চিমের অবস্থা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ। পূর্ব ইউরোপ থেকে শুরু করে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত মূর্খতা, দারিদ্র্য, কলুষতা এবং স্থবিরতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। ইউরোপীয় বাসিন্দারা...

---

[১] আস-সিরাতুন নববীয়্যাহ, আবুল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা ৩৩ থেকে ৩৬।

[২] মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন, পৃষ্ঠা ৪৬।

তারা বিজ্ঞান ও শিল্পকলা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। বাকি বিশ্বের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। রাজনীতি হোক বা সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা হোক বা শিল্প ও বাণিজ্য—সবকিছুর ওপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সংকীর্ণমনা পাদ্রিদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। তাদের চরমপন্থা এমন পর্যায়ে ছিল যে, একদিকে তারা আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে নিরুৎসাহিত করে মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা এবং আবিষ্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, যার ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক সক্ষমতা স্থবির হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, রোমান সাম্রাজ্য বিভক্তির পাশাপাশি তারা গির্জাকেও দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল—পূর্বীয় গির্জা এবং পশ্চিমীয় গির্জা।

পূর্বীয় গির্জার কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল, যাকে অর্থোডক্স চার্চ বলা হতো; এর প্রধানকে 'প্যাট্রিয়ার্ক' (Patrick) বলা হতো। পশ্চিমীয় গির্জা ক্যাথলিক চার্চ নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, যার ধর্মীয় নেতা পোপ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কনস্টান্টিনোপল ও রোমের রাজনৈতিক শত্রুতার পাশাপাশি উভয় গির্জার মধ্যেও শত্রুতা বাড়তে থাকে। উভয় পক্ষই একে অপরের ওপর নিজেদের বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। পূর্বীয় গির্জা বলত যে, পিতা (ঈশ্বর)-এর মর্যাদা পুত্র (যিশু খ্রিস্ট) অপেক্ষা বড়, যেখানে পশ্চিমীয় গির্জা উভয়কে সমান মনে করত। এমন অনেক বিতর্ক ছিল যার কারণে একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া এবং তাকফির (কাফির সাব্যস্ত করা)-এর উপক্রম হতো। এই পরিস্থিতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ নিজেদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জন্য বনে-জঙ্গলে গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং তারা সন্ন্যাসী (রাহিব) হিসেবে পরিচিতি পায়। কিন্তু কোনো লিখিত হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা না থাকায় তারা নিজেরাই নিত্যনতুন গোমরাহির শিকারে পরিণত হয়। [১]

এই ধর্মীয় লোকদের সাধারণ জীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করার মোটেও অবসর ছিল না। পাদ্রি ও সন্ন্যাসীদের একটি বড় অংশ ছিল সহিংস, মানববিদ্বেষী এবং হতাশাবাদী। তারা নিজেদের কষ্ট দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত। তারা মানব সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদের মধ্যে তখন পর্যন্ত এটি মীমাংসিত হয়নি যে, কোনো কিছু কেনা-বেচা বা তার মালিক হওয়ার অধিকার নারীর আছে কি না। তারা এ বিষয়েও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না যে, নারী একজন মানুষ। তাদের কোনো কোনো মহলে নারী জাতিকে কুকুর বা বিড়ালের মতো প্রাণী মনে করা হতো। নারীর মধ্যে আত্মা আছে কি না, সে বিষয়েও তাদের সন্দেহ ছিল। কেউ কেউ তাকে একটি প্রাণহীন যন্ত্র হিসেবেই গণ্য করত। [২] রবার্ট ব্রিফল্ট লিখেছেন:

"এই যুগের বর্বরতা ও পাশবিকতা প্রাচীনকালের বর্বরতা ও হিংস্রতার চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল, কারণ এর উদাহরণ ছিল একটি বিশাল সভ্যতার লাশের মতো যা পচে গলে গেছে।" [৩]

ইউরোপে এই সময়টি ছিল বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার যুগ। ইতালি ও ফ্রান্স থেকে শুরু করে পূর্ব ইউরোপ ও কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অরাজকতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। এমন কোনো সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ ছিলেন না যিনি জাহিলিয়াতের এই অন্ধকারে সত্য পথের সামান্য ইঙ্গিত দেবেন। তাদের কাছে মূল ইঞ্জিলের কোনো নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি অবশিষ্ট ছিল না, বরং তা দীর্ঘকাল পরে আবিষ্কৃত...

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২৭; আত-তুহফাতুল বাগদাদিয়্যাহ ফী মুখতাসার তারিখিন নাসরানিয়্যাহ লিল আসিম আল-মাকদিসী, পৃষ্ঠা ৯৬ থেকে ১১১।

[২] আস-সীরাতুন নববীয়্যাহ লি আবিল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা ৩০ থেকে ৩২।

[৩] মাযা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন লি আবিল হাসান আলী নদভী, পৃষ্ঠা ৩৮, উদ্ধৃত: (The Making of humanity, P: 164)।

যারা এই পাণ্ডুলিপিগুলোকে ইঞ্জিলের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিল, সেগুলো ছিল হাওয়ারীদের স্মৃতিচারণ এবং সেগুলোতেও ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছিল।

দ্বীন-ই-ঈসায়ীর মূল দাওয়াতদানকারী হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।" [১]

কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মগুরুর রূপ ধারণকারী ধূর্ত ইহুদি 'পল' খ্রিস্টধর্মের তাওহীদকে ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত করে ফেলেছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা নাসারাদের অনুসারী হয়ে পড়েছিল। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ভেসে গিয়ে তারা তাওহীদের সহজ-সরল দাওয়াত ত্যাগ করেছিল এবং রোমান মূর্তিপূজকদের দ্রুত প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার এক অদ্ভুত দর্শন গ্রহণ করে নিয়েছিল, যা নিয়মিতভাবে ত্রিত্ববাদ (তিন খোদায় বিশ্বাস) আকিদার রূপ ধারণ করেছিল। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তারা ইহুদিদের সেই কথায় বিশ্বাস করে নিয়েছিল যারা বলত যে, আমরা ঈসাকে হত্যা করেছি; অথচ বাস্তবতা ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। [২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষেও কোথাও কোথাও এমন খ্রিস্টান পাওয়া যেত যারা তাওহীদে বিশ্বাসী এবং প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল, কিন্তু এ ধরনের মানুষের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং যারা ছিল তারা কোনো সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে হতাশ ছিল এবং নির্জনে জীবন অতিবাহিত করছিল।

**গ্রীক দর্শন:**

সেই যুগে সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি প্রাচীন কেন্দ্র ছিল গ্রীস। ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে এখানে দর্শনের বাজারের জৌলুস ম্লান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনও একে সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতো জ্ঞানীদের দেশ হিসেবে চেনা হতো। তারা সবাই ছিলেন নিজ নিজ সময়ের প্রখ্যাত দার্শনিক। সক্রেটিস হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় চারশ বছর আগে গত হয়েছেন। তাঁর প্রখ্যাত ছাত্র প্লেটোর সময়কাল হযরত ঈসা (আ.)-এর সাড়ে তিনশ বছর আগের। এরপর অ্যারিস্টটল আসেন, যিনি ছিলেন প্রখ্যাত গ্রীক বিজয়ী আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের শিক্ষক ও উপদেষ্টা। গ্রীসের রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দার্শনিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশ বৃদ্ধি পায়। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট প্রাচ্যকে দার্শনিকদের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে ফিলিস্তিনিদের আবাদ করেন; এভাবে প্রাচ্যেও দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার শুরু হয়। এই দার্শনিকরা প্রতিটি জিনিস এবং প্রতিটি বিষয়কে যুক্তির তুলাদণ্ডে পরিমাপ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তারা যেকোনো বিষয়ে সঠিক বা ভুলের ফয়সালা করার জন্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে যথেষ্ট মনে করতেন এবং ওহীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন।

এই দার্শনিকরা কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং রাজনীতির বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করেননি, বরং খোদা, মহাবিশ্ব, ভালো-মন্দ এবং সৃষ্টির শুরু ও শেষ সম্পর্কিত সমস্যাগুলোও কেবল নিজেদের চিন্তাভাবনা দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। এখানেই তাদের পা এমনভাবে পিছলে গিয়েছিল যে, তারা সুদূরপ্রসারী গোমরাহীর অতলে গিয়ে পড়েছিলেন। তারা কেবল যুক্তির ওপর নির্ভর করার কারণে স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যান। আখেরাত এবং...

---

[১] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৫২

[২] আত-তুহফাতুল মাকদিসিয়্যাহ ফী মুখতাসারি তারিখিন নাসরানিইয়্যাহ লিল আসিম আল-মাকদিসী: পৃষ্ঠা ৭০ থেকে ৯৩

হাশর ও নশর সম্পর্কে তাদের মন কখনোই পরিষ্কার হতে পারেনি। নিজেদের জ্ঞানকে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ মনে করার কারণে তারা কখনোই রাসূলদের শিক্ষার ওপর চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেনি। এই চিন্তাধারা দার্শনিক এবং তাদের অনুসারীদের এক প্রকার আল্লাহ ও আখেরাত অস্বীকারকারী বানিয়ে দিয়েছিল। এভাবে শরীয়ত এবং হালাল ও হারামের শব্দগুলো তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল।

এর ফলে গ্রিসসহ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত প্রতিটি অঞ্চলে এক লাগামহীন সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে, যেখানে সন্দেহ ও সংশয়ে নিমগ্ন থাকাকে 'জ্ঞান' নাম দেওয়া হয়েছিল এবং নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। দার্শনিকদের দেওয়া সভ্যতা গ্রিসের এই অবস্থা করে দিয়েছিল যে, 'এথেন্স'-এর মোড়ে মোড়ে এবং বাজারে বাজারে ব্যভিচারী নারীরা প্রকাশ্যে পাপের দাওয়াত দিত। দার্শনিকদের চরম উন্নতির যুগে নগ্নতা গ্রিক সভ্যতার এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিল যে, ললিতকলার প্রতিটি শাখা—তা চিত্রকর্ম হোক বা ভাস্কর্য—তারই প্রতিফলন ঘটাত। থিয়েটারগুলোতে নারীদের নগ্ন নৃত্য ছিল সাধারণ ব্যাপার। খেলার মাঠে মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে খেলত এবং দর্শকরা বাহবা দিত। ব্যভিচার, অশ্লীলতা, খেলাধুলা, নাচ-গান এবং ভোগ-বিলাসই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নতুন নতুন দৃশ্যের মাধ্যমে ভোগ ও বিনোদনের স্বাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আমীর ও রাজপুত্ররা বন্দীদের ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর সাথে লড়াই করাত এবং এই তামাশা দেখে আনন্দ পেত। যৌন তৃপ্তির নিত্যনতুন উপায়ের সন্ধান মানুষকে স্বাভাবিক পথ থেকে এতটাই বিচ্যুত করে দিয়েছিল যে, বড় বড় অভিজাত ব্যক্তিরা সমকামিতার নেশায় মত্ত ছিল। সাধারণ লম্পটদের কথা আর কী বলা, যাদের বাজারে বাজারে পতিতাদের জুতো চাটতে দেখা যেত।

ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের যে সময়ের কথা আমরা বলছি, গ্রিসের পরিবর্তে তখন রোমের জয়জয়কার ছিল এবং প্রথিতযশা দার্শনিকদের সোনালী দিনগুলো গত হয়ে গিয়েছিল। তবে রোমান সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দার্শনিক চিন্তাধারা মিশে ছিল এবং প্রায় সেই সমস্ত মন্দ দিকগুলো বিদ্যমান ছিল যার বীজ দর্শন বপন করেছিল। [১]

কেবলই বাগাড়ম্বর:

সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় ছিল এই যে, পূর্ব ও পশ্চিমের এই দার্শনিকদের, বিপ্লবের এই আহ্বানকারীদের এবং মানবতার এই নেতাদের শিক্ষা ছিল কেবল কিতাবী ও তাত্ত্বিক। বাস্তব ক্ষেত্রে এই শিক্ষার কোনো নমুনা দেখার চেষ্টা করলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে আসত না।

তাদের মধ্যে কোনো দার্শনিক বা আহ্বানকারীর বাস্তব জীবন এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা প্রদান করে না যে, মানুষ কীভাবে আত্মা ও দেহের পবিত্রতা অর্জন করবে, তার প্রকাশ্য ও গোপন জীবন কেমন হবে, কথা ও কাজে কী গুণাবলি থাকবে, স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে এবং সৃষ্টির সাথে কেমন হবে। সে খুশিতে কোন আবেগে সজ্জিত হবে এবং দুঃখ ও শোকে তার আচরণ কেমন হবে। বিজয় ও সাফল্যের মুহূর্তে তার ব্যবহার কেমন হবে এবং পরাজয়, বিপদ ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সে কীভাবে ঘুমাবে, কীভাবে

---

[১] আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ লি-আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ৩০ থেকে ৩২; ক্বাযায়াল মারআ ফিল মুতামারাত আদ-দুওয়ালিয়্যাহ লিদ-ডক্টর ফুয়াদ বিন আব্দুল কারীম, পৃ. ৩৩৩।

জাগে, বড়দের এবং মুরুব্বিদের সাথে তার আচরণ কেমন ছিল এবং ছোটদের সাথে কীভাবে পেশ আসতেন, পারিবারিক জীবন কোন গুণাবলির প্রতিচ্ছবি ছিল এবং সামাজিক ব্যস্ততায় রীতিনীতি কী ছিল? দুনিয়ার এই প্রশ্নগুলোর বাস্তব উত্তরের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল যে আমলের মহান নেয়ামত পূর্ববর্তী নবীদের সাথে সাথেই দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

## ইহুদিরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত

যদি ভাসাভাসা নজরে দেখা যায়, তবে সেই যুগে অন্যদের তুলনায় "ইহুদিদের" কাছ থেকে এই প্রত্যাশা বেশি করা যেত যে তাদের মধ্যে কোনো নতুন সংস্কারক জন্ম নেবে যে অত্যন্ত বিগড়ে যাওয়া সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে। কারণ হাজার হাজার বছর ধরে বনী ইসরাঈলে আম্বিয়ায়ে কেরামের ধারা চলে আসছিল, তারপর তাদের কাছে তাওরাতের আকারে একটি হিদায়াতনামা বিদ্যমান ছিল, যাতে জায়গায় জায়গায় বিকৃতি সত্ত্বেও শেষ নবীর নিদর্শনসমূহ অন্তত তখন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ ছিল। খোদ ইহুদিদেরও এই বিশ্বাস ছিল যে সেই শেষ নবী আসার সময় হয়েছে এবং তিনি তাদের মধ্য থেকেই হবেন; কারণ শত শত বছর ধরে তাদের মধ্যে মহান আম্বিয়ায়ে কেরামের আবির্ভাব ঘটছিল। ইহুদিরা নিজেদেরকে বাকি সমাজগুলোর সাথে মিশে যাওয়া থেকেও রক্ষা করেছিল; তারা তাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি রক্ষা করে আসছিল। তাদের ইলমি যোগ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তার দিকে তাকালেও তাদের মধ্যে কোনো নেতা ও সংস্কারকের আবির্ভাবের আশা করা যেত।

কিন্তু এটি ছিল কেবল বাহ্যিক পর্যালোচনা। বাস্তবতা হলো এই যে, এই জাতি যারা শত শত বছর ধরে আল্লাহর নেয়ামত ও সম্মানের অধিকারী ছিল, অভ্যন্তরীণভাবে এতটাই অধঃপতিত হয়েছিল যে তাদের কাছ থেকে কোনো কল্যাণের আশা করা নিরর্থক ছিল। ইহুদিদের সমস্ত মন্দের মূলে ছিল তাদের অহংকার ও দম্ভ। অতীতে বারবার আল্লাহ তাআলার রহমত ও করুণা লাভের পর তারা ধারণা করে নিয়েছিল যে তারা আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত। এই ধারণা তাদেরকে অহংকারী করে দিয়েছিল, যার ফলে তারা একগুঁয়েমি ও আত্মম্ভরিতার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। যখন এই রোগ সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তারা আসমানি শরীয়তকেও নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর চেষ্টা শুরু করল। তাওরাতে জায়গায় জায়গায় শাব্দিক পরিবর্তন করে দিল এবং যে আয়াতগুলো আসল অবস্থায় ছিল, সেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য নিজেদের পক্ষ থেকে এমনভাবে নির্ধারণ করে নিল যা তাদের প্রবৃত্তির চাহিদার পরিপন্থী না হয়।

এই নতুন অর্থ ও উদ্দেশ্য ইহুদিদের এই ধারণার প্রতিফলন ঘটাত যে তারা সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বাকি সব মানুষ তাদের গোলাম। এই মনগড়া ব্যাখ্যাগুলোকে তারা সিনা-ব-সিনা হিদায়াত নাম দিয়েছিল এবং শত শত বছর ধরে সেগুলোর ওপর আমল করে আসছিল। তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার এবং তাঁর শিক্ষার বিরোধিতা এই জন্য করেছিল যে তাঁর শিক্ষাগুলো সিনা-ব-সিনা চলে আসা ইহুদি রেওয়াজগুলোর পরিপন্থী ছিল এবং ইহুদিরা সেই রেওয়াজগুলো থেকে সরে আসতে প্রস্তুত ছিল না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার প্রায় দেড়শ বছর পর ইহুদি আলেমরা তাওরাতের এই মনগড়া গোপন ব্যাখ্যাগুলোকে প্রথমবারের মতো লিপিবদ্ধ করার এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা করার কাজ শুরু করেন। এই সংকলনকে 'মিশনা' নাম দেওয়া হয় এবং ইহুদি আলেমরা সর্বসম্মতভাবে ফয়সালা শুনিয়ে দেন যে এখন তাওরাতের পরিবর্তে 'মিশনা'র ওপর আমল করা হবে এবং তাওরাতের ওপর আমলকারীরা আল্লাহর গজবের শিকার হবে। (পরবর্তীতে মিশনার ওপর সংযোজন করে একে 'তালমুদ' নাম দেওয়া হয়। ইহুদিদের কাছে আজও এর ওপরই আমল করা হয়।)

https://t.me/BoierSomahar

**প্রথম অধ্যায়**

নফসের খাহেশাতের খাতিরে শরিয়তে তাহরিফ ও তাবিলের এই ধারা ইহুদিদের আসমানি হেদায়েত থেকে এতটাই দূরে সরিয়ে দিয়েছিল যে, এখন তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তিই তাদের কাছ থেকে কোনো কল্যাণের আশা করতে পারত না। ইহুদি আলেমদের দ্বীন বিক্রি, সত্য বিস্মৃতি এবং স্বার্থপরতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাদের পুঁজিপতিদের লোভ-লালসা ও অর্থপূজার কোনো সীমা ছিল না। তাদের মধ্যে এমন লোকও পেশোয়া ও নেতা ছিল যারা শয়তানি শক্তির সাহায্য নিত, জাদু-টোনা করত, এই কালো বিদ্যা তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করত এবং জিকিরুল্লাহর পরিবর্তে জাদুকরী ও শয়তানি রিয়াজতকে নিজেদের মনের প্রশান্তির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছিল। ইহুদিদের বড় বড় আহবার ও নেতারা তাদের নির্দেশনাসমূহ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিত।

এই সবকিছুর চেয়েও বড় ইহুদিদের দুশ্চরিত্রতা ছিল এই যে, শতাব্দীকালের লাঞ্ছনা-অপমান ও বঞ্চনাবোধ তাদের মধ্যে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে ঘৃণা, হিংসা ও প্রতিশোধের আবেগ ভরে দিয়েছিল এবং এখন তারা সমস্ত মানবতাকে নিজেদের গোলাম বানাতে চাইত। অনেক এলাকায় তারা এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিল এবং এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকে তারা চরম ধূর্ত, মক্কার ও প্রতারক হয়ে উঠেছিল। ফলে তাদের মধ্যে গোপন সংগঠন তৈরি করা, গোয়েন্দাগিরি করা, ষড়যন্ত্র করে সরকারের তখত উল্টে দেওয়া, এক দেশকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া এবং এক জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার রীতি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই সংকীর্ণমনা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নির্মমতার উপস্থিতিতে তাদের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করা বৃথা ছিল যে, তারা পৃথিবীতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যম হতে পারবে। [১]

**আরববাসীদের ধর্মীয় অবস্থা:**

ঈসা (আ.)-এর ছয়শ বছর পূর্ব পর্যন্ত আরববাসী মূর্তিপূজার অভিশাপ থেকে মুক্ত এবং দ্বীনে ইব্রাহিমির অনুসারী ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে জাজিরাতুল আরবের সাথে সংযুক্ত মূর্তিপূজারি জাতিগুলোর প্রভাব তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। ওহির নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আমর বিন লুহাইয়ের মতো কুটিল চিন্তার লোকদের নেতৃত্ব শুধু কুরাইশ নয় বরং জাজিরাতুল আরবের সমস্ত গোত্রকে দ্বীনে ইব্রাহিমি থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে এবং দেখতে দেখতে মূর্তিপূজা পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়ে। পাথরের মূর্তিগুলোকে হাজত-রওয়া ও মুশকিল-কুশা মানা হতে থাকে। মানুষের এই আকিদা হয়ে যায় যে, এই মূর্তিগুলোর মধ্যে এমন সব রুহ রয়েছে যারা লাভ ও ক্ষতির মালিক এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ক্ষমতা রাখে। এটাও বলা হতো যে, এই মাবুদরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং তাঁর দরবারে সুপারিশকারী; আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়ার ইখতিয়ার দান করেছেন। মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মহাবিশ্বের স্রষ্টা তো আল্লাহ, কিন্তু এখন তিনি অবসর এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বে অন্য মাবুদরা সমস্ত বিষয় পরিচালনা করছে, যাদের মধ্যে কেউ জয়-পরাজয়ের মালিক, কেউ জীবন ও মৃত্যুর, কেউ রিজিক দেয় এবং কেউ সুস্থতা। কেউ রোগব্যাধি দূর করে এবং কেউ দুর্ভিক্ষ।

হারামের তাবাররুকাতের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিও ভ্রান্ত আকিদার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু আরব গোত্র মক্কা থেকে ফেরার সময়

---

[১] আল-ইয়াহুদ ফিল আলামিল কাদিমি, ডক্টর মুস্তফা কামাল আব্দুল আলিম, পৃষ্ঠা ১১ থেকে ২০; মা-যা খাসিরাল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা ৩৮ থেকে ৪০।

এখান থেকে পাথর তুলে নিয়ে যেত, কাবার মতো সেগুলোকে তাওয়াফ করত, পরবর্তীতে এই পাথরগুলোর নিয়মিত পূজা শুরু হয়ে যেত। [১] আরবে বিভিন্ন প্রকারের মূর্তি ছিল। কিছু ছিল অনেক বড় ও ভারী এবং নিজ স্থানে গেঁথে রাখা। মক্কার অধিকাংশ প্রসিদ্ধ মূর্তি এমনই ছিল, আবার কিছু এমন হালকা ও ছোট মূর্তিও ছিল যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যেত। আরবগণ এই মূর্তিগুলোকে 'আসনাম' বলত, যা 'সানাম'-এর বহুবচন। বলা হয় যে, এর মূল হলো 'সালম' (Solm), যা আরামাইক ভাষার শব্দ। আরবিতে এসে এই শব্দটি 'সানাম' হয়ে গেছে।

মূর্তিপূজারিদের 'কাহিন' বলা হতো এবং তাদের আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সাথে সম্পর্কের মাধ্যম মনে করা হতো। কুরাইশসহ সমস্ত আরব গোত্র কাহিনদের অনুসারী ছিল। তারা কাহিন, পূজারি এবং মূর্তিগৃহের বিশেষ খাদেমদের সাথে না নিয়ে কখনো যুদ্ধের জন্যও বের হতো না। এই কাহিনরাই লস্করের জন্য শুভ বা অশুভ লক্ষণের ইঙ্গিত গ্রহণ করত। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহে তাদের মতামত নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো। এই কাহিনদের মধ্যে কালব গোত্রের জুহাইর বিন জানাব এবং বনু আবস গোত্রের জুহাইর বিন জাযিমা প্রসিদ্ধ ছিলেন। [২]

'মানাত' ছিল প্রথম মূর্তি যার আরবে পূজা করা হতো, একে ভাগ্যের অধিপতি মনে করা হতো। একে বনু খুযাআ-র সর্দার আমর বিন লুহাই সিরিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল। কুরাইশ ছাড়াও বনু হুযাইল এবং ইয়াসরিবে বসবাসকারী আউস ও খাযরাজও এর বিশেষ পূজারি ছিল। [৩]

হুবাল ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে বড় মূর্তি যা আমর বিন লুহাই কাবায় স্থাপন করেছিল। এটি ছিল লাল আকিক পাথর দিয়ে খোদাই করা মানবাকৃতির একটি মূর্তি। এর সামনে শত শত উট উৎসর্গ করা হতো। কাবার তাওয়াফের পর মানুষ এর কাছে মাথা মুণ্ডন করত। এর নজরানা বা উপঢৌকনের জন্য একটি স্থায়ী ভাণ্ডার ছিল, যার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ছিল। [৪]

দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ মূর্তি ছিল 'লাত', যা তায়েফের মূর্তিগৃহে স্থাপিত ছিল। এটি ছিল একটি সাদা চতুষ্কোণ মূর্তি। আরবগণ এর নামে কসম খেত। [৫] একে বনু সাকিফ (যারা তায়েফ ও এর আশেপাশে বসবাস করত) এর একজন দানশীল ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছিল, যে হাজিদের ছাতু গুলিয়ে খাইয়ে দিত। তার মৃত্যুর পর আমর বিন লুহাইয়ের প্ররোচনায় পড়ে তায়েফবাসীরা তাকে তাদের মূর্তিতে পরিণত করল। [৬]

আরববাসীরা বৃক্ষের পূজা করত, যেমন 'উযযা' নামক প্রসিদ্ধ নারী মূর্তি যা বনু গাতাফানের একটি বাবলা গাছের নামে তৈরি করা হয়েছিল, যাকে দেবীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কুরাইশরা অত্যন্ত গর্বের সাথে 'আবদুল উযযা' নাম রাখত। উযযার একটি আলাদা কুরবানগাহ ছিল যেখানে পশু কুরবানি করা হতো। [৭]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৭৭

[২] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ: ২৮, ২৯

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ: ১৩৩

[৪] আখবারু মক্কা লি আবিল ওয়ালিদ আল-আযরাকি: ১/১১৭ থেকে ১১৯, দারুল আন্দালুস; আল-আসনাম, ইবনুল কালবি, পৃ: ৫, পাণ্ডুলিপি।

[৫] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, পৃ: ১৫৩, ১৫৫

[৬] আখবারু মক্কা, আল-আযরাকি: ১/১২১

‘ধাত আনওয়াত’ ও কুরাইশদের একটি বিখ্যাত পবিত্র গাছ ছিল, যার ইবাদতের জন্য একদিনের ইতিকাফ করা হতো। যুদ্ধের সময় হুবাল, লাত এবং উযযার স্লোগান দিয়ে জাতির মনোবল বৃদ্ধি করা হতো। মূর্তিপূজার আধিক্য এমন ছিল যে, কাবার প্রাঙ্গণে তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল, যার মধ্যে ইসাফ এবং নায়েলা নামক মূর্তি দুটি ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত। মানুষ ইসাফ থেকে তাওয়াফ শুরু করত এবং নায়েলায় শেষ করত। এদের মধ্যে প্রথমটি ছিল পুরুষ এবং দ্বিতীয়টি নারী। এগুলো ছাড়াও দুমাতুল জান্দালে ‘ওয়াদ্দ’-এর পূজা হতো, যার তত্ত্বাবধান কুরাইশদের হাতে ছিল। ‘সুওয়া’ ছিল বনু হুযাইল-এর মূর্তি। জুরশবাসীদের কাছে ‘ইয়াগুস’ নামক মূর্তির পূজা হতো যা ছিল সিংহের আকৃতির। খাইওয়ানবাসীরা ‘ইয়াউক’-এর ইবাদত গ্রহণ করেছিল যা ছিল ঘোড়ার আকৃতির। ইয়ামেনের হিময়ার গোত্র ‘নাসর’-এর পূজারি ছিল যা ছিল শকুনের মূর্তি। এই পাঁচটি নাম (ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর) মূলত হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির মূর্তিদের নাম ছিল, যারা হাজার বছর আগে বাবেলে (ইরাক) নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পর মূর্তিপূজারিরা এই নামগুলোকেই নতুন রূপে জীবিত করে তোলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরবরা কিছু পশুর পবিত্রতায় এতটাই বিশ্বাসী ছিল যে তারা সেগুলোর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। [১]

ঐতিহাসিক ইবনে কালবী বলেন: “মক্কার প্রতিটি ঘরে একটি করে মূর্তি ছিল যার মানুষ ইবাদত করত। যখন কেউ সফরে যেত তখন মূর্তিকে স্পর্শ করে বের হতো, আর ফিরে এসে সর্বপ্রথম মূর্তিকে স্পর্শ করত।” [২]

কিছু লোক মূর্তিপূজার পরিবর্তে নক্ষত্রপুঞ্জকে পবিত্র, জগতের নিয়ন্তা এবং দোয়ার জন্য কিবলা ও কাবা মনে করত। তারা ‘সাবেয়ী’ নামে পরিচিত ছিল। মক্কাবাসীদের ভাষায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেও ‘সাবী’ বলা হতো যে মূর্তিপূজা অস্বীকার করত। [৩]

আরবদের নৈতিক অবস্থা:

যেখানে আরবদের নৈতিক অবস্থার প্রশ্ন, কিছু সহজাত গুণাবলি বজায় থাকা সত্ত্বেও তা অত্যন্ত বিগড়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ করা এবং তলোয়ার উঁচিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সামান্য মতভেদে বড় বড় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত, যা বংশপরম্পরায় চলতে থাকত।

মদ্যপান এতটাই সাধারণ ছিল যে প্রতিটি ঘরকে মদের আড্ডাখানা মনে হতো। জুয়ার নেশা এমনভাবে চেপে বসেছিল যে মানুষ তাদের সবকিছু বাজি ধরত এবং একে গৌরবের বিষয় মনে করত। চুরি, ডাকাতি ছিল সাধারণ ব্যাপার। কিছু গোত্রের স্থায়ী পেশাই ছিল লুটতরাজ। লজ্জা ও হায়া এমনভাবে বিদায় নিয়েছিল যে মানুষ প্রকাশ্যে নারীদের সাথে চোখাচোখি করত, মজলিসগুলোতে নিজেদের প্রেমিকাদের কথা আলোচনা করত এবং তাদের স্মরণে কবিতা শুনিয়ে বেড়াত। তাদের কাছে নিকাহর গুরুত্ব অবশ্যই ছিল, কিন্তু যিনাও কোনো খারাপ কাজ ছিল না। পেশাদার পতিতারা জনপদে বসবাস করত এবং তাদের ঘরগুলো বিশেষ পতাকার কারণে দূর থেকে চেনা যেত। [৪]

---

[১] আখবারু মক্কা: আল-আযরাকী: ১/ ১২৯, ১৩০

[২] আত-তারীখুল ইসলামী আল-আম, পৃ. ১২৩, ১৩৪

[৩] আল-আসনাম, ইবনে কালবী, পৃ. ৩৩

[৪] তারীখুল ফিকর আদ-দ্বীনী আল-জাহেলী, ইবরাহীম আল-ফাইয়ূমী, পৃ. ২৭৯

এই সমাজে নারীর কোনো মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। একেকজন লোক ভেড়া-বকরির মতো যত খুশি নারী নিজের কাছে রাখত, নারীরা মিরাসে (উত্তরাধিকার সূত্রে) বণ্টিত হয়ে একজনের থেকে অন্যজনের মালিকানায় চলে যেত। লোকেরা নিজেদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলে গর্ব করত এবং কন্যা সন্তানের জন্মে মুখ লুকিয়ে বেড়াত। অনেক লোক কন্যা সন্তানদের জন্ম হওয়ার পরপরই জীবন্ত দাফন করে দিত যাতে গোত্রে তাদের অপমান না হয়।

আরবদের এই অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র হযরত জাফর বিন আবি তালিব (রা.) নাজ্জাশীর দরবারে এভাবে তুলে ধরেছিলেন: "আমরা এক জাহেলিয়াতপূর্ণ জাতি ছিলাম, মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম, সব ধরনের অশ্লীলতা ও পাপে লিপ্ত ছিলাম, আমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী ছিল সে দুর্বলকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে ফেলত।" [১]

**আবদুল মুত্তালিব**

কুরাইশদের সরদার হাশিম সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে 'ইয়াসরিব' (মদিনা) হয়ে যাতায়াত করতেন। একবার এখানে বনু নাজ্জারের এক প্রধান আমর বিন লুবাইদের কাছে অবস্থান করেন। উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, হাশিমের অনুরোধে আমর তাঁর কন্যা সালমাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। হাশিম ভরা যৌবনেই ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর স্ত্রী সালমা তাঁর পিত্রালয় 'ইয়াসরিব'-এ ছিলেন এবং তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কিছুকাল পর সেখানেই একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় যার নাম রাখা হয় 'শাইবা'। এই এতিম শিশুটি সাত বছর পর্যন্ত তাঁর নানার বাড়িতে লালিত-পালিত হতে থাকে। মক্কায় হাশিমের উত্তরাধিকারীদের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না যে তাদের বংশের এক অমূল্য রত্ন কোথায় অজানায় পড়ে আছে। সাত বছর পর হাশিমের ভাই মুত্তালিবকে ইয়াসরিব থেকে আসা এক ব্যক্তি বললেন: "আমি ইয়াসরিবে কিছু ছেলেকে দেখেছি যাদের মধ্যে আপনার ভাতিজাও ছিল। এমন মূল্যবান শিশু থেকে বঞ্চিত থাকা ভালো নয়।"

এ কথা শোনা মাত্রই মুত্তালিব ইয়াসরিবের দিকে রওনা হলেন, হাশিমের বিধবা স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে 'শাইবা'কে মক্কায় নিয়ে আসলেন। মক্কায় প্রবেশের সময় 'শাইবা' সওয়ারিতে তাঁর সামনে বসা ছিল, লোকেরা মনে করল যে মুত্তালিব একজন অল্পবয়সী গোলাম (দাস) কিনেছেন। সেদিন থেকে তারা শাইবাকে 'আবদুল মুত্তালিব' বলতে শুরু করল, অর্থাৎ মুত্তালিবের গোলাম। বড় হয়ে এই আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিমই কুরাইশদের সবচেয়ে খ্যাতিমান সরদার হন। [২] মুত্তালিব সারা জীবন তাঁর ভাই হাশিমের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার হক আদায় করে হাজীদের সেবা করেন। যখন মুত্তালিব এক সফরের সময় ইয়েমেনের এক দূরবর্তী অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর ভাতিজা আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম এই খিদমতগুলোর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। আবদুল মুত্তালিব হাজীদের পানি পান করানো এবং খাবার খাওয়ানোর এমন চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন যা তাঁর আগে কুরাইশদের মধ্যে কেউ করেনি। [৩]

আবদুল মুত্তালিব কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন যার ফলে তাঁর অনেক সন্তানাদি হয়। একটি বিবাহ তিনি তাঁর নানার বাড়ি অর্থাৎ বনু নাজ্জারের মেয়ে ফাতিমা বিনতে আমর বিন আইজ-এর সাথে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভেই তাঁর সবচেয়ে খ্যাতিমান পুত্র আবদুল্লাহ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা) জন্মগ্রহণ করেন। [৪]

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৩৬

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৬১৩, তারিখে ইবনে খালদুন: ২/৩০৩, মাতবুআ দারুল ফিকর

[৩] তারিখে ইবনে খালদুন: ২/৩০৩

[৪] লুবাবুল আনসাব লি ইবনে ফান্দামাহ আল-বাইহাকী: ১/৫

এই সময়ে আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখলেন যে, কোনো ব্যক্তি তাঁকে যমযম কূপ খনন করার নির্দেশ দিচ্ছে। যমযম কূপ দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ ছিল। বনু জুরহুম যখন মক্কা থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা যমযম কূপকে মাটি দিয়ে ভরাট করে যমীনের সমান করে দিয়েছিল। তখন থেকে এই কূপটি নাম-নিশানাহীন ছিল।

আব্দুল মুত্তালিব ঘুম থেকে জেগে খুব ভোরে তাঁর পুত্র হারিসকে সাথে নিয়ে যমযমের স্থানে পৌঁছে গেলেন। দুজনে মিলে খনন শুরু করলে পানির ধারা দৃশ্যমান হলো, যা দেখে আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এভাবে শত শত বছর পর যমযমের পানি পুনরায় জারি হলো। [১] যেহেতু যমযম নতুন করে খুঁজে পাওয়া আব্দুল মুত্তালিবের এক অনন্য কীর্তি ছিল, তাই তিনি এর খিদমতে অন্য কাউকে বা অন্য কোনো গোত্রকে শরিক করতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু কুরাইশ সরদাররা তাঁর সাথে ঝগড়া শুরু করল। তারা চেয়েছিল যমযমের কর্তৃত্বে বনু হাশিম যেন তাদেরও অংশ দেয়। এই পরিস্থিতিতে আব্দুল মুত্তালিব মানত করলেন যে, যদি তাঁর দশটি পুত্র সন্তান হয়, তবে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করবেন। আল্লাহর কুদরতে হারিসের পর আব্দুল মুত্তালিবের আরও পুত্র সন্তান জন্ম নিল, অর্থাৎ যুবাইর, হাজল, যিরার, মুকাউউইম, আবু লাহাব, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ, আব্বাস এবং হামযা। যখন দশম পুত্রের জন্ম হলো, তখন আব্দুল মুত্তালিবের জন্য তাঁর মানত পূরণ করা জরুরি হয়ে পড়ল। [২]

আব্দুল্লাহ

তিনি তাঁর পুত্রদের নামের লটারি করলেন যে কাকে যবেহ করা হবে। প্রতিবারই হযরত আব্দুল্লাহর নাম বের হলো। আব্দুল মুত্তালিব এই পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই তিনি খুব ব্যথিত হলেন। যাই হোক, পাথর হৃদয়ে আব্দুল্লাহকে শুইয়ে যবেহ করার জন্য ছুরি হাতে নিলেন। তখন তাঁর এক পুত্র এগিয়ে এসে আব্দুল্লাহর পা নিচ থেকে টেনে ধরল। এদিকে কুরাইশ সরদাররা দৌড়ে এলেন এবং তাঁরা আব্দুল মুত্তালিবকে জোরপূর্বক বাধা দিলেন এবং বললেন যে, আপনি যদি এমনটি করেন তবে মানুষের কুরবানির প্রথা চালু হয়ে যাবে। এরপর কুরাইশদের পরামর্শে আব্দুল মুত্তালিব দীর্ঘ সফর করে এক মহিলা গণকের কাছে গেলেন, যে খয়বারে থাকত। সে পরিস্থিতির কথা শুনে একটি সমাধান দিল এবং সেই অনুযায়ী আমল করা হলো। যার ফলে হযরত আব্দুল্লাহর পরিবর্তে একশটি উট কুরবানি করা হলো। [৩] কিছুদিন পর হযরত আব্দুল্লাহর বিবাহ বনু যুহরার এক মহীয়সী নারী আমিনা বিনতে ওয়াহবের সাথে সম্পন্ন হলো, যিনি কুরাইশ বংশের সকল নারীদের মধ্যে বংশমর্যাদা ও চরিত্রের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ এবং আমিনার ভাগ্যেই বিশ্বজাহানের রহমত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতামাতা হওয়ার মহান সৌভাগ্য নির্ধারিত ছিল। [৪]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/১৪২ থেকে ১৪৬।

[২] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/১৫১... হাকীম বিন হিযাম (যিনি আমুল ফীলের ১৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম আমুল ফীলের পাঁচ বছর পূর্বে হয়েছিল। (আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৬০৩৩)।

[৩] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/১৫৬। আমিনা বিনতে ওয়াহব: পিতার দিক থেকে তিনি কুরাইশ বংশের বনু যুহরা শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন বাররাহ বিনতে আব্দুল উযযা ইবনে আব্দুল দার ইবনে কুসাই। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নানী ছিলেন। (নাসাব কুরাইশ লিয-যুবাইরী, পৃষ্ঠা: ২১, ৩০)। তাই এই ধারণা ভুল যে ইয়াসরিব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নানার বাড়ি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নানার বাড়ি মক্কাতেই ছিল। বনু নাজ্জার ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতার নানার বাড়ির লোক।

[৪] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/১৫১ থেকে ১৫৩।

হযরত আবদুল্লাহ পঁচিশ বছর বয়সের ছিলেন যখন তিনি কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি তাঁর পিতার নির্দেশ অনুযায়ী "ইয়াসরিব" থেকে খেজুরের মজুদ নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানে তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে সফরের যোগ্য রইলেন না। আবদুল মুত্তালিব যখন খবর পেলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বড় ছেলে হারিসকে ইয়াসরিবে পাঠালেন যাতে তিনি আবদুল্লাহর খবর নিতে পারেন। কিন্তু হারিস যখন ইয়াসরিবে পৌঁছালেন, তার কিছুকাল আগেই হযরত আবদুল্লাহ এক মাস অসুস্থ থাকার পর ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁকে নাবিগা জাদীর আঙিনায় দাফন করা হয়েছিল। [১]

আবদুল মুত্তালিব তাঁর পঁচিশ বছর বয়সী ছেলের এই আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হলেন। তিনি জানতেন না যে এই ছেলের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন এক নাতি দান করবেন যাঁর নাম কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে।

জাযিরাতুল আরবের ওপর আসমানি অনুগ্রহ কেন?

সারা দুনিয়ায় যখন অন্ধকার ও গোমরাহির রাজত্ব ছিল, তখন যদি কোনো ভোরের আলো দেখা যেত, তবে তা ছিল সেই শেষ নবীর আবির্ভাব, যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ববর্তী রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীদের মুখে মুখে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে কারো এই ধারণা ছিল না যে মানবতার এই শেষ ত্রাণকর্তার আবির্ভাব আরবের এই পানিহীন মরুভূমি থেকে হবে। খোদ আরবরাও নিজেদের মধ্যে কোনো বিপ্লবের আশা করত না। কিন্তু তাদের সমস্ত ত্রুটি ও মন্দ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা শেষ নবীর নবুওয়াত ও তাঁর সাহায্যের জন্য এই জাতিকেই নির্বাচন করেছিলেন। এর পেছনে অসংখ্য হিকমত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা এই ছিল যে, গোমরাহি ও অন্ধকারের এই যুগেও আরবদের মধ্যে এমন কিছু উচ্চমানের গুণাবলী ও মহৎ বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্যদের মধ্যে ছিল না। হিন্দু ও ইহুদিদের বিপরীতে তারা ধোঁকা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত ছিল না। তাদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা ছিল সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী। এর পাশাপাশি তারা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সতর্ক; তারা ধোঁকা খেত না এবং ধোঁকা দেওয়া পছন্দ করত না। তারা বড় বড় শহর ও নরম সভ্যতার সেই কুপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিল যা মানুষকে ভীরু, আরামপ্রিয় ও অলস বানিয়ে দেয়। তাদের ধমনীতে গরম রক্ত প্রবাহিত হতো এবং তাদের স্বভাব যেকোনো বিপদের মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত।

ইহুদিরা শত শত বছরের দাসত্বের কারণে হীনমনা হয়ে পড়েছিল এবং চোরদের মতো গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। অন্যদিকে রোমান ও পারসিকরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করার কারণে অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে গিয়েছিল। আরবরা না কারো গোলাম ছিল আর না শাসক। তারা তাদের সংক্ষিপ্ত দুনিয়ায় স্বাধীন ছিল। না তারা কারো ওপর আক্রমণ করত, না কারো ফাঁদে পা দিত। দুনিয়ার সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার অধিবাসীরা তাদের গোমরাহিকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রলেপ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রেখেছিল যে তারা কোনো বিষয়েই তাদের অজ্ঞতা ও স্বল্পজ্ঞান স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। এর বিপরীতে আরবরা ছিল সরল স্বভাবের এবং সত্যকে চেনার ক্ষমতা রাখত। তাদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে কোনো বিভ্রান্তিকর দর্শনের জটিলতা ছিল না। তাদের শুধু এই অনুভূতি জাগিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/২৮২, মাতবা দার হিজর; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৬১২, ৯১৩... লেখক কোনো কোনো সূত্র থেকে শুনেছেন যে হযরত আবদুল্লাহর কবর কয়েক বছর আগে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণের সময় খনন করা হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে তাঁর দেহ অক্ষত ছিল কিন্তু সাধারণ মানুষের ফিতনার ভয়ে সেখান থেকে কবর সরিয়ে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। আল্লাহু আলাম।

যে তারা সঠিক পথে নেই, তবে তাদের দিক পরিবর্তন করতে খুব বেশি সময় লাগত না। ভৌগোলিক দিক থেকেও একটি বিশ্বজনীন দ্বীনের সূচনা এবং বিশ্বজনীন ইমামতের কেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরব ভূখণ্ড শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল, কারণ এটি জনবসতিপূর্ণ পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে বিষুবরেখার ওপর তিনটি বড় মহাদেশ: এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার সংযোগস্থলের কাছে অবস্থিত। অধিকাংশ পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলো এখান থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত। তাই এখান থেকে জারি হওয়া কোনো পয়গাম, কোনো দাওয়াত বা কোনো আন্দোলনের জন্য পুরো পৃথিবীর ওপর দ্রুত প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা বেশি ছিল। যদি আরবের পরিবর্তে হিন্দুস্তান বা গ্রিসের মতো প্রাচীন সভ্যতা কেন্দ্রগুলোকে একটি নতুন দ্বীনের কেন্দ্র বানানো হতো, তবে এই প্রভাব পৃথিবীর পূর্ব বা পশ্চিম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে যেত।

একটি নতুন দ্বীনের জন্য আরবকে নির্বাচন করা প্রতিরক্ষা দিক থেকেও বড় হিকমতের ওপর ভিত্তি করে ছিল, কারণ এই অঞ্চলটি তিন দিক থেকে সমুদ্রের ঢেউ এবং উত্তর দিকে মরুভূমির বিশালতা দ্বারা ঘেরা ছিল। এই কারণে এই এলাকায় সৈন্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন বলে গণ্য হতো এবং এই কারণেই হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আরবরা কখনো কারো গোলাম ছিল না। গ্রিসের আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, ব্যাবিলনের বখতে নসর এবং ইরানের সাইরাসের মতো বিজয়ীরা এর পাশ দিয়ে চলে গেছেন কিন্তু এর মরুভূমির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

শেষ রাসুলের জন্য সহজ-সরল, দরিদ্র এবং পরিশ্রমী আরবদের নির্বাচনের পেছনে এই হিকমতও কার্যকর ছিল যে, এভাবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে তাঁর কুদরত, শক্তি এবং বিজয়ের দৃশ্য দেখাতে চেয়েছিলেন। যদি শেষ নবী রোম বা পারস্যের মতো কোনো বড় সাম্রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হতেন, তবে এই দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার পর দুনিয়া এই কথা বলার সুযোগ পেত যে, এই বড় জাতিগুলোর ধন-সম্পদ ও শক্তির জোরে এই দ্বীন ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যথায় এই দ্বীনের মধ্যে নিজস্ব কোনো অনন্য বিষয় নেই।

দুই জাহানের স্রষ্টা শেষ পয়গম্বরকে একটি দুর্বল ও নিঃস্ব সমাজে জন্ম দিয়ে এই সন্দেহের অবকাশই শেষ করে দিয়েছেন এবং ব্যবহারিক উপায়ে এই হাকিকত হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ফয়সালা কার্যকর করতে, তাঁর দ্বীনকে ছড়িয়ে দিতে এবং তাঁর রাসুল আখিরুজ্জামান-এর নাম উভয় জাহানে বুলন্দ করার জন্য ধন-সম্পদ এবং বড় বড় সৈন্যবাহিনী ও হুকুমতের মুখাপেক্ষী নন। তিনি চাইলে দুর্বলদের দিয়েও কাজ নিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা তাদের জমিনের খিলাফত দান করতে পারেন।

একইভাবে শেষ নবী যদি গ্রিস, আলেকজান্দ্রিয়া বা কনস্টান্টিনোপলের মতো কোনো প্রাচীন জ্ঞানকেন্দ্রে আবির্ভূত হতেন, তবে মানুষের মনে এই সন্দেহ হতে পারত যে, এই নবী প্রাচীন জ্ঞান ও দর্শন থেকে উপকৃত হয়ে একটি দ্বীন উদ্ভাবন করেছেন এবং সেই দর্শনগুলোকেই নতুন রঙে পেশ করেছেন। আল্লাহ শেষ নবীর জন্য আরবদের জাহেল সমাজের নির্বাচন করে এই হাকিকত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই দ্বীন কোনো পূর্ববর্তী জ্ঞান-বিজ্ঞান বা দর্শনের অনুকরণ নয়, বরং এটি একজন সত্য নবীর ওপর নাজিল হওয়া খাঁটি আসমানি দ্বীন যা স্বয়ং আল্লাহ তাঁর মাখলুকের জন্য পছন্দ করেছেন।

## ইতিহাসের শিক্ষা

অতীত জাতিসমূহের অবস্থা আমাদের জন্য বড় শিক্ষা। আল্লাহর নাফরমানিতে অটল থাকা জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর আনুগত্যকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতেও সফল হয়।

অতীত জাতিসমূহের নির্ভরযোগ্য অবস্থা বেশিরভাগই কুরআন মাজীদ বা আহাদিসে নববী থেকে জানা যায়। এটি এই কথার প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ [সা.] আল্লাহর সত্য নবী, কারণ তিনি কোনো কিতাব না পড়ে এবং কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেই এই জাতিসমূহের ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

যখন কোনো জাতি অহংকার ও দম্ভে লিপ্ত হয়ে নবীদের শিক্ষার ওপর নিজের বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয়, তখন তারা নিকৃষ্টতম গোমরাহির শিকার হয়ে থাকে। বনী ইসরাঈলের উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং অতীত জাতিসমূহের অবস্থার মধ্যে সেই সমস্ত সমস্যা, পরীক্ষা এবং পরিস্থিতির জন্য দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, যার সম্মুখীন কোনো দাঈ বা সংস্কারককে হতে হতে পারে।

যদি কোনো দাঈ তার জাতির মধ্যে একা হন, পুরো জাতি মূর্খ, মূর্তিপূজারী এবং মুশরিক হয়, দীর্ঘ সময় চেষ্টা করার পরও কোনো ফল না আসে, তবে হযরত নূহ [আ.]-এর জীবনে দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

যদি কোনো জাতি শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির অহংকারের কারণে সত্যের বার্তার দিকে মনোনিবেশ না করে, তবে হযরত হূদ [আ.]-এর অবস্থা থেকে সাহস পাওয়া যাবে।

যদি মানুষ কৃষি, বাগান এবং ইমারত নির্মাণে অসাধারণ দক্ষতার ওপর গর্বিত হয়, তবে এমন সমাজের জন্য হযরত সালেহ [আ.]-এর অবস্থা দেখুন।

যদি মানুষ মুশরিক, মূর্তিপূজারী, নক্ষত্রপূজারী এবং ভ্রান্ত আকিদার অধিকারী হয়, আর তাদের বোঝানোর জন্য আপনি একা হন, সত্যের দাওয়াত দিতে গিয়ে জালেম ও স্বৈরাচারী শাসকদের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এমন অবস্থায় আবুল আম্বিয়া হযরত ইবরাহীম [আ.]-এর জীবনের দিকে দৃষ্টি দিন।

যদি আপনি সত্যপন্থীদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হন এবং আপনার বড়দের উত্তরাধিকারকে বুকে আগলে রাখতে হয় এবং আল্লাহর পথে কুরবানি দেওয়ার জন্য হযরত ইসমাঈল [আ.]-এর মতো জযবা বা আবেগের প্রমাণ দিতে হয়।

যদি সমাজ দুর্নীতি, প্রতারণা, অশান্তি, লুটতরাজ এবং অরাজকতার শিকার হয়, তবে এমন লোকদের মধ্যে কাজ করার সময় হযরত শুয়াইব [আ.]-এর অবস্থা নিয়ে চিন্তা করুন।

তারিখ মিল্লাত

যদি আপনজনদের প্রতারণা এবং আপনজনদের থেকে বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করতে হয়, তবে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর মতো ধৈর্য ও আশার প্রমাণ দিন। আত্মীয়-স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হতে হয়, বন্ধুবেশী শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কারণে জেলখানার কঠোরতা সহ্য করতে হয়, তবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর জীবনে নিজের জন্য আদর্শ তালাশ করুন। আল্লাহ তাআলা যদি নিচ থেকে উঠিয়ে উচ্চাসনে বসিয়ে দেন, আপনার হিংসুক ও অশুভাকাঙ্ক্ষীদের মাথা নত করে দেন, তবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর মতো উচ্চমানসিকতার প্রমাণ দেওয়া উচিত।

যদি আপনি এমন এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেন যা কালিমা পাঠকারী কিন্তু নিজেকে খোদা দাবিদার বাদশাহদের গোলামিতে আবদ্ধ, তবে হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম-এর মতো সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

যদি আল্লাহ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সুযোগ দেন, তবে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর মতো হিম্মত প্রদর্শন করুন এবং ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠা হুকুমতের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করুন।

যদি আল্লাহ উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা ও নেতৃত্ব দান করেন, তবে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদের মতো প্রতি মুহূর্তে তাঁর কৃতজ্ঞ থাকুন এবং হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর মতো রাষ্ট্রীয় শক্তিকে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার এবং বান্দাদের সেবায় ব্যয় করুন।

যদি কোনো সৌভাগ্যবান মানুষ জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সমাজ কালিমা পাঠকারী হওয়া সত্ত্বেও অপকর্ম ও বিশ্বাসগত ত্রুটির কারণে বিশ্ব জাতিগোষ্ঠীর গোলাম হয়ে থাকে, তবে জাতির সংশোধনের জন্য হযরত জাকারিয়া, হযরত মারিয়াম, হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জীবন এবং তাঁদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা অধ্যয়ন করুন।

আল্লাহর দ্বীন কোনো জাতির মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ যে কারো মাধ্যমেই তাঁর দ্বীনের হেফাজত, প্রচার এবং বিজয়ের কাজ করিয়ে নেন।

আল্লাহ অহংকার পছন্দ করেন না। বনী ইসরাঈল বংশীয় আভিজাত্যের দম্ভ প্রদর্শন করেছিল এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ধুলোয় মিশে গেল। আল্লাহ তাদের পরিবর্তে বনী ইসমাইলকে বিশ্বের নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করলেন।

জুলুম ও জাহেলিয়াতের রাত যতই দীর্ঘ হোক না কেন, একদিন সকাল হয় এবং হেদায়েতের নূর ছড়িয়ে পড়েই।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

উম্মতে মুসলিমার ইতিহাস (প্রথম অংশ)

আখিরুজ্জামান পয়গম্বরের সীরাত

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হস্তীবর্ষ ..... থেকে ..... রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী

(মার্চ ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ ..... থেকে ..... জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

https://t.me/BoierSomahar

জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি, মূর্ত করুণা, পূর্ণ রহমত

পৃথিবীতে এই গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ খাইরুল বাশার-এর আগে আসেনি।

https://t.me/BoierSomahar

## বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব

“সেই প্রাকৃতিক উপাদান যার মাথায় মানবতার অধিকাংশ বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক কীর্তির মুকুট রয়েছে, যাকে মানুষ ‘মহব্বত’ নামে স্মরণ করে, তা দীর্ঘকাল ধরে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল; শত শত বছর ধরে কেউ একে কাজে লাগানোর মতো ছিল না। কেবল তা বাহ্যিক চাকচিক্য এবং রূপ-সৌন্দর্যের নশ্বর নিদর্শনের কাছে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষের জন্ম হয়নি যিনি নিজের রূপ-গুণ ও উচ্চতর গুণাবলির কারণে সারা বিশ্বের ভালোবাসার যোগ্য হন এবং যিনি নিজের শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এই ভালোবাসাকে কাজে লাগান। রাসূল ﷺ-এর অবয়বে মানবতা সেই হারানো সম্পদ ফিরে পেল। আপনি ﷺ ছিলেন সেই মানুষ যাকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা সকল গুণের আধার বানিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে ﷺ হঠাৎ দেখত সে আপনার ﷺ প্রতি অনুরক্ত ও অভিভূত হয়ে পড়ত এবং বলত যে, আপনার ﷺ আগে আপনার মতো কাউকে দেখিনি আর আপনার পরেও না। আপনার ﷺ আগমনে সত্য ও পবিত্র ভালোবাসার ঝরনাধারা প্রবাহিত হলো এবং আপনার ﷺ উম্মতের সকল ব্যক্তি আপনার ﷺ সাথে এমন ভালোবাসা করতে শুরু করল যার উদাহরণ প্রেমিকদের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা আপনার ﷺ আনুগত্যে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছিল।”

(মানব বিশ্বের ওপর মুসলমানদের উত্থান-পতনের প্রভাব, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, পৃষ্ঠা ১১৮, ১১৯)

https://t.me/BoierSomahar

**দরুদ ও সালাম**

হে আল্লাহ! আপনার রহমত, বরকত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন রাসূলগণের সরদার, মুত্তাকীদের ইমাম এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ-এর ওপর, যিনি আপনার বান্দা ও রাসূল, কল্যাণের ইমাম, কল্যাণের পথপ্রদর্শক এবং রহমতের রাসূল। হে আল্লাহ! তাঁকে সেই 'মাকামে মাহমুদ'-এ অধিষ্ঠিত করুন, যা দেখে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ ঈর্ষা করবে।

হে আল্লাহ!

আপনার বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত ও বরকত নাযিল করুন সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি আপনার বিশেষ বান্দা ও রাসূল। তিনি নেকি ও কল্যাণের পথের ইমাম ও পথপ্রদর্শক, রহমতপ্রাপ্ত পয়গম্বর। হে আল্লাহ! তাঁকে সেই 'মাকামে মাহমুদ'-এ সিক্ত করুন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য ঈর্ষণীয় হয়।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর: ৯০৬)

বসন্ত আগমনের লক্ষণসমূহ

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দুনিয়াতে আসার পর মানবজাতি তাদের বয়সের কয়েক হাজার বছর পার করে দিয়েছিল। পৃথিবীতে তখন শত শত জাতি বসবাস করছিল। ভূখণ্ডের এমন কোনো কোণ ছিল না যেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ইতিহাস তৈরি হয়নি, কিন্তু সেই ইতিহাসে একটি বিশাল অভাব ছিল আর তা হলো এমন এক ব্যাপক নির্দেশনার যার পর আর কোনো পথভ্রষ্টতার আশঙ্কা থাকবে না, এমন এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার যার পর অজ্ঞতার গহ্বরে পথ হারানোর ভয় থাকবে না, এমন এক প্রশিক্ষণ ও শিষ্টাচারের যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে।

হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম)-এর আগমনের ধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু কোনো নবী বা রাসূলের শিক্ষার প্রভাব বিশ্বজনীন ছিল না। প্রত্যেক নবী ও রাসূলের দাওয়াত একটি নির্দিষ্ট জাতি, একটি বিশেষ বংশ এবং একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন বিশ্বজনীন নবীর যিনি একই সাথে পুরো বিশ্বের ইমামত করবেন এবং পথভ্রষ্ট মানবতাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম কুদরত ও সুনিপুণ হিকমতের অধীনে এই মহান পদের অধিকারীকে দুনিয়াতে আনার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি সাথে সাথে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন যা অচিরেই কোনো এক অসাধারণ বিপ্লবের সংবাদ দিচ্ছিল।

পরিস্থিতির এই উত্থান-পতনের ময়দান ছিল আরব ভূখণ্ড, যদিও এর প্রান্তগুলো একদিকে রোমান সাম্রাজ্য এবং অন্যদিকে কিসরার রাজত্বের সাথে গিয়ে মিশেছিল। কিসরা ছিল প্রাচ্যের মুকুটধারী এবং কায়সার এশিয়া ছাড়াও ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশকে পদানত করে রেখেছিল। এভাবে আরবে প্রকাশ পাওয়া পরিবর্তনগুলো বিশ্বের এই দুটি বড় দরবারের মাধ্যমে বিশ্বের তিনটি জনবহুল মহাদেশকে এক নতুন যুগের সূচনার সুসংবাদ শোনাচ্ছিল।

বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিতকারী প্রথম অসাধারণ দৃশ্যটি ছিল মক্কার ওপর আবরাহার আক্রমণ এবং তারপর তার শিক্ষণীয় পশ্চাদপসরণ। আবরাহা ছিল হাবশার (আবিসিনিয়া) সেই বাহিনীর একজন অফিসার যা রোমান সম্রাটের আদেশে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে হাবশার গভর্নর নাজাশী ইয়েমেনের খ্রিস্টানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা ইহুদি শাসক ইউসুফ যু-নুওয়াসকে দমন করতে পারে। সত্তর হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত এই হাবশী বাহিনীর সেনাপতি “আরয়াত” ইউসুফ যু-নুওয়াসকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দিয়ে ইয়েমেনের শাসনভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সময় ধরে আবরাহা আরয়াতের অধীনে ছিল কিন্তু পরে উভয়ের মধ্যে মতভেদ বাড়তে থাকে এমনকি একদিন উভয়ই একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরয়াতের আঘাতে আবরাহার নাক ও ঠোঁট কেটে যায়, এ কারণে সে “আশরাম” (নাক-কাটা) হিসেবে পরিচিতি পায়। আবরাহার গোলাম সুযোগ বুঝে পাল্টা আক্রমণে আরয়াতকে হত্যা করে। আবরাহা ছিল একজন ধূর্ত ও চরমপন্থী ব্যক্তি, সে তোষামোদপূর্ণ চিঠিপত্রের মাধ্যমে নাজাশীকে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট করে এবং ইয়েমেনে নাজাশীর প্রতিনিধিত্ব ও হাবশী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

কিছুকাল পরে সে তার গির্জা-পূজারী প্রভুদের খুশি করার জন্য ইয়েমেনের রাজধানী “সানা”-তে এমন একটি...

একটি চমৎকার গির্জা নির্মাণ করতে শুরু করল যার নজির দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না। এই বিস্ময়কর ইমারতটি তৈরি হতে বহু বছর সময় লেগেছিল। এই গির্জা নির্মাণের জন্য সে ইয়েমেনবাসীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়, হাজার হাজার মানুষকে ধরে এনে তাদের দিয়ে জোরপূর্বক শ্রম আদায় করা হয়। নির্দেশ ছিল যে সূর্য ওঠার আগেই শ্রমিকদের কাজে উপস্থিত হতে হবে। যার সামান্য দেরি হতো তার হাত কেটে ফেলা হতো। নির্মাণ সামগ্রীর জন্য ইয়েমেনের প্রাচীন প্রখ্যাত রানী বিলকিসের সুউচ্চ প্রাসাদের ইট পর্যন্ত খুলে ফেলা হয়েছিল; সোনা-রূপার আসবাবপত্র, মার্বেল পাথর এবং কাঠ—সবকিছু উপড়ে ফেলে গির্জা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অন্যায় আচরণের কারণে স্বয়ং ইয়েমেনের মানুষই তার ওপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ধারণা ছিল যে সে সমস্ত আরব গোত্রকে কাবা থেকে বিমুখ করে এই গির্জার অনুসারী বানানোর স্বপ্ন দেখছিল।

সে নাজ্জাশীকে তার পত্রে লিখেছিল:

“আমি ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তিতে বসব না যতক্ষণ না আরবরা হজের জন্য এই গির্জার দিকে মুখ না করে।” [১]

যখন আরবরা আবরাহার এই অপবিত্র সংকল্পের খবর পেল, তখন তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো; কারণ কাবার ভালোবাসা তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল এবং তারা এর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাসনালয়ের কথা কল্পনাও করতে পারত না। ফলে ‘নাসি’ প্রথা পালনকারী বনু ফুকাইম (বনু কিনানা) গোত্রের এক তেজোদীপ্ত যুবক সুযোগ বুঝে গির্জায় প্রবেশ করল এবং সেটিকে অপবিত্র করে পালিয়ে গেল।

আবরাহা যখন জানতে পারল যে এটি আরবদের কাজ, তখন সে কসম খেল যে সে কাবা ধ্বংস না করে দম নেবে না। ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো, যাতে তেরোটি যুদ্ধ-হাতিও ছিল। আরবদের মধ্যে আবরাহার মোকাবিলা করার সামর্থ্য ছিল না, তা সত্ত্বেও যু-নাফর এবং নুফাইল ইবনে হাবিব নামক দুই সর্দার নিজ নিজ এলাকায় তাকে থামানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু উভয়েই পরাজিত হয়ে বন্দি হন। এতে আবরাহার প্রভাব আরও বেড়ে গেল এবং সে বিনা বাধায় মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

বাহিনীর অগ্রবর্তী দল শহরের উপকণ্ঠে লুটতরাজ চালাল, যার কবলে আব্দুল মুত্তালিবের দুইশ উটও পড়ে গেল।

এই সময়ে আবরাহা দূত পাঠিয়ে কুরাইশ নেতাদের এই বার্তা দিল: “আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমার উদ্দেশ্য কেবল কাবা ধ্বংস করা। যদি তোমরা বাধা না দাও, তবে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।”

এ কথা শুনে আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন: “আমরাও তার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। এটি তো আল্লাহর ঘর, তাঁর খলিল ইব্রাহিমের নির্মাণ। যদি আল্লাহ তাঁর ঘরের হেফাজত করতে চান, তবে তিনি নিজেই তা করবেন।”

দূত এই অদ্ভুত উত্তর শুনে আব্দুল মুত্তালিবকে সাথে নিয়ে আবরাহার কাছে এল। দোভাষীর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো। আবরাহা জিজ্ঞেস করল: “আপনার প্রয়োজন কী?”

তিনি বললেন: “আমার দুইশ উট যা তোমার সৈন্যরা ধরেছে, তা ফেরত দাও।”

আবরাহা অবাক হয়ে বলল: “আপনি আপনার উটগুলোর চিন্তা করছেন, কাবার পরোয়া করছেন না যা আপনার দ্বীন এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন, যা আমি ধ্বংস করতে এসেছি।”

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৩৫ থেকে ১৪১

আবদুল মুত্তালিব আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিলেন:

“আমি তো উটগুলোর মালিক। এই ঘরের মালিক অন্য কেউ, তিনিই এর হেফাজত করবেন।”

আবরাহা অহংকারভরা সুরে বলল: “তিনিও একে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না।”

সে তাঁর উটগুলো ফেরত দিয়ে দিল এবং বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিল।

আবদুল মুত্তালিব মক্কায় পৌঁছামাত্রই লোকদের শহর খালি করার নির্দেশ দিলেন। লোকজন মক্কা থেকে বের হয়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করল এবং রুদ্ধশ্বাসে আবরাহার আক্রমণের দৃশ্য দেখতে লাগল। এদিকে আবদুল মুত্তালিব কাবার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিলেন যেন তিনি আবরাহার বাহিনীকে পরিণতির দিকে পৌঁছে দেন। আবরাহার বাহিনী তখনও মক্কায় প্রবেশ করেনি, এমন সময় হঠাৎ তাদের সবচেয়ে বড় বুনো হাতি ‘মাহমুদ’ পথেই বসে পড়ল এবং মারধর করা সত্ত্বেও উঠল না। যখন তার মুখ ইয়েমেনের দিকে ফেরানো হলো, তখন সে চলতে শুরু করল; এরপর সিরিয়া ও খোরাসানের দিকে ঘোরানো হলো তখনও সে চলতে থাকল। এখন যখন মক্কার দিকে আনা হলো, তখন সে আবার বসে পড়ল। মনে হচ্ছিল কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।

লোকেরা যখন বিস্ময়ের সাথে এই অনন্য দৃশ্য দেখছিল, তখন হঠাৎ সমুদ্র উপকূলের দিক থেকে পাখির ঝাঁক দেখা দিল যারা তাদের ঠোঁট ও নখরে ছোট ছোট কঙ্কর বহন করছিল। এই পাখিগুলো আসামাত্রই আবরাহার বাহিনীর ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করল। যার গায়েই এই কঙ্কর লাগত সে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয়ে যেত। বাহিনীতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল এবং সব সৈন্য পিছু হটে পালাল, আবরাহাও রক্তাক্ত হয়ে গেল; লোকজন তাকে তুলে ইয়েমেনে নিয়ে যেতে লাগল তখন তার শরীরের এক একটি অঙ্গ খসে পড়তে লাগল এমনকি নিজের রাজধানী ‘সানা’ পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার মৃত্যু হলো। সেই সময় পর্যন্ত তার শরীর এতটাই পচে গিয়েছিল যে পাঁজরের নিচে হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছিল। [১]

**হস্তী বাহিনীর ঘটনা, একটি গায়েবি ইশারা:**

পাখির মতো সাধারণ সৃষ্টির মাধ্যমে হাবশীদের ভয়াবহ বাহিনীর ধ্বংস এটি স্পষ্ট করে দিল যে মহাবিশ্বের মালিক নিজের ঘরের হেফাজত করছেন। হাবশার খ্রিস্টান বাহিনীর এই পরিণতি প্রকৃতপক্ষে কায়সারের মুখে চপেটাঘাত ছিল, যে ছিল পূর্ব ও পশ্চিমে ক্রুশের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। এটি ছিল গির্জার পরাজয় এবং আরবদের বিজয়। এটি অনুভূত হতে শুরু করেছিল যে অচিরেই পৃথিবীতে কোনো বড় পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে, যার কেন্দ্র হবে আরব। আরবিতে হাতিকে ‘ফীল’ বলা হয়। তাই এই ঘটনা ‘কিসসা আসহাবুল ফীল’ নামে প্রসিদ্ধ হলো। [২] আরবদের কাছে এই ঘটনার গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে তারা এই বছরকে ‘আমুল ফীল’ নাম দিল এবং ভবিষ্যতে নিজেদের তারিখের হিসাব এই বছর থেকেই করতে শুরু করল।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ২/৩২৩ থেকে ৩২৮।

[২] হস্তী বাহিনীর ঘটনা এবং নবী আকরাম-এর জন্মের মধ্যবর্তী সময়ে কতটুকু ব্যবধান ছিল? এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বেশ কিছু অভিমত রয়েছে: যেমন: ৪০ দিন, ৫০ দিন, ৫৫ দিন। হাফিজ ইবনে কাসীর ৫০ দিনের অভিমতটিকে প্রসিদ্ধ বলেছেন। কিছু অভিমত এমনও রয়েছে যে, এই ঘটনা নবীজির জন্মের ১০ বছর বা ২৩ বছর আগের; কিন্তু হাফিজ ইবনে কাসীর সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত কিছু বর্ণনার আলোকে এই বর্ণনাগুলোর সপ্রমাণ খণ্ডন করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ২/৩৯৮)। ইবনে হাবিব (২৪৫ হি.) হস্তী বাহিনীর ঘটনার সময়কাল রবিবার, ১৭ই মহররম নির্ধারণ করেছেন। (আল-মুহাব্বার: পৃ. ১০) তবে এটি মেনে নিলে এর ঠিক ৫৫ দিন পর ১২ই রবিউল আউয়াল হবে।

আবরাহার ধ্বংসের পর হাবশীদের শোষণমূলক শাসন বেশিদিন টিকতে পারেনি। আবরাহার ছেলে ইয়াকসুম কিছুদিন শাসন করার পর মারা যায়। দ্বিতীয় ছেলে মাসরুক শাসনভার গ্রহণ করে, কিন্তু সেও সেই প্রতিশোধের আগুন নেভাতে পারেনি যা হাবশীদের বিরুদ্ধে আরবদের হৃদয়ে জ্বলছিল।

হিময়ার গোত্রের এক উচ্চবংশীয় ব্যক্তি সাইফ বিন যি-ইয়াযান এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি হাবশীদের অত্যাচারের ফরিয়াদ নিয়ে ইরানি বাদশাহ নওশেরওয়ানের দরবারে পৌঁছান এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। নওশেরওয়ান একে হাবশীদের বিতাড়িত করার সর্বোত্তম সুযোগ হিসেবে গণ্য করেন এবং তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হন। অবশেষে সাইফ বিন যি-ইয়াযান ইরানিদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে জাজিরাতুল আরবে ফিরে আসেন এবং মাসরুক বিন আবরাহাকে শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানান।

এর ফলে ইয়ামেনে এক চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে হাবশীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং মাসরুক নিহত হয়। এভাবে জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান হাবশীদের বাহাত্তর (৭২) বছরের শাসন একটি বিস্মৃত কাহিনীতে পরিণত হয়। সাইফ বিন যি-ইয়াযান আরবদের জনপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন, কারণ তিনি আরবকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। [১]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৫৮-১৬০; তারিখ ইবনে খালদুন: ২/১৭৪।

নোট (১): হাবশীদের সাথে সাইফের সংঘাত মুহাম্মাদ-এর জন্মের আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু এর সমাপ্তি ঘটে মুহাম্মাদী জন্মের দুই বছর পর যখন পুরো ইয়ামেনের ওপর সাইফ বিন যি-ইয়াযানের দখল পূর্ণ হয়। (দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৯১)

নোট (২): আবরাহা যে মহররম মাসে মক্কায় আক্রমণ করেছিল, প্রবল ধারণা এই যে সেটি ছিল বিশেষ চান্দ্র পঞ্জিকার মহররম, যখন সৌর পঞ্জিকা অনুযায়ী সেটি ছিল রজব মাস। (গাণিতিক তারিখ অনুযায়ী এটি ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস হয়)। আবরাহার ক্ষোভ ছিল এই কারণে যে, তার ঘোষণা সত্ত্বেও আরবরা কেন তার গির্জায় হজ করেনি এবং কেন তারা বাইতুল্লাহর মর্যাদা ও হজের নিয়ম ত্যাগ করেনি। জাহেলিয়াত যুগে হজ বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা অনুযায়ী ছিল না বরং তা ছিল কাবি পঞ্জিকা অনুযায়ী। যে বছর আবরাহা আক্রমণ করেছিল, তার আগের হজও কাবি পঞ্জিকা অনুযায়ী করা হয়েছিল। আমাদের কাছে এটি যুক্তিযুক্ত মনে হয় না যে আবরাহা হজের পরপরই আক্রমণ করেছিল; কারণ হজের পর আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল যা তার চরম উত্তেজনার কারণ হয়েছিল, আর তা হলো বনু কিনানার এক ব্যক্তি صنعاء (সানা) গিয়ে আবরাহার গির্জাকে অপবিত্র করে দিয়েছিল। সেই আরব ব্যক্তির কাবার প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা ছিল, তাই এটি ধারণা করা যায় না যে সে কাবার হজ ছেড়ে ইয়ামেনে চলে গিয়েছিল। যদি হজের পর তার যাত্রা মেনে নেওয়া হয় যেমনটি যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তবে ইয়ামেনে পৌঁছাতে তার অবশ্যই এক মাস লেগে থাকবে। অর্থাৎ মহররমের মাঝামাঝি সময়ে গিয়ে সে গির্জাকে অপবিত্র করেছিল। তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে সেই মহররমেই আবরাহা মক্কায় পৌঁছে যাবে? সুতরাং হজের এক মাসের মধ্যে আক্রমণ হয়েছে এমন ধারণা অমূলক। যুক্তিযুক্ত ধারণা হলো আবরাহা এই ঘটনার পর একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে কিছু সময় লাগিয়েছিল। বাহিনীর পৌঁছাতেও দেড়-দুই মাস ব্যয় হয়ে থাকবে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনার শব্দগুলো থেকে বোঝা যায় যে অসাধারণ প্রস্তুতির পর অগ্রসর হওয়া হয়েছিল:

(فغضب عند ذلك ابرهة وحلف ليسيرن الى البيت حتى يهدمه ثم امر الحبشة فتهيأت وتجهزت ثم سار. (سيرة ابن هشام: ١/٤٥
“তখন আবরাহা রাগান্বিত হলো এবং শপথ করল যে সে বাইতুল্লাহর দিকে যাত্রা করবে যতক্ষণ না তা ধ্বংস করে। অতঃপর সে হাবশীদের নির্দেশ দিল, তারা প্রস্তুত হলো ও সরঞ্জাম সজ্জিত করল, তারপর সে যাত্রা করল।” (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৫)

এই হিসাব অনুযায়ী আবরাহার আক্রমণ ছয় মাস পর আসা প্রথম মহররমেই হওয়া যুক্তিযুক্ত, যা মাদানি মহররম (রজব মাসের সমতুল্য)।

## মহাবিশ্বের সুবহে সাদিক

অবশেষে সেই প্রাণবন্ত মুহূর্তটি একেবারে কাছে চলে এল যার জন্য মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু অপেক্ষায় ছিল। হস্তীবাহিনীর ঘটনার চল্লিশ দিন পর সোমবার ভোরে কুরাইশদের সরদার আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিমকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, আল্লাহ তাকে একটি নাতি দান করেছেন। [১] এটি ছিল রবিউল আউয়াল মাস, যদিও বিশুদ্ধ চান্দ্র পঞ্জিকা অনুযায়ী এটি ছিল রমজান মাস। তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; ৮, ৯, ১০ এবং ১২ তারিখের বর্ণনাগুলো প্রসিদ্ধ। [২]

**(১) নববী জন্মের তারিখ নিয়ে আলোচনা:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের দিনটি সর্বসম্মতিক্রমে সোমবার ছিল, যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে: তিনি ﷺ নিজেই বলেছেন: "এটি সেই দিন যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি।" (সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২৮০৪, কিতাবুস সিয়াম, অধ্যায়: প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার মুস্তাহাব হওয়া)। এ বিষয়েও ঐক্যমত রয়েছে যে, সেটি ছিল হস্তীবর্ষ (আমুল ফীল), যেমনটি কায়েস বিন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। (সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৬১৯; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৭৮৯১)। যদিও এর সনদ দুর্বল, তবে কুবাস বিন আশয়াম (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে এর সমর্থিত বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। (আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, হা: ৯০২, ইবনে আব্বাস থেকে; মুসনাদে বাজ্জার, হা: ৪৩৭৬) যার ভিত্তিতে একে হাসান গণ্য করা হয়। এছাড়া মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে: নবী ﷺ সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবার নবুওয়াত লাভ করেছেন, সোমবার মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন, সোমবার মদিনায় পৌঁছেছেন, সোমবার ইন্তেকাল করেছেন এবং সোমবার হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৫০৬)। এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল; কারণ মুসনাদে ইবনে লাহিয়াহ রয়েছে। তবে হাদীস ভাণ্ডারের উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, জন্ম হস্তীবর্ষের সোমবার হয়েছিল। ইবনে লাহিয়াহর বর্ণনাটি গ্রহণ করা হলে হিজরত, নবুওয়াত এবং ইন্তেকালের তারিখও নির্ধারিত হয়ে যায়। এছাড়া ইমাম যুহরী হাদীসে আগমনের তারিখও সোমবার ১২ই রবিউল আউয়াল বর্ণনা করেছেন। (তারিখে তাবারী: ২/৩৯৩)। ইমাম তাবারীর মতে আলেমদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। (তারিখে তাবারী: ২/২৯৩)।

(২) এই বিষয়ে যে, জন্ম কোন মাসে এবং কোন তারিখে হয়েছিল? হাদীসের কিতাবসমূহে কোনো দুর্বল বর্ণনাও বর্ণিত হয়নি। তবে ইতিহাস ও সীরাতের কিতাবসমূহে কিছু দুর্বল বর্ণনা রয়েছে, যার কিছু বিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত (মুনকাতে) এবং কিছু সনদবিহীন। কোনো একটি বর্ণনাও সহীহ বা হাসান পর্যায়ে পৌঁছে না, যেমনটি সামনে আমরা এই বর্ণনাগুলোকে দালিলিক অবস্থানসহ উল্লেখ করছি। তবে সনদের অবস্থা প্রকাশ করার অর্থ এই নয় যে, ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই বর্ণনাগুলো গুরুত্বহীন। উদ্দেশ্য কেবল এটি জানানো যে, এই বর্ণনাগুলো দ্বারা কোনো শরয়ী মাসআলা সাব্যস্ত করা যাবে না, আর না এটি বলা যাবে যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি তারিখ নির্ধারণ করে তাকে একটি 'শরয়ী উৎসবের' মর্যাদা দেওয়া হবে এবং ওই দিন উদযাপন না করা ব্যক্তিদের নবীপ্রেম থেকে শূন্য মনে করা হবে। যখন এই তারিখগুলো নিছক ধারণা প্রসূত, তখন কেউ যদি এই তারিখগুলো অস্বীকার করে তবে তার দ্বীন ও ঈমানের ওপর কেন আঘাত আসবে? এখন আমরা প্রাচীন উৎসসমূহে বর্ণিত নববী জন্মের তারিখ সংক্রান্ত উক্তিগুলো উদ্ধৃত করছি:

---

**প্রথম উক্তি: বারো রবিউল আউয়াল:**

- (১) ইবনে হিশাম (মৃ. ২১৩ হি.) মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন: ইবনে ইসহাক বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ হস্তীবর্ষের রবিউল আউয়াল মাসের বারো রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৫৮)। কিন্তু ইবনে ইসহাকের নিজস্ব সীরাতে নববীয়ায় অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও আমি এই বর্ণনাটি পাইনি। হতে পারে ইবনে হিশাম এই বর্ণনাটি ইবনে ইসহাকের অন্য কোনো কিতাবে দেখেছেন যা আমাদের সামনে নেই অথবা এই বর্ণনাটি তার থেকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, ইবনে হিশাম সনদ উল্লেখ করেননি বরং 'ইবনে ইসহাক বলেছেন' এর ওপরই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। এই বর্ণনাটিই বায়হাকী, হাকেম এবং তাবারীও বর্ণনা করেছেন কিন্তু সনদ ইবনে ইসহাকের ওপর গিয়ে শেষ হয়ে যায়। (দালাইলুন নুবুওয়াহ: ১/৭৩; আল-মুস্তাদরাক, হা: ৪১৮২; তারিখে তাবারী: ২/১৫৬)। যা-ই হোক, এই বর্ণনাটি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন (মুনকাতে) সাব্যস্ত হয় এবং তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে বর্ণনার আধিক্যের কারণে এতে কোনো শক্তি সৃষ্টি হয় না; কারণ প্রথম যুগের বর্ণনাকারীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত (মাজহুল)।
- (২) হাফেজ ইবনে কাসীর 'মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ'-এর বরাত দিয়ে হযরত জাবের (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন: 'ولد رسول الله ﷺ عام الفيل يوم الاثنين، الثانى عشر من ربيع الاول، وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء، وفيه هاجر و مات' (রাসূলুল্লাহ ﷺ হস্তীবর্ষের রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন, ওই দিনই তিনি নবুওয়াত লাভ করেছেন, ওই দিনই তাকে আকাশে আরোহণ করানো হয়েছে, ওই দিনই তিনি হিজরত করেছেন এবং ওই দিনই ইন্তেকাল করেছেন)। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/৫১৩)। কিন্তু ইবনে কাসীর এর সনদকে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতে) বলেছেন। (খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও আমি 'মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ'-তে এই বর্ণনাটি পাইনি এবং প্রাচীন উৎসসমূহেও এর নাগাল পাইনি।)
- (৩) একটি বিচ্ছিন্ন (মুনকাতে) বর্ণনা মারুফ বিন খারবুজ মক্কী (মৃ. ১৫০ হি.)-এর রয়েছে যাতে পুনরায় রবিউল আউয়ালকে জন্মের তারিখ হিসেবে বলা হয়েছে। (তারিখে দামেশক: ৩/২০, ২৯)।

তারা দৌড়ে এলেন। নিজের পুত্রবধূ আমিনা বিনতে ওয়াহাবের পাশে চাঁদের মতো এক সুন্দর শিশুকে দেখে তাদের অন্তর মমতা ও ভালোবাসায় ভরে গেল। ছয় মাস আগে তাদের সবচেয়ে প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেছিলেন, এই শিশুটি ছিল সেই আবদুল্লাহরই স্মৃতিচিহ্ন। আবদুল মুত্তালিব শিশুকে কোলে নিয়ে কাবায় প্রবেশ করলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন, এই শিশুর নাম নিয়ে ভাবতে লাগলেন তখন তার মনে একদম নতুন একটি নাম 'মুহাম্মদ' এল যা এর আগে আরবদের মধ্যে কেউ রাখেনি। আল্লাহ তাআলা এই অনন্য নামটি তাঁর শেষ রাসূলের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন যা সঠিক সময়ে আবদুল মুত্তালিবের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল।

এই শেষ নবীর বংশপরম্পরা নিম্নরূপ: 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কাব বিন লুয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নাদর বিন কিনানাহ বিন খুজাইমাহ বিন মুদরিকাহ বিন ইলিয়াস বিন মুদার বিন নিযার বিন মাআদ বিন আদনান'।

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ)

দ্বিতীয় মত: ১২ই রমজানুল মুবারক:

[১] হাফেজ ইবনে কাসীর জুবায়ের বিন বাক্কার (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি)-এর বরাতে একটি মত বর্ণনা করেছেন যার অনুযায়ী হযরত আমিনার গর্ভধারণের দিনগুলো আইয়ামে তাশরীকে শুরু হয়েছিল এবং নয় মাসের গর্ভকালীন সময় রমজানে পূর্ণ হয়েছিল এবং ১২ই রমজানে জন্ম হয়েছিল।

حملت به امه فی ایام التشریق... وولد بمکۃ فی ثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر رمضان। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/ ৩০৭)

এই মতটি আল্লামা আবদুল আজিজ আবহারী এবং আল্লামা মাকরিজিও বর্ণনা করেছেন। (আল-মুখতাসার আল-কাবীর ফি সিরাতুর রাসূল, পৃষ্ঠা ২২; ইমতাউল আসমা লিল মাকরিজি: ১/ ৬)

স্মরণীয় যে, জুবায়ের বিন বাক্কার একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর বংশধর। হিশাম ইসহাকের ওপর কঠোর সমালোচনা (জারাহ) থাকলেও জুবায়ের বিন বাক্কারের ওপর এমন কোনো সমালোচনা নেই বরং আল্লামা সুলাইমানি সমালোচনা করেছিলেন যা সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বাকি সবাই তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাফেজ জাহাবি তার পরিচয় দিতে গিয়ে 'আল-হাফেজ, আল-আল্লামা, আল-হাফেজ, মক্কার কাজী ও আলেম' বলে উল্লেখ করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১২/ ৩১১ থেকে ৩১৫) জুবায়ের বিন বাক্কারের নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই নয় যে উক্ত বর্ণনাটিকে সহীহ বা হাসান বলা হচ্ছে, বরং এটি ইনকিতা (সূত্রবিচ্ছিন্নতা)-এর কারণে তেমনি দুর্বল যেমনটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা। বিভিন্ন আলামত নির্দেশ করে যে এই বর্ণনার মর্যাদা ইবনে ইসহাকের চেয়ে কম নয়।

[২] জুবায়ের বিন বাক্কারের মতের সমর্থনে হাফেজ ইবনে আসাকির অন্য একটি সনদে শুয়াইব বিন শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন:

حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عاشوراء المحرم وولد یوم الاثنین لثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من رمضان।

কিন্তু এই সনদে দুইজন ব্যক্তি দুর্বল: একজন মুহাম্মদ বিন উসমান (বিন আবি শাইবাহ) মৃত্যু ২৯৭ হিজরি। কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তবে অধিকাংশ আলেম তার সংকলন এবং মুনকার বর্ণনা করার কারণে তার ওপর কঠোর সমালোচনা করেছেন। (মিজানুল ইতিদাল: ৩/ ৬৪২) দ্বিতীয়জন মুসাইয়িব বিন শারীক (মৃত্যু ১৮১ হিজরি) তিনিও দুর্বল। (মিজানুল ইতিদাল: ৪/ ১১৩)

তৃতীয় মত: ১লা রবিউল আউয়াল:

ইমাম হাকেম তাঁর নিজস্ব সনদে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ই 'রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে' হয়েছিল। (আখবারু মাক্কাহ লিল ফাকিহি: ৩/ ৩৮২) এই বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল কারণ সনদে মুয়াল্লা বিন আবদুর রহমানকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। (আদ-দুয়াফাউল কাবীর লিল উকাইলি: ৪/ ২০৫)

চতুর্থ মত: ২রা রবিউল আউয়াল:

ওয়াকিদি আবু মাশার মাদানি (মৃত্যু ১৭০ হিজরি) থেকে ২রা রবিউল আউয়ালের মতটি বর্ণনা করেছেন: 'یوم الاثنین لليلتين خلتا من شہر ربیع الاول' (রবিউল আউয়াল মাসের দুই রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সোমবার)। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/ ১০১) এটিও সূত্রবিচ্ছিন্ন (মুনকাতি)। তাছাড়া আবু মাশার মাদানি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। (তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৭১০০)

পঞ্চম মত: ৮ই রবিউল আউয়াল:

ইবনে জাওজি তাঁর নিজস্ব সনদে মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন বারা (মৃত্যু ২৯১ হিজরি)-এর মত বর্ণনা করেছেন যে, বরকতময় জন্ম ৮ই রবিউল আউয়াল হয়েছিল। (আল-মুনতাজাম: ২/ ২৩৬) এতেও সনদের বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট। ইবনে হাবিব (মৃত্যু ২৪৫ হিজরি) এই শেষ দুটি মত অর্থাৎ ২রা রবিউল আউয়াল এবং ৮ই রবিউল আউয়াল কোনো সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। (আল-মুহাব্বার, পৃষ্ঠা ৯০)

বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে কুনফুজ (মৃত্যু ৮১০ হিজরি) ৮ই রবিউল আউয়ালের মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন: 'والذی صححہ کثیر من الناس انہ الثامن منہ' (অনেক মানুষ যেটিকে সহীহ বলেছেন তা হলো মাসের অষ্টম দিন)। (ওয়াসিলাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৪) আরও অনেক মত রয়েছে যেমন ১০ই রবিউল আউয়াল ইত্যাদি কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। প্রসিদ্ধ মতগুলো আমরা উল্লেখ করেছি। ১২ই রবিউল আউয়ালের মতটি অধিকাংশ সীরাত লেখক ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশামের অনুসরণে গ্রহণ করেছেন এবং হাফেজ ইবনে কাসীর একে জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ)-এর মত বলে অভিহিত করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/ ৩০৭)

অবশ্য বর্ণনার চেয়ে যুক্তিনির্ভর প্রমাণের ওপর যারা নির্ভর করেন সেই পঞ্জিকা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মতে ১২ই রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে ৮ বা ৯ই রবিউল আউয়ালের মতগুলোই অগ্রগণ্য। তাদের অবস্থান হলো এই যে, হিজরত সর্বসম্মতিক্রমে ২রা রবিউল আউয়ালে হয়েছিল, সেই হিসেবে হিজরতের ৫৩ বছর আগে ১২ই রবিউল আউয়ালকে... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকায়)

আদনানের পর বেশ কিছু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধারা হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়, যিনি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর বড় সাহেবজাদা এবং মনোনীত নবী ছিলেন। [১]

**পবিত্র শৈশব:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুরুর দিকে কয়েক দিন তাঁর চাচা আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা দুধ পান করান। [২] এই সময়ে আবদুল মুত্তালিব তাঁর এতিম নাতির জন্য কোনো ধাত্রী খুঁজছিলেন। আরবদের মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, তারা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন-পালনের জন্য গ্রামের ধাত্রীদের হাতে তুলে দিত, যাতে তারা উন্মুক্ত ও পরিষ্কার আবহাওয়া পায় এবং তাদের দেহ ও প্রাণের সুষম বিকাশ ঘটে। এছাড়া গ্রামবাসীদের ভাষাও ছিল প্রাঞ্জল ও বিশেষ ধরনের, যা শিখে শিশুরাও...

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকাংশ)... কোনোভাবেই সোমবার হয় না। অথচ ৮, ৯, ১০, ১২ মে কোনো না কোনোভাবে এর সাথে মিলে যায়।

রমজানে জন্মের মতবাদটিও উপেক্ষা করার মতো নয়: কারণ এর প্রামাণিক মর্যাদা ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সমান। হাফেজ ইবনে কাসির এর সমর্থনে এই সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়া রমজানে শুরু হয়েছিল এবং সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬/১৩, ৪৭) সুতরাং জন্মের ঠিক চল্লিশ বছর আগে রমজানে এটি নির্ধারিত হয়।

**রবিউল আউয়াল ও রমজানের মতবাদগুলোর মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য?**

এখন প্রশ্ন হলো, রমজান নাকি রবিউল আউয়াল—এর মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য? প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যখন আমরা মক্কি ও মাদানি ক্যালেন্ডারের পার্থক্য সামনে রেখে হিজরতের ৫৩ বছর আগের হিসাব করি, তখন এটি প্রমাণিত হয় যে, বরকতময় জন্মের বছরে দুটি ভিন্ন ক্যালেন্ডারের রবিউল আউয়াল ও রমজান দুটি সময়ে একত্রিত হয়। আলী মুহাম্মদ খানের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রথম সুযোগটি হলো ১৩ রমজান মাদানি = ১৩ রবিউল আউয়াল মক্কি = ১৯ নভেম্বর ৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ। আর দ্বিতীয় সুযোগটি হলো ১০ রমজান মাদানি = ১০ রবিউল আউয়াল মক্কি = ১৩ মে ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ। (তাকউইমে আহদে নববী, পৃষ্ঠা ১১৫) কিছু ব্যক্তি এর মধ্যে প্রথমটিকে মিলাদুন্নবী হিসেবে গণ্য করেছেন, আবার কেউ দ্বিতীয়টিকে। মতভেদের কারণ হলো এই অস্পষ্টতা যে, রবিউল আউয়াল ও রমজানের প্রবক্তাদের মধ্যে কে মক্কি এবং কে মাদানি ক্যালেন্ডার উপস্থাপন করেছেন?

জন্মের তারিখ পর্যন্ত পৌঁছাতে ইবনে হাবিবের একটি বক্তব্য সাহায্য করে, যার অনুযায়ী জন্মের বছরের মহররম শুক্রবার শুরু হয়েছিল। (আল-محبر, পৃষ্ঠা ১০) এটি মেনে নিলে ৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের মাদানি রমজান (মক্কি রবিউল আউয়াল)-এর ১৮ তারিখ এবং ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের মক্কি রমজান (মাদানি রবিউল আউয়াল)-এর ১২ তারিখে সোমবার পড়ে।

লেখকের মতে এ বিষয়ে আরও গবেষণা হওয়া উচিত। সম্ভাবনা রয়েছে যে উদ্ধৃত তারিখগুলো সঠিক প্রমাণিত হবে। হিসাব-নিকাশে কিছু বিষয় ঠিকঠাক আসে না, তবে সেগুলোতে মানবিক ভুলের সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে এটিও সম্ভব যে চাঁদ দেখার ভুলের কারণে তারিখটি কেবল নকল করা হয়েছে। হিসাব কষে আমরা এটি তো বলতে পারি যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ওই দিন চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা, কিন্তু এটি বলতে পারি না যে কোনো স্থানে কি সত্যিই চাঁদ দেখা গিয়েছিল কি না? কারণ দিগন্ত ও আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা চাঁদ দেখার ওপর প্রভাব ফেলে থাকে।

যাই হোক, এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে রমজান ও রবিউল আউয়ালের মতভেদ মূলত বিশুদ্ধ চান্দ্র বর্ষপঞ্জি এবং সৌর-চান্দ্র বর্ষপঞ্জির পার্থক্য। চান্দ্র-সৌর বর্ষপঞ্জি এবং বিশুদ্ধ চান্দ্র বর্ষপঞ্জির মধ্যে পার্থক্য কী? এ সম্পর্কে আমরা শুরুতে বলেছি যে সেই সময়ের অনেক বর্ষপঞ্জি বিশুদ্ধ চান্দ্র ছিল না, বরং দুটি সৌর বছরের হিসেবে ৬১৫ দিনের হতো। এই হিসাব অনুযায়ী নববী জন্ম ও হিজরতের মধ্যে বিশুদ্ধ চান্দ্র বর্ষপঞ্জির ৫৩ বছর নয়, বরং ৫৪ বছর এবং কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছিল। যেখানে মক্কি বর্ষপঞ্জি বা সৌর বছর অনুযায়ী পূর্ণ ৫৩ বছরের চেয়ে কিছুটা বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিল। পূর্ণ ৫৩ চান্দ্র বছর নির্ধারিত হওয়ার কারণেই নববী জন্মের খ্রিস্টীয় সাল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ বের করা হয় এবং সাধারণত একে ১২ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ বলা হয়, অথচ জন্মের সঠিক খ্রিস্টীয় মাস হলো মে ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ অথবা নভেম্বর ৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ। এ নিয়ে যেন এই আপত্তি না ওঠে যে সিরাত লেখকরা জন্ম বসন্তকালে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বর্ণনাকারীদের থেকে বসন্তকাল সম্পর্কে কোনো বক্তব্য বর্ণিত নেই। রবিউল আউয়াল শব্দ থেকে কারো কারো এই ধারণা হয়েছে যে এই মাসটি হয়তো বসন্তে আসত এবং কেউ কেউ ক্যালেন্ডারের হিসাব কষে "বসন্তকাল"-এর কথা বাড়িয়ে দিয়েছেন, অথচ এই হিসাব মূলত ভুল।

**গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা:** লেখক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাতের বর্ষপঞ্জি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছেন যে মক্কি যুগ সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোতে বর্ণিত অধিকাংশ তারিখ মক্কি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী; কারণ সে সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই প্রথা ছিল। হ্যাঁ, যদি কোনো তারিখ কোনো দলিল বা সূত্রের মাধ্যমে ওই যুগের ঘটনাগুলোতেও মাদানি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, তবে সেটি ভিন্ন কথা।

(বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা)

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/ ৩০, ৩১

[২] জামিউল উসুল লি-ইবনিল আসির আল-জাযারি: ১২/ ১৬, ত. মাকতাবাতুল হালওয়ানি

শুরু থেকেই তারা মিষ্টভাষী হয়ে উঠতেন। তায়েফের নিকটবর্তী বনূ সাদ তাদের বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাই মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের ধাত্রীদের সেবা গ্রহণ করা বেশি পছন্দ করতেন। সেই দিনগুলোতে এই গোত্রের কয়েকজন ধাত্রী শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য মক্কায় এসেছিলেন, কিন্তু কোনো ধাত্রীই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গ্রহণ করেননি; কারণ তখন ছিল অনাবৃষ্টির সময় এবং এই লোকদের নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভালো পারিশ্রমিকের দরকার ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এতিম দেখে কোনো ধাত্রীই এই ঘর থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার আশা করেননি। ধাত্রীদের এই কাফেলায় হালিমা সাদিয়া নামক এক নেককার নারীও ছিলেন। তিনি কোনো ঘর থেকে কোনো শিশু পাননি। অবশেষে তিনি হযরত আমিনার ঘরে প্রবেশ করলেন, এই এতিম শিশুটিকে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি ভালোবাসা তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গেল, তিনি অধিক পারিশ্রমিকের চিন্তা না করেই নবী ﷺ-কে বুকে জড়িয়ে নিজের সাথে নিয়ে আসলেন। তাঁকে গ্রহণ করার সাথে সাথেই হালিমা সাদিয়া চারদিকে বরকত আর বরকত দেখতে পেলেন। দুর্বল পশুগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠল, দুর্দশা সচ্ছলতায় বদলে গেল।

নবী আকরাম ﷺ-এর বেড়ে ওঠা সাধারণ শিশুদের চেয়ে আলাদা ছিল, যখন তাঁর বয়স দুই বছর হলো তখন হালিমা সাদিয়া দুধ ছাড়িয়ে দিলেন। নবী আকরাম ﷺ তাঁর দুধ-ভাইবোনদের সাথে বকরি চরাতে জঙ্গলে যেতে শুরু করলেন। এই সময়ে একদিন হঠাৎ দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন যারা রহমতে আলম ﷺ-এর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করলেন এবং আপনার হৃদয় থেকে কালো মাংসপিণ্ডের মতো কোনো কিছু বের করে ফেলে দিলেন এবং হৃদয়কে ঈমান ও হিকমত দিয়ে পূর্ণ করে পুনরায় রেখে দিলেন। এরপর হুজুর ﷺ-এর শরীর মোবারকে বক্ষ বিদীর্ণ করার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। [১] হুজুর ﷺ চার বছর বয়স পর্যন্ত বনূ সাদে অবস্থান করেন। এরপর হালিমা সাদিয়া আপনাকে মায়ের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। [২] বনূ সাদ গোত্রে কাটানো সেই দিনগুলোর সাধারণ ও কঠোর পরিশ্রমী জীবন নবী আকরাম ﷺ-এর স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি এবং লালন-পালনের ওপর অত্যন্ত চমৎকার প্রভাব ফেলেছিল। হুজুর ﷺ পরবর্তীতে কখনো কখনো সাহাবায়ে কেরামদের বলতেন: “আমি তোমাদের সবার চেয়ে বেশি খাঁটি আরব এবং আমি বনূ সাদ গোত্রে দুধ পান করেছি।” [৩]

**মায়ের সাথে ইয়াসরিব সফর:**

মক্কায় ফিরে আসার পর যখন নবী ﷺ-এর বয়স ছয় বছর হলো, তখন তাঁর সম্মানিত মা আপনাকে নিয়ে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যাতে নিজের স্বামীর কবরে যেতে পারেন এবং শিশুটিকে তাঁর বাবার নানার বাড়ির লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। তাঁদের হাবশী দাসী বারাকাহ (উম্মে আয়মান)-ও এই সফরে সাথে ছিলেন, যাঁকে আব্দুল্লাহ মিরাস হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। ইয়াসরিবে হযরত আমিনা তাঁর স্বামীর নানার বাড়ি বনূ নাজ্জারে কিছু দিন অতিবাহিত করেন। এখানে বনূ নাজ্জারের একটি পুকুরও ছিল যাতে নবী আকরাম ﷺ সাঁতার শিখেছিলেন। [৪]

**হযরত আমিনার ইন্তেকাল এবং আব্দুল মুত্তালিবের লালন-পালন:**

ফেরার পথে হযরত আমিনা “আবওয়া” নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন যে হঠাৎ তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এল এবং দেখতে দেখতেই

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৬২ থেকে ১৬৩; শাক্কুস সদরের ঘটনা মুসনাদে আবি ইয়ালা, হা: ১৩৬৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬৩ cultural-এও রয়েছে।

[২] দুগ্ধপান সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত হালিমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় ফিরিয়ে এনেছিলেন কিন্তু মক্কায় মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শিশুর প্রতি ভালোবাসাও প্রবল ছিল, তাই হযরত আমিনাকে রাজি করিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাথে নিয়ে ফিরে যান। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৬৩) এরপর দুই বছর পর ফিরিয়ে আনেন। (মিরআতুয যামান, সিবত ইবনুল জাওযী: ৩/৪৯)

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৬৭

[৪] শারহুজ যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া: ১/৩০৯, ত. ইলমিয়্যাহ

তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। এই জনশূন্য বিরান স্থানটি মক্কা ও ইয়াসরিব উভয়ের ঠিক মাঝখানে ছিল। চারদিকে পাহাড় ছিল যার মাঝখানে একটি টিলার ওপর হযরত আমেনাকে দাফন করা হয়। আবদুল্লাহর এতিম সন্তান ছয় বছর বয়সে মায়ের আশ্রয় থেকেও বঞ্চিত হলেন এবং তাও এমন এক নিঃস্ব অবস্থায় যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এমন কোনো প্রিয়জন বা আত্মীয় ছিল না যে মাথায় হাত রাখত এবং বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিত। এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের প্রশিক্ষণের সেই পর্যায় যা চুল্লির কাজ করে প্রতিভার সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাসী বারাকাহ (উম্মে আয়মান), যিনি সম্ভবত তখন নিজে ষোলো-সতেরো বছরের বেশি ছিলেন না, অনেক কষ্টে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে মক্কায় আসেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁর এই এতিম রত্নকে পুরোপুরি নিজের স্নেহের কোলে তুলে নিলেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নাতিকে নিজের চোখের আড়াল হতে দিতেন না। যখন কাবার ছায়ায় তাঁর জন্য সেই রাজকীয় গালিচা বিছানো হতো যার ওপর অন্য কারো বসার অনুমতি ছিল না, তখনও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিশীল নাতিকে সাথে বসাতেন। [১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত বছর বয়সী ছিলেন যখন আবদুল মুত্তালিব কিছুদিনের জন্য তাঁকে রেখে ইয়েমেনে যান যাতে সেখানকার নতুন শাসক সাইফ বিন যি ইয়াযানকে অভিনন্দন জানাতে পারেন, যিনি ইয়েমেন থেকে হাবশীদের শাসন খতম করে আরবদের পুনরায় উত্থান ঘটিয়েছিলেন। [২] এই সফর ছাড়া আবদুল মুত্তালিব সর্বদা এতিম নাতিকে হৃদয়ের সাথে লাগিয়ে রাখতেন।

## আবদুল মুত্তালিবের পর:

কিন্তু গভীর স্নেহের এই দিনগুলো বসন্তের বাতাসের মতো কেটে গেল এবং একদিন আবদুল মুত্তালিবও পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন। [৩] যাওয়ার সময় আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখাশোনার ওসিয়ত করে যান এবং তিনিই তাঁর অভিভাবক হন। [৪]

---

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৬৮

[২] আস-সিরাত আল-হালাবিয়্যাহ: ১/১২৬, ১২৮, তাবা আল-ইলমিয়্যাহ; আল-মুনাম্মাক ফি আখবার কুরাইশ, পৃষ্ঠা ৪২৭; তারিখ ইবনে খালদুন ২/৪৪

[৩] আল-মুহাব্বার লি ইবনে হাবিব, পৃষ্ঠা ১০

[৪] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৭৯... আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের সময় তাঁর দুই পুত্র হামজা এবং আব্বাস নিজেরা অল্পবয়সী ছিলেন। তবে জুবায়ের এবং আবু তালিব যুবক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর কার অভিভাবকত্বে ছিলেন? এ বিষয়ে মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে: “হাদ্দাসানা ইবনু হুমাইদ, হাদ্দাসানা সালামাহ, ক্বলা হাদ্দাসানি মুহাম্মদ বিন ইসহাক, আন আবদুল্লাহ বিন আবি বকর, কানা আবদুল মুত্তালিব ইউসি বিরাসুলিল্লাহ আম্মাহু আবা তালিব” (তারিখুত তাবারী: ২/৪৪৭)
এই বর্ণনা অনুযায়ী আবদুল মুত্তালিব নাতির অভিভাবকত্বের ওসিয়ত আবু তালিবকে করেছিলেন। সিরাত ইবনে ইসহাক, তারিখ তাবারী, সিরাত ইবনে হিশাম এবং দালায়েলুন নুবুওয়াহ সহ অধিকাংশ সিরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের বিচ্ছিন্ন (মুনকাতে) সূত্রে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেহেতু এই বর্ণনার সূত্র দুর্বল, তাই কিছু ব্যক্তি একে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে বড় চাচা হযরত জুবায়েরকে অভিভাবক হিসেবে প্রমাণ করেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, “আবদুল মুত্তালিবের উত্তরসূরি ছিলেন জুবায়ের, তিনিই বড় ছেলে ছিলেন, সম্পদশালীও ছিলেন, পক্ষান্তরে আবু তালিব অসচ্ছল ছিলেন, তাই তিনি কীভাবে অভিভাবকত্ব করতে পারতেন।” কিন্তু এই দাবি নিছক অনুমান, এর কোনো সনদগত প্রমাণ নেই। হযরত জুবায়েরের অভিভাবকত্বের স্বপক্ষে যেসব বর্ণনা পেশ করা হয়, প্রথমত সেগুলো সূত্রহীন, দ্বিতীয়ত সেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালন-পালনের কোনো উল্লেখ নেই, বরং আবদুল মুত্তালিবের পর বংশের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ আছে। আওসা আবদুল মুত্তালিব ইলা ইবনিহিয জুবায়ের। (আল-মুনাম্মাক ফি আখবার কুরাইশ, পৃষ্ঠা ১২৬; আল-মুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১৩২)
এটা জরুরি নয় যে, যিনি উত্তরসূরি হবেন, বংশের ছোট-বড় সব কাজ সরাসরি তাঁর দায়িত্বে থাকবে। দ্বিতীয় কথা হলো, আবু তালিবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিভাবকত্ব লাভের বর্ণনা শুধু মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকেই নয়, বরং অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মদ বিন সাদ এমন অনেক সূত্র উল্লেখ করেছেন যা যদিও দুর্বল, তবে সেগুলোর মধ্যে একটি সূত্র মুয়াজ বিন মুহাম্মদ আনসারী (মৃত্যু: ১৬০ হিজরি, যিকরাহু ইবনে হিব্বান ফিল সিকাত: তাহযিবুল কামাল: ২৮/১৩৮) আন আতা (বিন ইয়াসার, মৃত্যু: ৯৪ হিজরি, বুখারী ও মুসলিমের রাবী) আন ইবনে আব্বাস-এর রয়েছে, এই সূত্রের অন্তত হাসান হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর অন্যান্য বর্ণনা মিলিয়ে একে সহীহ লি-গাইরিহি বলা যেতে পারে। তাই আবু তালিবের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

এই বছর আরবের বিখ্যাত দানবীর এবং বনী তায়্যি গোত্রের সরদার হাতেম তাঈ-এর ইন্তেকাল হয়েছিল এবং এই বছরই পারস্যের সবচেয়ে নামী বাদশাহ নওশেরওয়ানের মৃত্যুর বছর। [১]

সৌভাগ্যবান শৈশব:

সাধারণত শৈশবকাল চপলতা ও দুষ্টুমির চরম সময় হয়ে থাকে, কিন্তু রাসূল ﷺ শুরু থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, মর্যাদাবান এবং লজ্জাশীল ছিলেন। রাসূল ﷺ আরবের সামাজিক মন্দ কাজগুলো দ্বারা সামান্যতমও প্রভাবিত হননি। শিরকপূর্ণ রীতিনীতি, মদ্যপান এবং গান-বাজনা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলেন। সত্যবাদিতা, আমানতদারি, সহানুভূতি, বিনয়, সৌজন্যবোধ এবং দয়াশীলতার গুণাবলী রাসূল ﷺ-এর মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এর পাশাপাশি আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সাহসী এবং চটপটে ছিলেন। [২]

সিরিয়া সফর এবং বুহাইরা পাদ্রীর সাক্ষ্য:

রাসূল ﷺ-এর বয়স যখন বারো বছর, তখন আপনি আপনার চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে বের হন। এই কাফেলা সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর বসরার মহাসড়কের পাশে যাত্রাবিরতি করে, যেখানে বুহাইরা নামক এক পাদ্রীর গির্জা ছিল। [৩] বুহাইরা কখনো তার গির্জা থেকে বের হতো না, কিন্তু সেদিন সে বাইরে এল এবং ভিড় ঠেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে পৌঁছাল। তারপর তাঁর হাত ধরে বলতে লাগল: “ইনি বিশ্বজগতের সরদার। ইনি রাব্বুল আলামীনের রাসূল। ইনি রহমাতুল্লিল আলামীন।”

কুরাইশদের কিছু বৃদ্ধ লোক বলল: “তুমি কীভাবে জানলে?”

সে বলল: “যখন তোমরা উপত্যকা থেকে নিচে নামছিলে, তখন আমি দেখলাম যে এমন কোনো গাছ বা পাথর নেই যা সম্মানে সিজদাবনত হচ্ছে না। এমনটি কেবল নবীর জন্যই হয়ে থাকে। আমি তাঁকে মোহরে নবুওয়াতের মাধ্যমে চিনি যা তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে রয়েছে।”

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা): ...এর তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত এবং এর বিপরীতে কোনো যুক্তি টেকে না। ইমাম বালাজুরি এই বিষয়ে কিছু বর্ণনা উল্লেখ করে লিখেছেন: ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লালন-পালনের দায়িত্ব কে নেবেন তা নিয়ে জুবায়ের ও আবু তালিবের মধ্যে লটারি হয়েছিল, তাতে আবু তালিবের নাম আসে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজের কাছে নিয়ে নেন। আবার বলা হয় যে, আবু তালিব জুবায়েরের চেয়ে বেশি দয়ালু ছিলেন, তাই আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে অসিয়ত করেছিলেন যে তিনি যেন তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) লালন-পালন করেন।’ (আনসাবুল আশরাফ: ১/৮৫)

এই ইবারতের সারমর্ম হলো, একটি বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল ﷺ-এর লালন-পালনের বিষয়ে আবু তালিব ও জুবায়েরের মধ্যে লটারি হয়েছিল এবং আবু তালিব জয়ী হয়েছিলেন। অন্য একটি বর্ণনা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জুবায়েরের কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল এবং তিনি আবু তালিবকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। আরেকটি বর্ণনায় আব্দুল মুত্তালিবের অসিয়তের কথাও রয়েছে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লামা তিবী একটি উক্তি নকল করেছেন যার মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় হয়ে যায়। তা হলো, আব্দুল মুত্তালিবের পর জনাব জুবায়ের এবং হযরত আবু তালিব উভয়েই লালন-পালন করেছিলেন। যখন রাসূল ﷺ-এর বয়স চৌদ্দ বছর হলো, তখন হযরত জুবায়েরের ইন্তেকাল হয় এবং লালন-পালনের দায়িত্ব এককভাবে আবু তালিবের ওপর বর্তায়। (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১৬৫)। তবে আবু তালিবের লালন-পালনের বিষয়টি এই উক্তিতেও অস্বীকার করা হয়নি। আরও মনে রাখা দরকার যে, ইমাম বালাজুরি হযরত জুবায়েরের লালন-পালন করা এবং রাসূল ﷺ-এর চৌদ্দ বছর বয়সে হযরত জুবায়েরের ইন্তেকাল করার বর্ণনার সপ্রমাণ খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন: “কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, জুবায়ের নবী ﷺ-এর লালন-পালন করেছিলেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, তারপর আবু তালিব তাঁর দায়িত্ব নেন। এটি ভুল, কারণ জুবায়ের হিলফুল ফুজুলে উপস্থিত ছিলেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল বিশ বছরের কিছু বেশি। ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফর করেছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ: ১/৮৫)”

মোদ্দাকথা, ইমাম বালাজুরি আবু তালিবের অভিভাবকত্বের বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন যদি কেউ কেবল এই অনুমানের ভিত্তিতে যে, আবু তালিব দরিদ্র ও দুর্বল ছিলেন এবং জুবায়ের সম্পদশালী ও সরদার ছিলেন, এই বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করে, তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। অভাবী মানুষ কি সন্তান লালন-পালন করে না? আর তারা কি এতিমদের প্রতিপালন করে না?

(বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা):

[১] তারিখুল খামিস ফি আহওয়ালি আনফাসিন নাফিস: ১/২৫৫, তবা’ দারে সাদির; আল-বাদউ ওয়াত তারিখ: ৩/১৩৩, তবা’ মাকতাবাতুস সাকাফাতুদ দ্বীনিয়্যাহ।

[২] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/৮৮।

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১/১২১... সম্ভবত সিরিয়া সফর কুরাইশদের অভ্যাস অনুযায়ী গ্রীষ্মকালে হয়েছিল। (সূরা কুরাইশ, আয়াত ৩)।

রাহিব কাফেলাকে আপ্যায়ন করলেন এবং আবু তালিবকে কসম দিলেন যেন এই বালককে শামে না নিয়ে যাওয়া হয়; কারণ যদি রোমানরা তাকে নবুওয়াতের গুণাবলীর কারণে চিনে ফেলে তবে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। [১]

অবশেষে আবু তালিব রাসূল ﷺ-কে এক ব্যক্তির সাথে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। [২]

**হারবে ফিজারে অংশগ্রহণ:**

রাসূল ﷺ-এর বয়স যখন দশ বছর ছিল, তখন মক্কার উপকণ্ঠে লড়াইয়ের সেই ধারা শুরু হয়েছিল যাকে "হারবে ফিজার" বলা হয়...

---

[১] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৬২০, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মা জাআ ফী বাদয়ি নুবুওয়াতিন নবী ﷺ, আলবানী বলেছেন: সহীহ কিন্তু এতে বিলালের উল্লেখ মুনকার।

এই বর্ণনায় কোনো বর্ণনাকারীর বিভ্রমের কারণে এই অংশটুকুও যুক্ত হয়েছে: "আবু তালিব তাকে ফেরত পাঠালেন এবং আবু বকর তার সাথে বিলালকে পাঠালেন।" (আবু তালিব নবী ﷺ-কে ফেরত পাঠালেন এবং হযরত আবু বকর ﷺ তাকে হযরত বিলাল ﷺ-এর সাথে ফেরত পাঠালেন।)

এই অংশটি দেখে হাফেজ যাহাবী রহ. এই পুরো বর্ণনাটিকে বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। (মীযানুল ইতিদাল: ২/৫৮১)।

কিন্তু মধ্যপন্থা হলো বর্ণনার পাঠের (মতন) কেবল সেই অংশটুকুই বর্জনীয় হওয়া উচিত যা যুক্তির নিরিখে অগ্রহণযোগ্য। چنانچہ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. "যাদুল মাআদ"-এ, যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংকলিত সীরাতে নববী, এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং সেই অংশটিকেই অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন যা স্পষ্টভাবে ভুল। তিনি বলেন:

"তিরমিযী ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে যে, তিনি তার সাথে বিলালকে পাঠিয়েছিলেন, আর এটি একটি স্পষ্ট ভুল। কারণ বিলাল তখন সম্ভবত জন্মই নেননি, আর যদি জন্ম নিয়েও থাকেন তবে তিনি তার চাচার সাথে ছিলেন না এবং আবু বকরের সাথেও ছিলেন না। বাযযার তার মুসনাদে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে 'তার সাথে বিলালকে পাঠিয়েছেন' বলেননি, বরং বলেছেন: 'এক ব্যক্তিকে'।" (যাদুল মাআদ: ১/৭৬, ৭৭)

অন্যদিকে আল্লামা শিবলী নোমানী মরহুম তার বিশ্ববিখ্যাত "সীরাতুন্নবী"-তে প্রাচ্যবিদদের আপত্তির জবাবে এই বর্ণনার সনদের ওপর অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করে একে প্রায় প্রত্যাখ্যানই করেছেন। যদিও প্রাচ্যবিদদের এই আপত্তি যে, নবী ﷺ বুহাইরা রাহিবের কাছ থেকে এই সফরেই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তা নিজেই অত্যন্ত দুর্বল। আল্লামা শিবলী নোমানী নিজেই এর যৌক্তিক জবাব দিয়েছেন যে, এত অল্প সময়ে একজন অল্পবয়সী বালক কীভাবে এমন সূক্ষ্ম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখতে পারে যা রাসূল ﷺ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং প্রাচ্যবিদদের আপত্তিতে এমন কোনো ওজন নেই যার ভিত্তিতে আমরা আমাদের "ঐতিহ্য" (তরাস) ত্যাগ করব।

এখন আমরা এই বর্ণনার সনদের ওপর বিচার করি। সুনান আত-তিরমিযীতে এই সনদটি "হাসান গরীব" ও গ্রহণযোগ্য, সনদটি হলো:

ফজল বিন সাহল, আবদুর রহমান বিন গাযওয়ান, ইউনুস বিন আবি ইসহাক, আবু বকর বিন আবি মুসা, আবু মুসা আল-আশআরী।

ফজল বিন সাহল: বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। সাদুক। (তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৫৩০৩)

আবদুর রহমান বিন গাযওয়ান: সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী, সিকাহ। (তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৩৯৭৭), হাফেজ যাহাবী রহ. তাকে হাফেজ, ইমাম ও সাদুক বলেছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এবং ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহ. তার ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯/৫১৮)

ইউনুস বিন আবি ইসহাক: তার থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাকে "সাদুকুন ইয়াহিম" বলেছেন। (তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৭৮৯৯)

আবু বকর বিন আবি মুসা: বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং সিকাহ। (তাকরীবুত তাহযীব, অনুবাদ নম্বর: ৭৯৯০)

মোটকথা, তাদের প্রত্যেকেই বুখারী বা মুসলিম অথবা উভয়ের বর্ণনাকারী। এমন কোনো বর্ণনাকারী নেই যার ওপর মিথ্যার অপবাদ রয়েছে। শেষে আবু মুসা আল-আশআরী ﷺ রয়ে যান, যাকে নিয়ে আল্লামা শিবলী নোমানী মরহুম আপত্তি করে বলেছেন: "এই হাদীসের শেষ বর্ণনাকারী আবু মুসা আল-আশআরী, তিনি ঘটনার সাক্ষী ছিলেন না এবং উপরের বর্ণনাকারীর নাম বলেননি।" (সীরাতুন্নবী: ১/১১৪) কিন্তু এই আপত্তি ভিত্তিহীন। উসূলে হাদীসে এটি মীমাংসিত যে, সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। ইমাম যারকাশী রহ. বলেন: "সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যদিও তাদের তাবেয়ীদের থেকে বর্ণনা করার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সাধারণত তারা নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণনা করেন না, বিশেষ করে যখন তা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়, তখন একে সাধারণের ওপরই প্রয়োগ করা হয়।" (আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ লিল যারকাশী: ১/৩৭৫)

আল্লামা সালাহউদ্দীন আলাই আদ-দামেশকী রহ. লিখেছেন: "নিশ্চয়ই জমহুর সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা গ্রহণের পক্ষে।" (তাহকীকু মুনিফির রুতবাহ, পৃ. ৪৫)

امام عراقی রহ. লিখেছেন: "সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনার হুকুম মুত্তাসিল বর্ণনার মতোই।" (শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ আলফিয়াতুল ইরাকী: ১/২১৩)

সুনান আত-তিরমিযীর এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার পর সীরাতে ইবনে হিশাম এবং তাবাকাতে ইবনে সাআদের সেই দুর্বল সনদের বর্ণনাগুলোও আর বর্জনীয় থাকে না যেগুলোতে এই ঘটনাটি প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। সীরাতকারগণ এই ঘটনাটিকে পূর্ণ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন; কারণ এতে একজন অমুসলিমের জবানীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে।

[২] যাদুল মাআদ: ১/৭৬, ৭৭ বরাতে মুসনাদুল বাযযার

বলা হয়। এই ধারার প্রথম যুদ্ধ ফিজার আউয়াল বনু কিনানা এবং হাওয়াযিনদের মধ্যে হয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ কুরাইশ এবং হাওয়াযিনদের মধ্যে লড়া হয়েছিল। তৃতীয়টিতে হাওয়াযিন এবং বনু নযর বিন মুয়াবিয়া মুখোমুখি হয়েছিল। চতুর্থ যুদ্ধ যাকে 'ফিজার রাবে' এবং 'ফিজার বাররায' বলা হয়, তা পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধের চেয়ে বেশি ভয়াবহ ছিল যা কুরাইশ এবং বনু কায়েস গোত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল পনেরো বছর। যুদ্ধের দিন কুরাইশদের প্রায় সকল বুদ্ধিমান পুরুষ ময়দানে সারিবদ্ধ ছিল, বালকদেরও সাহায্যকারী হিসেবে তলব করা হয়েছিল। নবী আকরাম ﷺ-ও তাঁর চাচাদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেছিলেন যারা তীরন্দাজিতে নিযুক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধে বনু হাশিমের সরদার ছিলেন যুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব। কুরাইশদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বনু উমাইয়ার সরদার হারব বিন উমাইয়া।

যুদ্ধ শুরু হলে শত্রুরা কুরাইশদের ওপর পূর্ণ চাপ সৃষ্টি করল। নবী আকরাম ﷺ-এর চাচারা তাঁদের ধনুক থেকে তীর ছুড়ছিলেন এবং আপনি ﷺ তাঁদেরকে শত্রুদের ছোড়া তীরগুলো কুড়িয়ে এনে দিচ্ছিলেন যাতে তীরের অভাব না হয়। দিনের শুরুর অংশে বনু কায়েসের পাল্লা ভারী ছিল কিন্তু সূর্য ঢলে পড়ার পর কুরাইশরা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল এবং বনু কায়েস পরাজিত হয়ে পিছু হটল। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল।

সাইফ যি ইয়াযানের মৃত্যু এবং দক্ষিণ আরবে পারস্যের আধিপত্য:

এই বছর দক্ষিণ আরবে একটি বিপ্লব এল। ইয়েমেনের দেশপ্রেমিক আরব শাসক সাইফ বিন যি ইয়াযান পনেরো বছরের শাসনের পর মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু এই সরকার কিসরার সামরিক সাহায্যের বদৌলতে ছিল, তাই সাইফের মৃত্যুর সাথে সাথেই কিসরা ইয়েমেনকে সরাসরি নিজের দখলে নিয়ে নেয় এবং সেখানে নিজের পারস্য বংশোদ্ভূত গভর্নর ও কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করে। এভাবে জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ অংশ আবারও □□□□ভাবে বিদেশি স্বৈরাচারের কবলে পড়ে গেল।

রিজকে হালালের জন্য পরিশ্রম:

যৌবনে পদার্পণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কর্মসংস্থান খোঁজার চিন্তা করলেন। বনু হাশিম ব্যবসায়ী ছিল কিন্তু নবী আকরাম ﷺ-এর কাছে পুঁজি ছিল না, তাই আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের ছাগল চরানোর কাজ শুরু করলেন। বনু সা'দ গোত্রে শৈশব কাটানোর কারণে আপনি ﷺ-এর আগে থেকেই এই কাজের অভিজ্ঞতা ছিল।

---

[১] মিরআতুয যামান সিবত ইবনুল জাওযী: ৩/৭২, ৭৩

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৮৪; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১৮৫ থেকে ১৮৭, ত العلمية

ফায়দা (১): একটি মত অনুযায়ী হারাম মাসসমূহে সংঘটিত হওয়ার কারণে এগুলোকে হুরুবুল ফিজার (পাপের কারণ যুদ্ধসমূহ) বলা হয়েছে। কিন্তু এই মতটি সঠিক নয়, কারণ এগুলোর মধ্যে কিছু যুদ্ধ বছরের অন্যান্য মাসেও হয়েছিল। যেমন 'ফিজার বাররায' শাওয়াল মাসে লড়া হয়েছিল। (উয়ুনুল আসার লি ইবনে সাইয়্যিদুন নাস: ১/১৬০; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১৮৬) অগ্রগণ্য মত হলো এই যে, প্রচুর পরিমাণে অবৈধ জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতির কারণে এগুলোকে 'ফিজার' বলা হয়েছে। তীন বিন আজয মাদানী-র উক্তি হলো: سموا فجارا لانهم فجروا واحلوا اشياء كانو يحرمونها (তাদেরকে ফিজার নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা পাপাচার করেছিল এবং এমন বিষয়গুলোকে হালাল করে নিয়েছিল যা তারা হারাম মনে করত)। (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড: ১৩৯৩৯)

ফায়দা (২) 'ফিজার' শব্দটিকে 'ফুজজার'ও পড়া হয়। 'ফুজজার' হলো ফাজির (পাপী)-এর বহুবচন, এই দিক থেকে এই নামকরণটি স্পষ্ট।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৩১০, যিকর মুলক কিসরা আনুশিরওয়ান বিন কুবাদ; তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৪৩

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ২২৬২, কিতাবুল ইজারা, বাব রাঈল গানাম আলা কারারীত।

পরবর্তীতে হুজুর ﷺ তাঁর চাচা যুবাইরের সাথে ব্যবসার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তাঁর সাথে ইয়ামেনের একটি সফরও করেন। [১]

**হিলফুল ফুজুল:**

হুজুর আকরাম ﷺ-এর বয়স বিশ বছর ছিল যখন মক্কার বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে যুগান্তকারী 'হিলফুল ফুজুল' চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা থেকে বোঝা যায় যে স্থবিরতা ও নিদ্রাচ্ছন্নতার সেই যুগেও কিছু মানুষের বিবেক জাগ্রত ছিল। [২]

এই চুক্তির মূল কারণ ছিল এই যে, কুরাইশরা অহেতুক রক্তপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং একটি ন্যায়সঙ্গত চুক্তির মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আর এর তাৎক্ষণিক কারণ ছিল এই যে, 'বনু যুবাইদ'-এর একজন ব্যবসায়ী মক্কায় ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসেন। এখানে জনৈক কুরাইশ নেতা আস বিন ওয়াইল তার সমস্ত পণ্য কিনে নেয় কিন্তু তাকে মূল্য পরিশোধ করেনি। যুবাইদী ব্যবসায়ী অতিষ্ঠ হয়ে মক্কাবাসীদের কাছে ফরিয়াদ করলে বেশ কয়েকজন নেতার মনে দয়ার উদ্রেক হয়। নবী করীম ﷺ-এর চাচা যুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিবের প্রস্তাবে এই লোকেরা আব্দুল্লাহ বিন জুদআন নামক এক নেতার বাড়িতে একত্রিত হন এবং চুক্তি করেন যে, তারা সবাই জালিমের মোকাবিলা এবং মজলুমের সাহায্যের জন্য একতাবদ্ধ হবেন। চুক্তিটি জিলকদ মাসে হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণকারী তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ছিল: ফজল, ফাযালা এবং মুফায্যাল; তাই একে 'হিলফুল ফুজুল' বলা হয়। হুজুর ﷺ-ও এই চুক্তিতে শরিক ছিলেন এবং এই ন্যায়সঙ্গত অঙ্গীকারে অত্যন্ত খুশি ছিলেন। হুজুর ﷺ পরবর্তীতে বলতেন: "এই চুক্তির বিনিময়ে আমাকে যদি লাল উটও দেওয়া হতো, তবুও আমি তা গ্রহণ করতাম না। আজও যদি কেউ এমন চুক্তির দাওয়াত দেয়, তবে আমি প্রস্তুত আছি।" [৩]

**ঈর্ষণীয় যৌবন, ব্যবসা ও বিবাহ:**

পুঁজি না থাকার কারণে হুজুর ﷺ অন্যদের পুঁজি ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফায় অংশীদার হতে শুরু করেন। উমর মুবারক পঁচিশ বছর ছিল যখন আল্লাহ তাআলা হুজুর ﷺ-কে ধন-সম্পদের দিক থেকে অভাবমুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিলেন। কুরাইশদের একজন সম্পদশালী ও মহীয়সী বিধবা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পুঁজি দিয়ে ব্যবসায় নিয়োগ করতেন এবং অর্জিত মুনাফা থেকে তাদের সম্মানজনক পারিশ্রমিক দিতেন। তিনি যখন হুজুর ﷺ-এর মহত্ত্ব, আমানতদারি এবং অন্যান্য গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আপনাকে নিজের পুঁজি দিয়ে ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

---

[১] ইবনুল জাওযী 'আল-ওয়াফা'-তে বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স দশের কোঠায় (তের থেকে উনিশ) পৌঁছাল, তখন তিনি তাঁর চাচা যুবাইরের সাথে এক সফরে বের হন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২/১৩৯) এবং হালাবী তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন: "ইয়ামেনের দিকে" (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/১৭০)। এই বর্ণনা থেকে বয়সের পূর্ণ নির্ধারণ হয় না, কারণ 'বিয' (بضع) শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত বোঝায়। (আস-সিহাহ তাজুল লুগাহ: ৩/১১৮২)। তবে ধারণা করা যায় যে, এটি ছিল হারবুল ফিজার এবং হিলফুল ফুজুলের মধ্যবর্তী সময়। হিলফুল ফুজুলের সময় আপনার ﷺ বয়স ছিল বিশ বছর এবং হারবুল ফিজারের সময় পনের বছর। এছাড়া আপনি ﷺ কিছুকাল ছাগলও চড়িয়েছিলেন, তাছাড়া ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার জন্য কিছুটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রয়োজন হয়, তাই ধারণা করা হয় এই সফরে হুজুর ﷺ-এর বয়স ১৮ বছরের কাছাকাছি ছিল। সম্ভবত এই সফর কুরাইশদের রীতি অনুযায়ী শীতকালে হয়েছিল। (সূরা কুরাইশ, আয়াত: ২, সাথে তাফসীরে ইবনে কাসীর)

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১/১২৮; এই বর্ণনার ওপর এই আপত্তি ভিত্তিহীন যে, হযরত যুবাইর সেই সময়ে ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির কয়েক বছর আগে হয়েছিল। বালাগুরী, যিনি বংশপরম্পরা বিদ্যার ইমাম ছিলেন, তিনি লিখেছেন: "যুবাইর ইন্তেকাল করেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ত্রিশের কোঠায় (তেত্রিশ থেকে উনচল্লিশ) ছিল।" (আনসাবুল আশরাফ: ২/২০)

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১/১২৮; আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হা: ২৮৭০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৫৫ থেকে ৩৫৯; মিরআতুয যামান, সিবত ইবনুল জাওযী: ৩/৭৯।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সততা ও উত্তম আচরণের কারণে এই ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়। সেই সাথে খাদিজা (রা.) আপনার আরও অনেক গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি আপনার চরিত্রে এতটাই মুগ্ধ হন যে, আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এর আগে তিনি অনেক বড় বড় সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আপনার চাচা আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করেন। তখন আপনার বয়স ছিল পঁচিশ বছর, আর খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। [১]

**বৈবাহিক জীবন:**

এখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আর অভাবগ্রস্ত ছিলেন না; আল্লাহ তাআলা বৈবাহিক জীবনের নেয়ামতের পাশাপাশি আর্থিক সচ্ছলতাও দান করেছিলেন। অন্যদিকে খাদিজা (রা.) এমন একজন জীবনসঙ্গী পেয়েছিলেন, যাঁকে নিয়ে তিনি যতটা গর্ব করতেন তা ছিল কম। তিনি তাঁর ধন-সম্পদ, সম্পত্তি এবং ব্যবসার মূলধন সবকিছু রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সেবায় উৎসর্গ করে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনন্দেই ছিল তাঁর আনন্দ। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীর সাথে তাঁরই বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। এই বাড়িটি দুটি শোবার ঘর এবং একটি বৈঠকখানার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই বরকতময় ঘরে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর যৌবনের আটাশটি বছর কাটিয়েছিলেন। [২]

এ পর্যন্ত আপনার আবিসিনীয় দাসী বারাকাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সেবা করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন: “আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা।” উম্মে আয়মান রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে প্রায় দশ-এগারো বছরের বড় ছিলেন। আপনি আপনার বিয়ের সময় তাঁর পড়ন্ত বয়স এবং পূর্বের সেবার কথা বিবেচনা করে তাঁকে কেবল মুক্তই করে দেননি, বরং হারিস বিন যায়েদ নামক এক সচ্চরিত্র ব্যক্তির সাথে তাঁর বিয়েও দিয়ে দেন। এভাবে তিনিও নিজের সংসারে থিতু হন। তাঁর একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল যার নাম রাখা হয়েছিল আয়মান। বারাকাহ তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে “উম্মে আয়মান” নামে পরিচিত হন। [৩] [৪]

**হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-এর লালন-পালন:**

এই ঘরে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং খাদিজা (রা.) ছাড়াও আরও একজন ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ছিলেন বনু কালব গোত্রের হারিয়ে যাওয়া এক বালক যায়েদ বিন হারিসা। এই শিশুটিকে শত্রু গোত্রের আক্রমণকারীরা অপহরণ করে দাসে পরিণত করেছিল এবং উকাজ বাজারে বিক্রি করে দিয়েছিল। তখন এই শিশুটির বয়স ছিল মাত্র আট বছর। খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা হাকিম বিন হিযাম তাঁকে ক্রয় করেন এবং এনে খাদিজা (রা.)-এর নিকট পেশ করেন। যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে খাদিজা (রা.)-এর বিয়ে হলো, তখন তিনি যায়েদকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করেন। [৫]

দীর্ঘ সময় পর যায়েদের পিতা হারিসা সংবাদ পেলেন যে, তাঁর হারিয়ে যাওয়া সন্তান কুরাইশদের দাসত্বে রয়েছে। তিনি সরাসরি মক্কায় পৌঁছালেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং পুরো ঘটনা শুনিয়ে তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেন এবং সেই সাথে মুক্তিপণও পেশ করলেন।

---

[১] সিরাত ইবনে হিশাম: ১/১৮৭-১৯১... খাদিজা (রা.)-এর বয়স সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত হলো ৪০ বছর, যা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

[২] কিছু ওয়েবসাইট এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের প্রচেষ্টায় এই বাড়ির অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে। তবে আমরা এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করছি না।

[৩] আল-ইসাবাহ ফি তামিযিস সাহাবাহ, ইবনে হাজার আসকালানি: ৮/৩৫৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, অনুবাদ: উম্মে আয়মান (রা.)।

[৪] উসদুল গাবাহ লি ইবনিল আসির আল-জাযারি: ২/৩৫০, অনুবাদ: যায়েদ বিন হারিসা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

হুজুর ﷺ বললেন: “যায়েদকে ডেকে তাকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি সে আপনাদের সাথে যেতে চায় তবে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই সে আপনাদের সাথে যেতে পারে, আর যদি সে যেতে না চায় তবে আমি তাকে জোর করে পাঠাব না।”

যায়েদকে ডাকা হলে তিনি তার পিতার সাথে যেতে অসম্মতি জানালেন এবং বললেন: “আমি হুজুর ﷺ-কে ছেড়ে অন্য কারো সাথে থাকা কীভাবে পছন্দ করতে পারি?”

পিতা অবাক হয়ে বললেন: “বেটা! স্বাধীনতার বদলে গোলাম হয়ে থাকাই কি তোমার পছন্দ?”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ! আমি হুজুর ﷺ-এর মাঝে যে গুণাবলি দেখেছি, তার বিনিময়ে আমি অন্য কোনো কিছুকে পছন্দ করতে পারি না।”

হুজুর ﷺ যায়েদের এই ভালোবাসা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং তখনই মসজিদে হারামে গিয়ে ঘোষণা করলেন:

“আমি তাকে আমার পুত্র বানিয়ে নিলাম।”

যায়েদের পিতা এই দৃশ্য দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন।

হযরত যায়েদ বিন হারিসা আগেও হুজুর ﷺ-এর সাথেই থাকতেন, কিন্তু এখন তিনি এই পরিবারের এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেলেন যে, মানুষ তাকে ‘যায়েদ বিন মুহাম্মদ’ বলতে শুরু করল। [১]

**হুজুর ﷺ-এর সামাজিক ব্যস্ততা:**

নিকাহর পর থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কাল হুজুর ﷺ-এর জীবনে এক বিশেষ গুরুত্ব রাখে, যদিও সীরাত গ্রন্থগুলোতে এই অধ্যায়টি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। এই পনেরো বছরে হুজুর ﷺ একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী যুবক এবং সুপরিচিত সামাজিক ও সামষ্টিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। যেহেতু আপনার জীবিকার মাধ্যম ছিল ব্যবসা, তাই লেনদেন এবং অন্যান্য বিষয়ে সারাদিন সব ধরণের এবং সব অঞ্চলের মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ হতো। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনার সুনাম এবং সামাজিক স্তরে আপনার মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। পুরো মক্কায় আপনার চেয়ে বেশি শরীফ, বুদ্ধিমান, সম্মানিত এবং সদাচারী মানুষ আর কেউ ছিল না। মানুষ আপনার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার মনেপ্রাণে কায়েল ছিল। তাদের সবচেয়ে মূল্যবান আমানত রাখার জন্য তাদের দৃষ্টি হুজুর ﷺ-এর ওপরই পড়ত। তারা আপনাকে সাদিক এবং আমিন উপাধিতে ডাকত।

হুজুর আকরাম ﷺ কথার পাকা এবং ওয়াদার অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। মক্কার এক নাগরিক আবদুল্লাহ বিন আবি আল-হামসা-এর সাথে হুজুর ﷺ-এর কিছু লেনদেন হয়েছিল। আবদুল্লাহর কিছু পাওনা বাকি ছিল, তিনি বললেন: “আপনার বকেয়া এখানেই নিয়ে আসছি।” এ কথা বলে আবদুল্লাহ বাড়ি চলে গেলেন এবং সেখানে নিজের ওয়াদার কথা ভুলে গেলেন। তৃতীয় দিনে মনে পড়লে সাথে সাথে সেই জায়গায় এলেন এবং দেখলেন যে আপনি সেখানেই অপেক্ষা করছেন। হুজুর ﷺ শুধু এতটুকু বললেন: “হে যুবক! তুমি আমাকে ক্লান্ত করে দিলে।” [২]

হুজুর ﷺ ব্যবসায় অংশীদারিত্বও করতেন। আবু সায়েব এবং কায়েস বিন সায়েব নামক দুই শরীফ ব্যক্তি আপনার অংশীদার ছিলেন।

---

[১] উসদুল গাবাহ: ২/৩৫০

[২] উসদুল গাবাহ: ৩/২১৮, যিকর: আবদুল্লাহ বিন আবি আল-হামসা

ছিলেন। তারা আপনার সততা ও উত্তম আচরণের স্বীকৃতি দিতেন। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসার পণ্য নিয়ে মক্কার বাইরেও যেতেন। মক্কার উত্তর-পূর্বে তায়েফের কাছে 'উকায' নামক বিখ্যাত বাজার বসত, যেখানে ব্যবসা ছাড়াও কবিতা ও গল্প বলার আসর বসত এবং গোত্রীয় বিবাদের মীমাংসাও করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসার জন্য সেখানেও গমন করতেন। [২] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আবু বকর বিন আবি কুহাফা, যিনি মেজাজ, চিন্তা ও অভ্যাসে আপনার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি একই পেশারও ছিলেন। মূর্তিপূজা, মদ্যপান এবং অন্যান্য নৈতিক মন্দ কাজ থেকে তিনিও পুরোপুরি বিরত থাকতেন। [৩]

এই পনেরো বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈনন্দিন রুটিনের খুব বেশি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, আপনি দিনের বেলা ব্যবসা এবং সামাজিক ও পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং নির্জন সময়ে আল্লাহর কুদরত, দুনিয়ার শুরু ও শেষ এবং নিজের কওমের অবস্থার ওপর চিন্তা-গবেষণা করতেন।

**কাবা পুনর্নির্মাণ:**

নবী করীম ﷺ-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হলো [৪], তখন কুরাইশরা কাবা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসের সাথে নির্মাণ কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেন এবং পাহাড় থেকে পাথর বহন করে আনতে থাকেন। [৫]

নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর যখন দেয়াল গাঁথুনি হাজরে আসওয়াদের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছাল এবং এই পবিত্র পাথর স্থাপনের সময় এল, তখন কাজে অংশগ্রহণকারী সকল গোত্রের মধ্যে তীব্র বিবাদ শুরু হলো; কারণ প্রতিটি গোত্রই এটি স্থাপনের সম্মান নিজে অর্জন করতে চাচ্ছিল। বনু আদি এবং বনু আবদুদ দারের ক্রোধের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা আরবের যুদ্ধ চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী রক্তে ভরা পাত্রে নিজ নিজ হাত ডুবিয়ে শপথ করল যে, যদি তাদের হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে তারা কাল অন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং লড়াই করতে করতে প্রাণ দেবে। অন্যদিকে তাদের বিরোধীদের রাগও কম ছিল না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু কিছু দূরদর্শী লোকের বোঝানোর ফলে এই বিবাদের চূড়ান্ত সমাধান এই বের করা হলো যে, এখন যে ব্যক্তি সবার আগে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সেই এই সমস্যার সমাধান করবে। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবার আগে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে দেখল এবং চিৎকার করে উঠল: "মুহাম্মাদ আল-আমিন এসেছেন, আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিবাদটি এভাবে মীমাংসা করলেন যে, একটি চাদর আনিয়ে হাজরে আসওয়াদকে তার মাঝখানে রাখলেন। তারপর প্রতিটি গোত্রের একজন করে প্রতিনিধিকে চাদরের একটি করে কোণা ধরতে বললেন। সবাই এভাবে হাজরে আসওয়াদকে তার নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নিয়ে গেল যেখানে

---

[১] আল-ইসতিয়াব লি ইবনে আবদিল বার: ১২৮৮/৩; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১৮৬/২।

[২] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/৩৮৯; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯।

[৩] তাবাকাতে ইবনে সা'দের বর্ণনা: "কুরাইশরা রাসূলুল্লাহর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার পাঁচ বছর আগে কাবা নির্মাণ করেছিল" (৩/৩৮১) এবং "কুরাইশরা কাবা নির্মাণ করেছিল যখন নবী ﷺ-এর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর" (১/১৪৮) - এই দুটি মেলালে এই ফলাফলই বের হয়। মুসনাদে আহমদের বর্ণনা: "এবং হাজরে আসওয়াদ সোমবার দিন উত্তোলন করা হয়েছিল।" (মুসনাদে আহমদ, হা: ২৫০৬)-এর প্রেক্ষাপট বলে যে এটি রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা এবং তারিখও ১১ মে, যেমনটি এই বর্ণনার বাকি ঘটনাগুলো এই তারিখগুলোতেই আসে।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮২৯, কিতাবুল মানাকিব, বাব বুনইয়ানুল কাবা।

রসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে একে কাবার কোণে স্থাপন করে দিলেন। এভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূরদর্শিতা ও ন্যায়সঙ্গত কৌশলের কারণে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে হতে থেমে গেল। [১]

**পারিবারিক দায়িত্বসমূহ:**

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ঘরের দায়িত্বের বোঝাও কম ছিল না। আপনার তিন সাহেবজাদী: হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়্যাহ এবং হযরত উম্মে কুলসুম এমন বয়সে পৌঁছেছিলেন যখন বিয়ের চিন্তা করা হয়। আরবের বিগড়ে যাওয়া পরিবেশ এবং মক্কার কলুষিত সমাজে এই কাজ এত সহজ ছিল না। হযরত যয়নব-এর জন্ম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিয়ের পঞ্চম বছরে এবং হযরত রুকাইয়্যাহ-এর জন্ম অষ্টম বছরে হয়েছিল। তাঁদের পরে ছিলেন হযরত উম্মে কুলসুম এবং তারপর হযরত ফাতিমা, যিনি সবার ছোট ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকাহর দশম বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [২] চার কন্যার পিতা হিসেবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল, তার আন্দাজ কেবল তিনিই করতে পারেন যার কন্যা সন্তান রয়েছে।

এই সময়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র সন্তানও হয়েছিল। দুই ছেলে ছিল: কাসিম এবং আবদুল্লাহ। হযরত কাসিম-এর নামানুসারে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুনিয়াত (উপনাম) "আবুল কাসিম" হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ "তৈয়্যব" এবং "তাহের" উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [৩]

**উম্মে আয়মান-এর সাথে যায়েদ বিন হারিসাহ-এর নিকাহ:**

এদিকে হযরত উম্মে আয়মান ছিলেন যাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ মায়ের মতো সম্মান ও মর্যাদা দিতেন, তিনি বিধবা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁর অসহায়ত্বের জন্য দুঃখ ছিল এবং এই অনুভূতিও ছিল যে তাঁর দেখাশোনার জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজন। তিনি হাবশী ছিলেন, আরবে তাঁর কোনো আত্মীয় ছিল না। এই বয়সে তাঁর সাথে নিকাহ করার ব্যাপারে কারো আগ্রহ থাকাও সম্ভব ছিল না। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিসাহ তাঁর সাথে নিকাহ করতে রাজি হয়ে গেলেন। উম্মে আয়মান-এর সাথে তাঁর নিকাহ হয়ে গেল, যদিও যায়েদ একেবারে যুবক ছিলেন কিন্তু উম্মে আয়মান-এর সাথে তাঁর খুব ভালো মিল ছিল। হযরত উম্মে আয়মান-এর মরহুম স্বামীর পুত্র আয়মানও তাঁদের সাথেই ছিল। এই পরিবারটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে এবং রিসালাতের পরিবারের অংশ ছিল। [৪]

**খিদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা), রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য:**

বাণিজ্যিক, পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা এবং প্রিয় কাজ ছিল আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা। আপনি আল্লাহর দেওয়া সম্পদ, সম্মান এবং চিন্তা ও প্রজ্ঞার নেয়ামতসমূহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণে অকাতরে ব্যয় করতেন। ক্ষুধার্তদের অন্নদান করা, বিধবাদের সাহায্য করা এবং অভাবীদের সাথে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল। মেহমানদারিতে রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ত্রুটি রাখতেন না। বনু হাশিমের হকদার...

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/১৯০ থেকে ১৯৬

[২] তাঁর জন্ম এবং কুরাইশদের কাবা ঘর নির্মাণের সময়, যা নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগের ঘটনা। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৩৮ ত সাদির)

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/১৩৩ ত সাদির ... কিছু সীরাত রচয়িতার মতে তৈয়্যব এবং তাহের আলাদা আলাদা ছেলে ছিল, কিন্তু এটি গবেষণার পরিপন্থী।

[৪] উসদুল গাবাহ: ৮/৪৯০, আল-ইসাবাহ: ৮/৩৫৮ তরজমা: উম্মে আয়মান

পরিবারগুলোর সাথে রাসূল ﷺ বিশেষভাবে সহযোগিতা করতেন। আপনার চাচা আবু তালিব, যিনি আপনার লালন-পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর তিন ছেলের বিশেষ খেয়াল রাখতেন এবং তাঁদের সাথে ভ্রাতৃসুলভ মমতার সাথে আচরণ করতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আকিল রাসূল ﷺ থেকে দশ বছর, হযরত জাফর বিশ বছর এবং হযরত আলী ত্রিশ বছরের ছোট ছিলেন। এরপর যখন একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে নিজের লালন-পালনে নিয়ে নিলেন এবং এভাবে এখন তিনি আপনার ﷺ কোলে খেলে বড় হচ্ছিলেন। [১]

**বনু হাশিমের সূর্য:**

পারিবারিক দায়িত্ব ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি রাসূল ﷺ তাঁর বংশ বনু হাশিমের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিক হতেন। বনু হাশিমের স্তম্ভ তখন রাসূল ﷺ-এর চাচাগণ ছিলেন: আবু তালিব, আবু লাহাব, আব্বাস এবং হামজা। আবু তালিব বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং আপনার অভিভাবকও ছিলেন। আবু লাহাবের উগ্র মেজাজ সত্ত্বেও আপনার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। রাসূল ﷺ-এর দুই কন্যা: হযরত রুকাইয়া এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিয়ে আবু লাহাবের দুই ছেলে: উতবা এবং উতাইবার সাথে ঠিক হয়েছিল। [২]

রাসূল ﷺ-এর প্রখ্যাত চাচা হযরত আব্বাস আপনার চেয়ে তিন বছরের বড় ছিলেন এবং আপনার অনেক খেয়াল রাখতেন। তিনি একজন দীর্ঘদেহী ও শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। জমিদারি ছিল তাঁর পেশা। সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। আবদুল মুত্তালিবের পর কাবা ঘরের নির্মাণ ও সংস্কার এবং হাজীদের পানি পান করানোর খিদমত তাঁরই দায়িত্বে ছিল। [৩]

রাসূল ﷺ-কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা চাচা হামজা আপনার চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড় ছিলেন। তিনিও আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন, তাই তিনি রাসূল ﷺ-এর দুধভাইও ছিলেন। মানুষের সাথে সদাচরণ করতেন এবং অভাবীদের প্রয়োজনে আসতেন। তিনি অসাধারণ তীরন্দাজ এবং অতুলনীয় তলোয়ারবাজ ছিলেন। ভ্রমণ ও শিকার ছিল তাঁর শখ। [৪]

রাসূল ﷺ-এর ফুফু সাফিয়াও বনু হাশিমের নারীদের মধ্যে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সমবয়সীই ছিলেন। সাহস ও বীরত্বে তিনি ছিলেন অনন্য। [৫] বনু হাশিমের এই ছায়াপথে রাসূল ﷺ-এর অবস্থান ছিল সূর্যের মতো। এটুকু সবাই জানত যে ভবিষ্যতে বনু হাশিমের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রাসূল ﷺ-এর ভাগ্যেই রয়েছে। কিন্তু কারো এই ধারণা ছিল না যে এই এতীম মুক্তার নামে দুই জাহানের নেতৃত্ব লিখে দেওয়া হয়েছে।

---

[১] সিরাত ইবনে হিশাম: ১/ ২৪৫, ২৪৬; আসাদুল গাবাহ: ১/ ৫৩৮, অনুবাদ: জাফর ইবনে আবি তালিব; ৩/ ৬১৭, অনুবাদ: আকিল ইবনে আবি তালিব

[২] আল-জাওহারা ফি নাসাবিন নবী ﷺ ওয়া আসহাবিহিল আশারা, আল্লামা আল-বিররি আত-তিলমিসানি (মৃ. ৬৪৫ হি.): ২/ ৩৩, ত. দারুর রিফায়ি রিয়াদ

[৩] আল-ইসতিয়াব: ৩/ ৮১১, ত. দারুল জিল

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/ ৯৫; ৩/ ১৩, ত. সাদির; আনসাবুল আশরাফ: ৩/ ২৮৫, ত. দারুল ফিকর

[৫] আল-ইসাবাহ: ৮/ ২১৩, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

## যখন নবুওয়াতের আমানত অর্পণ করা হলো

চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিন্তা ও ভাবনা গভীর হতে থাকে। তিনি দেখছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস ও বিনাশের পথে ধাবিত হচ্ছে এবং যদি এর দিক পরিবর্তনের জন্য কোনো কার্যকর প্রচেষ্টা চালানো না হয়, তবে মানবজাতির পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। এই উদ্বেগ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অদ্ভুত অস্পষ্ট অস্থিরতা অনুভব করতেন। গত সাত বছর ধরে তিনি মাঝে মাঝে ফেরেশতাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন এবং গায়েবি নূরের পর্যবেক্ষণ করছিলেন। [১] সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কল্পনাতেও ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে শেষ রাসূলের পদে ভূষিত করতে যাচ্ছেন। [২]

এই অবস্থা তাঁকে নির্জনতাপ্রিয় করে তুলল এবং তিনি মক্কার উপত্যকা ও মরুভূমিতে সময় কাটাতে শুরু করলেন। এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই সত্য স্বপ্ন দেখতেন। কখনো কখনো উপত্যকা দিয়ে চলার সময় গাছপালা ও পাথর থেকে আওয়াজ আসত: “আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ”। তিনি ফিরে তাকাতেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেতেন না। [৩]

## জিনদের আসমানি ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা:

তাঁর ওপর ওহী নাযিল শুরু হওয়ার আগেই ওহীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছিল। আগে জিন ও শয়তানরা আসমানের কাছাকাছি গিয়ে ফেরেশতাদের প্রাপ্ত নির্দেশ ও খবরের কিছু অংশ আড়ি পেতে শুনে নিত। তারা এসে এই খবরগুলো তাদের গণক ও জাদুকরদের শোনাত এবং তারা একটি সত্যের সাথে দশটি মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের ওপর নিজেদের কাল্পনিক গায়েবি জ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করত। আল্লাহর শেষ কিতাব নাযিলের আগে জিনদের আসমানের কাছে আসা এবং আড়ি পেতে শোনার ওপর পাহারা বসানো হলো। যদি কোনো জিন আগের মতো সেদিকে অগ্রসর হতো, তবে উল্কাপিণ্ড (শিহাব-ই-সাকিব) তাকে ধাওয়া করত।

এই পরিস্থিতির কারণে জিনরাও বুঝতে পেরেছিল যে, অচিরেই কোনো বড় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। একজন গণকের বর্ণনা (যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) যে, আমার কাছে একজন নারী জিন আসত। একদিন সে আতঙ্কিত অবস্থায় উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগল: اَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَاِبْلَاسَهَا . وَيَاْسَهَا مِنْ بَعْدِ اِنْكَاسِهَا . وَلُحُوْقَهَا بِالْقِلَاصِ وَاَحْلَاسِهَا (তুমি কি জিনদের এবং তাদের বিস্ময়কে দেখনি? তাদের হতাশা ও বিপর্যয়কে এবং তাদের উটনীর পিঠে লেপ্টে থাকাকে?) [৪] যেন এই মহাজাগতিক পরিবর্তনগুলো জিনদেরও এই অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছিল যে, শেষ যমানার নবী ﷺ-এর আবির্ভাব নিকটবর্তী। রহমতের বৃষ্টির আগে যেমন বাতাস থেমে যায়, তেমনি ওহী নাযিলের আগে মনে হচ্ছিল যেন মহাবিশ্ব দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৬

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৬২৫০, কিতাবুল ফাদায়িল

[৩] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/২৪৩... এই যুগে কিছু পাথর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করত যা তিনি পরেও চিনতে পারতেন। (সহীহ মুসলিম, হা: ৬০৭৮, কিতাবুল ফাদায়িল)। এই আলামতগুলোকে সীরাত লেখকদের নিকট “ইরহাসাত” হিসেবে অভিহিত করা হয়।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮৬৬, বাব ইসলাম উমর ইবনুল খাত্তাব

## প্রথম ওহী (১ম নবুওয়াতী বর্ষ):

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে দূরে হেরা গুহাকে নিজের নির্জনবাসের জন্য পছন্দ করে নিয়েছিলেন। আপনার বয়সের চল্লিশতম বছর ছিল যখন একদিন হঠাৎ একজন ফেরেশতা আপনার ﷺ সামনে উপস্থিত হলেন।

ইনি ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, যিনি আল্লাহর নির্দেশে শেষ রিসালাত এবং সারা বিশ্বের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অর্পণ করতে এসেছিলেন। তিনি এসেই নিজের পরিচয় দিলেন এবং বললেন: "হে মুহাম্মদ! আমি জিবরাঈল এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।"

---

[১] ওহী নাযিলের সূচনার তারিখ সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহে মতভেদ রয়েছে এবং এই বিষয়ে পঞ্জিকার হিসাব-নিকাশেও মতপার্থক্য চলে আসছে। এর ওপর ঐকমত্য রয়েছে যে, ওহী নাযিলের প্রথম দিনটি ছিল সোমবার। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে: "সুনিল আন সাওমিল ইসনাইন ফাকালা: ফিহি উলিদতু ওয়া ফিহি উনযিলা আলাইয়্যা।" (সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮২০, কিতাবুস সাওম, বাবু ইসতিহবাব সাওমি সালাসাতি আইয়্যামিন মিন কুল্লি শাহর)। এর ওপরও ঐকমত্য রয়েছে যে, নবুওয়াতের সময় আপনার বরকতময় বয়সের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। সুনানে তিরমিযীর একটি সহীহ রেওয়ায়েতে আছে: "বা'আসাহুল্লাহু তা'আলা আলা রা'সি আরবাঈনা সানাহ।" (অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিসও এটি বর্ণনা করেছেন)। এটিও স্থিরীকৃত যে, নবুওয়াত হিজরতের তেরো বছর আগে হয়েছিল। মাস ও তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো রবিউল আউয়াল মাস। কারণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত হলো: "উনযিলা আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া হুয়া ইবনু আরবাঈন।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাবআসিন নাবী)। যেহেতু প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আপনার জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল, তাই চল্লিশ বছর পূর্ণ হতে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই নির্ধারিত হয়। ১২ই রবিউল আউয়াল সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি ওজনদার দলিল হলো: "ওয়ালিদা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাল ফীল ইয়াওমাল ইসনাইন আস-সানি আশারা মিন রবিউল আউয়াল, ওয়া ফিহি বুইসা, ওয়া ফিহি উরিজা বিহি ইলাস সামায়ি, ওয়া ফিহি হাজারা, ওয়া ফিহি মাতা।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/৫৩, ৩/৫; বা-ইসনাদে ইবনে আবি শায়বা)। ডক্টর মুহাম্মদ হামিদুল্লাহর মতে নবুওয়াতের বছর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হতে পারে না, তাই তিনি নবুওয়াতের তারিখ ১৭ই রবিউল আউয়াল নির্ধারণ করেছেন। জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তিনি এই ভিত্তিতে ৯ই রবিউল আউয়াল গ্রহণ করেছেন। (রাহমাতুল্লিল আলামীন, ১/৪৯, ২/২৪২)। কিন্তু অন্যান্য পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞদের মতে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারই পড়ে এবং ওহী নাযিলের তারিখ (تقویمِ عہدِ نبوی، محمد علی خان، ص ۸۰) এই বিশেষজ্ঞগণ নবুওয়াতের ঈসায়ী তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ নির্ধারণ করেছেন।

একটি দলের মতে নবুওয়াত রমজান মাসে হয়েছিল এবং জন্মও রমজান মাসে হয়েছিল। রমজানে জন্মের স্বপক্ষে দলিল হলো আপনার জন্ম শরীফের আলোচনায় টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশেষজ্ঞগণ সহীহ বুখারীর সেই রেওয়ায়েতকে দলিল হিসেবে পেশ করেন যাতে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র পঞ্জিকা অনুযায়ী চল্লিশ বছর পূর্ণ হতেই রমজান মাসে ওহী নাযিল শুরু হয়। নবুওয়াত রমজানে হওয়ার ব্যাপারে তাদের দলিল হলো এই আয়াতগুলো: "শাহরু রামাদানাল্লাজি উনযিলা ফিহিল কুরআন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫); "ওয়ামা আনযালনা আলা আবদিনা ইয়াওমাল ফুরকানি ইয়াওমাত তাকাল জামআন।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪১)। 'ইয়াওমাল ফুরকান' দ্বারা বদরের দিন উদ্দেশ্য যা ১৭ই রমজান ছিল এবং "ওয়ামা আনযালনা আলা আবদিনা"-এর অর্থ হলো 'ইয়াওমুল ফুরকান' অর্থাৎ ওহী নাযিলের দিন। সুতরাং ওহী নাযিলের তারিখ ১৭ই রমজান। (দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৩৩২)। হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. রবিউল আউয়ালের মতকে প্রসিদ্ধ বলেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৫)। এটি ইবনে ইসহাকের মতেও সঠিক মত। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩০১)। ওয়াকিদী ও ইমাম বাকের থেকে একটি রেওয়ায়েতে ১৭ই রমজান সোমবার হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১২)।

যেখানে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উল্লিখিত মতের সম্পর্ক রয়েছে, হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. একে দুর্বল আখ্যা দিয়ে এর দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত ও মতসমূহ সামনে রেখে উলামায়ে কেরাম পঞ্জিকার হিসাবের মাধ্যমে আরও কিছু সম্ভাব্য সুরত পেশ করেছেন, যার মধ্য থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত সুরত বেছে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিছু সুরতকে নিলে নবুওয়াত ও হিজরতের মধ্যবর্তী সময় তেরো বছরের পরিবর্তে চৌদ্দ বছর হয়ে যায়। যেমন ৯ ফেব্রুয়ারি ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের সুরত গ্রহণ করলে সময় তেরো বছর সাত মাস হয়ে যায়। যেখানে ঐকমত্য হলো এই সময় তেরো বছর। কিছু সুরত গ্রহণ করলে বুখারীর রেওয়ায়েত "বা'আসাহুল্লাহু আলা রা'সি আরবাঈনা সানাহ"-এর সাথে সামঞ্জস্য থাকে না। মোটকথা এমন কোনো সুরত নেই যা উল্লিখিত সমস্ত শর্তাবলীকে পূর্ণ করে এবং সব ধরণের জটিলতা দূর করে।

লেখকের মতে নবুওয়াতের ব্যাপারে যদি ১৯শে আগস্ট ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের মত গ্রহণ করা হয়, তবে সমস্ত জটিলতা দূর হয়ে যায় (এটি হিজরত সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী ১৩ বছর ৪ মাস)। এই মত গ্রহণের কারণসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) জন্ম শরীফের তারিখ রমজান নয় বরং ৯ই রবিউল আউয়াল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল। (২) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে ওহী নাযিলের সময়কাল উদ্দেশ্য। এখন দেখলে ১৯শে আগস্ট ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে রমজানের ৯ তারিখ সোমবার পড়ে, এই হিসেবে ওহী নাযিলের সমস্ত রেওয়ায়েত এই তারিখের সাথে মিলে যায়: (ক) সোমবারের দিন নবুওয়াতের দলিল। (খ) রমজান মাসে নবুওয়াতের দলিল। (গ) যার মধ্যে "ইবনু আরবাঈন" বা "আলা রা'সি আরবাঈনা সানাহ"-এর উল্লেখ আছে। (ঘ) নবুওয়াত থেকে হিজরতের ১৩ বছর সময়ের উল্লেখ আছে। রবিউল আউয়ালে নবুওয়াতের রেওয়ায়েতসমূহ মুহাম্মদ আলী খান মরহুমের তাহকীক অনুযায়ী ১৯শে আগস্ট ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের তৃতীয় ক্যালেন্ডার "শামসী কামারী রবি" এর ৯ই রবিউল আউয়ালের সাথে হুবহু মিলে যায়। এভাবে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত মত ও রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় হয়ে যায়। ওয়াল্লাহু আলামু বিস-সওয়াব।

তারপর ফেরেশতা আপনার সামনে ‘সূরা আল-আলাক’-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

“পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব অতি দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।” [১]

এটি ছিল প্রথম আসমানী বার্তা যা নবী আখেরুজ্জামান ﷺ-এর মাধ্যমে শেষ উম্মতকে দেওয়া হচ্ছিল, যা জানাচ্ছিল যে এই শেষ রাসূলের উম্মতের জন্য পড়া-লেখা করা, রবের যিকির করা, তাঁর সৃষ্টিশক্তির ওপর চিন্তা করা, তাঁর রহমতের ওপর বিশ্বাস রাখা, ইলমকে নিজের যোগ্যতার ভিত্তি বানানো এবং কলমের মাধ্যমে ইলমকে বিকশিত করা হবে মৌলিক সংবিধান।

**পৃথিবীতে ইলম ও কলমের ধারণা:**

এটি এমন এক সময় ছিল যখন বিশ্বের সভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও কলমের মহত্ত্বের কোনো বিশেষ ধারণা ছিল না। প্রাচ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, চীনে তখন তাং বংশের প্রতিষ্ঠাতা লি ইউয়ান শাসন করছিলেন। এরপর তাই শং আসেন, যিনি ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। হিন্দুস্তানে মহারাজা হর্ষবর্ধন ক্ষমতায় ছিলেন, যার শাসনকাল ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, কিন্তু প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই সব বড় বড় কেন্দ্রেও ইলমের ধারণা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। ভাস্কর্য, নাচ-গান এবং ধ্যান ও দম সাধনা কলমের ওপর প্রাধান্য পেত। আফ্রিকার উত্তর ও পশ্চিমে অসভ্য বারবার উপজাতিদের আধিপত্য ছিল যারা মূর্তিপূজার অভিশাপে লিপ্ত ছিল। পাশ্চাত্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সেই সময়ে ব্রিটেন অ্যাংলো-স্যাক্সন উপজাতিদের রাজাদের অধীনে ছিল যার শাসক কিং এডবার্ন ৬০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। কিন্তু ব্রিটেনের এই সময়টি ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম অনগ্রসরতা এবং ইলম থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়ার কাল। স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে আধা-যোদ্ধা উপজাতিদের রাজত্ব ছিল যারা প্রায়ই ব্রিটেনে লুটতরাজ চালাত। ফ্রান্সে রাজা ড্যাগবার্ট প্রথম (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তার পতনোন্মুখ রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করতে পারেননি। ইতালিতে গথ (Goth) বংশের শাসক সাইবার্ট ক্ষমতাসীন ছিলেন যার আমলে বিশেষ করে ইহুদিদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মূর্খতার জয়জয়কার ছিল। ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে নরম্যান, সুইডিশ, স্লাভিক এবং ক্রিশ্চিয়ানদের মতো মূর্খ ও অসভ্য উপজাতিদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। [২]

সংক্ষেপে, যে ইউরোপ কয়েক শতাব্দী পর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ইমামতির দাবিদার হয়েছিল, সেই সময় ইলম, লিখন এবং কলমের সাথে তাদের দূরতম কোনো সম্পর্কও ছিল না। এমন সময়ে আরবের মতো অন্ধকার কোণে নূরের প্রথম কিরণের ‘ইকরা’, ‘ইলম’ এবং ‘বিল কলম’-এর মতো ধারণা নিয়ে আবির্ভূত হওয়া বিশ্ব ইতিহাসের এক বিস্ময়ই ছিল। নিঃসন্দেহে এটি ছিল এমন এক বিপ্লবের ভূমিকা যা মানব সমাজ...

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩, বাব কাইফা কানা বাদউল ওহী; সীরাতে ইবনে ইসহাক: ১/ ১২৭, ত. দারুল ফিকর

[২] মিরআতুল আলামীন: ১/ ৫১; মাজাল্লাতুস সীরাহ, রমজান ১৪২৩ হি., পৃ. ৯১ থেকে ৯৩, প্রবন্ধ প্রফেসর নিসার আহমদ

এর সংশোধনের জন্য পড়া, শিক্ষা দেওয়া এবং কলমের শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন।

**দায়িত্বের গুরুভার:**

যখন ফেরেশতার কাছ থেকে এই বার্তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে পৌঁছালেন, তখন ভয় ও আতঙ্ক এবং এক অত্যন্ত গুরুদায়িত্বের অনুভূতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর কাঁপছিল। আপনার মনে হচ্ছিল যে, হয়তো এই কাজের চিন্তা ও বোঝায় প্রাণই বেরিয়ে যাবে।
আপনি ﷺ ঘরে পৌঁছেই আপনার সম্মানিতা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন:
“আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও!! আমি নিজের জীবনের আশঙ্কা করছি।” [১]

স্ত্রীর জিজ্ঞাসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি তাঁর মহান স্বামীর অবস্থা দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন: “আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের খেয়াল রাখেন, সর্বদা সত্য কথা বলেন, আমানতদার, অন্যের উপকারে আসেন, মেহমানদারি করেন এবং সত্যের পথে আসা বিপদ-আপদে সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণিত হন।”

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতেন, যাতে এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা নেওয়া যায়।
তিনি এই ঘটনা শুনেই বললেন: “আল্লাহর কসম! আপনি এই উম্মতের নবী। এটি সেই ফেরেশতা যিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। দেখবেন এমন এক সময় আসবে যখন আপনার কওম আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কষ্ট দিয়ে এই শহর থেকে বের করে দেবে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন যে, কুরাইশরা যারা আমাকে সাদিক ও আমিন বলেন, তারা আমার সাথে এমন আচরণও করতে পারে। আপনি ﷺ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: “এই লোকেরা আমাকে বের করে দেবে?” ওরাকা বললেন: “হ্যাঁ, যখনই কোনো নবী এমন বার্তা নিয়ে এসেছেন, তাঁর কওম তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। যদি আমার জীবনে সেই সময় আসে, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করব।” [২]

**ওহী বন্ধ থাকা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অস্থিরতা:**

এই ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফেরেশতা পুনরায় ওহী নিয়ে আসেননি। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে মক্কার উপত্যকা ও পাহাড়গুলোতে ঘুরে বেড়াতেন, কোনো মুহূর্তেই শান্তি পেতেন না। খোদা আপনার কাছে কী চান? এই মহান দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে হবে? কিছুই জানা ছিল না। এই বিস্ময় ও উদ্বেগের অবস্থায় মাঝে মাঝে একটি গায়েবী আওয়াজ আসত: “নিশ্চয়ই আপনি সত্য রাসূল।” তখন আপনি কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন। অবশেষে এই আয়াতগুলো নাযিল হলো:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

“হে চাদর আবৃতকারী! উঠুন এবং সতর্ক করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন।” [৩]

---

[১] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নবুওয়াত প্রাপ্তি শীতকালে হয়েছিল, অন্যথায় গ্রীষ্মকালে সাধারণত গরম কাপড় ব্যবহৃত হয় না। এটি কাইতানির মতকে সমর্থন করে।

[২] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ৩, অধ্যায়: ওহী শুরুর সূচনা।

[৩] সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ১ থেকে ৩।

গোপন দাওয়াত (নবুওয়াতের ১ম থেকে ৩য় বছর):

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন তিনি কাজের একটি কর্মপরিকল্পনা পেয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিলম্ব না করে দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন শুরু করেন এবং শুরুতে নিজের ঘর ও নিজের স্ত্রী থেকে এর সূচনা করেন। হযরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম এই সত্য দ্বীন কবুল করেন। হযরত আলী (রা.)-ও, যার বয়স তখন দশ বছর ছিল, তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-ও কোনো দ্বিধা ছাড়াই ইসলামে দীক্ষিত হন।

এই তিনজন তো ঘরের সদস্য ছিলেন। বাইরের পরিচিতদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বন্ধু সাইয়্যিদুনা আবু বকর বিন আবু কুহাফা (রা.) তাঁর দাওয়াতে সর্বপ্রথম সাড়া দেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম। তিনি নিজেও একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি তাঁর পরিচিতদের ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। [১]

**ইসলামের দাওয়াত কী ছিল?**

ইসলামের এই প্রাথমিক দাওয়াত কেবল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে ছিল। তাওহীদ ও রিসালাত ছিল সেই মৌলিক বার্তা যার মাধ্যমে এই মহান দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ ছিল: "মহাবিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ, সমস্ত বিষয়ের মালিক আল্লাহ; সাফল্য ও ব্যর্থতা, রোগ ও আরোগ্য, জীবন ও মৃত্যু সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে। সবকিছু তাঁর নির্দেশেই হয়। তাঁর নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়া সৃষ্টিজগত কিছুই করতে পারে না। মূর্তি এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত দেবী-দেবতাদের কোনো ক্ষমতা নেই। সবকিছু করার ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা কেবল আল্লাহরই, তাই ইবাদতও কেবল তাঁরই হওয়া উচিত।"

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর অর্থ ছিল: "মুহাম্মদ আল্লাহর শেষ রাসূল, তাঁর বলা সমস্ত কথার ওপর বিশ্বাস রাখা জরুরি। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা নিহিত এবং তাঁর শিক্ষার বিরোধিতার মধ্যে উভয় জগতের ক্ষতি রয়েছে।"

যেহেতু মক্কার মুশরিকি পরিবেশে এটি একটি অপরিচিত আওয়াজ ছিল এবং কুরাইশ নেতাদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধের আশঙ্কা ছিল, তাই শুরুতে দাওয়াতের কাজ গোপনীয়ভাবে করা হয়েছিল। সত্যের সন্ধানী আত্মারা এই বার্তা শোনার সাথে সাথেই অনুভব করলেন যেন তারা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দাওয়াতে উসমান বিন عفان (আফফান), জুবায়ের বিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর মতো অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঈমান আনেন। [২] দাওয়াতে কোনো গোত্র বা বংশের ভেদাভেদ ছিল না, বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছিল যার মধ্যে সত্য গ্রহণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এই কারণেই যেখানে আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ, আরকাম বিন আবি আরকাম, উবাইদাহ বিন হারিস, উসমান বিন মাজউন এবং সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর মতো কুরাইশ যুবকরা ইসলাম গ্রহণ করেন, সেখানে এই গোপন বার্তার আওয়াজ মক্কার দুর্বল ও নিঃস্ব মানুষ এবং দাসদের কাছেও পৌঁছে যায়। [৩]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/ ২৪০ থেকে ২৪৯

[২] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/ ২৫০ থেকে ২৫২

[৩] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/ ২৫২ থেকে ২৫৩

উমাইয়া বিন খালাফের হাবশী গোলাম বিলাল বিন রাবাহ (রা.) কালিমা পড়ে নিলেন। খাব্বাব বিন আল-আরাত (রা.), যিনি একজন সম্পদশালী মহিলার গোলাম ছিলেন এবং কামারের কাজ করতেন, ইসলাম গ্রহণ করলেন। সুহাইব রূমী (রা.), যিনি একজন অ-আরব যুবক ছিলেন, ইসলামে দীক্ষিত হলেন। ইয়াসিরের পরিবার, যারা অত্যন্ত নিঃস্ব ছিল, শুরুতেই মুসলমান হয়ে গেল; এতে হযরত ইয়াসির, তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া এবং তাঁদের পুত্র আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এক যুবক ছিলেন এবং উকবা বিন আবি মুয়াইতের বকরি চরাতেন; একবার জঙ্গলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর দেখা হলো এবং তাওহীদের দাওয়াত শুনেই তিনি কালিমা পড়ে নিলেন। [২]

কুরআন মাজীদের নাযিল হওয়া এখন ধারাবাহিকভাবে শুরু হলো। দাওয়াত-ই-ইসলামের এই প্রাথমিক দিনগুলোতেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সালাত শেখানো হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি ওযু করলেন এবং সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখালেন যে পবিত্রতা অর্জন এবং রবের ইবাদতের শরয়ী পদ্ধতি কী। রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যান্য মুসলমানদেরও একইভাবে ওযু ও সালাতের শিক্ষা দিলেন। [৩]

অন্যদিকে কুরাইশদের সরদার: আবু জাহল, নযর বিন আল-হারিস, আস বিন ওয়াইল, ওয়ালিদ বিন মুগীরা এবং উকবা বিন আবি মুয়াইত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই গোপন দাওয়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আপন চাচা আবু লাহাবও কিছু টের পায়নি।

## ইসলামে দাওয়াতের গোপনীয়তা ও সতর্কতা:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপন্থা ছিল এই যে, যারা উগ্র ও গোঁড়া লোক, তারা নিকটাত্মীয় হলেও তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হতো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইসলাম গ্রহণকারী সকল লোক এই সতর্কতা পুরোপুরি বজায় রাখতেন। যেহেতু আবু লাহাব চাচা হওয়া সত্ত্বেও উগ্র ও গোঁড়া মুশরিক ছিল, তাই তাকেও বেখবর রাখা হয়েছিল। এ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা এবং পরিকল্পনা করার সক্ষমতা আন্দাজ করা যায়।

বনু হাশিমের বড়দের মধ্যে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবু তালিব এই দাওয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তবে তাঁকে এই জ্ঞান এভাবে হয়েছিল যে, তিনি আকস্মিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে একটি উপত্যকায় লুকিয়ে সালাত আদায় করতে দেখে ফেলেছিলেন। তিনি ঈমান না আনা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী, রাজদার এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করেননি [৪], বরং নিজের দ্বিতীয় পুত্র জাফরকেও, যিনি হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্যে শামিল হওয়ার উৎসাহ দেন। এভাবে জাফর বিন আবি তালিব (রা.)-ও “আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন” (শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারীদের) মধ্যে গণ্য হলেন। [৫]

---

[১] উসদুল গাবাহ, তারাজুম: বিলাল (রা.), খাব্বাব (রা.), ইয়াসির (রা.)।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩৫৯৮; আল-মু’জামুস সাগীর লিত-তাবারানী: ১/৩১০, ত: দার আম্মার; আল-ইসাবাহ, তরজমা: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৭৪৮০, ত: আর-রিসালাহ; সহীহ বুখারী, হা: ৫২১, কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাত।

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৭৭৬, ত: আর-রিসালাহ।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/২০৬, ত: আর-রিসালাহ; তারিখু দামেশক: ১৬৫/৫৩।

হযরত আব্বাসও এই দাওয়াত সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। তিনি এই দাওয়াতে লাব্বাইক বলেননি ঠিকই, তবে বিরোধিতাও করেননি; বরং যেখানেই সম্ভব হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। [১]

ধীরে ধীরে কুরাইশদের অনেক সর্দার তাওহীদের এই বার্তার কথা জানতে পারল, যা তাদের মূর্তিপূজার পরিপন্থী ছিল। [২] কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত এমন গোপনে চলছিল যে, উত্তেজনার কোনো সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছিল না। মুসলিম ও মুশরিকরা কোথাও একে অপরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াত না। কুরাইশ সর্দারদের নীরব থাকার একটি কারণ ছিল বনু হাশিমের প্রতি সম্মান। এছাড়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা মনে করত যে, এই বার্তা কেবল কিছু দুর্বল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তারপর নিজে নিজেই মিটে যাবে। সম্ভবত তারা এই দাওয়াতকে জাহেলিয়াত যুগের উমাইয়া ইবনে আবিস সালত এবং যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের ধর্মীয় চিন্তাধারার সাথে তুলনা করেছিল, যারা ইলাহিয়াত বা ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এক মাবুদের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত সেই পূর্ববর্তী সংস্কারকদের কল্পনাপ্রসূত চিন্তার তুলনায় অপরিসীম শক্তির অধিকারী ছিল।

**আবু যর গিফারী ইসলাম গ্রহণ করলেন:**

কাবাঘরের কারণে মক্কা ছিল মানুষের মিলনস্থল, যেখানে বিদেশি দর্শনার্থীদের যাতায়াত লেগেই থাকত। সুযোগ বুঝে এই মুসাফিরদের কাছেও দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ শুরু করা হলো। তাদের মাধ্যমে ইসলামের খবর খুব দ্রুত দূর-দূরান্তের অঞ্চলে পৌঁছে গেল এবং সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল দু-একজন মানুষ মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। মক্কার সর্দাররা প্রথমবারের মতো সজাগ হলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যারা দেখা করতে আসত তাদের ওপর নজর রাখতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও নতুন লোকদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলেন।

সেই দিনগুলোতে ডাকাতদের গোত্র গিফারের এক যুবক আবু যর গিফারী, যিনি মূর্তিপূজা থেকে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তার ভাইয়ের কাছ থেকে একজন নতুন নবী এবং নতুন দ্বীনের খবর শুনলেন। তিনি সরাসরি মক্কায় পৌঁছালেন। তিনি জানতেন যে, নবুওয়াতের দাবিদার যুবকের সাথে সাক্ষাৎ করা বিপদ ডেকে আনার শামিল, তাই তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করে অপেক্ষা করতে লাগলেন যেন কোনো একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখা পান। অবশেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন: “কোথাকার লোক?”
তিনি বললেন: “গিফার গোত্রের।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বিস্ময় ও আনন্দে নিজের কপালে হাত রাখলেন। আবু যর গিফারী ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গোপন রাখার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু ফিরে যাওয়ার আগে তিনি মসজিদে হারামের দিকে গেলেন এবং মক্কাবাসীদের জনাকীর্ণ সমাবেশে প্রকাশ্যে তাওহীদের বাণী উচ্চকিত করলেন।

---

[১] হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নওমুসলিম হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হারামে কুরাইশদের হাত থেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম এই পুরো ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হা: ২৫১৬, ২৫১৩)। এটি এর প্রমাণ যে, হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের গোপন দাওয়াত সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করত তাদের সাহায্যকারী ছিলেন।

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/২৬২, দালায়েলুন নুবুওয়াহ: ২/৪৫।

এটি ছিল হকের প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগান যা কুরাইশরা মোটেও সহ্য করতে পারেনি এবং তারা এই নিঃস্ব দরবেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত আব্বাস (রা.) এটি দেখে দ্রুত এগিয়ে এলেন এবং এই বলে লোকদের পেছনে সরিয়ে দিলেন:

“হে দুর্ভাগারা! এই ব্যক্তি (ডাকাতদের গোত্র) গিফারের লোক। তোমাদের সিরিয়াগামী কাফেলাগুলো এদের এলাকা দিয়েই যাতায়াত করে।”

লোকেরা এই ভেবে সরে গেল যে, ডাকাতদের প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের ব্যবসা যেন বিপদে না পড়ে।

পরের দিন এই মুজাহিদ পুনরায় একইভাবে মসজিদে হারামে কালিমায়ে তাওহীদ উচ্চকিত করলেন, মার খেলেন এবং হযরত আব্বাস (রা.) তাঁকে রক্ষা করলেন।

আবু যর (রা.) নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে প্রথমে তাঁর মা ও ভাইকে দাওয়াত দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। এরপর পুরো গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং দেখতে দেখতে ডাকাতদের এই পুরো গোত্রটি মুসলমান হয়ে গেল। [১]

একইভাবে বনু বাজিলার আমর ইবনে আবাসা (রা.)-ও নিজ এলাকা থেকে বের হলেন, উকাযের মেলায় হুজুর (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে গেলেন। হুজুর (সা.) তাঁকে এই নির্দেশনা দিলেন যে, যখন আমাদের বিজয়ী হওয়ার খবর শুনবে তখন পুনরায় আসবে। [২]

তিন বছর পর্যন্ত দাওয়াতের গোপন ধারা অব্যাহত ছিল। হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা.)-এর ঘর, যা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল, তা ছিল এই মহান সংগ্রামের প্রথম কেন্দ্র। [৩]

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৫১৩, ২৫১৬, কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব ফাযায়িলে আবু যর গিফারী (রা.), ত: দারুল জীল; আল-ইসাবাহ, ল: আবু যর গিফারী (রা.)

[২] আল-ইসাবাহ, ল: আমর ইবনে আবাসা (রা.); আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৬৫৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/৩৫৬, ৩৫৭

[৩] উসদুল গাবাহ, ল: আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা.)

https://t.me/BoierSomahar

## তাওহীদের ঘোষণা এবং ঈমানদারদের পরীক্ষা

তিন বছর পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এখন ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ অর্থাৎ আপনার নিকটাত্মীয়দের (শিরকের পরিণাম সম্পর্কে) সতর্ক করুন (এবং তাদেরকে তাওহীদের বাণী শুনিয়ে দিন)। [১]

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ঘরের লোকজন ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে দাওয়াত দিলেন, একেকজনকে সম্বোধন করলেন এবং বোঝালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "হে আমার ফুফু সাফিয়া! হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চিন্তা করো; কারণ কাল আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের কোনো কাজে আসব না।" [২]

এই কাজটি বিশেষ ব্যক্তি এবং বন্ধুদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নিজের বংশ বনু হাশিমের সমস্ত সদস্যকে দাওয়াত দিলেন। তাদের মধ্যে তাঁর চাচা আবু তালিব, আব্বাস, হামজা এবং আবু লাহাবসহ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন লোক একত্রিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামান্য গোশত, দুধ এবং রুটি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করলেন। অলৌকিকভাবে সবাই খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন:

"মানুষ তার পরিবারের লোকদের সাথে মিথ্যা বলে না। সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আমি সবার জন্য আল্লাহর রাসূল এবং আপনাদের জন্য বিশেষভাবে। হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানরা! নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তি তার কওমের কাছে এর চেয়ে উত্তম কোনো কথা নিয়ে আসেনি যা আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি। আমি দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের বার্তা নিয়ে এসেছি। আল্লাহর কসম! আপনারা যেভাবে ঘুমান, সেভাবেই একদিন অবশ্যই মারা যাবেন এবং যেভাবে আপনারা জাগ্রত হন, সেভাবেই একদিন হিসাব-নিকাশের জন্য জীবিত করা হবে এবং সেখানে নিজেদের আমলের প্রতিদান অবশ্যই পাবেন। নিশ্চয়ই জান্নাতের ঠিকানা চিরস্থায়ী এবং জাহান্নামে থাকাও চিরস্থায়ী হবে।"

এটি শুনে আবু তালিব উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেন, কিন্তু জেদি ও অহংকারী আবু লাহাব অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করল এবং এই বার্তার তীব্র বিরোধিতা করল। [৩]

---

[১] সূরা আশ-শুআরা: আয়াত ২১৪

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/ ৯৭, ৯৮ দার হিজর

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/ ১০১-১০৩ দার হিজর

প্রকাশ্য দাওয়াত (৩ নবুওয়ী):

কিছু দিন পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো, ওহী নাযিল হলো:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

"আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিন এবং মুশরিকদের মোটেও পরোয়া করবেন না।" [১]

তখনই রাসূল ﷺ সাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন এবং ডাক দিলেন: "ইয়া সাবাহাহ!" আরবে এই স্লোগান তখন দেওয়া হতো যখন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা মাথার ওপর চলে আসত। দেখতে দেখতে কুরাইশদের পুরো গোত্র সেখানে সমবেত হয়ে গেল। রাসূল ﷺ বললেন:

"হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! হে বনী ফিহর! হে বনী কাব! আমি যদি তোমাদের সংবাদ দিই যে, এই পাহাড়ের পেছনে একটি বাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?"

রাসূল ﷺ-এর সত্যবাদিতার ওপর মানুষের এতই বিশ্বাস ছিল যে, সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল: "হ্যাঁ! আমরা বিশ্বাস করব।"

তখন রাসূল ﷺ বললেন: "আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি যা তোমাদের একেবারে সামনেই রয়েছে।"

এটি শুনে কুরাইশরা স্তব্ধ হয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে আবু লাহাব উত্তেজিত হয়ে বলল:

"تَبًّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟"

"তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এজন্যই আমাদের ডেকেছিলে।" (নাউযুবিল্লাহ)

এরপর সবাই রাগান্বিত দৃষ্টিতে ফিরে গেল। [২]

আবু লাহাবের ধৃষ্টতার জবাব। সূরা লাহাব নাযিল হওয়া:

আবু লাহাবের এই ধৃষ্টতার জবাবে সূরা লাহাব নাযিল হলো এবং কুরআন মাজীদ তার "তাব্বাল-লাকা" বাক্যের জবাব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ ভঙ্গিতে এভাবে দিল:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

(আবু লাহাবের হাত দুটি ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।)

এই মুজিযাপূর্ণ শৈলীর জবাব আবু লাহাবকে পুরো মক্কায় লাঞ্ছিত করে দিল। সে রাগান্বিত হয়ে তার দুই ছেলে উতবা ও উতাইবাকে নির্দেশ দিল যেন তারা রাসূল ﷺ-এর কন্যাদের: রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে দেয়। এই দুই সাহেবজাদী তাদের সাথে বিবাহিত ছিলেন, কিন্তু তখনও বিদায় (রুখসতী) হয়নি। আবু লাহাবের ছেলেরা পিতার আদেশে রাসূল ﷺ-এর কন্যাদের তালাক দিয়ে দিল। [৩]

---

[১] সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯৪

বর্ণনাগুলোতে এই ঘটনার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নেই, শুধু এতটুকু জানা যায় যে নবুওয়াতের তিন বছর পূর্ণ হয়েছিল। যেসব মহোদয়ের মতে নবুওয়াত রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল, তাদের মতে এই ঘটনা ঠিক তিন বছর পর রবিউল আউয়ালের এবং যাদের মতে রমযানে হয়েছিল, তাদের মতে এই ঘটনা রমযানের হওয়া উচিত। যেহেতু হাফেজ ইবনে কাসীর রমযানে নবুওয়াত লাভকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন (এবং আমরা সেটিই গ্রহণ করেছি), তাই এই মত অনুযায়ী এই ঘটনাটিও ৩ নবুওয়ীর রমযান মাসের।

[২] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, আয়াতের তাফসীর: তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব

[৩] উসদুল গাবাহ, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম-এর জীবনী আলোচনায়।

**আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর কষ্টদান:**

এর পর থেকে আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামিল নবী আকরাম ﷺ-কে সব ধরনের কষ্ট দিতে উঠেপড়ে লাগল। আবু লাহাবের ঘর নবী ﷺ-এর ঘরের কাছেই ছিল, তাই আপনি সবসময় তার অনিষ্টের লক্ষ্যবস্তু হতেন। উম্মে জামিল রাতে নবী ﷺ-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। আবু লাহাব তার ঘরের সমস্ত আবর্জনা (নবী ﷺ-এর ঘরের দরজায়) ফেলে দিত। নবী ﷺ-এর ঘরের অপর পাশে আপনার দ্বিতীয় শত্রু উকবা ইবনে আবি মুআইত থাকত। তারও নিয়ম ছিল যে নবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য নিজের ঘরের ময়লা আপনার দরজায় ফেলে যেত। [১] নবী আকরাম ﷺ বলতেন:

“আমি দুই নিকৃষ্টতম প্রতিবেশীর মাঝে থাকতাম: আবু লাহাব এবং উকবা ইবনে আবি মুআইত।” [২]

আবু লাহাব সবসময় নবী আকরাম ﷺ-এর সন্ধানে থাকত যে আপনি দাওয়াতের জন্য কোন দিকে যাচ্ছেন। আপনি কাছে বা দূরে যেখানেই যেতেন, সে পিছু পিছু পৌঁছে যেত এবং নবী ﷺ-কে বিদ্রূপ করত। [৩]

**আবু তালিবের ওপর কুরাইশদের চাপ এবং নবী ﷺ-এর জবাব:**

কুরাইশদের অন্যান্য সরদাররাও এখন প্রকাশ্যে বিরোধিতায় নেমে এসেছিল এবং এই দাওয়াত ও তাওহিদকে দমন করার জন্য নানা ধরনের ফন্দি আঁটতে শুরু করেছিল। এই লোকেরা একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে আবু তালিবের কাছে এল এবং বলল: “আবু তালিব! আপনি আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করুন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিন্দা এবং আমাদের উপাস্যদের দোষারোপ আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি তাকে থামান নতুবা আমরা আপনার সাথে এবং তার সাথে বোঝাপড়া করে নেব।”

আবু তালিব ঘাবড়ে গেলেন এবং নবী আকরাম ﷺ-কে একান্তে ডেকে কুরাইশদের দাবির কথা জানালেন এবং বললেন:

“আমার এবং নিজের জীবনের কথা চিন্তা করো, আমার ওপর এত বোঝা চাপিয়ে দিও না যা আমি বহন করতে পারব না।”

নবী আকরাম ﷺ বুঝতে পারলেন যে চাচা প্রচণ্ড চাপের মুখে আছেন এবং তিনি হয়তো আর আপনাকে সমর্থন করতে পারবেন না, কিন্তু নবী আকরাম ﷺ এই মহান দায়িত্ব কীভাবে ছাড়তে পারতেন, যার ওপর মুক্তির ভিত্তি ছিল এবং যার প্রতি আপনার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি আবেগীয় টান ছিল? নবী আকরাম ﷺ বললেন: “চাচাজান! আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় যাতে আমি এই কাজ ছেড়ে দিই, তবুও আমি থামব না, যতক্ষণ না আল্লাহ এই দ্বীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি এই প্রচেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দিই।” এ কথা বলে নবী আকরাম ﷺ-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং আপনি কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে গেলেন।

আবু তালিব যখন এটি দেখলেন, তিনিও বিচলিত হয়ে পড়লেন, আপনাকে ফিরে ডাকলেন এবং বললেন:

“ভাতিজা! তোমার যা মন চায় বলো, যেভাবে চাও দাওয়াত দাও। আমি তোমাকে কখনো একা ছাড়ব না।” [৪]

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা আল-লাহাব; আখবারু মক্কা লিল-ফাকিহি: ৩/৩৮৫, ত: দার খিজর।

[২] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/৩৩৭, আল-ইলমিয়্যাহ।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১০৬, দার হিজর।

[৪] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/২৬৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১০২, দার হিজর।

## সাহাবায়ে কিরামের ওপর জুলুম ও নির্যাতন

কুরাইশ সরদাররা যখন দেখল যে হুজুর আকদাস ﷺ দাওয়াত থেকে বিরত হচ্ছেন না এবং আবু তালিবও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়ছেন না, তখন তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বনু হাশিম গোত্রে হুজুর ﷺ-এর ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং আবু তালিবের মতো জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে তারা উপেক্ষা করতে পারছিল না, তাই নবী ﷺ-এর ওপর হাত তোলা সহজ ছিল না। কিন্তু সাধারণ মুসলমান, যাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র, তারা এখন তাদের ক্রোধ ও প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। কুরাইশদের প্রত্যেক সরদার নিজ নিজ গোত্রের সেই সব লোকদের ওপর নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানাতে শুরু করল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যারা দরিদ্র এবং অসহায় ছিল, তারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করেছে। খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দেওয়া হতো, যার ফলে তাঁর পিঠের চামড়া একেবারে পুড়ে গিয়েছিল। হযরত বিলাল হাবশী রাযিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়া ইবনে খালাফের গোলাম ছিলেন; সে তাঁকে মরুভূমির তপ্ত রোদে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখত। সে বলত যে মুহাম্মাদকে অস্বীকার করো এবং লাত ও উযযার উপাসনা করো, অন্যথায় এই অবস্থায় তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কখনো লোহার বর্ম পরিয়ে কড়া রোদে বসিয়ে রাখত। তিনি এই কষ্টের মধ্যেও বলতেন: “আহাদ! আহাদ!” (তিনি এক, তিনি এক)। কখনো তাঁর গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট ছেলেদের নির্দেশ দিত যেন তারা তাঁকে পুরো শহরে টেনে হিঁচড়ে বেড়ায়। [১]

বংশীয় দিক থেকে আম্মার বিন ইয়াসির, তাঁর পিতা ইয়াসির এবং মাতা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মক্কায় কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। কুরাইশ সরদাররা এই তিনজনকে ধরে মরুভূমিতে নিয়ে আসত এবং নিকৃষ্টতম নির্যাতনের শিকার বানাত। হুজুর ﷺ তাঁদের এই অবস্থায় দেখলে বলতেন: “হে ইয়াসিরের পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো। তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।”

হযরত ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিলেন, এই ক্রমাগত নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে একদিন ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর স্ত্রী হযরত সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহাকে অভিশপ্ত আবু জাহেল নিকৃষ্টতম কষ্ট দিয়ে বর্শার আঘাতে শহীদ করে ফেলে। তিনি ইসলামের প্রথম নারী শহীদ হিসেবে পরিচিত হন। [২] একইভাবে হযরত সুহাইব রুমী রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের মুক্ত করা গোলাম এবং বংশগতভাবে অনারব (আজমি) ছিলেন, মারধরের শিকার হতে থাকেন। তাঁকে এত বেশি মারা হতো যে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। [৩]

কুরাইশদের জুলুম এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে শরীফ, সম্পদশালী এবং সম্মানিত মুসলমানরাও তাদের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা পাননি। হযরত উসমান বিন আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর চাচা হাকাম বিন আবিল আস শক্ত করে বেঁধে ফেলেছিল এবং বলেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম না ছাড়বে ততক্ষণ তোমাকে মুক্ত করব না, কিন্তু তিনি সত্য দ্বীনের ওপর অটল রইলেন। [৪]

হযরত মুসআব বিন উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কার অত্যন্ত সম্পদশালী, প্রতিভাবান এবং বিলাসিতার মধ্যে বেড়ে ওঠা যুবক ছিলেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে একটি ছোট কামরায় বন্দি করে ফেলে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি বন্দিই থাকেন। [৫]

---

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩১৮; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/২৬; মুস্তাদরাকে হাকিম, হা: ৫২৩৮

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/১২৬, ৮/২৪৬, ত. সাদির

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/১৭, ২২

[৪] আল-মুনতাযাম: ৩/৩৩৫

[৫] আল-ইসতিয়াব: ৪/১৪৭৪

## হযরত সিদ্দিক আকবর (রা.)-এর ওপর জুলুম

সাইয়্যেদেনা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মক্কার অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, একইভাবে হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.)-ও শরীফদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যখন তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কুরাইশদের সরদার নওফেল বিন খুওয়াইলিদ উভয়কে ধরে একটি রশিতে বেঁধে ফেলেন এবং অনেক কষ্ট দেওয়ার পর ছেড়ে দেন। তখন থেকে এই দুজনকে "কারীনাইন" (দুই ঘনিষ্ঠ সাথী) বলা হতে থাকে। [১]

## হযরত সিদ্দিক আকবর (রা.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রাণের চেয়েও প্রিয়

একদিন সাইয়্যেদেনা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলে মুশরিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারতে মারতে তাঁকে বেহুঁশ করে দেয়। উতবা বিন রাবীআ তার মোটা তলাবিশিষ্ট পুরনো জুতো দিয়ে তাঁর চেহারায় লাথি মারতে থাকে। চেহারা এতটাই জখম হয়ে গিয়েছিল যে চেনা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে অর্ধমৃত অবস্থায় তুলে নিয়ে যায়, সবার বিশ্বাস ছিল যে তিনি আর বেঁচে থাকবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর জীবন অবশিষ্ট রেখেছিলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর জ্ঞান ফিরলে মুখ থেকে প্রথম যে বাক্যটি বের হলো তা হলো, "রাসূলুল্লাহ (সা.) তো ভালো আছেন তো?" যখন জানানো হলো যে তিনি ভালো আছেন, তখন তিনি বলতে লাগলেন:

"আমি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজে না দেখব, ততক্ষণ কিছু পানাহার করব না।"

অবশেষে তাঁর মা উম্মুল খায়ের এবং একজন আত্মীয় নারী উম্মে জামিল রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর তাঁকে সাহারা দিয়ে নবী আকরাম (সা.)-এর খিদমতে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর এই অবস্থা দেখে নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। হযরত আবু বকর (রা.)-ও কাঁদতে থাকলেন। তাঁর মা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। সাইয়্যেদেনা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর অনুরোধে নবী (সা.) তাঁর হিদায়াতের জন্য দুআ করলেন। দুআর প্রভাব এমনভাবে প্রকাশ পেল যে উম্মুল খায়ের (রা.) তখনই ঈমান নিয়ে আসলেন। এটি ছিল সেই দিনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জুলুম ও নির্যাতনের ওপর সবর করার নগদ প্রতিদান। [২]

## রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবমাননা

জুলুম ও নির্যাতনের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও ঈমানদাররা যখন নিজেদের দ্বীনের ওপর অটল থাকলেন, তখন কুরাইশ সরদারদের রাগ আরও বেড়ে গেল। এখন তারা নবী আকরাম (সা.)-কে মৌখিক কষ্টের পাশাপাশি শারীরিকভাবেও কষ্ট দেওয়ার সিলসিলা শুরু করে দিল। তারা শহরের বখাটেদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করল যে, যেখানেই নবী (সা.)-কে দেখবে, তাঁকে উত্ত্যক্ত করবে, তাঁকে লক্ষ্য করে কটু কথা বলবে, তাঁকে কবি, জাদুকর ও উন্মাদ বলবে এবং কষ্ট দেবে। ফলে এই সিলসিলা পূর্ণ দমে শুরু হয়ে গেল। নবী (সা.) এসব কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন; হৃদয়ের ব্যথা সীমা ছাড়িয়ে গেলে সান্ত্বনার জন্য ওহী নাযিল হতো।

একদিন নবী আকরাম (সা.) ঘর থেকে বের হলে সারাদিন এমনই কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো। এমনকি মক্কার গোলামরাও প্রকাশ্যে আপনার অবমাননা করল এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। নবী (সা.) অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ঘরে ফিরে আসলেন এবং চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

---

[১] "কারনাহুমা ফী হাবলিন ওয়াহিদ।" (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/২১৩, তারজামা: তালহা বিন উবাইদুল্লাহ)

[২] আল-ইসাবাহ, তারজামা: আবু বকর

গিয়ে, তখন ওহী নাযিল হলো এবং 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাসসির' বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহস বাড়ানো হলো। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের গালিগালাজ ও বিদ্রূপের জবাবে প্রায়ই নীরব থাকতেন, কিন্তু কখনো কখনো সবরের পেয়ালা উপচে পড়লে তিনি তাদের জানিয়ে দিতেন যে তারা নিজেদের জন্য ধ্বংসের সরঞ্জাম তৈরি করছে।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা তাওয়াফ করছিলেন, সে সময় মক্কার সর্দাররা কাবার ছায়ায় বসে ছিল। তিনি তাওয়াফ করতে করতে যখনই তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা তাঁকে নিয়ে উপহাস করছিল। তৃতীয় চক্করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে থামলেন এবং বললেন: "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা কি বিরত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়? শুনে রাখো, আমি তোমাদের জন্য ধ্বংসের খবর নিয়ে এসেছি।" এ কথা শুনে সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এবং তারা যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলতেন: "আল্লাহ অবশ্যই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন।" [২]

পরদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাওয়াফ করতে এলেন, তখন তারা তাঁকে ঘিরে ধরল এবং তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উকবা বিন আবি মুআইত পাপিষ্ঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গলায় চাদর পেঁচিয়ে এমনভাবে টান দিল যে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছিল এবং তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। সৌভাগ্যবশত হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি উকবা বিন আবি মুআইতকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন: "আ-তাকতুলুনা রাজুলান আইঁ ইয়াকুলা রাব্বিয়াল্লাহ?" (তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে কেবল এই কারণে হত্যা করছ যে সে বলে আমার রব আল্লাহ?) [৩]

এ কথা শুনে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ছেড়ে দিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; তাঁকে এত মারল যে তাঁর মাথা ফেটে গেল। [৪]

**আবু জাহেলের কারসাজি:**

কুরাইশদের উদীয়মান সর্দারদের মধ্যে আমর বিন হিশাম, যে আবু জাহেল উপাধিতে পরিচিত ছিল, সে ছিল নবী আকরাম ﷺ-এর সবচেয়ে বড় শত্রু। সে ছিল অত্যন্ত বাগ্মী, চতুর ও ধূর্ত। সে প্রায়ই অন্যদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবমাননায় উসকানি দিত এবং নিজে দূর থেকে তামাশা দেখত। মাঝেমধ্যে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রকাশ্যে অপমান করত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার কাছে নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন এই পাপিষ্ঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মাথায় পাথর মারার উদ্দেশ্যে দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে এল। আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে তাঁর নবীকে রক্ষা করলেন। সে একটি ভয়ংকর উট মুখ হাঁ করে থাকতে দেখল এবং ভয়ে পালিয়ে গেল। [৫]

কিন্তু এর পরেও সে তার কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয়নি। যখনই কুরাইশদের কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত বা ইসলামের দিকে ঝুঁকত...

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা লাকিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা। সম্ভবত এটি আয়াতটির দ্বিতীয়বার নাযিল হওয়া ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া, নতুবা এই আয়াত আগেই নাযিল হয়েছিল।

[২] সহীহ বুখারী, বাবু মা লাকিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা; উয়ুনুল আসার: ১/১৩০।

[৩] সহীহ বুখারী, বাবু মা লাকিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা।

[৪] সহীহ বুখারী, বাবু মা লাকিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়া আসহাবুহু মিনাল মুশরিকিনা বি মাক্কাতা।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৬৭, দারু হাজার।

দেখত তবে যদি সে কোনো প্রধান বা সর্দার হতো, তবে সে অত্যন্ত চতুরতার সাথে তাকে এভাবে সতর্ক করত: “তুমি তোমার পিতার ধর্ম ত্যাগ করছ অথচ তোমার পিতা তোমার চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন, তাই ভবিষ্যতে আমরা না তোমার চরিত্রের ওপর ভরসা করব, না তোমার মতামতের ওপর আস্থা রাখব আর না তোমার কোনো মান-মর্যাদা থাকবে।”

যদি কোনো ব্যবসায়ী হতো তবে তাকে এভাবে হুমকি দিত: “যদি তুমি মুসলমান হও তবে আমরা তোমার ব্যবসায় ক্ষতি করব এবং তোমার সম্পদ নষ্ট করে ছাড়ব।” আর যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত তবে আবু জাহেল সরাসরি ঘুষি, লাথি এবং লাঠি ব্যবহার করত। [১]

**নবুওয়াতের পরিবার আপনার পাশে পাশে:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াতি ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামে অত্যন্ত নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁর পারিবারিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। আপনি ﷺ আপনার বড় মেয়ে হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর খালাতো ভাই আবুল আস বিন রাবী-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বোন হালার ছেলে ছিলেন এবং বংশের একজন ব্যবসায়ী ও ভদ্র যুবক ছিলেন, যদিও তখনো ঈমান আনেননি কিন্তু সেই সময়ে যখন ঈমান আনয়নকারী মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন, এর চেয়ে উত্তম কোনো সম্বন্ধ আর ছিল না। মুশরিকদের সাথে বিবাহের ব্যাপারে তখন পর্যন্ত কোনো শরয়ি বিধান আসেনি।

দ্বিতীয় মেয়ে হযরত রুকাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা, যাঁকে উতবাহ বিন আবু লাহাব তালাক দিয়েছিল, আপনি ﷺ তাঁকে মক্কার সবচেয়ে লজ্জাশীল যুবক হযরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন যিনি একেবারে শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আর্থিকভাবেও সচ্ছল ছিলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কন্যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার মহান দায়িত্বে আপনার পূর্ণ সহযোগী এবং সমব্যথী ছিলেন।

হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা যেহেতু সবার বড় ছিলেন, তাই বিশেষভাবে নিজের পিতার খেয়াল রাখতেন যে তিনি কোথায় গিয়েছেন এবং কী অবস্থায় আছেন। হুজুর আনোয়ার ﷺ বাজার এবং অলিগলিতে আল্লাহর তাওহীদের বাণী শোনাতে শোনাতে এবং কাফেরদের কষ্ট সহ্য করতে করতে ক্লান্ত-বিহ্বল হয়ে পড়তেন, এমন সময় হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে যেতেন এবং আপনাকে শত্রুদের কষ্ট থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন।

হারিস বিন হারিস তাঁর কিশোর বয়সের এক প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পিতার সাথে মক্কায় পৌঁছে দেখলেন এক জায়গায় ভিড় জমে আছে। জিজ্ঞেস করলেন: “আব্বা! এটা কিসের ভিড়?” পিতা বললেন: “বেটা! এই লোকগুলো একজন ধর্মহীন মানুষকে ঘিরে রেখেছে।” তিনি পিতার সাথে সওয়ারি থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন নবী আকরাম ﷺ মানুষকে ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন, মানুষ আপনার ﷺ কথার প্রতিবাদ করছে এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দিচ্ছে। অর্ধেক দিন এভাবেই কেটে গেল, এরপর ভিড় সরে গেল, তখন একজন নারী পানির পাত্র এবং রুমাল নিয়ে এদিকে আসলেন এবং আপনাকে ﷺ পানি পান করালেন তারপর ওজু করালেন। লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে এই নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যয়নব।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/ ৪৭১, দার হিজর।

আরেকজন সাক্ষী হলেন মুনীব আজদী, যিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সমাবেশে বলছিলেন: “হে লোকসকল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, সফলকাম হবে।”

কিন্তু মানুষ আপনাকে গালিগালাজ করতে শুরু করল। কেউ মাটির বড় থালা ভর্তি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এমনভাবে নিক্ষেপ করল যে তাঁর সারা শরীর ধুলোবালিমাখা হয়ে গেল। এক হতভাগা তো পবিত্র চেহারায় থুতু দিতেও দ্বিধাবোধ করল না। দুপুর হয়ে গেল, তখন এক বালিকা পানির পেয়ালা নিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল ধুলেন এবং বালিকাকে বললেন: “তোমার বাবার ব্যাপারে আশঙ্কা করো না যে তিনি হঠাৎ মারা যাবেন বা লাঞ্ছিত হবেন।” এই বালিকা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা হযরত জয়নাব। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মসজিদে হারামে সালাত আদায় করছিলেন, তখন আবু জাহেল বলল: “এমন কেউ কি নেই যে উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসবে এবং যখন মুহাম্মদ সিজদায় যাবে তখন সেই নাড়িভুঁড়ি তাঁর পিঠের ওপর রেখে দেবে?”

একথা শুনে ওকবা বিন আবি মুআইত, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিল, সে গেল এবং কোনো উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠের ওপর ঠিক সেই মুহূর্তে রেখে দিল যখন তিনি সিজদায় ছিলেন।

মুশরিকরা তাদের এই দুষ্টুমিতে এতই আনন্দ পাচ্ছিল যে হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর গড়িয়ে পড়ছিল। কেউ একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে গিয়ে তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে খবর দিল, যিনি তখন অল্পবয়সী বালিকা ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এলেন, অনেক কষ্টে নাড়িভুঁড়ি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র পিঠ থেকে সরিয়ে দিলেন। এরপর কাফেরদের দিকে ফিরে তাদের মন্দ বলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সিজদা থেকে মাথা তুললেন, তখন তাঁর কাপড় নাপাক হয়ে গিয়েছিল। মুশরিকরা তখনও অট্টহাসি দিচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরুপায় অবস্থায় আল্লাহকে ডেকে তাদের জন্য এমন বদদোয়া করলেন যা শুনে তাদের চেহারার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং তারা ভয় পেল যে এই বদদোয়া না জানি কবুল হয়ে যায়। [২]

এই ঘটনাগুলো বলে দেয় যে, ইসলামের জন্য কুরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জান, মাল এবং পরিবার-পরিজনসহ শরিক ছিলেন এবং এটাই একজন সত্যনিষ্ঠ দাঈ ও পূর্ণাঙ্গ নেতার মর্যাদার উপযুক্ত।

প্রায় এই দিনগুলোতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পালক মা হযরত উম্মে আয়মান (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পালক পুত্র হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-এর ঘরে একটি সন্তান জন্ম নিল, যে তার মায়ের মতো কৃষ্ণাঙ্গ ছিল। শিশুটির নাম রাখা হলো উসামা। এই শিশুটির প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসাধারণ ভালোবাসা ছিল। [৩]

---

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ লিনূরুদ্দিন আল-হাইসামি, খণ্ড: ৯৮২৭, ৯৮২৮, ত মাকতাবাতুল কুদসি কায়রো।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ১৭৯৪, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা লাকিয়ান নবী ﷺ..., ত দারুল জীল, সীরাতে ইবনে ইসহাক: ৩১১/১।

সহীহ মুসলিম ও ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের নাম ধরে বদদোয়া করেছিলেন তারা সবাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রা.)-এর বয়স তখন প্রায় নয়-দশ বছর ছিল; কারণ তাঁর জন্ম নির্ভরযোগ্য মতানুসারে কুরাইশদের হাতে কাবা নির্মাণের দিনগুলোতে হয়েছিল যখন নবী করীম ﷺ ৩৫ বছর বয়সের ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৯/৮; আল-ইসাবাহ: ২৬৩/৮) এর পাঁচ বছর পর নবী ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি হয়। আরও তিন বছর গোপন দাওয়াতের কাজ চলে। এরপর দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময় শুরু হয়। এটা ছিল অর্থনৈতিক পরীক্ষার সময়।

[৩] আল-ইসাবাহ, জীবনী: উসামা বিন যায়েদ (রা.)।

**পুত্রসন্তানদের মৃত্যু এবং মুশরিকদের বিদ্রূপ:**

এই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আরও একটি বড় পরীক্ষা এল। তাঁর বড় সাহেবজাদা কাসেম, যিনি তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখন এত বড় হয়েছিলেন যে ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারতেন, তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর তাঁর দ্বিতীয় সাহেবজাদা আবদুল্লাহও দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো পুত্রসন্তান জীবিত রইল না। সন্তানদের বিচ্ছেদের শোক এমনিতেই কলিজা বিদীর্ণকারী ছিল, কিন্তু মুশরিকরা একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনঃকষ্টের আরও একটি মাধ্যমে পরিণত করল। এখন তারা বলে বেড়াতে লাগল যে, মুহাম্মদ "আবতার" (নির্বংশ) হয়ে গেছেন; অর্থাৎ তাঁর পুত্রসন্তান শেষ হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে তাঁর কোনো বংশ থাকবে না এবং নাম নেওয়ার মতোও কেউ থাকবে না। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য "সূরা আল-কাউসার" নাযিল করলেন এবং এই ঘোষণা দিলেন: "নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ হবে।" [১]

**পুত্রসন্তানদের মৃত্যুর পেছনে ঐশী হিকমত:**

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্রসন্তানদের দ্রুত নিজের কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় হিকমত এই ছিল যে, তাঁর শেষ নবী হওয়া নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এখন যদি তাঁর ছেলেরা বড় হয়ে নবী না হতেন, তবে কারো মনে এই সন্দেহ হতে পারত যে, হয়তো পূর্ববর্তী নবীগণ অধিক যোগ্য ছিলেন এবং নিজেদের সন্তানদের অধিক উত্তম প্রতিপালক ছিলেন যে তাঁদের সন্তানরাও পয়গম্বর হয়েছেন। যদি নবী ﷺ এত যোগ্য হতেন তবে তাঁর সন্তানরাও নবী হতো। সুতরাং আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুত্রসন্তানের নেয়ামত অবশ্যই দান করেছিলেন যাতে তিনি এই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত না থাকেন, কিন্তু তাঁদের দ্রুত ফিরিয়ে নিলেন যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি না হতে পারে।

**একটি নতুন উম্মত গঠন:**

এই সময়গুলো ছিল পরীক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, দৃঢ়তা, কৌশল এবং প্রশিক্ষণের দিন। ইসলামের ইতিহাসে এই দিনগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য; কারণ এই দিনগুলোতেই সেই ব্যক্তিরা তৈরি হচ্ছিলেন, যাদের ওপর ভবিষ্যতে পুরো উম্মতের নেতৃত্ব ও নির্দেশনার ভার ন্যস্ত ছিল। কাফেরদের কঠোরতা, বিদ্রূপ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অভিযোগ ও আপত্তির ঝড়, চরিত্র হননের নিত্যনতুন অপবাদ, গোপন ষড়যন্ত্র এবং প্রকাশ্য বাধা-বিপত্তির জবাবে শেষ নবী ﷺ-এর কৌশল ছিল ধৈর্য ও সহনশীলতা, অহিংসা, সতর্কতা ও সাবধানতা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণও সকাল-সন্ধ্যা মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর দিকে ডাকছিলেন। দিনের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশিরভাগ সময় সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত হযরত আরকাম (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করতেন, যা ছিল ইসলামের প্রথম দাওয়াতী কেন্দ্র এবং প্রথম মাদ্রাসা। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতেন এবং পরামর্শ করতেন। কাফেরদের মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা, সম্পদ বা জনবল ছিল না। তাঁর শক্তি ও অস্ত্র ছিল আল্লাহর ওপর মজবুত ঈমান, তাঁর সাহায্য ও বিজয়ের ওপর বিশ্বাস, সর্বাবস্থায় তাঁর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর কাছেই ব্যাকুল হয়ে দোয়া করা।

---

[১] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল-কাউসার।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল কালিমা তাইয়্যেবা, এটাই ছিল তাদের দাওয়াতের সারকথা এবং এটাই ছিল তাদের আধ্যাত্মিকতার উৎস। তারা তাদের মজলিসগুলোতে আনন্দ ও খুশির মুহূর্তে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনিও দিত। সালাত ফরজ হয়নি কিন্তু এর পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছিল, অজু, গোসল এবং সালাতের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছিল। হুজুর আকরাম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম ؓ দুই দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। সাধারণত এই সালাতগুলো নিজ নিজ ঘরে বা গোপন স্থানে আদায় করা হতো কিন্তু হুজুর ﷺ হারাম শরীফেও তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং সালাত আদায় করতেন, অনেক সময় রাতের অনেকটা অংশ সেখানে দীর্ঘ রাকাতে কাটাতেন যাতে অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন। তবে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম কুরাইশদের ভয়ে হারামে সালাত আদায় করতেন না, বিশেষ করে সেখানে সামষ্টিকভাবে ইবাদত করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

হুজুর আকরাম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের জন্য সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা এবং সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল "ওহী", যা ক্রমাগত নাজিল হচ্ছিল। কাফেররা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নিত্যনতুন আপত্তি তুলত কিন্তু কুরআন মাজিদের দুই-তিনটি আয়াত তাদের নিরুত্তর করে দিত। তারা কষ্ট দিত তখন ওহী মুসলমানদের সাহস জোগাত এবং বিজয় ও সফলতার নিশ্চয়তা দিত। কাফেরদের কৌশলের জবাবে কী করতে হবে? প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর দূত জমিনে অবতরণ করে পয়গম্বরে ইসলাম ﷺ-কে শিক্ষা দিয়ে যেতেন।

কুরআন মাজিদের লিখন, সংরক্ষণ এবং এর পাঠদানের কাজও এই প্রাথমিক যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। নতুন নাজিল হওয়া আয়াতগুলো লিখে নেওয়া হতো। সাহাবায়ে কেরাম সেগুলো শিখে নিতেন এবং অন্যদের শেখানো ও মুখস্থ করানো শুরু করে দিতেন।

হুজুর আকদাস ﷺ ইসলাম গ্রহণকারী তাঁর সাথীদের অনেক খেয়াল রাখতেন। তাদের পারিবারিক অবস্থা ও সমস্যাগুলোতেও আগ্রহ নিতেন। তাদের মধ্যে যারা অভাবী ও মিসকিন হতেন, তাদের কোনো উন্নত আয়ের অধিকারী মুসলমানের সাথী বানিয়ে দিতেন যাতে তাদের ভরণপোষণ চলতে থাকে এবং তারা কুরাইশ নেতাদের মুখাপেক্ষী না থাকে, যেমনটি অভাবী সাহাবী হযরত খাব্বাব ؓ-কে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ ؓ-এর সাথী বানিয়েছিলেন। হযরত খাব্বাব ؓ তাদের কুরআনও পড়াতেন। [১]

হুজুর আকদাস ﷺ-এর এই ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পদশালী মুসলমানরা নিজেরাও গরিব ও বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের সমস্যা সমাধান করাকে সৌভাগ্য মনে করতেন, ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক ؓ হযরত বিলাল বিন রাবাহ ؓ-কে উমাইয়া বিন খালাফের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন, একইভাবে জুনাইরাহ, নাহদিয়াহ এবং উম্মে উবাইস ؓ-ও মুশরিকদের দাসী ছিলেন যারা কালিমা পড়ার অপরাধে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক ؓ তাদেরও কিনে মুক্ত করে দেন। [২]

মনে হতো আবু বকর সিদ্দিক ؓ-এর সম্পদ কেবল ইসলামের জন্যই ওয়াকফ।

---

[১] মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুয়াইম, খণ্ড: ৭৭১

[২] জাওয়ামিউস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ লি-ইবনে হাজম, পৃ. ৩৪, তাবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; শুয়াবুল ঈমান লিল-বাইহাকী, হা: ১৫১৩, তাবা মাকতাবাতুর রুশদ

## দাওয়াতি তৎপরতা

হজের মৌসুম নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশা বেড়ে গেল; কারণ দূর-দূরান্তের মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হতে পারত না। এদিকে কুরাইশ নেতারা অত্যন্ত চিন্তিত ছিল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বদনাম করার জন্য এবং মানুষের কাছে তাঁর দাওয়াতকে অকার্যকর করার জন্য নানা ধরনের কথা ছড়িয়ে রেখেছিল। তারা তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) বেদ্বীন, পাগল এবং কবি হিসেবে প্রচার করে রেখেছিল, কিন্তু এই সমস্ত অপকৌশল সত্ত্বেও দু-একজন করে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকল।

এটি দেখে কুরাইশ নেতারা একত্রে বসল, তাদের প্রখ্যাত নেতা ওয়ালিদ বিন মুগীরা বলল: “হজের সময় আসছে। আরবের বিভিন্ন গোত্র এখানে আসবে যাদের কানে এই কথা পৌঁছে গেছে, তাই এই ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি কথাই স্থির করে বলো। এমন যেন না হয় যে আমাদের কথাগুলো একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।”

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোনো জোরালো অভিযোগ খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন ওয়ালিদ বলল:
“সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কথা হলো তোমরা বলো যে সে একজন জাদুকর, সে জাদুর জোরে ভাইকে ভাই থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে এবং পরিবারের সদস্যদের একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।”

ফলে লোকেরা এই কথাটি স্থির করে হাজীদের কাফেলার বিভিন্ন পথে বসে গেল এবং এই অপবাদ প্রচার করতে লাগল। এটি ছিল নবুওয়াতের চতুর্থ বছর। [১]

## সূক উকাযে ইসলামের দাওয়াত (শাওয়াল ৮ নববী):

আরবে শাওয়াল মাস থেকে যিলহজ মাসের শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত আনন্দ-উৎসব, উদ্দীপনা ও কর্মচঞ্চলতার দিন ছিল। কাফেলাগুলোর চলাচল ও অবস্থানের কারণে চারদিকে ঈদের আমেজ বিরাজ করত। এই দিনগুলোতে আরবদের বিখ্যাত মেলা ও বাজার বসত। সবচেয়ে বড় বাজার “উকায” মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী “নাখলা” নামক স্থানে বসত। এটি মক্কা থেকে তিন দিনের হাঁটা পথ ছিল। হজ্জযাত্রী ও ব্যবসায়ীদের কাফেলা পুরো শাওয়াল মাস এখানে কাটাত। যিলকদ মাসে মানুষের এই ঢল মক্কার দিকে যাত্রা করত এবং যি-মাজান্নায় যিলকদ মাসের বিশ দিন এমনভাবে কাটাত যে নির্জন বনও জনাকীর্ণ হয়ে উঠত। পহেলা যিলহজ এই জাঁকজমক মক্কা থেকে পাঁচ মাইল (৮ কিলোমিটার) দূরে জাবালে কাবকাবের পাদদেশে “যিল মাজায”-এ স্থানান্তরিত হতো, যা আরাফাত থেকে তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) দূরে। আট দিন পর্যন্ত এখানে মেলার আমেজ থাকত। ৯ই যিলহজ লোকেরা সবকিছু ছেড়ে হজের আহকাম পালনের জন্য আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যেত।

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/২৭১

রাসূল ﷺ মানুষের এই সমাবেশগুলো থেকে পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করার এবং এর মাধ্যমে অল্প সময়ে দূর-দূরান্তের গোত্রগুলোর কাছে নিজের কথা পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে রাসূল ﷺ নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে তিন দিনের সফর করে মক্কা থেকে উকায বাজারে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং বিভিন্ন গোত্রের সামনে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন। এরপর আপনি যুল-মাজায বাজারে আসলেন এবং এখানেও এই প্রচেষ্টায় দিন-রাত ব্যস্ত থাকলেন। রাসূল ﷺ-এর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য আবু লাহাবও আপনার পিছু পিছু লেগে থাকল। রাসূল ﷺ এই বাজার ও মেলাগুলোর বিভিন্ন মজলিসে তাশরিফ নিতেন এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন। রাসূল ﷺ বলতেন: "হে লোকসকল! বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই), তোমরা সফলকাম হবে।"

রাসূল ﷺ-এর পেছনে পেছনে আপনার চাচা আবু লাহাব দ্রুতবেগে আসত, তার টেরা চোখে ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ থাকত এবং তার লাল গাল রাগে থমথম করত। সে রাসূল ﷺ-এর ওপর মাটি নিক্ষেপ করত এবং চিৎকার করে বলত: "ওহে লোকসকল! দেখো, এই ব্যক্তি যেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে না দেয়। সে চায় যে তোমরা লাত ও উযযার ইবাদত ছেড়ে দাও।" রাসূল ﷺ তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের পয়গাম শুনিয়ে যেতেন। [১]

যিমাদ আযদীর ইসলাম গ্রহণ:

মক্কায় রাসূলের দাওয়াতের তৎপরতা জারি ছিল এবং কুরাইশদের শত্রুতাও। এই সময়ে আযদ গোত্রের যিমাদ নামক এক ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছালেন। মুশরিকরা এই আশঙ্কায় যে তিনি পাছে রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যান, তাকে বিশ্বাস করাল যে রাসূল (নাউযুবিল্লাহ) পাগল। ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারে যিমাদ-এর অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন: "আমার হাতে আল্লাহ অনেক মানুষকে শেফা দান করেছেন। আপনি চাইলে আমি আপনার ওপরও দম করে দিতে পারি।"

রাসূল ﷺ বললেন:

"إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ"

(নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করার নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত দেওয়ার নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।)

যিমাদ স্তব্ধ হয়ে এই কথাগুলো শুনলেন, বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে কেউ এমন কালামও শোনাতে পারে। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: "আবার শোনান।" রাসূল ﷺ এই কথাগুলোই দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পুনরাবৃত্তি করলেন। যিমাদ বললেন: "আমি গণক, জাদুকর এবং কবিদের কালাম শুনেছি কিন্তু এমন বাক্য কখনো শুনিনি। এগুলো তো অলঙ্কারশাস্ত্রের সমুদ্রের অতল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।"

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/১০৬, দারু হাজার।

ফিমাদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নিজের গোত্রের পক্ষ থেকেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বাইয়াত করে ফিরে গেলেন। [১]

**মুশরিকদের কুরআনের প্রভাব স্বীকার করা:**

সব ধরণের বিরোধিতা সত্ত্বেও কুরআনের প্রভাবের কোনো জবাব মুশরিকদের কাছে ছিল না। বরং তাদের বড় বড় সর্দার যারা কাব্য ও সাহিত্যের ভালো রুচি রাখতেন, তারা কুরআনের ধ্বনিগত প্রভাব এবং এর সাহিত্যিক মাধুর্য দ্বারা বিমোহিত না হয়ে পারতেন না। আবু জাহল, আবু সুফিয়ান এবং আখনেস বিন শারীক রাতের বেলা তখন লুকিয়ে লুকিয়ে আসতেন যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

সুবহে সাদিক পর্যন্ত তারা নিস্তব্ধ হয়ে এই আওয়াজ শুনতে থাকতেন। ভোর হতেই ফিরে যেতেন। যদি কোনো মোড়ে একে অপরের সাথে দেখা হয়ে যেত, তবে একে অপরকে তিরস্কার করে বলতেন: "ভবিষ্যতে এমন করো না। যদি গোত্রের নির্বোধ লোকেরা জানতে পারে, তবে না জানি তারা এর কী প্রভাব গ্রহণ করবে।" কিন্তু পরের রাতে আবার এমনটিই হতো। যখন বেশ কয়েকদিন এই ধারা চলতে থাকল, তখন একদিন আখনেস বিন শারীক লাঠি হাতে নিয়ে আবু জাহলের কাছে পৌঁছে গেল এবং বলতে লাগল: "বলো, মুহাম্মাদের কাছ থেকে যে তিলাওয়াত শুনলে সে সম্পর্কে তোমার মতামত কী?"

আবু জাহল বলতে লাগল: "আমরা এবং বনু হাশিম সম্মান ও মর্যাদার প্রতিটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে আসছি। যখন আমরা সব বিষয়ে সমান সমান হলাম, তখন তারা বলতে শুরু করল যে আমাদের কাছে একজন নবীও আছেন যার ওপর ওহী নাযিল হয়। আল্লাহর কসম! আমরা এই কথা কখনোই মানব না।" [২]

কুরাইশ সর্দার ওয়ালীদ বিন মুগীরা একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে কালামুল্লাহ শুনলেন, তখন তার ওপর এক আবেগঘন অবস্থা ছেয়ে গেল। ফিরে এলে আবু জাহল তার পরিবর্তিত অবস্থা দেখে তাকে খোটা দিল এবং জেদ ধরল যে সে যেন এমন কিছু বলে যাতে প্রকাশ পায় যে সে কুরআনের অস্বীকারকারী। ওয়ালীদ বলল: "আমি কী বলব? তোমরা জানো যে কবিতা, রণসংগীত এবং কাসিদা সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানে এমন কেউ নেই। আল্লাহর কসম! সেই কালাম এগুলোর কোনোটির সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এতে এক অদ্ভুত মিষ্টতা রয়েছে। এটি এমন এক কালাম যা সবার ওপর বিজয়ী, এর ওপর বিজয়ী হওয়ার মতো কেউ নেই। এটি অন্য সব কালামকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।"

আবু জাহল বলল: "তোমাকে এমন কিছু তো বলতেই হবে যাতে তোমার কওম খুশি হয়ে যায়।"

ওয়ালীদ চিন্তা-ভাবনা করে বলল: "একে জাদু বলা উচিত।" [৩]

কিন্তু নযর বিন হারিস, যাকে মানুষ শয়তান বলে ডাকত, সে এই কৌশলকেও নিরর্থক সাব্যস্ত করল। সে কুরআনের প্রভাবকে আরবের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ মনে করত। একদিন সে প্রকাশ্যে বলল:

"হে কুরাইশরা! আল্লাহর কসম! তোমরা এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ যার অতীতে কোনো উদাহরণ নেই। তোমরা জানো যে মুহাম্মাদ তোমাদেরই পরিবারের এক সন্তান ছিল যে বড় হয়েছে। সে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী..."

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২০৩৫, কিতাবুল জুমুআহ, বাব তাখফিফ আস-সালাত ওয়াল খুতবাহ।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৬১; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/২০৬।

[৩] মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হা: ৩৮৭৩।

কথা বলার ক্ষেত্রে এবং সবার চেয়ে বেশি আমানতদার ছিল। এখন যখন সে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে এবং এই নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে, তখন তোমরা বলছ যে সে জাদুকর। আল্লাহর কসম! সে জাদুকর নয়; কারণ আমরা জাদুকরদের ঝাড়ফুঁক এবং তাদের গিট দেওয়া জানি। কখনো তোমরা বলছ যে সে গণক। আল্লাহর কসম! সে গণক নয়, কারণ আমরা গণকদের অবস্থা এবং তাদের কথা খুব ভালোভাবেই দেখেছি। কখনো তোমরা বলছ যে সে পাগল। আল্লাহর কসম! সে পাগল নয়। আমরা উন্মাদনা, এর প্রকারভেদ এবং এর প্রভাব সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানি। হে কুরাইশরা! নিজেদের পরিণাম ভালো করে দেখে নাও। সত্যিই তোমাদের ওপর বড় বিপদ নেমে এসেছে। [১]

**উতবা বিন রাবিয়ার সাথে কথোপকথন:**

একদিন কুরাইশ নেতারা তাদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান নেতা উতবা বিন রাবিয়াকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পাঠাল। সে এসে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল: "আপনি কি উত্তম নাকি আপনার পূর্বপুরুষরা?"

রসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকলেন। সে বলতে লাগল: "যদি তারা উত্তম হয়, তবে ভেবে দেখুন যে তারা তো সেই উপাস্যদেরই পূজা করত যাদের আপনি ভুল বলছেন। আর যদি আপনি উত্তম হন, তবে আপনার বক্তব্য শোনান। আমরা শুনব। আমাদের কাছে আপনার চেয়ে বেশি অশুভ ও ক্ষতিকর ব্যক্তি আমাদের কওমে আর কেউ জন্ম নেয়নি, যে আমাদের ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে এবং আরবদের মধ্যে আমাদের বদনাম করেছে। এখন তো প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে কুরাইশদের মধ্যে একজন জাদুকর আছে, কুরাইশদের মধ্যে একজন গণক আছে। এখন তো শুধু এতটুকুই বাকি আছে যে আমরা তলোয়ার নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ধ্বংস হয়ে যাই। ভাই! যদি আপনার কোনো নারীর প্রয়োজন হয়, তবে আমরা আপনাকে দশজন নারীর সাথে বিয়ে করিয়ে দেব। আর যদি সম্পদ চান, তবে আমরা আপনার জন্য এত সম্পদ জমা করে দেব যে আপনি সমস্ত কুরাইশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে যাবেন।"

রসূলুল্লাহ (সা.) চুপচাপ এসব শুনছিলেন। যখন সে চুপ হলো, তখন তিনি বললেন: "তোমার যা বলার ছিল তা কি শেষ হয়েছে?"

সে বলল: "হ্যাঁ।" তখন রসূলুল্লাহ (সা.) এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন:

حم ۞ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۞ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

"এই কালাম পরম করুণাময় ও দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এমন কুরআন যা আরবি ভাষায়, সেই সব লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। এরপরও তাদের অধিকাংশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ফলে তারা শোনে না।" [২]

নবী করীম (সা.) তিলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন এবং উতবা হাতের ওপর ভর দিয়ে মাটিতে বসে শুনছিল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সা.) এই আয়াতে পৌঁছালেন: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

"অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন: আমি তোমাদেরকে এমন এক বজ্রধ্বনি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি যেমন আদ ও সামূদ জাতির ওপর এসেছিল।" [৩]

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/২০১

[২] সূরা হামিম আস-সাজদাহ, আয়াত: ১-৪

[৩] সূরা হামিম আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৩

উতবা এই আয়াতগুলো শুনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখের ওপর হাত রাখল এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আরও তিলাওয়াত করা থেকে বিরত রাখল। কালামে পাকের তার ওপর এমন প্রভাব পড়ল যে সে ঘরে আবদ্ধ হয়ে বসে রইল।

অবশেষে অন্য মুশরিকরা এসে কুশল জিজ্ঞাসা করল। সে পুরো ঘটনা শোনাল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখের ওপর হাত রাখার কারণ বর্ণনা করে বলল: "তোমরা জানো মুহাম্মদ যা-ই বলেন তা সত্যই প্রমাণিত হয়। আমার কাছে তখন আদ ও সামুদ জাতির ওপর আপতিত বজ্রধ্বনি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল তোমাদের ওপর সত্যিই না জানি আযাব নাযিল হয়ে যায়।"

তারপর সে বলতে লাগল: "আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ যা শুনিয়েছেন তা জাদুও ছিল না, কবিতাও ছিল না এবং কোনো মন্ত্রতন্ত্রও ছিল না। তোমরা আমার একটি কথা মেনে নাও। এরপর চাইলে আমার আর কোনো কথা মেনো না। এই লোকটিকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। সে যা বলছে, তার চর্চা অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে। যদি আরবরা তাকে কাবু করে ফেলে তবে তোমাদের কিছু করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয় তবে তার বিজয় তোমাদেরই বিজয় বলে গণ্য হবে। তার সম্মানে তোমাদেরই সম্মান হবে।"

কুরাইশ নেতারা এই বলে উঠে দাঁড়াল যে, "মুহাম্মদের জবানের জাদু তোমার ওপরও চলে গেছে।" [১]

**তুফাইল বিন আমর দাওসীর ইসলাম গ্রহণ:**

মক্কী যুগ ছিল যখন ইয়ামেনী গোত্র দাওস-এর এক শরীফ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তুফাইল বিন আমরের মক্কায় আগমন ঘটে। মক্কার মুশরিকরা তাদের প্রথা অনুযায়ী তাকে সতর্ক করল যে, এখানে এক ব্যক্তি নতুন দ্বীন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যে বাবা ও ছেলে, ভাই ও ভাই এবং স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে; ভয় হচ্ছে পাছে তুমিও তার বন্দি না হয়ে যাও, অতএব তার কথা শুনো না।

তুফাইল বিন আমর চিন্তিত হয়ে কানে তুলা গুঁজে নিলেন, কিন্তু একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাবার কাছে সালাত আদায় করতে দেখে কাছে চলে গেলেন। তিলাওয়াতের আওয়াজ কানে পড়েই গেল। কালামুল্লাহর মাধুর্য ও অলৌকিকতা তাকে বিমোহিত করে দিল। মনে মনে বলতে লাগলেন: "আমি একজন কবি ও বুদ্ধিমান মানুষ। কথার ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারি। এই লোকটির কথা শুনতে ক্ষতি কী? যদি ভালো হয় তবে ঠিক আছে, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করব।" রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত থেকে ফারেগ হলে তুফাইল বিন আমর সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে ইসলামের পয়গাম শুনলেন এবং সেখানেই ইসলামে দীক্ষিত হলেন। ইয়ামেন ফিরে গিয়ে প্রথমে পরিবারের সদস্যদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পিতা ও স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন, তারপর কওমের মধ্যে তাবলীঘ শুরু করলেন কিন্তু কওম রাজি হলো না। [২]

অবশেষে কিছুকাল পর পুনরায় মক্কায় এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন: "ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাওস গোত্র অবাধ্য, তারা (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করুন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন: "হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দিন এবং তাদের নিয়ে আসুন।" [৩]

---

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৬৫৬০; আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হা: ৩০০২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/ ১৫৫ থেকে ১৬০। হাফেজ ইবনে কাসীর এটি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমরা তিন-চারটি সূত্রের সারমর্ম একসাথে পেশ করেছি।

[২] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/ ৩৮৩, ৩৮৪

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৬৩৯৭, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুদ দুআ আলাল মুশরিকীন। এই দুআ কয়েক বছর পর কবুল হয়েছিল। দাওস গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে এবং এর ৮০টি পরিবার হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হয়। (সীরাত ইবনে হিশাম: ১/ ৩৮৫)

## আশ্রয়ের সন্ধান: হাবশায় হিজরত

যখন কুরাইশদের জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং মুসলমানদের জন্য মক্কার জমিন সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কুরাইশদের সীমা অতিক্রমকারী শত্রুতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এটা ভাবতে বাধ্য করছিল যে, মুসলমানদের জন্য কোথাও কোনো আশ্রয়ের স্থান খুঁজে বের করতে হবে। কিছু সাহাবীও নিজেরা এই বিপদ-আপদে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন করছিলেন যেন তাদের অন্য কোনো দেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য কোনো দেশে যাওয়া কোনো সহজ কাজ ছিল না।

আরব ভূখণ্ডে সেই সময় নিকটতম বড় শহর ছিল 'ইয়াসরিব', যেখানে বনু হাশিমের আত্মীয়তাও ছিল। কিন্তু ইয়াসরিবের আরব গোত্র আউস ও খাজরাজ একদিকে নিজেরা মুশরিক ও মূর্তিপূজারী ছিল, অন্যদিকে তারা মক্কার কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা পছন্দ করতে পারত না। বিশেষ করে এমন সময়ে যখন তাদের অভ্যন্তরীণ শত্রু ইহুদিরা তাদের অপদস্থ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, তারা মক্কার মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে নিজেদের শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা পছন্দ করতে পারত না।

ইয়াসরিবে আশ্রয় নেওয়া এই দিক থেকেও অনুপযুক্ত ছিল যে, সেই দিনগুলোতে হিজাজের এই এলাকাটি অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছিল। কেবল কুরাইশরাই ছিল যারা নিজেদের শান্তি বজায় রেখেছিল, অন্যথায় ইয়াসরিব এবং এর চারদিকে যুদ্ধের এক অন্তহীন ধারা অব্যাহত ছিল। আউস ও খাজরাজের উপ-গোত্রগুলো বারবার একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছিল; বনু নাযির, বনু কুরাইজা এবং বনু কাইনুকার ইহুদিরা যুদ্ধের এই ধারাকে উসকে দিচ্ছিল এবং পূর্ণ শক্তি দিয়ে এতে শরিক ছিল। যুদ্ধের এই ধারা 'হারবে সুমাইর' থেকে শুরু হয়েছিল এবং এরপর একে একে ইয়াওমুশ শারাহ, হারবে ফারে', হারবে হাতেব, ইয়াওমুর রাবী', ইয়াওমুল বাকী' এবং ইয়াওমে বুয়াসের যুদ্ধগুলো সংঘটিত হতে থাকে। এখন প্রতিটি ঘর ছিল নিহতদের উত্তরাধিকারী এবং প্রতিটি হৃদয়ে ছিল প্রতিশোধের আগুন; এমন লোকেরা অন্যদের সমস্যা সমাধানে কী আর আগ্রহ দেখাতে পারত। [১]

দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় নিকটবর্তী দেশ ছিল ইয়েমেন, কিন্তু সেখানে সাবা ও হিমইয়ারের নেতৃত্বের যুগ অনেক আগেই গত হয়ে গিয়েছিল এবং এখন তিন দশক ধরে সেখানে পারস্যবাসীদের শাসন চলছিল, যাদের অহংকার, গোঁড়ামি এবং স্বার্থপরতা দেখে কোনো ভালো আচরণের আশা করা যেত না। এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিম দিকে আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলীয় দেশ হাবশা (আবিসিনিয়া) এমন একটি কোণ হিসেবে নজরে আসছিল যেখানে নির্যাতিত ও অসহায় মুসলমানরা আশ্রয় নিতে পারত। মুসলমানদের জন্য যদিও এই ভূখণ্ডটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং সেখানকার সরকার ও প্রজারা খ্রিস্টান হওয়ার কারণে এই আশাও করা যেত না যে সেখানে ইসলামের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে, কিন্তু সেখানকার বর্তমান বাদশাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই তথ্য পেয়েছিলেন যে, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং কাউকে জুলুম হতে দেন না। হাবশা লোহিত সাগরের ওপারে হওয়ার কারণে আরবের অন্যান্য শহরের তুলনায় মক্কার কুরাইশদের নাগালের বাইরে এবং...

---

(১) আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৫৮৩ থেকে ৬০১, দারুল কিতাব আল-আরাবি।

তাদের কোনো সামরিক পদক্ষেপ থেকে একেবারেই নিরাপদ ছিল। তবে সেখানে যাওয়ার পথটি সুপরিচিত ছিল; কারণ আরব বণিকরা দীর্ঘকাল ধরে জেদ্দার উপকূল থেকে নৌকায় পণ্য বোঝাই করে হাবশায় যাতায়াত করত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এই বাস্তবতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন যে, হাবশা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র হতে পারে না, তবে পরিস্থিতির নাজুকতা ও চাপের কারণে এমন একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল যেখানে ইসলামের শত্রুদের আধিপত্য থাকবে না এবং প্রয়োজনে যেকোনো মুসলমান সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে।

**হিজরত হাবশা আউয়ালি (রজব ৫ নববী):**

এই দিকগুলো বিবেচনা করে অবশেষে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে হাবশায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। এই নির্দেশনার অধীনে নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে মুসলমানদের কয়েকটি পরিবার গোপনে মক্কা থেকে হাবশায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। [১] মুহাজিরদের মধ্যে এগারোজন পুরুষ ও চারজন নারী ছিলেন: তাদের মধ্যে ১. হযরত উসমান বিন আফফান (রা.), ২. তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়াহ (রা.), ৩. হযরত আবু সালামাহ (রা.), ৪. তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রা.), ৫. হযরত আমির বিন রাবিয়াহ (রা.), ৬. তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবি হাসমাহ (উম্মে আবদুল্লাহ) (রা.), ৭. হযরত আবু হুজাইফা বিন উতবাহ (রা.), ৮. তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল (রা.), ৯. হযরত জুবাইর বিন আওয়াম (রা.), ১০. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.), ১১. হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.), ১২. হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.), ১৩. আবু সাবরা বিন আবি রুহম (রা.), ১৪. সুহাইল বিন বাইদা এবং ১৫. আবু হাতিব বিন আমর (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। [২]

সাধারণত মনে করা হয় যে, হাবশায় হিজরতকারীদের মধ্যে কেবল নিঃস্ব ও দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু এই তালিকাটি দেখলে দেখা যায় যে এতে সব শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। তাদের মধ্যে উসমান বিন আফফান (রা.) ছিলেন, যিনি মক্কার ধনাঢ্য ও অভিজাতদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাদের মধ্যে জুবাইর বিন আওয়াম (রা.) ছিলেন, যাঁর সাহসিকতা ছিল প্রবাদতুল্য। অন্যদিকে হযরত বিলাল (রা.) এবং আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর মতো মুসলমানরা, যারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার ছিলেন, তাদের এই মুহাজিরদের মধ্যে দেখা যায় না। হতে পারে তারা এতটাই অসহায় ছিলেন যে তাদের পক্ষে মক্কা থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। এটাও হতে পারে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের খাতিরে কষ্ট সহ্য করার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেতেন।

হিজরতের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, নির্ধারিত সময়ে সবাই একে একে বা দু-দুজন করে মক্কা থেকে বের হবেন এবং কোনো দূরবর্তী স্থানে একত্রিত হবেন যাতে মক্কাবাসীরা সময়মতো টের না পায়। [৩]

**উম্মে আবদুল্লাহ (রা.) এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কথোপকথন:**

মুহাজিরদের মধ্যে আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ (রা.) তাদের আসবাবপত্র গুছিয়ে মক্কা থেকে বের হওয়ার উপক্রম করেছিলেন, এমন সময় আমির বিন রাবিয়াহ (রা.)-এর কোনো একটি জরুরি কাজের কথা মনে পড়ল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে রেখে শহরের দিকে চলে গেলেন।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/৬৫।

[২] তারিখুত তাবারী: ২/৩৩০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/১৬৫; সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩২১; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২/৩৬৩।

[৩] এই বিন্যাসটি মুজামুত তাবারানীর সেই বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে যা পরবর্তী লাইনে আসছে।

সে দিনগুলোতে মুসলমানরা বনু আদীর এক সাহসী যুবক উমর বিন খাত্তাবকে নিয়ে ভীত থাকতেন, যাকে আল্লাহ বুদ্ধি, আত্মমর্যাদা ও আভিজাত্য দান করেছিলেন, কিন্তু ইসলামের সত্যতা তখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি। তাই তাঁর পূর্ণ চেষ্টা ছিল যেন তাঁর স্বদেশী মুসলমানরা তাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরে আসে। ভাগ্যের পরিহাস যে, সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে উমর বিন খাত্তাব সেই দিকে চলে আসেন এবং যখন উম্মে আবদুল্লাহ (রা.)-কে আসবাবপত্রসহ উটের পিঠে সওয়ার দেখেন, তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "কোথায় যাচ্ছ?"

উম্মে আবদুল্লাহ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন: "উমর বিন খাত্তাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।" কিন্তু এই সুযোগে আল্লাহর এই বান্দী অস্পষ্ট কথা বলার পরিবর্তে নির্ভীকভাবে বললেন: "তোমরা আমাদের দ্বীনের কারণে কষ্ট দাও, তাই আমরা আল্লাহর জমিনের অন্য কোনো স্থানে চলে যাচ্ছি যেখানে আমরা আল্লাহর ইবাদত করলে আমাদের কষ্ট দেওয়া হবে না।"

জানা নেই এই শব্দগুলো হৃদয়ের কতটুকু ব্যথা নিয়ে বলা হয়েছিল যে, তা শুনে উমর বিন খাত্তাবের মন গলে গেল, চেহারায় অনুশোচনা ও কোমলতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুখ থেকে শুধু এটুকুই বের হলো: "আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হোন।"

একথা বলে তিনি ভারী কদমে ফিরে চললেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, মুসলমানদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উমর বিন খাত্তাবের জন্য অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ছিল। উম্মে আবদুল্লাহ (রা.) স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এমন সময় আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) চলে এলেন। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বললেন: "এইমাত্র উমর এখান থেকে গেলেন। হায়! আপনি যদি দেখতেন তাঁর চেহারায় কেমন আক্ষেপ ছিল।"

আমির (রা.) অবাক হয়ে বললেন: "তুমি কি তাঁর ইসলাম গ্রহণের আশা করছ?" স্ত্রী বললেন: "হ্যাঁ।" আমির (রা.) বললেন: "যতক্ষণ খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ খাত্তাবের ছেলেও ইসলাম গ্রহণ করবে না।" [১]

**হাবশায় আশ্রয়:**

অবশেষে মুহাজিরদের কেউ পায়ে হেঁটে আবার কেউ সওয়ার হয়ে মক্কা থেকে রওনা হলেন এবং লোহিত সাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছালেন। সৌভাগ্যবশত দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ হাবশায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাঁরা অর্ধেক দিনার ভাড়া দিয়ে সেগুলোতে সওয়ার হলেন।

কুরাইশরা মুসলমানদের বের হওয়ার খবর একটু দেরিতে পেল। তারা পিছু ধাওয়া করে উপকূল পর্যন্ত এল কিন্তু তার আগেই জাহাজগুলো চলে গিয়েছিল। এভাবে মুসলমানরা হাবশায় পৌঁছালেন। নাজ্জাশী এই প্রবাসীদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজের কাছে আশ্রয় দিলেন এবং এই লোকেরা আফ্রিকার এই অত্যন্ত গরম ও অসভ্য এলাকায় মক্কার তুলনায় অনেক শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। [২]

নবী করীম (সা.) এই স্বদেশহীন মুসলমানদের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। আপনার (সা.) নিজের মেয়ে রুকাইয়াহ (রা.) এবং জামাতা উসমান (রা.)-এর...

---

[১] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২১/২৫... আমির বিন রাবিয়াহ (রা.) হযরত উমরের ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোরতা দেখে একথা বলেছিলেন। তিনি কী জানতেন যে উমর বিন খাত্তাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বিতীয় নিকটতম সাথী এবং মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হবেন। হেদায়েতও আল্লাহর ইখতিয়ারে এবং সম্মানও।

[২] তারিখুত তাবারী: ২/৩২৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৬৫; আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ: ১/৩৫৮, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

কিছু বর্ণনাকারী এই মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর বিন আবি তালিব এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রা.)-কেও গণনা করেছেন, কিন্তু সঠিক কথা হলো এই ব্যক্তিবর্গ হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, প্রথমটিতে নয়। যেমনটি সামনে রেফারেন্সসহ আসছে।

জন্যও চিন্তিত ছিলেন যে তাদের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনি ﷺ মক্কার বাইরের রাস্তাগুলোতে বের হয়ে আসা-যাওয়া কারীদের কাছে তাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতেন। অবশেষে আফ্রিকা থেকে আসা এক নারী তাদের কুশল সংবাদ জানালেন এবং বললেন: 'আমি আপনার কন্যাকে সওয়ারির ওপর বসা এবং জামাতাকে সওয়ারির লাগাম ধরে থাকতে দেখেছি।' রাসূল ﷺ আশ্বস্ত হলেন যে তাঁর কলিজার টুকরা এবং জামাতা জীবিত ও সুস্থ আছেন। আপনি বললেন: 'আল্লাহ তাদের উভয়ের সাথে থাকুন। নিঃসন্দেহে উসমান লুত (আ.)-এর পর পরিবার-পরিজনসহ হিজরতকারী প্রথম ব্যক্তি।' [১]

**সাহাবীদের সবর ও ইস্তেকামাতের নির্দেশ:**

এই সময়ে পেছনে রয়ে যাওয়া সাহাবীদের ওপর মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। বিপরীতে সাহাবায়ে কেরামও ধৈর্য ও সহনশীলতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁরা চাইলে কিছু ক্ষেত্রে পাল্টা জবাব দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বিরত রেখেছিলেন। অবশেষে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর মতো মহান সাহাবী একদিন বলে উঠলেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন সম্মানিত ছিলাম। ঈমান আনলাম তো অসহায় ও মিসকিন হয়ে গেলাম!!' রাসূল ﷺ বললেন: 'আমাকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই লড়াই করো না।' [২] এর পেছনে হিকমত এটাই ছিল যে, এই স্বল্প শক্তি নিয়ে দু-চারটি সাময়িক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হলেও বিজয় অর্জন সম্ভব ছিল না। এর ফলাফল শত্রুর উত্তেজনা এবং নিজেদের বিপদ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হতো না।

---

[১] তুহফাতুল আহওয়াযী, পৃ: ৬৬২; উসদুল গাবাহ, তরজমা: রুকাইয়্যাহ বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-আহাদ ওয়াল মাসানি লি-ইবনে আবি আসিম, হা: ২৩

[২] "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন সম্মানে ছিলাম, যখন ঈমান আনলাম তখন লাঞ্ছিত হয়ে গেলাম, তখন তিনি বললেন: আমাকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা লড়াই করো না।" (নাসায়ী মুজতাবা, হা: ৩০৮৬)

ইসলামের নতুন সাহায্যকারী

ইসলামের নাম নেওয়ার লোক কম ছিল, এই দ্বীন তখন অসহায় অবস্থায় ছিল কিন্তু আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, যিনি চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী একজন সুঠাম ও শক্তিশালী যুবক এবং বীরোচিত গুণাবলির অধিকারী ছিলেন, তিনি কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমর্থনেই তলোয়ার হাতে তুলে নেননি বরং ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এমন যে, একদিন আবু জাহেল সাফা পাহাড়ের কাছে শহরের লোকদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অত্যন্ত বাজেভাবে অপমান ও গালিগালাজ করে। একজন অত্যন্ত ভদ্র মানুষের জনসমক্ষে এই অপমানজনক দৃশ্যটি এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে, প্রত্যক্ষদর্শীরাও নিজেদের হৃদয়ে ব্যথা অনুভব না করে পারেনি। হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব সেদিন তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী শিকার ও তীরন্দাজি শেষে ফিরে আসছিলেন। পথে এক মহিলা তাঁকে দেখে বলে উঠলেন: "হে আবু আম্মারা! আজ তো আবু জাহেল তোমার ভাতিজাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, গালি দিয়েছে এবং অনেক কিছু বলেছে।"

এ কথা শুনেই হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব অস্থির হয়ে আবু জাহেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। দেখলেন যে সে সাফা ও মারওয়ার মাঝে কুরাইশদের এক মজলিসে বসে আছে। আপনি সেখানে গিয়েই নিজের কাঁধ থেকে ধনুক নামালেন এবং তা দুই হাতে উঁচিয়ে ধরে সজোরে আবু জাহেলের মাথায় আঘাত করলেন, এতে আবু জাহেলের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল।

কুরাইশরা বিদ্রূপ করে বলল: "হে আবু আম্মারা! তুমি তো এতোটা নির্বোধ ছিলে না, তুমিও কি ঈমান নিয়ে এলে?"

এটি ছিল এক চূড়ান্ত মুহূর্ত, সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে এর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হওয়া অথবা পিছিয়ে যাওয়ার। হযরত হামজা হৃদয়ের গভীর থেকে জানতেন যে তাঁর ভাতিজা সত্যবাদী, তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে বললেন:

"হ্যাঁ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন।"

সেই সাথে তিনি কুরাইশদের সতর্ক করে বললেন: "এটি তো ছিল ধনুকের আঘাত, ভবিষ্যতে তলোয়ার চলবে।"

কুরাইশ নেতাদের ওপর এক ভীতি ছেয়ে গেল, তাদের এই আশঙ্কা পেয়ে বসল যে এমন বীর পুরুষদের ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের দমন করা কঠিন হয়ে পড়বে। [১]

**যখন হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামে দীক্ষিত হলেন (জিলহজ ৫ নবুওয়াত):**

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের এই চরম শত্রুতা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও বিশেষভাবে এমন ব্যক্তিদের হেদায়েতের আকাঙ্ক্ষা রাখতেন যাদের মধ্যে সত্য চেনার, সত্যের জন্য কুরবানি দেওয়ার এবং নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতা দেখা যেত, তারা ইসলামের কতই না বিরোধী হোক না কেন এবং তাদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যক্তিগতভাবে কতই না কষ্ট দেওয়া হোক না কেন।

---

[১] মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৪৮৮৪

এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহানুভবতা ও উদারতা ছিল যে, তিনি এ ধরনের ব্যক্তিদের হেদায়েতের জন্যও আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করতেন। কুরাইশদের দুই ব্যক্তির মধ্যে তিনি অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি দেখতে পেতেন। একজন অত্যন্ত জেদি ও ধূর্ত ব্যক্তি, আমর বিন হিশাম (আবু জাহেল) ছিল, যে প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নিত্যনতুন পরিকল্পনা তৈরি করত। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বীর। তিনি ছিলেন আটাশ বছর বয়সী তেজস্বী যুবক উমর বিন খাত্তাব। বীরত্ব ও রণকৌশলে তিনি ছিলেন অতুলনীয় এবং সাহস ও নির্ভীকতায় অনন্য। এমন এক-দুটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে তাঁর অন্তর কোনো না কোনোভাবে ইসলামের সত্যতা অনুভব করতে শুরু করেছিল।

**শোন সফলতার কথা:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করার কয়েক দিন আগে তিনি হারামের প্রাঙ্গণে ঘুমাচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে একটি মূর্তির সামনে পশু কোরবানি করল। ইতিমধ্যে একটি অত্যন্ত জোরালো আওয়াজ শোনা গেল, কেউ বলছিল:

“ইয়া জালীহ! আমরুন নাজীহ। রাজুলুন ফাসীহ। ইয়াকুলু: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”

(হে জালীহ! শোন সফলতার কথা। একজন প্রাঞ্জল ও বাগ্মী ব্যক্তি বলছেন: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।)

হযরত উমরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি আওয়াজকারীকে খুঁজতে থাকলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। এর মাত্র কয়েক দিন পর মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতের চর্চা শুরু হলো। [১]

**হযরত উমর গোপনে নববী তিলাওয়াত শোনেন:**

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে হারামে সালাত আদায় করার সময় ‘সূরা আল-হাক্কাহ’ তিলাওয়াত করছিলেন। হযরত উমর গোপনে তা শুনতে লাগলেন। কুরআন মাজীদের শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য তাঁর মন কেড়ে নিল, তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন: “ইনি তো একজন কবি।”

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

“ওয়ামা হুয়া বিক্বাওলি শা-ইরিন ক্বালীলাম মা তু’মিনূন” (এটি কোনো কবির কালাম নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান আনো।)

হযরত উমর অবাক হলেন যে, আমার মনের কথা তিনি কীভাবে জেনে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন: “ইনি তো জাদুকর।”

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তী আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

“ওয়ামা হুয়া বিক্বাওলি কা-হিনিন ক্বালীলাম মা তাযাক্কারূন” (এটি কোনো জাদুকরের কালাম নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো।)

হযরত উমরের অন্তরে ইসলামের সত্যতার বীজ সেদিনই রোপিত হয়েছিল। [২]

যখন হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কুরাইশদের মধ্যে চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিল না কীভাবে ইসলামকে একটি ভুল অক্ষরের মতো এক নিমেষে মিটিয়ে দেওয়া যায়। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে এই দোয়া করছিলেন:

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮৯৯, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইসলামি উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.)।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১১০৭, কানযুল উম্মাল, হা: ৩৫৭৩৯।

“হে আল্লাহ! উমর বিন হিশাম অথবা উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি দান করুন।”

এদিকে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিন দিন অতিবাহিত হয়েছিল, এমন সময় আবু জাহেলের প্ররোচনায় কুরাইশদের প্রতিশোধের আগুন নেভানোর দায়িত্ব উমর বিন খাত্তাব (রা.) নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি তলোয়ার হাতে নিলেন এবং নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। পথে নুআইম বিন আব্দুল্লাহ আন-নাহহাম (রা.)-এর সাথে দেখা হলো, যিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উমরের ভাবভঙ্গি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “উমর! কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?”

তিনি বললেন: “আমি মুহাম্মাদের খোঁজে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের জ্ঞানীদের নির্বোধ সাব্যস্ত করে, আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলে এবং আমাদের ঐক্যের বিরোধিতা করে।”

হযরত নুআইম (রা.) বললেন: “উমর! তুমি অনেক ভুল কাজ করতে যাচ্ছ। যদি তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করো, তবে বনু হাশিম ও বনু যুহরা গোত্রের লোকেরা তোমাকে কি ছেড়ে দেবে!”

কিন্তু হযরত উমর নিজের সংকল্পে অটল রইলেন। পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে দেখে নুআইম (রা.) তাঁর মন পরিবর্তনের জন্য তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে বললেন: “উমর! আগে নিজের ঘরের খবর নাও। তোমার বোন ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদ তো মুসলমান হয়ে গেছে।” [১]

হযরত উমর (রা.) যখন বোনের দরজায় পৌঁছালেন, তখন ভেতর থেকে কুরআন মাজীদ পড়ার আওয়াজ আসছিল। হযরত খাব্বাব (রা.) বাড়ির লোকদের কুরআন মাজীদ পড়াচ্ছিলেন। হযরত উমর (রা.) সজোরে দরজায় করাঘাত করলেন।

বোন জিজ্ঞেস করলেন: “কে?” উত্তর দিলেন: “উমর।”

এ কথা শুনেই সবাই ঘাবড়ে গেলেন। হযরত খাব্বাব (রা.)-কে দ্রুত একটি কামরায় লুকিয়ে ফেলা হলো। এরপর ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.) দরজা খুললেন। উমর ভেতরে প্রবেশ করেই বোন ও ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কী পড়ছিলে?”

দুজনেই বললেন: “আমরা তো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম।”

উমর গর্জন করে বললেন: “আমি জানি যে তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ।”

সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বললেন: “উমর! বলো তো, যদি সত্য তোমার ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্মে পাওয়া যায়, তবে আমরা কী করব?”

এ কথা শুনেই উমর হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তাঁকে নিচে ফেলে দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করতে লাগলেন। তাঁর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.) তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে সরানোর চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে এত জোরে চড় মারলেন যে তাঁর মুখ রক্তে ভিজে গেল।

---

[১] সাধারণত মনে করা হয় যে, হযরত উমর (রা.) এর আগে তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কথা জানতেন না, কিন্তু এ কথা সঠিক নয়; কারণ তাঁর ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) নিজেই বলতেন যে, উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের আগে আমাকে এবং আমার বোনকে ইসলাম গ্রহণের কারণে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইসলামি সাঈদ বিন যায়েদ (রা.); আত-তারীখুল আওসাত লিল-বুখারী: ১/১১২, ত দারুল ওয়াঈ)। সুতরাং হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার এই অর্থ নেওয়া ভুল যে, তিনি বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কথা তখনই জানতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ কথা আগে থেকেই জানতেন, কিন্তু সেই সময় রাগান্বিত অবস্থায় যখন এর খোটা দেওয়া হলো, তখন তিনি আগে এই বিষয়টি মীমাংসা করতে উদ্যত হলেন এবং সাময়িকভাবে সেই চিন্তা মন থেকে চলে গেল যার জন্য তিনি তলোয়ার নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রা.) কাঁদতে কাঁদতে বললেন: “খাত্তাবের ছেলে! তোমার যা ইচ্ছা করো, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সত্য রাসূল।”

বোনের মুখে এই কথা শুনে এবং তাকে রক্তাক্ত দেখে হযরত উমর (রা.)-এর মন নরম হয়ে গেল। রাগ নেমে গেল এবং তিনি সেখানেই চারপায়ীর ওপর বসে পড়লেন। বলতে লাগলেন: “দেখাও, তোমরা কী পড়ছিলে?”

বোন বললেন: “তুমি অপবিত্র, অথচ এই কিতাব কেবল পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করতে পারে। আগে গোসল করো।”

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) গোসল করলেন। শরীরের ময়লার সাথে সাথে মনের কলুষতাও ধুয়ে গেল। এবার বোন ওহীর পাতাগুলো সামনে এনে রাখলেন। এগুলো ছিল “সূরা ত্বহা”-এর আয়াত যা সেই দিনগুলোতে নাযিল হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) আয়াতগুলো পড়তে লাগলেন এবং হৃদয়ে ঈমানের আলো প্রবেশ করতে লাগল। অবশেষে ব্যাকুল হয়ে বললেন: “আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিয়ে চলো।” [১]

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে হযরত খাব্বাব (রা.), যিনি এতক্ষণ কুঠুরিতে লুকিয়ে ছিলেন, বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন:

---

[১] হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সময়কাল নিয়ে আলোচনা:

হযরত উমর (রা.) নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। (দালাইলুন নুবুওয়াহ লি-আবি নুআইম, পৃ. ৪৩)

এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ হাবশায় হিজরতকারী কাফেলা এবং কুরাইশদের প্রতিনিধি দলের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর সংঘটিত হয়েছিল। নিচের উদ্ধৃতিগুলো দেখুন:

كان اسلام عمر بعد خروج من خرج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحبشة. (সীরাতে ইবনে ইসহাক: ১/১৮৪; সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৪৭; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২/৩৭৩)

ততদিন পর্যন্ত চল্লিশের কিছু কম লোক মুসলমান হয়েছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/২৬৯) যাদের মধ্যে এগারো বা বারোজন নারীও হিজরত করেছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৫৩) সারকথা হলো, এই হিজরত হাবশায় প্রথম হিজরতের পরের ঘটনা। এটিও বলা হয়েছে যে, হাবশায় হিজরত ৫ নবুওয়ীতে হয়েছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১২৫)

এর কতদিন পর হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন? ইবনুল জাওযী একে ৬ নবুওয়ীর ঘটনা বলেছেন। (আল-মুনতাযাম: ৩/৩৮২) ইমাম কাসতাল্লানী আরও স্পষ্ট করেছেন যে, এটি ৬ নবুওয়ীর ঘটনা এবং হাবশায় প্রথম হিজরত ও দ্বিতীয় হিজরতের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২/৩৭৩)

যদি এই সময়কালকে বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়, তবে ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ হাবশায় হিজরতের (রজব ৫ নবুওয়ী) এক বছরেরও বেশি সময় পর হয়েছে। কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখলে এমনটি মনে হয় না। কারণ হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং হাবশায় প্রথম হিজরতের মধ্যে এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান হবে কেন? আসলে এই মহান ব্যক্তিদের নিকট নবুওয়াতের সময় গণনার প্রকৃত মানদণ্ড কী ছিল, যাতে প্রতি বছর নবুওয়াত থেকে শুরু হয়ে রমজানে শেষ হয়, অর্থাৎ এক মত অনুযায়ী রবিউল আউয়াল থেকে এবং অন্য মত অনুযায়ী রমজান থেকে রমজান। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ সাধারণত নবুওয়াতের বছর মহররম থেকে গণনা করেছেন। যদিও কেউ কেউ বলেছেন যে, এর বিপরীতে আসল সময় গণনার হিসাবও রাখা হয়েছে। যেমন নবুওয়াতের সাধারণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যদি দেখা যায়, তবে তা ৫ নবুওয়ী হয়। এখানে বর্ণনাকারীরা যে ৬ নবুওয়ীর কথা উল্লেখ করেছেন, তা আসল সময় গণনা অনুযায়ী, অর্থাৎ রমজান থেকে রমজান হিসেবে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের চতুর্থ মাস ছিল, যখন নবুওয়াতের সাধারণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তা ৫ নবুওয়ীর জিলহজ মাস ছিল। সুতরাং রজব ৫ নবুওয়ী থেকে হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের মধ্যে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধান ছিল।

এখন ঘটনার ধারাবাহিকতা এভাবে দাঁড়ায় যে, রজব ৫ নবুওয়ীতে হাবশায় প্রথম হিজরত হয়, যার পর হযরত উমর (রা.) গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে শুরু করেন। অবশেষে জিলহজ ৫ নবুওয়ীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ধারা কমে আসে। সম্ভবত এই খবরের কারণেই হাবশায় হিজরতকারীরা ৬ নবুওয়ীর মাঝামাঝি সময়ে ফিরে আসেন। মুশরিকরা যখন দেখল যে তাদের চাপ ও অত্যাচার মুসলমানদের ওপর কাজ করছে না এবং উল্টো মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে একটি বড় দল দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত করতে শামিল হয়েছে, তখন তারা শিয়াবে আবি তালিবে অবরোধ শুরু করে। যা এক মত অনুযায়ী মহররম ৭ নবুওয়ী এবং অন্য মত অনুযায়ী মহররম ৮ নবুওয়ীতে শুরু হয়।

আন্দাজ করা যায় যে, হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত শিয়াবে আবি তালিবে অবরোধের কিছুকাল আগে হয়েছিল এবং এই লোকদের চলে যাওয়ার পর শিয়াবে আবি তালিবে অবরোধের সিলসিলা শুরু হয়। যেমনটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাবশায় হিজরতের চেষ্টার কথা ইবনে হিশাম শিয়াবে আবি তালিবের অবরোধের বর্ণনার সময় উল্লেখ করেছেন।

“ওমর! মোবারকবাদ, বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুআ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্তাব অথবা ওমর ইবনে হিশামের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মান দান করুন। মনে হচ্ছে সেই দুআ তোমার পক্ষেই কবুল হয়েছে।” [১]

হযরত ওমর (রা.) সরাসরি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা.)-এর বাড়িতে পৌঁছালেন যেখানে নবী আকরাম (সা.) সেই প্রায় চল্লিশজন সাহাবীর সাথে যারা হাবশায় হিজরত করেননি, সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীনকে জিন্দা করার চিন্তায় মশগুল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত আলী এবং হযরত হামজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। একজন সাহাবী উঁকি দিয়ে দেখলেন এবং জানালেন যে ওমর তলোয়ারসহ দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত হামজা (রা.) বললেন: “আসতে দাও। যদি ভালো উদ্দেশ্য হয় তবে উত্তম। অন্যথায় আমরা তাকে তার তলোয়ার দিয়েই হত্যা করব।”

যখন হযরত ওমর (রা.) ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কিছু বলার আগেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন: “হে ওমর! তুমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও আযাব আসার আগে বিরত হবে না?”

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) দুআ করলেন: “হে আল্লাহ! এ ওমর ইবনুল খাত্তাব। ইলাহী! এর মাধ্যমে দ্বীনকে সম্মান দান করুন।”

হযরত ওমর (রা.) আর স্থির থাকতে পারলেন না, বললেন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রাসূল।”

এ কথা শুনে সকল মুসলমান এত জোরে তাকবীরের ধ্বনি দিলেন যে মক্কার প্রতিটি গলিতে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো।

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেই হুজুর (সা.)-এর নিকট আরজ করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিন।” [২]

হযরত ওমর (রা.) পরদিন সকালে মসজিদে হারামে গিয়ে কাফেরদের সামনে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। কাফেররা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি একাই তাদের সাথে লড়তে থাকলেন। দীর্ঘক্ষণ লড়াই চলল। অবশেষে কাফেররা হতাশ হয়ে পিছিয়ে গেল। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের খবরে পুরো মক্কায় তোলপাড় সৃষ্টি হলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন: “ওমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের বিজয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগে আমরা কাবার পাশে স্বাধীনভাবে সালাত পর্যন্ত আদায় করতে পারতাম না। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি কুরাইশদের সাথে লড়াই করলেন এবং কাবার পাশে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে আমরাও সালাত আদায় করলাম।” [৩]

**প্রথম হাবশা হিজরত থেকে প্রত্যাবর্তন (৬ষ্ঠ নবুওয়াত বর্ষের মাঝামাঝি):**

এই দিনগুলোতে হাবশার মুহাজিরগণ খবর পেলেন যে কুরাইশরা নবী আকরাম (সা.) এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত হয়েছে। এই কথাটি এভাবে ছড়িয়েছিল যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে হারামে সালাত চলাকালীন তিলাওয়াত করতে গিয়ে সূরা আন-নাজম তিলাওয়াত করলেন। এটিই ছিল প্রথম সূরা যাতে সিজদার আয়াত নাযিল হয়েছিল। যখন সূরা মুবারকের শেষে সিজদার আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সিজদা করলেন, তখন মুসলমানদের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত মুশরিকদের ওপরও এমন অবস্থা তৈরি হলো যে তারা সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

---

[১] কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ৩৫৭৩০; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/২১৫; বাবু যিকরি ইসলামি ওমর (রা.)।

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩৩ থেকে ৩৪২; কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ৩৫৭৩০; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/২১৫; বাবু যিকরি ইসলামি ওমর (রা.)। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীর এই বর্ণনাটি যদিও সনদের দিক থেকে দুর্বল, তবে সকল সীরাত লেখক এটি গ্রহণ করেছেন, এটি প্রত্যাখ্যান করার কোনো কারণ নেই।

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৪২... এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রথম হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

এমনকি জিন জাতিও সিজদা করেছিল। ঘটনার বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, কেবল একজন মুশরিক উমাইয়া ইবনে খালাফ দাঁড়িয়ে রইল এবং এক মুঠো মাটি তুলে নিজের কপালে রাখল। পরবর্তীতে সে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। [১]

এই সংবাদ অত্যন্ত অতিরঞ্জিতভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু সূরা আন-নাজমে কাফেরদের উপাস্য: লাত, মানাত এবং উজ্জার উল্লেখ রয়েছে, তাই কাফেররা এতে কিছু শব্দ বাড়িয়ে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, নাউযুবিল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের মূর্তিদের প্রশংসা করেছেন। [২]

এর বিপরীতে কিছু লোক কাফেরদের সিজদা করতে দেখে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মক্কায় সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সিজদা করেছে এবং তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। অথচ বিষয়টি এমন ছিল না। সিজদাকারীরাও একটি বিশেষ অবস্থায় সিজদা করেছিল, যেখানে আবু জাহল, নযর ইবনুল হারিস, উকবা ইবনে আবি মুআইত এবং আস ইবনে ওয়ায়েলের মতো বড় ইসলাম বিদ্বেষীরা (যারা পরবর্তীতে কুফরি অবস্থায় মারা গেছে) সেই সিজদাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তই ছিল না। [৩] তাই সবার মুসলমান হওয়ার কথাটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল। কিন্তু এই সংবাদ আবিসিনিয়ায় (হাবশায়) পৌঁছে যায় এবং তা শুনে আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ নিজ দেশে ফিরে আসার জন্য রওনা হন। [৪]

যাইহোক, যখন তারা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছালেন, তখন জানতে পারলেন যে কুরাইশদের ইসলাম বিদ্বেষ অব্যাহত রয়েছে। এখন মুহাজিরগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখান থেকেই আবিসিনিয়ায় ফিরে গেলেন। বাকিরা কোনো না কোনোভাবে সাময়িকভাবে কুরাইশদের কোনো ব্যক্তির আশ্রয় ও জামানত নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৮৬৩, ৩৮৫৩, কিতাবুত তাফসীর... আল্লামা হালাবী এই ঘটনার তারিখ ৫ নবুওয়ী রমজান উল্লেখ করেছেন। (সীরাতে হালাবিয়্যাহ: ১/ ৪৫৮) যুল-কাদা ও যুল-হিজ্জার মধ্যে সংবাদটি আবিসিনিয়ায় পৌঁছে থাকবে, যার পর ধারণা করা যায় যে ৬ নবুওয়ীর শুরুতে আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল।

[২] কিছু তাফসীর, তারিখ তাবারী এবং তাবাকাত ইবনে সাদ ইত্যাদিতে এই ঘটনার কিছু বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা আন-নাজম তিলাওয়াত করছিলেন, যখন তিনি সেই আয়াতে পৌঁছালেন যেখানে লাত ও মানাতের উল্লেখ আছে, তখন শয়তান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে এই শব্দগুলো জারি করে দিল: "তিলকাল গারানিকুল উলা ওয়া ইন্না শাফাআতাহুন্না লাতুরজা" (এই মূর্তিগুলো অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য)। এটি শুনে কাফেররা খুব খুশি হলো এবং ধারণা করল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সমমনা হয়ে গেছেন, ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তিলাওয়াতের সিজদার সাথে তারাও সিজদা করল। (তারিখুত তাবারী: ২/ ৩৩০, তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/ ২০৫)

এমন বর্ণনাগুলো সনদ ও অর্থগতভাবে বাতিল। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন:
"এই কথাটি কোনো শয়তান জিন বা শয়তান মানুষের ছিল যা মুশরিকরা শুনেছিল। কারণ তাদের অভ্যাস ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তিলাওয়াত করতেন তখন তারা আজেবাজে বকবক করত, যেমনটি কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাদের অভ্যাসের কথা বর্ণনা করেছেন: "লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআনি ওয়ালগাও ফীহি" (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ: ২৬) "তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর মধ্যে শোরগোল সৃষ্টি করো।" এই সূরার ছন্দের সাথে মিল রেখে শয়তানরা এই বাক্যগুলো বলে দিয়েছিল, মুশরিকরা মনে করেছিল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এটি বলেছেন, কারণ এই শব্দগুলো আপনার তিলাওয়াতের মাঝখানে বলা হয়েছিল। আর মাসুম রাসূলের মুখে এই শব্দগুলো জারি হওয়ার যে সম্ভাবনা, তা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমরা কিছু তাফসীরে লিখিত এই কথা দ্বারা প্রতারিত হয়ো না যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে এই শব্দগুলো জারি হয়েছিল। যদি তর্কের খাতিরে এটি সঠিক ধরে নেওয়া হয়, তবে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে যাবে এবং বৈধ হবে যে সঠিক نصوص (নসুস) সম্পর্কেও সন্দেহ করা শুরু হবে যে হয়তো এই কথাটি কোনো শয়তান পড়িয়ে দিয়েছে, অথচ আল্লাহ তাআলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে এ থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন এবং আল্লাহ ওহীকে শয়তানদের থেকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি এভাবে স্পষ্ট করেছেন: "ইয়াসলুকু মিম বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি রাসাদা" (সূরা আল-জিন: ২৭) "আল্লাহ তার সামনে ও পেছনে পাহারাদার ফেরেশতা পাঠান।" (কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিল সহীহাইন: ১/ ৪৭৩, ৪৭৪)

একাধিক গবেষক এই বর্ণনার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। (উমদাতুল কারী: ৭/ ১০০, মিরকাতুল মাফাতীহ: ২/ ৮০০) শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.) এর ওপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা "নাসবুল মাজানীক লি নাসফি কিসসাতিল গারানীক" লিখেছেন যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে এই বর্ণনার কোনো সহীহ সনদ নেই। পুস্তিকাটি পাঠযোগ্য।

[৩] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ঘটনাস্থলে উপস্থিত মুশরিকদের মধ্য থেকে উমাইয়া ইবনে খালাফের সিজদা করতে ইতস্তত করা এবং তার অশুভ পরিণতির কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন, যার অর্থ হলো বাকি মুশরিক যারা সিজদা করেছিল, তাদের পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ এবং উত্তম পরিণতির (হুসনে খাতেমা) তাওফীক হয়েছিল। (ফাতহুল বারী: ২/ ৫৫৪) আর আবু জাহল, উকবা ইবনে আবি মুআইত এবং আস ইবনে ওয়ায়েল যারা কাফের অবস্থায় মারা গিয়েছিল, সম্ভবত তারা এই সময়ে উপস্থিত ছিল না।

[৪] এটি বলাও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত হামজা (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুশরিকরা সাময়িকভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা সাময়িকভাবে কমে গিয়েছিল। এটি এমন এক সময় ছিল যখন অনুকূল পরিস্থিতির সংবাদ মুহাজিরদের ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে।

...প্রবেশ করলেন, যেমন আবু সালামা (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) জনাব আবু তালিবের আশ্রয় লাভ করলেন। উসমান বিন মাজউন (রা.) ওয়ালিদ বিন মুগিরার আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং এভাবে সাময়িকভাবে কুরাইশদের পাকড়াও থেকে বেঁচে গেলেন। [১]

**আবারও নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া:**

যেসব মুসলিম কারো আশ্রয় লাভ করেননি, তারা আবারও জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলেন। এটি দেখে একদিন হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)-এর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল এবং তিনি ওয়ালিদকে বলে দিলেন যে, এখন আমার আর তোমার অভিভাবকত্ব ও নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই। মুশরিকরা তো এমন সময়েরই অপেক্ষায় ছিল, ফলে এক সুযোগে জনৈক মুশরিক তাঁকে এমনভাবে আঘাত করল যে তাঁর একটি চোখ মারাত্মকভাবে জখম হলো। ওয়ালিদ বিদ্রূপ করে বলল: 'আগে তোমার চোখ নিরাপদ ছিল, তুমি এক মজবুত আশ্রয়ে ছিলে।' তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: 'আল্লাহর কসম! আমার দ্বিতীয় চোখটিও এমন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত।' [২]

**দ্বিতীয় হিজরতে হাবশা (নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের শেষভাগ):**

মুসলমানদের জন্য এখন জীবন আগের চেয়েও কঠিন ছিল। বিশেষ করে নাজ্জাশির কাছে শান্তি ও স্বস্তির দিন কাটানোর পর কুরাইশদের জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করা কঠিন ছিল। অবশেষে মুসলমানরা আবারও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে হাবশায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন।

পূর্ববর্তী মুহাজিরদের সাথে আরও অনেক মুসলমান এই কাফেলায় শামিল হলেন এবং মুহাজিরদের সংখ্যা ৮৮ জন পুরুষ এবং ১৯ জন মহিলা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যাদের মধ্যে আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, জাফর বিন আবি তালিব, মিকদাদ বিন আসওয়াদ, শুরাহবিল বিন আব্দুল্লাহ (শুরাহবিল বিন হাসানা), সাকরান বিন আমর এবং তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ (রা.) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। উম্মে হাবিবা বিনতে আবি সুফিয়ান (রা.)-ও তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশসহ কাফেলায় ছিলেন। হযরত জাফর (রা.)-কে তাঁদের আমির নিযুক্ত করা হলো।

তবে হাবশার প্রথম হিজরতে শামিল হওয়া কয়েকজন ব্যক্তিত্ব যেমন: হযরত রুকাইয়্যাহ (রা.), হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) প্রমুখ এবার কাফেলায় শামিল হননি বরং মক্কায় কাফেরদের নির্যাতনের মোকাবিলা করতে থাকলেন। [৩]

---

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৬৯

[২] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৭১, ৩৭২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৬৯

এই মুহাজিরদের মধ্যে হযরত জুবাইর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.), হযরত আবু সালামা (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-এর নাম নেওয়া হয় না বরং তাঁদেরকে হাবশার প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। যদিও সহিহ সনদে এতটুকু বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সবাই সেই কাফেলাতেই ছিলেন যাতে প্রায় ৮০ জন লোক ছিল এবং যার আমির ছিলেন হযরত জাফর (রা.)। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে:

"রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নাজ্জাশির কাছে পাঠালেন এবং আমরা প্রায় আশি জন লোক ছিলাম যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং জাফর... প্রমূখ ছিলেন।" (মুসনাদে আহমাদ, হা: ৪৩০০)

এর পর নাজ্জাশির দরবারে হযরত জাফর (রা.)-এর ভাষণ বর্ণিত হয়েছে। উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণনাটিও প্রণিধানযোগ্য যাতে হযরত জাফর (রা.)-এর ভাষণ রয়েছে, আল্লাহর নাম দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং কুরাইশ প্রতিনিধি দলের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে: "অতঃপর আমরা তাঁর কাছে সর্বোত্তম প্রতিবেশী হিসেবে সর্বোত্তম গৃহে অবস্থান করলাম।" এরপর নাজ্জাশির শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে উম্মে সালামা (রা.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নির্দোষিতার ঘটনা শোনান। (মুসনাদে আহমাদ, হা: ২২৩৪৮, ত-রিসালাহ হাসান সনদে)

[৩] আল-ইসতিয়াব, আল-ইসাবাহ, উসদুল গাবাহ এবং মারিফাতুস সাহাবায় এই ব্যক্তিদের অবস্থা লক্ষ্য করুন, এছাড়া তাঁদের হাদিস বর্ণনার প্রতি অনুরাগ থেকে জানা যায় যে তাঁরা পুনরায় হাবশায় যাননি এবং কয়েক বছর পর হুজুর (সা.)-এর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করেন। পক্ষান্তরে হাবশার মুহাজিররা মক্কা থেকে মদিনায় যাননি বরং সেখান (হাবশা) থেকেই মদিনায় এসেছিলেন।

**নাজাশির দরবারে কুরাইশদের প্রতিনিধি দল (নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগ):**

যখন মক্কার কুরাইশরা জানতে পারল যে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানরা শান্তিতে বসবাস করছে, তখন তারা অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। তারা আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়াকে প্রতিনিধি হিসেবে হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে এই দাবি নিয়ে পাঠাল যে, এই লোকগুলো ধর্মত্যাগী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তাদের আপনার দেশে থাকার অনুমতি দেবেন না বরং আমাদের হাতে তুলে দিন।

নাজাশি একজন বিচক্ষণ ও মধ্যপন্থী মানুষ ছিলেন, তিনি একতরফা অভিযোগ শুনে কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না বরং মুসলমানদের নিজের দরবারে ডেকে এই অভিযোগের ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাইলেন। তখন হযরত জাফর বিন আবি তালিব মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে সেই ভিনদেশে ইসলামের পরিচয় অত্যন্ত ব্যাপক ও কার্যকরভাবে তুলে ধরলেন এবং বললেন:

“হে বাদশাহ! আমরা আগে জাহেল ছিলাম, মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণী খেতাম, অশ্লীলতা, দুশ্চরিত্রতা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলাম, আমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী ছিল সে দুর্বলকে গ্রাস করত। তখন আল্লাহ আমাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠালেন যিনি আমাদেরই বংশের, আমরা তাঁর বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, আভিজাত্য এবং পবিত্রতা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। তিনি আমাদের দাওয়াত দিলেন যেন আমরা আল্লাহকে এক বলে মানি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। আত্মীয়-স্বজন ও নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করি, প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করি। তিনি আমাদের হারাম কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, রক্তপাত, মিথ্যা বলা এবং এতিমের মাল ভক্ষণ থেকে আমাদের বিরত রেখেছেন। যখন আমরা এসব শুনলাম তখন তাঁর ওপর ঈমান আনলাম। এসব বিষয়ের ওপর আমল করার কারণে আমাদের কওম আমাদের পেছনে লেগে গেল এবং আমাদের ওপর জুলুমের পাহাড় ভেঙে পড়ল। আমরা বাধ্য হয়ে আপনার দেশে এই আশায় এসেছি যে এখানে আমাদের ওপর জুলুম হবে না।”

নাজাশি এটি শুনে বললেন: “সেই নবী যা নিয়ে এসেছেন, তার মধ্য থেকে তোমাদের কিছু মুখস্থ থাকলে শোনাও।”

তখন হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু “সূরা মারইয়াম”-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়ে শোনালেন। নাজাশি এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত পাদ্রিরা এটি শুনে এত কাঁদলেন যে তাদের দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল।

নাজাশি বললেন: “এই কালাম এবং মূসা আলাইহিস সালামের নিয়ে আসা কালাম একই উৎস থেকে নির্গত হয়েছে।”

তারপর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিদের বললেন: “তোমরা চলে যাও, আমি এদের কখনোই তোমাদের হাতে তুলে দেব না।”

কুরাইশ প্রতিনিধিরা এটি শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলো। পরের দিন তারা দরবারে একটি নতুন অভিযোগ তুলল এবং বলল: “এই লোকগুলো ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে খুব বেয়াদবিপূর্ণ কথা বলে। তারা তাঁকে আল্লাহর বান্দা মনে করে।”

কুরাইশ প্রতিনিধিদের ধারণা ছিল যে নাজাশি খ্রিস্টান হওয়ার কারণে এটি শুনে উত্তেজিত হয়ে যাবেন এবং মুসলমানদের হত্যা না করে ছাড়বেন না, কিন্তু নাজাশি এবারও তদন্ত ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নিলেন না এবং মুসলমানদের পুনরায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কী বলো?”

হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “তাই, যা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল ছিলেন,”

তাঁর পক্ষ থেকে দানকৃত রূহের অধিকারী ছিলেন, তিনি আল্লাহর এমন এক নির্দেশ ছিলেন যাকে আল্লাহ কুমারী হযরত মারইয়াম-এর মাধ্যমে অস্তিত্ব দান করেছেন।“ নাজ্জাশী এটি শুনে একটি খড় তুললেন এবং বললেন: “হযরত ঈসা (আ.)-ও নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে এই খড় পরিমাণ বেশি কিছু বলেননি।” মোদ্দাকথা, কুরাইশ প্রতিনিধি দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল এবং মুহাজিরগণ হাবশায় শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে থাকলেন। [১]

**নাজ্জাশীর সাহায্যের জন্য মুসলমানদের চিন্তা ও তৎপরতা:**

কিছু দিন পর নাজ্জাশীর বিরুদ্ধে এক শত্রু দাঁড়িয়ে গেল। নাজ্জাশীকে তাকে দমনের জন্য নীল নদ পার হয়ে যেতে হলো। সাহাবীগণ এই সুযোগে কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেওয়া জরুরি মনে করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি নদী পার হয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি জেনে আসবে এবং প্রয়োজন হলে সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছে যাবে। হযরত যুবাইর (রা.), যিনি সবার চেয়ে কম বয়সী ছিলেন, এই খিদমতের জন্য নিজেকে পেশ করলেন। তিনি পানিতে ভরা একটি মশক-এর সাহায্যে নীল নদ পার হয়ে রণক্ষেত্রে পৌঁছে গেলেন। এদিকে সাহাবী ও সাহাবীয়াত নাজ্জাশীর বিজয়ের জন্য দোয়া করছিলেন। [২] শীঘ্রই হযরত যুবাইর (রা.) সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহ বিজয় দান করেছেন। এতে সাহাবীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। [৩]

**হাবশার মুহাজিরদের ফিরে আসার সময়কাল:**

হাবশার এই মুহাজিরদের মধ্য থেকে অনেক ব্যক্তি যেমন: যুবাইর বিন আওয়াম [৪], আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ [৫], আবু সালামাহ, উম্মে সালামাহ [৬], সাকরান বিন আমর এবং সাওদাহ বিনতে জামআহ [৭] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পূর্বেই মক্কায় ফিরে এসেছিলেন।

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ২২৪৯৮ হাসান সনদে; সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/ ৩৩৪ থেকে ৩৩৮।

[২] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ২২৪৯৮।

[৩] যুবাইর হাবশার জমিনে উভয় হিজরতই করেছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/ ৭৫)। যখন যুবাইর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন তিনি মুনজির বিন মুহাম্মদের কাছে অবস্থান করেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/ ৭৫)। সম্ভবত হযরত যুবাইর (রা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী সেই প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ১ হিজরীতে রওনা হয়েছিলেন, যাতে হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রা.) ছিলেন। একারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরত পর্যন্ত হযরত যুবাইর (রা.) মদিনায় ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফর শেষ করে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে শহরের উপকণ্ঠে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৬, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুন নবী সা.)।

[৪] আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ (রা.) হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/ ৩০৯)। অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মদিনায় হিজরতও করেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/ ৩১০)। আর বদর যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ তো প্রসিদ্ধই। (আল-ইসতিআব: ৩/ ১০১৭)। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি কিছুকাল হাবশায় অবস্থান করে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন।

[৫] উম্মে সালামাহ (রা.) নিজের ফিরে আসার ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেন: “আমরা সেখানে উত্তম আবাসে ছিলাম যতক্ষণ না আমরা মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ফিরে এলাম।” (মুসনাদে আহমাদ, হা: ২২৪৯৮)। অর্থাৎ আমরা নাজ্জাশীর কাছে শান্তিতে ছিলাম যতক্ষণ না আমরা মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ফিরে এলাম।

[৬] সাওদাহ বিনতে জামআহ (রা.) তাঁর স্বামী সাকরান বিন আমর (রা.)-এর সাথে মদিনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। এখানে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। (আল-ইসতিআব: ২/ ৬৮৫, ৬৮৭)। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) রমজান ১০ নবুওয়ীতে তাঁকে বিবাহ করেন।

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসা মুহাজিরদের সংখ্যা ৩৩ জন বলেছেন এবং তাঁদের পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন। ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এটি হাবশার প্রথম হিজরত থেকে ফিরে আসাদের তালিকা, কিন্তু তা সম্ভব নয়; কারণ প্রথম হিজরতে বড়জোর ১৫-১৬ জন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এটি প্রথম হিজরত এবং দ্বিতীয় হিজরত থেকে মক্কায় ফিরে আসাদের একটি মিশ্র তালিকা। এতে সেই সকল ব্যক্তিও আছেন যারা কেবল প্রথম হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁরাও আছেন যারা কেবল দ্বিতীয় হিজরতে শরীক ছিলেন যেমন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) (যাঁকে কিছু লোক উভয় হিজরতে এবং কেউ কেউ কেবল প্রথম হিজরতে শরীক মনে করার ভুল করেছেন) এবং তাঁরাও আছেন যারা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় হিজরতেই অংশগ্রহণ করেছিলেন যেমন হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.), উম্মে সালামাহ (রা.) এবং আবু সালামাহ (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর (সা.)-এর হিজরতের পূর্বেই হাবশার মুহাজিরদের একটি বড় অংশ মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের সংবাদ পেয়ে হাবশা থেকে সরাসরি মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। “হাবশার জমিনে হিজরতকারীদের সাধারণ অংশ মদিনার দিকে ফিরে এলেন এবং আবু বকর মদিনার জন্য প্রস্তুতি নিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: ধৈর্য ধরো।” (সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৫)।

অনেক ব্যক্তি হিজরতে মদিনা পর্যন্ত হাবশায় অবস্থান করেন এবং যখন তারা মদিনায় ইসলামের একটি নিরাপদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পান, তখন তারা অবিলম্বে সেখানে পৌঁছে যান, যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। [১]

অনেক ব্যক্তি কমবেশি দশ বছর সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে তাদের সন্তান-সন্ততিও লালিত-পালিত হতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে দু-একজন করে মদিনায় আসতে থাকেন, যেমন উম্মে হাবিবা (রা.) ৬ হিজরিতে শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-এর সাথে মদিনায় তাশরিফ এনেছিলেন। [২] পরিশেষে আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.), তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রা.) এবং অবশিষ্ট মুহাজিরগণ খায়বার যুদ্ধের সময় মদিনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন। [৩]

**হাবশা হিজরতের প্রভাব:**

যদিও হাবশায় মুসলমানদের আগমন বাহ্যিকভাবে কয়েকজন শরণার্থীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে জরুরি স্থানান্তর বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, এভাবেই ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম এশিয়া থেকে বেরিয়ে আফ্রিকায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা এতই নীরবে যে, বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলোর পক্ষে এই চলাচলের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুমান করা সম্ভব হয়নি।

হযরত জাফর বিন আবি তালিব (রা.) এবং বহু সাহাবায়ে কেরাম বছরের পর বছর আফ্রিকার এই অসভ্য কোণে পড়ে ছিলেন। তারা এখানে এত দীর্ঘ সময় পূর্ণ নীরবতার সাথে অতিবাহিত করেন। এই মুষ্টিমেয় মুসলমান নিশ্চিতভাবেই হাবশায় ইসলামের প্রচারের জন্য নয় বরং আশ্রয়ের জন্য এসেছিলেন। সম্ভবত একারণেই হাদিস ও সীরাতের ভাণ্ডারে এখানে তাদের কোনো তাবলীগী ও দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় না। হতে পারে তারা গোপনে এবং ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেছেন, কিন্তু হাবশা থেকে কখনো আফ্রিকান নও-মুসলিমদের কাফেলা মক্কা বা মদিনায় আসতে দেখা হয়নি, যা থেকে অনুভূত হয় যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আরব ভূখণ্ডের বিপরীতে এখানকার বিশেষ পরিস্থিতিতে হিকমতের দাবি এটাই ছিল যে, এখানে মুসলমানদের জন্য সরবরাহকৃত শান্তি ও নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে না ফেলা হয় এবং স্থানীয় শাসক ও পাদ্রিদের কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা উত্তেজনায় লিপ্ত হতে না দেওয়া হয়, বরং যেখানে সম্ভব এমন সহানুভূতিশীল সরকারকে নিজেদের আনুগত্যের ব্যবহারিক প্রমাণও প্রদান করা হয়।

হাবশার মুহাজিরদের এই শান্তিকামী নীতি প্রভাবহীন থাকেনি। এর প্রভাব সেখানে অবশ্যই পড়েছিল; কারণ শেষ পর্যন্ত স্বয়ং হাবশার শাসক ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলমানদের আখলাক ও চরিত্রে তাদের পয়গম্বর (সা.)-এর বরকতময় জীবনের প্রতিফলন দেখে...

---

[১] আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ২ হিজরিতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে মদিনায় পৌঁছেছিলেন, যার উল্লেখ হাদিসের কিতাবসমূহে এভাবে রয়েছে: ثم لم يلبث عبد الله بن مسعود حتى ادرک بدرا (মুসনাদে আহমাদ, হা: ৪৩০০; মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ৯৮৩১)

অন্য একটি বর্ণনা থেকেও এটাই স্পষ্ট হয় যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) হাবশা থেকে ঠিক সেই সময়ে ফিরেছিলেন যখন নামাজে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নামাজ পড়তে দেখেন এবং সালাম দেন কিন্তু উত্তর না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। (সুনানে নাসাঈ, হা: ১২২১, আলবানী বলেছেন: হাসান সহীহ)

অগ্রগণ্য মতানুসারে এই নিষেধাজ্ঞা মদিনায় হয়েছিল; কারণ নামাজের ফরজিয়াত হিজরতে হাবশা প্রথম ও দ্বিতীয় এর তিন-চার বছর পর মেরাজের ঘটনায় হয়েছিল। এরপর নামাজের বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করে যার পূর্ণতা মদিনা মুনাওয়ারায় হয়। সুতরাং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর এই প্রত্যাবর্তন ছিল হিজরতে হাবশা দ্বিতীয় থেকে এবং সেই সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় নয় বরং মদিনায় ছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শব্দগুলো হলো: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اذ كنا بمكة قبل ان نأتي ارض الحبشة (মুসনাদে আহমাদ, হা: ৪৫৭৫)

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/ ২২০-২২১

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪২৩০, বাবু গাযওয়াতি খায়বার

অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল এবং ইসলামের অনুসারী হয়েছিল। যদিও প্রথম শতাব্দীতে আফ্রিকায় ইসলাম সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি যেভাবে এশিয়ায় ছড়িয়েছিল। কিন্তু এই মহাদেশকে ইসলামের চারাগাছ হযরত উসমান গনি, হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সাইয়িদা রুকাইয়া, সাইয়িদা উম্মে সালামা এবং সাইয়িদা উম্মে হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তিত্বরা দিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে এই মহাদেশ শেষ পর্যন্ত বিশ্বে একটি বড় ইসলামী অঞ্চল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আজও সবচেয়ে বেশি মুসলিম দেশ আফ্রিকায় রয়েছে, তাই পশ্চিমারা আফ্রিকাকে 'মুসলিম মহাদেশ' বলে স্মরণ করে থাকে।

**হাবশা হিজরতের শিক্ষা:**

হাবশা হিজরতের ওপর গভীর দৃষ্টি দিলে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যখন মুসলমানরা অসহায় অবস্থায় থাকে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো তাদের ঘিরে রাখে, তখন এমন পরিস্থিতিতে কোনো উপযুক্ত আশ্রয়স্থল খুঁজে নেওয়া উচিত যাতে নিজেদের জীবন, যোগ্যতা এবং শক্তিকে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, কার্যকর সুযোগ এবং ফলপ্রসূ অভিযানে ব্যবহার করা যায়। এখান থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যদি মুসলমানদের কোনো অমুসলিম সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ন্যায়বিচারের ছায়ায় জীবন যাপনের সুযোগ মেলে, তবে তাদের সেখানে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা উচিত যা থেকে অহেতুক তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়ায় বা ভুল বোঝাবুঝি বৃদ্ধি পায়। নিজেদের সম্পদ, দেশের পরিস্থিতি এবং বৈশ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় রেখে পূর্ণ সতর্কতা, হিকমত এবং কৌশলের সাথে দাওয়াতের কাজ পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে এগিয়ে নেওয়া উচিত এবং সরাসরি অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা উচিত।

□□□

**সামাজিক বয়কট (মুহাররম ৮ নবুওয়ী)**

হাবশায় মুসলমানদের একটি নিরাপদ ঠিকানা লাভ করা এবং হযরত হামজা ও হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মতো সাহসী ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরাইশরা সাময়িকভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু শীঘ্রই তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা আবার জেগে ওঠে এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এখন ইসলামকে মিটিয়ে দেবে। তারা স্থির করল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করেই তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

আবু তালিব কুরাইশদের এই অপবিত্র সংকল্পের খবর পেলে সাথে সাথে বনু হাশিমের লোকদের একত্রিত করলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দ্রুত কোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় এবং চারপাশে পাহারা দেয় যাতে কোনো ব্যক্তি আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো ক্ষতি করতে না পারে। কুরাইশদের আগে থেকেই এই আশঙ্কা ছিল যে তাদের সংকল্পের পথে বনু হাশিমই সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, ফলে এখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে বনু হাশিমের সাথে সামাজিক ও সামষ্টিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে এবং তাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমর্থন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। তারা সকলে মিলে একটি চুক্তিপত্র লিখল যার সারসংক্ষেপ ছিল এই:

- "বনু হাশিমের সাথে বিবাহ বা আত্মীয়তার কোনো লেনদেন করা হবে না এবং তাদের সাথে কেনাবেচাও করা হবে না।"

চুক্তির সত্যায়নের জন্য তা কাবায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। [১] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়সের এটি ছিল ৩৮তম বছর।

শি'বে আবি তালিবের কষ্টদায়ক ঘটনাবলী:

নবুওয়াতের ৭ম বছরে বনু হাশিম তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কার সেই পাহাড়ি উপত্যকায় ডেরা ফেলেছিল যা তাদের পারিবারিক মালিকানাধীন ছিল, একে শি'বে বনি হাশিম বলা হতো। [২] অবরুদ্ধদের মধ্যে নারী ও নিষ্পাপ শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা ধর্মীয় আবেগে এবং যারা ঈমান আনেননি তারা পারিবারিক মর্যাদাবোধের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। কেবল আবু লাহাব সাথে না দিয়ে নিজের ইসলাম বিদ্বেষের প্রমাণ দিয়েছিল এবং বনু হাশিম থেকে আলাদা ছিল। আপনি ﷺ আপনার স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.) এবং সন্তানদের নিয়ে উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। চাচা হযরত হামজা (রা.) এখানে আপনার রক্ষক ছিলেন। [৩] হযরত আব্বাস (রা.)-ও এখানেই ছিলেন এবং এই উপত্যকাতেই আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর জন্ম হয়েছিল। [৪]

বনু হাশিম পানাহারের যত সরঞ্জাম নিয়ে যেতে পেরেছিল নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেল এবং অনাহারের উপক্রম হলো। নিষ্পাপ শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করলে তাদের কান্নার আওয়াজ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শোনা যেত। কুরাইশদের এই সামাজিক বয়কট এতটাই কঠোর ছিল যে বনু হাশিমকে মক্কার বাজারে যাতায়াত পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

যদি বাইরে থেকে কোনো সওদাগর শস্য নিয়ে আসত, তবে কুরাইশরা তার অপেক্ষায় থাকত এবং তার কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ সবকিছু কিনে নিজেদের গুদামে ভরে ফেলত যাতে বনু হাশিম কিছুই না পায়। যদি কোনো মুসলিম বা বনু হাশিমের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী উপত্যকার দিকে শস্য বা খাদ্যশস্য নিয়ে যেতে দেখা যেত, তবে কুরাইশরা তাকেও ধরে সবকিছু ছিনিয়ে নিত। কখনো কখনো এমন হতো যে কোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তি গোপনে কিছু খাবার পৌঁছে দিতে সক্ষম হতেন যার ফলে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনের স্পন্দন টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু লোকমা জুটে যেত, অন্যথায় প্রায়ই ঝোপঝাড়ের পাতা খেতে হতো। এমনকি পড়ে থাকা শুকনো চামড়া চিবানোর উপক্রমও হতো। [৫]

অনাহারের একটি দৃশ্য:

বনু হাশিম ছাড়াও আরও অনেক মুসলিম এই বন্দিদশায় শরিক ছিলেন। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), যিনি হাশেমি ছিলেন না বরং বনু জুহরা (অর্থাৎ আবদে মানাফের বংশধর) থেকে ছিলেন, এই উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে বিপদে সবার অংশীদার ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন:

"একদিন প্রস্রাব করতে বসলাম তখন মাটিতে খসখস শব্দ অনুভব করলাম, দেখলাম উটের একটি শুকনো চামড়ার টুকরো। আমি সেটি ধুলাম, পোড়ালাম, পেষণ করলাম এবং পানিতে মিশিয়ে খেয়ে নিলাম, এভাবে তিন দিন কাটিয়ে দিলাম।" [৬]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/ ৮৪, ৮৫, ২৩৬, ২৩৯

[২] মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং ওয়াক্বিদির বর্ণনা অনুযায়ী এটি ১লা মহররম ৭ম নবুওয়াতী সালের ঘটনা। (ত্বাবাক্বাত ইবনে সাদ: ১/ ২০৯) পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনুল জাওযী একে ৮ম নবুওয়াতী সালের ঘটনার অধীনে উল্লেখ করেছেন। (আল-মুনতাযাম: ২/ ৩৮৮)

[৩] এটি এর প্রাচীন নাম ছিল। পরবর্তীতে একেই শি'বে আবি তালিব বলা হতে থাকে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২/ ৩৮২)

[৪] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/ ৩৫১ থেকে ৩৫৩

[৫] ইমাম হাকেম বলেন: "হিজরতের তিন বছর পূর্বে শি'বে (উপত্যকায়) জন্মগ্রহণ করেন।" (মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৬৭৭৭)

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/ ৮৭, ২১৬; সিরাতে ইবনে ইসহাক: ১/ ১৯৩; আর-রওযুল উনুফ: ৩/ ২১৬, ২১৭

এই একটি ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায় যে উপত্যকায় অবরুদ্ধদের অনাহারের কী অবস্থা ছিল! শুধুমাত্র হজের মৌসুমে যখন কাফেররা শত্রুদের সাথে লড়াই করা হারাম মনে করত, তখন এই ব্যক্তিবর্গ কিছুটা স্বাধীনতা পেতেন। নবী আকরাম ﷺ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হাজীদের মাঝে তাবলিগের জন্য বেরিয়ে পড়তেন কিন্তু আবু লাহাব পেছনে লেগে থাকত এবং কটূক্তি করত। এই সময়ে বনু হাশিম ছাড়া অন্যান্য যে মুসলিম পরিবারগুলো ছিল, তারাও এক প্রকার নিজ নিজ ঘরে অবরুদ্ধ ছিল। [১]

**রোম ও পারস্যের যুদ্ধ এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী:**

এটি সেই সময় ছিল যখন (৮ম নববী বর্ষে) রোম ও পারস্যের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল যাতে পারস্য রোমানদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিল। মুশরিকরা যারা মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আগে থেকেই অহংকারী হয়ে উঠেছিল, তারা আরও বেশি দম্ভ করতে লাগল কারণ আকিদার দিক থেকে তারা নিজেদের পারস্যের মুশরিকদের এবং মুসলমানদের রোমান আহলে কিতাবদের নিকটতর মনে করত। ফলে তারা অহংকারের সাথে বলতে লাগল যে, যেভাবে আমাদের পারস্যের ভাইয়েরা রোমান আহলে কিতাবদের পিষে ফেলেছে, ঠিক সেভাবেই আমরা তোমাদের শেষ করে দেব। মুশরিকদের এই আস্ফালনের জবাবে সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয় যাতে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, রোমানরা পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যে পুনরায় বিজয়ী হবে। [২]

মুশরিকরা উপহাস করল যে এমন ভয়াবহ পরাজয়ের পর রোমানরা পুনরায় কীভাবে বিজয়ী হতে পারে। এর জবাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.] বাজি ধরলেন যে যদি পাঁচ বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী না হয় তবে তোমরা জিতবে অন্যথায় আমরা। পরাজিত পক্ষ বিজয়ী পক্ষকে দেওয়ার জন্য জরিমানাও নির্ধারণ করে নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বাজির কথা জানতে পেরে কুরআন মাজীদের শব্দ "বিযআ সিনীন" (بضع سنين)-এর প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.]-কে বাজির শর্তে পাঁচ বছরের স্থলে "নয় বছর" সংশোধন করার পরামর্শ দিলেন। তিনি তেমনই করলেন। সাত বছর পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হলো এবং রোমানরা পারস্যবাসীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল। [৩]

**হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.]-এর হাবশার দিকে হিজরত এবং পথ থেকে ফিরে আসা (৯ম নববী):**

বনু হাশিম অবরুদ্ধ হওয়ার পর পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীতে মুসলমানদের আর কোনো আশ্রয় নেই। এই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.]-এর মতো পাহাড়সম দৃঢ়তার অধিকারী ব্যক্তিও হাবশার দিকে হিজরত করতে বাধ্য হলেন। [৪]

---

[১] রহমাতুল্লিল আলামীন: ১/৯১

[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আর-রূম, আয়াত: ১ থেকে ৩

[৩] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩১৯৩, আবওয়াবুত তাফসীর; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৩৩২, ৩৩৩

ফায়দা: এই ধরণের বাজি ধরা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু তখন পর্যন্ত জুয়া হারামের বিধান নাযিল হয়নি। সাত বছর পর বদর যুদ্ধের সময় (২ হিজরীতে) রোম পারস্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং এভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। (শারহু মুশকিলিল আসার লিত-তাহাবী, হা: ২৯৮৭, ২৯৮৯)

ফায়দা: হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাবশায় হিজরতের অনুমতি শে'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ থাকার সময়ে নিয়েছিলেন, এবং এই দিনগুলোতেই কাফেরদের সাথে বাজি ধরেছিলেন এবং পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরামর্শে তাতে সংশোধন করেছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবরুদ্ধ অবস্থায় শরীক না থাকা সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতেন।

[৪] ইবনে ইসহাক বলেন: যখন মক্কায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.]-এর ওপর পরিস্থিতি সংকীর্ণ হয়ে পড়ল এবং তিনি সেখানে কষ্ট ভোগ করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান দেখলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর আবু বকর [রা.] হিজরতকারী হিসেবে বেরিয়ে পড়লেন। যখন তিনি মক্কা থেকে একদিন বা দুই দিনের পথ অতিক্রম করলেন, তখন ইবনে দাগিনাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৭২)

এই ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

“যখন আমি জ্ঞান লাভ করলাম, তখন আমার পিতামাতাকে দ্বীনের ওপর আমল করতে দেখলাম। এমন কোনো দিন অতিবাহিত হতো না যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের এখানে তাশরীফ আনতেন না। যখন মুসলমানরা কষ্টের সম্মুখীন হলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হাবশায় হিজরতের ইচ্ছা করলেন। তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে হাবশার দিকে রওনা হলেন। যখন তিনি বারক আল-গিমাদে পৌঁছালেন (যা মক্কা থেকে সমুদ্রের দিকে পাঁচ মঞ্জিল দূরে অবস্থিত), তখন তাঁর সাথে ক্বারা গোত্রের সরদার ইবনে দাগুনাহর দেখা হলো।”

ইবনে দাগুনাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: “আবু বকর! কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?”

তিনি বললেন: “আমার কওম আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি ভেবেছি যে, যমীনে সফর করে আমার রবের ইবাদত করব।”

ইবনে দাগুনাহ বললেন: “আবু বকর! তোমার মতো মানুষ না নিজে বের হতে পারে, না তাকে বের করে দেওয়া যেতে পারে। তুমি নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো, সমাজের অভাবী লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করো, মেহমানদারি করো এবং সত্যের কাজে সাহায্য করো। আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি। ফিরে চলো এবং নিজের শহরেই নিজের রবের ইবাদত করো।”

অতঃপর ইবনে দাগুনাহ রওনা হলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে (মক্কায়) আসলেন। সেখানে ইবনে দাগুনাহ কুরাইশ সরদারদের কাছে গেলেন এবং তাদের বললেন: “আবু বকরের মতো মানুষ না নিজে বের হতে পারে, না তাকে বের করে দেওয়া যেতে পারে। তোমরা কি এমন মানুষকে বের করে দিচ্ছ যে নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, সমাজের অভাবী লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করে, মেহমানদারি করে এবং সত্যের কাজে সাহায্য করে?” [১]

কুরাইশরা ইবনে দাগুনাহর আশ্রয় মেনে নিল, হযরত আবু বকর (রা.)-এর জন্য নিরাপত্তা কবুল করল এবং ইবনে দাগুনাহকে বলল: “আবু বকরকে বলো যে, তিনি যেন নিজের রবের ইবাদত ঘরেই করেন। সেখানেই সালাত আদায় করেন এবং যা ইচ্ছা তিলাওয়াত করেন। কিন্তু নিজের তিলাওয়াত দ্বারা আমাদের কষ্ট না দেন। আওয়াজ উঁচু না করেন, কারণ আমাদের ভয় হয় যে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানরা ফিতনায় না পড়ে যায়।”

ইবনে দাগুনাহ এই কথাগুলো হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে দিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) কিছুকাল এই শর্তগুলোর ওপর অটল থাকলেন। নিজের ঘরেই ইবাদত করতে থাকলেন। নিজের সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়তেন না এবং নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তিলাওয়াত করতেন না। তারপর একদিন তাঁর মনে চাইল, তাই তিনি নিজের ঘরের বাইরের আঙিনায় একটি মসজিদ তৈরি করে নিলেন। [২] সেখানে তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুরু করলেন। মুশরিকদের নারী ও শিশুরা তাঁর কাছে জমা হতো। তারা তাঁর কিরাত পছন্দ করত এবং তাঁকে দেখত...

---

[১] লক্ষ্য করুন যে, ঠিক এই শব্দগুলোই হযরত খাদিজা (রা.) প্রথম ওহীর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় বলেছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকালে সম্ভবত ইবনে দাগুনাহ পর্যন্ত হযরত খাদিজার (রা.) এই শব্দগুলো পৌঁছেছিল। নিশ্চিতভাবেই তিনি সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর মধ্যে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের প্রতিফলন দেখেই এমনটি বলেছিলেন।

[২] এটি ছিল উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে নির্মিত প্রথম মসজিদ, যা মসজিদে কুবা এবং মসজিদে নববী থেকেও পাঁচ-ছয় বছর আগে নির্মিত হয়েছিল।

করতেন। হযরত আবু বকর (রা.) খুব ক্রন্দনশীল ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন, তখন নিজের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না। কুরাইশ নেতারা এতে ঘাবড়ে গেল এবং ইবনে দাগিনাহকে ডেকে পাঠাল। সে যখন তাদের কাছে এল, তখন তারা বলল: "আমরা আবু বকরকে এই শর্তে আশ্রয় দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করবেন, কিন্তু তিনি সেই সীমা অতিক্রম করে গেছেন। ঘরের বাইরে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছেন। প্রকাশ্যে সালাত ও কিরাত শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে যে, এভাবে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানরা ফিতনায় পড়ে যাবে। তুমি তাঁর কাছে যাও, যদি তিনি মেনে নেন যে নিজের ঘরেই তাঁর রবের ইবাদত করবেন তবে ঠিক আছে। আর যদি তিনি প্রকাশ্যে ইবাদত করার ওপর অটল থাকেন, তবে তাঁকে বলো যে তিনি যেন তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে দেন। কারণ আমরা এটা পছন্দ করি না যে তোমার আশ্রয়ের অবমাননা হোক। আমরা আবু বকরের প্রকাশ্য ইবাদত অব্যাহত থাকতে দেব না।"

ইবনে দাগিনাহ আবু বকর (রা.)-এর কাছে এল এবং বলতে লাগল: "আপনি জানেন আমি আপনার সাথে কোন শর্তে চুক্তি করেছিলাম। যদি আপনি তার ওপর অটল থাকেন তবে ঠিক আছে, অন্যথায় আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিন। কারণ আমি চাই না আরবে এই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক যে, আমি এক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিলাম কিন্তু আমার আশ্রয় নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।"

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন: "আমি তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহর আশ্রয়েই সন্তুষ্ট আছি।" [১]

## শিয়াবে আবি তালিব থেকে মুক্তি:

শিয়াবে আবি তালিবে অবরুদ্ধ থাকার এই ধারা কমবেশি আড়াই বছর পর্যন্ত চলে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা কিছু কুরাইশ নেতার অন্তর নরম করে দিলেন। তাদের মধ্যে হিশাম বিন عمرو (আমর), জুহাইর বিন আবি উমাইয়া এবং মুতয়িম বিন আদি উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তাঁরা মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লজ্জিত করে এই চুক্তি থেকে সরে আসতে বাধ্য করেন। এভাবে এই বয়কট শেষ হয় এবং বনু হাশিম উপত্যকার প্রাণঘাতী বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায়। [২]

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুল হাওয়ালাত, বাবু জাওয়ারে আবি বকর ফি আহদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আকদিহি; [২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৩৭/৩ থেকে ২৩৯।

ফায়দা (১): ওয়াকিদী এবং ইবনে ইসহাকের মতে অবরোধ ৭ম নববী থেকে শুরু হয়ে তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল অর্থাৎ ১০ম নববী পর্যন্ত। অন্যদিকে উবাইদুল্লাহ বিন মুসার মতে অবরোধ দুই বছর স্থায়ী ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২০৯, ২১০)। ইবনুল জাওযী "আল-মুনতাজাম"-এ অবরোধের সূচনা ৮ম নববীর ঘটনাবলীতে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযীর মতটিই অধিকতর সঠিক মনে হয়, যার সাথে অন্যান্য মতের সমন্বয় এভাবে সম্ভব যে, অবরোধ ৮ম নববীর মহররম থেকে ১০ম নববীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। তাবাকাত ইবনে সাদ (১/২১০)-এর ইবারত: "ওয়াকানা খুরুজুহুম মিনাশ শি'বি ফিস সানাতিল আশিরতি" থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মুক্তি দশম বছরের কোনো এক মাসে হয়েছিল। এই মাসটি এভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, হযরত আবু তালিবের মৃত্যু উপত্যকা থেকে মুক্তির ছয় মাস পর হয়েছিল। (আল-মুহাব্বার: পৃ. ১১) এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাঁর মৃত্যু ১৫ই শাওয়ালের ঘটনা ছিল। যদি ছয় মাস বলতে পূর্ণ ছয় মাস বোঝানো হয়, তবে অবরোধ ১৫ই রবিউস সানি শেষ হওয়া প্রমাণিত হয়। এভাবে অবরোধের সময়কাল দুই বছর সাড়ে তিন মাস হয়, যাকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তিন বছর হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ তৃতীয় বছরটি অপূর্ণ দেখে দুই বছর বলেছেন। ওয়াল্লাহু আলাম।

ফায়দা (২): ৭ম নববী এবং ১০ম নববীতে সৌর ও চান্দ্র পঞ্জিকা একই ছিল, উভয়ের মাসগুলো একসাথে শুরু ও শেষ হয়েছিল। (তাকবীমে আহদে নববী, আলী মুহাম্মদ খান)।

ফায়দা (৩): কোনো কোনো বর্ণনায় চুক্তি শেষ হওয়ার কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে যে, চুক্তিপত্রে উইপোকা ধরেছিল এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত সমস্ত লেখা মুছে গিয়েছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৭৭)। এই বর্ণনাগুলো দুর্বল কি না তা বিবেচনা না করেও বলা যায়, প্রথাগত ও নৈতিকভাবে যদি কোনো চুক্তিনামার লেখা নষ্ট হয়ে যায়, তবে চুক্তি সম্পাদনকারীদের চুক্তি লঙ্ঘনের অধিকার জন্মায় না। প্রাচীন সমাজে মূলত মৌখিক কথারই গুরুত্ব ছিল। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, উইপোকা ধরা চুক্তিটি শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক কারণ হয়েছিল, কিন্তু আসল কারণ এটাই ছিল যে, চুক্তি সম্পাদনকারীরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল এবং কিছু বিবেকবান মানুষের তিরস্কারের কারণে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তারা এমন অমানবিক কাজে অটল থাকলে পুরো আরব সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবে।

**হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল:**

শি'বে আবু তালিবের কষ্ট ৮৫ বছর বয়সী আবু তালিবের স্বাস্থ্যের ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব ফেলেছিল এবং তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত খাদিজা আল-কুবরা (রা.), যাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর হয়েছিল, এই দীর্ঘ পরিশ্রম তাঁকে অর্ধমৃত করে দিয়েছিল। ফলে উপত্যকার বন্দিদশা থেকে মুক্তির কিছুকাল পরেই হযরত খাদিজা আল-কুবরা (রা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এই শোকাবহ ঘটনা ১০ নবুওয়াতের ১০ রমজানে সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে হুজুন নামক কবরস্থানে দাফন করেন। তিনি নিজেই কবরে নেমেছিলেন। সে সময় জানাজার সালাত বিধিবদ্ধ হয়নি। [১] হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরো পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সঙ্গী ও দুঃখের অংশীদার ছিলেন। এমন অতুলনীয় জীবনসঙ্গিনীর বিচ্ছেদের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দুঃখ ও শোকের এমন অবস্থা ছেয়ে গিয়েছিল যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে লাগল। [২]

**জনাব আবু তালিবের প্রস্থান:**

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পঁয়ত্রিশ দিন পর আবু তালিবও নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এটি ছিল নবুওয়াতের একাদশ বছর। [৩] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য এই দিনগুলো ছিল অত্যন্ত শোক ও দুঃখের। এজন্য এই বছরকে 'আমুল হুজন' (দুঃখের বছর) বলা হয়। তাঁর জীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর আবু তালিবের স্নেহের ছায়ায় অতিবাহিত হয়েছিল, যিনি প্রতিটি মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহায্যকারী ও অভিভাবক ছিলেন। স্ত্রী এবং চাচার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেকে একা অনুভব করতে লাগলেন। [৪]

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৩৫৩; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/১৮

[২] যখন খাদিজা ইন্তেকাল করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর তা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল, এমনকি তিনি আয়েশাকে বিয়ে করা পর্যন্ত শোকাচ্ছন্ন ছিলেন। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ১৫২৮৮)

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের সময়ের তাহকীক:

এ কথা নিশ্চিত যে হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল হিজরতের তিন বছর আগে হয়েছিল। নবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের তিন বছর আগে খাদিজা ইন্তেকাল করেন। (সহীহ বুখারী, খণ্ড: ৩৮৯৬, বাবু হিজরাতিন নবী সা.)

তবে ইন্তেকালের মাসের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে আবু তালিবের ইন্তেকাল ১৫ শাওয়াল ১০ নবুওয়াতে হয়েছিল। (আল-মুনতাযাম: ৩/৭) আর হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল এর ৩৫ দিন আগে হয়েছিল। (দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৩৫৩) এই হিসাব অনুযায়ী হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল ১০ রমজানে পড়ে।

দ্রষ্টব্য: সীরাত লেখকগণ যখন নবুওয়াতের অমুক বছর বা অমুক নবুওয়াতী বছর বলেন, তখন তার উদ্দেশ্য সবসময় এক হয় না। এক দলের মতে নবুওয়াতের সূচনা রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল, তারা রবিউল আউয়াল থেকে হিসাব করে প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, দশম বছর গণনা করেন। এক দলের মতে নবুওয়াত প্রাপ্তি রমজানে হয়েছিল, তারা রমজান থেকে হিসাব করে নবুওয়াতের অমুক বছর গণনা করেন।

তৃতীয় দল রবিউল আউয়াল বা রমজানের মতভেদ থেকে বাঁচার জন্য মক্কী ক্যালেন্ডারের মহররম থেকে বছর গণনা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই চলে আসছে যাতে গণনায় সুবিধা হয়। সম্ভবত এর কারণ এটিও যে হিজরত মক্কী ক্যালেন্ডারের মহররম মাসে হয়েছিল, তাই এর পুরো তেরো বছর আগের মহররম থেকে নবুওয়াতের প্রথম বছর গণনা করা হয় যাতে হিজরত পর্যন্ত পুরো তেরো বছর পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির একটি অসুবিধা হলো নবুওয়াতী বছরগুলো প্রকৃত থাকে না; কারণ কারো মতেই নবুওয়াতের সূচনা মহররম থেকে হয়নি। সুতরাং মহররম থেকে নবুওয়াতের বছর গণনা করায় কিছু মাস কম-বেশি হয়ে যায়। যেমন এই প্রসিদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী আবু তালিবের ইন্তেকাল এবং তায়েফ সফরকে নবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে বলা হয়, অথচ রমজানে নবুওয়াত শুরুর প্রকৃত হিসাব অনুযায়ী তখন দশম বছর শেষ হয়ে একাদশ নবুওয়াতী বছর শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদি রবিউল আউয়াল থেকে নবুওয়াতের সূচনা ধরা হয়, তবে তায়েফ সফরের শাওয়াল মাসে দশ বছরও পূর্ণ হয় না বরং পৌনে নয় বছরের শাওয়াল হয়। বছরের গণনার এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য জরুরি হলো নবুওয়াত শুরুর প্রকৃত মাস থেকে নবুওয়াতী বছরের শুরু ও শেষকে বিবেচনায় রাখা।

[৩] আল-মুনতাযাম: ৩/৭; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৩৫৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩০৪, ৩১৬

হযরত সাওদা এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহ:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনের একাকীত্বে কিছুটা স্বস্তি তখন এল যখন একজন সাহাবী সাকরান বিন আমর (রা.)-এর বিধবা হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.) আপনার বিবাহে আসলেন। এটি রমজানুল মুবারকের ঘটনা। [১]

পরের বছর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আপনার খিদমতে এবং নিজের সৌভাগ্যের জন্য নিজের কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কেও আপনার বিবাহে দিয়ে দিলেন। এই সময় শুধু আকদ (বিবাহের চুক্তি) হয়েছিল, বিদায় হয়েছিল তিন বছর পর। [২]

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিজা:

এই দিনগুলোতে মুশরিকরা হুজুর আকরাম (সা.)-কে অপদস্থ করার জন্য দাবি করল যে, আপনি যদি সত্য নবী হন তবে চাঁদকে দুই টুকরো করে দেখান। আল্লাহ তাআলা হুজুর আকরাম (সা.)-এর হাতে এই মুজিজাও প্রকাশ করে দিলেন। আপনার ইশারায় চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর উভয় টুকরো পুনরায় মিলে গেল, কিন্তু মুশরিকরা তবুও বিরত থাকল না; তারা একে জাদু বলে অভিহিত করল এবং তাদের হঠকারিতা স্বস্থানে অটল থাকল। [৩]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৫৩, জীবনী: সাওদা (রা.)। ধারণা করা হয় যে, হযরত সাওদা (রা.)-এর সাথে বিবাহ রমজানের শেষ দিকে হয়েছিল; কারণ ১০ই রমজান হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়েছিল এবং এরপর কিছু দিন গভীর শোক ও দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। তাই এই পরিমাণ বিরতি অবশ্যই হয়ে থাকবে।

[২] এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিদায় বিবাহের তিন বছর পর শাওয়াল মাসে হয়েছিল, মতভেদ রয়েছে বছর নির্ধারণে। এক বর্ণনা অনুযায়ী বিদায় ২ হিজরীর শাওয়ালে হয়েছিল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/১৩৫) পক্ষান্তরে ইবনে সাদের বর্ণনা অনুযায়ী বিদায় হিজরতের ৮ মাস পর শাওয়ালে হয়েছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৫৮, জীবনী: আয়েশা (রা.)) এই হিসেবে বিবাহের আকদ প্রকৃত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১২ নববীর শাওয়ালে হয়েছিল। (যাকে মহররম থেকে মহররমের বার্ষিক সময় গণনা অনুযায়ী ১১ নববীর শাওয়াল বলা হয়)। আর এটিই অগ্রগণ্য মনে হয়। হাফেজ ইবনে হাজারও এটিই গ্রহণ করেছেন। (আল-ইসাবাহ: ৮/৩৩২)

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/২৯৩ থেকে ৩০৩; তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল-কামার, আয়াত: ১, ২।

দ্রষ্টব্য (১): চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে প্রাচীন সীরাত গ্রন্থসমূহ থেকে কেবল এতটুকু ধারণা পাওয়া যায় যে, এই ঘটনা শেআবে আবু তালিব থেকে মুক্তির পর ঘটেছিল। তবে এর অর্থ সম্ভবত এটি বের করা সঠিক হবে না যে, মুক্তির পরপরই এই মুজিজা প্রকাশ পেয়েছিল; বরং ঘটনাবলির গতিপ্রকৃতি সামনে রাখলে প্রবল ধারণা এই যে, প্রথমে হযরত খাদিজা এবং এরপর হযরত আবু তালিবের ইন্তেকাল হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর কাফেরদের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং উপহাসের ঘটনা বেড়ে যায় যার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল এই যে, তারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার দাবি করে বসে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা ধারণা করতে পারি যে, এই ঘটনা নবুওয়াতের দশম বছরের শেষ মাসগুলোতে অর্থাৎ জিলকদ বা জিলহজ মাসের। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য (২): প্রসিদ্ধ আছে যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিজা ভারতেও দেখা গিয়েছিল। মালাবারের রাজা নিজ দেশে এই দৃশ্য দেখে কিছু লোক আরবে পাঠান, পরিস্থিতি ও ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন এবং ঈমান আনেন। (তাফসীরে হাক্কানী, সূরা আল-কামার) কিন্তু এই বিষয়টি প্রমাণের স্তরে পৌঁছায়নি। সঠিক কথা হলো রাজার ইসলাম গ্রহণের এই ঘটনা তাবেয়ীদের যুগের। তিনি তাবেয়ী কেরামদের থেকে এই ঘটনা শুনে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (আদওয়া আলাল হিন্দ, আব্দুল মোনায়েম আন-নামির, পৃ. ৬২ থেকে ৬৩)

## সফর তায়েফের বেদনাদায়ক ঘটনা

আবু তালিবের ইন্তেকালের পর কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে সব ধরনের কষ্ট দেওয়ার প্রকাশ্য সুযোগ পেয়ে গেল। ফলে তাদের বিরোধিতা, শত্রুতা ও অবাধ্যতা দিন দিন বাড়তে লাগল। তারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিজাও দেখেছিল কিন্তু তা-ও অস্বীকার করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের মাঝে ইসলামের প্রসারের কোনো লক্ষণ না দেখে এই চিন্তা করতে বাধ্য হলেন যে, ইসলামের সুরক্ষা ও প্রচারের জন্য অন্য কোনো শহরকে কেন্দ্র বানানো উচিত, যেখানে মানুষ আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী এবং তাঁর ইবাদতকারী হবে।

মক্কা থেকে ৭৫ মাইল (১২০ কিলোমিটার) দূরে তায়েফে সাকিফ গোত্র জনশক্তির দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এখানে অধিকাংশ সচ্ছল ও অবসরপ্রাপ্ত মানুষ বসবাস করত। কুরাইশদের ধনী ব্যক্তিরাও এখানে সম্পত্তি কিনে রেখেছিল। তায়েফের বাইরে বাগান ছিল যেখানে এই লোকেরা গ্রীষ্মকালে আরাম ও বিনোদনের জন্য অবস্থান করত। তায়েফ থেকে কিছু দূরে বনু সাদ গোত্র বাস করত, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাই হালিমা (রা.)-এর দুধ পান করেছিলেন এবং শৈশব কাটিয়েছিলেন। তাই এই আশা ছিল যে, এখানকার লোকেরা আপনাকে দুধ-সম্পর্কীয় আত্মীয় মনে করে সম্মান করবে এবং আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যদি এই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত, তবে মুসলমানরা অনেক বিপদ থেকে মুক্তি পেত এবং দ্বীন প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্র পাওয়া যেত। অবশেষে নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বড় আশা নিয়ে তায়েফের দিকে রওনা হলেন। আপনার সাথে আপনার মুক্ত করা গোলাম যায়েদ বিন হারিসা (রা.) ছিলেন। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে দশ দিন অবস্থান করে মানুষকে সাধারণ ও বিশেষ উভয়ভাবে দাওয়াত দিলেন। আপনি তায়েফের বাজারে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত শোনাতেন এবং মানুষকে আপনার সাহায্য ও সমর্থনের দিকে আহ্বান করতেন।

আবদুর রহমান বিন খালিদ আদওয়ানি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন: “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বনু সাকিফের (তায়েফ শহর) পূর্ব কোণে নিজের লাঠি বা ধনুকের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আপনি তাদের কাছে এসেছিলেন যাতে তাদের থেকে সাহায্য লাভ করতে পারেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সূরা আত-তারিক তিলাওয়াত করতে শুনেছি। আমি তখন মুশরিক ছিলাম কিন্তু আমি এই সূরাটি মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। বনু সাকিফের (সরদাররা) আমাকে ডাকল এবং জিজ্ঞেস করল: তুমি এই ব্যক্তির থেকে কী শুনেছ? আমি তাদের সূরা আত-তারিক শুনিয়ে দিলাম। বনু সাকিফের (সরদাররা)-এর কাছে কুরাইশদের কিছু লোকও ছিল, তারা বলল: ‘আমরা এই লোকটিকে ভালোভাবেই চিনি’।”

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২১১

...ভালোভাবে জানেন। আমরা যদি বুঝতাম যে তিনি সত্য কথা বলছেন, তবে আমরাই সবার আগে তা গ্রহণ করতাম। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ দাওয়াতের পাশাপাশি বিশেষ সাক্ষাৎও করেছেন। তায়েফে বনু সাকিফের বড় সর্দার ছিল তিন ভাই: আবদ ইয়ালীল, মাসউদ এবং হাবীব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে কথা বললেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানালেন এবং ইসলামের প্রসারের জন্য তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার উৎসাহ দিলেন। কিন্তু তারা কেবল দ্বীনের দাওয়াতই প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং আরবের ঐতিহ্যবাহী মেহমানদারির দাবিকেও উপেক্ষা করল এবং অত্যন্ত তিক্ত জবাব দিল। তাদের একজন বলল: "তুমি একজন ধর্মহীন লোক যে কাবার গিলাফ পরে এসেছে।"

দ্বিতীয়জন বলল: "আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাননি যাকে রাসূল হিসেবে পাঠাবেন?"

তৃতীয়জন বলল: "আমি তোমার সাথে কথাই বলতে চাই না; কারণ তুমি যদি সত্যিই নবী হও তবে তোমাকে অস্বীকার করা বিপদ থেকে মুক্ত নয়, আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আমি কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে কথা বলতে চাই না।"

এই সর্দাররা এটাও সহ্য করল না যে আপনি সেখানে অবস্থান করবেন। নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য লোকদের সাথে কথা বলার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু কেউ আপনার দিকে মনোযোগ দিল না, বরং অত্যন্ত অভদ্রতার সাথে বলল যে, আমাদের শহর থেকে এখনই বেরিয়ে যাও এবং যেখানে খুশি চলে যাও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রওনা হলেন, তখন সেই হতভাগারা শহরের বখাটে ছেলেদেরকে উপহাস করার জন্য এবং পাথর মারার জন্য আপনার পেছনে লেলিয়ে দিল। পাথরের বৃষ্টিতে আপনি ﷺ জখম হলেন, ব্যথার তীব্রতায় আপনি বারবার বসে পড়তেন। লোকেরা আপনাকে ﷺ বাহু ধরে ধরে উঠিয়ে দিত এবং আপনি ﷺ যেই চলার জন্য কদম বাড়াতেন, তারা আবার পাথর নিক্ষেপ করত। তায়েফের মাটিতে মহাবিশ্বের পবিত্রতম মানুষের রক্ত এত বেশি ঝরল যে, উভয় জুতো রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.) যিনি আপনার সাথে ছিলেন, তাকে এত পাথর মারা হলো যে তার মাথা ফেটে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে আঘাত সইতে সইতে শহরের সীমানা থেকে বেরিয়ে এলেন। একটি বাগান নজরে এলে আপনি ﷺ তাতে প্রবেশ করলেন। তখন সেই লোকেরা পিছু নেওয়া ছাড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি খেজুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে তাঁর মাওলার কাছে এই দুআ করলেন:

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার লাঞ্ছনা ও অপমানের ফরিয়াদ করছি। হে আরহামুর রাহিমীন! তুমিই দুর্বলদের রব, তুমিই আমার পালনকর্তা। তুমি আমাকে কার হাতে সঁপে দিচ্ছ? এমন কোনো অচেনা পরদেশীর হাতে যে আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভ্রুকুটি করে, নাকি কোনো শত্রুর হাতে যাকে তুমি আমার ওপর বিজয়ী করেছ? হে আল্লাহ! যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও, তবে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। আমার জন্য তোমার নিরাপত্তাই যথেষ্ট। আমি তোমার চেহারার সেই..."

---

[১] মুসনাদে আহমাদ: ৩১/২৮৯; আল-আহাদ ওয়াল মাসানি, হা: ১২৭৩; আত-তারিখুল কাবীর লিল বুখারী: ৪/১৩৮। এই বর্ণনার সনদে যদিও কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে, তবে ইমাম আহমাদ এবং ইমাম বুখারী উভয়ের এটি উদ্ধৃত করা একটি ভালো দিক নির্দেশ করে। তাই এই বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

নূরের উসিলায় সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হয়ে যায় এবং যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কাজ সুশোভিত হয়, আমি এই কথা থেকে আশ্রয় চাই যে আমার ওপর আপনার ক্রোধ নাযিল হোক বা আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হন। আপনার সন্তুষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত জরুরি যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আপনার শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই।

এই অস্থির দোয়ায় আল্লাহ তায়ালার শানে করীমি জোশ কেন আসবে না। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পাঠানো হলো। তিনি এসে আরজ করলেন: "আল্লাহ আপনার কওমের সেই কথোপকথন শুনেছেন যা তারা আপনার সাথে করেছে। এখন সেই ফেরেশতা যে পাহাড়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছে, সে হাজির খিদমত আছে, আপনি তাকে যা চান হুকুম দিন।"

এখন পাহাড়ের ফেরেশতা সালাম করে আরজ করল:
"নির্দেশ হলে দুই পাশের পাহাড়কে মিলিয়ে দিই? যাতে এই কওম মাঝখানে পিষ্ট হয়ে যায়।"

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) রহমত ও করমের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, জবাবে বললেন: "আমি আশা রাখি যে যদি এই লোকেরা মুসলমান না হয় তবে তাদের সন্তানদের মধ্যে এমন মানুষ জন্ম নেবে যারা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করবে।"

এই বাগানে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) অবস্থান করছিলেন, কুরাইশের দুই প্রধান: উতবা এবং শায়বা-এর বাগান ছিল এবং ঘটনাক্রমে সেই সময় তারা দুজনেই সেখানে উপস্থিত ছিল এবং দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসহায়ত্বের অবস্থা এমন ছিল যে তাদের মনও গলে গেল এবং তারা তাদের গোলাম আদ্দাসকে আঙুরের একটি থোকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পাঠাল।

আদ্দাস আঙুর নিয়ে হাজির হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) আহার করার আগে বললেন: "বিসমিল্লাহ"।
আদ্দাস অবাক হয়ে বলতে লাগল: "এই শব্দ তো এখানকার লোকেরা বলে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মনে হলো যে আর কেউ না হোক সম্ভবত এই অপরিচিত শহরে এই গোলামই ইসলামের দাওয়াত কবুল করে নেবে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনত্বের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: "আদ্দাস! তুমি কোথাকার এবং তোমার ধর্ম কী?"
সে বলল: "নিনেওয়ার খ্রিস্টান।" আপনি বললেন: "সেই নেককার ব্যক্তি ইউনুস বিন মাত্তা-এর শহরের।"
সে অবাক হয়ে বলল: "আপনি তার খবর কী করে জানেন?" বললেন: "তিনি আমার ভাই ছিলেন, তিনিও নবী ছিলেন এবং আমিও।"
আদ্দাস বুঝে গেল যে আপনি নবী। সে আপনার হাত চুম্বন করে বিদায় নিল। [১]

**জিনদের ইসলাম গ্রহণ:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফ থেকে ফিরে আসছিলেন। পথে 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করলেন। সেখানে এক রাতে নামাজে তিলাওয়াত করছিলেন যে ৭ বা ৯ জন জিনের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনে বুঝতে পারল যে এটি সত্য দ্বীন। তারা মুসলমান হয়ে গেল এবং সরাসরি তাদের কওমের কাছে গিয়ে ইসলামের খবর দিল। এক প্রাণান্তকর অভিযানের পর এটি ছিল সর্বোত্তম ফল।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৩৪ ও ৩/৩৩৭।
কিছু বর্ণনা অনুযায়ী আদ্দাস তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এর প্রকাশ পরে করেছিলেন। (আল-ইসাবা: ২/৩৮৬)

...ছিল যা রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে জিনের একটি বড় দল উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। [১]

মক্কায় পুনরায় প্রবেশ:

তায়েফ সফর, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের জন্য একটি নিরাপদ দাওয়াতী কেন্দ্র লাভ করতে চেয়েছিলেন, বাহ্যিকভাবে তা ব্যর্থ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু এতেও চরম ঝুঁকি ছিল; কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে মক্কার কুরাইশদের ক্ষোভ ও ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার ওপর আবু তালিবের মতো কুরাইশ নেতার হাতও ছিল না, যাকে সমস্ত কাফেররা সম্মান করত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশঙ্কা ছিল যে, মক্কায় প্রবেশের সময় কুরাইশরা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করবে অথবা চরম কষ্ট দেবে। এই বিপদের কথা বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলেন কারো আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে। এটি আরবদের রীতি ছিল যে, কেউ যদি তাদের কাছে আশ্রয় চাইত, তবে আরবরা তা প্রত্যাখ্যান করাকে তাদের আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করত এবং নিজেদের জান-মালের মতো আশ্রয়প্রার্থীর হেফাজত করত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার এক সম্ভ্রান্ত নেতা মুতয়িম বিন আদি-র কাছে বার্তা পাঠালেন যেন তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন। মুতয়িম বিন আদি তাঁর সশস্ত্র পুত্রদের সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজ হেফাজতে গ্রহণ করলেন এবং হারামে ঘোষণা করলেন: “মুহাম্মদ আমার আশ্রয়ে আছেন।” রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তীতে মুতয়িম বিন আদি-র এই মহানুভবতার কথা স্মরণ করতেন। [২]

মুতয়িম বিন আদি-র আশ্রয়ে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতী কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়েছিল; কারণ আশ্রয়দাতার এ বিষয়ে আপত্তি ছিল যে, তিনি মক্কায় অবস্থান করে ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার করবেন। তবুও তিনি মক্কায় বাইরে বিশেষ করে হজের মৌসুমে বসা বাজার এবং মেলার সমাবেশগুলোতে নিজের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। এর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের জন্য অন্য কোনো আশ্রয়স্থল খোঁজার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৩২; তাফসির ইবনে কাসির, সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ২৯ থেকে ৩১।

ইবনে ইসহাক, ইবনে সাদ এবং অন্যান্যরা বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তায়েফ থেকে মক্কায় ফেরার পথে সাকিফ গোত্রের কল্যাণ থেকে নিরাশ হলেন, তখন তিনি ‘নাখলা’ নামক স্থানে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি রাতের গভীরে সালাত আদায় করছিলেন, তখন জিনের একটি দল তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল যাদের কথা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৩/৩৩৭)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৩২ ও ৩৩৩।

তায়েফ সফরের সময়কাল: ইবনে সাদের মতে, তায়েফ সফর শাওয়ালের শেষে শুরু হয়েছিল। এই সময়ে দশ দিন তায়েফে অবস্থান ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২১১) বালাজুরির মতে, তায়েফ সফরের (যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত) মোট সময়কাল ছিল ১০ম নববী বর্ষের ২৭শে শাওয়াল থেকে ২৩শে জিলকদ পর্যন্ত। (আনসাবুল আশরাফ: ১/২৩৭) যেহেতু হজের মৌসুম নিকটবর্তী ছিল এবং এর আশপাশে দাওয়াতের সুযোগ বেশি থাকত, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ জিলকদ মাসের শেষে ফিরে আসেন যাতে যথারীতি হজ পালনকারীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন। এর ফলে হাজীদের মাঝে দাওয়াতের ফলাফল শুরুতে এবং আরও ভালো ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে কেমন ছিল, তা সামনে বিস্তারিত আসছে।

## দার হিজরত

মক্কা থেকে দুইশ মাইল (৩৩৬ কিলোমিটার) দূরে ‘ইয়াসরিব’ সেই স্থান ছিল যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ নবীর হিজরত, মুসলমানদের হেফাজত ও নুসরাত, ইসলামের শক্তি ও শওকত এবং তাওহীদের দাওয়াত ও প্রচারের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। এই শহর ভৌগোলিক দিক থেকে এতটাই সুরক্ষিত ছিল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম এখানে যেকোনো শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রতিরোধ করতে পারতেন। এটি দক্ষিণ দিক থেকে ঘন বসতি এবং খেজুরের বাগানে এমনভাবে ঘেরা ছিল যে যদি কোনো আক্রমণকারী দল আক্রমণ করত তবে তাকে সারিবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সরু পথ ও গলিতে ঢুকতে হতো এবং এমন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাকে সহজেই পরাস্ত করা যেত। শহরের পূর্ব অংশ যা ‘হাররা ওয়াকিম’ এবং পশ্চিম অংশ যা ‘হাররা ওয়াবরা’ নামে পরিচিত ছিল, আগ্নেয়গিরির লাভা দ্বারা পূর্ণ পাহাড়ে ঘেরা ছিল, যেখানে কোনো কাফেলার তো দূরের কথা, একজন মানুষের চলাও কঠিন ছিল।

শহরের কেবল উত্তর অংশ সমতল ও উন্মুক্ত ছিল। সাধারণ কাফেলাগুলোর পথও এই দিক থেকেই ছিল এবং কোনো শত্রু আক্রমণ করতে চাইলে কেবল এই দিক থেকেই করতে পারত। কিন্তু ‘ইয়াসরিব’-এর বাসিন্দারা তাদের শহরের পূর্ণ প্রতিরক্ষা করতে পারত, এই উদ্দেশ্যে তারা জায়গায় জায়গায় মজবুত দুর্গের মতো হাবেলি তৈরি করেছিল, যেগুলোকে ‘আতাম’ বলা হতো। ইয়াসরিবের রাজনৈতিক পরিবেশও মক্কা থেকে ভিন্ন ছিল। এখানে কোনো একটি গোত্রের একাধিপত্য ছিল না। ইয়ামেন থেকে আসা দুটি শক্তিশালী গোত্র: আউস এবং খাযরাজ তাদের নিজস্ব আলাদা মর্যাদা ও অবস্থান রাখত। এই উভয় গোত্রই বীরত্ব ও সাহসিকতায় অতুলনীয় ছিল। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকর্ম এবং কিতাবি জ্ঞানে বিশিষ্ট ইহুদিদের নিজস্ব একটি পরিচিতি ছিল যারা শহরের উপকণ্ঠে দুর্গের মতো বসতিগুলোতে বাস করত। [১]

### ইয়াসরিবের প্রথম মুসলমান:

সেই দিনগুলোতে আউস এবং খাযরাজের মধ্যে চরম শত্রুতা চলছিল। প্রায়ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হতো, যাতে অনেক মানুষ মারা যেত। নবুওয়াতের ১১তম বছরে আউস গোত্রের বনু আবদিল আশহাল পরিবারের কিছু লোক মক্কায় এসেছিল যাতে কুরাইশদের খাযরাজের বিরুদ্ধে তাদের মিত্র বানাতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাদের আগমনের খবর পেলেন তখন তাদের সাথে দেখা করলেন এবং বললেন: “আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম কিছু বলব না?”

এই বলে তিনি তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন যা শুনে বনু আবদিল আশহালের এক যুবক ইয়াস বিন মুয়াজ বললেন: “ভাইয়েরা! আল্লাহর কসম! এই কথাটি গ্রহণ করে নাও যা তার চেয়ে অনেক উত্তম যার জন্য তোমরা এসেছ।”

কিন্তু বাকি লোকেরা তাকে চুপ করিয়ে দিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। [২]

---

[১] আস-সিরাত আন-নাবাবিয়্যাহ লি আবিল হাসান আলী আন-নাদভী, পৃ. ২০২, ২০৭।

[২] আল-মু’জাম: ৩৮৬/২।

ফায়দা (১): ইবনে জাওযী একে নবুওয়াতের ১১তম বছরের অধীনে উল্লেখ করেছেন যেখান থেকে জানা যায় যে এটি শিয়াবে আবি তালিব থেকে বের হওয়ার (৮ম নবুওয়ী) পর সংঘটিত হয়েছিল।

ফায়দা (২): ইয়াস বিন মুয়াজ ঈমান নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু নিজ দেশে ফিরে খাযরাজ তাকে হত্যা করেছিল এবং তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন। (মা’রিফাতুস সাহাবাহ লি আবি নুয়াইম: ১/২৯৩; ইবনে কাসির এর বর্ণনায় কিছু দিন পর তার মৃত্যু হয়েছিল। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৬৬)

**জঙ্গ-এ বুআছ এবং এর প্রভাব:**

আউস গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের নিজেদের মিত্র বানাতে সফল হতে পারেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বনু খাযরাজদের সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয় যা "জঙ্গ-এ বুআছ" নামে পরিচিত। যুদ্ধের আগে তারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদি গোত্র: বনু নাযির এবং বনু কুরাইজাকে মিত্র বানিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করে নিয়েছিল, ফলে বনু খাযরাজকে প্রাণপণ লড়াইয়ের পর পিছু হটতে হয়েছিল। [১]

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আউস ও খাযরাজের প্রায় সকল বয়োবৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ সর্দার নিহত হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এখানে আগমনের পূর্বে এমন পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিলেন যে এখানে নেতৃত্বের স্থান শূন্য হয়ে গিয়েছিল। [২]

এই যুদ্ধের পর ইহুদিরা বিজয়ী দলের মিত্র হিসেবে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। এতে আউস ও খাযরাজ উভয়ের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, ইহুদিরা পুনরায় এখানে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হবে। এই আশঙ্কা উভয় পক্ষের বুদ্ধিমান লোকদের, যারা আগে থেকেই এই যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, বাধ্য করল যেন তারা কোনোভাবে স্থায়ী ও টেকসই শান্তির পথ বের করে। উভয় গোত্রের রাজনীতিতে খাযরাজের প্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুল এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল যে জঙ্গ-এ বুআছ-এ নিরপেক্ষ ছিল। সে চতুরতা, বাকপটুতা এবং সুযোগ সন্ধানে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। আউস ও খাযরাজের সর্দাররা ভেবে নিয়েছিল যে, আগামীতে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বাঁচতে এবং স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হতে পারে আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ইয়াসরিবের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া এবং শহরটিকে শাসনের আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা। [৩]

**ইয়াসরিববাসীদের প্রথম কাফেলা ইসলাম গ্রহণ করল (১০ নবুওয়ী):**

আউস ও খাযরাজের কল্পনাতেও ছিল না যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা তাদের এমন এক মহান সৌভাগ্য দান করতে যাচ্ছে যাতে তাদের কোনো অংশীদার থাকবে না। তায়েফ থেকে ফেরার পরপরই, ১১ নবুওয়ীর হজ্জের সমাবেশে হুজুর ﷺ নিয়ম অনুযায়ী গোত্রগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দিতে বের হলেন। মিনায় বড় জামরার কাছে পাহাড়ের একটি উপত্যকায় আপনি খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের দেখা পেলেন যারা ইয়াসরিব থেকে হজ্জের জন্য এসেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে শোনালেন।

ইয়াসরিবের লোকেরা তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনত যে, শীঘ্রই একজন নবীর আবির্ভাব হতে যাচ্ছে। হুজুর আকরাম ﷺ-এর নূরানী চেহারা, উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র দাওয়াত তাদের অনেক প্রভাবিত করল এবং তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ইনিই সেই নবী যিনি মানবতার মুক্তিদাতা হবেন। তারপর তারা এটাও অনুভব করল যে, নিজেদের দেশ থেকে গৃহযুদ্ধের স্থায়ী অবসান এবং দেশের অর্থনীতি ও কৃষির ওপর চেপে বসা ইহুদিদের থেকে মুক্তির উপায়ও এটাই হতে পারে যে তারা সবাই এই নবীর ওপর...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ৬০১, ৬০২... এই যুদ্ধ বনু কুরাইজার দুর্গের নিকটবর্তী "বুআছ" উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। (আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/ ৬০৩)

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯৩০, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাকদামিন নবী ওয়া আসহাবিহিল মাদীনাহ।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪৫৬৬, কিতাবুত তাফসীর, বাবু ওয়া লাতাসমাউন্না মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাব; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি-আবীল হাসান আলী আন-নাদভী, পৃ. ২০২ থেকে ২০০।

ঈমান নিয়ে এলেন। তারা বলতে লাগলেন: “আমরা আমাদের কওমকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তাদের মধ্যে যতটা অনিষ্ট ও ফাসাদ রয়েছে, দুনিয়ার আর কোথাও তা নেই। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন।”

ইয়াসরিবের এই ছয় ব্যক্তি যারা সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন: আসআদ বিন যুরারাহ, আওফ বিন হারিস, রাফে বিন মালিক, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, কুতবাহ বিন আমির এবং উকবাহ বিন আমির। তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চারদিকে এই নতুন পয়গাম ছড়িয়ে পড়ল, সেই সময় অনেক মানুষ মুসলমান হয়ে গেল। [১]

ইয়াসরিবের ঘরে ঘরে আলোচনা হতে লাগল যে মক্কায় একজন সত্য নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাদেরকে তাদের কওমের পক্ষ থেকে কঠোর কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তিনি কুরাইশ ও হাশেমী বংশের, আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র এবং আব্দুল্লাহর পুত্র। ইয়াসরিববাসীদের জন্য এই বংশ পরিচয় অপরিচিত ছিল না। তারা জানত যে অনেক আগে তাদেরই একটি গোত্র বনু নাজ্জারের মেয়ে সালমা বিনতে আমর কুরাইশ সরদার হাশেমের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের বড়দের জানা ছিল যে আব্দুল মুত্তালিব তার শৈশব এই গলিগুলোতে খেলাধুলা করে কাটিয়েছেন এবং এখানকারই এক মেয়ে ফাতিমা বিনতে আমর বিন আয়েযের সাথে বিবাহ করেছিলেন যার গর্ভে আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বনু নাজ্জারের বয়স্ক মহিলারা সেই দিনগুলো মনে রেখেছিলেন যখন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব তাদের এখানে অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং এখানেই সমাহিত হয়েছিলেন। আমিনা বিনতে ওয়াহাবও তার স্বামীর কবরের যিয়ারতের জন্য আসা-যাওয়া এবং ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা ভুলে যাননি যে ছয় বছরের ‘মুহাম্মদ’ তার সাথে ছিলেন। আজ সেই ‘মুহাম্মদ’-এর একজন পথপ্রদর্শক এবং একজন পয়গম্বর হিসেবে সামনে আসা, মানুষকে আল্লাহ তাআলার তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং আসমানী হেদায়েতের দিকে আহ্বান করা তাদের জন্য যেখানে অভাবনীয় ছিল সেখানে এক আপনত্বের অনুভূতিও মিশে ছিল।

**বায়আতে উকবা উলা (১১ নববী):**

পরের বছর ১২ নববীতে হজের মৌসুমে আউস ও খাযরাজ গোত্রের বারোজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তারা ঈমান এনেছিলেন এবং এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারত ছাড়াও সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে এবং দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বারোজন ব্যক্তির মধ্যে হযরত আসআদ বিন যুরারাহ, হযরত উকবাহ বিন আমির, হযরত উবাদাহ বিন সামিত এবং হযরত মালিক বিন তাইয়িহান-এর মতো ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা পরবর্তীতে অনেক প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ থেকে বিধিবদ্ধ বায়আত নিলেন, যাতে শিরক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা থেকে বিরত থাকা এবং প্রতিটি নেক কাজে আনুগত্য করার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। একে ‘বায়আতে উকবা উলা’ বলা হয়। [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে হযরত মুসআব বিন উমাইর এবং অন্ধ ক্বারী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম-কে কুরআনে মাজীদের শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। [৩] তারা হযরত আসআদ বিন যুরারাহ-এর বাড়িতে অবস্থান করলেন এবং ইসলামের নতুন কেন্দ্রে তাওহীদের দাওয়াত, নামাযের ইমামতি এবং কুরআনে মাজীদের তালীমের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। [৪]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৪২৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৭৩, ৩৭৪।

[২] পূর্বোক্ত সূত্র।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/৩৩৩; সহীহ বুখারী, হা: ৩৯২৩, বাবু হিজরাতিন নবী ﷺ, কিতাবুল মানাকিব। কুরআনে মাজীদের তালীমে শুরু থেকেই অন্ধ ব্যক্তিদের অবদানের কথা স্মরণ রাখা উচিত, এই সব হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম-এর উত্তরসূরি। - জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

[৪] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৪২৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৭৩, ৩৭৪।

চার বছর আগে সংঘটিত আউস ও খাযরাজ গোত্রের ঐতিহাসিক লড়াই ‘বুআসের যুদ্ধে’ উভয় পক্ষের বড় বড় সর্দাররা নিহত হয়েছিলেন, যার পর আউসের নেতৃত্ব সা’দ বিন মুআয এবং খাযরাজের নেতৃত্ব সা’দ বিন উবাদাহর হাতে ছিল। যখন মুসআব বিন উমাইর এবং আসআদ বিন যুরারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন, তখন আউসের সর্দার সা’দ বিন মুআয তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে নিলেন। তাঁর চাচাতো ভাই উসাইদ বিন হুযাইরও, যিনি গোত্রের নায়েবে সর্দার এবং সেনাপতি ছিলেন, ঈমান নিয়ে আসলেন।

এই নতুন উদ্দীপনা কেবল আউস ও খাযরাজের পূর্ব শত্রুতার দাগই মুছে দেয়নি, বরং শহরে একটি নতুন ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন এবং আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলকে শাসক বানানোর যে পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, এখন তা পরিত্যাগ করা হলো। কারণ টেকসই শান্তি ও স্থায়ী ঐক্যের সর্বোত্তম কর্মপন্থা তাদের হাতে এসে গিয়েছিল। [১]

---

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ২/২১৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/৩৮৮, ৩৮৯

https://t.me/BoierSomahar

**সফর-এ-মিরাজ**

গত কয়েক বছর ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, তাঁর সেই ক্ষত উপশম করার জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমন এক সম্মানজনক সফর দান করেন, যা ইতিপূর্বে কোনো মানুষকে দেওয়া হয়নি। এটি ছিল 'সফর-এ-মিরাজ'-এর মর্যাদা, যাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নিয়ামত ও অলৌকিক ঘটনার বর্ষণ করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে হারামে ঘুমাচ্ছিলেন, এমন সময় ফেরেশতাদের সর্দার জিবরাঈল (আ.) তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর সাথে ঘোড়ার মতো দেখতে একটি ডানাযুক্ত প্রাণী ছিল যাকে 'বুরাক' বলা হতো। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এর ওপর সওয়ার করালেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে মসজিদে হারাম থেকে শামের দিকে রওনা হলেন। বুরাকের গতির অবস্থা এমন ছিল যে, যেখানে দৃষ্টি পৌঁছাত সেখানেই তার কদম পড়ত। সফরের এই প্রথম পর্যায়কে 'ইসরা' বলা হয়। বাইতুল মুকাদ্দাসে মসজিদে আকসায় পৌঁছে সফর শেষ হলো, যেখানে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত কমবেশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে সালাত আদায় করলেন এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 'ইমামুল আম্বিয়া' হওয়ার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটল।

এখান থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সফরের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, যাকে 'মিরাজ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে আসমানের উচ্চতায় পৌঁছালেন। একে একে আপনি সাত আসমান ভ্রমণ করলেন। প্রতিটি আসমানের দরজায় ফেরেশতারা আপনাকে স্বাগত জানালেন। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.), তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আ.), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আ.) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। হযরত ইব্রাহিম (আ.) বাইতুল মামুরের দরজার সামনে বসে ছিলেন, যা ঠিক কাবার ওপরে অবস্থিত। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এটি তাওয়াফ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জাহান্নাম এবং তাতে অবাধ্যদের দেওয়া বিভিন্ন শাস্তি দেখানো হলো। একইভাবে জান্নাত এবং এর নিয়ামতসমূহও দেখানো হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছালেন, যা আরশে ইলাহির নিচে একটি পবিত্র কুল গাছ, যেখানে ফেরেশতাদের ভিড় থাকে। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তাআলার খাস দরবারে পৌঁছালেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিদার দান করলেন যেমনটি তাঁর শানের উপযোগী। এখানে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উম্মতে মুসলিমার জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের উপহার দিলেন। হযরত মুসা (আ.)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (সা.) বারবার কমানোর আবেদন পেশ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ রাখলেন এবং পুরো পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান সওয়াব প্রদানের সুসংবাদ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এই ঘটনার পর পূর্ণ সম্মানের সাথে তাঁর বিছানায় পৌঁছে দেওয়া হলো। এই দুনিয়ায় তখন পর্যন্ত এতটুকু...

অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছিল যে আপনার ﷺ বিছানা তখনও গরম ছিল। সকালে রসূল ﷺ যখন এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন, তখন মুশরিকরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী উপহাস করতে শুরু করল। আবু জেহেল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কটাক্ষ করে বলল: "তোমার সাথী বলছে যে সে রাতারাতি বাইতুল মুকাদ্দাস এবং আসমানসমূহ ভ্রমণ করে এসেছে, তুমি কি একেও সত্য বলে মানো?"

সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো দ্বিধা ছাড়াই বললেন: "হ্যাঁ! আমি তাঁর কথাকে যে কোনো অবস্থাতেই সত্য বলে মানি।"

মোটকথা, মুসলমানরা এই ঘটনার সত্যায়ন করল এবং আল্লাহর ওপর তাদের ঈমান আরও মজবুত হয়ে গেল। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের ব্যবস্থা আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ও নৈকট্য বাড়িয়ে দিল। মেরাজের এই ঘটনা জাগ্রত অবস্থায় এবং সজ্ঞানে ঘটেছে, স্বপ্নে নয়। যদি স্বপ্ন হতো তবে একে একটি মুজিজা এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হতো না, আর মুশরিকরাও একে নিয়ে উপহাস করত না, কারণ স্বপ্নে মানুষ যা খুশি দেখতে পারে। [১]

মেরাজের ঘটনা এই বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সারা বিশ্বের নেতৃত্ব ও ইমামতের জন্য এসেছেন। আপনার ﷺ নবুওয়াত কোনো একটি শহর বা দেশের জন্য নয়, বরং এর পরিধি পুরো পৃথিবী তথা পুরো মহাবিশ্বের ওপর পরিব্যাপ্ত। পূর্ববর্তী সকল উম্মত এখন আপনার অনুসরণ ছাড়া মুক্তি পেতে পারে না, কারণ তাদের নবী ও রসূলগণও আপনার ﷺ মুক্তাদিদের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ঘটনা এই ইঙ্গিতও দিয়েছে যে, মুসলমানদের দারিদ্র্য, দুর্বলতা এবং স্বল্পতা সত্ত্বেও ইসলাম শীঘ্রই বিশ্বের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং হকের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/২৯ থেকে ২৮৫, তবা দার হিজর; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৬৫০, ৬৫১, তবা দারুল কিতাব আল-আরাবি।
নোট: মেরাজের ঘটনার মাস ও বছর সম্পর্কে তীব্র মতভেদ রয়েছে। সাধারণত ২৭ রজব ১০ নবুওয়ী প্রসিদ্ধ, আল্লামা আইনি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৭ নবুওয়ীকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন। (উমদাতুল কারী: ৩/৩৯) হাফেজ আব্দুল গনি মাকদিসি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "সীরাতে নববীয়্যাহ"-তে "১৭ রবিউল আউয়াল"-কে অগ্রগণ্য বলেছেন, কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। হাফেজ ইবনে কাসীর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৩/২৭)-তে এ ছাড়াও নিম্নোক্ত অভিমতগুলো উল্লেখ করেছেন:

- ইবনে আসাকির রহমাতুল্লাহি আলাইহির نزدیک নবুওয়াতের প্রাথমিক বছরগুলোতে (হিজরতের ৫ বছর আগে)।
- ইবনে ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে ১০ নবুওয়ীতে (মাস অজানা)।
- সুদ্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য অনুযায়ী হিজরতের ১৬ মাস আগে (১২ নবুওয়ীর জিলকদ মাসে)।
- জুহরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে হিজরতের এক বছর আগে (১৩ নবুওয়ীর রবিউল আউয়াল মাসে)।

হাফেজ ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই অভিমতটিকে দলিলের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন যার মতে এটি হিজরতের পাঁচ বছর আগের ঘটনা, এরপর তিনি মেরাজের সময় নির্ধারণে দশটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। সুদ্দী থেকে তিনি এটি বর্ণনা করেছেন যে, মেরাজ হিজরতের ১৭ মাস আগে হয়েছিল এবং বলেছেন যে এই হিসাব অনুযায়ী মেরাজ রমজান বা শাওয়াল মাসে হবে। তবে বাকি অভিমতগুলোর মধ্যে কোনোটিকে প্রাধান্য দেননি। (ফাতহুল বারী: ৭/২০৩)
প্রকৃতপক্ষে এই মতভেদে কোনো একটি অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে এই সকল অভিমত দুর্বল বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে। এমতাবস্থায় উত্তম পন্থা হলো ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে যুক্তিযুক্ত পথ অবলম্বন করা। হিজরতের পাঁচ বছর আগে বা এক বছর আগের অভিমত ঘটনার গতিপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে হিজরতের ১৭ মাস আগের অভিমত যা হাফেজ ইবনে হাজার সুদ্দীর বরাতে বর্ণনা করেছেন তা যুক্তিযুক্ত। এই বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য ইবনে সা'দ-এর যা সুদ্দীর বর্ণনার কাছাকাছি: "فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا" (তাবাকাত ইবনে সা'দ: ১/২১৩) অর্থাৎ মেরাজের ঘটনা হিজরতের ১৮ মাস আগে ১৭ রমজানে ঘটেছিল। এই ১৭ রমজান মাদানি যা সৌর পঞ্জিকার ২৭ রজবের সমান্তরাল। আর যদি মক্কি পঞ্জিকায় ২৭ রজব প্রসিদ্ধ হয় তবে মাদানি পঞ্জিকায় বিশুদ্ধ চান্দ্র ক্যালেন্ডারে এটি ২৭ রমজান ১২ নবুওয়ীর ঘটনা হবে। যার ঈসায়ী তারিখ হবে ২৪ এপ্রিল ৬২১ খ্রিষ্টাব্দ। আলী মুহাম্মদ খান এটিকেই গ্রহণ করেছেন। (তাকভীমে আহদে নববী, পৃ: ৮০, ১৬)

## বিয়াত আকাবা সানিয়া (১২ নবুওয়ী):

১৩ নবুওয়ীতে হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.) ইয়াসরিব থেকে হাজীদের একটি বড় কাফেলার সাথে মক্কায় আসলেন। হজ্জের পর ১২ই জিলহজ্জের রাতে মিনার সেই গিরিপথে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সমবেত হলেন। [১] তারা ছিলেন ৭৫ জন ব্যক্তি—৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা। তারা সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর জান, মাল ও জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করতে এসেছিলেন এবং আপনাকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস, যিনি সেই সময় পর্যন্ত মুসলমান হননি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সমর্থন করতেন, ইয়াসরিববাসীদের আগ্রহ দেখে বললেন: "ভেবে নাও! তোমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ, যদি তা সত্যিই পূরণ করতে পারো এবং মুহাম্মদকে তাঁর শত্রুদের থেকে রক্ষা করতে পারো তবে ঠিক আছে। অন্যথায় এখনই ক্ষমা চেয়ে নাও; কারণ মুহাম্মদ আমাদের হেফাজতে আছেন। এমন যেন না হয় যে তোমরা তাঁকে নিয়ে গেলে আর তারপর শত্রুদের হাতে সঁপে দিলে।"

তারা বললেন: "আপনি (সা.) আমাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিতে চান, তা নিন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "বিয়াত করো যে, তোমরা আমার সেভাবেই হেফাজত করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাজত করো।"

হযরত বারা বিন মা'রুর (রা.) আবেগের আতিশয্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাত ধরলেন এবং বিয়াত করে বললেন: "সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা আপনার সেভাবেই হেফাজত করব যেভাবে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের হেফাজত করি। আমরা যুদ্ধবাজ লোক। যুদ্ধ আমাদের আজমায়ী বংশীয় ঐতিহ্য।"

এখন সকল উপস্থিত ব্যক্তি বিয়াত করলেন। এই সুযোগে আবুল হাইসাম বিন তাইয়িহান (রা.) আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এমন যেন না হয় যে যখন আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করবেন তখন আপনি আমাদের ছেড়ে নিজের কওমের কাছে চলে যাবেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি হাসলেন এবং বললেন: "না। নিশ্চিন্ত থাকো। যার সাথে তোমরা লড়বে আমি তার সাথে লড়ব। যার সাথে তোমাদের সন্ধি হবে তার সাথে আমারও সন্ধি হবে। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত এবং তোমাদের সম্মান আমার সম্মান।"

এটি ছিল সেই ভিত্তিপ্রস্তর যার ওপর দুনিয়ার জন্য একটি আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি ছিল। এই বিয়াত 'বিয়াত আকাবা সানিয়া' নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের মধ্য থেকে বারোজন নকীব (দায়িত্বশীল ব্যক্তি) নিযুক্ত করলেন, তারা হলেন: আসআদ বিন যুরারাহ, সা'দ বিন রাবী', সা'দ বিন উবাদাহ, উসাইদ বিন খুদাইর, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, বারা বিন মা'রুর, উবাদাহ বিন সামিত, রাফে' বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন আমর, মুনযির বিন আমর, সা'দ বিন খাইসামাহ এবং আবুল হাইসাম বিন তাইয়িহান (রা.)। [২]

## বিয়াতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ:

বিয়াতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন: আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (শহীদে গাযওয়ায়ে ওহুদ), আবু আইয়ুব আনসারী (খালিদ বিন যায়েদ), আউস বিন সাবিত, আবু তালহা আনসারী (যায়েদ বিন সাহল), সা'দ বিন রাবী' (শহীদে গাযওয়ায়ে ওহুদ), আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (আযানের স্বপ্নদ্রষ্টা)।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৫১৩

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩৮১

খল্লাদ বিন সুওয়াইদ (খন্দক যুদ্ধে শহীদ), মুয়াজ বিন জাবাল এবং উবাদাহ বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম উল্লেখযোগ্য। [১] বনু মাজিনের যায়েদ বিন আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুরো পরিবারসহ এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে আম্মারা রাযিয়াল্লাহু আনহা (নুসাইবা বিনতে কাব) এবং দুই ছেলে হাবিব বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [২]

বায়য়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী মুসলমানরা যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা পূরণ করে দেখিয়েছেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ-এর ওপর জান ও মাল উৎসর্গ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং বদর, ওহুদ ও খন্দকের মতো যুদ্ধগুলোতে তাঁদের অধিকাংশ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকে শহীদ হন।

**সাহাবীদের হিজরত:**

বায়য়াতে আকাবায়ে সানিয়ার কিছুকাল পর নবুওয়াতের ১৩তম বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুসলমানদেরকে আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে নিজেদের ঘরবাড়ি ও স্বদেশ চিরতরে ত্যাগ করে ইয়াসরিবে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন:

“আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মক্কা থেকে একটি খেজুর বাগান সমৃদ্ধ ভূমির দিকে হিজরত করছি। আমার ধারণা হয়েছিল যে সেটি ইয়ামামা বা হাজারের এলাকা। কিন্তু সেটি তো মদিনা ইয়াসরিব।” [৩] স্বদেশ ত্যাগের এই আমল ‘হিজরত’ নামে অভিহিত হলো। মুসলমানরা ধীরে ধীরে ইয়াসরিবের দিকে যেতে লাগলেন। হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আম্মার বিন ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৪]

কুরাইশরা এই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল যে, আউস ও খাযরাজ গোত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে, তাই তারা হিজরতকারীদের পথে সম্ভাব্য সকল বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করল। পরিবারসহ সর্বপ্রথম আবু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং এক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে মুশরিকরা তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং বলে: “যদি যেতে চাও তবে যাও, কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানকে আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হবে।” আবু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁদেরকে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে চলে গেলেন। হযরত উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা এক বছর পর্যন্ত তাঁর পিত্রালয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন এবং শিশুটি তার পিতৃগৃহে মা-বাবার থেকে দূরে ছটফট করতে থাকে।

সুহাইব রুমি রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হিজরত করতে উদ্যত হলেন, তখন কুরাইশরা পিছু ধাওয়া করে তাঁকে আটকে দিল। অবশেষে তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ এবং গোপন সম্পদের ঠিকানা বলে দিয়ে মুক্তি পান। একমাত্র হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন যিনি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে হিজরত করেছিলেন এবং তাঁর প্রভাব ও প্রতাপের কারণে কেউ তাঁকে বাধা দেওয়ার সাহস করেনি। [৫]

---

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/ ৪৬০ থেকে ৪৬৮

[২] এই মাজনি পরিবারটি আত্মোৎসর্গের এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত ছিল। যায়েদ বিন আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদ যুদ্ধে তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে আম্মারা (নুসাইবা বিনতে কাব) রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং দুই ছেলে আবদুল্লাহ বিন যায়েদ ও হাবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সহ শরিক হন। ওহুদ যুদ্ধে উম্মে আম্মারা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুরক্ষায় যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তা ইসলামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। হাবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে খতমে নবুওয়াতের ঝাণ্ডা উড্ডীন রেখে মুসাইলামা কাযযাবের হাতে শহীদ হন। উম্মে আম্মারা রাযিয়াল্লাহু আনহা মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ অংশগ্রহণ করেন, তিনি আহত হন এবং একটি হাতও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর ছেলে মুসাইলামা কাযযাবকে খতম করেন। এই আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হাররার যুদ্ধে ইয়াজিদি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন। (আল-ইসাবাহ, উসদুল গাবাহ, আল-ইসতিয়াব: নুসাইবা রাযিয়াল্লাহু আনহা, হাবিব বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু)

[৩] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯২৩, বাব হিজরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিতাবুল মানাকিব

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/ ৪২০ থেকে ৪২৩ ... সাহাবীদের হিজরতের সময় নবুওয়াতের তেরো বছর পূর্ণ হয়েছিল এবং নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের তৃতীয় মাস ছিল।

## রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের সফর (রবিউল আউয়াল ১ হিজরি / সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.)

নবী করীম ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনও হিজরতের নির্দেশ পাননি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থেমে ছিলেন, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল যে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সফরের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য যেন নসিব হয়। তিনি সফরের জন্য দুটি উটনী সংগ্রহ করেন এবং চার মাস পর্যন্ত সেগুলোকে বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। [১]

সাহাবীগণ মক্কা থেকে রওনা হতে থাকলেন। উসমান বিন আফফান, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, জুবায়ের বিন আওয়াম, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, জায়েদ বিন খাত্তাব, হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব এবং জায়েদ বিন হারিসা (রা.) সহ ধীরে ধীরে সকলেই হিজরত করে গেলেন। কেবল এমন কিছু অসহায় মুসলমান পেছনে রয়ে গেলেন যারা কাফেরদের কবলে আটকে ছিলেন এবং হিজরত করতে একেবারেই অক্ষম ছিলেন। [২]

হিজাজের অন্যান্য এলাকায় এমন কিছু সাহাবী ছিলেন যাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে মেহমানদারির সম্মান দান করুন। তাঁদের মধ্যে ইয়ামেনি গোত্র দাওস-এর এক নিবেদিতপ্রাণ তুফাইল বিন আমর (রা.) নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন এবং নিজের মজবুত দুর্গে আসার আবেদন জানান। কিন্তু এই সম্মান আল্লাহ আনসারদের ভাগ্যে রেখেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তুফাইল বিন আমর (রা.)-এর আবেদন গ্রহণ করেননি। [৩]

### প্রাণঘাতী হামলার ষড়যন্ত্র:

কুরাইশদের মনে মুসলমানদের হিজরত নিয়ে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, তারা একটি কেন্দ্র তৈরি করার পর মক্কার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে মক্কার "দারুন নদওয়া"-তে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হলো যাতে ইসলামের নবী ﷺ সম্পর্কে এমন এক চূড়ান্ত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যাতে এই নতুন দ্বীন আর ছড়িয়ে পড়তে না পারে। সভায় প্রতিটি বংশের প্রধানগণ যেমন: উমাইয়া বিন খালাফ, আবু সুফিয়ান, আবু জাহেল, নযর বিন হারিস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কেউ পরামর্শ দিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বন্দি করা হোক। কেউ বলল যে দেশান্তর করে দেওয়াই যথেষ্ট।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৫, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুন নবী ﷺ।

ফাওয়াইদ: বায়আতে আকাবা সানিয়া ১২ই জিলহজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩ই নবুওয়াত বর্ষে হিজরতের নির্দেশ নাজিল হয়েছিল এবং সাহাবীদের হিজরত শুরু হয়েছিল। এই দিনগুলোতেই হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইতে শুরু করেন এবং দুটি উটনী ক্রয় করেন। "তিনি তাঁর কাছে থাকা দুটি উটনীকে চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাইয়েছিলেন।" (সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৫)

[২] সওয়ারির জন্য বাবলা পাতার মতো উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করার কারণ ছিল এই যে, হিজরতের সফরে পিছু ধাওয়ার আশঙ্কা ছিল। উট সুস্থ-সবল হলে এবং কুঁজে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকলে দ্রুতগতিতে ক্লান্তিহীনভাবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারে। উটের পরিবর্তে উটনী নেওয়ার হিকমত হলো মরুভূমিতে খাবার না পাওয়া গেলে উটনীর দুধ পাওয়া যাবে।

[৩] এই উটনীগুলো ছিল উন্নত জাতের, হযরত আবু বকর (রা.) এগুলো আটশ দিরহামে (বর্তমানে ২৫ হাজার বা দেড় লক্ষ টাকা) ক্রয় করেছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২২৮)। এগুলোর মধ্যে একটি উটনী 'কাসওয়া' শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ সওয়ারি ছিল। এরই নাম 'জাদআ' এবং 'আযবা'ও ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/৪৬৯)

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯২১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৭৩ থেকে ১৭৭।

[৫] সহীহ মুসলিম, হা: ৩২৬, কিতাবুল ঈমান।

আবু জাহলের মত ছিল যে হত্যা করে ফেলা হোক। মজলিসের লোকেরা এটিকেই অগ্রাধিকার দিল, কিন্তু সমস্যা ছিল যে গোত্রীয় সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন পুরো গোত্রের আমানত হিসেবে গণ্য হতো। আশঙ্কা ছিল যে এমতাবস্থায় বনু হাশিম এবং বনু আবদে মানাফের সমস্ত শাখা একত্রিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে এবং মক্কায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হলো যে প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে ব্যক্তি নির্বাচন করা হবে এবং তাদের দল আজ রাতে নবীজির ঘর ঘেরাও করবে এবং যৌথভাবে প্রাণঘাতী হামলা চালাবে। [১]

হিজরতের নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে:

সেই দিনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবিলম্বে হিজরতের নির্দেশ পেয়ে গেলেন। [২] কুরাইশদের অনেক লোক এত শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের মূল্যবান আমানতসমূহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাখার অভ্যাস ত্যাগ করেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আমানতসমূহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সোপর্দ করলেন যাতে সেগুলো মালিকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে পরে তিনিও ইয়াসরিবে চলে আসেন। [৩]

এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সেই ঘর থেকে আলাদা হলেন যাতে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিবাহের পর আপনি জীবনের আটাশ বছর কাটিয়েছিলেন। আপনি চিরতরে শুধু এই ঘরই নয় বরং এই পবিত্র শহরটিও ছেড়ে যাচ্ছিলেন। আপনি আপনার স্ত্রী হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং দুই ছোট মেয়ে: হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকেও এখানেই রেখে যাচ্ছিলেন। বড় মেয়ে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাও মক্কায় তার স্বামী আবুল আসের ঘরে ছিলেন যিনি তখনও মুসলমান হননি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের রওনা হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করছিলেন। যখন আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেলেন, তখন সেই দিন সকাল পর্যন্ত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও জানতেন না যে আজই রওনা হতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরের প্রচণ্ড গরমে মাথায় রুমাল জড়িয়ে ঘর থেকে বের হলেন এবং সরাসরি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন। তাকে জানালেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ এসে গেছে। তিনি বললেন: “আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনার সঙ্গ নসিব হবে কি?”

আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তুমি সাথে আছো।” [৪]

সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের মিশ্রিত আবেগে কেঁদে ফেললেন [৫] এবং আরজ করলেন:

“আমার এই দুটি উটনীর মধ্যে একটি গ্রহণ করুন।” আপনি বললেন: “হ্যাঁ, তবে মূল্য পরিশোধ করে।” [৬]

হযরত আয়েশা এবং হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সফরের জন্য পানাহারের সরঞ্জাম প্রস্তুত করলেন। খাবারের থলে এবং পানির মশকের মুখ বাঁধার জন্য কোনো রশি পাওয়া গেল না। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্মানিত পিতাকে বললেন: “বাঁধার জন্য নিতাক (কোমর বাঁধার ওড়না) ছাড়া আর কিছুই নেই।” পিতা বললেন: “ওটিকেই ছিঁড়ে একটি দিয়ে থলে এবং অন্যটি দিয়ে মশকের মুখ বেঁধে দাও।” তিনি তেমনই করলেন। এই কারণেই তাকে ‘জাতুন নিতাকাইন’ (দুই নিতাক বিশিষ্ট) বলা হতে লাগল। [৭]

---

[১] সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০; সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৮০, ৪৮২

[২] কদ উযিনা লি ফিল খুরুজ (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯০৫)

[৩] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৮৫

[৪] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯০৫

[৫] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৮৫

[৬] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯০৫

[৭] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯০৫, কিতাবুল জিহাদ, বাব হামলুয যাদ ফিল গাযউ

সায়্যিদুনা আবু বকর (রা.) তাঁর কন্যাদ্বয়: হযরত আসমা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং বৃদ্ধ অন্ধ পিতা আবু কুহাফাকে আল্লাহর ওপর ভরসা করে রেখে যাচ্ছিলেন। তিনি ঘরে থাকা সমস্ত অর্থ নবী আকরাম (সা.)-এর খিদমতের জন্য সাথে নিয়ে নিলেন [১] এবং আপনাকে (সা.) নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। [২]

হযরত আবু কুহাফা তাঁদের প্রস্থানের পর সন্দেহ পোষণ করে আসমা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন:
“আমার মনে হয় আবু বকর (রা.) তোমাদের কষ্টে ফেলে দিয়েছে যে যাওয়ার সময় সমস্ত অর্থ সাথে নিয়ে গেছে।”
হযরত আসমা (রা.) তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন: “না, তিনি তো অনেক কিছু রেখে গেছেন।”
অতঃপর সেই তাকে (তাক), যেখানে অর্থ রাখা হতো, কিছু ছোট ছোট পাথর রেখে উপরে কাপড় দিয়ে দিলেন এবং অন্ধ দাদার হাত ধরে তার ওপর বুলিয়ে দিলেন। তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং বললেন: “ঠিক আছে, যদি তিনি এত কিছু রেখে গিয়ে থাকেন তবে ভালো করেছেন, তোমাদের চলে যাবে।” [৩]

**হিজরত সফরের কৌশল:**

যেহেতু ইয়াসরিব পর্যন্ত সরাসরি যাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ আশঙ্কা ছিল যে কুরাইশরা পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলবে, তাই অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে বের হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যাতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ এবং মুক্তদাস আমির বিন ফুহাইরা (রা.)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আবদুর রহমান বিন আবি বকর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। সিদ্ধান্ত হলো যে, উভয় ব্যক্তি মক্কার বাইরে সাওর গুহায় আত্মগোপন করবেন, তিন রাত সেখানে লুকিয়ে কাটাবেন। এই সময়ে মক্কাবাসীদের খবরাখবর আনার কাজ করবেন আবদুল্লাহ বিন আবি বকর। তৃতীয় দিনে যখন কুরাইশরা ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবে, তখন উটের পিঠে চড়ে এক অপরিচিত পথে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সফর করা হবে। অপরিচিত পথে পথ হারানো থেকে সুরক্ষার জন্য আবদুল্লাহ বিন আরীকাত নামক একজন পেশাদার পথপ্রদর্শককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাথে নেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছিল, যিনি মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও পেশাদার গোপনীয়তা রক্ষায় দৃঢ় ছিলেন। [৪]

**যদি আমার কওম আমাকে বের করে না দিত!**

নবী আকরাম (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উটের পিঠে চড়ে মক্কা থেকে বের হলেন। একটি টিলার ওপর উঠে আপনি এই পবিত্র শহরকে সম্বোধন করে বললেন: “হে মক্কা! আল্লাহর কসম! তুমি জমিনের শ্রেষ্ঠ শহর এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। যদি

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৯৫৭; সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯০৫, ৩৯০৬, কিতাবুল মানাকিব; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬২৭৭।
শিক্ষা: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুপুরে বের হওয়ার হিকমত ছিল এই যে, কুরাইশদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রস্থানের আশঙ্কা তো ছিল কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে প্রস্থান রাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে দুপুরে এমন সময়ে বের হলেন যখন মানুষ সাধারণত বিশ্রাম করে। এই প্রস্থান ছিল মাদানী রবিউল আউয়াল (নিকি মহররম) মোতাবেক ২৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গরম মৌসুমে। তবে কিছু লোক ইবনে ইসহাকের সেই বর্ণনা গ্রহণ করে যাতে হযরত আলী (রা.)-এর চাদর মুড়ি দিয়ে উঠানে নববী বিছানায় শোয়ার কথা উল্লেখ আছে, একে “নিকি রবিউল আউয়াল (মাদানী জমাদিউল আউয়াল) মোতাবেক নভেম্বর” বলে অভিহিত করেছেন। অথচ নভেম্বরের শীতে কেউ উঠানে শোয় না। অবশ্য সেপ্টেম্বরের শেষে আবহাওয়া এমন থাকে যে রাতে উঠানে বিশ্রাম করা যায় এবং এমন নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রায় চাদর মুড়ি দেওয়া কোনো অদ্ভুত বিষয় নয়। তাই নিঃসন্দেহে এটি সেপ্টেম্বর মাস ছিল। (মাসিক “আল-উসওয়াহ” দেখুন)
[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৮৫।
[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৯৫৭।
[৪] এই বিন্যাস সহীহ বর্ণনাগুলো থেকেই গৃহীত। অর্থাৎ সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯০৫, বাব হিজরাতুন নবী (সা.); সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬২৭৭।

“আমাকে বের করে দেওয়া না হলে আমি কক্ষনোই তোমায় ছেড়ে যেতাম না।” [১] এই ঘটনাটি ২৮ সফর (মাদানি) শুক্রবার, ১ হিজরি (১০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)-এর। [২]

কুরাইশদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে হিজরত করবেন। তারা সেই রাতেই নববী গৃহ অবরোধ করে ফেলে। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নববী গৃহের আঙিনায় নববী বিছানায় নববী চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন। [৩] কুরাইশরা প্রতারিত হলো। তাদের কাছে আত্মীয়-স্বজনের ঘরে ঢুকে আক্রমণ করা ছিল লজ্জাজনক বিষয়, তাই সীমানার দেয়াল নিচু হওয়া সত্ত্বেও তারা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সকালে যখন প্রকৃত সত্য জানতে পারল, তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল। [৪]

আবু জাহেল সরাসরি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে পৌঁছে গেল এবং হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করলে আবু জাহেল তাকে এমন জোরে চড় মারল যে তার কানের দুল পর্যন্ত ভেঙে গেল। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দী মুখ খোলেননি। [৫]

**গাওরে সওর (সওর গুহা)-এ আত্মগোপন এবং কুরাইশদের দৌড়ঝাঁপ:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সরাসরি সওর গুহায় পৌঁছালেন এবং উটগুলো আবদুল্লাহ বিন আরীকতের জিম্মায় দিয়ে দিলেন। [৬] তার সাথে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, তৃতীয় রাতে সে সওয়ারিগুলো গুহার কাছে নিয়ে আসবে। নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সময়ে আবদুল্লাহ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি অত্যন্ত চতুর বালক ছিলেন, সন্ধ্যায় মক্কাবাসীদের দৌড়ঝাঁপ এবং পরামর্শের খবর গুহা পর্যন্ত...

---

[১] সুনান আত-তিরমিজি, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু ফি ফাদলি মক্কা।

[২] সফর মাসে সেখান থেকে বের হন এবং রবিউল আউয়াল মাসে মদিনায় পৌঁছান। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২৩৩)। অন্যান্য বর্ণনায় হিজরতের দিন সোমবার এবং মাস রবিউল আউয়াল নির্ধারিত। সমন্বয়ের সুরত এটাই যে, ২৮ সফরে ঘর থেকে সওর গুহার দিকে রওনা হন, সেখানে তিন রাত আত্মগোপনের পর রবিউল আউয়ালের শুরুতে সোমবার মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই হিসেবে গুহায় আত্মগোপনের দিনটি ২৮ সফর শুক্রবার হয়।

[৩] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৮৩।

ফায়দা (১): ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনাটি যঈফ। নীতিগতভাবে এমন বর্ণনা এই শর্তে গ্রহণযোগ্য হয় যে তা সহিহ বর্ণনার পরিপন্থী না হয়। ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনায় উল্লিখিত কিছু বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন হযরত জিবরাঈল বললেন যে, আজ রাতে আপনি ﷺ আপনার বিছানায় শোবেন না। এতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ হতে পারে এই নির্দেশনা ওহির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নববী বিছানায় শোয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নেই; কারণ হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হওয়ার সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে একটি বিষয় বিবেচ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বের হলেন তখন মুশরিকদের মাথায় ধুলো ছিটিয়ে রাতের বেলা ঘর থেকে বের হলেন। আল্লামা শিবলী নোমানী উভয় বর্ণনাকে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুপুরে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে হিজরতের প্রস্তুতির নির্দেশ দিতে গিয়েছিলেন। নববী গৃহ থেকে হিজরত এর এক-দুই দিন পর রাতে হয়েছিল। কিন্তু সহিহ বুখারীর বর্ণনায় সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে এতটাই তাড়াহুড়োর অবস্থা দেখা যায় যে, খাবারের থলে এবং মশক বাঁধার জন্য ফিতা খোঁজারও সময় ছিল না বরং কাপড় ছিঁড়ে তা বাঁধা হচ্ছিল। এই পরিবেশ উল্লিখিত ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ফায়দা (২): হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই চাদরটিই মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর সময় ব্যবহার করতেন। বর্ণনায় আছে: “বাতা ফিহি আলীউন ওয়া তাগাশশা বুরদান আহমার হাদরামিয়ান কানা রাসূলুল্লাহি ﷺ ইয়ানামু ফিহি”। যারা হিজরতকে শীতকালে মনে করেন তারা নিজেদের দাবি জোরালো করার জন্য এই চাদরকে ‘পশমি চাদর’ হিসেবে অভিহিত করেন। অথচ বর্ণনায় এমন কোনো শব্দ নেই যা দ্বারা চাদরটি ‘পশমি’ হওয়া প্রমাণিত হয়।

[৪] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৩/২১৩।

[৫] সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৮৭... একটি যঈফ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাতে সওর গুহায় খাবারও নিয়ে যেতেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/২২৭)।

[৬] বুখারী এবং ইবনে হিব্বানের এই সহিহ বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাতের বেলা ঘর থেকে রওনা হওয়ার বর্ণনাগুলো সঠিক নয়, এমনিতেও সেগুলো সনদের দিক থেকে যঈফ। একইভাবে পায়ে হেঁটে সওর গুহা পর্যন্ত যাওয়ার বিষয়টিও সঠিক নয়; কারণ ইবনে হিব্বানের উল্লিখিত সহিহ বর্ণনায় স্পষ্টতা রয়েছে: “ফাহাররাবাকা হাত্তা আতায়াল গারা”। এখানে একটি যঈফ বর্ণনায় আছে যে, পাহাড়ের دشوار (দুর্গম) পথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী ﷺ-কে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/২৫০)। সুতরাং যুক্তিযুক্ত বিষয় হলো, সওর জঙ্গল পর্যন্ত যেখানে সম্ভব ছিল, তারা সওয়ারিতে চড়ে পৌঁছেছেন। এরপর কঠিন পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা হয়েছে। সহিহ বুখারীর বর্ণনা থেকে সম্ভবত এই দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়: “ফারাকিবা ফানতালাকা হাত্তা আতায়াল গারা”। (সহিহ বুখারী, হা: ৩৯০৬)।

আনতেন এবং রাত গুহায় কাটাতেন। আমের বিন ফুহাইরা (রা.) সারাদিন ছাগল চরাতেন এবং এশার পর গুহায় এসে ছাগলের দুধ পেশ করতেন। [১] কুরাইশরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে শহরে না পেয়ে প্রতিটি পথে তাঁদের তালাশ শুরু করে দিয়েছিল। এই পবিত্র সত্তাদের হত্যা বা গ্রেফতার করার জন্য একশ উটের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। [২] এই বিশাল পুরস্কারের লোভে ডজন ডজন লোক এই অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। এক পর্যায়ে অনুসন্ধানকারীরা সওর গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেল; তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর অস্থিরতা অবর্ণনীয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের আশঙ্কা তাঁকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তিনি ফিসফিস করে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকেরা যদি নিজেদের পায়ের দিকে তাকায় তবে আমাদের দেখে ফেলবে।" রাসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ণ প্রশান্তির সাথে বললেন: "হে আবু বকর! ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [৩] কুরাইশরা এত কাছে পৌঁছেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

সওর গুহা থেকে হিজরতের গন্তব্যের দিকে:

তিন রাত আত্মগোপনে থাকার পর শেষ রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) গুহা থেকে বের হলেন। [৪] দুটি উট সওয়ারির জন্য প্রস্তুত ছিল। পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ বিন উরাইকিতও এসে গিয়েছিল এবং আমের বিন ফুহাইরা (রা.)-ও সাথে ছিলেন। এখন চার ব্যক্তির এই কাফেলা একটি জটিল পথে রওনা হলো, যা পরিচিত মহাসড়কের তুলনায় উপকূলের কাছাকাছি ছিল। সোমবার, ১লা রবিউল আউয়াল (১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.) তারা নিজ গন্তব্যের দিকে রওনা হলেন। রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত সফর দ্রুতগতিতে চলতে থাকল। প্রচণ্ড গরম ছিল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো মানুষ ছিল না। গরম এবং ক্লান্তির কারণে এই ব্যক্তিবর্গ জোহরের সময় ছায়া খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে একটি উঁচু পাথর দেখা গেল যার কিছু ছায়া ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) নিজ হাতে মাটি সমান করে সেখানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আরাম করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ্রাম নিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) পাহারায় নিযুক্ত হলেন যাতে কোনো পিছু ধাওয়াকারী আসছে কি না তা দেখতে পারেন। কিছুক্ষণ পর এক মেষপালক নিজের পালের সাথে ছায়া খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)...

---

[১] এই সহীহ বর্ণনাগুলোতে আমের বিন ফুহাইরা-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উটের সাথে সাথে ছাগল চরাতেন যাতে পায়ের চিহ্ন মুছে যায়; কারণ মক্কার লোকেরা পায়ের চিহ্ন দেখে পিছু ধাওয়া করতে পারত। (সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৪৮৬)

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৫, বাব হিজরাতুন নবী (সা.); সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬২৭৭

[৩] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪০; সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৫৩, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিবুল মুহাজিরিন; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬২৭৮

[৪] গুহা থেকে বের হওয়া জোহরের সময় হয়েছিল। (সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৫, ৩৯০৭) এবং গুহা থেকে সফরের সূচনা করা হয়েছিল যেমনটি সহীহ বুখারীতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর শব্দে আছে: "আমরা সারা রাত এবং দিন সফর করলাম।" (হা: ৩৬১৫) এবং "আমরা রাতে বের হলাম এবং দিন ও রাত সফর করলাম।" (হা: ৩৯১১) থেকে প্রমাণিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শব্দ "সুবহে সালাত" (সহীহ বুখারী, হা: ২২৬৩) থেকেও এটিই প্রতীয়মান হয় যে সফরের শেষ রাতে শুরু হয়েছিল যা তৃতীয় রাতের সকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। এর অর্থ এই যে গুহায় অবস্থানের মোট সময় তিন দিন (৭২ ঘণ্টা) নয় বরং এর সময়কাল প্রায় ৬০ ঘণ্টা ছিল। অর্থাৎ জুম্মার দিন ভোরে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন অর্থাৎ ভোরে এই ব্যক্তিবর্গ গুহায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। জুম্মার দিন থেকে সোমবারের শেষ রাত বা ভোরের শেষ অংশ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এভাবে আত্মগোপনের সময়কাল পুরো তিন দিন এবং তিন রাত নয় বরং দুই দিন এবং তিন রাত। বুখারীর বর্ণনায় (হা: ৩৯০৫) "সালাসা লায়ালিন" (তিন রাত) শব্দ এসেছে, যা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কার রাখাল?” সে একজন কুরাইশ ব্যক্তির নাম নিল। সিদ্দিক আকবর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “তোমার কাছে কি দুধেল ছাগল আছে?” সে ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বললেন: “আমাদের কি দুধ দোহন করে দেবে?”

রাখাল রাজি হয়ে একটি ছাগলের দুধ দোহন করতে বসল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বললেন যে, আগে ছাগলের ওলান ধুলোবালি থেকে পরিষ্কার করে নাও এবং নিজের হাতও। সে ওলান পরিষ্কার করল, তারপর নিজের হাত ঝেড়ে দুধ দোহন করে পেশ করল। হযরত আবু বকর (রা.) মহান নেতা (সা.)-কে জাগাতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু যখন দুধ নিয়ে ফিরলেন তখন তিনি (সা.) জেগে উঠেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিজের কাছে থাকা মুখবন্ধ ছাগল (চামড়ার পাত্র) থেকে পরিষ্কার পানি বের করে দুধে মেশালেন এবং এই ঠান্ডা পানীয় পেশ করে বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এটি পান করুন!” রাসূলুল্লাহ (সা.) পান করার পর দরবারে রিসালাতের খাদেম বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! রওয়ানা হওয়ার সময় কি হয়নি?” তিনি (সা.) বললেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই!” [১]

এখন সূর্য ঢলে পড়েছিল, ফলে পুনরায় সফর শুরু হলো। জনশূন্য পথ শেষ হয়ে গেল এবং কোথাও কোথাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিচিত গোত্রীয় লোকদের দেখা মিলতে লাগল যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে পরিচিত ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) দেখতে বয়স্ক মনে হতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন ঘন কালো দাড়িবিশিষ্ট ও যুবক। লোকেরা জিজ্ঞেস করত: “আবু বকর! আপনার সাথে ইনি কে?” তিনি বলতেন:

“هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ” (এই ব্যক্তি আমার পথপ্রদর্শক।)

লোকেরা মনে করত যে তিনি পথের দিশারী। হযরত আবু বকর (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি হিদায়াতের পথ প্রদর্শনকারী।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ণ প্রশান্তির সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) সতর্ক অবস্থায় অনবরত চারদিকে নজর রাখছিলেন কারণ পিছু ধাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর বাস্তবতা ছিল এই যে, সত্যিই বিপদ মাথার ওপর ছিল। বনু মুদলিজের একজন অশ্বারোহী সুরাকা বিন মালিক কুরাইশদের পক্ষ থেকে একশ উটের পুরস্কারের ঘোষণা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তালাশ শুরু করে দিয়েছিল। অবশেষে মরুভূমিতে নবুওয়াতের কাফেলা নজরে এল। সুরাকা ঘোড়াকে তাড়া দিয়ে দ্রুত দূরত্ব অতিক্রম করল এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিরাআতের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। হযরত আবু বকর (রা.) একজন অশ্বারোহীকে এভাবে দ্রুত আসতে দেখে বললেন: [২]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬১৫, বাবু আলামাতিন নুবুওয়াহ; হা: ৩৬৫২, বাবু মানাক্বিবিল মুহাজিরীন; হা: ৩৯১৭, বাবু হিজরাতিন নবী (সা.), কিতাবুল মানাক্বিব।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯১১, বাবু হিজরাতিন নবী (সা.), কিতাবুল মানাক্বিব।

উপকারী ফায়দা:

- (১) বুখারীর এই দৃশ্যগুলো বলে দেয় যে হিজরত শীতে নয়, গরমে হয়েছিল, অন্যথায় শীতে তো রোদ প্রিয় হতো এবং ঠান্ডা পানীয় অপ্রীতিকর হতো।
- (২) এই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) বের হওয়ার পর প্রথমবার বিশ্রাম নিয়েছিলেন তা ছিল “ক্বাদীদ”। (ত্বাবাক্বাত ইবনে সাদ: ১/২৩২) যা মক্কা মুকাররমা থেকে ১০০ মাইল দূরে। এতে জানা গেল যে প্রথম দশ ঘণ্টায় সফরের গতি অত্যন্ত দ্রুত ছিল এবং গড়ে প্রতি এক ঘণ্টায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করা হয়েছে।
- (৩) হিজরতের সফর যা দীর্ঘ অপরিচিত পথে হয়েছিল, তা ছিল ৪৬৮ কিলোমিটার (২৯২ মাইল) অর্থাৎ ৭ মঞ্জিল, কিন্তু তা মাত্র সাত দিনে সম্পন্ন করা হয়েছিল। অর্থাৎ সফরের গতি ছিল অসাধারণ। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শব্দ “ফারতাহালনা” (সহীহ বুখারী, হা: ৩৬১৫) অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সফর করার স্পষ্ট প্রমাণ। বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে এতে সেই উটনীগুলোর চার মাসের লালন-পালন খুব কাজে এসেছিল যা হযরত আবু বকর (রা.) বিশেষ গুরুত্বের সাথে করেছিলেন।
- (৪) বর্ণনাকারীরা সফরের পুরো পথটি সংরক্ষিত করেছেন। ইবনে সাদের বর্ণনা অনুযায়ী সফরে নিম্নোক্ত স্থানগুলো দিয়ে অতিক্রম করা হয়েছিল:

ক্বাদীদ, হারাজ, সানিয়াতুল মুররাহ, লাক্বাফ, মুদলাজাতু লাক্বাফ, মুদলাজাতু মাজাজ, মারজাহু মাজাজ, বাতনে মারজাহ, বাতনে জাতে কাশদ, আল-জাদাজিদ, আল-আজাখির, বাতনে রাব’ই, জু সালাম, মুদলাজাতু উসানিয়াহ, বাতনে ফাহাহ, আল-আরজ, আল-জাদাওয়াত, আল-গায়ির (রাকুবাহ-এর ডান দিক থেকে), বাতনে আক্বীক্ব, জাসজাসাহ ইত্যাদি। (ত্বাবাক্বাত ইবনে সাদ: ১/২৩২, ২৩৩)

“এই অশ্বারোহী আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে!” হুজুর (সা.) বললেন: “ঘাবড়িয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।”

তারপর দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! একে ফেলে দিন।” সেই মুহূর্তেই সুরাকা বিন মালিকের ঘোড়া পেট পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেল। সুরাকা বিন মালিকের কাছে আপনার (সা.) সত্য হওয়া এবং অচিরেই বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেল, তাই তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাইলেন এবং একটি নিরাপত্তা পত্র (আমান নামা) প্রার্থনা করলেন।

হুজুর আকরাম (সা.)-এর আদেশে আমের বিন ফুহাইরা (রা.) তাকে চামড়ার একটি টুকরোতে নিরাপত্তা পত্র লিখে দিলেন।

তারপর হুজুর আকরাম (সা.) বললেন: “তুমি এই পথেই থাকো। কাউকে আমাদের পর্যন্ত আসতে দিও না।” সুরাকা ওয়াদা করলেন। [১]

**সুরাকা বিন মালিককে সুসংবাদ:**

হুজুর (সা.) ঠিক এমন এক অবস্থায় যখন দ্বীন ইসলাম তার ইতিহাসের নাজুকতম মুহূর্ত পার করছিল এবং খোদ এই দ্বীনের প্রতিষ্ঠাতার জীবন চরম বিপদের মুখে ছিল, সুরাকা বিন মালিককে এমন এক সুসংবাদ দিলেন যা ইসলামের সত্যতার দলিল এবং এর অনুসারীদের উজ্জ্বলতম ভবিষ্যতের সুসংবাদ ছিল। হুজুর (সা.) বললেন:

“সুরাকা! তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন কিসরার কঙ্কণ তোমার হাতে পরানো হবে।”

ফিরে যাওয়ার সময় সুরাকা বিন মালিকের মনে তীব্র বিস্ময়ও ছিল এবং হুজুর (সা.)-এর কামালিয়াতের (অলৌকিকত্বের) স্বীকৃতিও ছিল। কে ভাবতে পেরেছিল যে মাত্র পনের বছর পর নবী (সা.)-এর দ্বিতীয় খলিফা সাইয়্যেদেনা উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে কিসরার ধনভাণ্ডার মুসলমানদের পদতলে এবং নওশেরওয়ানের কঙ্কণ সুরাকার হাতে থাকবে। [২] সুরাকা বিন মালিক তার ওয়াদা পূরণ করলেন এবং এই পথে আসা প্রত্যেক মুশরিককে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি এই দিকটি তল্লাশি করে দেখেছি। [৩] পরবর্তীতে সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবীদের কাতারে শামিল হন (রা.)।

অবশেষে এই বরকতময় কাফেলা গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে পরিচিত মহাসড়কে এসে পড়ল। এখানে সবার আগে তাদের সাক্ষাৎ হলো সিরিয়া থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফাতো ভাই এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর জামাতা হযরত জুবাইর (রা.)-ও শামিল ছিলেন। পবিত্র সত্তাদের কাপড় সফরের কারণে ধূলিমলিন হয়ে গিয়েছিল। হযরত জুবাইর (রা.) তাদের নতুন সাদা কাপড় উপহার দিলেন। [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৫২, বাব মানাকিবুল মুহাজিরিন, হা: ৩৯১৫; বাব আলামাতুন নুবুওয়াহ, হা: ৩৯০৬, ৩৯১; বাব হিজরাতুন নবী (সা.), কিতাবুল মানাকিব; সহীহ মুসলিম, হা: ৭৭০৬, আয-যুহদ ওয়ার-রাকাইক, বাব ফি হাদিসিল হিজরাহ, ত: দারুল জীল।

নোট: আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় করা এই সফরেও ইসলামের পয়গম্বর (সা.) লেখালেখির সরঞ্জাম সাথে রেখেছিলেন, যদিও সফরে এসব জিনিসের প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। ইসলামে লিখনশৈলীর গুরুত্ব এর মাধ্যমে ভালোভাবে প্রকাশ পায়।

[২] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩২৫/২ [৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৭৭০৬, আয-যুহদ ওয়ার-রাকাইক, বাব ফি হাদিসিল হিজরাহ, ত: দারুল জীল।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৫, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুন নবী (সা.)।

[৫] হিজরতের সফরের এই ইতিবৃত্ত সহীহ বর্ণনার আলোকে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এই জন্য পেশ করা হয়েছে যে, প্রথমত ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনার অনেক গুরুত্ব রয়েছে এবং এই কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) তার সংক্ষিপ্তকরণের প্রবণতা সত্ত্বেও সহীহ বুখারীতে এই ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা সম্পর্কিত সীরাতের সাধারণ বইগুলোতে অনেক যঈফ বরং কিছু মাওজু বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে সহীহ বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে কিছু বিস্তারিত বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা চেষ্টা করেছি যেন বর্ণনার মাধ্যমে হিজরতের ঘটনাটি তার আসল এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে সামনে আসে। কয়েকটি অংশ ছাড়া প্রায় পুরো ঘটনাটিই আমরা সহীহ বর্ণনা থেকে নিয়েছি, যার অধিকাংশ বুখারী থেকে নেওয়া।

পাঠকদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর পরিবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে দেখা যায়। হিজরতও তাদের ঘর থেকেই শুরু হয়েছিল। গুহার গোপনীয়তা রক্ষা এবং রাতের বেলা সেবা করার কাজও এই ব্যক্তিরাই করেছেন। শেষ পর্যায়েও এই পরিবারই পাথেয় পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করে। এ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক এবং চরম আস্থার মাত্রা অনুমান করা যায়।

**হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মর্যাদা গুহার আয়াতের আলোকে:**

হিজরতের এই স্মরণীয় ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী সফরের উল্লেখ কুরআন মাজিদেও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা গুহার নির্জনতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাহচর্যকে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

“যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, তবে (রাসূলের কোনো ক্ষতি নেই; কারণ) আল্লাহ তাকে সেই সময়েও সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, এমতাবস্থায় যে তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি তার সঙ্গীকে বলছিলেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, তারপর আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তার ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন যা তোমরা দেখনি।” [১]

**ইমাম রাযীর সূক্ষ্মদর্শিতা:**

ইমাম রাযী (রহ.) ‘তাফসীরে কবীর’-এ এই আয়াতের অধীনে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করেছেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: হিজরতের সফর কুরাইশদের কষ্ট ও শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য ছিল। যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঈমান ও ইখলাসের ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ থাকত, তবে তিনি তাকে কখনোই নিজের সাথে নিতেন না, কারণ এমন পরিস্থিতিতে আশঙ্কা থাকত যে তিনি হয়তো শত্রুদের খবর দিয়ে দেবেন। শুধুমাত্র হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের সাথে নেওয়া তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থার অকাট্য প্রমাণ এবং এই বাস্তবতার শক্তিশালী দলিল যে তিনি মনেপ্রাণে রিসালাতের প্রতি অনুগত ছিলেন।

১. হিজরত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নির্দেশ ছিল। শত শত সাহাবীর মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটাত্মীয়দেরও ছেড়ে রাসূলের সাহচর্যের জন্য শুধুমাত্র হযরত আবু বকর (রা.)-কে নির্বাচন করা তাঁর সমস্ত সাহাবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে ‘সানি ইসনাইন’ (দুজনের দ্বিতীয়জন) বলেছেন এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতাও এই যে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং মর্যাদায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ‘সানি’ অর্থাৎ ‘নিকটতম’ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন যিনি সবার আগে তাওহীদের আকিদার মাধ্যমে ঈমানের সম্পদে ধন্য হয়েছিলেন। তিনিই ইসলামের দ্বিতীয় দাঈ ছিলেন যার প্রচেষ্টায়...

---

[১] সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৪০

হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হযরত উসমান গনি এবং আরও অনেক প্রথম সারির মহান সাহাবী (রা.) ইসলামে দীক্ষিত হন। যখন রাসূল (সা.) হিজরত করে পৌঁছালেন, তখন তাঁর সাথে কেবল হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। আনসারগণ রাসূল (সা.)-এর সাথে যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন কেবল হযরত আবু বকর (রা.)। হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিটি যুদ্ধে খিদমতে আকদাসে উপস্থিত ছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও আলাদা হননি।

- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের অসুস্থতার সময় সালাত পড়ানোর ক্ষেত্রেও তিনিই 'সানি ইসনাইন' হয়েছিলেন।
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে সবচেয়ে কাছে সমাহিত হয়ে এই দুনিয়াতেও 'সানি ইসনাইন' হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছেন।
- যখন গুহার মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হলেন, তখন সেই নাজুক মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন:

"মা যনুকা বিসনাইনি আল্লাহু স্যালিসুহুমা?"
(সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ?)

এই শব্দগুলো হযরত আবু বকর (রা.)-এর জন্য চিরকালের তরে মায়িয়্যাতে নববী এবং মায়িয়্যাতে ইলাহী-এর এক তকমা, যার চেয়ে বড় আর কোনো সম্মান হতে পারে না।

মুফাসসিরগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, "ইজ ইয়াকুলু লিসাহিবিহি" দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা "লিসাহিবিহি" বলে হযরত আবু বকর (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাহাবী বলে স্বীকার করে না, সে এই আয়াতের অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। [১]

---

[১] তাফসীরে মাফাতিহুল গায়েব (আত-তাফসীরুল কাবীর), ফখরুদ্দিন রাজি: ১৬ / ৫০ থেকে ৫৩, তাবা দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি।

https://t.me/BoierSomahar

## প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র

শহরের লোকদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা থেকে রওনা হওয়ার খবর পৌঁছে গিয়েছিল। (সম্ভবত তারা এও জানতেন না যে তিনি রাতে সফর করেন এবং দুপুরে বিশ্রাম নেন)। তাই তারা প্রতিদিন ফজরের পর থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অপেক্ষায় শহরের বাইরে আসতেন এবং দূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। যখন রোদ তীব্র হয়ে যেত, তখন তারা ফিরে যেতেন। [১]

**কুবায় শুভাগমন:**

অবশেষে একদিন যখন সূর্য বেশ উপরে উঠে গিয়েছিল, তখন নবী করীম (সা.) ইয়াসরিবের পার্শ্ববর্তী জনপদ 'কুবা'-র কাছে পৌঁছালেন। মদিনার লোকেরা তখন প্রাত্যহিক অপেক্ষার পর নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। এই সময় মদিনার একজন ইহুদি, যে নিজের দুর্গের ওপর থেকে মরুভূমির দৃশ্য দেখছিল, দেখল যে অনেক দূরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাথী সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসছেন, তপ্ত বালুর ওপর মরীচিকার মতো তাদের প্রতিচ্ছবি ঝলমল করছে। ইহুদিটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিৎকার করে উঠল:

"হে আরবের লোকসকল! তোমাদের সেই সৌভাগ্য এসে গেছে যার তোমরা অপেক্ষা করছিলে।"

এ কথা শোনামাত্রই আনসাররা আরবের প্রথা অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাদের প্রিয় রাসূল (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দৌড়ে এলেন। নবী করীম (সা.) একটি অভ্যর্থনা মিছিলের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলেন, এমনকি তিনি কুবায় বনু আমর বিন আউফের জনপদে পৌঁছালেন (যেখানে অধিকাংশ মুহাজির অবস্থান করছিলেন)। তিনি খোলা ময়দানে থেমে গেলেন এবং চুপচাপ বসে পড়লেন। হযরত আবু বকর (রা.) (রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য) নিজে দাঁড়িয়ে লোকদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। যেসব লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আগে দেখেনি, তারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে সালাম করতে লাগল। এই সময় সূর্য মাথার ওপর চলে এল এবং রোদ অসহ্য হয়ে উঠল। হযরত আবু বকর (রা.) নিজের চাদর তুলে ধরলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ছায়া দিলেন। তখন সবাই বুঝতে পারল যে কে মখদুম (যাঁর সেবা করা হয়) আর কে খাদেম (সেবক)। [২] এই ঘটনাটি ছিল ৮ই রবিউল আউয়াল সোমবার (২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)। [৩]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৬; বাব হিজরাতুন নবী (সা.); সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৪৯২।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৬।

ফায়দা: এই হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরম বিনয় এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর আদব ও শিষ্টাচারের চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের কোনো বিশেষ মর্যাদা জাহির করার চেষ্টা করেননি। অন্যদিকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমল থেকে বোঝা যায় যে আদব কাকে বলে। আদব মানে শুধু হাত পা চুমু খাওয়া বা জুতো তোলা নয়, বরং আসল আদব হলো এই যে, মখদুমকে যেন আরাম পৌঁছানো যায় এবং কষ্ট থেকে বাঁচানো যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সফর থেকে আসছিলেন, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। এমন অবস্থায় স্বস্তি প্রদান করাই ছিল সঠিক সৌজন্যবোধ ও সহমর্মিতা যা একজন খাদেম আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এতে নিজের বড়ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের কোনো প্রকাশ ছিল না; কারণ হযরত আবু বকর (রা.) কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই মজলিসে নিজের চাদর তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ছায়া দিচ্ছিলেন। এটাই আসল সেবা এবং এটাই আসল আদব।

[৩] সহীহ বুখারীতে আছে: "ذالك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول" (সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৬, বাব হিজরাতুন নবী (সা.))। ইবনে সাদ কুবায় আগমনের তারিখ ও দিন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: সোমবার ৮ই রবিউল আউয়াল। (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১/২৩৩)। তবে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক মাহমুদ পাশা ফালাকি ৮ই রবিউল আউয়ালের তারিখটি গ্রহণ করেছেন। (ওয়াসিলাতুল ইসলাম, পৃ: ৪৬)। এর কারণ হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিচারে এই বছর রবিউল আউয়ালের ১ তারিখ বুধবার ছিল, আর ৮ই রবিউল আউয়াল ছিল বুধবার। তবে লেখক যে তারিখটি এখানে উল্লেখ করেছেন তা মক্কা থেকে রওনা হওয়া এবং তারিখের সামঞ্জস্য বজায় রেখে করা হয়েছে, যার পর এটিই অগ্রগণ্য মত যে কুবায় আগমন ৮ই রবিউল আউয়াল এবং মদিনায় আগমন ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল। ইয়াতিম মাহমুদ খানের "তাকভীমে আবদিয়া"-তেও এমনই বলা হয়েছে।

**মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন:**

আপনি কুবায় বনু আমর বিন আউফের নিকট অবস্থান করেন, সেখানে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যা আজও "মসজিদে কুবা" নামে প্রসিদ্ধ। এখানেই আপনি সালাত আদায় করতে থাকেন। [১] এটি পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্মিত প্রথম মসজিদ ছিল। আপনি ﷺ হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে মানুষের গচ্ছিত আমানতসমূহ ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে এসেছিলেন। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তিন দিনে এই কাজ সম্পন্ন করে রওয়ানা হন এবং এখানেই কুবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এসে মিলিত হন। [২]

**মদিনা মুনাওয়ারায় স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা:**

কুবায় চার দিন অবস্থান করে জুমুআ ১২ই রবিউল আউয়াল (২৪শে সেপ্টেম্বর) আপনি মদিনার অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনু সালিম বিন আউফের মহল্লার মসজিদে জুমুআর সালাত আদায় করেন। এটি এই ভূখণ্ডে আপনার ﷺ আদায়কৃত প্রথম জুমুআর সালাত ছিল। [৩]

সেই সন্ধ্যায় আপনি ﷺ মদিনায় প্রবেশ করলে মানুষ রাস্তাঘাট, অলিগলি এবং ঘরবাড়ির ছাদে আপনার ﷺ দিদার লাভের জন্য সমবেত হয়েছিল। চারদিকে স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছিল: "আল্লাহু আকবার, জাআ মুহাম্মাদুন, আল্লাহু আকবার, জাআ রাসূলুল্লাহ" [৪]

নিষ্পাপ বালিকারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিল:

ত্বলাআল বাদরু আলাইনা ... মিন ছানিয়্যাতিল ওয়াদা

"কাফেলাদের বিদায় জানানোর গিরিপথ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে।"

ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা ... মা দাআ লিল্লাহি দাঈ

"আমাদের ওপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে যতক্ষণ আল্লাহকে ডাকার মতো কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকে।"

আইয়্যুহাল মাবউছু ফিনা ... জি'তা বিল আমরিল মুত্বা

"হে রাসূল! যিনি আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, আপনি এমন দ্বীন নিয়ে এসেছেন যার প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।" [৫]

মদিনায় আগমন সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের অবস্থান চৌদ্দ দিন পর্যন্ত কুবায় বনু আমর বিন আউফের প্রধান কুলসুম বিন হাদামের নিকট রাখেন। সোমবার ১২ই রবিউল আউয়াল আপনি ﷺ বনু নাজ্জারের সশস্ত্র ব্যক্তিদের এক বিশাল মিছিলে মদিনার প্রাচীন জনপদে অবস্থানের জন্য তাশরিফ আনেন। [৬] সেদিন শহরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই বলতে বলতে দৌড়াচ্ছিল: "এই দেখো রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে গেছেন।" [৭] কেউ কেউ এভাবে চিৎকার করছিল: "আল্লাহর নবী এসে গেছেন, আল্লাহর নবী এসে গেছেন।" [৮]

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯০৬, বাবু হিজরাতিন নবী ﷺ

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৪৯৩/১

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৪৯৪/১

[৪] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৩, ত্বর রিসালাহ; মুসনাদে আল-বাযযার, খণ্ড: ৫০

[৫] সীরাতে ইবনে হিব্বান: ১৩০, ১৩৯/১; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৪৭৩/২, ত্বর ইলমিয়্যাহ; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৫০৭/২, ত্বর ইলমিয়্যাহ

[৬] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯৩২, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাকদামিন নবী ﷺ আল-মদিনাহ; সীরাতে ইবনে হিশাম: ৪৯৮/১

[৭] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯৩১, কিতাবুত তাফসীর, বাবু লাতারকাবান্না ত্বাবাকান আন ত্বাবাক

[৮] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯১১, বাবু হিজরাতিন নবী ﷺ

## বনু নাজ্জারের বালিকাদের সংগীত

জনাকীর্ণ গলিগুলোতে মানুষের দলগুলো সামনে এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনীর লাগাম ধরে অনুরোধ করত যে, আমাদের এখানে অবস্থান করুন। কিন্তু তিনি ﷺ বলতেন: "উটনীকে যেতে দাও। এটি আল্লাহর নির্দেশের অনুগত।" যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিতার মাতুলালয় বনু নাজ্জারের গলিগুলোতে পৌঁছালেন, তখন উটনীটি একটি জায়গায় নিজে থেকেই বসে পড়ল। বনু নাজ্জারের অল্পবয়সী বালিকারা খুশিতে গাইতে লাগল:

নাহনু জাওয়ারুম মিন বানিন নাজ্জার
ইয়া হাব্বাযা মুহাম্মাদুম মিন জার

"আমরা বনু নাজ্জারের বালিকা। কতই না আনন্দের বিষয় যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন।"

পাশেই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর দোতলা বাড়ি ছিল। নবী করীম ﷺ তাঁর অনুরোধে তাঁর বাড়ির নিচের তলায় অবস্থান করলেন। [১] ইহুদিদের আলেম আবদুল্লাহ বিন সালাম সেদিন তাঁর বাগান থেকে খেজুর পাড়ছিলেন; তিনি খিদমতে হাজির হলেন, নবুওয়াতের নিদর্শনগুলো ভালোভাবে চিনতে পারলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। [২]

## ইয়াছরিব মদিনাতুন নবী ﷺ হয়ে গেল

এই শহর এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শহর ছিল। এটি আপনার বাসস্থান, আপনার নাম উচ্চারণকারীদের স্বদেশ এবং ইসলাম ধর্মের প্রথম কেন্দ্র ছিল। আপনার ﷺ আগমনের পর মনে হচ্ছিল যেন এই শহরের প্রতিটি জিনিস এক নতুন রঙে রঞ্জিত হয়েছে। একটি আলো ছিল যা প্রতিটি জিনিসের ভেতরে প্রবেশ করেছিল। একে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো নাম দিতে পারি না। এটি ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা ছিল; এমনটি কখনো হয়নি যে, শত বছরের প্রাচীন একটি শহর কারো ভালোবাসায় এমনভাবে বদলে যাবে যে নিজের নাম পর্যন্ত মুছে ফেলবে এবং শহরে বসবাসকারী গোত্রগুলো তাদের পূর্ববর্তী বংশপরিচয় ভুলে গিয়ে এই একজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে পরিচিত হতে শুরু করবে। কিন্তু এখানে এটাই হলো। মানুষ তাদের স্বদেশের নাম "ইয়াছরিব" ভুলে গেল। এটি এখন নবীর শহর ছিল। একে "মদিনাতুন নবী" বলা হতে লাগল। আগে মানুষ আউস, খাযরাজ এবং তাদের উপশাখাগুলোর মাধ্যমে পরিচিত হচ্ছিল। এখন প্রতিটি বিভেদ এক ঐক্যে পরিণত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের "আনসার" নামক সুন্দর নাম দিলেন যাতে দ্বীনের সাহায্য ও সহযোগিতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। মক্কা থেকে আগত লোকদের আপনি ﷺ "মুহাজিরিন" উপাধি দিলেন। এখন শহর ছিল "মদিনাতুন নবী" এবং নাগরিকরা মুহাজিরিন ও আনসার। এখন প্রতিটি জিনিস ইসলামের সাথে সম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছিল এবং প্রতিটি আত্মীয়তার বন্ধন দ্বীনের জন্য কোরবানি ও আত্মোৎসর্গের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

## মসজিদে নববী, ইসলামের নতুন কেন্দ্র

এখানে আসার পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়ির সামনের জমির খালি অংশে একটি মসজিদ নির্মাণ করার দিকে মনোযোগ দিলেন। এই জমিটি দুই এতিম বালক: সাহল এবং সুহাইলের মালিকানাধীন ছিল, তারা মসজিদের...

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯১১, বাব হিজরাতুন নবী ﷺ দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৫০৮, ৫০৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯১১, বাব হিজরাতুন নবী ﷺ। এই বর্ণনার শব্দগুলো: "ওয়া হুয়া ফিন নাখলি লিআহলিহি ইয়াখতারিফু লাহুম।" থেকে কিছু মহোদয়ের এই যুক্তি ভিত্তিহীন যে হিজরত শীতকালে হয়েছিল, কারণ শীতকালে খেজুর পাড়া হয় না। এর দ্বারা হিজরতের বিষয়টি আরও নিশ্চিত হয় যে তা ছিল শরতের শুরু অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস।

জমির মালিকরা তা উপহার হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জোর দিয়ে তাদের মূল্য পরিশোধ করেন এবং মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করান। মসজিদের কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। এর দেয়ালগুলো ছিল কাঁচা ইটের, খুঁটিগুলো খেজুর গাছের কাণ্ডের এবং ছাদ ছিল খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি। দৈর্ঘ্য ১০৫ ফুট এবং প্রস্থ ৯০ ফুট ছিল। [১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নেন। তিনি নিজে ইট বহন করতেন এবং মুসলমানরা তা দেখে আরও বেশি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করতেন। তিনি তাদের সাহস ও আগ্রহ দেখে বলতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

“হে আল্লাহ! আসল প্রতিদান তো আখেরাতের প্রতিদান। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহম করুন।” [২]

**মুয়াখাত, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব:**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল মুহাজিরদের পুনর্বাসন, যারা সবকিছু ছেড়ে এখানে চলে এসেছিলেন। তাই এর সমাধানের জন্য তিনি “মুয়াখাত”-এর চুক্তি করান যার মাধ্যমে প্রত্যেক মুহাজিরকে কোনো না কোনো সচ্ছল আনসারীর ভাই বানিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা এখানে আত্মীয়-স্বজনের অভাব বা কষ্ট অনুভব না করেন। আনসাররা এই ক্ষেত্রে ত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তারা তাদের ঘরবাড়ি, বাগান ও সম্পদের অর্ধেক পেশ করে দেন। মুহাজিররা অল্পে তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন। [৩]

**পরিবার-পরিজনের মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর এবং তাদের আবাসের ব্যবস্থা:**

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাত মাস পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (رضی اللہ عنہ)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি তাঁর খাদেম যায়েদ বিন হারিসা এবং আবু রাফে (رضی اللہ عنہما)-কে গোপনে মক্কায় পাঠান যাতে তারা তাঁর পরিবার-পরিজন: হযরত সাওদা, হযরত উম্মে কুলসুম এবং হযরত ফাতিমা (رضی اللہ عنہن)-কে মদিনায় নিয়ে আসেন। হযরত রুকাইয়া (رضی اللہ عنہا) আগেই হযরত উসমান (رضی اللہ عنہ)-এর সাথে মদিনায় চলে এসেছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কন্যা হযরত জয়নব (رضی اللہ عنہا) তাঁর স্বামী আবুল আসের কাছে মক্কাতেই ছিলেন। [৪]

একইভাবে হযরত আবু বকর (رضی اللہ عنہ) তাঁর কন্যাদের: হযরত আসমা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (رضی اللہ عنہم)-কে ডেকে পাঠান। যখন মসজিদে নববী এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আবাসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলো, তখন তিনি তাঁর নিজ ঘরে চলে যান। এই আবাসে হযরত সাওদা এবং হযরত আয়েশা (رضی اللہ عنہما)-এর জন্য আলাদা আলাদা কামরা নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সময়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضی اللہ عنہا)-এর বিদায় অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে সম্পন্ন হয় এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘরে তাঁর কামরায় চলে আসেন। এটি ১ হিজরীর শাওয়াল মাসের ঘটনা। [৫]

---

[১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৩/৩৩৮।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯৩২, বাব মাকদামুন নবী (ﷺ) ওয়া আসহাবিহি ইলাল মদিনা।

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২০৪৮, ৩৭৮০, ৩৭৮২, কিতাবুল মানাকিব, বাব ইখাউন নবী (ﷺ); সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৯৯, ৫০৩, ৫০৫।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩৯৯।

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/২, দারুল কিতাব আল-আরাবি।

**আসহাবে সুফফা, প্রথম ইসলামি মাদ্রাসা:**

কুরআন মাজীদের নাযিল হওয়া অব্যাহত ছিল এবং মদীনার নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের পরিবেশ অনুযায়ী আয়াত নাযিল হতে থাকছিল যাতে বিধানের অনুপাত মক্কী সূরাগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। মুহাজিরদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যারা এতটাই নিঃস্ব ছিলেন যে এখন পর্যন্ত তাদের ঘরবাড়ি ও জীবিকার কোনো ব্যবস্থা হতে পারেনি। তাদের জন্য মসজিদে নববীর দক্ষিণ কোণে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরার কাছে ছিল, একটি চত্বরে জায়গা দেওয়া হয়েছিল যাকে সুফফা বলা হতো। এই লোকেরা যারা আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত হলেন, দিনভর সেখানে থাকতেন, কুরআন কারীমের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীসমূহ শুনতেন এবং সেগুলো মুখস্থ করতেন। রাতের বেলা নবী আকরাম ﷺ তাদের খাবারের জন্য অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পাঠিয়ে দিতেন যারা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। সুফফার কিছু অভাবী লোককে নবী আকরাম ﷺ নিজেই নিজের সাথে ঘরে নিয়ে যেতেন।

**যোহর, আসর এবং এশায় চার রাকাতের ফরয হওয়া - আযানের বিধান:**

এখন পর্যন্ত যোহর, আসর এবং এশার ফরয নামায দুই দুই রাকাত পড়া হতো। মদীনায় আসার কিছুদিন পর দুইয়ের পরিবর্তে চার রাকাত ফরয করা হলো। [১]

মুসলমানরা এই সময় পর্যন্ত নামাযের ওয়াক্তের আন্দাজ করে মসজিদে জমা হয়ে যেতেন। নামাযের জন্য ডাকার কোনো পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল না। ইহুদি ও নাসারাদের পদ্ধতি যেমন শিঙা বা ঘণ্টা বাজানো রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করেননি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.)-কে স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ দিলেন। আযানের প্রথম সম্মান হযরত বিলাল হাবশী (রা.)-কে দেওয়া হলো এবং তিনি মসজিদে নববীর স্থায়ী মুয়াযযিন নিযুক্ত হলেন। [২]

এখন শত শত বছর পর আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর যমীনে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পেলেন যেখানে তারা স্বাধীনভাবে আল্লাহর নাম বুলন্দ করতে পারতেন, তাঁর তাওহীদের দাওয়াত দিতে পারতেন এবং তাঁর দ্বীনকে ছড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বন করতে পারতেন। এটি ছিল সেই সমাজ যার তালাশ মানব আত্মা শত শত বছর ধরে করছিল। چنانچہ ইহুদিদের আলেম আবদুল্লাহ বিন সালাম সত্যের সন্ধানী ছিলেন, ইসলাম এবং নবী ইসলামের সেই গুণাবলিকে উপেক্ষা করতে পারেননি যার উল্লেখ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং এই সমাজের একটি অংশ হয়ে গেলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) যিনি দীর্ঘ সময় ধরে প্রথমে অগ্নিপূজা থেকে তওবা করে ইরান থেকে বের হয়েছিলেন এবং সত্যের সন্ধানে কত পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের খিদমতে থেকেছিলেন, শেষ যমানার নবী ﷺ-কে দেখামাত্রই বুঝে গেলেন যে দুনিয়ার নাজাত এই সত্তার অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে। হৃদয়ের স্পন্দনে লাব্বাইক বলে তিনিও ইসলামে দীক্ষিত হলেন। [৩] সত্য ও হকের পিপাসু আত্মাদের জন্য মদীনা তাদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য সুমিষ্ট ঝরনা হয়ে গেল।

---

[১] মুখতাসার সীরাতুর রাসূল, শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব, পৃ. ১৩০, ১৩১, প্রকাশনা: মিনিস্ট্রি অফ ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স সৌদি আরব।

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৫০৯, ৫০৮/১... আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.) ছাড়াও হযরত উমর (রা.)-ও এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন। (ফাতহুল বারী: ৮১, ৮০/২)

[৩] উসদুল গাবাহ আছার: আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.), সালমান ফারসী (রা.)।

ইসলামী রাষ্ট্র যে সকল বিপদের সম্মুখীন ছিল:

মদিনা মুনাওয়ারায় শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র বিপদমুক্ত ছিল না। মদিনা মুনাওয়ারায় মুসলমানদের দুটি গোষ্ঠী ঘোর বিরোধী ছিল:

- মুনাফিক
- ইহুদি

মুনাফিকরা ছিল সেই হতভাগ্য লোক যারা ইসলামের আলো এত কাছ থেকে দেখেও তা থেকে বঞ্চিত ছিল। এরা ছিল সেই সব লোক যারা নিফাক বা কপটতার রোগে আক্রান্ত ছিল। নিফাক বা দ্বিমুখী আচরণ হলো একটি মানসিক দুর্বলতা এবং নৈতিক ব্যাধি যার সূচনা হয় হিংসা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা থেকে। এটি এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠে যেখানে শত্রুতা প্রকাশের প্রকাশ্য সুযোগ থাকে না, যেখানে কারো সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতা করা বিপজ্জনক হয়। এই রোগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই সব লোক আক্রান্ত হয় যারা স্বভাবগতভাবে বিদ্বেষপরায়ণ, হিংসুক এবং অহংকারী হয়, যার ফলে সত্য কথা তাদের সহ্য হয় না; এর পাশাপাশি তারা ভীরু, প্রতারক, চতুর এবং মিষ্টভাষী হয়। এমন লোক ভীরুতার কারণে সত্যের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা করতে ভয় পায় এবং চতুরতা ও মিষ্টভাষার দক্ষতা ব্যবহার করে তাদের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যগুলোর ওপর আনুগত্য, শুভকামনা এবং সহমর্মিতার পর্দা টেনে দেয়।

মক্কায় শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে সবকিছু করার শক্তি ছিল, তাই সেখানে নিফাকের কোনো প্রশ্নই ছিল না। মদিনায় ইসলাম শক্তি অর্জন করেছিল, তাই এখানে ইসলাম এবং নবী করীম ﷺ-এর বিরোধীরা দমে গিয়েছিল এবং তাদের বিরোধিতা নিফাকের রূপ ধারণ করেছিল। অধিকাংশ মুনাফিকের সম্পর্ক ছিল আউস এবং খাযরাজ গোত্রের সাথে, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল খাঁটি মুসলমান, কিন্তু এই পরিবারগুলোর মধ্যেই কোথাও কোথাও মুনাফিকরাও লুকিয়ে ছিল।

আবদুল্লাহ বিন উবাই: মুনাফিকদের সর্দার:

মুনাফিকি আচরণে সবার আগে ছিল খাযরাজ গোত্রের সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল, যাকে কিছুকাল আগে আউস এবং খাযরাজ তাদের যৌথ শাসক হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বাকি ছিল এমন সময় রিসালাতের প্রদীপের আলো তার ভক্তদের অনুসারী করে নিল। সেই দিন থেকে সে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি চরম হিংসা ও ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেই তার সুপ্রতিষ্ঠিত রাজত্ব ধূলিসাৎ হওয়ার জন্য দায়ী মনে করত। তাই সে মদিনার বিপ্লব থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করল এবং নেপথ্যে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পরেও সে আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে টালবাহানা করতে থাকল।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ মুনাফিক ছিল বয়স্ক এবং প্রৌঢ়। তাদের মধ্যে এক-দুজন ছাড়া কোনো যুবক ছিল না। এর কারণ হলো যুবকদের মধ্যে নতুন সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশি থাকে এবং তারা সত্যের জন্য কুরবানি দিতে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যায়, যেখানে বৃদ্ধরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং পদমর্যাদার অহংকারে সাধারণত সত্যের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করে। মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারীরাও ছিল বেশিরভাগ যুবক। মদিনায় এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটল। স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ এবং মেয়ে জামিলা সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সে তার নিফাকের ওপর অটল রইল।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীর সাথে গাধার পিঠে চড়ে মহল্লা বনু হারিস বিন খাযরাজ-এর দিকে যাচ্ছিলেন। মদীনায় কিছু লোক তখনও ইসলাম থেকে বঞ্চিত ছিল, তাই পথে এক জায়গায় অমুসলিম আরব, ইহুদি এবং মুসলিমদের একত্রে বসে থাকতে দেখা গেল, আবদুল্লাহ বিন উবাই তাদের মধ্যে প্রধান ছিল। সওয়ারি যাওয়ার সময় ধুলো উড়লে ইবনে উবাই কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিল এবং অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলল: "ধুলো উড়িও না।"

নবী আকরাম ﷺ দাওয়াতের নিয়তে সেখানে থামলেন, সবাইকে সালাম করলেন এবং কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত শুনিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই বলতে লাগল: "সাহেব! যদি তোমার কথা সত্যও হয় তবুও আমার এই ভঙ্গি পছন্দ নয়, আমাদের মজলিসে এসে আমাদের তাবলীগ করো না। যে তোমার কাছে যায় তাকে শুনিয়ে দিও।"

এই ধৃষ্টতায় হুজুর আকদাস ﷺ-এর সঙ্গীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, লোকজন একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এক হাঙ্গামা সৃষ্টি হলো। আপনি ﷺ অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সবাইকে শান্ত করলেন, যাই হোক এই ঘটনা থেকে এটা জানা গেল যে আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর অন্তরে হিংসার আগুন তীব্রভাবে জ্বলছে। [১]

মদীনায় আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর সমমনা আরও কিছু লোক ছিল যাদের কাছে সে সত্যিই মদীনার রাজত্বের হকদার ছিল এবং মুহাজিররা তার হক নষ্টের কারণ হয়েছিল, ফলে তারা অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুহাজিরদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করল। তারা সবাই ইসলামের সত্যতার উজ্জ্বল দলিল থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল এবং আপনার ﷺ দাওয়াতকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের একটি ভণ্ডামি মনে করেছিল। এই লোকগুলো আরামপ্রিয়তা এবং ভীরুতার রোগী ছিল। যেকোনো বিষয়কে বাস্তব সত্যের নিরিখে যাচাই করার পরিবর্তে তারা এই দিক থেকে দেখত যে এতে তাদের জান ও মালের কতটা সুরক্ষা আছে এবং এতে সম্পদ, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা লাভের কতটুকু সুযোগ আছে। কিন্তু অন্যদিকে তাদের অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও নিজেকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলার সমতুল্য ছিল। তাই আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার অনেক মুনাফিক বন্ধু কিছুকাল পর বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই নতুন ধর্মের শিকড় কাটতে এবং তাদের হারানো নেতৃত্ব ফিরে পেতে অস্থির হয়ে রইল।

ইহুদি:

মুনাফিকদের চেয়েও বড় অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল ইহুদিদের প্রতিবেশী হওয়া, যারা সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল এবং অর্থনীতি ও জীবিকায় মুসলমানদের ওপর প্রভাবশালীও ছিল। যদিও ইহুদিরা তাওহীদ ও রিসালাতের আকিদা এবং আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমানের পাশাপাশি অনেক শরয়ী আহকামে মুশরিকদের তুলনায় মুসলমানদের নিকটবর্তী ছিল এবং হুজুর ﷺ-এর হিজরতের আগে মুসলমান ও কুরাইশ মক্কার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু এখন আপনার ﷺ আগমনে তাদের স্বার্থে চরম আঘাত লেগেছিল। এর আগে তারা তাদের সংখ্যাস্বল্পতা সত্ত্বেও আউস ও খাযরাজের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী শক্তি হিসেবে গণ্য হতো।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৫৬৬৩, কিতাবুল ইসতিযান, বাবুত তাসলীম ফী মাজলিসিন ফীহি আখলাতুন মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীন।

ছিলেন; কারণ এই উভয় আরব গোত্র একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এখন রাসূল ﷺ-এর পতাকাতলে তাদের এই দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যের পরিষ্কার অর্থ ছিল এই যে, ইহুদিদের মদিনায় দমে থাকতে হবে।

রাসূল ﷺ-এর রিসালাতের ব্যাপারে ইহুদিদের চেয়ে বেশি তাঁর গুণাবলী ও নিদর্শন সম্পর্কে অন্য কোনো জাতি অবগত ছিল না, কিন্তু তাদের বংশীয় অহংকার ও জাতিগত গর্ব তাদের অনুমতি দিচ্ছিল না যে তারা বনী ইসরাঈল ব্যতীত অন্য কোনো জাতির নবীর ওপর ঈমান আনবে। এসব কারণে মদিনায় আগমনের সাথে সাথেই রাসূল ﷺ ইহুদিদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য কোনো অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি মনে করেছিলেন।

**মিথাক-এ-মদিনা:**

রাসূল ﷺ রাষ্ট্রকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং একে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি মদিনা ও এর আশপাশে বসবাসকারী গোত্রসমূহ এবং ইহুদিদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা আইনের শাসন, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংহতি, বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্য, ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীনতা, একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পারস্পরিক প্রতারণা থেকে বিরত থাকা, সমাজের দুর্বল ও অভাবী ব্যক্তিদের সাহায্য করা এবং পূর্ববর্তী ভালো ঐতিহ্যগুলো বজায় রাখার নিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করে ছিল। এই চুক্তিকে 'মিথাক-এ-মদিনা' (মদিনার সনদ) বলা হয়, যা ছিল বিশ্বের প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক সংবিধান। এই চুক্তির মাধ্যমে রাসূল ﷺ মুহাজির ও আনসার ছাড়াও মদিনায় বসবাসরত সকল শক্তিকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- আমরা সবাই বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।
- রক্তপণ এবং বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণের পূর্ববর্তী প্রথা বহাল থাকবে।
- অপরাধীকে সবাই মিলে পাকড়াও করে শাস্তি দেবে, চাই সে আমাদের কারো সন্তানই হোক না কেন।
- মুসলমানরা কাফিরদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা করবে।
- চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী অমুসলিমরা কুরাইশদের কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবে না।
- ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীন থাকবে। মুসলমানরা তাদের দ্বীনের ওপর এবং ইহুদিরা তাদের দ্বীনের ওপর চলবে।
- ইহুদি ও মুসলমানরা তাদের নিজ নিজ খরচ আলাদাভাবে বহন করবে। যুদ্ধে ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে আর্থিক সহযোগিতা করবে।
- মদিনার ওপর আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবে।
- চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর প্রতিটি মতভেদ ও বিরোধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদালতে পেশ করা হবে। [১]

এই ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার এই ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রকে এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তিতে পরিণত করেছিলেন।

---

[১] সিরাত ইবনে হিশাম: ১/ ৫০১ থেকে ৫০৩

যেখানে মানুষের দ্বীন ও ঈমান, ইজ্জত ও সম্মান এবং জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জিত ছিল। এটি ছিল মানুষের জন্য তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রদানের প্রথম সফল প্রচেষ্টা। এটি ছিল এমন এক শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা, যা খুব শীঘ্রই মদিনা থেকে বেরিয়ে শুধু সমগ্র জাজিরাতুল আরব নয় বরং পুরো বিশ্বের ওপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছিল।

**কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার প্রচেষ্টা:**

ইসলামের এই নবজাতক চারাগাছটি ঝড়-ঝাপটা থেকে নিরাপদ ছিল না। কুরাইশরা অনবরত মদিনার খোঁজখবর নিচ্ছিল। তারা ইসলামকে বিকশিত হতে দেখতে পারছিল না। ব্যবহারিক পদক্ষেপ হিসেবে সবার আগে তারা মদিনার প্রধানদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল এবং তাদের হুমকি দিল যে, মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়ার পরিণাম ভালো হবে না। তারা খাজরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে চিঠি লিখল:

“তোমরা আমাদের লোকটিকে তোমাদের কাছে আশ্রয় দিয়েছ, আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, যদি তোমরা তাদেরকে তোমাদের এখান থেকে বের করে না দাও, তবে আমরা আমাদের সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, তোমাদের হত্যা করব এবং তোমাদের নারীদের দাসী বানিয়ে নেব।” [১]

কুরাইশদের তখন পর্যন্ত মোটেও ধারণা ছিল না যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজে মুসলমানদের আগমনে কতটা অসন্তুষ্ট এবং সে তাদের মদিনা থেকে বের করে দিতে চায়। কিন্তু যেহেতু ততদিনে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের গোত্রের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাই সে চাইলেও কুরাইশদের এই দাবি পূরণ করতে পারছিল না।

**কুরাইশদের পক্ষ থেকে পথ অবরোধ:**

এর পাশাপাশি কুরাইশরা মদিনা অবরোধ করারও পূর্ণ চেষ্টা শুরু করে দিল। মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত বসতি স্থাপনকারী অধিকাংশ গোত্রই ছিল কুরাইশদের মিত্র। কুরাইশরা সবাইকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দিল এবং দক্ষিণ দিক থেকেও মুসলমানদের পথ বন্ধ করে দিল। এই কারণেই ইয়েমেন এবং এর আশপাশের এলাকায় ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের মদিনায় আসা-যাওয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন ছিল; কারণ তাদের কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গোত্রগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। [২]

**মদিনায় কুরাইশদের আক্রমণের আশঙ্কা:**

কুরাইশদের এসব কর্মকাণ্ডের কারণে মুসলমানদের মনে প্রতি মুহূর্তে এই আশঙ্কা থাকত যে, যেকোনো সময় মদিনায় আক্রমণ হতে পারে। এই কারণে মদিনায় মুসলমানদের প্রতি মুহূর্তে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। তাদের নিয়ম ছিল যে, তারা অস্ত্র বেঁধে সশস্ত্র অবস্থায় ঘুমাত। [৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের অপবিত্র সংকল্পের খবরে এতটাই উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, তিনি রাতে সতর্ক ও জাগ্রত থাকতেন। [৪] এই সময়ে একবার মক্কার এক নেতা কুরজ বিন জাবির ফাহরি মদিনার চারণভূমিতে আক্রমণও করেছিল।

---

[১] সুনান আবু দাউদ, হা: ৩০০৪, বাবু ফি খবরিন নাযীর, ত. আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৫৩, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদাইল খুমুসি মিনাল ঈমান; সহীহ মুসলিম, হা: ১২৪, কিতাবুল ঈমান, বাবু আল-আমরু বিল ঈমানি বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি।

[৩] লুবাবুন নুকুল ফি আসবাবিন নুযুল লিস-সুয়ূতী, সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫ (ওয়াআদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু)।

[৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন প্রথম মদিনায় আসলেন, তখন তিনি রাতে জাগ্রত থাকতেন। (আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮১৬০, কিতাবুল মানাকিব, বাবু সা’দ বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

এবং রাসূল ﷺ-এর গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাটি ২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের। [১]

**জিহাদের অনুমতি:**

কুরাইশদের এই সমস্ত পদক্ষেপ ছিল বিপদের সংকেত। এখন মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা নিজের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করার নামান্তর ছিল। এটিই সেই সময় ছিল যখন কুরআন মাজীদ জিহাদের অনুমতি প্রদান করে। সূরা হজ্জের আয়াতসমূহ নাযিল হয়:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (জিহাদের) অনুমতি দেওয়া হলো কারণ তাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সেই সব লোক যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা বলেছিল আমাদের রব আল্লাহ।” [২]

এই প্রাথমিক পর্যায়ে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ফরয হওয়ার বিধান তখনও আসেনি। সম্ভবত এই ধারাবাহিক পদ্ধতির মাধ্যমে সাহাবীদের সাহস ও উদ্দীপনা পরীক্ষা করা হচ্ছিল। আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে অনুমতি প্রকাশ পাচ্ছিল কিন্তু পরিস্থিতির চাপ এই অনুমতিকে কাজে লাগিয়ে বিলম্ব না করে যুদ্ধ করতে বাধ্য করছিল।

**মক্কায় কেন জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি?**

মক্কায় জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি বরং সেখানে নির্দেশ ছিল: “كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ” (তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখো)। যদিও সেখানেও হযরত উমর, হযরত হামযা, হযরত সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত যুবাইর বিন আওয়াম-এর মতো বীরেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা এতটাই শক্তিশালী ও সাহসী ছিলেন যে রাসূল ﷺ-এর ইশারায় প্রয়োজন অনুযায়ী কাফিরদের অত্যাচারের জবাব তলোয়ার দিয়ে দিতে পারতেন, কোনো জরুরি মুহূর্তে দুই-চারজন মুশরিককে হত্যা করতে পারতেন, তাদের অট্টালিকা ও বাণিজ্যিক গুদামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু এই আবেগপ্রবণ প্রচেষ্টার ফলে আরও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ত এবং দাওয়াতের সামান্য সুযোগটুকুও বন্ধ হয়ে যেত এবং মুসলমানদের বিপদ-আপদ আরও বৃদ্ধি পেত। এই কারণে ধৈর্য ও সহনশীলতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, একটি রাষ্ট্র অর্জিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী পরিচালনা করার নামই হলো রাজনীতি এবং রাজনীতির একটি অংশ হলো সামরিক বিষয়াবলী, যা দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য হলে ইসলাম সেগুলোকে “জিহাদ” নাম দিয়ে একটি মহান ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করে।

মক্কায় যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না তাই রাজনীতি সম্ভব ছিল না এবং জিহাদও নয়। মদীনায় রাষ্ট্র অর্জিত হয়েছে এবং এটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্র গঠনের সাথে সাথেই সরকার প্রধানদের ওপর এর সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বও অর্পিত হয়। এই...

---

[১] আল-ইসাবাহ, জীবনী: কুরয বিন জাবির আল-ফিহরি। কুরয বিন জাবির কিছুকাল পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয় যুদ্ধে শহীদ হন। (আল-ইসতিআব: ৩/১৩১০)

[২] সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৩৯, ৪০

...একইভাবে রাষ্ট্রের শত্রুদের মোকাবিলা করা এবং তাদের সর্বদা দমন করাও জরুরি হয়ে পড়ে। তাই এই প্রকৃত প্রয়োজনের উদ্ভব হওয়ামাত্রই জিহাদকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

জিহাদের উদ্দেশ্য:

জিহাদের উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করানো হবে। ইসলাম তো হলো অন্তর থেকে একটি সত্যকে মেনে নেওয়ার পর মুখ দিয়ে তা স্বীকার করার নাম। এই বাস্তবতা যে অন্তরের সিদ্ধান্ত জোরপূর্বক হয় না, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে ভালো আর কে জানতে পারতেন? এই কারণেই তাঁর সীরাতে এমন একটি উদাহরণও পাওয়া যায় না যা দ্বারা কাউকে জোর করে মুসলমান বানানো প্রমাণিত হতে পারে। মক্কার মুহাজির হোক, মদীনার আনসার হোক বা অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান—সবাই দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সন্তুষ্টি ও খুশিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যার পরিষ্কার অর্থ হলো, ইসলাম একটি আকিদা হিসেবে এর প্রসারে তলোয়ার চালানোর নয়, বরং উদ্বুদ্ধ করার এবং দলিল পেশ করার প্রবক্তা। তলোয়ারের প্রয়োজন ইসলামের সামনে আসা বিপদসমূহ প্রতিরোধ এবং ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর আধিপত্য খতম করার জন্য পড়ে; কারণ সাধারণত ব্যক্তিরা যখন একটি দল বা সরকারের রূপ ধারণ করে, তখন সেই অবস্থায় তারা ভিন্ন পক্ষের দাওয়াত শোনার সহনশীলতা রাখে না, বরং জাতীয় অহমিকা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিতে মত্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রদর্শন করতে সামান্য দেরিও করে না। এমন অবস্থায় তারা কেবল শক্তির ভাষা বোঝে। অতএব ইসলামও বিরোধী শক্তিগুলোকে পরাভূত করতে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নিজের আধিপত্য কায়েম করতে এবং ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকর করে মানবতাকে অন্যান্য বাতিল ব্যবস্থার জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য জিহাদের পথ অবলম্বন করে এবং তার অনুসারীদের এর নির্দেশ দেয়। জিহাদ ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য কখনোই এটি নয় যে মানুষের ঘাড়ে তলোয়ার রেখে বলা হবে যে মুসলমান হয়ে যাও। ইসলাম জিহাদের পাশাপাশি জিজিয়া-র পথ খোলা রাখে এবং কাফেরদের ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক (জিম্মি) বানিয়ে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। যার পরিষ্কার অর্থ হলো, ইসলাম কখনোই অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না।

আবার ইসলাম জিহাদেরও কিছু মূলনীতি ও আদব নির্ধারণ করে দিয়েছে। খোদ যুদ্ধের চলাকালীনও ইসলাম কেবল সেই সব লোকদের হত্যার অনুমতি দেয় যারা রণক্ষেত্রে আসে অথবা ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যারা লড়াইয়ে অংশ নেয় না, তাদের নিরাপদ ঘোষণা করা হয়েছে। যারা কোনো চাপের মুখে বাধ্য হয়ে মোকাবিলায় চলে এসেছে, তাদেরও নিরাপদ রাখার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছিলেন: “বনী হাশিমের কেউ সামনে এলে তাকে হত্যা করো না; কারণ তারা নিজেদের খুশিতে যুদ্ধে শরিক হয়নি বরং তাদের জোরপূর্বক আনা হয়েছে।” [১]

اسلامی جہاد مغربی اقوام کی جنگوں کی طرح اندھا دھند لڑائی نہیں، جس میں مرد، عورتوں اور بچوں سمیت شہروں کے شہر انتہائی بے دردی سے ملیا میٹ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ امن کے دشمنوں کو مٹانے، مظلوموں کو انصاف دلوانے، ظالم کو...

[১] তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ২/৫৮, তাদমুরি

বাঁচানোর, তাওহীদের দাওয়াতের পথে অন্তরায় বাধাগুলো দূর করার এবং ইসলামকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রাম, যা মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরকালীন সওয়াব এবং জান্নাত লাভের নিয়তে লড়ে থাকে।

**অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিপদসমূহ:**

'জিহাদ' এই প্রাথমিক পর্যায়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তার বিস্তৃত ও গভীর অর্থে স্পষ্ট ছিল, এটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ইসলামী রাজনীতি কায়েম রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল। জিহাদ কেবল তলোয়ার চালানো এবং আক্রমণ করার নাম নয় বরং এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখা, এর শত্রুদের মোকাবিলা করা এবং সত্যকে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে সমুন্নত করা, দ্বীন প্রচার করা এবং কাফেরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার নাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগে কোনো বাহিনী বা গোত্রের সর্দার ছিলেন না, নবুওয়াতের পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের দিন-রাত এ পর্যন্ত একজন দাঈ, আধ্যাত্মিক নেতা এবং শিক্ষক হিসেবে অতিবাহিত হয়েছিল কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর যখন আপনি প্রথমে রাজনৈতিক বিষয়ের লাগাম ধরেন এবং এরপর সামরিক বিষয়ের দায়িত্বও আপনার ওপর অর্পিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অলৌকিক যোগ্যতার সাথে এখানে রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে নেতৃত্বের শীর্ষে দৃষ্টিগোচর হন।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক বিপদ ছিল কুরাইশ এবং অভ্যন্তরীণ বিপদ ছিল ইয়াহুদী। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মিছাকে মদীনা'র মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিপদকে এক পর্যায় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন কিন্তু বাহ্যিক বিপদ যথারীতি বিদ্যমান ছিল। কুরাইশরা এখন পর্যন্ত মদীনার নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়নি। এর অখণ্ডতার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত ছিল, মক্কা থেকে মদীনার আশপাশ পর্যন্ত বসতি স্থাপনকারী অধিকাংশ গোত্র কুরাইশদের মিত্র ছিল যাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেত। সবচেয়ে বেশি উস্কানিমূলক বিষয় ছিল এই যে, মদীনার নিকটবর্তী মহাসড়কগুলো কুরাইশরা আগের মতোই এখনো সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরের জন্য ব্যবহার করছিল, অথচ নতুন পরিস্থিতিতে তাদের মদীনা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এই পথগুলো ব্যবহার করা উচিত ছিল; কারণ এগুলো মদীনার সীমানা ঘেঁষে ছিল, কিন্তু কুরাইশদের অহংকার তাদের অনুমতি দিচ্ছিল না যে তারা মুসলমানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখবে এবং যাতায়াতের অনুমতি নেবে। তারা জোরপূর্বক এই পথে যাতায়াত অব্যাহত রেখে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল।

**প্রাথমিক অভিযানসমূহ:**

নবী আকরাম ﷺ কুরাইশদের তাদের অবস্থান স্মরণ করিয়ে দিতে এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে তাদের সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র ও বিপদ থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আপনি ﷺ মদীনার পশ্চিমে উপকূল পর্যন্ত বসবাসকারী জনপদ ও গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি করেন এবং তাদেরকে একটি ফেডারেশনের অধীনে আনার চেষ্টা করেন। এই সিলসিলায় আপনি ﷺ ষাটজন মুহাজিরের সাথে সেই সফর করেন যাকে প্রথম যুদ্ধ 'আবওয়া' বলা হয়, এটিই সেই জায়গা ছিল যেখানে আপনার মহীয়সী মাতা আপনাকে একা রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন এবং এখানেই তাঁর কবর ছিল। এখানে বসবাসকারী বনু যামরাহ-এর সাথে ঐক্য ও সহযোগিতার চুক্তি হয়। এটি সফর ২ হিজরীর ঘটনা। [১]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৪/৫... ইবনে হাবীবের মতে সফর ২ হিজরীর শুরুতে যাত্রা এবং ১লা রবিউল আউয়াল প্রত্যাবর্তন হয়েছিল। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১০)

জামাদিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) 'উশাইরা' গমন করেন এবং বনু মুদলিজের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকার করেন। [১] একইভাবে 'জুহাইনা' গোত্রকে, যারা মদিনা থেকে ত্রিশ মাইল (৪৯ কিলোমিটার) দূরে পাহাড়ে বসবাস করত, অন্তত এই পর্যায় পর্যন্ত সম্মত করা হয়েছিল যে তারা যুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ নেবে না। [২] একই বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) শাবান মাসের শুরুতে 'বুওয়াত' গমন করেন। এরপর শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে 'সাফওয়ান' তাশরিফ নিয়ে যান যেখানে বনু গিফার এবং বনু আসলামের সাথে একইভাবে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। [৩]

এই সমস্ত গোত্র মদিনা এবং লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সিরিয়াগামী মহাসড়কের আশেপাশে বসবাস করত। তাদের মদিনা রাষ্ট্রের প্রভাবাধীন আসা কুরাইশদের জন্য অবশ্যই উদ্বেগের বিষয় ছিল; কারণ এর ফলে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর যাতায়াত আরও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিল। নবী করীম (সা.) কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর ওপর এমন কঠোর পাহারা বসাননি যে তাদের যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত একটি নবজাত রাষ্ট্রের জন্য এমনটি করা কঠিনও ছিল।

**কুরাইশদের দুর্বল দিক: বাণিজ্যিক পথ অনিরাপদ:**

মক্কাবাসীরা আউস এবং খাজরাজ গোত্রের সাথে শত্রুতা করতে চাইত না; কারণ মদিনা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর মহাসড়কের ওপর অবস্থিত ছিল। এখানকার মানুষের সাথে শত্রুতা মক্কাবাসীদের জন্য ব্যয়বহুল হতে পারত। এটি ছিল কুরাইশদের সেই দুর্বল দিক যা আনসাররা ভালোভাবেই জানতেন। সময় এলে তারা এর বহিঃপ্রকাশও ঘটিয়েছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর মদিনায় আগমনের কিছুকাল পর আউস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুয়াজ (রা.) উমরাহ পালনের জন্য মক্কায় যান। উমাইয়া বিন খালাফের সাথে তার পুরনো বন্ধুত্ব ছিল, তাই মক্কায় তিনি তার কাছেই অবস্থান করেন। একদিন তিনি উমাইয়ার সাথে কাবার তাওয়াফ করতে বের হলে সেখানে আবু জাহেলের সাথে দেখা হয়। সে হুমকি দিয়ে বলল: "তোমরা সাবী (ধর্মত্যাগী) এবং বেদ্বীনদের আশ্রয় দিয়েছ, আমি এটা সহ্য করব না যে তোমরা কাবার জিয়ারত করতে আসতে পারবে। যদি উমাইয়া তোমার সাথে না থাকত, তবে তুমি বেঁচে ফিরতে পারতে না।" সাদ বিন মুয়াজ (রা.) তাৎক্ষণিক কড়া জবাব দিয়ে বললেন:

"যদি তোমরা আমাদের কাবার জিয়ারত থেকে বাধা দাও, তবে আমরা তোমাদের সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দেব।" [৩]

পরবর্তী দিনগুলোতে উভয় পক্ষের এই হুমকিগুলো বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করে। কুরাইশদের আচরণ এতটাই শত্রুতামূলক দেখা যাচ্ছিল যে, মুসলমানরা কাবার জিয়ারত তো দূরের কথা, মক্কার কাছেও ঘেঁষতে পারছিল না। অন্যদিকে কুরাইশদের কাফেলাগুলো এখন মুসলমানদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখা দিতে লাগল।

**গাজওয়াত ও সারায়া:**

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সীমান্ত রক্ষা, শত্রুর আগ্রাসনের জবাব এবং ইসলামী সীমান্ত দিয়ে অতিক্রমকারী তাদের কাফেলাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সময়ে সময়ে সাহাবীদের সশস্ত্র...

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৫৯৮, ৫৯৯

[২] আল-মুহাব্বার, পৃষ্ঠা ১১১

[৩] সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৯৫০, কিতাবুল মাগাজি, বাব জিকরুন নবী (সা.) মান ইউকতালু বি-বদর

দল পাঠাতে শুরু করলেন যাদের সীরাতকারগণ ‘সারায়া’ নামে স্মরণ করেন।

‘গাযওয়াত’ এবং ‘সারায়া’-এর মর্মার্থ এখানেই ভালোভাবে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি যাতে সামনে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সেই সুসংগঠিত প্রচেষ্টাগুলো যাতে যাতায়াত ও সফরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেগুলোকে ‘গাযওয়াত’ ও ‘সারায়া’ বলা হয়। ‘গাযওয়াত’ হলো গাযওয়া-এর বহুবচন। এর দ্বারা সেই রাজনৈতিক, সামরিক বা তাবলীগী সফরগুলো উদ্দেশ্য যাতে রাসূলুল্লাহ স্বয়ং সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন।

‘সারায়া’ হলো ‘সারিয়া’-এর বহুবচন। এটি সেই অভিযানকে বলা হতো যার বিন্যাস রাসূলুল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন কিন্তু নিজে বাস্তবিকভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেননি। ‘গাযওয়া’ বা ‘সারিয়া’ যুদ্ধের সমার্থক শব্দ নয়, বরং এদের মর্মার্থে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। [১]

গাযওয়াতের সংখ্যা হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ রেওয়ায়েতে ১৯টি বলা হয়েছে। [২] পক্ষান্তরে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) এই সংখ্যা ২১টি বর্ণনা করেছেন। কিছু রেওয়ায়েতে এই সংখ্যা ২৭ পর্যন্ত বলা হয়েছে। [৩] সারায়ার সংখ্যা ৩৮, ৪৭ এবং ৫৬ বলা হয়। [৪] এই পার্থক্যের কারণ এটি মনে হয় যে, কখনো কখনো একই সফরে বা একই সময়ে একাধিক স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে; কেউ এক সফর বা এক সময়ের দুই-তিনটি অভিযানকে একটি অভিযান গণ্য করেছেন এবং কেউ প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা গণনা করেছেন। [৫]

---

[১] নিম্নোক্ত সকল প্রকারের সফরের ওপর ‘গাযওয়া’ বা ‘সারিয়া’ শব্দ প্রয়োগ হয়:

- নিজের প্রতিরক্ষা বা শত্রুকে পরাভূত করার জন্য করা সফর যাতে যুদ্ধও হয়েছে, যেমন: গাযওয়ায়ে হুনাইন, গাযওয়ায়ে খায়বার।
- নিজের প্রতিরক্ষা বা শত্রুকে পরাভূত করার জন্য সফর করা হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ হয়নি, যেমন: গাযওয়ায়ে তাবুক।
- সফরে যুদ্ধের নিয়ত ছিল না কিন্তু যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেমন: গাযওয়ায়ে বদর।
- দলগুলোর মূলোৎপাটনের অভিযান, যেমন: গাযওয়ায়ে বনী কায়নুকা, গাযওয়ায়ে বনী কুরাইযা।
- সীমান্ত রক্ষার জন্য টহলদানকারী দল। অধিকাংশ সারায়া এই প্রকারের ছিল।
- তাবলীগী ও শিক্ষামূলক প্রতিনিধি দল যাদের দায়িত্বে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ বা নিজের কোনো মিত্রের সাহায্য করাও ছিল, যেমন: সারিয়া রাজী।
- তাবলীগী ও শিক্ষামূলক সফর যাতে কোনো চুক্তি হয়েছে, যেমন: গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান, গাযওয়ায়ে বুওয়াত।
- এদিক-ওদিক থেকে শত্রুর পক্ষ থেকে বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া, যেমন: গাযওয়ায়ে যাওয়াতুর রিকা।
- শত্রুকে আতঙ্কিত করার জন্য করা সফর, যেমন: গাযওয়ায়ে বনী লিহিয়ান, গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ, গাযওয়ায়ে বদরুল মাওঈদ।
- কোনো দস্যুতা বা আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় করা ব্যবস্থা, যেমন: গাযওয়ায়ে যূ কারাদ, গাযওয়ায়ে সাফওয়ান।
- শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের জন্য করা সফর, যেমন: সারিয়া আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ।
- শত্রুকে অবরুদ্ধ করার জন্য করা সফর, যেমন: সারিয়া আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ, সারিয়া যূ কারাদাহ।
- কোনো জাতির সাথে চুক্তির জন্য করা সফর, যেমন: গাযওয়ায়ে আবওয়া, গাযওয়ায়ে যুল উশাইরাহ।
- ইবাদতের জন্য করা সফর যাতে কোনো জাতির সাথে চুক্তি হয়েছে। (এজন্য হুদায়বিয়ার সফরকেও গাযওয়া গণ্য করা হয়।)
- শত্রুর কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য বিশেষ অভিযান, যেমন: সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ, সারিয়া আব্দুল্লাহ বিন আতীক... (রাহমাতুল্লিল আলামীন: ২/২৫৩ থেকে ২৫৬)।

যেসব গাযওয়ায় যুদ্ধ হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা এগারোটি, যথা: গাযওয়ায়ে বদর, গাযওয়ায়ে উহুদ, গাযওয়ায়ে বনী কায়নুকা, গাযওয়ায়ে বনী নাযীর, গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক, গাযওয়ায়ে খন্দক, গাযওয়ায়ে বনী কুরাইযা, গাযওয়ায়ে খায়বার, গাযওয়ায়ে ফাতহে মক্কা, গাযওয়ায়ে হুনাইন এবং গাযওয়ায়ে তায়েফ... কিছু ব্যক্তি এই তালিকায় গাযওয়ায়ে বনু কায়নুকাকে গণনা করেন না; কারণ এতে কেবল অবরোধ হয়েছিল। তদুপরি তারা গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযাকে গাযওয়ায়ে খন্দকেরই অংশ মনে করেন, এভাবে যুদ্ধ হওয়া গাযওয়াতের সংখ্যা ৯টি থেকে যায়।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৯৪৯, কিতাবুল মাগাযী।

[৩] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৫/৩৫৭ থেকে ৩৬২।

[৪] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৩/৯।

[৫] শরাফুল মুস্তফা: ৩/১০।

প্রাচ্যবিদরা এই অভিযানগুলোকে ডাকাতি বলে অভিহিত করেন; কারণ এগুলোতে কুরাইশদের কাফেলাও লুণ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। কুরাইশদের কাফেলার ওপর আক্রমণকে তখনই ডাকাতি বলা যেত যদি কুরাইশরা নিজেরা নির্দোষ হতো। দ্বিতীয়ত, যখন তাদের ওপর আক্রমণ কোনো সরকারের পক্ষ থেকে না হয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে হতো। জালেমের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া ইনসাফের দাবি। আর যখন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কোনো চুক্তিও না থাকে, এমতাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি অপর পক্ষকে জান ও মালের ক্ষতি পৌঁছায়, তবে তাকে বিশ্বের কোনো অভিধানেই ডাকাতি বলা হয় না।

**সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা:**

সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি সংবাদ আদান-প্রদান ও গোয়েন্দাগিরি ছাড়া কখনোই চলতে পারে না, কারণ এই ব্যবস্থাগুলো ছাড়া ভেতরের আসল খবর পাওয়া সম্ভব নয়। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু খবর ওহী এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পেয়ে যেতেন, কিন্তু অধিক নির্ভরতা ছিল সংবাদদাতাদের ওপর। একজন আদর্শ নেতার ভূমিকা পালন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মক্কা থেকে কুরাইশদের বিশেষ পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের তথ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাঝে মাঝে সেই সব লোক দিতেন যারা তখনো পর্যন্ত নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে কুরাইশদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। আপনি ﷺ প্রাপ্ত গোপন তথ্যের "উৎস" প্রকাশ করতেন না, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা যেত না যে আপনি ﷺ ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়েছেন নাকি সংবাদদাতার মাধ্যমে।

যা-ই হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই সংবাদদাতা নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, কিন্তু সেই যুগে চলমান কাফেলাগুলো সম্পর্কে কোনো সংবাদদাতার খবর এত সময়মতো পৌঁছাতে পারত না যে কাফেলাটিকে থামিয়ে দেওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। অনেক সময় কাফেলাগুলো হঠাৎ তাদের পথ পরিবর্তন করে ফেলত এবং মদিনা থেকে পঞ্চাশ, সাাট মাইল (৮০ থেকে ৯৫ কিলোমিটার) দক্ষিণে সরে গিয়ে তাদের মিত্র গোত্রগুলোর মাঝে পৌঁছে যেত, ফলে কুরাইশদের অনেক কাফেলা সাহাবীদের সশস্ত্র দলগুলোর নাগাল থেকে পরিষ্কারভাবে বেঁচে বেরিয়ে যেত। তবে এতটুকু অবশ্যই হয়েছিল যে, এর ফলে কুরাইশরা জানতে পেরেছিল যে এখন তারা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে সিরিয়ায় যাতায়াত করছে, যার জন্য তারা অবাধ স্বাধীনতা পেতে পারে না।

সাধারণত এই দলগুলোকে প্রয়োজন পড়লে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কয়েকজনকে শুধুমাত্র শত্রুর ওপর নজরদারি করার নির্দেশ দেওয়া হতো। এভাবে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র স্পষ্ট ভাষায় এই ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, কুরাইশদের বাণিজ্য এবং তাদের অর্থনীতির মূল ধমনী এখন মুসলমানদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল; তারা যদি শত্রুতা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের চরম অর্থনৈতিক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। এই দিকটিও উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিযানগুলোতে শুধুমাত্র মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সম্ভবত কুরাইশদের অধিক ভীত করা এভাবেই সম্ভব ছিল যে, তাদের হাতে নির্যাতন সহ্যকারী মজলুমদেরই তাদের মোকাবিলায় সৈনিক হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। একটি কারণ এও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কাছ থেকে নিজের নিরাপত্তা এবং মদিনার ওপর হওয়া আক্রমণগুলোতে সম্মিলিত প্রতিরক্ষার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। মদিনার বাইরের অভিযানগুলো এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যদিও আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ইশারায় যেকোনো স্থানে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আপনি ﷺ যথাসম্ভব চুক্তি অনুযায়ী চলতে চেয়েছিলেন।

জিহাদের প্রথম অভিযান হিজরতের সাত মাস পর রমজান মাসে হযরত হামজা (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়েছিল, এই দল...

এতে বিশ জন মুহাজির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এর লক্ষ্য ছিল কুরাইশদের একটি কাফেলা যা আবু জাহলের নেতৃত্বে মদীনার প্রধান সড়ক এড়িয়ে উপকূলীয় পথ দিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিল। মুসলমানরা সামনে এসে এই কাফেলাকে সতর্ক করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।

দ্বিতীয় অভিযানটি শাওয়াল মাসে হযরত উবাইদাহ বিন আল-হারিস (রা.)-এর নেতৃত্বে বাতনে রাবিগের দিকে পাঠানো হয়েছিল, যেখানে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা আসছিল। এই অভিযানে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি কাফেরদের ওপর একটি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন; এটিই প্রথম তীর যা ইসলামের ইতিহাসে প্রতিপক্ষের ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবারও কাফেলাকে কেবল আতঙ্কিত করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। [১]

**সারিয়া আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.):**

২ হিজরীর জমাদিউল আখিরা মাসের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের দক্ষিণমুখী বাণিজ্য যা ইয়ামেনের দিকে ছিল, তা অসুরক্ষিত করার জন্য একটি অসাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি (সা.) হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.)-কে বারোজন মুহাজিরের আমীর বানিয়ে একটি পত্র দিলেন এবং বললেন: "দুই দিনের সফরের পর এটি খুলবে।" দুই দিন পর তিনি পত্রটি খুলে দেখলেন তাতে লেখা ছিল: "নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করো এবং কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করো।" এত দূরবর্তী সফর তাও আবার ঠিক শত্রুর এলাকায় অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। তাই হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.) পত্রটি পড়ার পর সঙ্গীদের বললেন: "কেবল সেই আমার সাথে চলো যার শাহাদাতের তামান্না আছে।" কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ পিছিয়ে থাকল না। [২]

এই দলটি সেখানে পৌঁছে গেল, তখন কুরাইশদের একটি ছোট কাফেলা চামড়া ও কিশমিশ নিয়ে সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। সেই সময় রজব মাসের চাঁদ উঠে গিয়েছিল যা ঐ মাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল যেগুলোতে আরবদের নিকট লড়াই করা হারাম ছিল এবং ইসলামেও তখন এই হুকুমই ছিল। কিন্তু সাহাবীগণ মনে করেছিলেন যে আজ জমাদিউল আখিরা মাসের শেষ তারিখ। [৩] ফলে তারা আক্রমণ করে বসলেন যাতে কাফেলার সরদার আমর বিন হাদরামি নিহত হলো, দুইজন লোক বন্দী হলো এবং বেশ কিছু গনীমতের মাল হস্তগত হলো। অভিযান শেষে ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "আমি রজব মাসে লড়াই করার নির্দেশ দেইনি।" আপনি বন্দী ও গনীমতের মাল যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

আমর বিন হাদরামি যে এই ঘটনায় নিহত হয়েছিল, সে কুরাইশদের একজন নামকরা সরদার ছিল। তার নিহত হওয়ার কারণে কুরাইশরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলো। তারা রটিয়ে দিল যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসগুলোতেও যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে নিয়েছে।

এই অপপ্রচারের জবাবে আয়াত ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ [৪] নাযিল হলো, যাতে জানিয়ে দেওয়া হলো যে মুসলমানদের এই ভুলের তুলনায় কাফেরদের কু-আকীদা, কুফর ও শিরক এবং জুলুম-অত্যাচারের অপরাধ অনেক বেশি গুরুতর। তাদের নিজেদের...

---

[১] যাদুল মাআদ: ৩/১৬৩।

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৬০২। মনে রাখা দরকার যে, নাখলা মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে তায়েফের পথে অবস্থিত।

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম (১/৬০৪) এবং তারিখুল মদীনা লি-ইবনে শাব্বাহ (২/৩৭২)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটি রজবের শেষ তারিখ ছিল এবং সাহাবীগণ তা জানতেন না। ইমাম তহাবীর বর্ণনা (শারহু মুশকিলিল আসার, হা: ৪৮৮০) জানায় যে, সাহাবীগণ জানতেন না এটি জমাদিউল উলার শেষ তারিখ নাকি রজবের। সনদ ও যুক্তির বিচারে এটিই অগ্রগণ্য।

[৪] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৭... মনে রাখা দরকার যে, সারিয়া আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.) যে রজব মাসে পাঠানো হয়েছিল তা ছিল সেই রজব যাকে বিশেষ চান্দ্র রজব বলা হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা কোনো অপরাধ করেনি, কিন্তু যেহেতু কুরাইশরা এই কৃত্রিম রজবকে পবিত্র মনে করত, তাই তারা এত শোরগোল করেছিল এবং কুরআন মাজীদ তাদেরই স্বীকৃত যুক্তির ভিত্তিতে তাদের জবাব দিয়েছে।

নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ড ভুলে গিয়ে তারা মুসলমানদের কেবল একটি ভুলের জন্য অভিযুক্ত করতে পারে না। [১]

**কাবা কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হওয়া:**

এ পর্যন্ত মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, কাবাকে সালাতের কিবলা বানানো হোক। কেন? কারণ এই কেন্দ্র থেকেই হাজার বছর আগে সর্বপ্রথম তাওহীদের বাণী প্রচারিত হয়েছিল এবং এটিই ছিল আল্লাহর প্রথম ঘর, যার মর্যাদা ও পবিত্রতা সমস্ত ইবাদতগাহের চেয়ে বেশি ছিল। অবশেষে হিজরতের এক বছর চার মাস পর ২ হিজরীর শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সমস্ত মুসলমানকে কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। ইহুদিরা এ নিয়ে যে আপত্তি তুলেছিল, সূরা আল-বাকারায় তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয়েছে। [২]

**সওমে আশুরা:**

মক্কায় মুশরিকরাও আশুরার দিন (১০ই মহররম) রোজা রাখত এবং এই দিনে কাবায় নতুন গিলাফ পরানো হতো। ইসলামে এই মহররমের রোজা ফরজ করা হয়েছিল এবং মুসলমানরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা পালন করতেন। [৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় তাশরীফ আনলেন, তখন দেখলেন ইহুদিরাও মহররমের রোজা রাখছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল: “এটি একটি বরকতময় দিন, যে দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু (ফেরাউন) থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাই মূসা (আ.) রোজা রেখেছিলেন।” রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “মূসা (আ.)-এর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে আমিই বেশি হকদার।” [৪]

আপনি নিয়ম অনুযায়ী সেই দিন রোজা রাখলেন এবং মুসলমানদেরও এর নির্দেশ দিলেন। [৫]

প্রাচ্যবিদদের (মুস্তাশরিকিন) এই আপত্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহুদিদের অনুকরণে রোজা রাখা শুরু করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই রোজা মক্কায়ও মুসলমানরা রাখতেন। এখানে কেবল এটিই দেখানো হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃত অনুসারী আপনারা, তারা নয়। [৬]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/২০৩ থেকে ২০৪।

[২] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪২ থেকে ১৫০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/২৫২। কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে: কারো মতে হিজরতের ১৬ মাস পর, কারো মতে রজব মাসে এবং কারো মতে হিজরতের ১৮ মাস পর অর্থাৎ শাবান মাসে এই নির্দেশ নাজিল হয়। হাফেজ ইবনে কাসীর শাবান মাসের মতটিকে সঠিক বলেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/২৫২)। আর সহীহ বুখারী অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনায় আগমনের পর ১৬ বা ১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা হয়েছে। (হা: ৪০, বাব: আস-সালাতু মিনাল ঈমান, কিতাবুল ঈমান)। এর অর্থ হলো হিজরত থেকে রজব ২ হিজরী বা শাবান ২ হিজরী পর্যন্ত চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ১৬ বা ১৭ মাস অতিবাহিত হয়েছিল যে সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতেন। ১৮তম মাসে শাবান মাসে কাবার দিকে মুখ করার নির্দেশ আসে।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ১৫৯২, কিতাবুল হজ, হা: ১৮৯৩, কিতাবুস সওম, বাব: উজুবু সওমে রমজান; ফাতহুল বারী: ৪/২৪৮।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ২০০৩, কিতাবুস সওম, বাব: সওমে আশুরা।

[৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) ১২ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় তাশরীফ আনেন। সৌর বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী তখন মহররম মাস শেষ হতে চলেছিল। ইহুদিদের ‘খাফিয়া কিপ্পুর’ বা ‘ইয়ম কিপ্পুর’ (যা তাদের বর্ষপঞ্জির তিশরী মাসের ১০ তারিখে শুরু হয়, সাধারণত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের শুরুতে) শুরু হচ্ছিল। তারা এই মাসের ১০ তারিখে রোজা রাখত। যদিও এই দিনটি চান্দ্র বর্ষপঞ্জির ১০ই মহররম ছিল না। যেহেতু ইসলামে বর্ষপঞ্জি সংশোধন সূরা আত-তাওবার ৩৬, ৩৭ আয়াতের মাধ্যমে হয়েছিল, তাই এর আগে মুসলমানরা আশুরার রোজা চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ীও রাখতেন এবং ইহুদিদের বর্ষপঞ্জি অনুযায়ীও রাখতেন। আর সেই সময় ইসলামে এটিই প্রাথমিক পর্যায় ছিল যখন কাবার পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা হতো।

## রমজানের রোজার ফরযিয়ত:

হিজরতের দ্বিতীয় বছর শাবান মাসে রমজান মাসের রোজার ফরয হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয় [১]। আশুরার রোজার মর্যাদা এখন নফল হিসেবে রয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সা.) বলে দিলেন যে, যে চায় সে রাখুক, আর যে চায় সে না রাখুক [২]। তবে আপনি রমজানের রোজার ব্যাপারে কঠোর তাকিদ দিলেন এবং এর গুরুত্ব ও ফযিলত ভালোভাবে স্পষ্ট করে দিলেন। আপনি বলতেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে এবং এতে তারাবিহর ব্যবস্থা করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে" [৩]।

রমজানের রোজার ফরযিয়ত ছিল আল্লাহর ভালোবাসায় প্রতিটি প্রিয় বস্তু ত্যাগ করার একটি ব্যবহারিক অনুশীলন। এটি ছিল আত্মার পবিত্রতা, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর প্রশিক্ষণ। রমজান এবং এর রোজার যেসব ফযিলত কুরআন মাজিদ ও হুজুর (সা.)-এর হাদিস থেকে জানা গেছে, সেগুলোর কারণে রোজা সাহাবায়ে কেরামের প্রিয় ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছিল। আপনি (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম রমজান ছাড়াও মাঝে মাঝে রোজা রাখতেন।

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২৩৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩১২; আল-মুনতাযাম লিবনিল জাওযি: ৩/৯৬।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ১৫৯৩, কিতাবুল হাজ্জ, বাব কওলিল্লাহ: জা'আলাল্লাহুল কা'বাহ; হা: ১৮৯৩, কিতাবুস সাওম, বাব উজুবে সাওমে রমজান।

[৩] সুনানে তিরমিযী, হা: ৬৮৩, আবওয়াবুস সাওম।

গাযওয়ায়ে বদর (রমজান ২ হিজরি / মে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.)-এর সারিয়্যাহতে প্রথমবারের মতো এমনটি ঘটেছিল যে কুরাইশদের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালানো হয়েছিল এবং তাদের একজন লোক নিহত হয়েছিল। এর ফলে কুরাইশ নেতাদের তাদের কওমের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর যে সুযোগ মিলেছিল, তারা তা নষ্ট করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় পরিসরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সামরিক ব্যয়। কুরাইশরা তাদের সমস্ত পুঁজি দিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বড় বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওনা করে যাতে এর মুনাফা দিয়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা যায়। [১]

এই কাফেলাটি যাওয়ার সময় মুসলমানদের নাগালের বাইরে দিয়ে চলে গিয়েছিল। ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোয়েন্দারা এর ওত পেতে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সময়মতো সংবাদ পেয়ে যান এবং তিনি ৮ রমজানুল মুবারক ২ হিজরিতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন, তাদের সাথে নিয়ে এই কাফেলাটিকে থামানোর জন্য স্বয়ং রওনা হয়ে যান। [২]

**শিশুদের জিহাদের আগ্রহ:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে মদিনা থেকে এক মাইল (৬০ কিলোমিটার) দূরে "বি'রে উতবা"-র কাছে যাত্রাবিরতি করেন এবং সবাইকে পর্যবেক্ষণ করেন। আপনি তাদের মধ্যে কিছু অল্পবয়সী কিশোরকে দেখতে পান যারা জিহাদের প্রবল আগ্রহে সাথে বেরিয়ে এসেছিল। আপনি তাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই শিশুদের মধ্যে উসামা বিন যায়েদ, রাফে বিন খাদিজ, বারা বিন আযিব, যায়েদ বিন আরকাম এবং যায়েদ বিন সাবিত (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যেই ষোল বছর বয়সী উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও ছিলেন যিনি হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর ছোট ভাই ছিলেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হওয়া থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তার ভাই সাদ (রা.) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: "কী হয়েছে?" তিনি বললেন: "ভয় পাচ্ছি নবী আকরাম (সা.) আমাকে দেখে ফেললে ছোট মনে করে ফেরত না পাঠিয়ে দেন। আমি আল্লাহর পথে বের হতে চাই, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাকে শাহাদাত দান করবেন।" তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে আনা হলো। আপনি যথারীতি তাকেও ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার আবেগ দেখে এই অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে দিলেন। [৩] মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিনশ তেরো জন, লস্করে ঘোড়া ছিল মাত্র দুটি এবং উট ছিল সত্তরটি। একেকটি উটে তিন জন করে ব্যক্তি পালাক্রমে সওয়ার হতেন। [৪]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২/৩

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৬১২/১

গাযওয়ায়ে বদর গরম মৌসুমে হয়েছিল, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলতেন: "ওয়া কানা ইয়াওমান হাররান" (সহীহ বুখারী, হা: ৩৯৬০, কিতাবুল মাগাযী)। এছাড়া সাহাবীদের যাত্রাবিরতিতে পানির নিকটবর্তী হওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য ছায়াঘর তৈরি করা গরম মৌসুমের সম্ভাবনাকে জোরালো করে। এখন দেখলে দেখা যায় যে, ২৭ মে রমজান মার্চে আসে যেখানে রমজান মে মাসে। এই অস্পষ্ট লক্ষণগুলো নির্দেশ করে যে, বর্ণনাকারীরা এই যুদ্ধের সময়কাল নির্ধারণ জাতীয় ক্যালেন্ডারের সাথে করেছিলেন।

[৩] আল-ইসাবাহ, অনুবাদ: উমাইর বিন সাদ (রা.)

[৪] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৬১৩/১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৬/৫

**কাফেলার পরিবর্তে মক্কার বাহিনীর সাথে মোকাবিলা:**

এদিকে কুরাইশ কাফেলার সরদার আবু সুফিয়ান ইবনে হারব মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি সাধারণ রাস্তা ছেড়ে সমুদ্রের তীর ধরে কাফেলা নিয়ে দ্রুত চলতে লাগলেন এবং সাথে সাথেই একজন অশ্বারোহীকে মক্কার দিকে পাঠালেন যাতে কুরাইশরা সাহায্যের জন্য পৌঁছায় এবং তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা রক্ষা করে। কুরাইশরা আগে থেকেই মদিনায় হামলার বাহানা খুঁজছিল, এই খবর মক্কায় পৌঁছানো মাত্রই নয়শ পঞ্চাশ জন সশস্ত্র ব্যক্তির একটি বাহিনী, যাতে দুইশ ঘোড়সওয়ার এবং সাতশ উট সওয়ার ছিল, মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে পড়ল। কুরাইশদের বড় বড় সরদাররা এই বাহিনীতে শরীক ছিল। ছয়শ জন বর্ম পরিহিত ছিল। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ খবর পেলেন যে বাণিজ্যিক কাফেলা তো বেঁচে বেরিয়ে গেছে এবং কুরাইশদের সশস্ত্র বাহিনী মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসছে। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং অন্যান্য মুহাজিরগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প ব্যক্ত করলেন, কিন্তু আপনি আনসারদের আবেগ দেখতে চাচ্ছিলেন। আনসাররা আপনাকে এই ওয়াদা দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন যে তারা মদিনার সীমানার ভেতরে আপনাকে সুরক্ষা প্রদান করবেন, যার অর্থ ছিল মদিনার সীমানার ভেতরে সুরক্ষা প্রদান করা। প্রকাশ্য শব্দে এই চুক্তি ছিল না যে যদি মদিনার বাইরে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ হয় তবে আনসাররা তখনও সাহায্যের জন্য বাধ্য থাকবে। তাই আপনি আনসারদের মতামতের অপেক্ষায় ছিলেন। আউস গোত্রের সরদার হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.) আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে বললেন:

“আপনি সম্ভবত আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা চান তা-ই করুন! আপনি যার সাথে চান সন্ধি করুন, যার সাথে চান যুদ্ধ করুন। আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর কসম! আপনি যদি নির্দেশ দেন তবে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব।”

আরেকজন আনসারি হযরত মিকদাদ (রা.) আরজ করলেন:

“হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বনী ইসরাঈলের মতো নই যারা হযরত মুসা (আ.)-কে বলেছিল যে যাও তুমি এবং তোমার রব যুদ্ধ করো, আমরা তো আপনার ডানে-বামে এবং সামনে-পেছনে থেকে যুদ্ধ করব।” [২]

কুরাইশ বাহিনী বদরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল যা মদিনা থেকে ৮০ মাইল (১২০ কিলোমিটার) দক্ষিণে একটি উপত্যকা। মুসলমানরাও সেদিকে রওনা হলেন। ইসলামের বাহিনীর যুদ্ধের সাদা রঙের পতাকা হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)-এর হাতে ছিল। নবী করীম ﷺ-এর সামনে আরও দুটি কালো রঙের ঝাণ্ডা ছিল, একটি হযরত আলী (রা.)-এর হাতে এবং অন্যটি হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর কাছে। [৩]

এখানে কুরাইশদের কিছু গোলাম যারা পানির সন্ধানে বেরিয়েছিল, সাহাবায়ে কেরামের হাতে ধরা পড়ল। তারা তাদের মারধর করে কুরাইশদের সংখ্যা ইত্যাদি জানতে চাইলে নবী করীম ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। আপনি নিজেই তদন্ত শুরু করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন:

“কুরাইশরা প্রতিদিন কয়টি উট জবাই করে?” তারা বলল: “নয়-দশটি।”

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৬০৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৬১

[২] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৬১৫

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৬২

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং সাহাবীদের বললেন: “শত্রুর সংখ্যা নয়শ থেকে এক হাজারের মধ্যে।” [১] এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল, সাধারণত একটি উটের গোশত একশ জন মানুষের জন্য যথেষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ হিসাব করে নিলেন যে কুরাইশদের সংখ্যা কত হতে পারে, যা একদম সঠিক ছিল, অর্থাৎ নয়শ পঞ্চাশ জন।

কুরাইশদের বাহিনী অগ্রসর হতে হতে বদর ময়দানের অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেল যেখানে পানি কাছে ছিল। মুসলমানরা প্রথমে ময়দানের এই প্রান্তে এমন জায়গায় ছাউনি ফেলেছিল যেখানে পানি কয়েক মাইল দূরে ছিল। কিন্তু পরে একজন সাহাবী হযরত খুবাব বিন মুনজির (রা.)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ ﷺ পানির ঝরনার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে তাঁবু স্থাপন করলেন, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যার ফলে মুসলমানরা তৃপ্ত হলেন এবং এখানকার বালুময় মাটি শক্ত হয়ে গেল। এই বৃষ্টি কুরাইশদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো; কারণ তাদের ছাউনিতে কাদা ও পিচ্ছিলতা তৈরি হলো।

শুক্রবার, ১৭ রমজান ২ হিজরি (২৫ মে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)-এর সূর্য উদিত হলে কুরাইশরা তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিল। [২] এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের কাতার সোজা করছিলেন, হযরত সাদ বিন মুয়াজ (রা.)-এর পরামর্শে আপনার জন্য একটি খেজুরের ডাল ও পাতা দিয়ে একটি ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল যাতে আপনি সেখানে অবস্থান করেন এবং পুরো যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে নির্দেশ দিতে পারেন। পেছনে দ্রুতগামী সওয়ারিও রাখা হয়েছিল যাতে আল্লাহ না করুন যদি পরাজয় হয় তবে মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার পথ খোলা থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহরক্ষী নিযুক্ত হলেন। [৩]

সকাল হতেই কুরাইশদের বাহিনী সামনে চলে এল এবং কিছু দূরত্ব বাকি থাকতেই মুখোমুখি হলো। এটি ইসলাম ও কুফরের প্রথম এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিল, একদিকে তিনশ তেরোজন মুসলমান ছিলেন যাদের যুদ্ধের সরঞ্জামও কম ছিল। অন্যদিকে কাফেরদের তিন গুণ বেশি এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের সাথে উপস্থিত ছিল। এই মুহূর্তে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন, আপনি বলছিলেন: “হে আল্লাহ! যদি আজ মুমিনদের এই জামাত ধ্বংস হয়ে যায় তবে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনে তোমার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না।” [৪]

আপনি ﷺ এত ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করছিলেন যে আপনার চাদর মোবারক বারবার কাঁধ থেকে পড়ে যাচ্ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) চাদর ঠিক করে দিচ্ছিলেন এবং সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন: “আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার রবের কাছে অনেক চেয়েছেন, তিনি আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং আপনাকে জয়ী করবেন।” [৫]

দুই সাহাবী ঠিক এই যুদ্ধের সময় অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছালেন, মুসলমানদের অনেক আনন্দ হলো; কারণ সেই সময় মুসলমানদের নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল, এমন অবস্থায় যদি একজন ব্যক্তিও বেশি আসত তবে তা গনিমত ছিল, কিন্তু আগত ব্যক্তিরা...

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৩৩, ত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

[২] জাওয়ামিউস সিরাতিন নববিয়্যাহ, পৃ: ৮৬, ত: দারুল ইলমিয়্যাহ; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৫/৫, ত: দারুল হিজর।

নোট: গাজওয়ায়ে বদরের তারিখ সম্পর্কে ১৯ ও ২০ রমজানের বর্ণনাও আছে কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীরসহ জমহুর ঐতিহাসিকগণ ১৭ রমজানকেই সঠিক মনে করেন। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন: “আমি বলি, বদরের রাত ছিল শুক্রবার, ১৭ই রমজান, হিজরীর দ্বিতীয় বছর।” (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৫/৮১)

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৬২০, ৬২৭।

[৪] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৬২৭।

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৬২৭।

বললেন: “রাস্তায় কাফেররা আমাদের পথরোধ করেছিল এবং বলেছিল যে তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহায্যের জন্য যাচ্ছ।” আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম যে আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছি না। তারা আমাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দিল যে আমরা যুদ্ধে শরিক হব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে উভয়কে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখলেন এবং বললেন: “আমরা প্রতিটি অবস্থায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব, আমাদের জন্য কেবল আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট।” [১] এটি প্রতিশ্রুতি রক্ষার এমন এক উদাহরণ যা কেবল একজন পয়গম্বরই পেশ করতে পারেন।

**ব্যক্তিগত দ্বৈরথ:**

যুদ্ধ এভাবে শুরু হলো যে, কাফেরদের কাতার থেকে বৃদ্ধ উতবা বিন রাবিয়াহ, যে ছিল বাহিনীর প্রধান, তার ভাই শায়বাহ এবং পুত্র ওয়ালিদের সাথে ময়দানে বের হলো। তারা তিনজনই ছিল নামকরা যোদ্ধা। তারা এসেই হুঙ্কার দিল: “হে মুসলমানরা! আমাদের সাথে মোকাবিলা করার মতো কেউ থাকলে সামনে এসো।” এটি শুনেই তিনজন আনসারী যুবক: মুআউয়িজ, আউফ এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুম সামনে এগিয়ে এলেন। [২]

উতবা জিজ্ঞেস করল: “তোমরা কারা?” তারা নিজেদের পরিচয় দিলে উতবা বলল: “তোমাদের সাথে আমাদের কোনো কাজ নেই, আমাদের সমপর্যায়ের লোকদের মোকাবিলায় পাঠাও।” রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাবু থেকে যুদ্ধের কমান্ড দিচ্ছিলেন, তিনি এই তিনজনকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন এবং ডাক দিলেন: “হে উবায়দাহ বিন হারিস! ওঠো, হে হামজা! ওঠো, হে আলী! ওঠো।”

এই তিনজনই ছিলেন কুরাইশ বংশীয় এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। উবায়দাহ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সী, হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাতান্ন বছর এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সী। এখন মোকাবিলা ছিল একদম সমানে সমান! কারণ ওদিকে উতবা ছিল বৃদ্ধ, শায়বাহ তার চেয়ে কিছুটা কম বয়সী এবং ওয়ালিদ ছিল একদম যুবক। তিনজন সাহাবী নিজেদের কাতার থেকে বের হয়ে তাদের সামনে পৌঁছালেন। তারা মুখ ও মাথা ঢেকে রেখেছিলেন, তাই উতবা জিজ্ঞেস করল: “তোমরা কারা?” তারা নিজেদের নাম বললে সে বলল: “হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সমপর্যায়ের।”

হযরত উবায়দাহ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু উতবা বিন রাবিয়াহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সমবয়সী শায়বাহর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার যুবক প্রতিপক্ষ ওয়ালিদের ওপর আক্রমণ করলেন। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু শায়বাহকে আঘাত করার সুযোগও দিলেন না এবং এক আঘাতেই তাকে হত্যা করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে ওয়ালিদ টিকতে পারল না এবং নিহত হলো। কিন্তু হযরত উবায়দাহ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উতবা উভয়ই ছিলেন অনেক পুরনো তলোয়ারবাজ, তাই তারা দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে থাকলেন। উভয়ের তলোয়ার দীর্ঘক্ষণ ঝনঝন করতে থাকল, অবশেষে হযরত উবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু লড়তে লড়তে আহত হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত হামজা এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে পড়ে যেতে দেখে উতবার দিকে ধাবিত হলেন এবং তার কাজ শেষ করে দিলেন। [৩] তারপর তারা উবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তুলে আপনার ﷺ কাছে নিয়ে এলেন।

হযরত উবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আপনার কদমে গাল রেখে প্রশ্ন করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি শহীদ?”

---

[১] সহীহ মুসলিম: ১৭৮৭, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু আল-ওয়াফা বিল আহদ, ত. দারুল জীল।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৫৯, ৬০০।

[৩] নিজের সঙ্গীকে সাহায্য করা নিয়মের পরিপন্থী ছিল না, আর মুশরিকরাও এর ওপর কোনো আপত্তি করেনি। মূলত এটি ছিল নিজেদেরই বীরত্ব প্রদর্শন যেমনটি আজকাল “রেসলিং”-এ হয়ে থাকে।

রহমতে আলম (সা.) বললেন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তোমরা শহীদ হবে।”

তারা বলতে লাগল: “আজ আবু তালিব বেঁচে থাকলে মানতেন যে তার এই কবিতাগুলোর পূর্ণ হকদার আমরাই:

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ
وَنَذْهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

“আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে কারো হাতে সোপর্দ করব না, চাই আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হোক, আমরা তাদের জন্য নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীদের ভুলে যাব।” [১]

**ভয়াবহ যুদ্ধ - উমাইর বিন হুমাম-এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা:**

উতবা, শায়বা এবং ওয়ালিদ নিহত হওয়ার পর ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা.)-এর গোলাম মিহজা (রা.) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হলেন। এদিকে নবী করীম (সা.) মুসলমানদের উৎসাহিত করে বললেন: “সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি এই মুশরিকদের মোকাবিলায় ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে লড়বে এবং পিছু হটবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন।”

কিছু সাহাবী সংরক্ষিত দল হিসেবে পেছনের সারিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছিলেন, তাদের মধ্যে উমাইর বিন হুমাম (রা.)-ও ছিলেন, যার হাতে কিছু খেজুর ছিল যা তিনি খাচ্ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা শুনেই বলে উঠলেন: “আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি?” তিনি বললেন: “তুমি তাদের মধ্যেই আছো।”

তিনি বললেন: “বাহ! বাহ! তবে তো আমার এবং জান্নাতের মাঝে কেবল এতটুকু দূরত্ব যে কেউ আমাকে হত্যা করে দেয়।” এই বলে তিনি খেজুরগুলো ফেলে দিলেন এবং তলোয়ার হাতে শত্রুদের দিকে দৌড়ে গেলেন। লড়াই করতে করতে তিনি কয়েকজনকে হত্যা করলেন এবং অবশেষে তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। [২]

**আনসারী যুবকদের জিহাদের জযবা - আবু জাহেল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত:**

যুদ্ধে আনসারী যুবকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। দুই আনসারী ভাই: মুয়ায বিন আফরা এবং মুয়াউয়িয বিন আফরা, যারা হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “চাচাজান! আপনি কি আবু জাহেলকে চেনেন?”

তিনি জবাবে বললেন: “হ্যাঁ! খুব ভালোভাবেই চিনি, তোমাদের তার সাথে কী কাজ?”

তারা বললেন: “শুনেছি, সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে গালি দেয়। আল্লাহর কসম! যদি সে নজরে আসে তবে তাকে ছাড়ব না।”

ঠিক সেই সময় আবু জাহেল ঘোড়ায় চড়ে নিজের সাথীদের উৎসাহিত করতে করতে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) সাথে সাথে বললেন: “ঐ দেখো, ও-ই আবু জাহেল।”

একথা শোনা মাত্রই দুই কিশোর আবু জাহেলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে এক আনসারী মুয়ায বিন আমর (রা.), যিনি আগে থেকেই আবু জাহেলের সন্ধানে ছিলেন, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার পায়ের নলার ওপর এমন এক আঘাত করলেন যে তা কেটে পড়ে গেল। আবু জাহেলের...

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/২০

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩/১০৬, ৫/১৪১, দারুল হিজর

ইকরিমা যখন তার পিতাকে আহত হতে দেখলেন, তখন তিনি মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন, যার ফলে তাঁর হাত কেটে গেল কিন্তু সামান্য চামড়ার সাথে ঝুলে রইল। মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য এই হাতের কারণে লড়াই করতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই তিনি তাঁর পা দিয়ে হাতটি চেপে ধরলেন এবং জোরে টান দিলেন যাতে চামড়া আলাদা হয়ে যায় এবং তিনি হাতটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

এদিকে মুআউয়িয রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু জাহলের ওপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে তাকে গুরুতর আহত করলেন এবং নিজেও লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

আবু জাহল রক্তে লথপথ হয়ে ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। মুআয বিন আফরা এবং মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা মনে করলেন যে আবু জাহল মারা গেছে। উভয়েই দৌড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পৌঁছালেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন: "তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?" তাঁরা উভয়েই একযোগে বললেন: "আমি করেছি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা কি তোমাদের তলোয়ার পরিষ্কার করে ফেলেছ?" তাঁরা উত্তর দিলেন: "জি না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উভয়ের তলোয়ার দেখলেন এবং মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তলোয়ারে লেগে থাকা রক্ত সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে তাঁর আঘাতটি ছিল মারাত্মক। তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বললেন: "তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।" [১]

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিলেন যে আবু জাহলের শরীরের পোশাক এবং বর্ম মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেওয়া হবে। [২]

---

[১] আবু জাহল হত্যার এই ঘটনাটি সংকলন করার ক্ষেত্রে মাদারেজুন নবুওয়াত, বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাগুলোকে সামনে রাখা হয়েছে। এতে বিরোধ দূর করার জন্য এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য সীরাতে ইবনে হিশামের বর্ণনাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর শরহে মুসলিম নববী, ফাতহুল বারী এবং উমদাতুল কারী-তে বর্ণিত এই ঘটনার ব্যাখ্যাগুলো থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আসলে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী দুই যুবক কে ছিলেন? এই বিষয়ে দুটি মত প্রসিদ্ধ:

- আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর দুই ছেলে: মুআয এবং মুআউয়িয রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে হত্যা করেছেন। এটিই বেশি প্রসিদ্ধ। নিচের বর্ণনাগুলো একে সমর্থন করে:

"আমরা দুই বাজপাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম যতক্ষণ না তারা তাকে আঘাত করল, আর তারা ছিল আফরার দুই ছেলে।" (সহীহ বুখারী, হা: ৩৯৮৮, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফজল মান শাহেদা বদরান)

"অতঃপর ইবনে মাসউদ গেলেন এবং তাকে পেলেন এমতাবস্থায় যে আফরার দুই ছেলে তাকে আঘাত করেছে।" (সহীহ মুসলিম, হা: ১৭৬৩, বাব কতল আবি জাহল)

- মুআয বিন আফরা এবং মুআয বিন আমর বিন জামুহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে হত্যা করেছেন। সহীহ মুসলিমসহ অনেক হাদীসের কিতাবে এই বর্ণনা রয়েছে। "আর তিনি (রাসূলুল্লাহ) মুআয বিন আমর বিন জামুহ-এর জন্য তার (নিহতের) আসবাবপত্রের ফয়সালা দিলেন, আর সেই দুই ব্যক্তি ছিলেন মুআয বিন আমর বিন জামুহ এবং মুআয বিন আফরা।" (সহীহ মুসলিম, হা: ৪৬৬৮, কিতাবুল জিহাদ, বাব ইস্তিহকাকুল কাতিল সালবাল কাতিল; শরহে মুসলিম নববী: ১২/৭৬; শরহে মাআনীল আসার: ৩/২২৬)

সীরাতে ইবনে হিশামে মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সরাসরি এই ঘটনার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, যাতে তিনি বর্ণনা করেন যে তিনি কীভাবে আবু জাহলের পায়ের নলায় আঘাত করেছিলেন এবং কীভাবে আবু জাহলের ছেলে তাঁর হাত কেটে ফেলেছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/২৩৫)

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন যে, মুআয বিন আফরা এবং মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহুমা একসাথে আক্রমণ করে আবু জাহলকে গুরুতর আহত করেছিলেন। এরপর মুআউয়িয রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করেন। এরপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সেখানে পৌঁছান, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল, তিনি তার শিরশ্ছেদ করেন। (ফাতহুল বারী: ৭/২৯৬)

ইমাম নববী রহ.-এর মতে, মুআয বিন আফরা এবং মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়েই আবু জাহলের ওপর আক্রমণে শরিক ছিলেন। মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আঘাত ছিল বেশি মারাত্মক, তাই তাকে নিহতের বর্ম ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। আর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মাথা কেটেছিলেন, তাই তাকে তলোয়ার দেওয়া হয়নি। (শরহে মুসলিম নববী: ১২/৬৩)

বিনীত নিবেদন এই যে, যা মনে রাখা জরুরি তা হলো, সবার আগে দুই ভাই মুআয এবং মুআউয়িয রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আক্রমণ করেছিলেন যেমনটি আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় স্পষ্ট। কিন্তু যেহেতু আবু জাহল একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিল এবং তার সাথে সাহায্যকারীরাও ছিল, তাই তারা তাকে কাবু করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে মুআয বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আগে থেকেই আবু জাহলের সন্ধানে ছিলেন, তাই তিনি সুযোগ পাওয়া মাত্রই এগিয়ে যান এবং যেহেতু তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তাঁর আঘাতটি ছিল বেশি মারাত্মক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তলোয়ারে রক্তের অবস্থা দেখে আন্দাজ করেছিলেন যে তাঁর আঘাতটিই ছিল প্রাণঘাতী। (শরহে মুসলিম নববী: ১২/৬৩; উমদাতুল কারী: ১৬/৬৫)

তাই নিহতের বর্ম তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি অনেক মুহাদ্দিস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। (আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২০/১৭৯; সহীহ ইবনে হিব্বান: ১১/৪৭৩; মুস্তাদরাক হাকেম, হা: ৫৬৯৭)

(বাকি অংশ পরের পৃষ্ঠায়)

## মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নবী আকরাম এবং আবু বকর সিদ্দিক ছাদযুক্ত মাচা থেকে নেমে রণক্ষেত্রে শরিক হলেন। হযরত আলী বলেন যে, বদর যুদ্ধের চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে আমরা নবী আকরাম-এর আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছিলাম। [১] যখন যুদ্ধের লেলিহান শিখা চরম তীব্রতায় পৌঁছাল, তখন নবী আকরাম এক মুষ্টি মাটি হাতে নিলেন এবং শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে মেরে বললেন: "এই চেহারাগুলো লাঞ্ছিত হোক। হে আল্লাহ! এদের অন্তরসমূহ ভয়ে পূর্ণ করে দিন এবং এদের কদম উখড়ে দিন।" এর পরপরই তিনি সাহাবায়ে কিরামকে চূড়ান্ত আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। [২] আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

"আর আপনি (ধুলোর যে মুষ্টি) ছুঁড়েছিলেন, তা আপনি ছোঁড়েননি বরং আল্লাহ ছুঁড়েছিলেন।" [৩]

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা)

মুআয বিন আফরা আবু জাহলকে আহত করার পর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'মুআয বিন আফরা যুদ্ধ চালিয়ে যান যতক্ষণ না তিনি শহীদ হন।' (সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৬৩৫)।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ মুআয-এর জন্য 'মুআয বিন আফরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং মুআয বিন আমর-কে ডেকেছেন, যেমনটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: মুআয বিন আফরা, মাউয বিন আফরা এবং মুআয বিন আমর শিশু ছিলেন না বরং যুবক ছিলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ অপ্রাপ্তবয়স্কদের জিহাদে সাথে নিতেন না। বদর ও খন্দকের যুদ্ধের আগে অনেককে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের ফেরত পাঠানো হয়েছিল। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খণ্ড: ১১/৪৭২; আল-মু'জামুল আওসাত, হা: ৯২৬৫)। আব্দুর রহমান বিন আউফ-এর বর্ণনায় 'গুলামাইন' (দুই কিশোর) এবং 'হাদীসাতুল আসনান' (অল্পবয়স্ক) শব্দ থেকে এটি বোঝা যায় যে তারা তেরো বা চৌদ্দ বছরের কিশোর ছিলেন। এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না।

মুআয বিন আফরা এবং মাউয বিন আফরা-এর সঠিক জন্ম তারিখের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তবে এটি উল্লেখ আছে যে মুআয বিন আফরা এবং রাফি বিন খাদীজ-এর ওফাত একই সময়ে হয়েছিল। (তারীখু খলিফা, পৃ: ২০২)। এর থেকে এটি অনুমান করা যায় না যে বদর যুদ্ধের সময় তাদের বয়স কত ছিল। তবে অন্যান্য দলীল থেকে স্পষ্ট হয় যে তারা যুবক ছিলেন। মুআয বিন আফরা এবং মাউয বিন আফরা বাইয়াতে আকাবাতেও শরিক ছিলেন। (তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ১/৩০৬, তদমীরী)।

অনুরূপভাবে মাউয বিন আফরা (যিনি ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)-এর বয়স তাঁর বোন রুবাইয়ি বিনতে মুআউবিয-এর বয়স থেকে অনুমান করা যেতে পারে, যাঁর বিয়ে বদর যুদ্ধের ঠিক পরে (বা কয়েক মাস পরে) হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ নিজেও তাতে শরিক হয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৫১৪৩, কিতাবুন নিকাহ)। রুবাইয়ি বিনতে মুআউবিয অন্যান্য যুদ্ধেও শরিক হতেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ-এর সাথে থাকতেন, যখমীদের পানি পান করাতেন, তাদের সেবা করতেন এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় পৌঁছে দিতেন। (সহীহ বুখারী, হা: ২৮৮৩, ২৮৮৪, কিতাবুল জিহাদ, বাব মুদাওয়াতুন নিসা আল-জারহা ফিল গাযউ)। এর পরিষ্কার অর্থ হলো তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কারণ অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হতো না।

এর থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে বদর যুদ্ধের সময় তাঁর পিতা মুআউবিয যুবক ছিলেন। যুক্তিযুক্ত অনুমান হলো মুআউবিয-এর বিয়ে খুব অল্প বয়সে হয়েছিল এবং রুবাইয়ি-এর জন্ম দ্রুত হয়েছিল। ধারণা করা যেতে পারে যে পিতা ও কন্যার বয়সের ব্যবধান সম্ভবত পনেরো বা ষোলো বছর হবে। যদি বদর যুদ্ধে মুআউবিয-এর বয়স ২৬-২৭ বছর হয়, তবে রুবাইয়ি-এর বয়স হবে ১১ বছর। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স এর থেকে বেশিও হতে পারে। সুতরাং এই বিবেচনায় রুবাইয়ি-এর ভাই মাউয-এর বয়সও জিহাদে শরিক হওয়ার মতো হওয়া কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় নয়।

অনুরূপভাবে মুআয বিন আমর-এর বদর যুদ্ধের সময় যুবক হওয়ার অন্যান্য দলীলও বিদ্যমান, যেমন তিনি বাইয়াতে আকাবাতেও শরিক ছিলেন। (সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৫৩১)। এবং তিনি সেই নবীদের মধ্যে ছিলেন যারা মসজিদে নববীর জন্য জমি দান করেছিলেন এবং সুহাইল ও সাহল তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিলেন। (সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৪৯৫)।

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১/৬৫৩, সহীহ সনদসহ, আল-রিসালা।

[২] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৬২৮।

[৩] সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ১৭।

অলৌকিকভাবে কাফিরদের প্রত্যেকের চোখে এই ধূলিকণা গিয়ে পড়ল, তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে সাহাবায়ে কিরাম জোরালো আক্রমণ করলেন, মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা ও গ্রেফতার করলেন। [১]

**ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য। সাহাবীদের কারামত:**

এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। সূরা আল-আনফালে ইরশাদ হয়েছে:
“সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের ডাক শুনলেন এবং বললেন যে, আমি তোমাদের এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব যারা ধারাবাহিকভাবে আসবে।” [২]

ফেরেশতাদের আগমনে কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হলো এবং তারা বুঝতে পারল যে মুসলমানদের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। ফেরেশতারা দু-একজন মুশরিককে হত্যাও করেছিলেন কিন্তু সাধারণভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, আর না একজন ফেরেশতা পুরো দুনিয়ার কাফিরদের ধ্বংস করতে পারতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলমানদের মনোবল বাড়ানো এবং কাফিরদের ভীত করা। [৩]

বদরের দিন যখন মুশরিকরা পালাতে শুরু করল, তখন একজন আনসারী একজন মুশরিকের পিছু ধাওয়া করছিলেন, তখন তিনি চাবুক মারার শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলেন, সাথে সাথে আওয়াজ এল: “হে হাইজুম! সামনে বাড়ো।”

সাহাবী দেখলেন, সেই মুশরিক সেখানেই পড়ে গেল, তার নাক ভেঙে গেল এবং মুখ ফেটে গেল। সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা শোনালেন, তখন তিনি ﷺ ইরশাদ করলেন:
“তুমি সত্য বলছ, এটি তৃতীয় আসমান থেকে অবতীর্ণ সাহায্যকারী ফেরেশতা ছিল।” হাইজুম সেই ফেরেশতার ঘোড়ার নাম। [৪]

বদরের দিন মুশরিকদের সাহায্যের জন্য ইবলিস নিজে এসেছিল; কারণ সে জানত যে এটি হক ও বাতিলের মধ্যে একটি চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ। আজ যদি হক বিজয়ী হয়ে যায় তবে ইসলামকে বিকশিত হওয়া থেকে কেউ রুখতে পারবে না। সাধারণ অবস্থায় ইবলিস সামনে এসে বড় থেকে বড় মানুষেরও সাহায্য করে না, কিন্তু সেদিন কুফরকে পশ্চাদপসরণ থেকে বাঁচাতে ইবলিস এতটাই চিন্তিত ছিল যে, সে নিজে একজন মুশরিক সরদার সুরাকা বিন মালিক কিনানীর বেশে শয়তানদের একটি পুরো বাহিনী নিয়ে এসেছিল। মুশরিকদের মনোবল বাড়ানোর জন্য যুদ্ধের শুরুতে ইবলিস বলেছিল: “আজ তোমাদের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না, আমি তোমাদের সমর্থক।”

কিন্তু যখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অন্য ফেরেশতাদের সাথে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ হলেন, তখন ইবলিস তার অনুসারীদের নিয়ে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। মক্কার মুশরিকরা এটাই মনে করেছিল যে সুরাকা পালিয়ে গেছে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মক্কায় পৌঁছানোর পর তারা সুরাকাকে খুব গালমন্দ করল এবং বলল: “তুমিই সবার আগে কাতার ভেঙে পালিয়েছিলে এবং যুদ্ধে আমাদের মার খাইয়েছ।”

সুরাকা অবাক হয়ে বলল: “আমি কিছুই জানি না, আমি তো বদরের ময়দানে যাই-ই নি।”

কিন্তু মুশরিকরা মনে করল সুরাকা মিথ্যা বলছে। [৫]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ১/৬২৮

[২] সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/১০১

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/১১৩

[৫] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৮

উমাইয়া বিন খালাফের হত্যা:

কাফেরদের পরাজয় ও পিছু হটার সময়, কিছু মুসলমান শত্রুদের ফেলে যাওয়া মালামাল সংগ্রহ করছিলেন, তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)-ও ছিলেন, তিনি কিছু বর্ম উঠিয়েছিলেন, এমন সময় কুরাইশদের সরদার উমাইয়া বিন খালাফ এবং তার ছেলের ওপর তার নজর পড়ল। তারা দুজনেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় এদিক-ওদিক পালাচ্ছিল। উমাইয়া যেহেতু অতীতে মক্কায় থাকাকালীন তার বন্ধু ছিল, তাই উমাইয়া তাকে ডেকে বলল:

“হে ইবনে আউফ! আমি কি তোমার জন্য এই বর্মগুলোর চেয়ে উত্তম হব না?”

তার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমাকে এবং আমার ছেলেকে বন্দি করো যাতে আমরা মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যাই এবং তোমাদের আমাদের মুক্তির বিনিময়ে যে মুক্তিপণ পাওয়া যাবে তা এই বর্মগুলোর মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হবে। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) তৎক্ষণাৎ বর্মগুলো ফেলে দিলেন এবং উমাইয়া ও তার ছেলের হাত ধরে সাথে নিয়ে চললেন। তখন হযরত বিলাল (রা.)-এর নজর উমাইয়ার ওপর পড়ল, এটি সেই উমাইয়া বিন খালাফ ছিল যে মক্কায় তার মালিক ছিল এবং তার ওপর নির্দয়ভাবে জুলুম ও নির্যাতন করত। উমাইয়াকে দেখামাত্রই হযরত বিলাল (রা.)-এর সেই সব জুলুমের কথা মনে পড়ে গেল, তার রক্ত টগবগ করে উঠল এবং তিনি চিৎকার করে বললেন:

“হে মুসলমানগণ! বদরের কাফেরদের সরদার উমাইয়া বিন খালাফ, আজ যদি সে বেঁচে যায় তবে মনে করো আমি বাঁচলাম না।”

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) অবাক হয়ে বললেন: “বিলাল! এরা আমার বন্দি, তুমি কি এদের হত্যা করবে?”

কিন্তু হযরত বিলাল (রা.) কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না এবং চিৎকার করতে থাকলেন: “হে আনসারগণ! হে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীগণ! বদরের কাফেরদের সরদার উমাইয়া বিন খালাফ। আজ যদি সে বেঁচে যায় তবে মনে করো আমি বাঁচলাম না।”

আনসাররা যারা আগে থেকেই পলায়নরত কাফেরদের হত্যা করছিল, তারা দৌড়ে এল এবং উমাইয়া ও তার ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এদিকে হযরত বিলাল (রা.)-ও তলোয়ার দিয়ে উমাইয়ার ওপর আঘাত করলেন। তলোয়ার তার শরীরে জখম করল এবং সে চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বন্দিদের বাঁচানোর জন্য তাদের ওপর ঝুঁকে পড়লেন কিন্তু আনসাররা ডানে-বামে তলোয়ার চালিয়ে বাবা ও ছেলেকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিল। এভাবে মক্কার এক মজলুম গোলাম তার ওপর করা অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের পূর্ণ প্রতিশোধ বদরের ময়দানে নিয়ে নিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) উমাইয়া ও তার ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও কিছুটা আহত হয়েছিলেন। পরে তিনি এই ঘটনা স্মরণ করে বলতেন:

“আল্লাহ বিলালের ওপর রহম করুন, তার কারণে আমার বর্মগুলোও হাতছাড়া হলো, বন্দিরাও চলে গেল এবং আমি জখমও হলাম।” [১]

এই উম্মতের ফেরাউন:

যুদ্ধের হাঙ্গামা যখন থেমে গেল তখন নবী করীম (সা.) আবু জাহেলের লাশ খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) তাকে খুঁজে বের করলেন। দেখলেন যে তার মধ্যে এখনো কিছু প্রাণ অবশিষ্ট আছে, তিনি তার ঘাড়ে পা রেখে বললেন:

---

(১) সহীহ বুখারী, হা: ২৩০১, কিতাবুল ওকালাহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩২৭ থেকে ৩৩২।

“হে আল্লাহর শত্রু! দেখ, আজ আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছেন।”

এ কথা বলে তিনি তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং নবী আকরাম ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে এসে বললেন:

“হে আল্লাহর রাসূল! এই হলো আল্লাহর শত্রু আবু জাহেলের মাথা।”

আপনি ﷺ বললেন: “আল্লাহর কসম! তিনিই সেই সত্তা, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।” [১]

আপনি ﷺ আবু জাহেলের তলোয়ারটি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দান করলেন। [২]

তারপর আবু জাহেলের লাশের কাছে গিয়ে বললেন: “এ ছিল এই উম্মতের ফেরাউন।” [৩]

নবী আকরাম ﷺ এবং আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকদের লাশের মাঝখান দিয়ে হাঁটার সময় বীরত্বগাথা কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।

হুজুর ﷺ প্রথম চরণের একটি অংশ: “নুফাল্লিকু হামান...” পড়তেন এবং হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা এভাবে পূর্ণ করতেন:

...মিন রিজালিন আজিজ্জাতিন... আলাইনা ওয়া হুম কানু আআক্ক ওয়া আজলামা।

(আমরা মাথা ফাটিয়ে দিই... ঐসব লোকদের যারা আমাদের ওপর কঠোরতা করত... আর তারা ছিল অবাধ্য ও জালিম।) [৪]

**যুদ্ধের সময় নববী মুজিজাসমূহ:**

বদর যুদ্ধের সময় সাহাবীগণ আপনার ﷺ কিছু মুজিজাও প্রত্যক্ষ করেন। যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে হযরত উক্কাশাহ বিন মিহসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর তলোয়ার ভেঙে যায়। আপনি ﷺ তাঁকে একটি লাঠি দিয়ে বললেন: “উক্কাশাহ! এটি দিয়ে যুদ্ধ করো।” তিনি আপনার ﷺ কাছ থেকে লাঠিটি নেওয়া মাত্রই সেটি একটি ধারালো তলোয়ারে পরিণত হলো। হযরত উক্কাশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটি দিয়েই যুদ্ধ করতে থাকলেন। [৫]

হযরত রিফায়া বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখে একটি তীর বিদ্ধ হয় এবং চোখ ফেটে যায়। আপনি ﷺ তাঁর চোখে নিজের লালা মুবারক লাগিয়ে দিলেন, যার ফলে চোখটি তৎক্ষণাৎ ভালো হয়ে গেল এবং এরপর আর কখনো তাতে কোনো ব্যথা হয়নি। [৬]

**রক্তের সম্পর্কের কোরবানি:**

বদর যুদ্ধে ঈমানের সামনে রক্তের সম্পর্ককে কোরবানি করার অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছিল। হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে তাঁর পিতা চলে আসে; একবার তো ছেড়ে দিলেন কিন্তু দ্বিতীয়বার ঈমানি চেতনা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করল, সব সম্পর্ক ভুলে পিতাকে হত্যা করলেন। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর তলোয়ার তাঁর মামার রক্তে রঞ্জিত হলো। মুশরিকদের সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বড় ছেলে আবদুল কাবাও ছিল, যে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি; ইসলাম গ্রহণের পর সে-ই আবদুর রহমান বিন আবি বকর নামে পরিচিত হয়। যখন তিনি মুসলমান হলেন, তখন একদিন তাঁর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে লাগলেন:

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/ ১৩৮, ১৩৯

[২] মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, হা: ৩৩৬

[৩] আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ইবনে কাসির: ২/ ৪৪৯, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৩/ ৫৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/ ১৩৪, ১৩৫

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/ ১৩৮

“হ্যাঁ! বদরের যুদ্ধে আপনি কয়েকবার আমার নাগালে এসেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি।”

حضرت আবু বকর সিদ্দিক رضی اللہ عنہ তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন: “কিন্তু হে পুত্র! যদি তুমি সেদিন আমার নাগালে আসতে, তবে আমি কখনোই তোমার প্রতি কোনো দয়া দেখাতাম না।” [১]

**খুশি ও বেদনা। হযরত রুকাইয়্যাহ-র ইন্তেকাল:**

গজওয়ায়ে বদর খুশি ও বেদনার মিলনের এক অদ্ভুত দৃশ্য উপস্থাপন করে। একদিকে বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে দূত মদিনায় প্রবেশ করছিল, আর অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যাহ رضی اللہ عنہا পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم তাঁর স্বামী হযরত উসমান رضی اللہ عنہ-কে তাঁর সেবা করার জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অন্যথায় তিনি নিজেও জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। নবী করীম صلی اللہ علیہ وسلم তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে সাহাবীদের সাথে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর আদরের কন্যাকে বাকী-র শীতল মাটিতে দাফন করা হচ্ছিল। [২]

**রোমের কাছে ইরানের পরাজয়। কুরআনি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা:**

এই সময়ে যখন মদিনার বাসিন্দারা বিজয়ী বাহিনীকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, তখন আরও একটি খবর শোনা যাচ্ছিল যা জাজিরাতুল আরবের বাইরের জগতেও কোনো আমূল পরিবর্তনের চেয়ে কম ছিল না। বাইজেন্টাইন রোমানরা, যারা কয়েক বছর আগে ইরানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে কেবল তাদের অধিকাংশ এশীয় ভূখণ্ডই নয় বরং তাদের পবিত্র ক্রুশও হারিয়েছিল, তারা আবারও তাদের নতুন তরুণ নেতা হারকিউলিস (হিরাক্লিয়াস)-এর নেতৃত্বে সিরিয়া ও আরবের সীমান্তে ইরানীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এই খবরে মুসলমানদের আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গেল; কারণ এই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন কারীম কয়েক বছর আগেই ঠিক সেই সময়ে করেছিল যখন রোমানরা পরাজিত হয়ে এশিয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং দৃশ্যত তাদের পুনরায় জেতার কোনো আশা ছিল না। [৩]

**শহাদায়ে বদর এবং কাফেরদের নিহতদের সংখ্যা:**

গজওয়ায়ে বদরে মাত্র চৌদ্দজন মুসলমান শহীদ হন, তাঁদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার ছিলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضی اللہ عنہ-এর অল্পবয়সী ভাই উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস رضی اللہ عنہ-ও এই যুদ্ধে শহীদ হন। উবাইদাহ বিন আল-হারিস رضی اللہ عنہ, যিনি উতবার সাথে লড়াই করার সময় গুরুতর আহত হয়েছিলেন, যুদ্ধের শেষে ফেরার পথে শাহাদাতের সুধা পান করেন; নবী করীম صلی اللہ علیہ وسلم তাঁকে নিজ হাতে কবরে নামিয়েছিলেন। [৪]

কুরাইশদের সত্তরজন লোক নিহত হয় যাদের মধ্যে তাদের নামী-দামী সর্দার ও সেনাপতিরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমসংখ্যক কাফের গ্রেফতার হয় যাদেরকে বন্দী করে মদিনায় আনা হয়। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم-এর চাচা আব্বাস, জামাতা আবুল আস এবং হযরত আলী رضی اللہ عنہ-এর বড় ভাই আকীলও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা সবাই পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন। [৫]

---

[১] আসাদুল গাবাহ, তরজমা: আব্দুর রহমান বিন আবি বকর رضی اللہ عنہ

[২] আসাদুল গাবাহ, বাবুন্নিসা, তরজমা: রুকাইয়্যাহ رضی اللہ عنہا আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/১৮২, ১৮৩

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৩৩২, ৩৩৪

[৪] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৭০৬ থেকে ৭০৮

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/৮ থেকে ৮১

**বন্দীদের সাথে আচরণ:**

নবী আকরাম ﷺ বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন তখন হযরত আবু বকর رضی اللہ عنہ আরজ করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকেরা আপনার পরিবার ও গোত্রের লোক। আমার রায় হলো যে, মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক, এভাবে আমরা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করব। এই প্রত্যাশাও আছে যে, আমাদের উত্তম আচরণের কারণে এই লোকেরা ঈমান নিয়ে আসবে।”

নবী আকরাম ﷺ হযরত উমর رضی اللہ عنہ-কে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমার রায় কী?”

তিনি বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকেরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে, তাই আমার রায় হলো যে, এই বন্দীদের মধ্যে যারা আমার আত্মীয়, তাদের আমার হাতে সোপর্দ করুন, আমি নিজ হাতে তাদের হত্যা করব, আকিলকে তার ভাই আলী-র এবং আব্বাসকে তার ভাই হামজা-র হাতে সোপর্দ করা হোক যাতে সবাই জানতে পারে যে মুশরিকদের জন্য আমাদের হৃদয়ে কোনো জায়গা নেই।”

হুজুর আকরাম ﷺ সেই সময় নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং কিছুক্ষণ পর নির্দেশ দিলেন যে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। আপনি ﷺ সকল বন্দীকে দুই দুই, চার চার জন করে সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং তাকিদ দিলেন যে তাদের আরামের খেয়াল রাখতে, ফলে এমনও হয়েছে যে কোনো সাহাবীর ঘরে খাবার কম পড়ে গেলে খাবার নিজের বন্দীকে খাইয়ে দিয়েছেন এবং নিজে খেজুর খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মুসআব বিন উমাইর رضی اللہ عنہ-এর ভাই আবু আজিজও বন্দীদের মধ্যে ছিলেন, তিনি বলেন: “আমাকে যে আনসারদের জিম্মায় দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন খাবার আনতেন তখন আমার সামনে রুটি রেখে দিতেন এবং নিজেরা শুধু খেজুরের ওপর নির্ভর করতেন।”

বন্দীদের আত্মীয়-স্বজন মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে আসতে থাকলেন এবং তাদের মুক্ত করে নিয়ে যেতে থাকলেন। যে বন্দীরা দরিদ্র ছিলেন এবং মুক্তিপণ আদায় করতে সক্ষম ছিলেন না, তাদের সাথেও উদার আচরণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু লোক লিখতে ও পড়তে জানতেন, তাদের বলা হলো যে মদিনার দশ দশ জন শিশুকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়ে দিলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

এই সব তো হলো কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সূরা আল-আনফালের আয়াতসমূহে এভাবে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ওপর সতর্কবাণী এলো যেন তা হযরত উমর رضی اللہ عنہ-এর রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। [১]

**জামাতার গ্রেফতারি:**

হুজুর আকরাম ﷺ-এর জামাতা আবুল আসও গ্রেফতার হয়েছিলেন। আইন সবার জন্য এক ছিল, তার কাছেও মুক্তিপণ চাওয়া হলো কিন্তু তাদের ঘরে দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। বাধ্য হয়ে তার স্ত্রী জয়নব رضی اللہ عنہا মক্কা থেকে নিজের হার আপনার ﷺ খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়ের হার দেখে স্নেহময় পিতার চোখে পানি এসে গেল বিশেষ করে এই জন্য যে এটি হযরত খাদিজা رضی اللہ عنہا-এর হার ছিল যা তিনি মেয়েকে বিদায়ের সময় উপহার দিয়েছিলেন। আপনি ﷺ নিজের মেয়ের সাথে কোমল আচরণ করতে চেয়েছিলেন এবং আপনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই তা করতে পারতেন কিন্তু সতর্কতার অবস্থা এই ছিল যে আপনি এই বিষয়েও সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন:

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/১৬১ থেকে ১৬৩

“যদি উপযুক্ত মনে করো তবে এই হারটি ফেরত দিয়ে দাও এবং আবুল আসকে ছেড়ে দাও।”

সাহাবীগণ আপনার একটি হাসির জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা সানন্দে কথা মেনে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবুল আসকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিনি মক্কায় পৌঁছেই হযরত যয়নব (রা.)-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেবেন। এটি এজন্য জরুরি ছিল যে, নবী ﷺ-এর কন্যার কুফরি রাষ্ট্রে থাকা ইসলামের মর্যাদার পরিপন্থী ছিল এবং সম্ভবত এজন্যও যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকাইয়্যাহ (রা.)-এর বিচ্ছেদের তীব্রতা অনুভব করছিলেন, যাঁর কয়েকদিন আগে ইন্তেকাল হয়েছিল। আবুল আস তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। মক্কায় পৌঁছেই স্ত্রীকে তাঁর ভাই কিনানাহ বিন রাবী’-এর সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। [১]

**সদকায়ে ফিতরের বিধান:**

বদর যুদ্ধের পর রমজান মাসের শেষ দিনগুলোতে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ২৭শে রমজান সাহাবীগণকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিলেন যে, ঈদের নামাজের আগে খেজুর, কিসমিস বা যবের মধ্য থেকে যেকোনো একটির এক সা’ অথবা গমের দুই মুদ (প্রায় পৌনে দুই কেজি) সদকায়ে ফিতর হিসেবে আদায় করা হোক যাতে অভাবীরা অভাবমুক্ত হয়ে যায়। [২]

**ঈদের নামাজের বিধান:**

ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার উৎসব একই সাথে শুরু হয়েছিল। ১লা শাওয়াল মদীনা মুনাওয়ারায় প্রথমবার ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করা হয়। [৩] এরপর যিলহজ মাসে ঈদুল আযহা পালন করা হয় এবং প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহজ মাসে কুরবানী করতেন। [৪] মদীনায় জাহেলিয়াতের দুটি উৎসব প্রচলিত ছিল। ইসলাম সেগুলো বন্ধ করে দেয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সেগুলোর পরিবর্তে দুটি উত্তম উৎসব দান করেছেন: ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা।” [৫]

**ঈদগাহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলসমূহ:**

ঈদগাহে যাওয়ার সময় হযরত বিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগে আগে ‘আনযাহ’ নামক একটি সূঁচালো লাঠি নিয়ে চলতেন। এই লাঠিটি নাজ্জাশী আসহামাহ হযরত যুবাইর (রা.)-কে উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করেছিলেন। এটি ঈদগাহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে গেঁথে দেওয়া হতো। ঈদের নামাজের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি খুতবা দিতেন। [৬]

**মহিলাদের প্রতি বিশেষ ভাষণ:**

সবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্যেও বিশেষ ভাষণ দিতেন, যাতে তিনি সাধারণত তাঁদেরকে আখেরাতের চিন্তা, স্বামীদের আনুগত্য এবং দান-সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। হযরত বিলাল (রা.) মহিলাদের কাতারের সামনে কাপড় বিছিয়ে দিতেন এবং মহিলারা তাঁদের আংটি, চুড়ি এবং কানের দুল পর্যন্ত খুলে দিয়ে দিতেন। [৭]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, জীবনী: যয়নব বিনতে মুহাম্মদ ﷺ, আবুল আস বিন রাবী’ ﷺ

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২৩৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩১২ পূর্বোক্ত সূত্রে

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ১১৩৪, অধ্যায়: দুই ঈদের নামাজ

[৪] তারিখুত তাবারী: ২/২১৮

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৯৭৫, কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ; হা: ১৩৬২, অধ্যায়: আত্মীয়-স্বজনের ওপর যাকাত; সহীহ মুসলিম, হা: ২০৮১-২০৮৫

যাকাতের ফরযিয়্যাত:

এই বছরের (২ হিজরী) শেষের দিকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তিদের ওপর যাকাত ফরয করা হয়। [১] যাকাত এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে বান্দা কার্যত এই কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় যে, তার কাছে যা কিছু আছে তা আল্লাহর দেওয়া এবং আল্লাহর নির্দেশে সে তাঁর দেওয়া সম্পদ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সানন্দে ব্যয় করতে প্রস্তুত। সম্পদের প্রতি ভালোবাসা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু যখন এটি বেড়ে যায় তখন তা অর্থপূজায় পরিণত হয়। যাকাত এই বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত ও অভাবী মানুষের সাহায্য হয়; মুখাপেক্ষী ও অসহায় ব্যক্তিরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। যাকাত সমাজে সম্পদের কেন্দ্রীভূত হওয়া রোধ করে তা নিম্নবিত্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

**বদর যুদ্ধের প্রভাব - প্রতিশোধের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র:**

বদরের বিজয় পুরো আরবে মদিনাবাসীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এই বিজয় প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, ইসলাম ধর্ম তার ভিত্তি মজবুত করে নিয়েছে এবং এর পতাকাবাহীরা কেবল নিজেদের আত্মরক্ষাই করতে পারে না, বরং তাদের বিরোধীদের দাঁতভাঙা জবাবও দিতে পারে। একমুঠো মুসলমানের বদরের ময়দানে তাদের চেয়ে তিনগুণ বেশি শত্রুর ওপর বিজয়ী হওয়া এই কথার প্রমাণ ছিল যে, আসমানী সাহায্য তাদের সাথে রয়েছে। এই ঘটনা আরবে এক বিশাল বিপ্লবের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিল যার আওয়াজ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল।

এদিকে মুসলমানরা আনন্দিত ও উৎফুল্ল ছিল এবং ওদিকে মক্কার ঘরে ঘরে শোকের মাতম চলছিল। আবু লাহাব এই পরাজয়ের খবর শোনার নয় দিন পর মারা যায়। কুরাইশরা বদরে নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ গ্রহণ করে। উমাইয়া ইবনে খালাফের ছেলে সাফওয়ান তার পিতার হত্যাকাণ্ডে এতটাই ক্ষুব্ধ ছিল যে, সে তার বন্ধু উমাইর ইবনে ওয়াহাবকে বিষাক্ত খঞ্জর দিয়ে নবী আকরাম ﷺ-কে হত্যা করার জন্য মদিনায় পাঠায়। এটি ভিন্ন কথা যে, নবী আকরাম ﷺ তাকে দেখামাত্রই বলে দিলেন যে, তুমি এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া মিলে আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছ। উমাইর এই মুজিজা দেখার পর ঈমান আনতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেনি। [২]

**কুরাইশদের হাবশায় প্রতিনিধি দল:**

বদরের পরাজয়ের পর কুরাইশরা বুঝতে পেরেছিল যে, মদিনাবাসীদের সাথে মোকাবিলা করা সহজ নয়; এর জন্য অসাধারণ প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে। তাই তারা সিরিয়া থেকে আসা বাণিজ্যিক কাফেলার সমস্ত পুঁজি একটি বড় যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ঢেলে দেয়। [৩] এর পাশাপাশি কুরাইশদের দৃষ্টি হাবশায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের ওপর নিবদ্ধ হয় যারা কয়েক বছর ধরে সেখানে...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩১২; আল-বিনায়া শারহুল হিদায়া: ৩/২৮৮; যাকাতের সংক্ষিপ্ত বিধান হিজরতের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল, যেমনটি হযরত জাফর তাইয়ার (রা.) নাজাশীর দরবারে নবী আকরাম ﷺ-এর শিক্ষার সারসংক্ষেপ পেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন: "তিনি আমাদের সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন।" (সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৩৬)। স্পষ্টতই এটি মদিনায় হিজরতের কয়েক বছর আগের ঘটনা। তবে যাকাত ব্যবস্থার বিস্তারিত মাসআলাসমূহ হিজরতের পর ২ হিজরীতে নাযিল হয়, আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা আদায়ের ব্যবস্থা মক্কা বিজয়ের পর ৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। (ফাতহুল বারী: ৩/২৬৬)

[২] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/১৪৮

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৬০

তারা শান্তি ও স্বস্তির জীবন অতিবাহিত করছিলেন। কুরাইশরা দেখে নিয়েছিল যে মদিনায় মুসলমানরা সুসংহত, কিন্তু হাবশা (আবিসিনিয়া) ছিল একটি খ্রিস্টান দেশ যেখানে কেবল বাদশাহর ইনসাফের কারণে মুসলমানরা আশ্রয় পেয়েছিল। কুরাইশরা বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভাবল যে কেন হাবশা থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করা হবে না। [১] তারা আমর ইবনুল আস এবং আমারা বিন আল-ওয়ালিদকে দূত বানিয়ে নাজ্জাশির দরবারে পাঠাল। তারা উভয়ে নাজ্জাশির কাছে অভিযোগ করল যে, এই লোকগুলো আমাদের অপরাধী, আপনি তাদের আশ্রয় দেবেন না বরং আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। কিন্তু এবারও এই চেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং নাজ্জাশি কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে ব্যর্থ মনোরথে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। [২]

**হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা এবং হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর বিবাহ:**

এই বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা আয-যাহরা রাদিআল্লাহু আনহার বিবাহের দায়িত্বও সম্পন্ন করলেন। তাঁর জন্য তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে পছন্দ করলেন। এই বিবাহ বদর যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত হয় এবং অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বিদায় (রুখসতি) সম্পন্ন হয়। [৩]

---

[১] আত-তারিখুল আওসাত লিল বুখারি: ১/৩১১, তবা দারুল ওয়াঈ।

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১৮৩৫।

এর আগেও একটি প্রতিনিধি দল গিয়েছিল যার বিবরণ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। অধিকাংশ সীরাত লেখক উভয়কে একটিই প্রতিনিধি দল হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এই কারণেই এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রতিনিধি দলটি কি হিজরতে হাবশার পরপরই গিয়েছিল নাকি বদর যুদ্ধের পর। এই মতভেদও রয়েছে যে, প্রতিনিধি দলে আমর ইবনুল আসের সাথে কার নাম ছিল—আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া নাকি আমারা বিন আল-ওয়ালিদ। যদি প্রতিনিধি দলগুলোকে আলাদা আলাদা ধরা হয় তবে মতভেদ দূর হয়ে যায়। ইবনে সাইয়্যিদুন নাস রাহিমাহুল্লাহ এই মতই গ্রহণ করেছেন যে, এই ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা। তিনি লেখেন: “কুরাইশরা তাদের ব্যাপারে নাজ্জাশির কাছে দুইবার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল: প্রথমবার তাদের হিজরতের সময়, এবং দ্বিতীয়বার বদর যুদ্ধের ঘটনার পর। আমর ইবনুল আস উভয়বারই দূত ছিলেন, প্রথমবার তাঁর সাথে ছিলেন আমারা বিন আল-ওয়ালিদ এবং অন্যবার আবদুল্লাহ বিন আবি রাবিয়া।” (উয়ুনুল আসার: ১/৩৫) তবা দারুল কলম বৈরুত।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২২ তবা সাদির।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী হিজরতের পাঁচ মাস পর (১ হিজরির রজব মাসে) বিবাহ হয়েছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২২) কিন্তু এটি সঠিক নয়, গবেষণালব্ধ কথা হলো বিবাহ এবং বিদায় ২ হিজরিতে হয়েছিল। বিদায়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু নিজে বলতেন যে, আমি আমার ওলিমার আয়োজনের জন্য দুটি উটনীর পিঠে ঘাস বোঝাই করে আনা এবং বনু কাইনুকার এক স্বর্ণকারের সাহায্যে তা বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলাম। তাদের মধ্যে একটি উটনী বদর যুদ্ধের গনিমতের মালে পাওয়া গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ শুরু করার আগেই হযরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহু মদ্যপ অবস্থায় সেই উটনী দুটিকে কেটে ফেলেন। (সহীহ বুখারি, কিতাবুল মুসাকাত, বাবু বাইয়িল হাতাব; সহীহ মুসলিম, হা: ৫২৩২, কিতাবুল আশরিবা, বাবু তাহরিমিল খামর)। হযরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহু ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, সুতরাং বুখারি ও মুসলিমের এই ঐক্যমত্যের বর্ণনা সাক্ষী দেয় যে, বিদায় বদর ও ওহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো এক মাসে হয়েছিল। সেটি কোন মাস ছিল? তার আন্দাজও এই বর্ণনা থেকে করা যেতে পারে, কারণ এতে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ‘সানি মিন বানি কাইনুকা’ (বনু কাইনুকার কারিগর)-এর সাথে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি নিশ্চিত যে, বদর যুদ্ধের মাত্র ২৮ দিন পর ১৫ই শাওয়াল বনু কাইনুকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং এই গোত্রের সমস্ত লোক দেশান্তরিত হয়েছিল। যার পর ‘সানি বানি কাইনুকা’-এর সাথে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাই বিদায় বদর যুদ্ধ এবং বনু কাইনুকা যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, ইমাম দুলাবির বর্ণনা অনুযায়ী ২ হিজরির সফর মাসে বিবাহ এবং জিলহজ মাসে বিদায় হয়েছিল। (আয-যুররিয়্যাতুত তাহিরা, পৃ. ৬৩, এবং ইবনুল জাওযি আল-মুনতাযাম: ৩/৮৩-এ এটি উদ্ধৃত করেছেন)। এই জিলহজ দ্বারা ২ হিজরির জিলহজ উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ তা বনু কাইনুকা যুদ্ধের দুই মাস পরে পড়ে। সুতরাং বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্য হলো ১ হিজরির জিলহজ। এখানে একটি জোরালো আপত্তি রয়েছে, তা হলো জিলহজ সেই বছর রমজান মাসের সমান্তরালে পড়েছিল যাতে প্রথমবারের মতো রোজা ফরজ হয়েছিল। রমজানে হযরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহু মদ পান করতে পারতেন না। (রমজানের পর এটি আশ্চর্যজনক ছিল না, কারণ তখন পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি এবং আরবদের মধ্যে মদ্যপান সাধারণ বিষয় ছিল)। এই আপত্তির ভিত্তিতে একটি رأي (মত) হলো যে, শাওয়ালের শুরুতে ঈদের সময় হযরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর মদ্যপানের এই ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। (এই বছর অর্থাৎ ২ হিজরিতে প্রথম ঈদুল ফিতর প্রবর্তিত হয়েছিল। মিরকাতুল মাফাতিহ: ৩/১০৬০)। এর পরপরই (বনু কাইনুকা যুদ্ধের আগে) বিদায় সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ বিদায়ের ঘটনাটি ২ হিজরির শাওয়ালের প্রথম দশকে। এই মতটি নিজের জায়গায় জোরালো, কিন্তু যদি হযরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহুর মদ্যপানকে ইফতারের পর সন্ধ্যা বা রাতের সময়ের ওপর ধরা হয় তবে এই আপত্তি দূর হয়ে যায়।

## ইহুদিদের সাথে প্রথম যুদ্ধ: গাযওয়ায়ে বনু কায়নুকা

বদরে মুসলমানদের বিজয় যেখানে কুরাইশদের অস্থির করে তুলেছিল, সেখানে মদিনার ইহুদিরাও, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মৈত্রীর চুক্তি করেছিল, ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে "বনু কায়নুকা"-র ইহুদিরা, যারা স্বর্ণকার ও কারিগর হওয়ার কারণে অত্যন্ত সম্পদশালী ছিল, গাযওয়ায়ে বদরের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মক্কার কুরাইশদের সাথে যোগসাজশ করতে এবং তাদের মিত্র হতে কোনো দ্বিধাবোধ করেনি। [১]

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি নিজেই তাদের মহল্লায় তাশরিফ নিলেন, যা মদিনার মহল্লাগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একত্রিত করে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতও দিলেন, যার উত্তরে তারা এই অবমাননাকর জবাব দিল: "আপনার পাল্লা মক্কার আনাড়ি বাহিনীর সাথে পড়েছে, আমাদের সাথে নয়।"

তাদের এই আচরণ যুদ্ধ ঘোষণার শামিল ছিল। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করলেন।

কয়েকদিন পর বনু কায়নুকার ইহুদিরা তাদের স্বর্ণের বাজারে অলঙ্কার তৈরি করতে আসা এক মুসলিম নারীকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করল। একজন মুসলমান এই দৃশ্য দেখে ফেললেন এবং এক দুশ্চরিত্র ইহুদিকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করলেন, বাকি ইহুদিরা দুর্গে আবদ্ধ হয়ে গেল। এই জঘন্য কাজের পর ইহুদিরা কোনো ছাড় পাওয়ার যোগ্য ছিল না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর শোনামাত্রই বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং তাদের দুর্গগুলো অবরোধ করলেন। এটি ১৩ শাওয়াল ২ হিজরির ঘটনা। [২] এটি ইসলামি ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ ছিল, যাতে দুর্গবন্দী শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছিল। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর বনু কায়নুকা হার মেনে নিল। তাদের শাস্তি হিসেবে নির্বাসিত করা হলো। এই লোকেরা মদিনা থেকে বের হয়ে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা "আযরুয়াত"-এ গিয়ে বসবাস শুরু করল। [৩]

## গাযওয়ায়ে সাউইক:

মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘাত শুরু হতে দেখে কুরাইশরা ইহুদিদের সাথে নেওয়ার কথা ভাবতে লাগল। প্রথমে তারা মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে গোপনে মিত্রতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল। এই কাজ বনু উমাইয়ার প্রধান...

---

[১] তারিখুল ইসলামিল আম, ডক্টর আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারা, পৃ: ১৬৯

[২] এটি সঠিক পঞ্জিকা। (আল-মাগাযি লিল ওয়াকিদি ১/১৭৬; আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ ২/৪৭৯) যেহেতু চান্দ্র পঞ্জিকার বছর শুরু হয়নি, তাই একে ২ হিজরিই লেখা হয়েছে। যদিও বিশুদ্ধ চান্দ্র হিজরি পঞ্জিকা অনুযায়ী এখানে নতুন বছর শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেই হিসেবে এটি ১৩ মহরম ৩ হিজরির ঘটনা।

[৩] সিরাতে ইবনে হিশাম ২/৪৭ থেকে ৪৯, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৪/১৭১

আবু সুফিয়ান বিন হারব-এর হাতে নেতৃত্ব অর্পিত হলো। আবু জাহল, আবু লাহাব এবং উতবার মতো নেতাদের ধ্বংসের পর আবু সুফিয়ানকে কুরাইশদের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি মনে করা হতো। আবু সুফিয়ান দুইশত লোক নিয়ে মদিনার দিকে যাত্রা করেন এবং ইহুদি বনু নাযিরের দুর্গে অবস্থান করেন। এখানকার প্রধান সালাম বিন মিশকামের সাথে ঐক্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়। ফেরার পথে আবু সুফিয়ান মদিনার উপকণ্ঠে একটি খেজুর বাগানে আগুন ধরিয়ে দেন এবং একজন আনসারীকে শহীদ করেন। নবী আকরাম (সা.) খবর পাওয়া মাত্রই ধাওয়া করেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা পালিয়ে যায়। পালানোর সময় তারা তাদের ছাতুর বস্তাগুলো ফেলে যায়। ছাতুকে আরবিতে 'সুইক' বলা হয়, তাই এই অভিযানকে গাযওয়ায়ে সুইক বলা হয়।

**বিশেষ গোপন অভিযান: কাব বিন আশরাফ ইহুদির হত্যা:**

কুরাইশদের সশস্ত্র ব্যক্তিদের নিজেদের এখানে আশ্রয় দিয়ে এবং তাদের মদিনায় অভিযানের সুযোগ করে দিয়ে বনু নাযিরও মদিনাবাসীদের সাথে চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। বনু নাযিরের একজন নেতা কাব বিন আশরাফ ইসলাম বিদ্বেষে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। সে একজন কবিও ছিল এবং তার কবিতার মাধ্যমে উস্কানি ছড়াত। এখন সে তার কবিতায় মুসলিম নারীদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে শুরু করে। তার ধৃষ্টতা থেকে নবী আকরাম (সা.)-ও নিরাপদ ছিলেন না। এই সময়ে সে সীমা অতিক্রম করে যখন সে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতাদের সাথে দেখা করে এবং বদরে নিহত মুশরিকদের স্মরণে এমন বেদনাদায়ক কবিতা পাঠ করে যে উপস্থিতরা প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মদিনার সনদের পরিপন্থী এই কর্মকাণ্ড ছিল ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং যেকোনো বিচারেই তা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ।

হুজুর (সা.) আপাতত বনু নাযিরের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া ফিতনা সৃষ্টিকারীদের আরও উস্কানি দেওয়ার সুযোগ দেওয়াও সমীচীন ছিল না। তাই একদিন তিনি বললেন: "কে আছে যে কাব বিন আশরাফকে শায়েস্তা করবে?"

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) এই কাজের দায়িত্ব নিলেন এবং সেই সাথে কাব বিন আশরাফের সাথে কিছু কথা বলার অনুমতি চাইলেন যা নবী (সা.) প্রদান করলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ঋণ নেওয়ার অজুহাতে কাব বিন আশরাফের দুর্গে পৌঁছালেন এবং আলোচনার এক পর্যায়ে এমন কিছু কথা বললেন যাতে মনে হচ্ছিল যে ইসলামের জন্য সদকা-খয়রাত দিতে দিতে তারা আর্থিক সংকটে পড়েছেন। কাব বলল: "আল্লাহর কসম! এই নবী তোমাদের আরও কষ্টে ফেলবেন।"

যখন ঋণের কথা এলো, কাব বিনিময়ে নারী বা শিশুদের বন্ধক রাখার দাবি জানাল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বললেন: "নারীদেরকে তোমার মতো আরবের সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তির কাছে কীভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়? আর শিশুদের বন্ধক রাখলে তারা ঋণের বদলে বন্ধক থাকার অপবাদ পেতে থাকবে। হ্যাঁ, আমরা আমাদের অস্ত্র তোমার কাছে বন্ধক রাখতে পারি।"

কাব বিন আশরাফ এতে রাজি হয়ে গেল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) রাতে দুই-তিনজন সাথীসহ অস্ত্র নিয়ে তার দুর্গে পৌঁছালেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) সাথীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখন আমি ইশারা করব তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩২; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৪/২১৭।

গাযওয়ায়ে সুইক ৫ জিলহজ সংঘটিত হয়েছিল যা ২৫ রবিউল আউয়াল ৩ হিজরি (২৬ আগস্ট ৬২৪ খ্রি.) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অবশেষে কাবের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে সময় সে চমৎকার সুগন্ধি মেখেছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন:

“এমন সুগন্ধি আমি কখনো শুঁকিনি।”

সে গর্ব করে বলতে লাগল: “হ্যাঁ! আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুগন্ধিময় এবং সুন্দরী নারী রয়েছে।”

মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “আমাকে কি অনুমতি দেবেন আপনার মাথার সুগন্ধি শুঁকতে?”

কাব হ্যাঁ বলে যেই মাথা এগিয়ে দিল, মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জাপটে ধরলেন এবং সাথীদের বললেন: “একে শেষ করে দাও।”

এভাবে ইসলামের এই শত্রুর কাজ খতম হয়ে গেল। এই ঘটনা ১৪ রবিউল আউয়াল ৩ হিজরির। [১]

**উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ:**

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা উম্মে কুলসুম তখনো কুমারী ছিলেন। এদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু একা হয়ে গিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে কুলসুমের বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রের কথা চিন্তা করলেন, তখনো উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে উত্তম আর কেউ ছিল না। ফলে জমাদিউল আখিরা ৩ হিজরিতে কন্যার বিবাহ তাঁর সাথেই সম্পন্ন করলেন। [২]

**ইরাকের মহাসড়কে কুরাইশদের সাথে প্রতিরোধ - সারিয়্যাহ যি কারদাহ (জমাদিউল আখিরা ৩ হিজরি):**

কুরাইশরা একদিকে বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, অন্যদিকে এই বছর তারা গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক কাফেলা শামের পরিবর্তে ইরাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল; কারণ মদিনার আশপাশ দিয়ে যাতায়াত করা এখন তাদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেলা মক্কা থেকে ইরাকের দিকে রওনা হলো, যার মালামালের মধ্যে রুপার বড় মজুদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পথে নজদের পাথুরে ভূমির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ‘কারদাহ’ নামক স্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো সশস্ত্র মুজাহিদদের মুখোমুখি হলো, যারা যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কমান্ডে ছিলেন। মক্কাবাসীদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে হলো। তাদের যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হলো, তার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম। [৩]

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস: ৪০৩৭, বাব কতল কাব বিন আশরাফ; আল-মাগাজি লিল ওয়াকিদি: ১/১৮৪ থেকে ১৯০

[২] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ: ৮/৩৮, ত ত সাদির, তর: উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৬; সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৫০। এই ঘটনা জমাদিউল আখিরা ৩ হিজরি (নভেম্বর ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) এর। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/৩৬)

## গাযওয়ায়ে উহুদ (শাওয়াল ৩ হিজরী)

কুরাইশদের জন্য মদীনা আক্রমণের অনেকগুলো কারণ একত্রিত হয়েছিল। বাণিজ্যিক পথগুলোর অবরোধ তখনই খোলা সম্ভব ছিল যখন মুসলমানদের নিরস্ত্র করা যেত। বদরের নিহতদের প্রতিশোধও মদীনা আক্রমণের মাধ্যমেই নেওয়া সম্ভব ছিল। আরবে তাদের পূর্বের শান-শওকত পুনরুদ্ধার করারও তাদের মতে এখন আর অন্য কোনো উপায় ছিল না, তাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

কুরাইশরা তাদের সমস্ত বাণিজ্যিক মুনাফা ব্যয় করে একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করল, যার মধ্যে তাদের মিত্র গোত্রসমূহ এবং "আহাবীশ" এর যোদ্ধারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। [১] তিন হাজার সদস্যের এই বাহিনীতে দুইশ অশ্বারোহী এবং সাতশ বর্মধারী সৈন্য ছিল। পনের জন শোকগাথা পাঠকারী নারীও ছিল যারা বদরের নিহতদের জন্য বিলাপ করে করে বাহিনীকে উৎসাহিত করত। এই বাহিনী যাত্রা শুরু করার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস বনু গিফারের একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে একটি তথ্য সংবলিত পত্র দিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। ফলে বাহিনী পৌঁছানোর কয়েক দিন আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আক্রমণের খবর পেয়ে গেলেন। [২]

যেহেতু মদীনার দক্ষিণে লাভার আধিক্য রয়েছে যেখানে যুদ্ধ করা কঠিন, তাই কুরাইশ বাহিনী মদীনার চারপাশ ঘুরে উত্তরে পৌঁছে গেল এবং এখানে উহুদ পাহাড়ের পশ্চিমে "যাগাবাহ" নামক স্থানে তাবু গাড়ল। এটি ৩ হিজরীর শাওয়াল মাসের প্রথম দশকের ঘটনা। কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পূর্ণ প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। বিজয়ের পর তারা এই দিক থেকেই মদীনায় প্রবেশ করতে পারত; কারণ মদীনার অন্য দুই দিক ঝলসানো পাহাড় এবং এক দিক বাগানের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল।

এদিকে নবী করীম ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় সাহাবায়ে কেরামের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ করছিলেন। যেহেতু এত বড় বাহিনীর সাথে সরাসরি মোকাবিলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত ছিল যে, শহরে অবস্থান করে অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করা হোক। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ভীরুতার কারণে সম্মুখ যুদ্ধ থেকে ঘাবড়াচ্ছিল, সে এই মতে সায় দিল। কিন্তু যুবকরা তলোয়ার চালনার নৈপুণ্য দেখানোর জন্য অস্থির ছিল। তারা বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য জেদ ধরল। তাদের মধ্যে অনেকেরই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার দুঃখ ছিল এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা তাদের হৃদয়ে উথলে উঠছিল।

তাদের এই জোশ ও উদ্দীপনা দেখে নবী করীম ﷺ নীরবে ঘরে চলে গেলেন এবং এরপর বর্ম পরিধান করে ও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে প্রাঙ্গণে ফিরে এলেন। [৩] এটি ছিল খোলা ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করার একটি ব্যবহারিক ইঙ্গিত। সাহাবীগণ এখন চিন্তিত হলেন এবং তারা নিজেদের মত থেকে সরে এসে আরজ করলেন: "আপনি পছন্দ করলে ভেতরে অবস্থান করেই যুদ্ধ করা হোক।"

কিন্তু তিনি বললেন: "যখন কোনো নবী অস্ত্র পরিধান করেন, তখন যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়।" [৪] এটি এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত ছিল যে, যখন একটি রণকৌশল নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন তাতে বারবার রদবদল করা সমীচীন নয়।

---

[১] মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বনু কিনানা এবং বনু মুদরিকের কিছু গোত্রকে আহাবীশ বলা হতো। (আত-তারীখুল ইসলামী আল-আম, পৃ. ১০৮)

[২] আল-মাগাযী লিল-ওয়াকিদী: ১/২০২, ২০৩

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৬২, ৬৩

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৪৮৪৭; সুনানে দারেমী, হা: ২২০৫

উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং মুনাফিকদের ইসলাম বিদ্বেষ:

নবী আকরাম ﷺ জুমার নামাজ আদায় করে সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করলেন এবং বিকেলের দিকে শহরের ভেতরের মহল্লা ও গলিগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে উত্তর দিকে রওনা হলেন যেখানে কুরাইশরা শিবির স্থাপন করেছিল। তাদের সতর্ক না করে উপযুক্ত স্থানে পৌঁছানো জরুরি ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো নতুন পথ দিয়ে বের হতে চেয়েছিলেন। শহরের প্রান্তে বনু হারিসা মহল্লায় পৌঁছে তিনি বললেন:

“এমন কেউ কি আছে যে আমাদের এমন কোনো পথ দিয়ে শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে দেবে যাতে আমাদের তাদের সামনে দিয়ে যেতে না হয়?”

ওই মহল্লার একজন সাহাবী আবু খাইসামা (রা.) আরজ করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই খিদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।”

তিনি ইসলামী বাহিনীকে বাগানের ভেতরের পথ দিয়ে নিয়ে জনবসতির বাইরে নিয়ে গেলেন। মুনাফিকরা এই সুযোগে তাদের পূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষ প্রদর্শন করল। বাহিনীকে যখন মুরব্বা বিন কাইজি নামক এক মুনাফিকের বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে হলো, তখন সে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে, আমি আমার বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। তবে পরিস্থিতি এতটাই নাজুক ছিল যে, কারো অজুহাত আমলে নিয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলা সম্ভব ছিল না। ফলে মুসলমানরা তার প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সেখান দিয়েই অতিক্রম করলেন।

এই চরম সংকটময় মুহূর্তে আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক হঠাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সে এই অজুহাত দেখাল যে, তার মত ছিল শহরে অবরুদ্ধ থেকে যুদ্ধ করার, কেন তা মানা হলো না। যখন সে এই বলে ফিরে গেল যে, “আমরা কেন অকারণে নিজেদের প্রাণ হারাব?” তখন প্রায় তিনশ লোক তার সাথেই ফিরে গেল। এটি এই বাস্তবতার এক প্রকাশ্য প্রমাণ ছিল যে, মদিনায় মুনাফিকদের সংখ্যা ছিল শত শত, যারা ইসলামের শিকড় কাটতে উদ্যত ছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, এই বিশ্বাসঘাতকদের থামানোর চেষ্টা করা একটি নতুন যুদ্ধ ডেকে আনার নামান্তর ছিল, তাই রাসূল ﷺ নীরবতা অবলম্বন করলেন।

বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছিল, এখন প্রায় সাতশ লোক অবশিষ্ট ছিল। যদি মুনাফিকরা শুরু থেকে বাহিনীর সাথে না চলত তবে এত বেশি মনোবল ভাঙত না, কিন্তু এখন তাদের হঠাৎ চলে যাওয়ায় ইসলামী বাহিনী এক চরম ধাক্কা খেল। তবে আল্লাহর রহমত এবং রাসূল ﷺ-এর মতো অতুলনীয় নেতার দিকনির্দেশনা সাথে ছিল, তাই মুসলমানরা সাহস হারাননি। [১]

প্রতিরক্ষা কৌশল:

প্রকৃতপক্ষে মদিনাকে আগে কখনো এমন গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। বদরের যুদ্ধ মদিনা থেকে ১৭৫ মাইল (১১২ কিলোমিটার) দূরে হয়েছিল, ফলে শহর বিপদমুক্ত ছিল। কিন্তু এখন যুদ্ধের দামামা মদিনার দরজায় বাজছিল। সংখ্যার দিক থেকেও পরিস্থিতি গাযওয়ায়ে বদরের চেয়ে বেশি নাজুক ছিল। তখন কাফেররা ছিল তিন গুণ, আর এখন চার গুণেরও বেশি; কারণ আব্দুল্লাহ বিন উবাই চলে যাওয়ার পর ইসলামী বাহিনী সাতশর কাছাকাছি রয়ে গিয়েছিল, যেখানে কুরাইশদের তিন হাজার যুবক শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে শিবির গেড়েছিল। যদি তাদের এই ভয় না থাকত যে ভেতরে সশস্ত্র মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছে, তবে সম্ভবত তারা শহরে ঢুকে পড়তে দ্বিধা করত না।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩৫৫, দার হিজর।

কিন্তু এখন তাদের রণকৌশল এটাই ছিল যে, প্রথমে খোলা ময়দানে লড়াই করে মুসলমানদের সশস্ত্র জনশক্তিকে নির্মূল করে দেওয়া হবে। লড়াইয়ে সফলতার সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে কম ছিল, কিন্তু হুজুর আকদাস ﷺ ঈমান, সংকল্প, তাওয়াক্কুল এবং সাহসিকতার চরম শিখরে ছিলেন এবং প্রতিরক্ষার প্রতিটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা করছিলেন। অন্যদিকে কুরাইশরা মদিনার বাইরে শিবির স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা মদিনা থেকে বের হওয়ার রাস্তাগুলো অবরোধ করার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করেনি, একইভাবে তারা কোনো উপযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজে বের করাকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। নবী আকরাম ﷺ তাদের এই গাফিলতির সুযোগ নিলেন এবং কুরাইশদের শিবিরকে নিজের বাম দিকে রেখে শহর থেকে এতটুকু বাইরে চলে এলেন যে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপও ছিল; কারণ এখন কুরাইশরা সামান্য তৎপরতা দেখালেই ইসলামি লশকর ও মদিনার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধের ফয়সালা হওয়ার আগে কুরাইশরা মদিনায় প্রবেশ করার সাহস করবে না; কারণ সেক্ষেত্রে ইসলামি লশকর তাদের পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সংখ্যাস্বল্পতার কথা মাথায় রেখে অনুভব করছিলেন যে, কোনো সাধারণ ময়দানে যুদ্ধ জয় করা কঠিন, তাই তিনি এমন একটি বিশেষ স্থানের সন্ধানে ছিলেন যেখানে নিজের শক্তিকে সুরক্ষিত রেখে শত্রুর ওপর আক্রমণাত্মক হামলা চালানো যায়। এটি তখনই সম্ভব ছিল যখন পেছন এবং ডানে-বামে থেকে ঘেরাও হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না এবং এমনটি উহুদ পাহাড়ের পাদদেশেই সম্ভব ছিল। এটি মদিনার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় যা শহর থেকে পৌনে পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত, এটি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে এমনভাবে বিস্তৃত যে এর দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইল (৮ কিলোমিটার) এবং প্রস্থ দুই মাইল (সোয়া তিন কিলোমিটার) পর্যন্ত চলে গেছে।

এই পর্যায়ে হুজুর ﷺ সেনাবাহিনীর নতুন করে পর্যালোচনা করলেন। আবদুল্লাহ বিন উমর, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন আরকাম, বারা বিন আযিব, যায়েদ বিন সাবিত এবং আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুম মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সের ছিলেন কিন্তু জিহাদের আগ্রহে সাথে চলে এসেছিলেন। আপনি ﷺ তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তবে রাফে বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে, যিনি পনেরো বছর বয়সের ছিলেন, এই কারণে গ্রহণ করে নিলেন যে তিনি একজন ভালো তীরন্দাজ ছিলেন। আপনি ﷺ তাকে তীরন্দাজ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। একইভাবে সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেও, যিনি পনেরো বছর বয়সের ছিলেন, গ্রহণ করে নিলেন, কারণ তিনি কুস্তিতে রাফে বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আছাড় দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। [১]

শনিবার ১৫ই শাওয়াল ৩ হিজরি (৩০শে মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) খুব ভোরে হুজুর ﷺ কাতারবন্দি এবং ব্যূহ রচনা এমনভাবে সম্পন্ন করেছিলেন যে উহুদ পাহাড় পেছনে ছিল এবং মদিনা মুনাওয়ারা বাম দিকে। [২]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩৫৩, তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৪৩৩

[২] উহুদ যুদ্ধের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাক "অর্ধ শাওয়াল" বলেন এবং কাতাদাহ "শাওয়ালের শনিবার" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/২৮), লেখক প্রাচীনদের থেকে অন্য কোনো তারিখের স্পষ্ট বর্ণনা পাননি। যদিও পরবর্তীদের কেউ কেউ ৭, ৮ এবং ৯ তারিখও উল্লেখ করেন। (আস-সিরাহ ওয়াদ দাওয়াহ ফিল আহদিল মাদানি, আহমদ গালুশ, পৃ. ৩২০) ইবনে ইসহাকের বক্তব্যই অগ্রগণ্য মনে হয়; কারণ এটি নিশ্চিত যে হুজুর ﷺ জুমার নামাজ পড়ে বের হয়েছিলেন এবং পরের দিন যুদ্ধ হয়েছিল যা নিশ্চিতভাবেই শনিবার ছিল। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শনিবারে ৮ই শাওয়াল তারিখ হয়। ৮ তারিখের মতটি কেবল অনুমাননির্ভর, অথচ ক্যালেন্ডারের হিসাব ছাড়াও এটি ইবনে ইসহাকের বক্তব্যের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এটিই অগ্রগণ্য। এখানে এটিও মনে রাখা উচিত যে লেখক যতটুকু চিন্তা করেছেন, উহুদ যুদ্ধের তারিখ ১৫ই শাওয়াল বিশুদ্ধ চান্দ্র অর্থাৎ মাদানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। যদিও মরহুম মাওলানা ইসহাক আন-নবী আলভির মত হলো এটিই শাওয়াল (মাদানি বয়স ২ হিজরি) ছিল। (আন-নুকুশ, রাসূল নম্বর খণ্ড: ২) কিন্তু এর সমর্থনে তার পেশ করা প্রমাণাদি খুব একটা জোরালো নয়।

## কুরাইশ বাহিনীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ:

দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। তাদের দুই দক্ষ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ ডান পার্শ্বের এবং ইকরিমা বিন আবু জাহল বাম পার্শ্বের একশ একশ অশ্বারোহীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। খালিদের যুদ্ধকৌশল ছিল প্রবাদতুল্য, অন্যদিকে ইকরিমা তার পিতা আবু জাহলের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। তাদের মধ্যে আবু আমির রাহিব নামক এক বিখ্যাত দরবেশও ছিল, যে মদিনার বাসিন্দা ছিল এবং ইসলামের পূর্বে ইবাদত ও সাধনার কারণে পরিচিত ছিল। নবী করীম (সা.)-এর মদিনায় আগমনের ফলে তার ভণ্ড আধ্যাত্মিকতার মুখোশ উন্মোচিত হলে সে হিংসা ও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকে। তার ক্ষোভ তখন আরও বেড়ে যায় যখন তার পুত্র হানজালা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন আবু আমির তার কয়েকজন অনুসারীসহ মক্কায় চলে যায়। আজ সে প্রতিশোধের আগুন নেভাতে কুরাইশ বাহিনীতে শামিল হয়ে এসেছে। এই বাহিনীতে জুবাইর বিন মুতয়িমের গোলাম ওয়াহশি বিন হারবকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার বর্শা নিক্ষেপে এমন দক্ষতা ছিল যে তার লক্ষ্য কখনো ভুল হতো না। জুবাইর বিন মুতয়িম হযরত হামজা (রা.)-এর ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলেন, যিনি বদরের যুদ্ধে কুরাইশ সেনাপতি তুয়াইমা বিন আদি-কে হত্যা করেছিলেন। জুবাইর বিন মুতয়িম ওয়াহশিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি সে হামজা (রা.)-কে হত্যা করতে পারে তবে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। [১]

কুরাইশ নারীরা বাহিনীর পেছনে দফ বাজিয়ে রণসংগীত গাইছিল।

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقِ وَنَفْرِشِ النَّمَارِقِ

“যদি তোমরা অগ্রসর হও, তবে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব এবং তোমাদের জন্য কারুকার্যময় বিছানা পেতে দেব।”

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقِ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقِ

“কিন্তু যদি তোমরা পিছু হটো, তবে আমরা তোমাদের ছেড়ে চলে যাব, কোনো অনুরাগ ছাড়াই চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।” [২]

## মুসলমানদের ব্যূহ রচনার সামরিক দিকসমূহ:

মুসলমানরা প্রায় সবাই পদাতিক ছিলেন, মাত্র দুইজনের কাছে ঘোড়া ছিল। শত্রুবাহিনীর দুইশ অশ্বারোহী খোলা ময়দানে সহজেই পদাতিকদের ওপর চড়াও হতে পারত। এই কারণেই নবী করীম (সা.) উপত্যকার প্রশস্ত অংশে বেশি সামনে গিয়ে ব্যূহ রচনা করা থেকে বিরত থাকেন, যাতে প্রয়োজনে মুসলমানরা পিছিয়ে এসে নিজেদের শিবিরে আশ্রয় নিতে পারে, যেখানে পাহাড়ের দেয়াল প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সংকীর্ণ স্থানে শত্রুর অশ্বারোহীরা ঘোড়া নিয়ে অবাধে ঘুরতে পারত না, যেখানে পদাতিক মুসলমানরা দ্রুত দিক পরিবর্তন করে তাদের আহত করতে পারত।

উহুদ পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে ব্যূহ রচনার মধ্যে এই হিকমতও ছিল যে, এর ফলে মুসলমানদের মুখ ছিল পশ্চিম দিকে,

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩৫০, ৩৫৭। ইবনে হাজার-এর মতে, এই জুবাইর বিন মুতয়িম কুরাইশদের অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্পর্কে চাচাতো ভাই হতেন। মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, তার থেকে কিছু হাদিসও বর্ণিত আছে, ৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৯৪, ত র রিসালাহ)

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩৫৫

এখন শত্রুর সৈন্যরা সামনে থেকে পূর্বমুখী হয়েই আক্রমণ করতে পারত এবং এমন অবস্থায় সূর্যের রশ্মি তাদের দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে অবশ্যই তাদের বিচলিত করত।

মুসলমানদের পেছনে এমন এক দুর্গম ঢাল ছিল যে তার ওপর ঘোড়া চড়ানো সম্ভব ছিল না, তবে পরাজয়ের ক্ষেত্রে পদব্রজে মুসলমানরা এই ঢালে চড়তে পারত এবং কুরাইশ অশ্বারোহীদের ওপর তীর নিক্ষেপ ও পাথর বর্ষণ করে নিজেদের রক্ষা করতে পারত। যদি পেছন থেকে কোনো আক্রমণ সম্ভব হতো তবে তা কেবল তখনই সম্ভব ছিল যখন কুরাইশদের কোনো দল দীর্ঘ পথ ঘুরে পেছনে আসত এবং মুসলমানদের বাম পার্শ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ত। যদিও এমন পদক্ষেপ কঠিন ছিল কিন্তু অসম্ভব ছিল না। হুজুর ﷺ এই বিপদ সময়মতো আঁচ করতে পেরে এক অনন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামি বাহিনীর বাম দিকে পাহাড় থেকে বেশ দূরে সরে গিয়ে একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত টিলা ছিল, এর পেছনের দিকটি সামান্য উঁচু ছিল যার ওপর অশ্বারোহীরা চড়তে পারত, তবে সামনের অংশ যা ময়দানের দিকে ছিল তা বেশ উঁচু ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজের একটি দলকে এই টিলায় নিযুক্ত করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই নিজেদের জায়গা ছাড়বে না। এই তীরন্দাজরা এই টিলা থেকে চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দেখতে পারত, তাদের পেছনে ছিল উহুদ পাহাড়, বাম হাতে মদিনা এবং সামনে শত্রু। তাদের উপস্থিতিতে শত্রু মুসলমানদের ওপর পেছন থেকে আক্রমণের জন্য টিলা প্রদক্ষিণ করতে পারত না। যদি তারা মদিনায় ঢোকার চেষ্টা করত তবে তীরন্দাজরা পেছন থেকে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানাত এবং নবী আকরাম ﷺ-কে তৎক্ষণাৎ খবর দিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করাত। যদি কুরাইশরা ঘুরে মুসলমানদের পেছনে আসত তবুও তীরন্দাজদের সাথে না লড়ে সামনে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কুরাইশ সেনাপতি আবু সুফিয়ান শেষ সতর্কবার্তা হিসেবে আনসারদের কাছে বার্তা পাঠাল: “তোমরা আমাদের চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গ দেওয়া ছেড়ে দাও, আমরা ফিরে যাব, তোমাদের সাথে আমাদের লড়াই করার কোনো প্রয়োজন নেই।” আনসাররা এই বার্তার কঠোর জবাব দিয়ে দূতকে ফিরিয়ে দিল। [১]

আবু দুজানা (রা.)-এর বীরত্ব ও ব্যক্তিগত লড়াই:

এখন উভয় পক্ষের লোকেরা সাধারণ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নবী আকরাম ﷺ প্রয়োজনীয় মনে করলেন যে শক্তিশালী শত্রুর ওপর শুরুতে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করা হোক। এমনটি বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের অসাধারণ প্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। এজন্যই জনাব রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের আবেগ জাগিয়ে তুলে নিজের তলোয়ার ঘোরালেন এবং বললেন: “এটি কে নেবে?” অনেক জানবাজ নিজেদের হাত বাড়ালেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তলোয়ার পেছনে সরিয়ে নিলেন এবং বললেন: “এর হক আদায় করার জামানতে এটি কে নেবে?” আনসারদের প্রখ্যাত তলোয়ারবাজ আবু দুজানা (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: “হক বলতে কী বোঝানো হয়েছে?” বললেন: “একে এত চালাও যেন রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।” তিনি আরজ করলেন: “আমি হক আদায় করার জামানতে এটি নিচ্ছি।”

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩৬১, দারু হাজার।

তলোয়ার হাতে নিয়েই তিনি মাথায় লাল পট্টি বেঁধে নিলেন, ময়দানে নামার সময় এটি ছিল তাঁর অভ্যাস। এটি দেখে সবাই অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে উঠল: “আবু দুজানা মৃত্যুর পট্টি বেঁধে নিয়েছে।”

আবু দুজানা রাদিআল্লাহু আনহু তলোয়ার উঁচিয়ে দুই সারির মাঝখানে দম্ভভরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে বললেন: “আল্লাহর কাছে এই চাল কেবল এমন সুযোগেই পছন্দনীয়।”

এরপর উভয় পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত মোকাবিলা শুরু হলো, মুশরিকদের নামকরা পালোয়ান তালহা বিন আবি তালহা উটের পিঠে চড়ে বের হলো, এদিক থেকে জুবায়ের বিন আওয়াম রাদিআল্লাহু আনহু পায়ে হেঁটে আবির্ভূত হলেন এবং লাফিয়ে তার উটের ওপর চড়ে বসলেন, সাথে সাথে তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তলোয়ার দিয়ে জবেহ করে ফেললেন। এরপর নিহতের ভাই আবু সাদ এলো এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু-এর হাতে নিহত হলো, এটি দেখে নিহতের দুই ভাতিজা মুসাফি এবং জুলাস ময়দানে বের হলো, এদিক থেকে আসিম বিন সাবিত রাদিআল্লাহু আনহু ধনুক সামলে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাদের তীরের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দিলেন। [১]

**সাধারণ আক্রমণ এবং মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব:**

এখন উভয় পক্ষ থেকে তাকবির ধ্বনি উঠল এবং উভয় বাহিনী একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। আবু দুজানা রাদিআল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ার এমনভাবে চালালেন যে একের পর এক সারি পরিষ্কার করে দিলেন এবং শত্রুর কাতারগুলো উল্টে দিয়ে তাদের নারীদের পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এমনকি হিন্দ বিনতে উতবা তাঁর তলোয়ারের নাগালে চলে এলো। তিনি নারী হওয়ার বিবেচনা করে তাকে ছেড়ে দিলেন।

মুহাজির ও আনসারগণ একে অপরের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ার চালনার নৈপুণ্য দেখালেন। হযরত হামজা রাদিআল্লাহু আনহু-এর সামনে যে মুশরিক আসত, তলোয়ারের গ্রাসে পরিণত হতো। আরতাহ বিন আবদ শারাহবিল এবং সিবাহ বিন আব্দুল উযযার মতো বীররা মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ল। ওদিকে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর আঘাতে মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা বিন উসমান আহত হয়ে পতাকাসহ পড়ে গেল। কুরাইশদের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী মুসলমানদের ঈমানি শক্তি এবং জোশ ও জযবার সামনে টিকতে পারল না এবং ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল।

মুসলমানরা পিছু ধাওয়া করে তাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং গনিমত সংগ্রহ করতে লাগল। [২]

মুশরিকদের নারীরা কাপড় গুটিয়ে সেখান থেকে পালাচ্ছিল। টিলার ওপর নিয়োজিত তীরন্দাজরা যখন এই দৃশ্য দেখল, তারা ভাবল যে যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে গেছে, তাই তারাও গনিমত নেওয়ার জন্য নিচে নামতে লাগল। তাদের আমির আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু তাদের থামানোর চেষ্টা করলেন এবং মনে করিয়ে দিলেন যে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি অবস্থায় এখানে পাহারা দেওয়ার তাকিদ করেছেন, কিন্তু যারা যাচ্ছিল তারা এই ভেবে চলে গেল যে এই হুকুম যুদ্ধের অবস্থার জন্য ছিল এবং এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। [৩]

**মোড় ঘুরে গেল:**

এভাবে টিলার ওপর মাত্র চৌদ্দ-পনেরো জন লোক বাকি রইল, মুশরিকদের অশ্বারোহী দলের সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ পশ্চাদপসরণ...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/১৬-১৭ দার হিজর

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৪০-৩৫ দারুল কুতুব আল-আরাবি

[৩] সহিহ বুখারি, হা: ৩০৩৯, কিতাবুল জিহাদ, বাব মা ইয়াকরাহু মিনাত তানাযু ওয়াল ইখতিলাফ

এই অবস্থায় টিলাটি খালি হতে দেখে ফেললেন এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে দেরি করলেন না। শীঘ্রই খালিদের অশ্বারোহী বাহিনী টিলাটি ঘুরে মুসলমানদের পেছনের দিকে এসে পৌঁছাল। [১]

টিলায় থেকে যাওয়া অবশিষ্ট প্রহরীরা তাদের রুখতে সফল হতে পারলেন না এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। এখন খালিদ বিন ওয়ালিদ গনিমতের মাল সংগ্রহে মগ্ন অসতর্ক মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দিলেন এবং অনেককে শহীদ করে দিলেন। ওদিকে পলায়নরত মুশরিকরাও ফিরে এল এবং মুসলমানরা উভয় দিক থেকে কঠিন ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

ওয়াহশি সুযোগ পেয়ে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর বর্শা নিক্ষেপ করল যা তাঁর নাভির এপার-ওপার হয়ে গেল। এদিকে ইসলামী লশকারের পতাকাবাহী মুসআব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও শহীদ হয়ে গেলেন, পতাকা মাটিতে পড়ে যাওয়ায় মুসলমানদের শৃঙ্খলা রক্ষা করা আরও কঠিন হয়ে পড়ল। সেই সাথে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ কথা শুনে মুসলমানদের ওপর যেন বজ্রপাত হলো। শোক ও অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা এবং হাহাকারের এই অবস্থায় ডজন ডজন মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন এবং অনেকে এদিক-ওদিক চলে গেলেন। [২]

**নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিরক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় আত্মত্যাগ:**

কিন্তু গুজবটি ভুল ছিল, এই অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কুরাইশদের অনেক যোদ্ধা আপনাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুঁজছিল। তাদের অপবিত্র উদ্দেশ্য থেকে রক্ষা করার জন্য কয়েকজন সাহাবী নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিজেদের বেষ্টনীতে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং সিসা ঢালা প্রাচীর হয়ে আপনার চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হারিস বিন আস-সিম্মাহ এবং কয়েকজন আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুম অগ্রগণ্য ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের আগে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিজের বর্ম হযরত কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বদল করে নিয়েছিলেন, ফলে আপনাকে চেনা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তবুও মুশরিকদের মধ্য থেকে উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস সেদিকে এল এবং একের পর এক কয়েকটি পাথর আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর নিক্ষেপ করল, যার ফলে আপনার দন্ত মোবারক আহত হলো। এমন সময় ইবনে শিহাব এবং ইবনে কুমাইয়াহ মুশরিকদের একটি দলের সাথে তলোয়ার চালিয়ে আক্রমণ করল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন। তা সত্ত্বেও ইবনে শিহাবের আঘাতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে জখম হলো এবং ইবনে কুমাইয়াহর তলোয়ার আপনার ইস্পাতের শিরস্ত্রাণের ওপর পড়ল। যদিও মাথা মোবারক সুরক্ষিত ছিল কিন্তু শিরস্ত্রাণের লোহার কড়াগুলো গালের ভেতরে ঢুকে গেল। [৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রক্ষা করার জন্য যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উম্মে আম্মারা (নুসাইবা বিনতে কাব) রাদিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন, তিনি আপনার ডানে-বামে তলোয়ার ও তীর চালাচ্ছিলেন। তাঁর সাথেই তাঁর স্বামী জায়েদ বিন আসিম এবং দুই ছেলে: হাবিব ও আবদুল্লাহও সিংহের মতো মুশরিকদের সাথে লড়াই করছিলেন। উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইবনে কুমাইয়াহর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন। সে এমনভাবে তলোয়ার চালাল যে উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর

---

[১] কোনো কোনো গবেষকের মত হলো, হযরত খালিদ পুরো পাহাড় ঘুরে এসেছিলেন।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩, ৩৫

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৫, ৩৬; সিরাতে ইবনে হিশাম: ৩/৮০ থেকে ৮৩

কাঁধ থেকে গোশতের টুকরো খসে পড়ল। উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা জখমের পরোয়া না করে জবাবে তার ওপর তলোয়ারের কয়েকবার আঘাত করলেন, কিন্তু সেই দুর্ভাগা দুটি বর্ম পরিহিত ছিল, তাই বেঁচে গেল। উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনেকগুলো জখম পেলেন কিন্তু কাফেররা তাকে পথ থেকে সরাতে পারল না। [১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে কোনো ঢাল নেই। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি নিজের ঢাল তাকে দিয়ে দেন। উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঢাল নিয়ে আরও বেশি বীরত্বের সাথে লড়াই করতে লাগলেন।

উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেই দিনের কথা স্মরণ করে বলতেন:
“আমাদের অশ্বারোহীরা বেশি ক্ষতি পৌঁছেছে। তারা যদি আমাদের মতো পদাতিক হতো, তবে আমরা তাদের মজা বুঝিয়ে দিতাম।”

যখন কোনো অশ্বারোহী আক্রমণ করত, তখন উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঢালের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আত্মরক্ষা করতেন এবং তার তলোয়ার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। যখন সে ফিরে যেত, তখন উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করতেন; ঘোড়া ও অশ্বারোহী পড়ে যেতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহার ছেলেকে ডাক দিতেন: “আমারা-র ছেলে! তোমার মাকে সাহায্য করো।” মা ও ছেলে উভয় মিলে শত্রুকে খতম করে দিতেন। এই সময়ে এক আক্রমণকারী তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন যায়েদের হাত মারাত্মকভাবে জখম করে দিল। উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা দৌড়ে আসলেন, নিজের থলে থেকে ব্যান্ডেজ করার সরঞ্জাম বের করলেন এবং ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে বললেন: “যাও আমার সন্তান! শত্রুর সাথে লড়াই করো।”

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি দেখে বললেন: “উম্মে আমারা! কে আছে যার তোমার মতো সাহস আছে।”

ইতিমধ্যে এক কাফের আক্রমণের জন্য দৌড়ে এল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “উম্মে আমারা! এই সেই ব্যক্তি যে তোমার সন্তানকে জখম করেছে।” উম্মে আমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা এগিয়ে গিয়ে তার নলার ওপর এমন এক আঘাত করলেন যে সে পড়ে গেল। এরপর ছেলের সাথে মিলে তাকে খতম করে দিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন: “তুমি তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নিলে। আল্লাহর শোকর যিনি তোমার চোখ জুড়িয়ে দিয়েছেন।” [২]

মুশরিকরা সরাসরি আক্রমণ ব্যর্থ হতে দেখে তীর বর্ষণ শুরু করে দিল। এটি দেখে আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত এগিয়ে এলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়লেন, মুশরিকদের তীরগুলো তার পিঠে বিঁধতে লাগল। [৩]

**বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের সাহস এবং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা:**

যে সকল মুসলমান সেখান থেকে দূরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তারা তখনও পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু জানতেন না। তবে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেন এবং একে অপরকে সাহস দিতে লাগলেন। সাবিত বিন দাহদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আওয়াজ দিলেন: “হে আনসারগণ! এসো আমার দিকে এসো। আমি সাবিত বিন দাহদাহ। যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে থাকেন, তবে তাতে কী, আল্লাহ তাআলা তো জীবিত আছেন। তোমরা তোমাদের দ্বীন রক্ষার জন্য লড়াই করো।”

কিছু আনসার তার চারপাশে সমবেত হলেন। তারা কুরাইশদের অশ্বারোহী দলের মুখোমুখি হলেন যাতে খালিদ বিন ওয়ালিদ,

---

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২ / ৮২

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩ / ৪১২ ত সাদার

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪ / ৩৭

ইকরিমাহ বিন আবি জাহল এবং আমর ইবনুল আস-এর মতো তলোয়ারবাজরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জোরালো সংঘর্ষের পর সাবিত বিন ওয়াহদাহ (রা.) এবং তাঁর সমস্ত সাথী শহীদ হয়ে গেলেন। [১]

আনাস বিন নাযর (রা.) মুসলমানদেরকে ছত্রভঙ্গ হতে দেখে বললেন: "ভাইয়েরা! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর তোমরা বেঁচে থেকে কী করবে? সামনে এগিয়ে যাও এবং যে উদ্দেশ্যে আমাদের নেতা প্রাণ দিয়েছেন, তার জন্য প্রাণ দিয়ে দাও।"

এ কথা বলে তিনি কাফেরদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তলোয়ার চালাতে থাকলেন। [২]

কাব বিন মালিক (রা.) আহত হয়েছিলেন, তিনি বলেন: "আমি দেখলাম যে বর্ম পরিহিত এবং অস্ত্রে সজ্জিত এক বিশালদেহী কাফের মুসলমানদের ওপর খুব চড়াও হচ্ছিল এবং চিৎকার করে বলছিল: 'ওদেরকে বেঁধে বেঁধে মারো'।"

এমন সময় একজন মুখোশধারী মুসলমান তার সামনে চলে এলেন। দুজনে একে অপরের সাথে লিপ্ত হলেন। সেই মুসলমান এমনভাবে তলোয়ার চালিয়ে আঘাত করলেন যা তার কাঁধ থেকে উরু পর্যন্ত নেমে গেল। সেই কাফের বর্মসহ দুই টুকরো হয়ে গেল।

তখন সেই মুখোশধারী নিজের মুখ খুলে বললেন: "কাব! দেখো! আমি আবু দুজানা।" [৩]

হযরত আলী (রা.) মুসলমানদের লাশগুলো দেখে বেড়াচ্ছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পেলেন না তখন ভাবতে লাগলেন, এটা সম্ভব নয় যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ময়দান ছেড়ে চলে যাবেন, অথচ তিনি শহীদদের মধ্যেও নেই। এর অর্থ হলো আল্লাহ আমাদের বিচ্যুতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। এখন এটাই করা উচিত যে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়ে দিই। এই ভেবে তিনি তলোয়ারের খাপ ভেঙে ফেললেন এবং উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই আক্রমণ এত জোরালো ছিল যে কাফেররা দূরে সরে গেল। তখন হযরত আলী (রা.) দেখলেন যে নবী করীম (সা.) তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছেন। [৪]

এমন সময় মুশরিকদের একটি দল আক্রমণ করল, রাসূলুল্লাহ (সা.) ডেকে বললেন: "আলী! ওদেরকে রুখো।"

হযরত আলী (রা.) শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত প্রবলভাবে তলোয়ার চালিয়ে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করলেন। এমন সময় দ্বিতীয় আরেকটি দল আক্রমণ করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) পুনরায় হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন। তিনি আবারও তাদের তাড়িয়ে দিলেন। [৫]

**রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিচিতি এবং সাহাবায়ে কেরামের অবর্ণনীয় আনন্দ:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই যুদ্ধের সময় এমন একটি শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) পরিহিত ছিলেন যার ফলে কেবল চোখ দুটি দেখা যাচ্ছিল। সেই চোখের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য সাহাবায়ে কেরাম খুব ভালোভাবেই জানতেন, কিন্তু মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চিনতে পারছিল না। [৬]

এদিক থেকে হযরত কাব বিন মালিক (রা.)-ও পৌঁছে গেলেন, যাঁর বর্মটি সেই সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিহিত ছিলেন। নিজের বর্ম তো তিনি চিনতেনই, সাথে শিরস্ত্রাণের ভেতর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উজ্জ্বল চোখ দুটিও দেখলেন, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠলেন:

---

[১] আল-ইসতিয়াব: ২০৩/১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৫৯/৫

[৩] তারিখু দামেশক: ৭৬/৩২

[৪] সিরাতে ইবনে হিশাম: ৮৩/২

[৫] আল-জিহাদ লি ইবনে আবি আসিম, হা: ২৭০

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩১১/৫, দারু হাজার

“হে মুসলমানগণ! এই তো আমাদের নবী জীবিত ও সুস্থ আছেন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ তাদেরকে চুপ থাকার ইশারা করলেন। [১]

কেননা তখন পর্যন্ত মুশরিকরা কেবল অনুমানের ভিত্তিতে এদিক-সেদিক আক্রমণ করছিল। তাদের নিশ্চিত জানা ছিল না যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন।

**উহুদ পাহাড়ের দিকে পশ্চাদপসরণ এবং সাহাবীগণের আত্মোৎসর্গ:**

এখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজেদের বেষ্টনীতে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুশরিকরা কিছুটা পিছু হটার পর আবারও দ্রুতগতিতে পেছন থেকে ধেয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “এমন কোনো বীর পুরুষ আছে কি! যে এদের তাড়িয়ে দেবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।” হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ؓ আরজ করলেন: “আমি উপস্থিত আছি।” তিনি বললেন: “তুমি নও।”

এবার একজন আনসারী সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মুশরিকরা এখন পুনরায় পিছু নেওয়া শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একইভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে থাকলেন এবং একজন একজন করে আনসারী মুশরিকদের বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টায় শহীদ হতে থাকলেন। পরিশেষে কেবল হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ؓ রয়ে গেলেন, তখন তাঁকে নিজেই মোকাবিলায় নেমে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে হলো, যাতে তাঁর উভয় হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং এক হাতের আঙুলগুলো কেটে গেল। [২]

**উবাই বিন খালাফ জাহান্নামবাসী হওয়া:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একনিষ্ঠ সাথীদের নিয়ে পাহাড়ের একটি গিরিপথের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পেছন থেকে উবাই বিন খালাফ বর্শা উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে এল। এই ব্যক্তি হিজরতের পূর্বে মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক কষ্ট দিয়েছিল এবং এমনকি বলেছিল যে, আমি তোমাকে হত্যা করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিয়েছিলেন: “ইনশাআল্লাহ, আমিই তোমাকে হত্যা করব।”

আজ সেই উবাই বিন খালাফ বলছিল: “মুহাম্মদ কোথায়? মুহাম্মদ কোথায়? যদি সে বেঁচে যায় তবে মনে করো আমি বাঁচব না।”

সাহাবীগণ চাইলেন তাকে পথেই রুখে দিতে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “আসতে দাও।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিস বিন আস-সিম্মাহর কাছ থেকে বর্শা ◌িলেন এবং নিজেই তার মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন। সে তাঁর ওপর আঘাত করার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তার শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝখান দিয়ে দৃশ্যমান ঘাড়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। আক্রমণকারীর কাছে আপাতদৃষ্টিতে এটি সামান্য জখম মনে হলেও সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, তারপর অত্যন্ত ভয়াবহভাবে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে করতে পেছনে পালিয়ে গেল। মুশরিকরা তাকে সান্ত্বনা দিল যে এটি সামান্য জখম, কিন্তু সে ব্যথায় অস্থির হয়ে চিৎকার করে বলছিল: “মুহাম্মদ বলেছিল যে আমিই উবাইকে হত্যা করব। আল্লাহর কসম! আমার এত কষ্ট হচ্ছে যে, যদি তা সমস্ত হিজাজবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় তবে তারা সবাই মারা যাবে।”

অবশেষে উবাই বিন খালাফ সেই জখমেই জাহান্নামবাসী হলো। [৩]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/৮৩

[২] আল-মু’জামুল আওসাত লিত-তাবারানি, হা: ৮৭০৩, ত: দারুল হারামাইন

[৩] আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম, হা: ৩৬৬৩; আল-জিহাদ লি-ইবনে আবি আসিম, হা: ২৫৩; মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৯৭৩১, ত: আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান

**উহুদ পাহাড়ের মোর্চা:**

মুশরিকদের পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু এখন আপনি বিপদমুক্ত ছিলেন; কারণ আপনি ﷺ পাহাড়ের বেশ উঁচুতে ছিলেন, সেখানে অনেক সাহাবীও আপনার কাছে একত্রিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ আহত ছিলেন আবার কেউ সুস্থ ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু তালহা (রা.)-ও ছিলেন, যিনি একজন দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি নিজের ঢাল খাড়া করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং শত্রুদের ওপর অনবরত তীর বর্ষণ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তীরন্দাজি দেখার জন্য বারবার মাথা উঁচু করে দেখতেন যে শত্রুদের গায়ে তীর লাগছে কি না। আবু তালহা (রা.) অস্থির হয়ে বলতেন: “আল্লাহর নবী! আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। আপনি মাথা উঁচু করবেন না। আপনার আগে আমার বুক হাজির আছে।” [১]

সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও এমন চমৎকার তীরন্দাজি করেছিলেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বাহবা দিয়ে বলেছিলেন:
“সা’দ! তীর চালাও। আমার বাবা-মা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোন।” [২]

মুশরিকদের আক্রমণের গতি যখন কিছুটা স্তিমিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উহুদ পাহাড়ের উঁচুতে উঠতে শুরু করলেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবু দুজানা, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, হযরত যুবাইর বিন আওয়াম, হযরত হারিস বিন সিম্মাহ (রা.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। মুশরিকরাও তাদের পিছু নিল। [৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “দেখো, এই লোকেরা যেন আমাদের পেছনে উপরে উঠতে না পারে।”

এ কথা শুনে হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং কয়েকজন মুহাজির ফিরে গিয়ে আক্রমণ করলেন এবং কাফেরদের তাড়িয়ে দিলেন।

এখন পাহাড়ের দুর্গম পথে আরোহণ শুরু হয়েছিল, আপনি ﷺ আহত ছিলেন এবং দুটি বর্ম পরিহিত ছিলেন, যার ওজনের কারণে একটি খাড়া পাথরের ওপর আপনি নিজে উঠতে পারছিলেন না, তখন হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.) তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে বসে পড়লেন, আপনি ﷺ তাঁর পিঠে পা রেখে পাথরের ওপর উঠলেন এবং বললেন: “তালহা নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।” [৪]

**আহতদের সেবা... সাকিনা নাযিল হওয়া:**

উঁচুতে আসার পর কুরাইশদের আক্রমণের ভয় আর ছিল না, তবে এখানে একত্রিত হওয়া মুসলমানরা সবাই খুব ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলেন। কিন্তু এখানে আগে থেকেই এমন পরিস্থিতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে মুসলিম মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.)-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইম এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) পানির মশক ভরে পিঠে বহন করে আনছিলেন এবং মুজাহিদীনদের পানি পান করাচ্ছিলেন। শিশুদের মধ্যে হযরত আনাস (রা.) ছিলেন, যিনি মাত্র তেরো বছর বয়সের ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ খাদেম হিসেবে এখানে উপস্থিত ছিলেন। [৫] হযরত ফাতিমা (রা.)-ও সেখানে ছিলেন। নবী করীম ﷺ-এর...

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮১১, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিব আবি তালহা (রা.)

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪০৫৯, কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়ায়ে উহুদ, বাব: ইয হাম্মাত ত্বয়িফাতানি মিনকুম

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১১, দারু হিজর

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১৩, দারু হিজর

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮১১, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিব আবি তালহা (রা.)

পবিত্র চেহারা থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল, হযরত আলী (রা.) ঢালে পানি ভরে নিয়ে আসলেন এবং আপনার ক্ষতগুলো পরিষ্কার করলেন কিন্তু রক্ত বন্ধ হলো না। হযরত ফাতিমা (রা.) এটি দেখে চাটাইয়ের একটি টুকরো পোড়ালেন এবং তার ছাই আপনার (সা.) ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিলেন, রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। [১]

এই সময়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত মুজাহিদদের ওপর হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্নতা ছেয়ে যেতে লাগল যা এমন এক নাজুক সময়ে অসম্ভব একটি বিষয় ছিল। কিন্তু অবস্থা এমন ছিল যে, চেষ্টা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা জেগে থাকতে পারছিলেন না। হযরত আবু তালহা (রা.)-এর হাত থেকে তলোয়ার বারবার পড়ে যাচ্ছিল। [২] কয়েক মুহূর্ত পর এই অবস্থার অবসান ঘটলে মুসলমানরা সতেজ হয়ে উঠলেন এবং নিজেদের মধ্যে এক নতুন শক্তি অনুভব করতে লাগলেন। [৩]

**আবু সুফিয়ানের সাথে কথোপকথন:**

যুদ্ধের হট্টগোল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কুরাইশরাও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্ধানে হতাশ হয়ে পড়েছিল, তবে যাওয়ার সময় তাদের সেনাপতি আবু সুফিয়ান পাহাড়ের কাছে এসে বিজয়ের স্লোগান দিল এবং বলল:

“যুদ্ধের ভাগ্য ওঠানামা করে। আজকের দিনটি বদরের দিনের প্রতিশোধ। হুবালের জয় হোক।”

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন: “আল্লাহই প্রবল ও সুউচ্চ।”

আবু সুফিয়ান বলল: “আমাদের উযযা আছে, তোমাদের কোনো উযযা নেই।”

হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিখিয়ে দেওয়া অনুযায়ী উত্তরে বললেন:

“আমাদের অভিভাবক আল্লাহ, তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই।” [৪]

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল: “শপথ দিয়ে বলছি, সত্য সত্য বলো আমরা কি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি নাকি করিনি?”

হযরত উমর (রা.) কঠোরভাবে উত্তর দিলেন: “না, আল্লাহর কসম! তিনি তো এই মুহূর্তে তোমার কথা শুনছেন।”

আবু সুফিয়ান যাওয়ার আগে বলল: “আগামী বছর আবার বদরে মোকাবিলা হবে।”

উত্তর দেওয়া হলো: “ঠিক আছে। আগামী বছর সেখানে মোকাবিলার ওয়াদা রইল।” [৫]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৫৭, কিতাবুল মাগাযী, বাব: মা আসাবান নাবিয়্যা মিনাল জিরাহ; হা: ৩০৩৯, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল মিজান। চাটাইয়ের ছাই দিয়ে ক্ষতস্থান ভরাট করা আরবদের একটি কার্যকর দেশীয় চিকিৎসা ছিল। এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মদিনা মুনাওয়ারার মেয়েদের ঘরে ঘরে দেশীয় চিকিৎসা শেখানো হতো। এর মাধ্যমে ইসলামে চিকিৎসা বিশেষ করে ভেষজ চিকিৎসার গুরুত্বও প্রকাশ পায়।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮১১, কিতাবুল মানাকিব, বাব: মানাকিবে আবু তালহা (রা.)। [৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৪।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩০৩৯, কিতাবুল জিহাদ, বাব: মা ইউকরাহু মিনাত তানাজু। [৫] সীরাতে ইবনে ইসহাক, পৃ. ৩৩২, ৩৩৩।

নোট: ইবনে সা’দের বর্ণনায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আবু সুফিয়ান পরবর্তী বছর “বদরে সুগরা”-তে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। বদরে সুগরা ছিল একটি বার্ষিক মেলা যা প্রতি বিশুদ্ধ চান্দ্র জিলকদ মাসের ১ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত বদর উপত্যকায় অনুষ্ঠিত হতো। (তাবাকাতে ইবনে সা’দ: ২/৭০) এই মেলা বিশুদ্ধ চান্দ্র জিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ হলো, পরবর্তী বছর নবী করীম (সা.) যখন ওয়াদা অনুযায়ী বদরে পৌঁছান, তখন সেই মাসটি কোনো কোনো বর্ণনাকারীর মতে শাবান ছিল। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১৩) আবার কারো মতে জিলকদ ছিল। (তাবাকাতে ইবনে সা’দ: ২/৫৯) যদি চান্দ্র হিসাব অনুযায়ী দেখা হয় তবে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এটি প্রচলিত ক্যালেন্ডারের শাবান হলেও বিশুদ্ধ চান্দ্র ক্যালেন্ডারের জিলকদ ছিল। এর দ্বারা এটিও বোঝা যায় যে, গযওয়ায়ে উহুদ সম্পর্কে কিছু মহলের এই অবস্থান যে এটি মে মাসের শাওয়াল মোতাবেক মাদানী মহররম ৩ হিজরীর ঘটনা, তা সঠিক নয়। কারণ গযওয়ায়ে উহুদে আবু সুফিয়ান এক বছর পর যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল “আল-মাও’ইদু বাইনানা ওয়া বাইনাকুম বাদরুস সাফরা রা’সুল হাওল”। (তাবাকাতে ইবনে সা’দ: ২/৫৯) স্পষ্টতই গযওয়ায়ে উহুদ যদি মহররমে হয়ে থাকে তবে জিলকদ পর্যন্ত এক বছর পূর্ণ হয় না।

হযরত আলী (রা.) গোয়েন্দাগিরির জন্য রওনা:

যখন কাফেরদের বাহিনী ফিরে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন যে, তিনি যেন তাদের পিছু নেন এবং দেখেন তারা কী করছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "যদি তারা উটের ওপর সওয়ার হয় এবং ঘোড়াগুলোকে খালি সাথে নিয়ে যায়, তবে তারা সরাসরি মক্কার দিকে যাবে। কিন্তু যদি তাদের ঘোড়ার ওপর সওয়ার দেখা যায়, তবে তাদের উদ্দেশ্য হবে মদিনায় আক্রমণ করা। আল্লাহর কসম! যদি এমন হয় তবে আমি নিজেই তাদের মোকাবিলায় বের হব।"

হযরত আলী (রা.) কুরাইশদের পেছনে গেলেন এবং ফিরে এসে জানালেন:

"তারা উটের ওপর সওয়ার হয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছে এবং ঘোড়াগুলো খালি সাথে যাচ্ছে।"

পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদদের দাফন-কাফনের দিকে মনোনিবেশ করলেন। [১]

ওহুদের শহীদগণ:

ওহুদের ময়দানে শহীদদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাদের মধ্যে হযরত আনাস বিন নযর (রা.)-ও ছিলেন যার শরীরে আশির কাছাকাছি জখম লেগেছিল। লাশ চেনা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাঁর বোন আঙুলের ডগা দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। [২]

শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভকারীদের মধ্যে উসাইরাম (রা.)-ও ছিলেন। তিনি সেদিনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সরাসরি রণক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং অবশেষে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে যান। যুদ্ধের পর মুসলমানরা যখন শহীদদের দাফন-কাফন করতে শুরু করল, তখন লাশের স্তূপের মধ্যে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পেল। কেউ জানত না যে তিনি মুসলমান হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: "তুমি এখানে কীভাবে? জাতীয়তাবোধের কারণে এসেছ নাকি ইসলামের খাতিরে?"

তিনি বললেন: "ইসলামের খাতিরে, হ্যাঁ আমি আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি।"

এই কথা বলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হুজুর (সা.) বললেন: "তিনি জান্নাতি।" তিনি এমন এক জান্নাতি ছিলেন যাকে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সুযোগও হয়নি। [৩]

আমর বিন আল-জামুহ (রা.):

শহীদদের মধ্যে হযরত আমর বিন আল-জামুহ (রা.)-ও ছিলেন যিনি এক পায়ে পঙ্গু ছিলেন। তাঁর চারজন জোয়ান ছেলে যখন যুদ্ধে শরিক হতে যাচ্ছিল, তখন তিনিও সাথে বের হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ছেলেরা বার্ধক্য ও পঙ্গুত্বের কথা বলে নিষেধ করলে তিনি হুজুর (সা.)-এর কাছে এসে আরজ করলেন: "আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যেতে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমি চাই আমার এই পঙ্গু পা নিয়ে জান্নাতে চলাফেরা করতে।"

এই আবেগ দেখে হুজুর (সা.) অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন তাঁর লাশও যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে ছিল। [৪]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩২১

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩০২

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩১৮

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩১৮

**হযরত হানজালা গাসীলুল মালাইকা রাদিয়াল্লাহু আনহু:**

তাদের মধ্যে হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন, যার পিতা আবু আমির রাহিব এই যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে ছিল। মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কন্যা জামিলা, যিনি একজন দৃঢ় ঈমানদার মেয়ে ছিলেন, তার সাথে হানজালার বিয়ে হয়েছিল। গত রাতেই বিয়ে হয়েছিল। বাসর রাতের গোসল তখনও করেননি, এমন সময় মুসলমানদের পরাজয়ের খবর শুনলেন। তিনি সরাসরি ছুটে এলেন এবং রণক্ষেত্রে প্রাণ বাজি রেখে শাহাদাত বরণ করলেন। তাকে কাফন পরানোর সময় মুসলমানরা তার শরীর থেকে পানির ফোঁটা ঝরতে অনুভব করলেন। যখন কনে জানালেন যে তিনি গোসল ছাড়াই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এজন্যই যে, ফেরেশতারা তাকে গোসল করিয়েছেন।" [১]

**হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অপূর্ণ কাফন:**

তাদের মধ্যে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন, যিনি মক্কার সবচেয়ে সুন্দর এবং সুবেশধারী যুবক ছিলেন। কিন্তু আজ তার দাফন এমন অবস্থায় হচ্ছিল যে, শরীর ঢাকার জন্য কেবল একটি ছোট চাদরই পাওয়া গিয়েছিল, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা খুলে যেত। [২]

**একজন শহীদের শেষ কথা:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিদের নিয়ে চিন্তিত ছিলেন যাদের লাশ পাওয়া যাচ্ছিল না, আবার জীবিতদের মধ্যেও তাদের দেখা যাচ্ছিল না। আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ বিন রাবী আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কোথায়? বেঁচে আছেন নাকি শহীদ হয়ে গেছেন? মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুঁজে পেতে সফল হলেন। সাদ বিন রাবী আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু লাশের স্তূপের মাঝে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন। এই অবস্থায়ও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

তার শেষ কথাগুলো ছিল এই:
"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার সালাম জানাবেন এবং আরজ করবেন: আল্লাহ আপনাকে সেই প্রতিদানের চেয়েও উত্তম প্রতিদান দিন যা কোনো উম্মতের পক্ষ থেকে তার নবী লাভ করেছেন। আর মুসলমানদেরও সালাম জানিয়ে এই বার্তা দেবেন যে, যদি আপনাদের বেঁচে থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামান্যতম ক্ষতিও হয়, তবে আল্লাহর কাছে আপনাদের কোনো ওজর কবুল হবে না।"

এ কথা বলতে বলতে তার রূহ কবজ হয়ে গেল। [৩]

**হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লাশ:**

কুরাইশদের কিছু লোক লাশের অবমাননা করেছিল। নাক, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলেছিল। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বুক চিরে ফেলা হয়েছিল, চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। [৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা ছিল, তিনি আপনার দুধভাই এবং ঘনিষ্ঠ...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩৭০, দার হিজর

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪০৪৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে উহুদ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/২৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩২৫, ৩৩৪

বন্ধুও ছিলেন। তাঁর লাশের এই অবস্থা দেখে আপনি ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। বললেন: "এর মতো শোক আর কখনো পৌঁছাবে না।"

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু হযরত সাফিয়্যাহ (রা.) এই দুর্ঘটনার খবর শুনে দৌড়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন, তখন তৎক্ষণাৎ তাঁর সাহেবজাদা যুবাইর (রা.)-কে বললেন যে তাকে থামিয়ে দাও। যুবাইর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বললেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ চান না যে আপনি লাশটি দেখেন।"

তিনি বললেন: "আমার ভাইয়ের জন্য কাফনের দুটি কাপড় নিয়ে এসেছি, এগুলো নিয়ে নাও।"

মুসলমানরা যখন এই দুটি কাপড়ে হযরত হামযাহ (রা.)-কে কাফন পরাতে লাগলেন, তখন একজন আনসারীর ছিন্নভিন্ন লাশ নজরে এল। সাহাবায়ে কেরাম এটা মেনে নিতে পারলেন না যে তাঁকে কাফনহীন রাখা হবে। অবশেষে একটি কাপড়ে হযরত হামযাহ (রা.)-কে এবং অন্যটিতে সেই আনসারীকে কাফন দেওয়া হলো। [২]

## কে জিতল? কে হারল?

এই যুদ্ধে মুসলমানদের জানমালের ক্ষতি বেশি হয়েছিল, সেই হিসেবে কুরাইশরা বিজয় লাভ করেছিল। কিন্তু এই বিজয় ছিল অপূর্ণাঙ্গ, কারণ মুসলমানদের রাষ্ট্রও অবশিষ্ট ছিল এবং নেতৃত্বও। মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের পাশেই অবস্থান করছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ বন্দী হননি এবং কেউ আত্মসমর্পণও করেননি। সবচাইতে বড় কথা হলো, মুসলমানরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের আতা ও মাওলা ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন এবং কুরাইশরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। মক্কার মুশরিকরা তাদের এই দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল।

## গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুদের এই হীনম্মন্যতাকে আরও দৃঢ় করতে এবং মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য পরের দিনই কুরাইশ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহর নির্দেশও এটাই ছিল। এতে এই হিকমতও ছিল যে, কুরাইশরা যদি পরবর্তীতে মদীনায় আক্রমণ করার চিন্তা করে, তবে মুসলমানদের এই সাহস দেখে তারা তাদের সংকল্প ত্যাগ করবে।

---

[১] হযরত হামযাহ (রা.)-এর লাশের অবমাননা অবশ্যই হয়েছিল, তবে কোনো সহীহ বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়নি যে হিন্দ কলিজা বের করে চিবিয়েছিল। যদিও এই বর্ণনাটি মেনে নিতে কোনো শরয়ী বাধা নেই, কারণ এখানে কুফরের অবস্থার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যেখানে চরম শত্রুতার কারণে এমন জঘন্য কাজ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এই দিকটিও মাথায় রাখা উচিত যে, এই বর্ণনাটি শুধুমাত্র ইবনে ইসহাকের, যা সালিহ বিন কায়সান থেকে বর্ণিত। সালিহ নির্ভরযোগ্য ছিলেন কিন্তু তাঁর জন্ম ৭০ হিজরীতে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন না, তাই বর্ণনায় অবশ্যই ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। এই নেতিবাচক দিকটিও বিবেচনা করুন যে, সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচার হত্যাকারী ওয়াহশী (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পরেও তাঁর প্রতি এমন আন্তরিক দুঃখ পোষণ করতেন যে সারাজীবনে আর কখনো তাঁকে দেখা পছন্দ করেননি। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৭০) যদি হিন্দ (রা.) লাশের অবমাননা করতেন যা অনেক বেশি অমানবিক কাজ, তবে রাসূলের দরবারে তাঁর এমন সম্মান ও মর্যাদা হতো না। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় তাঁর বাড়িকে নিরাপদ স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণের পর আরজ করলেন যে, আগে আপনার দলের চেয়ে বেশি কারো অপমান আমার কাছে প্রিয় ছিল না কিন্তু এখন আপনার দলের চেয়ে বেশি কারো সম্মান আমার কাছে প্রিয় নয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন: "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার অবস্থাও ঠিক তেমনই।" (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৮২৫, কিতাবুল মানাকিব, যিকরে হিন্দ) তাঁর কাছ থেকে এমন নেক কথা বলা হয়েছে এবং অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে স্বামীর রাখা টাকা ঘরের প্রয়োজনীয় খরচে না বলে ব্যবহার করতে পারবেন। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৫৩৬০, কিতাবুল মাযালিম, বাবু কিসাসিল মাযলুম) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর স্বামী হযরত আবু সুফিয়ান এবং পুত্র হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আস্থাভাজন ছিলেন। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে এই বর্ণনাটি বনু সুফিয়ান পরিবারের চরিত্র হননের জন্য প্রচার করা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৪৬/৫

এমনটাই হলো। বেশ সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর কুরাইশদের বিজয়ী সরদাররা যখন তাদের অভিযান অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার বিষয়টি অনুভব করল, তখন তারা মদিনায় ঢুকে লুটতরাজ করার পরিকল্পনা করতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ তারা জানতে পারল যে, হুজুর ﷺ সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে তাদের পিছু ধাওয়া করছেন। এ কথা শুনে তারা এতটাই দিশেহারা হয়ে পড়ল যে, দ্রুত মক্কার দিকে রওনা দিল। হুজুর ﷺ তবুও হামরা আল-আসাদ পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করলেন।

যখন কুরাইশদের মক্কায় চলে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল, তখন হুজুর ﷺ ফিরে এলেন।

এই পশ্চাদ্ধাবনকে গাজওয়ায়ে হামরা আল-আসাদ বলা হয়। এতে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া বাকি সবাই তারাই ছিলেন যারা ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের অধিকাংশ ছিলেন আহত এবং ক্লান্ত-শ্রান্ত। তা সত্ত্বেও এই নতুন অভিযানের জন্য নিজেকে পেশ করা ছিল প্রাণোৎসর্গ, আনুগত্য এবং কুরবানির এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। [১]

**উম্মে আম্মারার জযবা:**

উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু আনহা যুদ্ধে বারোটি আঘাত পেয়েছিলেন। [২] তিনি বিছানায় পড়ে ছিলেন। ইবনে কুমাইয়ার হাতে তার কাঁধে লাগা আঘাতটি ছিল অত্যন্ত গভীর। এই সময়ে মদিনার অলিগলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা করলেন:

“’ইলাল হামরা আল-আসাদ’” (হামরা আল-আসাদের দিকে চলো)

উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই ডাক শুনে ওই অবস্থাতেই যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নিজেকে কাপড়ে ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্ষতগুলো ছিল টাটকা। সেগুলো থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সারা রাত তার ক্ষতস্থানে মলম ও পট্টি লাগানো হলো।

এই সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ হামরা আল-আসাদে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে তিনি তৎক্ষণাৎ একজন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে পাঠিয়ে তার খোঁজখবর নিলেন। যখন জানতে পারলেন যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। উম্মে আম্মারা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাঁধের ক্ষতটি এক বছর পর গিয়ে শুকিয়েছিল। [৩]

---

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪৩, ৭৩, দার তাইয়্যেবা, রিয়াদ

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৪১৩, ত. সাদির

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৪১৩

কয়েকটি গভীর ক্ষত

কুরাইশরা ওহুদ যুদ্ধে বিজয়ের পরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি, তারপর ফিরে এসে তারা বিজয়ের প্রভাবকে দীর্ঘস্থায়ী করার দিকেও কোনো মনোযোগ দেয়নি। এমনকি তারা সিরিয়াগামী কাফেলাগুলোর নিরাপত্তার জন্যও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা করতে পারেনি। দুই বছর পর্যন্ত তাদের মদিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস হয়নি। তবে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র অবশ্যই করেছিল এবং তাদের মিত্র বা প্রভাবশালী গোত্রগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের কয়েকটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

রাজী-র ট্র্যাজেডি:

৪ হিজরির সফর মাসে আযাল ও কারাহ গোত্রের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারের জন্য কয়েকজন শিক্ষক চাইলেন। [১] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসিম বিন সাবিত (রা.)-কে আমির নিযুক্ত করে দশজন সাহাবীর একটি দলকে ওই এলাকার দিকে রওনা করে দিলেন। এই অভিযানটি "ওয়াকিয়া-এ-রাজী" নামে পরিচিত। যখন এই ব্যক্তিবর্গ বনু লিহিয়ান এলাকার "রাজী" নামক ঝরনার কাছে পৌঁছালেন, তখন প্রায় একশ তীরন্দাজসহ তারা এই ব্যক্তিবর্গকে ঘিরে ফেলল এবং বলল:
"নিজেদেরকে আমাদের হাতে সঁপে দাও। আমাদের ওয়াদা যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না।"
আসিম বিন সাবিত (রা.) এটি শুনে তাঁর সাথীদের বললেন: "ভাইয়েরা! আমি কোনো কাফিরের ওয়াদার ওপর বিশ্বাস করি না। হে আল্লাহ! আমাদের অবস্থার খবর আপনার নবীকে পৌঁছে দিন।" এই কথা বলে তিনিসহ সাতজন সাহাবী যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁর লাশের অবমাননা করতে চাইল কিন্তু আল্লাহ তাআলা মৌমাছির একটি ঝাঁক পাঠিয়ে দিলেন যা তাঁর লাশকে ঘিরে রাখল এবং কাফিররা তা স্পর্শ করতে পারল না। [২] কাফিররা সকাল হওয়ার অপেক্ষা করল কিন্তু ওই রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হলো অথচ তখন বৃষ্টির মৌসুম ছিল না। লাশ বন্যার পানিতে ভেসে গেল। শহীদ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি কোনো মুশরিককে স্পর্শ করবেন না এবং কোনো মুশরিককেও তাঁর শরীর স্পর্শ করতে দেবেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের মাধ্যমে তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করলেন।

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/১৬৯, ১৭০।

ফায়দা: এখানে ওয়াকিদীর একটি বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার মতে, এই লোকেরা ছিল সেই সব যুবক যাদের কিছু নিকটাত্মীয় বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল সাহাবীদের বন্দি করে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দিতে এবং এভাবে নিজেদের প্রতিশোধ নিতে। (আল-মাগাযী লিল-ওয়াকিদী: ১/৩৫৪)

ফায়দা: সীরাত ইবনে হিশামে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আযাল ও কারাহ-র কয়েকজন প্রতিনিধি এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে দ্বীন শেখানোর জন্য শিক্ষক চাইলেন এবং তিনি সাহাবীদের পাঠালেন যেখানে তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়। (২/১৬৯) সহীহ বুখারীতে বলা হয়েছে যে, এই সাহাবীগণ দশজন ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের "আয়ন" অর্থাৎ সামরিক গোয়েন্দা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। "بعث النبي سرية عينا" (হাদিস: ৩০৮৬)

সাহাবীদের সংখ্যার দিক থেকে বুখারীর বর্ণনাটি অবশ্যই সঠিক। তবে যেখানে এই বিষয়ের সম্পর্ক যে এই ব্যক্তিবর্গ গোয়েন্দা ছিলেন নাকি শিক্ষক? তো এ ব্যাপারে সীরাত লেখকদের বর্ণনাকেও পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। এতে কোনো বাধা নেই যে, এই সাহাবীদের তাবলীগী দায়িত্বের সাথে সাথে এই দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল যে তারা ওই এলাকায় অবস্থান করে কুরাইশদের মিত্র গোত্রগুলোর গতিবিধির খবরও মদিনায় পাঠাতে থাকবেন। হাফিজ ইবনে কাসীর বুখারীর বর্ণনা এবং ইবনে ইসহাকের বর্ণনার মধ্যে এই মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত অবশ্যই করেছেন কিন্তু সীরাত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন: "من اراد المغازي فهو عيال على محمد بن اسحاق" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৫০১)

[২] সহীহ বুখারী, বাবু গাযওয়াতিল রাজী; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা: ৪৭; সীরাত ইবনে হিশাম: ২/১৬৯; আল-মাগাযী লিল-ওয়াকিদী: ১/৩৫৬।

খুবাইব, আবদুল্লাহ বিন তারিক এবং যায়েদ বিন দাসিনাহ (রা.) অবশিষ্ট ছিলেন। কাফেররা তাদের প্রাণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিল। তারা নিজেদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। কিন্তু কাফেররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাদেরকে বন্দী বানিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দিল। কুরাইশ নেতারা তাদেরকে কিনে নিল যাতে বদরে নিহত তাদের আত্মীয়-স্বজনদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে তাদেরকে হত্যা করতে পারে। [১]

**উচ্চতর ইসলামী নৈতিকতার একটি উদাহরণ:**

কুরাইশ নেতারা তাদের সবাইকে হত্যা করার জন্য হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। [২] খুবাইব (রা.) বদর যুদ্ধে হারিস বিন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। নিহতের ছেলেরা তাকে কিনে নিল এবং পায়ে শিকল পরিয়ে একটি ঘরে বন্দী করে রাখল। এই সময়ে মাঝে মাঝে তাকে তাজা আঙুর খেতে দেখা যেত, অথচ সেই সময়ে মক্কায় এই ফল একেবারেই ছিল না। এটি ছিল আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্য এবং সাহাবীর কারামত। অবশেষে মহরম মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হারাম মাসগুলো শেষ হলো এবং তাকে হত্যার প্রস্তুতি নেওয়া হলো।

খুবাইব (রা.) হত্যার আগে পশম পরিষ্কার করার জন্য একটি ক্ষুর চাইলেন যা তাকে দেওয়া হলো। এমন সময় হঠাৎ ঘরের একটি ছোট শিশু তার কাছে চলে গেল। তিনি তাকে কোলে বসিয়ে নিলেন। বাড়ির লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে বন্দীর হাতে ক্ষুর এবং শিশুটি তার কোলে। খুবাইব তাদেরকে ঘাবড়ে যেতে দেখে বললেন: “তোমরা কি ভয় পাচ্ছ যে আমি তাকে হত্যা করব? এমনটি কখনোই হবে না।”

খুবাইব (রা.)-এর কাছে প্রাণ বাঁচানোর এটিই ছিল শেষ সুযোগ যে এই শিশুটিকে জিম্মি করে পালিয়ে যেতেন, কিন্তু তিনি নিজের প্রাণের জন্য একটি শিশুকে ঢাল বানানোকে একটি হীন কাজ মনে করলেন এবং উচ্চতর ইসলামী নৈতিকতার ওপর কোনো কালিমা আসতে দিলেন না।

কাফেররা তাকে ধরে হারাম সীমানার বাইরে নিয়ে গেল। তিনি শাহাদাতের আগে দুই রাকাত নামাজ পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ আদায় করলেন এবং তারপর বললেন: “যদি এই ভয় না থাকত যে তোমরা বলবে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়েছি, তবে আমি দীর্ঘ নামাজ পড়তাম।”

হত্যার সময় তিনি এই ঐতিহাসিক কবিতাগুলো পাঠ করলেন:

وَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي

“যখন আমি মুসলমান হিসেবে নিহত হচ্ছি, তখন আমার পরোয়া নেই যে আল্লাহর খাতিরে আমি কোন পার্শ্বে লুটিয়ে পড়ছি।”

وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

“এটি আল্লাহর সত্তার জন্য এবং তিনি চাইলে একটি ছিন্নভিন্ন লাশের টুকরোগুলোর ওপর বরকত নাজিল করতে পারেন।” [৩]

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩০৮৬, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতুর রাজী; হা: ৩০৪৫, কিতাবুল জিহাদ।

[২] ইবনে হিশাম বলেন: খুবাইব তাদের হাতে বন্দী ছিলেন যতক্ষণ না হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হলো, তারপর তারা তাকে হত্যা করল: (সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/১৭৩)।

সতর্কবার্তা: অধিকাংশ সীরাত লেখক বর্ণনা করেন যে, এই দুর্ঘটনা ৪ হিজরীর সফর মাসে ঘটেছিল। কিন্তু এখানে একটি জোরালো সংশয় এই যে, সফরের পর বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত হারাম মাসগুলোর কোনো মাস আসে না যার কারণে কুরাইশরা বন্দীদের হত্যা বিলম্বিত করত। এর সমাধান হলো, এই সফর হলো মাদানী ক্যালেন্ডারের যা মক্কী ক্যালেন্ডারের যিলকদ মাসের সাথে মিলে যায়, যেমনটি ওয়াক্বিদীর বর্ণনায় “ফী শাহরিন হারাম ফী যিলকদ” শব্দগুলোও বিদ্যমান রয়েছে। (আল-মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী: ১/৩৫৪) এবং যিলকদ বিবেচনা করেই একে ৩ হিজরী গণ্য করা হয়েছে যদিও মাদানী ক্যালেন্ডারে ৪ হিজরীর দ্বিতীয় মাস চলছিল। সফর ৩ হিজরীও এভাবে হতে পারে যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে এই ঘটনা ওহুদ যুদ্ধের পরে। সহীহ বুখারীতে আছে: “ইন্নাহা বা’দা ওহুদ” (সহীহ আল-বুখারী, বাবু গাযওয়াতুর রাজী) এবং ওহুদ যুদ্ধ ৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে হয়েছিল। সুতরাং এই ঘটনা যিলকদ মোতাবেক সফর ৪ হিজরীর। মক্কাবাসীরা যিলকদ, যিলহজ এবং মহরম মাসে সাহাবীদের বন্দী করে রেখেছিল এবং সফর মাসে তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছিল যা মাদানী ক্যালেন্ডারে জুমাদাল উলা ৪ হিজরী।

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩০৪৫, ৩০৮৬, ৩০৮৭; আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২০/৩৫২, তবা মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া।

সাহাবী (রা.)-দের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার এক অপূর্ব ঝলক:

যায়েদ বিন দাসিনাহ (রা.)-কে হত্যা করার আগে আবু সুফিয়ান পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করল: "যায়েদ! তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ এখানে থাকতেন এবং তোমার জায়গায় তাঁকে হত্যা করা হতো?" যায়েদ (রা.) উত্তর দিলেন: "আল্লাহর কসম! আমি তো এটাও সহ্য করতে পারি না যে, তিনি তাঁর ঘরে থাকা অবস্থায় তাঁর পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধুক আর আমরা আমাদের ঘরে আরামে বসে থাকি।" আবু সুফিয়ান বলল: "আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের সাথীরা তাঁকে যেমন ভালোবাসে, আমি অন্য কাউকে এমন ভালোবাসতে দেখিনি।" এরপর যায়েদ বিন দাসিনাহ (রা.)-কে হত্যা করা হয়। এটি ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল (সফর মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) মাসের ঘটনা। [১]

**বির-এ-মাউনার বিয়োগান্তক ঘটনা**

এই সময়ে নজদ-এর একজন অমুসলিম নেতা আবু বারা (আমির বিন মালিক) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কিছু সাহায্যকারী চাইলেন যারা তার বিরোধী গোত্রগুলোকে বশ করবে এবং তাদের কাছে মদীনা রাষ্ট্রের পয়গাম পৌঁছে দিয়ে মিত্র বানাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নজদবাসীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, কিন্তু আবু বারা সব ধরনের আশ্বাস দিলেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলেন।

অবশেষে ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে [২] রাসূলুল্লাহ (সা.) সত্তর জন হাফেজ ও ক্বারী সাহাবীকে সেই দিকে পাঠালেন যারা ইবাদত ও সাধনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুনজির বিন আমর, হারাম বিন মিলহান, হারিস বিন আস-সিম্মাহ এবং আমির বিন ফুহাইরা (রা.)-এর মতো সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বির-এ-মাউনা নামক স্থানে আমির বিন তুফায়েল তাঁদের পথরোধ করল। হারাম বিন মিলহান (রা.) আমির বিন তুফায়েলকে বললেন: "তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশিত একটি কাজে যাচ্ছি। তোমরা কি আমাদের নিরাপত্তা দেবে না যাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পয়গাম পৌঁছে দিতে পারি?"

এই কথা বলে হারাম বিন মিলহান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্রটি তার সামনে পেশ করলেন, কিন্তু সেই হতভাগা সেটি দেখলও না; বরং কথা বলার মাঝখানে তার ইশারায় এক ব্যক্তি পেছন থেকে এসে হারাম বিন মিলহান (রা.)-এর পিঠে বর্শা বিদ্ধ করল। হারাম বিন মিলহানের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল: "ফুতু ওয়া রাব্বিল কাবা" ("কাবার রবের কসম! আমি সফল হয়ে গেলাম।") সাথে সাথে তিনি প্রবাহিত রক্ত নিজের মুখ ও মাথায় মেখে নিলেন। হারাম বিন মিলহান (রা.)-কে শহীদ করার পর আমির বিন তুফায়েল উসাইয়্যাহ, রি'ল এবং জাকওয়ান গোত্রের সমর্থকদের একত্রিত করল এবং বাকি সাহাবীদেরও ঘিরে ফেলল। এই মহান ব্যক্তিগণও তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। [৩]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ৩/১৭৩।

[২] বির-এ-মাউনার বিয়োগান্তক ঘটনা ঠিক সেই মাসেই ঘটেছিল যে মাসে রাজী-এর বন্দীদের কাফেররা হত্যা করেছিল, অর্থাৎ ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল, যা ৪ হিজরীর সফর মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[৩] সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবুল আউন বিল মাদাদ; কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতিল রাজী' ওয়া রি'ল ওয়া জাকওয়ান ওয়া বির-এ-মাউনা; সীরাত ইবনে হিশাম: ৩/১৮৩-১৮৫।

জাব্বার বিন সুলমি আমির বিন ফুহাইরা [রা.]-এর বুকে বর্শা বিদ্ধ করলেন। আমির বিন ফুহাইরা [রা.] প্রাণ ত্যাগ করার সময় বললেন: “ফুতু ওয়াল্লাহ” (আল্লাহর কসম, আমি সফল হয়েছি)। [১] তারপর তাঁর লাশ হঠাৎ আকাশের দিকে উপরে উঠে গেল, এমনকি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। এরপর পুনরায় নিচে নিজ জায়গায় ফিরে এল। [২] জাব্বার বিন সুলমি বলেন যে, আমি তদন্ত শুরু করলাম যে এটি কোন ধরনের সফলতা যার কারণে নিহত হওয়ার সময়ও তিনি আনন্দিত ছিলেন। অবশেষে মুসলমানরা তাঁকে জানালেন যে এটি শাহাদাতের সফলতা। এতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। [৩]

বি’রে মাউনা নামক স্থানে সাহাবীদের হত্যার সময় দুইজন সাহাবী: আমর বিন উমাইয়া [রা.] এবং মুনজির বিন মুহাম্মদ [রা.] উট চরাতে গিয়েছিলেন। তাঁরা দূরে আকাশে শিকারি পাখিদের উড়তে দেখে বিপদ অনুভব করে সেদিকে দৌড়ে গেলেন। কাছে পৌঁছে দেখলেন যে সাথীদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং অশ্বারোহীরা চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমর বিন উমাইয়া [রা.] বলতে লাগলেন: “আমরা কি গিয়ে রাসুলুল্লাহ-কে খবর দেব?”

কিন্তু মুনজির বিন মুহাম্মদ [রা.] বললেন: “যেখানে এই লোকেরা শহীদ হয়েছেন, আমি এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারি না।”

অবশেষে এই অবস্থায় উভয়ের ওপর শত্রু আক্রমণ করল। মুনজির [রা.] শহীদ হলেন আর আমর বিন উমাইয়া [রা.] জীবিত বন্দী হলেন। আমির বিন তুফাইল জানতে পারলেন যে আমর বিন উমাইয়া [রা.] মুদারি গোত্রের, তখন তিনি এই বলে যে “আমার মায়ের একজন গোলাম আজাদ করার মানত ছিল”, তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। [৪] এই দুর্ঘটনায় আমর বিন উমাইয়া [রা.] ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। একজন কাব বিন যায়েদ [রা.], যিনি গুরুতর জখম হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা তাঁকে মৃত মনে করে লাশের মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছিল। পরে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যান এবং পরের বছর খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। [৫] অন্য একজন ল্যাংড়া সাহাবী ছিলেন যিনি লড়াইয়ের আগে নিকটস্থ পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন এবং কাফেররা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। [৬] এই ঘটনা বি’রে মাউনা নামে প্রসিদ্ধ।

বি’রে মাউনার শহীদগণ প্রাণ ত্যাগ করার আগে এই দোয়া করেছিলেন:
“আলা বাল্লিগু আন্না ক্বাওমানা... বিআন্না ক্বাদ লাক্বিনা রাব্বানা... ফারাযিয়া আন্না ওয়া আরযানা।”
(আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও!... যে আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি... তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।)

হযরত জিবরাঈল [আ.] এই শব্দগুলো রাসুলুল্লাহ-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। [৭]

রাসুলুল্লাহ এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত শোকাহত হলেন এবং এক মাস পর্যন্ত কুনুতে নাযিলা পড়ে ঐ জালেমদের জন্য বদদোয়া করতে থাকলেন যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সাহাবীদের সাথে নিষ্ঠুরতা করেছিল। [৮] এর সাথে রাসুলুল্লাহ আমর বিন উমাইয়া যামরি [রা.]-কে একজন সাথীর সাথে গোপনে মক্কায় পাঠালেন যাতে আবু সুফিয়ানের কাজ শেষ করে দেওয়া যায়, কিন্তু আবু সুফিয়ানের তকদিরে ইসলামের দৌলত লেখা ছিল। মক্কাবাসীরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিল, আমর বিন উমাইয়া [রা.] এবং তাঁর সাথী অতি কষ্টে ফিরে এলেন। [৯]

---

[১] সিরাত ইবনে হিশাম: ২/১৮৭

[২] সিরাত ইবনে হিশাম: ২/১৮৬

[৩] সিরাত ইবনে হিশাম: ২/১৮৭

[৪] সিরাত ইবনে হিশাম: ২/১৮৫

[৫] সিরাত ইবনে হিশাম: ২/১৮৫

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ৩০৬৩, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাবু আল-আউন বিল মাদাদ; কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতুর রাজী ওয়া রিল ওয়া যাকওয়ান ওয়া বি’রে মাউনা।

[৭] প্রাগুক্ত।

[৮] সিরাত ইবনে হিশাম: ২/৬৩৩; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৩৩৩।

## পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোর অভিযান - জিহাদের ময়দান আরও বিস্তৃত

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে হত্যার এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলোতে আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের চরম আঘাত লেগেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমনটি করে কাফেররা চরম বোকামির প্রমাণ দিয়েছিল। এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা নিজেরাই সেই মহাসড়ক তৈরি করে দিয়েছিল যার মাধ্যমে মুসলমানরা দূর-দূরান্তের এলাকাগুলোতে আক্রমণ করতে পারত। আর ঠিক এমনটিই ঘটেছিল।

রাসূল ﷺ জালেমদের বিরুদ্ধে কেবল কুনুতে নাযেলার ওপরই ক্ষান্ত হননি, বরং বিদ্রোহী শক্তিগুলোকে দমন করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুতগামী সেনাদলকে সক্রিয় করে তোলেন। এই অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বনু লিহিয়ান ও তাদের মিত্র গোত্রসমূহ (আদল ও ক্বারা) ছাড়াও মক্কার নেতাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করা, যারা তিনজন সাহাবীকে হত্যা করার জন্য আদল ও ক্বারা গোত্রের কাছ থেকে ক্রয় করেছিল।

### গাযওয়ায়ে বনু লিহিয়ান:

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং দুইশত মুজাহিদকে সাথে নিয়ে, যাদের মধ্যে বিশজন অশ্বারোহী ছিলেন, অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পূর্ব দিকে যাত্রা করেন এবং নজদ এলাকার "দুগাইব" বা "দুগাইব আশ-শাম" পর্যন্ত পৌঁছে যান। আসিম বিন সাবিত (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের রক্তে হাত রঞ্জিতকারী বনু লিহিয়ান যখন এই অগ্রযাত্রার খবর পেল, তখন তারা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের জনপদ ছেড়ে পালিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করল। [১] এরপর রাসূল ﷺ উসফান পর্যন্ত যান, যা মক্কা থেকে মাত্র ৩৬ মাইল (৫৮ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। [২] এই অভিযানকে গাযওয়ায়ে বনু লিহিয়ান বলা হয়। এই দ্রুততম অভিযানটি মাত্র চৌদ্দ দিনে সম্পন্ন হয়েছিল।

### হযরত আবু বকর (রা.)-এর মক্কার উপকণ্ঠ পর্যন্ত আক্রমণ:

এবার রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা.) দশজন অশ্বারোহী নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী উপত্যকা "গামিম" পর্যন্ত পৌঁছে যান। মক্কাবাসীদের কাছে যখন এই খবর পৌঁছাল, তখন তারা এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, মুসলমানরা তাদের উপকণ্ঠ পর্যন্ত আক্রমণ করতে পারে। [৩]

### নজদ ও বাতনে উরনায় হানা:

কিছু বেদুইন গোত্রের ধারণা হয়েছিল যে, মুসলমানরা উহুদ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে বনু আসাদ নজদে এবং বনু হুযাইল মক্কার নিকটবর্তী বাতনে উরনায় দলবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারা পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উভয় দিকে সারিয়া পাঠিয়ে দেন। বনু আসাদ ভীত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, অন্যদিকে বনু হুযাইলের সরদার...

---

[১] আল-মাগাযী লিল ওয়াকিদী: ২/৫৩৬; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৭৭, টীকা সহ।
ওয়াকিদী এই অভিযানের তারিখ রবিউল আউয়াল ৬ হিজরি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু খলিফা বিন খাইয়াতের বক্তব্যই অধিক গ্রহণযোগ্য, যারা এই ঘটনাটি জমাদিউল উলা ৪ হিজরির অধীনে বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের প্রতারণা করে হত্যার ঘটনাগুলো ৪ হিজরিতেই ঘটেছিল। এই ঘটনার অপরাধীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেওয়া জরুরি ছিল, একে দুই বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করা সম্ভব ছিল না।
[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৭৭, টীকা সহ।
[৩] আল-মাগাযী লিল ওয়াকিদী: ২/৫৩৯; ওয়াকিদীর মতে, রওনা হওয়া থেকে মদিনায় ফিরে আসা পর্যন্ত পুরো অভিযানটি চৌদ্দ দিনে সম্পন্ন হয়েছিল। এই অভিযানের তারিখ ২১ জমাদিউস সানি ২ হিজরি দেওয়া হয়েছে যা মক্কা সফরের পরবর্তী সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা হয় যে, এই অভিযানটি সফরের শেষে শুরু হয়েছিল এবং রবিউল আউয়ালের শুরুতে সম্পন্ন হয়েছিল।

খালিদ বিন সুফিয়ান হযরত আবদুল্লাহ বিন উনাইস (রা.)-এর সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়। [১]

**এই অভিযানগুলোর প্রভাব:**

এই অভিযানগুলোর ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের শক্তি কমার পরিবর্তে দিন দিন বাড়তে দেখা গেল। এর আগে ইসলামের পতাকা হিজাজের একটি সীমিত এলাকায় উড়ছিল, কিন্তু রাজী'র ঘটনা এবং বি'রে মাউনার ট্র্যাজেডি পূর্বদিকের অঞ্চলগুলোতে আক্রমণের যৌক্তিকতা তৈরি করে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ৪ এবং ৫ হিজরিতে বেশ কিছু সারিয়্যাহ প্রেরণ করেন এবং অনেক অভিযানে নিজেই নেতৃত্ব দেন। এই অভিযানগুলো বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে এবং স্বয়ং মক্কাবাসীদের এমনভাবে আতঙ্কিত করে দিল যে, তাদের একবারও প্রকাশ্যে মোকাবিলা করার সাহস হলো না।

**জিহাদের সময় ইসলামের দাওয়াত:**

জিহাদের এই সফর ইসলামের দাওয়াতের দিক থেকেও ফলপ্রসূ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম চরিত্র এবং দয়া ও করুণা সব জায়গায় অমলিন ছাপ রেখে গেছে। নজদ থেকে ফেরার পথে এক তপ্ত দুপুরে কাফেলা এমন এক উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করল যেখানে যত্রতত্র কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় ছিল। সাহাবায়ে কেরাম ছায়া খোঁজার জন্য এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের তলোয়ার একটি ঝোপের ডালে ঝুলিয়ে দিলেন এবং নিজে তার নিচে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ এক বেদুইন অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে পৌঁছে গেল। সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তলোয়ার খাপ থেকে বের করে নিল। শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চোখ খুলে গেল। দেখলেন বেদুইন তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে হুঙ্কার দিয়ে বলল: "তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" আপনি (সা.) অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বললেন: "আল্লাহ!"

বেদুইন দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করল এবং আপনি (সা.) প্রতিবারই এই একই উত্তর দিলেন। বেদুইনের ওপর এমন ভীতি ভর করল যে, তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তলোয়ার তুলে নিলেন এবং বললেন: "এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?"

সে লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল: "আপনি একজন উত্তম পাকড়াওকারী হোন।"

আপনি (সা.) বললেন: "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?"

সে বলল: "না, তবে আমার ওয়াদা রইল যে, আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করব না এবং সেই কওমের সাথী হব না যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে।"

ইতিমধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ঘুম থেকে জেগে সেখানে চলে এলেন, দেখলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন অপরিচিত বেদুইনকে পাশে বসিয়ে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের পুরো ঘটনা শোনালেন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি (সা.) তাকে শাস্তি দেননি এবং ক্ষমা করে দিলেন। সে নিজের কওমের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহান চরিত্রের কথা উল্লেখ করল এবং বলল: "আমি শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে ফিরে আসছি।" [২]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/৫০, ৫১

এই অভিযানের তারিখও সফর ২ হিজরি বর্ণনা করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে ভুল, এবং জমাদিউল আউয়াল ৩ হিজরি অনুযায়ী সঠিক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নিজে বনু লিহইয়ানের দিকে বের হচ্ছিলেন, তখন আপনার নির্দেশে সাহাবীদের একটি দল এই অন্য দিকে আক্রমণ করছিল।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩৯৩৯; সহীহ বুখারী, হা: ২৯১০, কিতাবুল জিহাদ, হা: ১১৩৬; সহীহ মুসলিম, হা: ৬০৯০

## ইহুদীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান: গাযওয়ায়ে বনু নাযীর

নজদ অভিযান থেকে ফেরার পর বাহ্যিক বিপদের তীব্রতা কমে গিয়েছিল। এখন রাসূল [সা.] অভ্যন্তরীণ বিপদ দমনের জন্য মদীনার দক্ষিণে বসবাসকারী বনু নাযীর গোত্রের ইহুদীদের বহিষ্কার করা জরুরি মনে করলেন। কারণ এই ছিল যে, মদীনার সনদ অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধে ইহুদীরা মুসলমানদের সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু তারা নিরপেক্ষ থেকে চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল। এটি রাসূল [সা.]-এর দূরদর্শিতা ছিল যে, তিনি বিভিন্ন ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে একসাথে ব্যবস্থা নেননি, বরং একের পর এক সুযোগ বুঝে শাস্তি দিয়েছেন এবং তাও তখন যখন তাদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গ ও উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে বনু কায়নুকা এক মুসলিম নারীর সম্মানে হাত দেওয়ার জঘন্য অপরাধ করেছিল, তাই তাদের যথাসময়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

বনু নাযীরের প্রধান সালাম বিন মিশকাম মক্কার কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু রাসূল [সা.] ধৈর্য ধারণ করছিলেন, তবে এবার সে ক্ষমার অযোগ্য ধৃষ্টতা দেখাল। রাসূল [সা.]-কে কোনো একটি মামলার বিষয়ে তাদের ওখানে ডাকা হলো এবং আলোচনার সময় আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলো। রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রাসূল [সা.] তৎক্ষণাৎ মুজাহিদদের তলব করলেন এবং ১২ই রবিউল আউয়াল ৪ হিজরীতে বনু নাযীরের দুর্গগুলো অবরোধ করলেন। ২৩ দিন পর বনু নাযীর আত্মসমর্পণ করল। তাদের নির্বাসনের দণ্ড দেওয়া হলো, তাদের মধ্যে কেউ মদীনার উত্তর-পূর্বে ৯০ মাইল (১৪৪ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত "খায়বার"-এর দিকে রওনা হলো এবং কেউ সিরিয়ার সীমান্তের দিকে চলে গেল। [১]

### গাযওয়ায়ে বদরুল মাওঈদ (যিলকদ ৪ হিজরী):

গাযওয়ায়ে বনী লিহিয়ান এবং গাযওয়ায়ে বনু নাযীর দ্বারা কুরাইশদের ওপর এমন ভীতি সঞ্চার হয়েছিল যে তারা মুসলমানদের একটি বড় শক্তি হিসেবে গণ্য করতে শুরু করল। যিলকদ ৪ হিজরীতে যখন নবী আকরাম [সা.] কুরাইশদের সেই চ্যালেঞ্জের জবাবে যা তারা উহুদ যুদ্ধের শেষে দিয়েছিল, দেড় হাজার সাহাবীর সাথে বদর প্রান্তরে পৌঁছালেন, তখনও কুরাইশরা ময়দানে নামার সাহস করতে পারেনি এবং তাদের বাহিনী মাররুজ জাহরান পর্যন্ত এসে ফিরে গেল। মুসলমানরা আট দিন পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে থাকল কিন্তু কুরাইশদের মোকাবিলায় আসার কথা ছিল না, তারা আসেনি। মুসলমানরা নিজেদের সাথে বাণিজ্যিক পণ্যও নিয়ে এসেছিল। তারা বদরের বাজার থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে ফিরে এল। [২]

### আবু রাফে হত্যা (যিলহজ ৪ হিজরী):

খায়বারের ইহুদী প্রধান আবু রাফে সালাম বিন আবিল হুকাইক তার দুর্গটিকে নতুন উদ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। এই খবরগুলো মদীনায় পৌঁছাতে থাকল। অবশেষে রাসূল [সা.]-এর নির্দেশে আবদুল্লাহ বিন আতিক [রা.] কয়েকজন সঙ্গীর সাথে তাকে হত্যা করতে গেলেন। সন্ধ্যায় তারা দুর্গের বাইরে এমনভাবে বসে রইলেন যেন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে বের হয়েছেন। দারোয়ান দরজা বন্ধ করার আগে তাদের দুর্গের বাসিন্দা মনে করে ডাকল যে ভেতরে চলে এসো। তারা ভেতরে চলে গেলেন এবং কোনো এক কোণে লুকিয়ে রইলেন।

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/ ১৯০ থেকে ১৯২; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ২/ ৫৭; আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১৩। এটি রবিউল আউয়াল ছিল যা জমাদিউল আখিরা মাদানী অনুযায়ী ছিল।

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/ ২০৯; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ২/ ৫৯, ৬০। এই ঘটনাটি শাবান (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১৩) অনুযায়ী যিলকদ মাদানী ছিল।

https://t.me/BoierSomahar

রাতে সুযোগ পেয়ে আবু রাফের শয়নকক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে হত্যা করে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। পড়ে যাওয়ার কারণে তাঁর পায়ের নলা ভেঙে গেল। বাকি সাথীরা তাঁকে মদিনায় নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পায়ের ওপর বরকতময় হাত বুলালেন, ফলে ক্ষতের কোনো চিহ্নও আর অবশিষ্ট থাকল না। [২]

**উত্তরের দিকে অভিযানসমূহ (৫ হিজরি)**

৫ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরের দিকেও অভিযান পাঠানো শুরু করেন। এই ধারার প্রথম অভিযানটি হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-এর নেতৃত্বে সিরিয়ার মহাসড়কে অবস্থিত ওয়াদিউল কুরা-র দিকে পাঠানো হয়। এখানকার সর্দার হুনাইদ বিন আরিজের দস্যুবৃত্তি সিরিয়ার মহাসড়ককে অনিরাপদ করে তুলেছিল। যায়েদ বিন হারিসা পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই সংঘর্ষে হুনাইদ নিহত হয় এবং তার ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। [১]

**গাযওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল:**

২৫ রবিউল আউয়াল ৫ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এক দীর্ঘ সফরে বের হন এবং উত্তরে দুমাতুল জানদালের উপকণ্ঠ পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করেন, যা মদিনা থেকে মাত্র পাঁচ মঞ্জিল দূরে ছিল এবং ইরাক, সিরিয়া ও আরবের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর জন্য একটি সংযোগস্থল হিসেবে বিবেচিত হতো। এই এলাকার স্থানীয় গ্রামবাসী যাদের 'নাবতি' বলা হতো, তারা সিরিয়া থেকে ছাতু ও জয়তুনের তেলসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হিজাজে আসত। কিন্তু সেই দিনগুলোতে রোমানরা তাদের সেনাবাহিনী সীমান্তে নিয়ে আসছিল এবং নাবতিদের বাণিজ্যে বাধা দিচ্ছিল, যার নেতিবাচক প্রভাব মদিনার অর্থনীতির ওপর পড়ছিল। এটাও শোনা যাচ্ছিল যে, রোমানরা মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। এমন পরিস্থিতিতে জরুরি ছিল যে, নিজে এগিয়ে গিয়ে রোমানদের জাযিরাতুল আরবের সীমান্তে উস্কানি দেওয়া থেকে বিরত রাখা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র এক হাজার মুজাহিদ নিয়ে এই অভিযানে বের হন। অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখার জন্য কেবল অপরিচিত পথই অবলম্বন করা হয়নি, বরং সফরও কেবল রাতে করা হতো। বনু উযরার একজন পথপ্রদর্শক মুসলমানদের পথ দেখাচ্ছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুর মাথার ওপর গিয়ে পৌঁছালেন এবং হঠাৎ তাদের গবাদিপশু ও রাখালদের ওপর আক্রমণ করলেন। রোমানরা এই হামলার খবর শোনামাত্রই তাদের আস্তানা ছেড়ে পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশেপাশের জনপদগুলোতে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে তাদের থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং কয়েক দিন অবস্থানের পর ফিরে আসার যাত্রা শুরু করেন; কারণ পেছনে কেন্দ্রের (মদিনার) দেখাশোনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০ রবিউস সানি রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের দীর্ঘতম এবং দ্রুততম সফর। এই যুদ্ধ কেবল জাযিরাতুল আরবের উচ্চভূমি পর্যন্ত ইসলামের প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত করেনি, বরং ইরাকের পারস্য সীমান্তরক্ষী এবং সিরিয়া শাসনকারী বাইজেন্টাইন রোমান শাসকদেরও এই অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছিল যে, আরবে অচিরেই মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। [২]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩০৩৯, ৪০৩৯, বাবু কতলি আবি রাফে। ওয়াক্বিদীর মতে এই অভিযান ৩ হিজরি বা ৪ হিজরির। (আল-মাগাযী: ১/৩৯১) ইবনে সা'দের মতে ৪ হিজরির রমজান মাসের। (ত্বাবাক্বাত: ২/৯১) ৪ হিজরির উক্তিটি নিশ্চিতভাবেই ভুল। বাকি পার্থক্য মক্কী ও মাদানী ক্যালেন্ডারের কারণে। এই বছর মাদানী যিলহজ মাস মক্কী রমজান মাসের সাথে মিল ছিল।

[২] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ৭৭; ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ: ২/৮৮; ইবনে সা'দ এর তারিখ জমাদিউল আখিরা ৬ হিজরি উল্লেখ করেছেন।

[৩] আল-মাগাযী লিল ওয়াক্বিদী: ১/৪০২, ৪০৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৯৬, এর তারিখ ওয়াক্বিদী উল্লেখ করেছেন। (টীকা ও নাম্বারে পার্থক্য রয়েছে)

## গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক এবং ইফকের ঘটনা (শাবান ৫ হিজরী)

জুমাদিউল আখিরা ৫ হিজরীতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। [১] শাবান ৫ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) দক্ষিণে "মুরাইসী" ঝরনার দিকে রওনা হলেন যেখানে বনু মুস্তালিকের সরদার হারিস বিন আবি যিরার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছিল। [২] রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিপক্ষ প্রস্তুত হওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। এক তীব্র সংঘর্ষের পর বনু মুস্তালিক অস্ত্র সমর্পণ করল। এই সুযোগে বনু মুস্তালিকের সরদার হারিস বিন যিরারের কন্যা জুওয়াইরিয়া ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী করীম (সা.) সম্মানস্বরূপ তাঁকে বিবাহ করলেন এবং মুসলমানরা এই আত্মীয়তার সম্মানে বনু মুস্তালিকের সমস্ত যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিল এবং গনীমতের মাল ফেরত দিল। হারিস বিন যিরারও গোত্রসহ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং খাঁটি মুসলমান হিসেবে প্রমাণিত হলেন। [৩]

### মুনাফিকদের কারসাজি:

যেহেতু এই যুদ্ধে লড়াইয়ের ঝুঁকি কম এবং গনীমতের মাল পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল, তাই আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিকদের একটি বড় দল নিয়ে ইসলামী লস্করে শামিল হয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে মুসলমানদের এখন আর কোনো বহিঃশক্তি দমন করতে পারবে না, তাদের অভ্যন্তরীণভাবে ভেঙে দিয়েই কেবল দুর্বল করা সম্ভব। তাই এই যুদ্ধে সে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বালানোর সুযোগ খুঁজতে থাকে। মুসলমানরা বনু মুস্তালিককে পরাজিত করে তখনও "মুরাইসী" ঝরনার পাড়ে অবস্থান করছিল, এমন সময় একদিন ঝরনা থেকে পানি ভরার সময় একজন মুহাজির এবং একজন আনসারীর মধ্যে কোনো এক বিষয়ে ঝগড়া বেধে গেল। একজন সাহায্যের জন্য চিৎকার করে বলল: "হে মুহাজিরগণ!" অন্যজন ডাকল: "হে আনসারগণ!" কিন্তু বিষয়টি বাড়ার আগেই রাসূলুল্লাহ (সা.) খবর পেয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলেন এবং বললেন: "এসব স্লোগান ছেড়ে দাও। এগুলো দুর্গন্ধযুক্ত।" [৪]

---

[১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৭/১২, এটি মাদানী ক্যালেন্ডার যা ৬ নভেম্বর ৬২৬ খ্রিস্টাব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[২] গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিককে গাযওয়ায়ে মুরাইসীও বলা হয়। এর সাল নির্ধারণে দুটি মত রয়েছে: একটি ইবনে ইসহাকের যে, এটি ৬ হিজরীতে হয়েছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/২৮৯) দ্বিতীয়টি হলো এটি শাবান ৫ হিজরীর ঘটনা। (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/৬৩) অনেক ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মত গ্রহণ করে এই যুদ্ধকে ৬ হিজরীর অধীনে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটি সঠিক মনে হয় না। কারণ এই যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ইফকের ঘটনা ঘটেছিল যাতে বিখ্যাত আনসারী সাহাবী সাদ বিন মুয়াজ (রা.) জীবিত ছিলেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, অধ্যায়: যারা অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে পছন্দ করে)। তিনি যিলকদ ৫ হিজরীতে ইয়াহুদী বনু কুরাইযার ফয়সালা করার পর ইন্তেকাল করেছিলেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায়: আহযাব থেকে নবীর প্রত্যাবর্তন)। সুতরাং যদি গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক ও ইফকের ঘটনাকে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী ৬ হিজরীতে ধরা হয়, তবে সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাফসীরের বর্ণনাটি আলাদা হয়ে যাবে যেখানে সাদ বিন মুয়াজ ইফকের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শিরশ্ছেদ করার অনুমতি চাচ্ছেন। এই বর্ণনাটি সাক্ষী যে ইফকের ঘটনা এবং গাযওয়ায়ে মুরাইসী সাদ বিন মুয়াজের জীবদ্দশায় হয়েছিল অর্থাৎ গাযওয়ায়ে খন্দকের আগে। একারণেই হাফেজ যাহাবী "তারীখুল ইসলাম"-এ ৫ হিজরীর অধীনে প্রথমে গাযওয়ায়ে মুরাইসী ও ইফকের ঘটনা এবং এরপর গাযওয়ায়ে খন্দকের উল্লেখ করেছেন।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/১৮১, এই সফর ছিল ২৯ দিনের: ২ শাবান (সোমবার) রওনা এবং ১ রমজান প্রত্যাবর্তন হয়েছিল। (আল-মাগাযী লিল ওয়াকিদী: ১/৪০৪)

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৫১৮, ৪৯০৫, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল-মুনাফিকুন; সহীহ মুসলিম, হা: ৬৫৮৬, আল-বিররু ওয়াস সিলাহ, অধ্যায়: ভাইয়ের সাহায্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী শুনে মুসলমানরা তো শান্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই এই ঘটনাকে উস্কানি দেওয়ার মাধ্যম বানিয়ে নিল। সে আনসারদের মুহাজিরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল, সে বলল: “এসব তোমাদেরই কর্মফল, তোমরা তাদের নিজেদের শহরে জায়গা দিয়েছ, নিজেদের সম্পদে তাদের অংশীদার বানিয়েছ। তাদের সাথে তোমাদের আচরণ এই প্রবাদের বাস্তব রূপ যে, তুমি তোমার কুকুরকে খাইয়ে খাইয়ে মোটা করো আর সে তোমাকেই কামড়ে ধরবে। যদি তোমরা তাদের খরচ বহন করা ছেড়ে দাও, তবে এই লোকেরা নিজেরাই পালিয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! মদিনায় পৌঁছে সম্মানিত ব্যক্তিরা নীচ লোকদের বের করে দেবে।”

একজন অল্পবয়স্ক সাহাবী যায়েদ বিন আরকাম (রা.) এই কথোপকথন শুনে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবকিছু জানিয়ে দিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) উত্তেজিত হয়ে অনুমতি চাইলেন যে, গিয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের শিরশ্ছেদ করে দেবেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে নিষেধ করে দিলেন যে, লোকেরা বলবে মুহাম্মদ তার নিজের লোকদেরই হত্যা করিয়ে দেয়। যা-ই হোক, আবদুল্লাহ বিন উবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, সে কসম খেয়ে নিজেকে নির্দোষ জাহির করল এবং বলল: “হয়তো এই বাচ্চার কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।” যেহেতু একের পর এক দুটি অপ্রীতিকর ঘটনায় লস্করের মধ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছিল, তাই হুজুর ﷺ নিয়ম বহির্ভূতভাবে লস্করকে অবিলম্বে মদিনার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন।

এটি ছিল বিকেলের সময়, লস্কর সারা রাত সফর করতে থাকল। সকাল পর্যন্ত মানুষ ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু হুজুর আকদাস ﷺ কাফেলাকে থামতে দিলেন না। যখন দিন হয়ে গেল এবং রোদের তীব্রতা বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রাবিরতি করলেন। এই দ্রুত গতির কারণে মানুষ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, যাত্রাবিরতি করতেই ঘুমিয়ে পড়ল এবং কারো গতকালের ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করার সুযোগই হলো না। আর এটাই ছিল হুজুর আকদাস ﷺ-এর উদ্দেশ্য, যাতে একে অপরের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলা এবং গীবতের পরিবেশ তৈরি হতে না পারে। [১]

লস্কর মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছানোর আগে আরও দুটি ঘটনা ঘটল: একটি হলো, এক রাতে কোথাও যাত্রাবিরতির সময় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কাফেলা থেকে দূরে চলে গেলেন, সেখানে তাঁর গলার হারটি ছিঁড়ে পড়ে গেল। তিনি সেটি খুঁজছিলেন, এমন সময় কাফেলা রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেল এবং লোকেরা তাঁর হাওদা উঠিয়ে উটের পিঠে রেখে দিল। যেহেতু তিনি হালকা গড়নের ছিলেন, তাই তিনি হাওদায় নেই—তা অনুভব না করেই কাফেলা রওনা হয়ে গেল।

যখন তিনি যাত্রাবিরতির স্থানে ফিরে এলেন, তখন কাফেলার দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো চিহ্ন ছিল না। উম্মুল মুমিনীন সেখানেই অবস্থান করলেন, সৌভাগ্যবশত একজন সাহাবী সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল (রা.) পেছন থেকে আসছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীনকে নিজের উটে বসিয়ে নিলেন এবং নিজে পায়ে হেঁটে তাঁকে লস্কর পর্যন্ত নিয়ে এলেন। [২]

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই ঘটল যে, সূরা আল-মুনাফিকুন নাযিল হলো, যাতে আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া হলো। কুরআন মজিদ ইবনে উবাইয়ের সেই ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যগুলো পর্যন্ত উদ্ধৃত করে দিল, যা যায়েদ বিন আরকাম (রা.) আপনার ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ইবনে উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ (রা.), যিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন, নিজের বাবার এই গুরুতর অপরাধের কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে অনুমতি চাইলেন যে, নিজের বাবার মাথা কেটে নিয়ে আসবেন। আপনি নিষেধ করলেন। তা সত্ত্বেও তিনি রাগ ও অনুশোচনার মিশ্র...

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/২৯০, ২৯১

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৬৬১, কিতাবুশ শাহাদাত, বাব তা’দীলুন নিসা

এই অবস্থায় তলোয়ার কোষমুক্ত করে মদিনার পথে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন পিতার সওয়ারি এল, তখন তাকে থামিয়ে বললেন:

“আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি নিজের মুখে বলবে যে তুমি হীন এবং মুহাম্মদ ﷺ সম্মানিত।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন, তখন পুনরায় নম্রতার তাকিদ দিলেন। [১]

**সানিহা-এ-ইফক (মিথ্যা অপবাদের ঘটনা):**

মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে মুসলমানরা তাদের স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে শুরু করলেন। সালাত, দ্বীনি শিক্ষার আসর এবং ইসলামের দাওয়াতের কার্যক্রম সবই চলছিল, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের যে অপমান হয়েছিল, তার ফলে সে আহত সাপের মতো ছটফট করছিল। তখন তার মাথায় এই শয়তানি পরিকল্পনা এল যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর এক রাতে লশকর থেকে পেছনে পড়ে যাওয়া এবং সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল (রা.)-এর সাথে ফিরে আসাকে নবুওয়াতের ঘরের অবমাননার বাহানা বানানো হোক। ইবনে উবাই এই শয়তানি ফন্দি কার্যকর করল এবং সেই রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ও হযরত সাফওয়ান (রা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ করতে শুরু করল। এই কথা মদিনাবাসীদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। অধিকাংশ সাহাবী এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেন এবং একে একটি জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ বলে অভিহিত করলেন; তবে কিছু সহজ-সরল মুসলমান বিশ্বাস করে নিলেন যে হয়তো এমনটিই হয়েছে। তারা এসব কথা বর্ণনাও করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদের জ্বালানো এই আগুন দেখে দুঃখ ও শোকে নিমজ্জিত হলেন। আপনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে মুনাফিকরা আপনার নম্রতা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের এই প্রতিদান দেবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে মসজিদে একত্রিত করলেন এবং সেখানে এই ঘোষণা দিলেন যে, আমার নিজের স্ত্রী এবং আমার সাহাবী সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল (রা.)-এর ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সাহাবীগণও উম্মুল মুমিনীন-এর পবিত্রতা ও আভিজাত্যের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। আউস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুয়াজ (রা.) বললেন: “এই ধরনের কথা ছড়ানোর লোক যদি আউস গোত্রের কেউ হয়, তবে আমরা তার শিরচ্ছেদ করব; আর যদি খাযরাজ গোত্রের হয়, তবে আপনি যা আদেশ করবেন, আমরা তা পালন করব।”

খাযরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন উবাদাহ (রা.), যিনি অন্যান্য সাহাবীদের মতো এই ঘটনার কারণে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন, তিনি একে নিজের গোত্রের প্রতি কটাক্ষ মনে করলেন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর পাল্টা জবাব দিলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মুনাফিকদের ইচ্ছা অনুযায়ী দুই গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যেত এবং মুসলমানদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিস্থিতি সামলে নিলেন এবং নেতাদের শান্ত করে মুসলমানদের ঐক্য বজায় রাখলেন। আপনি ﷺ আজেবাজে কথা রটনাকারীদের শিরচ্ছেদ করার অনুমতি এই জন্য দেননি যে, এই জঘন্য অপবাদের বিষয়ে আপনি ওহীর অপেক্ষায় ছিলেন যা সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) অনেক দিন পর জানতে পারলেন যে তাকে নিয়ে কী ধরনের কুৎসা রটানো হচ্ছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করার সাহস করতে পারলেন না; কারণ আপনি ﷺ নিজের দুঃখে এতটাই অস্থির ছিলেন যে পরিবারের সদস্যদের সাথে হাসি-কথা বলা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের পিত্রালয়ে চলে এলেন।

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/২৯১, ২৯২।

এখানে মায়ের কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল যে তার বিরুদ্ধে কী তুফান সৃষ্টি হয়েছে। শুনে তিনি শোকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে গেলেন। অবশেষে এক মাস পর ওহী নাযিল হলো। [১] আল্লাহ তাআলা সূরা আন-নূরের ষোলটি আয়াত (১১ থেকে ২৬) নাযিল করে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পবিত্রতার সাক্ষ্য দিলেন এবং শেষে বললেন:

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

"তারা সেই অপবাদ থেকে মুক্ত যা (তাদের সম্পর্কে মুনাফিক) লোকেরা বলছে।"

এভাবে মুনাফিকদের অপবিত্র ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। আসমানী ফয়সালা নবুওয়াতের পরিবারের ওপর আরোপিত অভিযোগের প্রতিরক্ষা করে উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা দ্বিগুণ করে দিল। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন মাজীদে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নির্দোষিতা নাযিল হওয়ার পর তার ওপর অপবাদ দানকারী সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের বাইরে; কারণ সে কুরআনের আয়াত অস্বীকারকারী। [২]

এই আয়াতগুলোতেই পবিত্র নারী ও পুরুষদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে যারা এই অপবাদ রটনা করেছিল, তাদের আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। [৩] শরীয়তে একে "হদ্দে কাযফ" বলা হয়। ইসলামী আইন মুসলিম নর-নারীর পবিত্রতার ওপর প্রমাণ ছাড়া আঙুল তোলাকে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করে মুসলমানের সম্মান ও মর্যাদাকে এমন সুরক্ষা প্রদান করে যার নজির বিশ্বের কোনো সমাজে, কোনো সংস্কৃতিতে এবং কোনো আইনে পাওয়া যায় না। [৪]

ইফকের ঘটনায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাশারিয়াত (মানবীয় সত্তা)-এর পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সেখানে মুহাম্মাদী রিসালাতের সত্যতাও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে অসাধারণ সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়ে নিজের ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় ওহী আনতে পারেননি। যদি আপনার প্রতিটি বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকত, তবে আপনি দ্রুততম সময়ে ওহী নিয়ে আসতেন। যদি আপনি আল্লাহর মতো "আলেমুল গায়েব" এবং সব জায়গায় "হাযির ও নাযির" হতেন এবং আপনার সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামেরও এই আকিদা থাকত, তবে এই সমস্ত পেরেশানি ও অস্থিরতার কোনো প্রশ্নই উঠত না। মদীনার ওপর এতদিন ধরে এমন গুরুতর অবস্থা বিরাজ করত না। অমুসলিমদের ভাবা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাদের ধারণা অনুযায়ী নিজের মন থেকে ওহী বানিয়ে নিতেন (নাউযুবিল্লাহ), তবে এই বিষয়ে এত দেরি কেন করলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে ওহী বানিয়ে শুনিয়ে দিতেন এবং বিষয়টি শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এমনটি হয়নি; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সত্য নবী। তিনি ওহী তখনই শোনাতেন যখন আসমান থেকে তা নাযিল হতো।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ২৬৬১, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু তা'দীলিন নিসা; সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/ ২৯৭ থেকে ৩০৭। সহীহ বুখারীতে এখানে "কদ মাকাসতু শাহরান" শব্দগুলো থেকে জানা যায় যে এই ঘটনার সময়কাল ছিল এক মাস, যদিও চল্লিশ দিনের সময়কাল প্রসিদ্ধ কিন্তু তা নির্ভরযোগ্য নয়।

[২] قد اجمع العلماء قاطبة على ان من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد الذى ذكر فى هذه الآية فانه كافر لانه معاند للقرآن। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩/ ৩২৩, সূরা আন-নূর)

[৩] মাজমাউয যাওয়ায়েদ লিল হাইসামী, হা: ১৫৩০০

[৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আন-নূর, ৩ থেকে ৯-এর অধীনে।

গজওয়ায়ে খন্দক (শাওয়াল ৫ হিজরি / ফেব্রুয়ারি ৬২৭ খ্রি.)

এ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মক্কার মুশরিক, ইহুদি এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর সমস্ত যুদ্ধ আলাদা আলাদাভাবে হয়েছিল। কাফেররা বুঝতে পেরেছিল যে কোনো একক শক্তি ইসলামের পথ রোধ করতে পারবে না, তাই ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের কথা চিন্তা করতে শুরু করল। এই পরিকল্পনার মূল হোতা ছিল বনু নাজিরের সেই ইহুদি নেতারা যাদের কিছুকাল আগে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে হুয়াই ইবনে আখতাব ছিল অগ্রগণ্য। এই নেতারা প্রথমে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতাদের সাথে মিলিত হয়ে মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের চুক্তি করে। এরপর তারা মদিনার দক্ষিণ-পূর্বে নজদ সীমান্তে বসবাসকারী গাতাফানের যোদ্ধা গোত্রগুলোর সাথে দেখা করে এবং তাদেরও এই জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে সফল হয়। [১]

৫ হিজরির শাওয়াল মাসের শেষের দিকে মিত্রবাহিনীর প্লাবন মদিনা মুনাওয়ারার দিকে ধেয়ে আসে। কুরাইশরা তাদের যুবক, মিত্র গোত্র এবং আহাবীশদের মধ্য থেকে চার হাজার যুবকের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিল যাদের মধ্যে তিনশ অশ্বারোহী ছিল। বনু গাতাফান সাতশ যোদ্ধা পেশ করেছিল যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল উয়াইনা ইবনে হিসন। বনু মুররার চারশ সৈন্যের সেনাপতি ছিল হারিস ইবনে আউফ। বনু ফাজারা, বনু সুলাইম, বনু আসাদ এবং বনু সুলাইমের বাহিনীগুলোও সাথে যোগ দিল। এভাবে আক্রমণকারীদের সংখ্যা দশ হাজারে গিয়ে পৌঁছাল। [২] কুরাইশ সেনাপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কাছে সমস্ত বাহিনীর সাধারণ কমান্ড ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিত্রবাহিনীর রওয়ানা হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। দক্ষিণে বাগানের দেয়াল এবং পূর্ব ও পশ্চিমে 'হাররাহ'-এর দুর্গম টিলাগুলো আক্রমণকারীদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। তাই আসল বিপদ ছিল উত্তর দিক থেকে। সাধারণ অবস্থায় এখানে কেবল পরিখা খনন করেও প্রতিরক্ষা করা সম্ভব ছিল এবং যদি শত্রু শহরে ঢুকে পড়ত তবে শহরের গলিতে গলিতে অবস্থিত আনসারদের কেল্লা সদৃশ বাড়িগুলো থেকে তাদের ওপর পাথর ও তীর নিক্ষেপ করে তাদের নাস্তানাবুদ করা যেত, যেমনটি ওহুদ যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাথমিক পরিকল্পনাও ছিল। [৩]

কিন্তু এখন শত্রুর জনশক্তি এত বেশি এবং প্রস্তুতি এত পূর্ণাঙ্গ ছিল যে এই সাধারণ প্রতিরক্ষা কৌশলগুলো কার্যকর হতে পারত না। খোলা ময়দানে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ওহুদ যুদ্ধে সামনে এসেছিল, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে শহর রক্ষার বিষয়ে পরামর্শ করেন যেখানে কেবল বড়রাই নয়, সাধারণ সাহাবীদেরও মতামত পেশ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৬৫/২

[২] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি: ২৮২, ২৮৩/১; তাদমুনি

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩৩৭/৫

https://t.me/BoierSomahar

পারস্য থেকে আসা সালমান ফারসি (রা.)-এর প্রস্তাব ছিল সবার থেকে আলাদা। তিনি জানালেন যে, পারস্যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে পরিখা খনন করে আক্রমণকারীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই পরামর্শ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং তারপর কোনো বিলম্ব ছাড়াই তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি ছিল সেই সময়ের একটি উন্নত যুদ্ধকৌশল যার সাথে আরবরা পরিচিত ছিল না। [১]

**খন্দকের নকশা তৈরি ও খনন:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কয়েকজন মুহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে বের হলেন এবং মদিনার আশপাশে টহল দিয়ে প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত নকশা তৈরি করলেন। আপনি নির্দেশ দিলেন যে মুজাহিদগণ, যাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, তারা যেন সল' পাহাড়ের পাদদেশে ছাউনি ফেলেন এবং মদিনার পূর্ব দিকের টিলা "হাররাহ ওয়াকিম" থেকে পশ্চিম দিকের টিলা "হাররাহ ওয়াবরাহ" পর্যন্ত ধনুকের আকৃতিতে একটি দীর্ঘ পরিখা খনন করেন। [২]

খননের আগে পুরো এলাকাটি পরিমাপ করা হয়েছিল যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল (সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার)। এই দীর্ঘ অংশে পরিখা খননের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) চিহ্ন দিলেন এবং সীমানা নির্ধারণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তিন হাজার সাহাবী ছিলেন, আপনি দশ দশ জনের দল গঠন করলেন এবং ত্রিশ ত্রিশ মিটার এলাকা খননের দায়িত্ব প্রতিটি দলের ওপর অর্পণ করলেন। [৩]

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রত্যেকেই শক্তিশালী ও প্রবাসী সাহাবী সালমান ফারসি (রা.)-কে নিজের দলে নিতে চাচ্ছিলেন। মতভেদ এতটাই বাড়ল যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ফয়সালা করতে হলো, তিনি বললেন: "সালমান আমাদের আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।" [৪]

পরিখার গভীরতা পনেরো ফুট এবং প্রস্থ প্রায় ত্রিশ ফুট রাখা হয়েছিল, যাতে কোনো অশ্বারোহীও তা সহজে পার হতে না পারে। [৫] যেহেতু সময় কম ছিল তাই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাজ শুরু করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) সময়ের নাজুকতা উপলব্ধি করে সবাইকে এই কাজে লাগিয়ে দিলেন। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক ছিল যে কোনো শিশু বা বৃদ্ধ এই কাজ থেকে পিছিয়ে থাকতে পারেনি। [৬]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩/৬, ১৪

[২] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ২/৩১৮, তাবা ইলমিয়্যাহ; মারওয়িয়াতু গাজওয়াতি খন্দক লিদ-দুকতুর ইবরাহিম আল-মাদহালি: ১/১৯৬, তাবা ইমাদাতুল বাহাসিল ইলমি

[৩] খাত্তুল খন্দক বাইনা কুল্লি আশারাতিন আরবাঈনা জিরাআন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/৩৬) আল্লামা শিবলী নোমানী লিখেছেন যে দশ দশ জন মানুষের মধ্যে দশ গজ জমি বণ্টন করা হয়েছিল কিন্তু আরবাঈনা জিরাআন দশ গজ নয়, বিশ মিটার হয়; কারণ এক জিরা দেড় ফুটের হয় এবং চল্লিশ জিরা-র আয়তন ষাট ফুট বা বিশ মিটারের সমান হবে।

[৪] আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ৬/২১২, তাবা মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া

[৫] আহদে নববী কে ময়দানে জং, ডক্টর হামিদউল্লাহ মরহুম, পৃ. ৬৮, তাবা ইদারা ইসলামিয়াত লাহোর; সীরাতুন নবী (সা.), আল্লামা শিবলী নোমানী: ১/২৩৬

[৬] ওয়াকানু বি-আজমাঈহিম মান বালাগ ওয়া মান লাম ইয়াবলুগ ইয়ামালুনা ফিহি। (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ২/৩২২)

গাজওয়ায়ে খন্দক ৫ হিজরিতে হয়েছিল, তবে মাস ও দিনের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ ৮ জিলকদ তারিখ নির্ধারণ করেছেন যা ভুল। হাফেজ ইবনে কাসীর ইমাম জুহরি ও ইমাম মালিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে যুদ্ধ শাওয়াল ৫ হিজরিতে হয়েছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/১০) ইবনে হাবিব যুদ্ধের সময়কাল বৃহস্পতিবার ১১ শাওয়াল থেকে ১ জিলকদ পর্যন্ত বলেছেন। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ৭৩) ক্যালেন্ডারের হিসাবে এটিই সঠিক। (তাকভীমে মুহাম্মদী, পৃ. ৯৭) এছাড়া মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ-ও এর সমর্থক। "মুহাজির ও আনসারগণ কনকনে শীতের সকালে খনন কাজ করছিলেন।" (সহীহ বুখারী, হা: ২৮৩৪, কিতাবুল জিহাদ, বাবুত্তাহরীজি আলাল কিতাল)

যুদ্ধের আগে পরিখা খনন কারো মতে এক মাস পর্যন্ত এবং ইমাম নববীর বক্তব্য অনুযায়ী পনেরো দিন পর্যন্ত জারি ছিল। (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ২/৩২২) ইমাম নববীর বক্তব্যই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় এবং সেই হিসাবে খনন ২৫ রমজানে শুরু হয়েছিল। সৌর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১ শাওয়াল (মাদানি) ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ পরিখা খনন ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত হয়েছিল। অবরোধের মোট সময় তিন সপ্তাহ ধরা হলে যেমনটি অধিকাংশ বর্ণনায় রয়েছে, তবে অবরোধ ৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ছিল। সুতরাং যুদ্ধের সূচনা শাওয়াল মাসে হওয়ার বক্তব্যটিই অগ্রগণ্য যা খনন কাজ শীত মৌসুমে হওয়ার সহীহ হাদিস এবং সৌর ক্যালেন্ডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুদ্ধের শেষ দিনগুলো অবশ্যই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ছিল কিন্তু সেই সময় যে অপ্রত্যাশিত ঝড় ও শীত এসেছিল তা ছিল অস্বাভাবিক এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গায়েবি সাহায্য ছিল।

যদি কাউকে সামান্য সময়ের জন্যও কোনো কাজে যেতে হতো, তবে তিনি রাসূল ﷺ-এর অনুমতি ছাড়া যেতে পারতেন না। [১]

যারা শক্তিশালী যুবক ছিলেন তারা কোদাল ও বেলচা দিয়ে মাটি খুঁড়ছিলেন। বাকি লোকেরা মাটি তুলে তুলে কিনারায় জমা করছিলেন, যার ফলে খন্দকের ভেতরের কিনারায় প্রায় ছয় ফুট উঁচু একটি বাঁধ তৈরি করা হচ্ছিল। [২]

মাটি বহনকারীদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর মতো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাড়াহুড়োর কারণে সবাই ঝুড়ি পাননি, তাই হযরত আবু বকর صديق এবং হযরত উমর ফারুক (রা.) নিজেদের কাপড়ে করে মাটি বহন করছিলেন। [৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাজের তদারকি এবং সাহাবীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য খন্দকের কাছে একটি পাহাড়ের ওপর তাবু খাটিয়ে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। খন্দক যেখানে যেখানে কোনো পাহাড়ি অংশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল, সেখানে পাহাড়গুলোর ওপর মুজাহিদদের পাহারা বসিয়ে চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল। রাসূল ﷺ-ও খন্দক সংলগ্ন এমনই একটি চৌকিতে অবস্থান করছিলেন।

পরবর্তীতে স্মারক হিসেবে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় যা 'মসজিদ জুবাব' নামে পরিচিত। এই চৌকিগুলোর সামনে প্রয়োজনে খন্দক পার হওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল যাতে মুসলমানদের মধ্য থেকে কাউকে গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদির জন্য শত্রুদের দিকে যেতে হলে যেতে পারে। এমন পথ বা সেতুকে 'বাব' নাম দেওয়া হয়েছিল। মসজিদ জুবাব মূলত ছিল 'জু বাব', অর্থাৎ 'দরজাবিশিষ্ট'। এর অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবু যেখানে মসজিদ জু বাব অবস্থিত, এমন এক স্থানে ছিল যার সামনে খন্দকের ওপর দরজা লাগানো ছিল যা সেতু ইত্যাদির আকৃতির হবে, তাই এই স্থানকে জু বাব বলা হতো। [৪]

রাসূল ﷺ দশজন লোকের একটি দলের সাথে ব্যক্তিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে কেবল খননকাজেই অংশগ্রহণ করতেন না বরং মাটি তুলে ফেলার কাজেও অংশ নিতেন। এগুলো ছিল প্রচণ্ড শীতের দিন এবং শহরে খাদ্যদ্রব্যের মজুদ খুব কমে গিয়েছিল, তাই সাহাবায়ে কেরামের পেট ভরে খাবারও জুটত না, তবুও তারা খন্দক খননের কাজে পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে শরিক ছিলেন। খননকাজ প্রতিদিন খুব ভোরে শুরু হতো এবং অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকত। [৫]

**রাত্রিকালীন অতর্কিত হামলা প্রতিরোধের ব্যবস্থা:**

এই সময়ে মুশরিকদের অগ্রসর হওয়ার খবর ক্রমাগত আসছিল এবং খননকাজ শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগে মনে হচ্ছিল যে মুশরিকদের অগ্রবর্তী দলগুলো যেকোনো রাতে অতর্কিত হামলা শুরু করে দেবে। সম্ভাব্য রাত্রিকালীন হামলা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"যদি তোমাদের ওপর রাতে অতর্কিত হামলা করা হয় তবে (আপনজনদের চেনার জন্য) সংকেত বাক্য হবে 'হা-মীম, লা ইউনসারুন'।" [৬]

---

[১] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ১৩, ১২

[২] আহদে নববী কে ময়দানে জং, ডক্টর হামীদুল্লাহ মরহুম, পৃ. ৬৮

[৩] মাগাযী লিল ওয়াকিদী: ২/৩৩৯, ত. দারুল ইলমী; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ২/৪৩০

[৪] আহদে নববী কে ময়দানে জং, পৃ. ৬৬

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬/১০ থেকে ১৫

[৬] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৬৭৯৯

## সাহাবীদের রণসঙ্গীত ও প্রশংসামূলক কবিতা:

আক্রমণের পূর্বে খনন কাজ সম্পন্ন করার জন্য মুসলিমরা তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করছিলেন। নবী আকরাম ﷺ সাহাবীদের এই কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট দেখে তাদের সাহস বাড়াতেন এবং বলতেন:

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ، فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

“হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন তো আখেরাতেরই জীবন, অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।”

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুআ শুনে নিজেদের ভালোবাসা ও উদ্দীপনা প্রকাশ করে এই রণসঙ্গীত (রজয) পাঠ করতেন:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

“আমরা তারা যারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব চিরকালের জন্য।” [১]

মাটি বহন করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবী আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনসারী (রাযি.)-এর এই কবিতাগুলো পুনরাবৃত্তি করতেন:

وَاللّٰهِ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

“আল্লাহর কসম! আল্লাহর তাওফীক না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না... না সদকা-খয়রাত করতাম, না সালাত আদায় করতাম।”

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

“অতএব হে ইলাহী! আপনি আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করুন... আর যদি মোকাবিলা হয় তবে আমাদের কদমগুলোকে অটল রাখুন।”

اِنَّ الْاُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

“নিশ্চয়ই এই লোকেরা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে... তারা যখনই আমাদের পরীক্ষা করতে চাইবে, আমরা হার মানব না।”

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সুর মিলিয়ে পুনরাবৃত্তি করতেন “আমরা হার মানব না।” [২]

## পূর্ব ও পশ্চিম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী:

খনন কাজের সময় এক জায়গায় শক্ত পাথর সামনে এল। সাহাবায়ে কেরাম তা ভাঙতে অক্ষম হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসে খবর দিলেন। তিনি নিজে উপস্থিত হলেন এবং কোদাল দিয়ে সেই শক্ত পাথরের ওপর তিনটি আঘাত করলেন। তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। [৩]

পাথরের ওপর আঘাত করার সময় প্রতিবার কিছু আলোকচ্ছটা চমকে উঠল।

হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন: “এই চমক কিসের ছিল?”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “আল্লাহ আমাকে প্রথম আঘাতে ইয়ামেন, দ্বিতীয় আঘাতে শাম (সিরিয়া) ও পশ্চিম এবং তৃতীয় আঘাতে পূর্ব বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন।” সাহাবায়ে কেরাম এটি শুনে খুশিতে তাকবীরের ধ্বনি দিলেন। [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ২৮৩৪, কিতাবুল জিহাদ, বাব আত-তাহরীদ আলাল কিতাল; হা: ৪০৯৯, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে খন্দক।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪১০৩, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে খন্দক।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪১০১, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে খন্দক।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬/৩২, দারু হিজর।

অবস্থা এই ছিল যে, সাহাবীগণ তিন দিন ধরে কিছু খাননি। [১] মুনাফিকরা যারা নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাথে ছিল, তারা আজেবাজে কথা বলতে লাগল যে, প্রাণের সংশয় দেখা দিয়েছে অথচ পূর্ব ও পশ্চিম বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে। [২]

**একজন সাহাবীর বাড়িতে দাওয়াত এবং মুজিযার প্রকাশ:**

বাস্তবতা এই ছিল যে, সেই সময় হুজুর আকদাস ﷺ নিজেও অনাহারে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ওয়াদার ওপর তাঁর এবং সত্যবাদী মুসলমানদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দিন নবী আকরাম ﷺ-এর নূরানী চেহারায় অনাহারের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করলেন, যা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। দ্রুত বাড়ি গেলেন যাতে কিছু রান্না করাতে পারেন, কিন্তু সেখানেও সামান্য কিছু যব এবং একটি ছাগলছানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর স্ত্রী দ্রুত সেই যব পিষে আটা মাখলেন এবং ছাগলছানাটি জবাই করে চুলার ওপর হাঁড়ি চড়িয়ে দিলেন। এদিকে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর ﷺ-এর খিদমতে এসে আরজ করলেন যে, আমি কিছু খাবার তৈরি করছি, আপনি এক-দুজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে তাশরীফ আনুন।

হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: “খাবার কতটুকু?”

তিনি পরিমাণ জানালে হুজুর ﷺ বললেন: “বেশ ভালোই আছে।”

তারপর হুজুর ﷺ সেখানে উপস্থিত সমস্ত মুহাজির ও আনসারকে সাথে নিলেন এবং হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুটির ছোট ছোট টুকরো করলেন, নিজে রুটি ও সালন বের করে করে সবাইকে দিতে থাকলেন। এরা প্রায় আটশ জন লোক ছিলেন যারা তৃপ্তিসহকারে খেয়ে উঠলেন, কিন্তু জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাঁড়ি একইভাবে সালনে পূর্ণ ছিল এবং রুটিও অবশিষ্ট ছিল। [৩]

পনেরো দিনের দিনরাত পরিশ্রমের পর অবশেষে খন্দক খনন সম্পন্ন হলো। [৪]

**আহযাবের আগমন এবং মদীনা অবরোধ:**

ওদিক থেকে কুরাইশ বাহিনীও আত্মপ্রকাশ করল এবং ওহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে মদীনার উত্তরে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের সাথে আহাবীশ, বনু গাতফান, বনী কিনানা, নজদ ও তিহামার মুশরিকরাও ছিল। নিজেদের সামনে একটি গভীর ও প্রশস্ত খন্দক খনন করা দেখে তারা অবাক হয়ে গেল এবং বলল: “আল্লাহর কসম! এটি এমন এক যুদ্ধকৌশল যা এর আগে আরবরা কখনো প্রয়োগ করেনি।” [৫]

নবী আকরাম ﷺ অবিলম্বে পনেরো বছরের কম বয়সী সমস্ত শিশু যারা এ পর্যন্ত খনন কাজে শরীক ছিল, তাদের মহিলাদের সাথে আনসারদের কেল্লা সদৃশ বাড়িগুলোতে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বেশিরভাগ মহিলা ও শিশুদের ‘উতুম হাসসান’-এ রাখা হয়েছিল, [৬] যা...

---

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ: খণ্ড ১ / ৩৬৮, ত. আর-রুশদ

[২] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ৮৬৩: ১, তারিখুত তাবারী: ৫০৭/২

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪১০৩, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে খন্দক

[৪] আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩৩২/২, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২২৩/২

[৬] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৩৯৮, ফাযাইলুস সাহাবা, ফাযাইলু তালহা ওয়ায যুবাইর

...মদীনার সবচেয়ে প্রশস্ত ইমারত ছিল এবং হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর সম্পত্তি ছিল। [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এখন খন্দকের পেছনে জাবালে সাল-এর সাথে তাঁবু ফেলে সৈন্য সমাবেশ করলেন যাতে কাফেরদের তীরন্দাজি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আপনার নিজের তাঁবু এই পাহাড়ের উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানেই সালাত আদায় করতেন। পরবর্তীতে স্মারক হিসেবে সেখানে মসজিদ-এ-ফাতাহ নির্মাণ করা হয়েছে যা আজও বিদ্যমান। [২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাজির ও আনসারদের দুটি আলাদা দল গঠন করলেন; যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-কে মুহাজিরদের এবং সাদ বিন উবাদাহ (রা.)-কে আনসারদের আমির নিযুক্ত করে তাদের হাতে পতাকা প্রদান করলেন এবং খন্দকের কিনারায় পরিখা খনন করালেন। এর পাশাপাশি আপনি মাসলামা বিন আসলাম (রা.)-কে দুইশ লোকের সাথে মদীনা পাহারার জন্য নিযুক্ত করলেন যাতে পেছন থেকে শহরে কোনো আক্রমণ না হতে পারে। বিশেষ করে বনু কুরাইজা যেন কোনো অনিষ্ট করতে না পারে। [৩]

**বনু কুরাইজার ষড়যন্ত্র:**

মদীনায় এখন ইহুদিদের মাত্র একটি গোত্র বনু কুরাইজা অবশিষ্ট ছিল এবং শহরের অভ্যন্তর থেকে তারা মুসলমানদের ওপর আঘাত হানতে পারত। এদিকে কুরাইশরা বনু কুরাইজাকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করার জন্য বনু নাজিরের প্রধান হুয়াই বিন আখতাবকে গোপনে পাঠাল। সে গিয়ে বনু কুরাইজাকে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিল। তারা শুরুতে অস্বীকার করলেও যখন হুয়াই বিন আখতাব তাদের এই বলে আশ্বস্ত করল যে, কুরাইশ এবং তাদের মিত্ররা এবার মুসলমানদের নির্মূল না করে দম নেবে না, তখন বনু কুরাইজা মিত্রদের সাথে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেল। [৪]

এই খবর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছেও পৌঁছে গেল। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল বনু কুরাইজার বিদ্রোহ। মদীনায় লড়াইরত সমস্ত সৈন্য ছিল মাত্র তিন হাজার, যারা অতি কষ্টে দশ হাজার সশস্ত্র শত্রুর সামনে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রন্ট সামলে রেখেছিল। তাদের মধ্য থেকে কোনো অংশকে সরিয়ে বনু কুরাইজার মোকাবিলায় লাগানো সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে বনু কুরাইজার যোদ্ধার সংখ্যা সাতশ'র কম ছিল না। তারা যদি আক্রমণ করত তবে পুরো শহরে রক্তের নদী বইয়ে দিত। মুসলমানদের স্ত্রী ও সন্তানরা তাদের বন্দি হয়ে যেত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসারদের দুই সম্মানিত নেতা সাদ বিন মুয়াজ এবং সাদ বিন উবাদাহ (রা.)-কে বনু কুরাইজার সাথে আলোচনার জন্য পাঠালেন। কিন্তু সেই হতভাগারা অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করল এবং বলল:

"আমরা জানি না আল্লাহর রাসূল কে। আমাদের সাথে তার কোনো অঙ্গীকার বা চুক্তি নেই।"

এই শব্দগুলো ছিল প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার ঘোষণা। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের দূতদের পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি ইহুদিদের আনুগত্য অটুট দেখো তবে ফিরে এসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করবে (যাতে সবার মনোবল বৃদ্ধি পায়), কিন্তু যদি পরিস্থিতি এর বিপরীত হয় তবে ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণনা করবে।

---

[১] ওফাউল ওফা, আলী বিন আব্দুল্লাহ আস-সামহুদী (মৃ. ৯১১ হি.): ১/১৬৭, ত: আল-ইলমিয়্যাহ।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৩১৬, দার হিজর; আহদে নববী কে ময়দানে জং, ড. হামিদুল্লাহ মরহুম, পৃ. ৭২।

[৩] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ২/৩২২, ত: আল-ইলমিয়্যাহ।

[৪] তারিখুত তাবারী: ২/৫৬৫।

সুতরাং এই ব্যক্তিবর্গ ফিরে এসে ইশারায় বললেন: “আযাল এবং কারাহ।” [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি শুনে কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু অন্যদেরকে হতাশ হওয়া থেকে বাঁচাতে বললেন: “হে মুসলমানগণ! তোমাদের জন্য বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ।” [২]

অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল, মুনাফিকরা এখন আপনার ﷺ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে যাচ্ছিল, বাহানা ছিল এই যে ঘরগুলো অনিরাপদ। আপনি ﷺ উপেক্ষা করে তাদের যেতে দিচ্ছিলেন। [৩]

এদিকে বনু কুরাইজার পক্ষ থেকে ইতিবাচক উত্তর পাওয়ার সাথে সাথেই মিত্রবাহিনী খন্দকের চারপাশের অবরোধ আরও কঠোর করে ফেলেছিল এবং তীর নিক্ষেপ ও পাথর বর্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদের খন্দক থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিল। মুসলমানরা সমানতালে শহর রক্ষা করছিলেন এবং পাল্টা নিশানার মাধ্যমে তাদের খন্দকের কাছে আসতে বাধা দিচ্ছিলেন। একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুশরিকদের আক্রমণের চাপ এত বেশি ছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের তিন ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। [৪]

এই পরিস্থিতিতে পেছন থেকে শহরবাসীদের ওপর বনু কুরাইজার আক্রমণের আশঙ্কা ক্রমাগত লেগে ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো দৃঢ় হৃদয়ের মানুষের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি বারবার সাল’ পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘুরে ঘুরে মদিনার দিকে তাকাতেন এবং যখন নীরবতা অনুভব করতেন তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন যে এখনও বনু কুরাইজা আক্রমণ করেনি। [৫]

**হযরত সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব এবং জুবায়ের ইবনুল আওয়াম-এর বীরত্ব:**

কিন্তু বাস্তবতা ছিল এই যে, বনু কুরাইজা কেবল মদিনার জনপদে অতর্কিত হামলার প্রস্তুতিই নেয়নি, বরং সেই সব হাভেলি বা অট্টালিকাগুলোর দিকেও কিছু সশস্ত্র লোক পাঠিয়েছিল যেখানে নারী ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছিল, যাতে তারা যাচাই করতে পারে যে হাভেলিগুলোর নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন আছে কি না। আর যদি থাকে তবে কতজন?

তাদের মধ্যে একজন ইহুদি হযরত হাসসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হাভেলির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল যা ছিল সবচেয়ে বড় এবং সুরক্ষিত দুর্গের মতো ভবন। সেই সময় এখানে কেবল নারী ও শিশুরাই ছিল, পুরুষদের মধ্যে হাসসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু হযরত সাফিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হাভেলির ছাদে দাঁড়িয়ে নজরদারি করছিলেন। তিনি ইহুদিটিকে চক্কর দিতে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন, প্রথমে হযরত হাসসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন: “আপনি গিয়ে তাকে মেরে ফেলুন, অন্যথায় সে গিয়ে অন্য ইহুদিদের খবর দিয়ে দেবে যে এই হাভেলির নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই।”

---

[১] অর্থাৎ ইহুদিদের মতোই তারাও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরা সেই গোত্র ছিল যারা ৩ হিজরিতে তবলিগ ও শিক্ষার জন্য পাঠানো কিছু সাহাবায়ে কেরামকে শহীদ করেছিল। (ফাতহুল বারী: ৭/৩৮০ রেওয়ায়েত ইবনে ইসহাক) এই ঘটনা আমরা আগে সহীহ বুখারীর বরাতে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি, সীরাতে ইবনে হিশামে এটি বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৩৫৬ ও ৩৮

[৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ১৩

[৪] সুনানে নাসাঈ আল-মুজতাবা, হা: ৬৬২, কিতাবুল আযান

[৫] মাগাযী লিল ওয়াকিদী: ২/৪৬০, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ বৈরুত

কিন্তু তারা বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে সাহস করতে পারছিলেন না। অবশেষে সাফিয়া (রা.) নিজেই একটি ভারী বাঁশের লাঠি নিলেন, ধীরে ধীরে প্রাসাদের দরজা খুললেন, পা টিপে টিপে বাইরে বের হলেন এবং পেছনের দিক থেকে গিয়ে ইহুদির ওপর এমনভাবে একের পর এক আঘাত করলেন যে সে সেখানেই মারা গেল। [১]

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) বনু কুরাইজার গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি হাতের তালুতে প্রাণ নিয়ে একাকী ঘোড়া ছুটিয়ে মদিনা থেকে অতিক্রম করে বনু কুরাইজার দুর্গ পর্যন্ত যেতেন, পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতেন এবং তারপর সরাসরি খন্দকে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অবহিত করতেন। তাঁর এই বীরত্ব দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: "তোমার ওপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক।" [২]

**নওফেল বিন আবদুল্লাহ নিহত হওয়া:**

মুশরিকদের পক্ষ থেকে খন্দকের ওপর আক্রমণ অব্যাহত ছিল। আবু সুফিয়ান, আমর ইবনুল আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরিমা বিন আবি জাহল এবং কুরাইশের অন্যান্য নামী-দামী সর্দাররা অশ্বারোহীদের নিয়ে পালাক্রমে আক্রমণ করত। একদিন তাদের এক বিখ্যাত সর্দার নওফেল বিন আবদুল্লাহ খন্দক পার হওয়ার চেষ্টায় ঘোড়াসহ খন্দকের মধ্যে পড়ে গেল। মুসলমানরা ওপর থেকে তাকে পাথর মারতে শুরু করলে সে চিৎকার করে বলল: "হে আরব! তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা এর চেয়ে উত্তম।"

একথা শুনেই হযরত আলী (রা.) তলোয়ার হাতে খন্দকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এমন আঘাত করলেন যে তার দুই টুকরো হয়ে গেল। মুশরিকদের কাছে তার মৃত্যু ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বার্তা পাঠাল যে নওফেলের লাশ আমাদের কাছে হস্তান্তর করুন, আমরা এর বিনিময়ে দশ হাজার দিরহাম দিতে প্রস্তুত আছি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিনিময় নিতে অস্বীকার করলেন এবং সাহাবীদের বললেন: "লাশ তাদের দিয়ে দাও। এটিও অপবিত্র এবং এর বিনিময়ও (অপবিত্র)।" [৩]

**আনসারদের কুরাইশের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার:**

অবরোধ যত দীর্ঘ হচ্ছিল, মদিনাবাসীদের কষ্ট দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অস্থিরতাও তত বাড়ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই আশঙ্কাও ছিল যে আনসাররা যেন সাহস হারিয়ে না ফেলে। তাই তিনি শত্রুদের দুর্বল করার জন্য তাদের দুই নেতা: উয়াইনা বিন হিসন এবং হারিস বিন আউফ, যারা গাতফান গোত্রের সর্দার ছিল, তাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করলেন এবং তাদের এই প্রস্তাব দিলেন যে তারা যদি তাদের দলবলসহ কুরাইশদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়, তবে তাদের মদিনার ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। এই দুই সর্দার কুরাইশদের থেকে লুকিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দেখা করল এবং সন্ধিতে আগ্রহ প্রকাশ করল, কিন্তু সাথে সাথেই জেদ ধরল যে আমরা ফসলের অর্ধেক নেব। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক-তৃতীয়াংশের বেশি দিতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে গাতফানি সর্দাররা এতেই রাজি হয়ে গেল।

---

[১] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৮৬৬, ২৮৬৭।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৯৪, ফাযায়েলুস সাহাবা, ফাযায়েলু তালহা ওয়া যুবাইর (রা.)।

[৩] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ২/৩৩১; আরও বর্ণনা করেছেন ইবনে আবি শাইবা সংক্ষেপে, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হা: ৩৭৮২৩।

https://t.me/BoierSomahar

হয়ে গেলেন। চুক্তির বয়ান লিখে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু স্বাক্ষর করার আগে রাসূলুল্লাহ (সা.) আউস ও খাযরাজ গোত্রের সরদারদের: হযরত সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন উবাদাহ (রা.)-কে আস্থায় নেওয়া জরুরি মনে করলেন এবং তাঁদের ডেকে সব কথা বললেন।

তাঁরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! যদি এটি আল্লাহর নির্দেশ হয় তবে তো ঠিক আছে।"

আপনি বললেন: "যদি আল্লাহর নির্দেশ হতো তবে আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ করতাম না। কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে সমস্ত আরব তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে, তখন আমি চেয়েছিলাম তাদের শক্তি এভাবে কমিয়ে দিতে।"

একথা শুনে সা'দ বিন মু'আয (রা.) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! যদি এই কারণ হয় তবে শুনুন, যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখনও এই লোকেরা আমাদের ফসল আত্মসাৎ করতে পারত না, এখন তো আল্লাহ আমাদের ইসলামের হিদায়াত দিয়েছেন এবং আপনার মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। এখন কীভাবে সম্ভব যে এই লোকেরা আমাদের ফসলে অংশীদার হবে? আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে তাদের জন্য তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের এই জযবা দেখে খুশি হলেন, আপনি চুক্তির খসড়া ছিঁড়ে ফেললেন এবং গাতাফানের দুই সরদারকে বললেন: "যাও, এখন তলোয়ার দিয়েই ফয়সালা হবে।" [১]

**সা'দ বিন মু'আয (রা.)-এর যখম:**

খন্দকের কিনারায় এভাবে অবরোধের যুদ্ধ চলতে থাকল। তীর এবং পাথর বিনিময় হতে থাকল। আউস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) দীর্ঘদেহী ছিলেন এবং বর্ম ছোট ছিল, যার ফলে তাঁর দুই হাত বাইরে দেখা যাচ্ছিল। [২]

একদিন কুরাইশদের একজন দক্ষ তীরন্দাজ হিব্বান বিন আরকাহ তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল, যা তাঁর কবজির শাহরগ কেটে দিল। [৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জন্য মসজিদে একটি তাবু খাটিয়ে দিলেন যাতে তাঁর কাছে থেকে তাঁর ভালোভাবে সেবা-শুশ্রূষা করা যায়। [৪] কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার নাম নিচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে একটি শলাকা গরম করে যখমটি দাগিয়ে দিলেন কিন্তু সুস্থতা নসিব হলো না, হাত ফুলে গেল। [৫] তারপর যখম ফেটে গেল এবং রক্ত পুনরায় প্রবাহিত হতে লাগল। নবী করীম (সা.) পুনরায় যখম দাগিয়ে দিলেন। এই অবস্থায় সা'দ বিন মু'আয (রা.) দুআ করলেন: "হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার চোখ বনু কুরাইযা (এর পরিণাম) দেখে শীতল না হয়।"

এই দুআ এমনভাবে কবুল হলো যে রক্তক্ষরণ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল। তবে অবস্থা বিপদমুক্ত ছিল না; কারণ যখমটি ছিল শাহরগের। [৬]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/২৩৩। এই ঘটনা সংক্ষেপে হাদীসের কিতাবসমূহেও এসেছে; দেখুন: (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩৬৮১৬, তহা আল-রশিদ)

[২] মুসনাদ আহমাদ, হা: ২৫০৯৭

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪১২২, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারজিউন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল আহযাব

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৪৬৩, কিতাবুস সালাত, বাবুল খিমা ফিল মাসজিদ। হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ এখানে স্পষ্ট করেননি যে এটি কোন মসজিদ ছিল? তবে অনুমান করা হয় যে এটি খন্দকের যুদ্ধের কাছেই স্থাপিত সেই মসজিদ ছিল যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) অবস্থান করছিলেন। মসজিদে নববী উদ্দেশ্য নয়; কারণ তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে ছিল এবং কাছে রাখার উদ্দেশ্য ছিল যাতে হযরত সা'দ (রা.)-এর সেবা-শুশ্রূষার লক্ষ্য পূরণ হয়।

[৫] সহীহ মুসলিম, হা: ৫৮৭৮, কিতাবুত তিব্ব, বাব লিকুল্লি দায়িন দাওয়া

[৬] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ১৫৮২, আবওয়াবুস সিয়ার, বাব মা জাআ ফিল নুযুল আলাল হুকম

## আমর বিন আবদ উদ-এর হত্যা

একদিন একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটল, প্রতিপক্ষের কয়েকজন নামকরা অশ্বারোহী তাদের ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিল এবং একটি তুলনামূলক কম প্রশস্ত জায়গা থেকে লাফিয়ে খন্দক পার হয়ে এল। তাদের মধ্যে আরবের স্বীকৃত তলোয়ারবাজ আমর বিন আবদ উদ-ও ছিল। সে হুঙ্কার দিয়ে বলল: "এমন কেউ আছে কি যে মোকাবিলায় আসবে?" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরজ করলেন: "আমি তার সাথে লড়ব।"

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে থামালেন এবং বললেন: "আলী! এ তো আমর বিন আবদ উদ।"

আমর বিন আবদ উদ দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার আওয়াজ দিল এবং জবাবে নীরবতা দেখে বলতে লাগল:

"কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যাতে তোমরা মরে যাওয়ার পর প্রবেশের বিশ্বাস রাখো?"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন: "আলী! বসে পড়ো। এ আমর বিন আবদ উদ।"

তিনি বললেন: "সে যা-ই হোক না কেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন, তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করে পায়ে হেঁটে বের হলেন। আমর বিন আবদ উদ তাকে আসতে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আঘাত প্রতিহত করলেন কিন্তু আমর বিন আবদ উদ-এর হাত এত শক্তিশালী ছিল যে তলোয়ার ঢাল কেটে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কপাল পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তবে ক্ষতটি মারাত্মক ছিল না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে তার কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝখানে এমন এক আঘাত করলেন যে রক্তের ফোয়ারা ছুটে বের হলো। আমর বিন আবদ উদ লুটিয়ে পড়তেই মুসলমানরা খুশিতে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিলেন। [১] যে মুশরিকরা খন্দক পার হয়ে এসেছিল তারা পালিয়ে গেল। [২]

## মিত্রদের মধ্যে ফাটল

এই সময়ে মিত্রদের মধ্যে ফাটল ধরার কারণও তৈরি হয়ে গেল। এর বড় কারণ ছিল এই যে, কিছু ইহুদির মনে এই আশঙ্কা হতে লাগল যে যদি পরাজয় ঘটে তবে মিত্ররা হয়তো আমাদের মুসলমানদের সামনে ফেলে রেখে নিজ নিজ এলাকায় পালিয়ে যাবে। যুদ্ধের আগেই তারা হুয়াই বিন আখতাবকে বলে দিয়েছিল: "তোমাদের মিত্রদের ওপর আমাদের ভরসা নেই। তাদের কাছে গিয়ে বলো যে তারা যেন প্রতিটি দলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কিছু লোককে আমাদের কাছে জিম্মি হিসেবে রেখে দেয়।"

ফলে হুয়াই বিন আখতাব মিত্র নেতৃত্বের সাথে দেখা করল এবং ঠিক করে নিল যে সত্তরজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বনু কুরাইজার কাছে জিম্মি হিসেবে থাকবে। [৩]

কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মিত্ররা এই ওয়াদা পূরণ করার নামও নিল না। এই পরিস্থিতিতে ইহুদিদের আশঙ্কা দৃঢ় হতে লাগল যে মিত্ররা তাদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যাবে। অবশেষে তারা গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই শর্তে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল যে, তাদের স্বগোত্রীয় বনু নাযির যাদেরকে নির্বাসিত করে খায়বারে পাঠানো হয়েছিল, তাদের পুনরায় মদিনায় বসবাসের অনুমতি দেওয়া হোক। [৪]

---

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ১৮৩৫০

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/২৩৫

[৩] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৩০১ আন মুসা বিন উকবা

[৪] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৩০৫ আন মুসা বিন উকবা

https://t.me/BoierSomahar

এই দিনগুলোতে বনু গাতফানের এক ব্যক্তি নুআইম বিন মাসউদ আশজায়ী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কেউ জানত না। তিনি কথা এদিক-সেদিক পৌঁছাতে পারদর্শী ছিলেন এবং সম্ভবত এই কারণেই ইহুদিদেরসহ বিভিন্ন গোত্র ও স্তরের মানুষের সাথে তাঁর বেশ মেলামেশা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন:

"তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে চাই। ইহুদিরা আমার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছে, শর্ত দিয়েছে যে আমি যেন বনু নাযিরকে পুনরায় মদিনায় বসবাসের অনুমতি দিই।" [১]

নুআইম বিন মাসউদ ﷺ এই কথাগুলো শুনলেন এবং এই বলে উঠে দাঁড়ালেন:

"আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি এই লোকদের সাথে যা ইচ্ছা কথা বলতে পারি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "তুমি যদিও একজন একা মানুষ, তবে যতটুকু সম্ভব মিত্রবাহিনীকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দাও।" [২]

তাঁর চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"যুদ্ধ হলো কৌশলের নাম। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা এভাবে আমাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেবেন।" [৩]

নুআইম বিন মাসউদ ﷺ প্রথমে বনু কুরাইজার কাছে গেলেন এবং তাদের বললেন:

"তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও শুভাকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক রয়েছে। এই কুরাইশ ও গাতফানরা তোমাদের মতো নয়। এটি তোমাদের এলাকা যেখানে তোমাদের নারী ও শিশুরা বসবাস করে। তোমরা এখান থেকে পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। তোমরা কুরাইশ ও গাতফানের সাথ দিচ্ছ, কিন্তু যদি তারা পরাজিত হয় তবে তারা তোমাদের ছেড়ে দিয়ে নিজেদের এলাকায় পালিয়ে যাবে।" [৪]

ইহুদিরা আগে থেকেই মিত্রবাহিনীর ওপর থেকে মন হারিয়ে ফেলছিল, এই কথাগুলোতে তাদের আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। এখন নুআইম ﷺ কুরাইশদের কাছে গেলেন এবং সহমর্মিতার সুরে তাদের জানিয়ে দিলেন যে বনু কুরাইজা মুসলমানদের সাথে সন্ধির চেষ্টা করছে। অর্থাৎ খবর পাওয়া মাত্রই শিবিরে হুলস্থুল পড়ে গেল। অধিকাংশ লোক বলতে লাগল: "আমাদের মনে হয়, এখন ফিরে যাওয়া উচিত।"

মিত্রবাহিনীর নেতারা সেই সময় জিম্মি হিসেবে পাঠানোর জন্য কিছু লোককে মনোনীত করেছিলেন, যারা এই খবর শোনা মাত্রই শোরগোল শুরু করে দিল: "আমরা তো কখনোই ইহুদিদের দুর্গে যাব না। আমাদের নিজেদের প্রাণের ভয় আছে।"

তা সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান শেষ চেষ্টা হিসেবে ইকরিমা বিন আবি জাহলকে বনু কুরাইজার কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন: "আগামীকাল শনিবার আমরা চূড়ান্ত আক্রমণ করব। তোমরাও দুর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নাও।"

উত্তর এল: "শনিবার আমাদের এখানে যুদ্ধ জায়েজ নেই। আপনারা জিম্মি পাঠিয়ে দিন। রবিবার আমরা আক্রমণে শরিক হব।"

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৩০৫, মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত।

[২] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/২২৯, ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। এটি সংক্ষেপে কিছু মুহাদ্দিসও বর্ণনা করেছেন। দেখুন: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৬৮১০।

[৩] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৩০৫, মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত।

[৪] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/২২৯, ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত।

ইকরিমা বিন আবি জাহল ফিরে এসে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য নেতাদের ঘটনাটি জানালে সবার কাছে ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চিত হয়ে গেল। [১]

**ঝড়ো আবহাওয়া এবং আহযাব বাহিনীর ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন:**

অবরোধের তিন সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছিল, আবহাওয়া শীতল হয়ে আসছিল। অবরুদ্ধ এবং আক্রমণকারী উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সাথে ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছিল। এটি ছিল আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্য, যা মিত্রবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। এক ঝড়ো ও অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হুযাইফা (রা.)-কে শত্রুদের গোয়েন্দাগিরি করার জন্য পাঠালেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, ঝড়ো বাতাসে মিত্রবাহিনীর তাঁবুগুলো উপড়ে যাচ্ছে, গবাদি পশু মারা যাচ্ছে, হাঁড়ি-পাতিল উল্টে পড়ছে। মুশরিকদের নেতারা আগুনের কুণ্ডলীর চারপাশে বসে হাত গরম করছিল এবং অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছিল। অবশেষে মিত্রবাহিনীর সেনাপতি আবু সুফিয়ান ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

হযরত হুযাইফা (রা.) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এই সুসংবাদ শোনালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি হাসলেন। হুযাইফা (রা.) অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর পবিত্র দাঁত মোবারকের চমক পরিষ্কার দেখতে পেলেন। পরের দিন মিত্রবাহিনী তাদের তাঁবু ও সরঞ্জাম গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তিন সপ্তাহ ধরে যুদ্ধের মেঘে আচ্ছন্ন থাকার পর মদিনার আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। [২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) মিত্রবাহিনীর ফিরে যাওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: “এখন আক্রমণ আমাদের পক্ষ থেকে হবে। তারা আমাদের ওপর আর আক্রমণ করতে পারবে না।” [৩] এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। এরপর মক্কাবাসীরা আর কখনো মদিনায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসতে পারেনি।

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৫/৩; সুনানে মুসা বিন উকবা। এখানে আমরা ‘দালায়েলুন নুবুওয়াহ’-তে বর্ণিত মুসা বিন উকবা এবং সীরাতে ইবনে হিশামে বর্ণিত ইবনে ইসহাকের বর্ণনাগুলোকে এমনভাবে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি যাতে উভয় বর্ণনার বৈপরীত্য দূর হয়ে যায়। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, মুসা বিন উকব্বার বর্ণনা অনুযায়ী নুয়াইম বিন মাসউদ (রা.) একজন সাধারণ এবং পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে বনু কুরাইজার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তারা তাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ফাটল ধরেছিল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী নুয়াইম বিন মাসউদ (রা.) নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেছিলেন যে, তিনি একাই একটি যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করতে পারেন যাতে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এখানে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যাতে ঘটনার ধারাবাহিকতা বেশি স্পষ্ট। হাফেজ ইবনে কাসীরও একেই বেশি পছন্দ করেছেন। তবে আল্লামা শিবলী নোমানী মুসা বিন উকব্বার বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন এবং ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে দুর্বল মনে করেছেন। এর কারণ হলো ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় মুসা বিন উকব্বার বর্ণনার তুলনায় বেশি অলঙ্কার ও নাটকীয়তা রয়েছে এবং এটি নীতিগতভাবে সঠিক অবস্থান যে, মুসা বিন উকব্বার বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি কোনো সমালোচক এই আপত্তি তোলেন যে, ‘এটি কি প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ছিল যা ইসলামের নৈতিকতার পরিপন্থী?’ - তবে এর থেকে বাঁচার জন্য ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা বৃথা চেষ্টা মাত্র, কারণ মুসা বিন উকব্বার বর্ণনাতেও গোয়েন্দাগিরি বিদ্যমান। হযরত হুযাইফা (রা.)-এর গোয়েন্দাগিরির বিষয়টি সেখানেও স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে মুস্তাশরিকদের (প্রাচ্যবিদদের) এই আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এর উত্তর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ‘আল-হারবু খুদআ’ (যুদ্ধ হলো কৌশল)-এর মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবায়ে কেরাম কখনো একে অন্যায় মনে করেননি। রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করা, গোয়েন্দা পাঠানো, গুপ্তচরবৃত্তি এবং গোপন অভিযান পরিচালনা করা বিশ্বের প্রতিটি সভ্য জাতিই করে থাকে। ইসলাম একে জায়েজ রেখেছে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে কাব বিন আশরাফকে কৌশলে হত্যা করেছিলেন, এটিও একই ধরনের ঘটনা। সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদে ‘আল-কাযিবু ফিল হারব’ (যুদ্ধে মিথ্যা বলা) শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে। এর অর্থ কি এই যে, মিথ্যা বলাকে বৈধ করা হয়েছে? না, বরং এর অর্থ হলো এমন কোনো কৌশল অবলম্বন করা যাতে শত্রুর ক্ষতি হয় এবং নিজের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত হয়। এটি একটি পাল্টা ব্যবস্থা এবং শত্রুকে দমন করার জন্য অপরিহার্য।

[২] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৩৯৬ ও ৩/৪৫৫, ত ত العلمية কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ৩, হাদীস: ৩০০৮৩; আন ইবনে আসাকির; সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/২৩২।

[৩] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪১১০, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতিল খন্দক।

## গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা (যিলকদ ৫ হিজরী)

মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে এলেন। হযরত সাদ বিন মুআয (রা.)-এর আহত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীর আঙিনায় একটি তাবু খাটিয়ে তাঁকে সেখানে স্থানান্তরিত করলেন যাতে তাঁর দেখাশোনার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সবেমাত্র অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে গোসল করেছেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) ধূলিমলিন অবস্থায় উপস্থিত হলেন এবং বললেন:
"আপনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলেছেন অথচ আমরা ফেরেশতারা এখনও অস্ত্র নামাইনি। আপনি আক্রমণ করুন।"
রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: "কোথায়?" জিবরাঈল (আ.) বনু কুরাইযার দিকে ইশারা করলেন। [১]

জিবরাঈল (আ.)-এর এই অবতরণ এজন্য ছিল যাতে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর নির্দেশ এটাই এবং পরবর্তীতে এই অভিযানের যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ না থাকে। যদি জিবরাঈল (আ.) নাও আসতেন, তবুও রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম বনু কুরাইযার অনিষ্টতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকে উপেক্ষা করতে পারতেন না, যারা যুদ্ধের অত্যন্ত নাজুক সময়ে তাঁদের পিঠে খঞ্জর চালিয়েছিল। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এই অভিযানকে কয়েক দিন পিছিয়ে দিয়ে মুজাহিদদের বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন। তবে এখন আসমানী নির্দেশের পর আর বিলম্ব করার কোনো অবকাশ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ দিনই খন্দকের ক্লান্ত-শ্রান্ত মুজাহিদদের বনু কুরাইযার দিকে রওনা করিয়ে দিলেন এবং বললেন: "তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছানোর আগে আসরের সালাত আদায় না করে।"

ফলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেদিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে আসরের সময় হয়ে গেলে কিছু সাহাবী এই ভেবে আসরের সালাত আদায় করে নিলেন যে, এই তাকিদের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত রওনা হওয়া, সালাতে বিলম্ব করা নয়।
কিছু সাহাবী নির্দেশের আক্ষরিক অনুসরণ করলেন এবং বনু কুরাইযার দুর্গের সামনে পৌঁছে বিলম্বে আসরের সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কারো কাজকেই ভুল বলেননি। [২] এ ধরণের ঘটনা থেকে ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

১লা যিলকদ সন্ধ্যা পর্যন্ত বনু কুরাইযার দুর্গগুলো অবরোধ করা হলো। অবশেষে ২৫ দিন পর বনু কুরাইযার সাহস ফুরিয়ে গেল এবং তারা আত্মসমর্পণ করল। [৩] সিদ্ধান্ত হলো যে, তাদের ভবিষ্যতের ফয়সালা হযরত সাদ বিন মুআয (রা.) করবেন। ইসলামের পূর্বে তিনি বনু কুরাইযার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাই শুধু বনু কুরাইযা নয় বরং আনসারদেরও প্রত্যাশা ছিল যে, তিনি অতীতের সম্পর্কের খাতিরে নরম ফয়সালা করবেন, বড়জোর বনু কাইনুকা ও বনু নাযীরের মতো তাদের দেশান্তরের শাস্তি...

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ২৮১৩, কিতাবুল জিহাদ, বাব: যুদ্ধের পর গোসল ও ধূলিবালি; হা: ৪১১৭, কিতাবুল মাগাযী, আহযাব থেকে নবীর (সা.) প্রত্যাবর্তন।
[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪১১৯, কিতাবুল মাগাযী, আহযাব থেকে নবীর (সা.) প্রত্যাবর্তন।
[৩] বনু কুরাইযার যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার দিনই তাদের দিকে বের হওয়া এবং পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখা। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১৩)

...বানাবেন কিন্তু প্রাণভিক্ষা অবশ্যই করে দেবেন। কিন্তু সেদিন হযরত সাদ বিন মুয়াজ (রা)-এর দৃষ্টি ইসলামের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ওপর নিবদ্ধ ছিল না। তিনি সব আত্মীয়তার সম্পর্ক ভুলে গিয়েছিলেন, যখন তাঁকে বিচার সভায় আনা হলো তখন তিনি বলছিলেন:

"আজ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের খাতিরে কারো তিরস্কারের পরোয়া করব না।"

উভয় পক্ষের সম্মতিতে তাঁকে ফয়সালার ইখতিয়ার দেওয়া হলে তিনি ঘোষণা করলেন:

"বনু কুরাইজার লড়াই করার যোগ্য পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদের দাস বানিয়ে নেওয়া হোক।"

এ কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু হুজুর (সা) বললেন: "সাদ আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করেছে।" [১]

ফয়সালা অনুযায়ী একইভাবে আমল করা হলো। বনু কুরাইজার চারশ যুদ্ধবাজ পুরুষকে হত্যা করা হলো। হযরত সাদ (রা) বনু কুরাইজার পরিণতি দেখার জন্যই যেন বেঁচে ছিলেন, এর পরপরই তাঁর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল এবং তিনি প্রকৃত স্রষ্টার সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। [২]

বনু কুরাইজার সাথে এই আচরণ নিশ্চিতভাবেই হুজুর (সা)-এর সাধারণ অভ্যাসের পরিপন্থী ছিল। আপনি (সা) তাদের প্রাণভিক্ষা দিতে পারতেন কিন্তু আপনি সাজা কার্যকর করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর আসল কারণ তো এটাই ছিল যে আসমানি হুকুম এটাই ছিল। আল্লাহ তাআলা যেভাবে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে পাঠিয়ে বনু কুরাইজার ওপর আক্রমণকে একদিনও বিলম্বিত হতে দেননি, একইভাবে সেই অপরাধীদের সাজাও আসমানেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যা সাদ বিন মুয়াজ (রা)-এর জবান দিয়ে জারি হয়ে গেল। দুনিয়ার পূর্ববর্তী ও বর্তমান আইন অনুযায়ীও বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। খোদ ইহুদিদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাত এই ধরনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের কথা শোনায়, যেমনটি ওল্ড টেস্টামেন্টে (আহদনামা-এ-আতিক) আছে যে, ঈশ্বর যখন কোনো শহরকে তোমার কবজায় করে দেবেন তখন তুমি তার প্রত্যেক পুরুষকে তলোয়ারের ধারে হত্যা করো। [৩]

এই কথাটি বাকি থাকে যে, আসমানি হুকুম ছাড়াও কি এই পদক্ষেপের পেছনে কোনো বিশেষ পার্থিব কারণও কার্যকর ছিল? এর উত্তর 'হ্যাঁ', তবে কারণ শুধু এটি ছিল না যে তারা ইহুদি ছিল; কারণ বনু কাইনুকা এবং বনু নাজিরও ইহুদি ছিল কিন্তু আপনি (সা) তাদের সাথে এমন কঠোর আচরণ করেননি। পার্থিব কারণ বনু কুরাইজার স্বভাবজাত অনিষ্টতাও ছিল না; কারণ অন্য ইহুদিরাও নিশ্চিতভাবে ফিতনাবাজ ছিল যাদেরকে হুজুর (সা) দেশান্তর করার মাধ্যমেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। তাহলে বনু কুরাইজার প্রতি শিথিলতা না দেখানোর কারণ কী ছিল?

---

[১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ. ৩৬৯৫, কিতাবুল জিহাদ, বাব জাওয়াজ কিতাল মান নাকাদাল আহদ, দারুল জীল।

[২] সুনান আত-তিরমিজি, হা: ১৫৮২, আবওয়াবুস সিয়ার, বাব মা জাআ ফিন নুযুল আলাল হুকম, সহীহ সনদে। মুসনাদ আহমদ, খণ্ড ৩, পৃ. ৭৩, সহীহ সনদে। বনু কুরাইজার কতজন পুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল? ইবনে হিশাম ৬০০, ৭০০, ৮০০ এবং ৯০০-এর চারটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী খুনাইস বিন আল-মুত্তালিব কুরাইশদের সাথে চুক্তির সময় ৭০০ ব্যক্তির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। (মাগাযী লিল-ওয়াকিদী ২:৩৫৩)। কিন্তু তিরমিজি ও মুসনাদ আহমদের সহীহ বর্ণনায় ৪০০-এর উল্লেখ আছে। সমন্বয়ের সুরত এই যে, ইহুদিদের নিজস্ব দাবি বা তাদের গণনায় যোদ্ধাদের সংখ্যা বেশি ছিল, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী ছেলেদেরও যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য করে রেখেছিল কিন্তু মুসলমানরা এমন অনেক ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন যেমনটি একটি ফতোয়াযোগ্য বিষয়ের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে যাদের চিকিৎসাগত পরীক্ষায় যুবক প্রমাণিত হয়নি তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। (মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড ৩, পৃ. ৮১৭)। ইহাও সম্ভব যে কিছু বন্দী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যেমন আতিয়্যাহ আল-কুরাযীর একটি উদাহরণ হাদিসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান আছে। যাই হোক মনে রাখা উচিত যে, নারী ও নাবালক শিশুদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কেবল একজন নারী এমন ছিল যে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ (রা)-কে ভারী যাঁতা দিয়ে হত্যা করেছিল (সীরাত ইবনে হিশাম ২:৩৩২), সে এই অপরাধের শাস্তির সাথে সাথে স্বীকারোক্তিও দিয়েছিল, ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। (সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ১, পৃ. ২৬৭, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি কিতালিন নিসা)।

[৩] বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ (ইস্তিসনা), অধ্যায় ২০, আয়াত ১০-১৩।

যদি লক্ষ্য করা হয় তবে জানা যাবে যে, বনু কাইনুকা এবং বনু নাযিরের পক্ষ থেকে অনিষ্টতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সাধারণ পরিস্থিতিতে হয়েছিল, যেখানে বনু কুরাইজা প্রকাশ্য বিদ্রোহের জঘন্য অপরাধটি করেছিল ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর ঠিক একটি বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময়, যার কারণে এই অপরাধের ভয়াবহতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই কারণে তাদের এই চরম গুরুতর অপরাধ অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

এখন কথা হলো, যদি হুজুর ﷺ তাঁর স্বভাবজাত দয়া ও করুণা অনুযায়ী অনুগ্রহের আচরণ করতেন তবে কি কোনো ক্ষতি হতো? হ্যাঁ! অবশ্যই হতো। এটা স্পষ্ট যে, বনু কুরাইজাকে ক্ষমা করে দেওয়ার পরেও তাদের নিজেদের আবাসস্থলে বসবাস করতে দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এটি নিজের আস্তিনে সাপ পালার সমতুল্য হতো। তাদের দেশান্তরই করতে হতো। কিন্তু এর ফলাফল কী হতো? এর আগে বনু কাইনুকা এবং বনু নাযিরের অনেক লোক দেশান্তরিত হয়ে খায়বারের দুর্গগুলোতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং সেখানে ইহুদিদের একটি বিশাল জনসমষ্টি তৈরি হয়েছিল যা মদিনার নিরাপত্তার জন্য হুমকি ছিল। বনু কুরাইজার লোকেরা গিয়ে তাদের শক্তিতে আরও বৃদ্ধির কারণ হতো। এভাবে বনু কুরাইজাকে প্রাণভিক্ষা দেওয়া নিজের পায়ে কুড়াল মারার নামান্তর হতো।

এখানে মানব প্রকৃতি এবং সামাজিক দর্শনের এই দিকটি লক্ষ্যণীয় যে, কোনো ক্ষমতাসীন শক্তি যে শাস্তি বা ক্ষমা উভয়ের ওপর ক্ষমতা রাখে, সাধারণ মানুষের কাছে তখনই ক্ষমতাধর হিসেবে গণ্য হতে পারে যখন তাকে কখনো ক্ষমা করতে দেখা যায়, আবার কখনো শাস্তি কার্যকর করতে দেখা যায়। যদি কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রতিটি বিষয়ে এবং প্রতিটি সমস্যায় কেবল ক্ষমার দিকটি অবলম্বন করতে থাকেন, তবে সাধারণ মানুষ এটাই ধারণা করবে যে তিনি বাস্তবে ক্ষমতাধর নন, বরং অন্যদের ক্ষমা করতে বাধ্য, তাকে শাস্তি কার্যকর করার ক্ষমতা আদতেই দেওয়া হয়নি। এই চিন্তার অনিবার্য ফলাফল এই হবে যে, অভ্যস্ত অপরাধী, গুণ্ডা, বদমাশ এবং চোর-ছ্যাচড়েরা নির্ভয়ে অপরাধ করতে শুরু করবে এবং সমাজ থেকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা উঠে যাবে।

অপরাধীদের শাস্তির ভয়ই অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখতে পারে এবং এই ভয় তখনই অবশিষ্ট থাকতে পারে যখন শাস্তির মাঝেমধ্যে বাস্তব প্রয়োগ হতে থাকে। যেভাবে মহাবিশ্বের মহান অধিপতি আল্লাহ তাআলা যদিও অধিকাংশ সময় ক্ষমা ও মার্জনা করেন, কিন্তু কখনো কখনো তিনি অপরাধীদের আদ ও সামুদ জাতির মতো শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত করে দেখিয়ে দেন; একইভাবে আল্লাহর শেষ রাসূল ﷺ-ও যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপাদমস্তক দয়া ও করুণার মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হন, কিন্তু কখনো এমনও হয় যে আপনি ﷺ ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি কার্যকর করাকে অগ্রাধিকার দেন। অপরাধীদের ওপর হুদুদ ও কিসাস কার্যকর করার অসংখ্য উদাহরণ সুন্নাতে নববীতে বিদ্যমান। তবে কোনো জাতির সামষ্টিক অপরাধের জন্য সামষ্টিক শাস্তি দেওয়ার এটিই সীরাতে নববীতে একমাত্র উদাহরণ। এছাড়া অন্য সব জায়গায় আপনি ﷺ হয় সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন অথবা নির্দিষ্ট অপরাধীদের ব্যতিক্রম রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে মার্জনার আচরণ করেছেন। সীরাতে নববীতে এমন কঠোর উদাহরণও একটি রহমত। যদি এটি না হতো তবে "ইসলামী রাষ্ট্র"-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের শাস্তি কার্যকর করা কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রতিটি গুরুতর থেকে গুরুতর বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য হতো। "নবী-এ-রহমত"-এর লেখকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, তিনি লিখেন:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু কুরাইজার সাথে যে আচরণ করেছেন, তা ছিল যুদ্ধকালীন রাজনীতি এবং আরবের ইহুদি গোত্রগুলোর প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী। তাদের জন্য এই ধরণের কঠোর ও শিক্ষণীয় শাস্তির প্রয়োজন ছিল যার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং প্রতারণা..."

বড়দের জন্য চিরস্থায়ী শিক্ষা হয়ে যায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। [১]

□□□

**খন্দক যুদ্ধের পরবর্তী কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা**

খন্দক যুদ্ধের পর ৫ হিজরীর শেষভাগ এবং ৬ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং কিছু মদিনা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

**রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জয়নব বিনতে জাহাশ (রাযি.)-এর বিবাহ (যিলকদ ৫ হিজরী):**

যায়েদ বিন হারিসা (রাযি.) তখনও নবী করীম ﷺ-এর সাথে তাঁর পালক পুত্র হিসেবে বসবাস করছিলেন, লোকেরা তাঁকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলত। তিনি তাঁর যৌবনের শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে উম্মে আয়মান (রাযি.)-কে বিবাহ করেছিলেন, যিনি সেই সময় তাঁর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বয়সের ছিলেন। এখন যায়েদ (রাযি.)-এর বয়স প্রায় চল্লিশ বছর হয়েছিল এবং উম্মে আয়মান বৃদ্ধা হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে হলো যে, যায়েদের জন্য একজন যুবতী স্ত্রী হওয়া উচিত।

এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন কুরাইশী নারী জয়নব বিনতে জাহাশ (রাযি.)-কে নির্বাচন করলেন। এই নারী অত্যন্ত উচ্চবংশীয়, ইবাদতগুজার এবং দানশীল ছিলেন, কিন্তু যায়েদ (রাযি.)-এর সাথে বিবাহে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। ফলে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদের অভিভাবক হিসেবে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি তাঁর মনের অবস্থা প্রকাশ করে বললেন: “আমি তাঁকে পছন্দ করি না।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “আমি তাঁকে তোমার জন্য পছন্দ করি।”

জয়নব (রাযি.) নবীর নির্দেশের সামনে নীরব হয়ে গেলেন। বিবাহ সম্পন্ন হলো। কিছুদিন ভালোভাবেই কাটল কিন্তু ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যায়েদ (রাযি.)-এর পক্ষে তাঁর সাথে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়। তখন যায়েদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি জানালেন এবং সাথে সাথে বললেন যে, আমি তাঁকে তালাক দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে থাকলেন: “যায়েদ! তাঁর সাথে মানিয়ে চলো।” কিন্তু শেষ পর্যন্ত যায়েদ (রাযি.) তাঁকে তালাক দিয়েই দিলেন।

জয়নব (রাযি.) এখন ইদ্দত পালন করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাবছিলেন যে, এই নারীর যে মনোভঙ্গ হয়েছে তার প্রতিকার তখনই হতে পারে যখন আমি নিজে তাঁকে বিবাহ করব। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, আরবে পালক পুত্রকে আপন পুত্রের মতো মনে করা হতো এবং তার স্ত্রীকে আপন পুত্রবধূর মর্যাদা দেওয়া হতো। তাই প্রবল আশঙ্কা ছিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিবাহ করেন তবে সমাজে বিষয়টি অত্যন্ত অদ্ভুত বলে গণ্য হবে। শত্রুরা তো আপত্তি করবেই, আপনজনদের মনেও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে এবং এই বিষয়টি খোদ তাদের দ্বীন ও ঈমানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

যাইহোক, আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আহযাবের প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল করে এই সমস্ত আপত্তির অবসান ঘটালেন। ইরশাদ হলো:

---

[১] নবী রহমত ﷺ, হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ৪২৫

“আর তিনি তোমাদের পালক পুত্রদের তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র বানাননি। এটা তোমাদের মুখের কথা মাত্র, আর আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সঠিক পথ দেখান। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতাদের নামে ডাকো। আল্লাহর নিকট এটাই অধিক ইনসাফের কথা।” [১]

লোকেরা যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-কে ‘ইবনে মুহাম্মদ’ বলা থেকে বিরত হলো। তাকে যায়েদ বিন হারিসা (রা.) বলা হতে লাগল। [২]

এদিকে যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর ইদ্দত পূর্ণ হলো, তখন আল্লাহ তাআলা এই মাসআলার ওপর মোহর লাগানোর জন্য ওহীর মাধ্যমে তাঁর বিবাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পন্ন করে দিলেন এবং ঘোষণা হলো:

“অতঃপর যায়েদ যখন তার থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করল (তালাক দিল), তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের জন্য তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা না থাকে যখন তারা তাদের থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।” [৩]

এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত বংশীয় সন্তান এবং পালক সন্তানদের অধিকার ও দায়িত্বের মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনে দেওয়া হলো।

## ২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মে হাবীবা (রা.)-এর সাথে বিবাহ:

৬ হিজরীতে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহ হাবশার মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সাথে পড়ালেন এবং নিজের পক্ষ থেকে চারশ দিনার মোহর আদায় করলেন। নাজ্জাশী তাকে শুরাহবিল বিন হাসানা-এর হেফাজতে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দিলেন। সে সময় উম্মে হাবীবা (রা.)-এর বয়স ৩৩ বছরের কিছু বেশি ছিল। [৪]

---

[১] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪-৫।

[২] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-আহযাব; আল-ইসাবাহ, তারাজুম: যায়েদ বিন হারিসা (রা.)।

গুরুত্বপূর্ণ নোট: হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহের ব্যাপারে তাবাকাত ইবনে সাদ, তারিখ তাবারী এবং জালালাইনসহ কিছু তাফসীরে কিছু বর্ণনা এসেছে, যার সারমর্ম হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নজর হঠাৎ হযরত যয়নব (রা.)-এর ওপর পড়ে যাওয়ায় তিনি তাকে পছন্দ করেছিলেন, যার পর হযরত যায়েদ (রা.) তাকে তালাক দিয়েছিলেন। প্রাচ্যবিদরা এই বর্ণনাগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসমত (নিষ্পাপতা)-এর ওপর আপত্তি করে থাকেন, অথচ এই বর্ণনাগুলো ইসলামের ইলমী ও আকিদাগত মাসআলার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং দরায়াত (যুক্তি)-এর দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম যেমন: ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী, আল্লামা ইবনে হাযম, কাযী আইয়ায, ইমাম কুরতুবী, হাফেজ ইবনে কাসীর, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এবং হাফেজ ইবনে হাজার একে বিভিন্ন কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন: এই বর্ণনার রাবীদের মধ্যে আব্দুল রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম ও মুহাম্মদ বিন সামআহ রয়েছেন যারা যয়ীফ (দুর্বল)। আবার এই বর্ণনাগুলো মুরসাল বা মুদাল, অর্থাৎ প্রথম এক-দুই রাবী বাদ পড়েছেন। যেহেতু এর অর্থ স্বয়ং অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অগ্রহণযোগ্য, তাই কিছু বর্ণনা রাবীদের বিশ্বস্ততা সত্ত্বেও এবং ঘটনার বর্ণনার কারণে যয়ীফ। এমন যয়ীফ, ভিত্তিহীন, আকিদা ও আহকাম বিরোধী বর্ণনা ইলমী দলিল হতে পারে না।

এই দিকটিও লক্ষ্যণীয় যে, যদি মনের কোনো কথা হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই তা প্রকাশ করে দিতেন, কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে স্পষ্ট করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী আল্লাহর কালাম, যা থেকে প্রাচ্যবিদদের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এটি নিশ্চিতভাবে সনদে বিদ্যমান বর্ণনাকারীদের নিজস্ব কল্পনা এবং বর্ণনা যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ডক্টর খলীল আব্দুল করীম তার ‘আল-ওয়াদুন মুঞ্জিয ফি নাকদিন নাসিল মুয়াসসিস’-এ এই বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

[৩] বিবাহ ৫ হিজরীর যিলকদ মাসে হয়েছিল। যয়নব (রা.)-এর বয়স তখন ৩৫ বছর ছিল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১৭)।

[৪] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৭।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১৮, ২২১।

সারিয়া আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (সাইফুল বাহর):

খন্দকের যুদ্ধে আরব মুশরিকদের সম্মিলিত শক্তি যে লজ্জাজনক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং কুরাইশদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরও জোরদার করেন। আপনি ﷺ হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ-এর নেতৃত্বে তিনশ জনের একটি বড় দল সমুদ্র উপকূলের "সাইফুল বাহর" নামক স্থানে মোতায়েন করেন যাতে কুরাইশ কাফেলা পথ পরিবর্তন করেও সিরিয়ার দিকে যেতে না পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ থাকা পর্যন্ত এই কাফেলা আবহাওয়ার তীব্রতা এবং রসদপত্রের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এই পাহারার সময় ক্ষুধার তীব্রতার কারণে মুজাহিদদের মরুভূমির উদ্ভিদ "খাবাত" (বাবলা) এর পাতা খেতে হয়েছিল, যার কারণে এই অভিযানকে "জাইশুল খাবাত" বলা হতে থাকে।

পরবর্তীতে আল্লাহর সাহায্য আসে এবং একটি পাহাড়সম বিশাল মাছ উপকূলে এসে পড়ে। মুসলমানদের মনে শুরুতে দ্বিধা তৈরি হয় যে এটি মৃত (হারাম) কি না। কিন্তু হযরত আবু উবাইদাহ তার ফিকহি ও ইজতিহাদি প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে বললেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরিত। আল্লাহর পথে বের হয়েছি। এটি খাও।"

তিনশ জনের এই বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত এই খোদায়ী মেহমানদারি থেকে তৃপ্তিসহকারে আহার করে এবং ফেরার সময় এর বেঁচে যাওয়া গোশতের প্রচুর মজুদও সাথে নিয়ে আসে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও গ্রহণ করেন এবং একে আল্লাহর সাহায্য ও পুরস্কার হিসেবে অভিহিত করেন। [১]

মক্কার তিন নির্যাতিত মুসলমানের মুক্তি:

মক্কায় কিছু মুসলমান অত্যন্ত কষ্টের জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আইয়াশ বিন আবি রাবিয়াহ, যিনি আবু জাহেলের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। তিনি হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে শরিক ছিলেন। এরপর পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত উমরের সাথে মদিনায় হিজরত করেন এবং কুবায় অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আবু জাহেল আসে এবং এই বলে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যে, তোমার মায়ের অবস্থা খুব খারাপ, তিনি কসম খেয়েছেন যে তোমাকে না দেখা পর্যন্ত তিনি ছায়ায় বসবেন না। হযরত উমরের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মাকে দেখতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন কিন্তু কাফেররা তাকে গ্রেফতার করে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে। [২]

সালামাহ বিন হিশামও হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মক্কায় ফিরে আসেন। তাকে হিজরত থেকে বিরত রেখে বন্দি করা হয়। আবু জাহেল তাকে মারধর করত এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাখত। [৩]

ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ বিখ্যাত কাফের নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরার পুত্র ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি মুশরিকদের সাথে ছিলেন। পরাজয়ের পর বন্দি হন এবং এই সময়েই ইসলামের সত্যতা তার অন্তরে গেঁথে যায় কিন্তু তিনি ইসলাম প্রকাশ করেননি। কিছুদিন পর তার...

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৩৬০, কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়া সাইফ আল-বাহর; সহীহ মুসলিম, হা: ৫১০০, আস-সাইদ ওয়ায যাবাইহ, ইবাহাতু মাইতাতিল বাহর। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী একে ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা বলেছেন কিন্তু এটি এজন্য সঠিক হতে পারে না যে সেটি কুরাইশদের সাথে সন্ধির সময় ছিল। তখন কাফেলা আটকানো বৈধ ছিল না। আল্লামা সালিহি আশ-শামি এ বিষয়ে আলোচনা করে বলেছেন যে এটি ৫ম হিজরি বা তার আগের ঘটনা। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৭/ ১৭৮, ১৭৯)

[২] তারিখুল মদিনা লি ইবনে শাব্বাহ: ২/ ৭২৩; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/ ১২৯

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/ ১৩০

আত্মীয়-স্বজনরা এল এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মুক্ত করে সাথে নিয়ে ফিরে যেতে লাগল, কিন্তু তারা পথ থেকে ফিরে রিসালাতের দরবারে চলে এলেন এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। আত্মীয়-স্বজনরা পিছু পিছু এল এবং খোটা দিল যে, যদি ইসলাম গ্রহণই করতে হতো তবে আগেই করতে, আমাদের অর্থ কেন নষ্ট করালে? তারা উত্তর দিলেন: "যাতে কেউ এটা মনে না করে যে, বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য ধর্ম পরিবর্তন করেছি।" [১]

এরপর তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মক্কায় চলে গেলেন, যারা মক্কায় পৌঁছে তাদের বন্দি করে ফেলল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে কুনুতে নাজেলা পাঠ করে মক্কার সমস্ত অসহায় মুসলিমদের জন্য সাধারণভাবে এবং এই তিন সাহাবীর মুক্তির জন্য বিশেষভাবে নাম ধরে দুআ করতেন। সাথে সাথে এই দুআও করতেন:
"হে আল্লাহ! মক্কাবাসীদেরকে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর যুগের মতো দুর্ভিক্ষে নিপতিত করুন।" [২]

প্রথম দুআটি এভাবে কবুল হলো যে, খন্দকের যুদ্ধের কিছুদিন পর ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনোভাবে শিকল থেকে মুক্ত হয়ে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে আইয়াশ বিন আবি রাবিআ এবং সালামা বিন হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অবস্থা জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন যে, উভয়ের একটি করে পা একসাথে একই শিকলে বাঁধা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মজলুমদের মুক্তির জন্য চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে একটি ব্যবস্থা হয়ে গেল। মক্কায় একজন কামার গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (যিনি শিকল কাটতে সাহায্য করতে পারতেন)। হুজুর ﷺ ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দিলেন যে, মক্কায় গিয়ে সেই কামারের বাড়িতে আত্মগোপন করতে এবং যখন সুযোগ পাবেন তখন উভয় বন্দিকে শিকল থেকে মুক্ত করে সাথে নিয়ে আসতে। ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই বিপজ্জনক অভিযানে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত উভয় সাথীকে মুক্ত করে মদীনায় ফিরে এলেন। [৩]

দ্বিতীয় দুআটি এভাবে কবুল হলো যে, সেই দিনগুলোতে মক্কা এবং এর আশপাশের এলাকা তীব্র দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে গেল। মক্কায় খাদ্য এতটাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল যে, মানুষ হাড়কে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। [৪]

৫. সারিয়্যাহ উকাশা বিন মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), সারিয়্যাহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু):

রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উকাশা বিন মিহসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ৪০ জন ব্যক্তির সাথে বনু আসাদের বিরুদ্ধে অতর্কিত হামলার জন্য "গামর মারযুক" নামক ঝরনার দিকে পাঠালেন। শত্রু পালিয়ে গেল, মুসলিমরা ২০০ উট গনীমত হিসেবে নিয়ে ফিরে এলেন।

৬ হিজরীর রবিউস সানি মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বনু সা'লাবার সংবাদ সংগ্রহের জন্য "যুল কাসসা" পাঠালেন। তিনি দশজন সাথী নিয়ে গেলেন কিন্তু সেখানে ১০০ জন তীরন্দাজ মোকাবিলায় চলে এল। তীরের আঘাতে অনেক মুসলিম আহত হলেন। এরপর শত্রু বর্শা উঁচিয়ে আক্রমণ করল এবং প্রায় সকল মুসলিমকে শহীদ করে দিল। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গোড়ালি ভেঙে গিয়েছিল, কোনো একজন মুসলিম পরে তাঁকে তুলে নিয়ে আসেন। হুজুর ﷺ আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে পাঠালেন কিন্তু তারা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। [৫]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৩২

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৯৩২, কিতাবুল জিহাদ, বাব আদ-দুআ আলাল মুশরিকীন

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৩৩ এই ঘটনা খন্দকের যুদ্ধের কিছুকাল পরের। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৩০)

[৪] সহীহ মুসলিম, হা: ২৭৯৫, কিতাব সিফাতু ইয়াওমিল কিয়ামাহ, বাব আদ-দুখান

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/৮৫, ৮৬

**সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা (রা.) এবং আবুল আস বিন রাবী'র ইসলাম গ্রহণ:**

মক্কার কুরাইশদের কাফেলাগুলো তখনও এড়িয়ে চলে সিরিয়ায় যাতায়াত করত। মুসলমানরা তখনও তাদের অবরোধ করার চেষ্টা করত। ৬ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে যায়েদ বিন হারিসা (রা.) সিরিয়া থেকে ফিরে আসা একটি কুরাইশ কাফেলার ওপর অভিযান চালান, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামাতা আবুল আসও ছিলেন। মদিনায় পৌঁছে তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.)-এর দরজায় পৌঁছান এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হযরত যয়নব (রা.) ফজরের নামাজের সময় নিজের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে মুসল্লিদের ডাকলেন: "হে লোকসকল! শুনে রাখো, আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিয়েছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে জানতেন না। এই আওয়াজ শুনে তিনিও বিস্মিত হলেন। তিনি (সা.) উপস্থিতদের সামান্য ভুল বোঝাবুঝি থেকেও বাঁচাতে বললেন: "হে লোকসকল! আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তা শুনেছ?" সবাই বলল: "জি হ্যাঁ।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। হ্যাঁ, যখন তোমরা এই ঘোষণা শুনলে, আমিও তা শুনলাম। ঈমানদাররা অন্যদের মোকাবিলায় এক হাতের মতো, তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ ব্যক্তিও কাউকে আশ্রয় দিতে পারে। যয়নব যাকে আশ্রয় দিয়েছে আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।"

এরপর তিনি (সা.) নিজের ঘরে তাশরীফ নিলেন। যয়নব (রা.) উপস্থিত হলেন এবং আবেদন করলেন যে, আবুল আসের যে মালামাল লুট করা হয়েছে তা যেন ফেরত দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবুল আসকে তাঁর মালামাল ফেরত পাইয়ে দিলেন। এরপর তাঁদের বললেন যে, যতক্ষণ তিনি মুশরিক থাকবেন, যয়নবের সাথে তাঁর সম্পর্ক হালাল নয়, তাই তিনি যেন তাঁর থেকে দূরে থাকেন। আবুল আস অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন। ইসলামের গুণাবলি তাঁর সামনে স্পষ্ট ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই সময় তাঁর কাছে এটাই ভালো মনে হলো যে, প্রথমে মক্কায় চলে যান যাতে কারো মনে এই ধারণা না হয় যে, কোনো ভয় বা লোভের কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি মক্কায় ফিরে গেলেন। সেখানে সবার আমানত ফেরত দিলেন, যার যা হক ছিল তা পুরোপুরি আদায় করলেন। এরপর ৭ হিজরীর মহররম মাসে তিনি মদিনায় আসলেন এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যয়নব (রা.)-কে তাঁর সাথে থাকার অনুমতি দিলেন। [১]

সীরাত গ্রন্থগুলো দেখলে জানা যায় যে, এই অভিযান যাতে আবুল আস বিন রাবী' গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কুরাইশদের অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ পদক্ষেপ। এরপর এই ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কিছুকাল পর হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী উভয় পক্ষের জন্য পুরো জাযিরাতুল আরবে সমস্ত পথ খুলে যায়। কিন্তু ততদিনে কুরাইশদের অর্থনৈতিক শক্তি এতটাই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় কোনো যুদ্ধের অর্থনৈতিক বোঝা বহন করার যোগ্য ছিল না।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩১৪৩, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কিসসাতি উকল ওয়া উরাইনাহ; সুনান আবু দাউদ, হা: ৩৩৯৩, কিতাবুল হুদুদ।

## সারিয়্যাহ যায়িদ বিন হারিসাহ (রা.) এবং উম্মে কিরফাহ হত্যা:

বনু ফাযারার যোদ্ধারা দীর্ঘকাল ধরে মদিনা মুনাওয়ারার আশপাশে অতর্কিত হামলা চালাচ্ছিল। অবশেষে এই লুটেরাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যায়িদ বিন হারিসাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি দল সেখানে পাঠানো হয়। ফাযারীরা সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করল এবং মুসলমানদের পরাজয় হলো। যায়িদ বিন হারিসাহ (রা.) নিজে গুরুতর আহত হলেন এবং কষ্টে মদিনায় ফিরে আসতে সক্ষম হলেন। যায়িদ বিন হারিসাহ (রা.) শপথ নিলেন যে, যতক্ষণ না বনু ফাযারার মাথা চূর্ণ করবেন, ততক্ষণ তিনি জানাবাতের গোসল করবেন না। ক্ষত শুকানোর সাথে সাথেই তিনি বনু ফাযারার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। [১]

এই গোত্রের আসল কেন্দ্রবিন্দু ছিল একজন যোদ্ধা নারী উম্মে কিরফাহ (ফাতিমা বিনতে রাবিয়াহ), যার কারণে তারা টিকে ছিল। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে সাত দিনের দূরত্বে ওয়াদিউল কুরা-র কাছে এটি ছিল তার দুর্গ। সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে গালিগালাজ করত এবং নিজের ত্রিশজন ছেলে ও নাতিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যার জন্য প্রস্তুত করছিল (নাউযুবিল্লাহ)। যায়িদ বিন হারিসাহ (রা.) রমজান মাসে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তার ছেলে ও নাতিরা নিহত হয়। সে নিজে তার এক মেয়েসহ বন্দি হয়। তাকে হত্যা করা হয় এবং তার মেয়েকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। [২]

## মুরতাদদের শাস্তি (৬ হিজরি):

এই বছর উকল ও উরাইনাহ গোত্রের কিছু লোক মদিনা মুনাওয়ারায় এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের অনুরোধে মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসের অনুমতি দেন এবং তাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে কিছু উট ও একজন রাখালের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে এই লোকেরা মুরতাদ হয়ে যায়, তারা রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে তাদের পিছু ধাওয়ায় পাঠান। অবশেষে তারা ধরা পড়ে এবং তাদের ধর্মত্যাগ ও ডাকাতির শাস্তিস্বরূপ তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হয় এবং হাত-পা কেটে হত্যা করা হয়। তবে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কাউকে মুসলা করতে (চোখ উপড়ে ফেলা, নাক-কান কাটা) নিষেধ করে দেন। [৩]

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৭১৭

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৭১৭; শরফুল মুস্তফা: ৫২/৩

[৩] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ: ২/৯৩, তাবা সাদর... সিবত ইবনুল জাওযি এই পুরো ঘটনাটি ৬ হিজরির অধীনে লিখেছেন। (মিরআতুয যামান: ৩/৪১৭)

## হুদায়বিয়ার সন্ধি (জিলকদ ৬ হিজরি)

মুসলমানদের মক্কা ছেড়ে আসার ৬ বছর হয়ে গিয়েছিল। তারা মসজিদে হারাম এবং আল্লাহর ঘরের জিয়ারতের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। নবী করীম (সা.)-এরও তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা হোক এবং মানাসিক আদায় করা হোক।

এই দিনগুলোতে নবী করীম (সা.) স্বপ্নে নিজেকে সাহাবায়ে কেরামের সাথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে এবং মানাসিক পালন করতে দেখলেন। এটি একটি ইঙ্গিত ছিল যে মনের আশা পূরণ হতে চলেছে। নবী করীম (সা.) এটিও অনুভব করেছিলেন যে কুরাইশরা ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই এই আশা ছিল যে তারা উমরার অনুমতি দিয়ে দেবে। সুতরাং নবী করীম (সা.) ১লা জিলকদ ৬ হিজরিতে চৌদ্দশ সাহাবায়ে কেরামের সাথে এহরাম বেঁধে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হলেন। কুরবানির পশুও সাথে ছিল। আরবের লোকেরা এমন কোনো কাফেলার ওপর আক্রমণ করত না যাদের সাথে কুরবানির পশু থাকত। এটি মদিনার ক্যালেন্ডারে জিলকদ মাস এবং রুকি ক্যালেন্ডারে রজব মাস ছিল। কুরাইশসহ সমস্ত আরবদের কাছে এই দিনগুলোতে যুদ্ধ হারাম ছিল। তাই নবী করীম (সা.) আশ্বস্ত ছিলেন যে যুদ্ধের পরিস্থিতি আসবে না। কিন্তু কুরাইশরা যখন তাঁর আসার খবর পেল, তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা নবী করীম (সা.)-কে বাধা দেওয়ার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করল এবং পথে একটি সশস্ত্র দল মোতায়েন করল। নবী করীম (সা.) যখন জানতে পারলেন, তিনি বললেন: “কুরাইশদের জন্য আফসোস, যুদ্ধ তাদের শেষ করে দিয়েছে। তাদের কী হবে যদি তারা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দেয় এবং বাকি আরবদের সাথে আমার মাঝে বাধা না হয়।” [১]

## কুরাইশদের সাথে আলোচনা:

এখন নবী করীম (সা.) মূল মহাসড়ক ছেড়ে অন্য একটি পথে এগিয়ে গেলেন এবং মক্কার উপকণ্ঠে “হুদায়বিয়া” নামক স্থানে তাবু ফেললেন। এখানে নবী করীম (সা.) একজন স্থানীয় বাসিন্দা বুদাইল বিন ওয়ারকা-এর মাধ্যমে কুরাইশদের কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে “আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য উমরা করা।”

কুরাইশরা এই বার্তার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়নি। তারা উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফি নামক একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দূত হিসেবে পাঠাল যাতে ভয় দেখিয়ে নবী করীম (সা.)-কে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। দীর্ঘ ছয় বছরের মধ্যে এটিই প্রথম সুযোগ ছিল যখন কুরাইশরা তলোয়ারের পরিবর্তে কূটনীতি ও আলোচনার পথ বেছে নিয়েছিল। এটি এই কথার বাস্তব ঘোষণা ছিল যে ইসলাম নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। উরওয়া বিন মাসউদ দরবারে রিসালাতে উপস্থিত হয়ে কুরাইশদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কঠোর কথা বললেন, কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর যৌক্তিক অবস্থান শুনে, তাঁর সংকল্প ও দৃঢ়তা অনুভব করে এবং সাহাবায়ে কেরামের নবী করীম (সা.)-এর প্রতি অতুলনীয় ভক্তি ও ভালোবাসা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে মুসলমানরা পিছু হটার লোক নয়। সুতরাং ফিরে গিয়ে তিনি বললেন: “আমি কায়সার ও কিসরার মতো রাজাদেরও এমন সম্মান পেতে দেখিনি যেমনটি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীরা তাঁকে সম্মান করে।” [২]

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩০৯, ৩০৮/২

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৩১, কিতাবুল শুরুত, বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ

কুরাইশরা তাদের মিত্র 'আহাবিশ'-এর নেতা হুলাইসকেও মুসলমানদের ভয় দেখানোর জন্য পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে কাফেলায় কুরবানির পশু দেখামাত্রই ফিরে এল এবং বলতে লাগল: "কুরবানি নিয়ে আসা লোকদের হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া আমাদের দ্বীনের পরিপন্থী। তোমরা তাদের আসতে দাও, অন্যথায় আমরা সকল আহাবিশ তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যাব।" কুরাইশরা, যারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আহাবিশদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঝুঁকি নিতে পারছিল না, তাই তারা অত্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। [১]

**বাইয়াতে রিদওয়ান:**

এই সময়ে নবী আকরাম ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে হযরত উসমান (রা.)-কে দূত হিসেবে কুরাইশদের কাছে পাঠালেন। তিনি কুরাইশ নেতাদের সামনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নবী ﷺ-এর অবস্থান পুনরায় পেশ করলেন। ফেরার সময় কুরাইশরা তাঁকে প্রস্তাব দিল যে, তিনি চাইলে তাওয়াফ করতে পারেন। তিনি বললেন: "যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফ করার অনুমতি পাবেন, ততক্ষণ আমিও তাওয়াফ করব না।" এতে কুরাইশ নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে নজরবন্দি করে রাখল। এদিকে হযরত উসমান (রা.)-এর ফিরতে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, তাঁকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।

হুজুর আকদাস ﷺ এই খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি এ পর্যন্ত সন্ধি ও সমঝোতার পথ খুঁজছিলেন, কিন্তু তাঁর ﷺ কাছে হযরত উসমান (রা.)-এর রক্ত এতই মূল্যবান ছিল যে তা ক্ষমা করা সম্ভব ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নিচে বসলেন এবং সাহাবীদের কাছ থেকে হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের বিনিময়ে মৃত্যুর শপথ (বাইয়াত) নিলেন। সবাই মনেপ্রাণে সম্মতি প্রকাশ করল যে, উসমান (রা.)-এর প্রতিশোধ নিতে আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করব। [২]

সাহাসিকতা ও আত্মোৎসর্গের এই ভঙ্গি আল্লাহ তাআলার কাছে এতই পছন্দ হলো যে, তিনি কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন যাতে এই বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেওয়া হলো। ইরশাদ হয়েছে:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জানতেন, তাই তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার হিসেবে এক নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।" [৩]

এই কারণেই এই বাইয়াতকে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' বলা হয়।

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩১২/৩

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩১৫/৩, ৩১৬

[৩] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮

নোট (১): হুদাইবিয়ার সন্ধিতে চৌদ্দশ সাহাবায়ে কেরাম শরিক ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) ছাড়াও এমন অনেক মহান সাহাবীর এক বিশাল দল ছিল যাদের রাফেযীরা মুনাফিক বলে অভিহিত করে। (নাউযুবিল্লাহ)। এই কুরআনী আয়াত স্পষ্টভাবে এই মহান ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে সেই বাতিল ধারণাকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করছে যে, হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) এবং আরও অনেক সাহাবীর অন্তরে মুনাফিকি ছিল। আল্লাহ এই আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ জানতেন এবং সেই অবস্থা দেখেই আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। যদি তাঁদের অন্তরে (নাউযুবিল্লাহ) নিফাক থাকত, তবে কি আল্লাহ তাঁদের মুনাফিকির ওপর সন্তুষ্ট হতেন? কোনো মুমিন কি এমন চিন্তা করতে পারে?

নোট (২): হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাটি হিজরি সনের (মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি) সময়ের। হুদাইবিয়ায় যাত্রাবিরতির পরপরই সাহাবীরা পানির সংকটের কারণে সমস্যায় পড়লে নববী মুজিজায় সামান্য পানি সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী: ২৭৩১, ২৭৩২, কিতাবুল জিহাদ, বাবুশ শুরূত; মুসনাদে আহমাদ: ১৮৯০৬)

## কুরাইশদের সমঝোতায় সম্মতি

মুসলমানদের এই উদ্দীপনা কুরাইশদের ওপর এমন প্রভাব ফেলল যে তারা ভীত হয়ে পড়ল। তারা হযরত উসমান (রা.)-কে মুক্ত করে দিল। তারা বুঝতে পারল যে জাজিরাতুল আরবে এখন মুসলমানরা এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে যার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মানে দেয়ালের সাথে মাথা ঠোকার নামান্তর। তারা তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা সম্পর্কেও সচেতন ছিল, যার কারণ ছিল সিরিয়া ও ইরাকের বাণিজ্য পথগুলোতে মুসলমানদের একের পর এক অভিযান। বিগত যুদ্ধগুলোতে তাদের ক্রমাগত জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ফলে সৃষ্ট সামরিক দুর্বলতাকেও তারা উপেক্ষা করতে পারছিল না। তাই তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমেই মুসলমানদের শক্তি হ্রাস করার এবং নিজেদের শক্তি সঞ্চয় ও বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল। এই পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রথমবারের মতো 'রিয়াস্ত-ই-মদিনা' বা মদিনা রাষ্ট্রকে একটি শক্তিশালী সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হচ্ছিল, কিন্তু এই তিক্ত বড়ি গেলা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। তারা অনেক চিন্তাভাবনা করে ছয়টি শর্ত নির্ধারণ করল এবং সুহাইল বিন আমরকে দূত বানিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পাঠাল। [১]

## সন্ধির শর্তাবলি ও সেগুলোর বিশ্লেষণ

সন্ধিপত্রের অধিকাংশ শর্ত আপাতদৃষ্টিতে কুরাইশদের পক্ষে ছিল এবং মুসলমানদের এতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু হুজুর (সা.) কুরাইশদের শর্তাবলি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা এই সিদ্ধান্ত নিল যে, সন্ধিপত্রের যেসব শর্ত কুরাইশরা নিজেদের জন্য অত্যন্ত উপকারী মনে করছে, বাস্তবে সেগুলো তাদের জন্য ততটা উপকারী নয়। আর যেসব শর্ত আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অসহনীয় মনে হচ্ছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও মদিনা রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হ্যাঁ, কিছু মুসলমানকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে পারে, তবে হুজুর (সা.)-এর পূর্ণ আশা ছিল যে মুসলমানরা তা সহ্য করে নেবে। এই কারণেই হুজুর (সা.) বলেছিলেন: "কুরাইশরা আমার কাছে এমন যেকোনো বিষয় দাবি করুক যাতে তারা আল্লাহর পবিত্রতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আমি তা কবুল করে নেব।" [২] ফলে আলোচনার মাধ্যমে ৬টি শর্ত নির্ধারিত হলো।

- ১. সন্ধিপত্রের প্রথম শর্ত ছিল এই যে, দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই শর্তের মাধ্যমে কুরাইশরা মক্কার ওপর মুসলমানদের সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কা দূর করতে চেয়েছিল। তারা জানত যে যদি আক্রমণ হয় তবে মুসলমানরা বিজয়ী হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। হুজুর (সা.) এটি কবুল করে নিলেন, কারণ আরব ভূখণ্ডে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের দাওয়াতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যেত এবং মানুষ মদিনার ইসলামি সমাজকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেত। [৩]

- ২. দ্বিতীয় শর্ত ছিল এই যে, মুসলমানরা এ বছর এভাবেই ফিরে যাবে, আগামী বছর এসে উমরা করবেন। এর মাধ্যমে কুরাইশরা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে এখনও তারাই বিজয়ী, তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ এবং মুসলমানরা পরাজিত। [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৩১, ২৭৩২, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতি ফিল জিহাদ

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৩১

[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩১৭

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৩১, ২৭৩২, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতি ফিল জিহাদ

https://t.me/BoierSomahar

এই শর্তটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল; কারণ তারা বাইতুল্লাহ যিয়ারতের জন্য ব্যাকুল ছিলেন এবং কুরাইশদের সাথে সেই সময় এই বিষয়েই দ্বন্দ্ব চলছিল। এই শর্ত মেনে নেওয়া পরাজয় স্বীকার করার সমতুল্য ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাময়িকভাবে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা দম্ভ বজায় রাখতে দিলেন; কারণ তিনি জানতেন যে এর ফলে বাস্তব পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না এবং কুরাইশরা বাস্তবে এর মাধ্যমে কোনো শক্তি অর্জন করতে পারবে না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বছর ফিরে যাওয়া এবং আগামী বছর উমরাহ করার শর্তটি গ্রহণ করে নিলেন।

কিন্তু কুরাইশদের আশঙ্কা ছিল যে, আগামী বছর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আসবেন, তখন সম্ভব হতে পারে তিনি মক্কায় দীর্ঘকাল অবস্থান করবেন, অথবা অস্ত্রের জোরে শহরটি দখলে নেবেন। আর তা না হলেও এই আশঙ্কা তো ছিলই যে, মক্কার অসহায় ও নিরুপায় মুসলমানরা সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনায় চলে যাবে। তাই তারা শর্ত [২]-এর সাথে কিছু উপ-ধারা যোগ করার জন্য জেদ ধরল, যা ছিল নিম্নরূপ:

- (ক) আগামী বছর উমরাহর সময় মক্কায় মুসলমানদের অবস্থান হবে মাত্র তিন দিন।
- (খ) মুসলমানরা খাপবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সাথে রাখবে না।
- (গ) মুসলমানরা মক্কার কোনো বাসিন্দাকে সাথে নিয়ে যাবে না।
- (ঘ) যদি মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ মক্কায় থাকতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এটিও গ্রহণ করে নিলেন। [১]

[৩] তৃতীয় শর্তটি ছিল এই যে, যদি মক্কাবাসীদের কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এসে মিলিত হয়, তবে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। [২]
এভাবে কুরাইশরা তাদের যুবকদের ইসলামে প্রবেশের পথ বন্ধ করতে চেয়েছিল যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়।

এই শর্তটি মুসলমানদের জন্য অসহনীয় ছিল যে, তারা তাদের এমন কোনো মুসলমান ভাইকে যে হিজরত করে মদীনায় এসেছে, পুনরায় কুরাইশদের কবলে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করা সত্ত্বেও এই কথাটি মেনে নিলেন। সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়ে ব্যথিত দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সান্ত্বনা দিলেন যে, আল্লাহ শীঘ্রই এমন লোকদের জন্য কোনো পথ বের করে দেবেন। তিনি জানতেন যে, এই শর্ত পালনের ফলে ইসলাম এবং মদীনা রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। উপরন্তু, এই শর্তের কারণে যদি কুরাইশদের কিছু লোকের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়, তবে এর বিনিময়ে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণে অন্যান্য ডজন ডজন গোত্রে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪২৫১, কিতাবুল মাগাযী; হা: ২৬৯৯, কিতাবুস সুলহ; সহীহ বুখারী, হা: ৪২৫১, কিতাবুল মাগাযী, বাবু উমরাতিল কাযা। এই উপ-ধারাগুলোর মধ্যে “ধারা: ঘ” সম্ভবত কুরাইশরা এই ভেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল যে, মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক হয়তো দীর্ঘ নির্বাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ঘরে ফিরে আসতে চাইবে এবং তাদের মক্কায় অবস্থানের ফলে মুসলমানদের শক্তি বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আগতদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ছাড়া মক্কায় থাকতে চেয়েছিল। ভবিষ্যতেও কোনো মুসলমান এমনটি করেনি এবং এর ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৩১, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতি ফিল জিহাদ।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি এই দিকটির ওপরও ছিল যে, আকিদা এমন কোনো বিষয় নয় যা জোর-জবরদস্তি ও সহিংসতার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়, তা তো হৃদয়ের ব্যাপার। তাই যারা অন্তর থেকে ঈমান আনবে, কুরাইশদের ধরপাকড় তাদের ঈমান পরিবর্তন করতে পারবে না। হ্যাঁ, তাদের ব্যক্তিগতভাবে কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, তবে তাদের ব্যাপারে আপনার আশা ছিল যে তারা এই পরীক্ষাগুলোতে সফল হয়ে বেরিয়ে আসবে।

- চতুর্থ শর্তটি ছিল এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে মক্কাবাসীদের সাথে এসে যোগ দেয়, তবে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

এই শর্তের মাধ্যমে কুরাইশরা তাদের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পথ খোলা রাখতে চেয়েছিল। হুজুর ﷺ এটি ভেবে তা মঞ্জুর করে নিলেন যে, যদি কোনো দুর্ভাগা নিজেই ইসলামের সঙ্গ ত্যাগ করতে চায়, তবে তার চলে যাওয়াই ভালো হবে। [১]

•

পঞ্চম শর্তটি ছিল এই যে, উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত থাকবে।

•

ষষ্ঠ শর্তটি ছিল এই যে, অন্যান্য গোত্রগুলোর মধ্যে যে চায় কুরাইশদের মিত্র হয়ে এবং যে চায় মুসলমানদের মিত্র হয়ে এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। [২]

এটি একটি ন্যায়সঙ্গত বিষয় ছিল যা মুসলমানদের জন্য উপকারী ছিল; কারণ এর ফলে তারা নতুন মিত্র পেতে পারত এবং পুরো আরবে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হতে পারত। এই শর্তের অধীনে তৎকালীন সময়ে উপস্থিত বনু খুজাআ হুজুর ﷺ-এর এবং বনু বকর কুরাইশদের মিত্র হয়ে এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হলো। [৩]

সবশেষে রসূলুল্লাহ ﷺ এই শর্তটি যোগ করালেন:

“আমাদের সেই অধিকারগুলোই তোমাদের জিম্মায় থাকবে যা তোমাদের আমাদের জিম্মায় থাকবে।” [৪]

মুশরিকরাও এমন যুক্তিসঙ্গত বিষয়ে কোনো আপত্তি করতে পারল না। এই শর্তের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের সমান মর্যাদা স্বীকৃত করিয়ে নিলেন।

**সন্ধিপত্র লেখার ক্ষেত্রে কুরাইশদের আপত্তি এবং হুজুর ﷺ-এর চরম সহনশীলতা:**

এই চুক্তি সভায় কুরাইশদের আচরণ ছিল চরম জেদ, অস্থিরতা এবং অনিচ্ছার প্রতিফলন, অন্যদিকে রসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত সহনশীলতা, উচ্চ মনোবল এবং দূরদর্শিতার সাথে চুক্তিটিকে সফল করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। চুক্তির শর্তাবলি লেখানোর জন্য হুজুর ﷺ নিজের পক্ষ থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লেখক নিযুক্ত করেছিলেন। [৫] তিনি ইসলামী আদব...

---

[১] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩১৭

[২] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩১৭

[৩] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩১৮

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ২/১০১

[৫] সহীহ মুসলিম, হা: ১৭৮৩, কিতাবুল জিহাদ, বাবু সুলহিল হুদাইবিয়াহ

শিষ্টাচার অনুযায়ী দলিলের শুরু “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ” (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম) দিয়ে করা হলো। এতে কাফেররা আপত্তি জানালো এবং বললো: “আমরা আল্লাহকে চিনি, রহমান ও রহিমকে চিনি না। এখানে ‘بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ’ (বিসমিকা আল্লাহুম্মা) লিখুন।”

রাসুল ﷺ তাদের কথা মেনে নিলেন এবং এটাই লিখিয়ে দিলেন। [১]

এরপর হযরত আলী رضى الله عنه লিখলেন: “এটি সেই দলিল, যার অঙ্গীকার মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ করেছেন।”

এই বাক্যটি দেখামাত্রই কুরাইশ নেতারা শোরগোল শুরু করে দিল: “আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলে মানতামই, তবে কেন কোনো বিষয়ে বাধা দিতাম? আপনি (আমাদের নিকট কেবল) মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। আপনি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ-ই লেখান।”

রাসুল ﷺ বললেন: “আমি মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ-ও বটে, আবার আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ-ও বটে। যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ।” [২]

অতঃপর রাসুল ﷺ বিবাদ মেটানোর জন্য হযরত আলী رضى الله عنه-কে বললেন: “ঠিক আছে, এটি মুছে দাও।”

হযরত আলী رضى الله عنه-এর জন্য বরকতময় নাম মোছার চেয়ে নিজেকে মিটিয়ে ফেলা সহজ ছিল। তিনি আরজ করলেন: “না, আল্লাহর কসম! আপনার সম্মানিত নাম আমি কখনোই মুছব না।” পরিশেষে রাসুল ﷺ নিজেই কলম নিলেন এবং হযরত আলী رضى الله عنه-কে বললেন: “আমাকে সেই জায়গাটি দেখাও (যেখানে রাসুলুল্লাহ লেখা আছে)।” তিনি সেই স্থানটি দেখালেন। রাসুল ﷺ তা মুছে দিলেন। যদিও আপনার লিখনশৈলীতে দক্ষতা ছিল না, তবুও আপনি নিজ বরকতময় হাতে তার স্থলে “বিন আবদুল্লাহ” লিখে দিলেন। [৩]

**ধৈর্য ও আনুগত্যের এক কঠিন পরীক্ষা:**

এখনো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়নি, এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যা মুসলমানদের সাহস, ধৈর্য এবং রাসুলের আনুগত্যের এক কঠিন পরীক্ষা ছিল। ঘটনাটি হলো, কুরাইশদের দূত সুহাইল বিন আমরের তরুণ পুত্র আবু জানদাল মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর শাস্তিস্বরূপ তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কার নিকটবর্তী হওয়ার খবর শুনে তিনি কোনোভাবে পালিয়ে এলেন এবং এমন অবস্থায় রাসুল ﷺ-এর দরবারে পৌঁছালেন যে তার পায়ে বেড়ি পরা ছিল।

সুহাইল বিন আমর তাকে দেখে বললেন যে, চুক্তি অনুযায়ী তাকে ফেরত দিতে হবে। রাসুল ﷺ বললেন:

“এখনো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়নি।” কিন্তু সুহাইল বিন আমর তাকে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে জেদ ধরলেন।

অবশেষে রাসুল ﷺ তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত উমর رضى الله عنه এটি দেখে অস্থির হয়ে বললেন:

“হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি হকের ওপর এবং আমাদের শত্রু কি বাতিলের ওপর নেই? তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে মাথা নত করব?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন: “উমর! আল্লাহ আমার সাহায্যকারী।”

তিনি বললেন: “আপনি কি বলেননি যে আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব?”

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১০১/২

[২] সহিহ মুসলিম, হা: ৪৫৩১, কিতাবুল জিহাদ, বাব সুলহুল হুদায়বিয়্যাহ; সহিহ বুখারি, হা: ৩২৫১, কিতাবুল মাগাজি, বাব উমরাতুল কাজা

[৩] সহিহ মুসলিম, হা: ৪৫৩১, কিতাবুল জিহাদ, বাব সুলহুল হুদায়বিয়্যাহ; সহিহ বুখারি, হা: ৩২৫১, কিতাবুল মাগাজি, বাব উমরাতুল কাজা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “হ্যাঁ! কিন্তু আমি কি বলেছিলাম যে এই বছরই করব?” [১]

শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জানদাল (রা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। আপনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা তাদের পশুগুলো কোরবানি করে এবং মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম খুলে ফেলেন। [২] ২৯ জিলহজ আপনি মদিনায় ফিরে আসলেন। [৩]

**আবু বসর (রা.)-এর কর্মকাণ্ড:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার পর বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি যে, মক্কা থেকে একজন মুসলিম আবু বসর (রা.) কাফেরদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে আপনার খেদমতে চলে আসলেন। কুরাইশরা চুক্তি অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়ে দুইজন দূত পাঠালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কুরাইশদের দূতদের সাথে রওয়ানা হলেন, কিন্তু পথিমধ্যে সুযোগ বুঝে তাদের একজনকে হত্যা করে ফেললেন এবং পালিয়ে পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন:

“আপনি তো চুক্তি অনুযায়ী আমাকে তাদের সাথে পাঠিয়ে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন, এরপর আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন।”

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার অবস্থান করা তখনও চুক্তির লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই আপনি বললেন:

“যদি তার (আবু বসর) সাথে আরও লোক থাকত, তবে সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিত।”

তিনি বুঝতে পারলেন যে তার এখানে অবস্থান করা সমীচীন নয় এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেফতার করতে অন্য কোনো প্রতিনিধি দল আসলে তাকে পুনরায় মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ মদিনা থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং সমুদ্রতীরে ‘সাইফুল বাহর’ নামক স্থানে কুরাইশদের কাফেলার পথের একপাশে আলাদাভাবে থাকতে শুরু করলেন।

কিছুদিন পর আবু জানদাল (রা.)-ও মক্কা থেকে পালিয়ে তার কাছে চলে আসলেন। ধীরে ধীরে কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসা ডজন ডজন যুবক পালিয়ে এখানে সমবেত হতে লাগলেন এবং তাদের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এই যুবকরা একটি স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হয়ে কুরাইশদের প্রতিটি যাতায়াতকারী বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা চালাতে লাগলেন। তাদের হামলাগুলো এমন ধারাবাহিকতায় হচ্ছিল যে কুরাইশদের সিরিয়া...

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৭৩১, কিতাবুশ শুরূত; সীরাত ইবনে হিশাম: ২/৩১৮, ৩১৯

[২] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/৩১৯

[৩] হুদায়বিয়ার যুদ্ধের জন্য নবী ﷺ বৃহস্পতিবার জিলকাদা মাসের শুরুতে বের হয়েছিলেন... এবং জিলহজ মাসের শেষে ফিরে আসেন। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১৫) এখানে মনে রাখা উচিত যে এটি ছিল মাদানি জিলকাদা, মক্কি নয়। যদি মক্কি হতো তবে এটি হতো হজের তৃতীয় মাস যাতে মুশরিকরা উমরা করা নিষিদ্ধ মনে করত বরং একে সবচেয়ে বড় গুনাহ মনে করত।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তারা মনে করত হজের মাসগুলোতে উমরা করা চরম পাপাচার। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৫৬৩, বাবুত তামাত্তু ওয়াল কিরান)

আরবদের এই প্রাচীন প্রথা মুসলিমরাও এতটাই মানত যে বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে উমরার ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলে তাদের কাছেও বিষয়টি কষ্টকর মনে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের গুরুত্বের সাথে জানালেন যে এখন এটি ঘোষণা হয়ে গেছে। তারা যখন উমরা সম্পন্ন করল তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এখন কি সব কিছু হালাল? তিনি বললেন: সব কিছুই হালাল। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৫৬৩, বাবুত তামাত্তু ওয়াল কিরান)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই মাসে উমরার জন্য জেদ করা মুশরিকদের আরও ক্ষুব্ধ করার বরং যুদ্ধ শুরু করার কারণ হতো, অথচ আপনি ﷺ শুধুমাত্র উমরার জন্য গিয়েছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে মক্কি নয় বরং মাদানি ক্যালেন্ডারের জিলকাদা ছিল।

রইল এই কথা যে, তবে মুশরিকরা এই মাসকে শাহরে হারাম (নিষিদ্ধ মাস) কেন মানছিল? এর কারণ ছিল এই যে, এই মাদানি জিলকাদা মক্কি ক্যালেন্ডারের রজব মাসের বিপরীতে আসছিল, যা শাহরে হারামই ছিল। বরং এই মাসে মক্কায় উমরার আধিক্য হতো যার কারণে এই উপলক্ষকে “হজ্জে আসগর” বলা হতো। আর উমরা হলো ইসলামের “হজ্জে আসগর”-এর সমতুল্য এবং জাহেলি যুগের লোকেরা রজব মাসে এটি আদায় করত। (আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব ক্বাবলাল ইসলাম: ১১/৪৯১)

এর বাণিজ্য যা আগেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন করল যে, সন্ধিপত্র থেকে সেই ধারাটি বাদ দেওয়া হোক যার অধীনে মক্কা থেকে আপনার কাছে আসা ব্যক্তিদের ফেরত দেওয়া জরুরি ছিল; এখন যে-ই আপনার কাছে আসবে, তাকে নিরাপদ মনে করা হবে। এভাবে আবু জানদাল (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী যারা উপকূলে অবস্থান করছিলেন, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আসার সুযোগ পেলেন, তবে আবু বাসীর (রা.) এর আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। [১]

আবু বাসীর (রা.)-এর অভিযানের ওপর ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমরীর গবেষণামূলক মন্তব্য:

আবু বাসীরের এই অভিযান ছিল ইসলামী ইতিহাসের এক অনন্য অভিজ্ঞতা যা পরিস্থিতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বর্তমান যুগের প্রখ্যাত গবেষক জনাব ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমরী এই ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

“হযরত আবু জানদাল (রা.) এবং হযরত আবু বাসীর (রা.) ঈমানের খাতিরে অশেষ কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু তারা চরম দৃঢ়তা, নিয়তের ইখলাস এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়ে নিজেদের সংগ্রাম ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন যতক্ষণ না মুশরিকদের মাথা নত করে দিয়েছেন। তারা মুসলমানদের ওপর থেকে সেই কঠোর শর্তটি সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালেন যা মুশরিকরা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তাদের ওপর আরোপ করেছিল। এই ঘটনা ঈমানের প্রতি আনুগত্য এবং এর জন্য সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ঘটনা থেকে এই নীতিও পাওয়া যায় যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি এমন কাজ করে ফেলে যা পুরো সমাজ করতে পারে না।”

আবু বাসীর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা মুশরিকদের এমন এক সময়ে আঘাত হেনেছিলেন যখন ইসলামী রাষ্ট্র তা করতে অক্ষম ছিল; কারণ মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে সন্ধি ও শান্তির শর্তাবলী স্থির করে ফেলেছিল। হযরত আবু বাসীর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা যদিও বাহ্যিকভাবে মদীনা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার বাইরে ছিলেন। তবুও তিনি এবং তাঁর সাথে মক্কার মজলুম মুসলমান সাথীরা এই সমস্ত কার্যক্রম কেবল এমন ইজতিহাদ থেকে করেননি যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মতি ছিল না। যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) চাইতেন তবে শুরুতেই আবু বাসীর (রা.)-কে কুরাইশ কাফেলাগুলোর ওপর হামলা করতে নিষেধ করে দিতেন অথবা মক্কায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু আপনি (সা.) তা করেননি যা আপনার সম্মতির লক্ষণ ছিল।

হযরত আবু বাসীর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল। তারা মক্কায় থেকে জুলুম সহ্য করতে থাকাও পছন্দ করেননি এবং এটাও মেনে নেননি যে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করা হতে থাকবে। তারা এমন এক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে কেবল তারা মক্কাবাসীদের জুলুম-নিপীড়ন থেকেই মুক্তি পাননি বরং এই কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে মদীনা রাষ্ট্রও সাহায্য পেয়েছিল; কারণ এই কার্যক্রমগুলোর ফলে কুরাইশদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই কার্যক্রমগুলোর একটি সুফল এটাও সামনে এসেছিল যে, সন্ধির যুগেও কুরাইশরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ছিল। এটাও বলা যেতে পারে...

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৭৩১, কিতাবুল জিহাদ, বাবুশ শুরূতি ফিল জিহাদ; উসদুল গাবাহ, রা: আবু বাসীর (রা.), আবু জানদাল (রা.); আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮৬/২

যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বসর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মপদ্ধতিকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন; কারণ তিনি বলেছিলেন:

‘তার মায়ের জন্য আফসোস! সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার লোক, যদি তার সাথে আরও কেউ থাকত।’ [১]

**সন্ধির প্রভাব:**

‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো, যা তিনি হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে এই শব্দে প্রকাশ করেছিলেন: ‘কুরাইশদের জন্য আফসোস, যুদ্ধ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের কী ক্ষতি হবে যদি তারা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দেয় এবং অন্যান্য আরবদের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এরপর যদি অন্য আরব গোত্রগুলো আমার ওপর বিজয়ী হয়, তবে কুরাইশদের উদ্দেশ্য এমনিতেই পূর্ণ হয়ে যাবে, আর যদি আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করেন, তবে কুরাইশরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে।’ [২]

**খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর বিন আস-এর ইসলাম গ্রহণ:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার লক্ষণগুলো খুব দ্রুত প্রকাশ পেতে শুরু করল। খোদ কুরাইশদের বড় বড় অভিজাত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের হৃদয়ে ইসলাম জায়গা করে নিতে লাগল। যখন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজেরা আবেদন করে সন্ধিপত্র থেকে মক্কার নতুন মুসলিমদের মদিনা মুনাওয়ারা থেকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর ধারাটি বাতিল করাল, তখন তার কিছু দিন পরই কুরাইশদের তিনজন সম্মানিত ও যোগ্য যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পৌঁছে গেলেন।

তাদের মধ্যে একজন ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, যার চেয়ে বড় অশ্বারোহী এবং রণবীর মক্কায় আর কেউ ছিল না। দ্বিতীয়জন ছিলেন আমর বিন আস, যার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সবাই অবগত ছিল। তৃতীয়জন ছিলেন উসমান বিন তালহা, যার পরিবার ছিল কাবা ঘরের চাবির রক্ষক। যখন এই তিনজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন:

“মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে।” [৩]

---

[১] আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আস-সহীহাহ: ২/৪৫১, ৪৫২।

দ্রষ্টব্য: বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শব্দগুলো হলো: “ওয়াইলু উম্মিহি মিসআরু হারবিন লাও কানা লাহু আহাদুন”। তবে এখানে “ওয়াইল” দ্বারা বদদোয়া নয় বরং প্রশংসা উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার লেখেন: এটি তেমন যেমন কোনো কবির কবিতা ভালো হলে বলা হয় ‘কাতাল্লাহুল্লাহু’ (আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন)... এবং এরই অন্তর্ভুক্ত হলো তাঁর কথা “ওয়াইলু উম্মিহি মিসআরু হারবিন”, যার দ্বারা তিনি তার প্রশংসা করতে চেয়েছেন। (আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা: ৩/৪৮) হাফেজ ইবনে হাজার ইমাম খাত্তাবীর বরাতে লেখেন: “যেন তিনি তাকে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া এবং যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করার গুণে গুণান্বিত করছেন।” এরপর হাফেজ ইবনে হাজার এই হাদিসের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: “এতে তার পলায়নের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যাতে তাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত না পাঠানো হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে যাদের কাছে এই খবর পৌঁছাবে তাদের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যেন তারা তার সাথে মিলিত হয়। শাফেয়ী ও অন্যান্য জমহুর উলামাগণ বলেছেন: এ বিষয়ে ইঙ্গিতে কথা বলা জায়েজ, স্পষ্টভাবে নয়।” (ফাতহুল বারী: ৫/৩৫০)

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৮৯১০; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৮২

[৩] উসদুল গাবাহ, জীবনী: খালিদ বিন ওয়ালিদ, উসমান বিন তালহা; জামিউল উসুল ফি আহাদিসির রাসূল লি ইবনিল আসির আল-জাযারি: ১২/৫৯৭

## আক্রমণাত্মক জিহাদের সূচনা

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই হুজুর আকরাম ﷺ জিহাদ ও ইসলামী রাজনীতির আরও একটি মহান পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং প্রথমবারের মতো মদিনার বাইরে সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল হয় প্রতিরক্ষামূলক যেমন ওহুদ যুদ্ধ এবং খন্দক যুদ্ধ, অথবা সেগুলোর অবস্থান ছিল শত্রুর এলাকা, কাফেলা এবং রসদ ইত্যাদির ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর মতো। এখন পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের এলাকা থেকে বের হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্য কোনো শহর বা এলাকা দখল করেনি। বনু নযীর, বনু কায়নুকা এবং বনু কুরায়যার যুদ্ধগুলোতে যদিও দুর্গগুলো দখল করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল মদিনার অভ্যন্তরীণ ফ্রন্ট। এমন যুদ্ধ যাতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে শত্রুর এলাকা দখল করা হয়, তা প্রথমবারের মতো খায়বার যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল যা হুদায়বিয়ার সন্ধির দুই মাস পর মহরম ৭ হিজরিতে ঘটেছিল। একেই "আক্রমণাত্মক জিহাদ" বলা হয় এবং "প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ"-এর মতো এটিও জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার।

## খায়বার: ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র:

খায়বার কোনো একটি দুর্গের নাম নয় বরং এটি মদিনার উত্তরে নব্বই মাইল (১৪৪ কিলোমিটার) দূরে ইহুদিদের ডজন ডজন জনবসতি, ছোট-বড় দশটি দুর্গ এবং বাগান সম্বলিত একটি বিশাল এলাকা ছিল। দুর্গগুলোর মধ্যে সাতটি ছিল একটি বৃত্তের মধ্যে এবং তিনটি আলাদা আলাদা। এখানকার ইহুদিরা ছিল কৃষিভিত্তিক এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তারা যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শী ছিল এবং মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। মদিনা থেকে বহিষ্কৃত বনু নযীর এবং বনু কায়নুকার অনেক ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকও এখানে এসে এই ষড়যন্ত্রে শরিক হয়েছিল। এভাবে খায়বার জাজিরাতুল আরবে ইহুদিদের শক্তির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যার দুর্গগুলোতে বিশ হাজার সশস্ত্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিল।

খন্দক যুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে মদিনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিতকারীও ছিল ইহুদিরা। বনু নযীরের সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাবের হত্যার পর সালাম ইবনে আবিল হুকাইক (আবু রাফে আবদুল্লাহ) ইহুদিদের প্রধান নিযুক্ত হলে সে খায়বারকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত করে। সে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করত এবং বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দিত। অবশেষে হুজুর ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে আতিক আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গোপন অভিযানে খায়বার পাঠিয়ে এই ফিতনাবাজ সর্দারকে হত্যা করান। [১]

## খায়বার যুদ্ধের ভূমিকা: ইউসাইর ইবনে রাজাম হত্যা:

এখন "ইউসাইর ইবনে রাজাম" খায়বারের সর্দার হলো এবং সে-ও সালাম ইবনে আবিল হুকাইকের মতো গাতাফানের সাহায্যে মদিনা মুনাওয়ারার ওপর...

---

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৯০ থেকে ৩৯৩।

আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ৬ হিজরির শাওয়াল মাসে আবদুল্লাহ বিন উনাইস এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-কে খায়বারে পাঠালেন এবং ইউসাইর বিন রিজামকে এই প্রস্তাব দিলেন যে, সে যেন মদিনায় এসে সন্ধির আলোচনা করে, তার শাসন মেনে নেওয়া হবে। [১]

ইউসাইর বিন রিজাম এই প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করল এবং তার কিছু সঙ্গীর সাথে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কূটনৈতিক দলের সদস্যরাও তার সাথে ছিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে সন্দেহের পরিবেশ বিরাজ করছিল। যার ফলে পথিমধ্যে ইউসাইর বিন রিজাম আবদুল্লাহ বিন উনাইস (রা.)-এর তলোয়ার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। এতে কথা কাটাকাটি বেড়ে গেল এবং লড়াইয়ে ইউসাইর বিন রিজাম নিহত হলো। [২] এই ঘটনার পর মদিনা ও খায়বারের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠল।

**গজওয়া যি কারাদ - এক অল্পবয়স্ক সাহাবির সাহস ও বীরত্বের ঐতিহাসিক ঘটনা:**

সেই দিনগুলোতে বনু গাতাফানের আক্রমণকারীরা মদিনার চারণভূমি গাবাহ (যি কারাদ)-তে আক্রমণ করে গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায় এবং তাদের পাহারাদারকে হত্যা করে। এই সব ঘটেছিল রাতের শেষ অংশে। একজন অল্পবয়স্ক সাহাবি সালামা বিন আকওয়া (রা.) ফজরের আগে তীর-ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গাবাহর দিকে যাচ্ছিলেন। কেউ তাকে লুটের খবর দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পাহাড়ে চড়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করলেন: “ইয়া সাবাহাহ!” এই ঘোষণা দিয়ে তিনি লুটেরাদের পিছু নিলেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিলেন [৩] এবং তার লক্ষ্যভেদ ছিল প্রশংসনীয়। শীঘ্রই তিনি শত্রুদের কাছাকাছি পৌঁছে তাদের ওপর তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। সাথে সাথে তিনি এই স্লোগান দিচ্ছিলেন:

“আনা ইবনুল আকওয়া... আল-ইয়াওমু ইয়াওমুর রুদ্দা” (আমি ইবনুল আকওয়া, আজ তোমাদের নানি-দাদি মনে পড়ে যাবে।)

হযরত সালামা (রা.)-এর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ, যাকে লাগত সে আহত বা নিহত হয়ে পড়ে যেত। প্রথমে লুটেরারা মনে করেছিল যে তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য অনেকে আসছে, তাই তারা প্রাণপণে পালাতে লাগল। কিন্তু পরে তারা বুঝতে পারল যে এটি মাত্র একজন কিশোর যে তাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এবার লুটেরারা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ওপর আক্রমণ করার এবং তাকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু যখনই কোনো অশ্বারোহী তার দিকে আসত, তিনি কোনো গাছ বা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে তীর ছুড়তেন এবং তাদের ঘোড়াকে জখম করে দিতেন, ফলে তারা প্রাণ বাঁচাতে ফিরে পালিয়ে যেত। হযরত সালামা (রা.) লুটেরাদের এমনভাবে তাড়া করলেন যে তারা দিশেহারা হয়ে লুট করা উট ছাড়াও তাদের অতিরিক্ত সফরের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে যেতে লাগল। সালামা (রা.) সেই ফেলে যাওয়া মালামালের ওপর পাথর দিয়ে চিহ্ন দিচ্ছিলেন যাতে পেছন থেকে আসা মুসলমানরা একে গনিমত হিসেবে চিনে নিতে পারে।

সামনে গিয়ে সমতল এলাকা শেষ হয়ে গেল এবং পাহাড়ি উপত্যকা শুরু হলো। লুটেরারা নিচু পথে এবং সালামা (রা.) উচ্চস্থানে থেকে তাদের ওপর বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর লুটেরাদের সাহায্যের জন্য একটি দল এসে পৌঁছাল। এবার তাদের সাহস বেড়ে গেল এবং তারা এই একাকী মুজাহিদকে ধরার চেষ্টা করল। সালামা (রা.) একটি পাহাড়ে চড়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করে বললেন: “আমি আকওয়ার পুত্র, সেই সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্মান দান করেছেন! তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে ধরতে পারবে না...”

---

[১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১১/৬।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/২৫৯; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৭৭।

[৩] তার সাহেবজাদা বলতেন: “আমার পিতা দৌড়ে ঘোড়াকে ছাড়িয়ে যেতেন।” (মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৫৩১, ইসনাদ সহিহ)।

“ধরা সম্ভব নয় এবং আমি যাকে চাই তাকে ধরতে পারি।”

তারা ঘাবড়ে গেল, হযরত সালামাহ বিন আল-আকওয়া (রা.) তাদেরকে কথার জালে আটকে রেখেছিলেন যাতে মদিনা থেকে মুসলমানদের সাহায্য এসে পৌঁছায়।

কিছুক্ষণ পর দূর থেকে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি অশ্বারোহী দল আসতে দেখা গেল। তারা ময়দানে পৌঁছানো মাত্রই লড়াই শুরু হয়ে গেল, লুটেরাদের সর্দার নিহত হলো এবং বাকিরা পালিয়ে গেল। হযরত সালামাহ (রা.) আবারও তাদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাদের অনুসরণ করতে থাকলেন। পলায়নরত লুটেরারা পানি পান করার জন্য একটি পুকুরের কাছে থামল, কিন্তু যখন তারা হযরত সালামাহ (রা.)-কে আসতে দেখল, তখন ভয়ে পানি পান না করেই পালিয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল, হযরত সালামাহ (রা.) তাকে ধাওয়া করে একটি পাহাড়ের গিরিপথে ধরে ফেললেন এবং তীর নিক্ষেপ করার সময় চিৎকার করে বললেন:

“আমি ইবনে আল-আকওয়া—আজকের দিনটি হলো নীচ লোকদের ধ্বংসের দিন।”

তীরটি তার কাঁধ ভেদ করে চলে গেল এবং সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলল: “আরে! তুমি কি সেই সকালের ইবনে আল-আকওয়া?”

হযরত সালামাহ (রা.) উত্তর দিলেন: “হ্যাঁ! ওরে নিজের প্রাণের শত্রু! আমি সেই সকালের ইবনে আল-আকওয়া।”

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তাই হযরত সালামাহ (রা.) ডাকাতদের দুটি ঘোড়া নিজের দখলে নিয়ে ফিরে চললেন। পথে দেখলেন যে হুজুর নবী কারীম (সা.) স্বয়ং আরও সাহাবায়ে কেরামসহ তাশরীফ এনেছেন। কাফিররা যে উটনী, চাদর এবং বল্লম ফেলে গিয়েছিল, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সেগুলো একত্রিত করেছিলেন। হযরত বিলাল (রা.) একটি উটনী যবেহ করে তার কলিজা ও কুঁজ ভাজছিলেন যাতে হুজুর (সা.) তা গ্রহণ করেন। হযরত সালামাহ (রা.) দরবারে রিসালাতে আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আমাকে একশ জন লোক দেন, তবে আমি শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে তাদের খতম করে দেব।

হুজুর (সা.) সেই অল্পবয়সী জানবাজের সাহস ও হিম্মত দেখে এতই খুশি হলেন যে হেসে দিলেন। তারপর বললেন: “এখন আর পিছু ধাওয়া করা সমীচীন নয়। তারা তাদের গোত্রে পৌঁছে গেছে।” সারারাত বিশ্রাম নিয়ে সকালে যখন মদিনা মুনাওয়ারার দিকে রওনা হলেন, তখন হুজুর (সা.) হযরত সালামাহ বিন আল-আকওয়া (রা.)-কে নিজের সাথে নিজের উটনীর পিঠে বসিয়ে নিলেন, যা সেই যুবকের জন্য ছিল এক বিশাল সম্মান। [১]

ইমাম বুখারির মতে, এই যুদ্ধ যাকে গাযওয়া-এ-যি কারাদ বলা হয়, তা খয়বর আক্রমণের তিন দিন আগে সংঘটিত হয়েছিল। [২]

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৬৭৩, অধ্যায়: গাযওয়া-এ-যি কারাদ।

দ্রষ্টব্য: সালামাহ বিন আল-আকওয়া (রা.)-এর মৃত্যু ৭৪ হিজরিতে হয়েছে। হাফেজ আব্দুল বার (রহ.) এবং ইবনে আসীর জাযারী (রহ.) তাঁর বয়স ৮০ বছর উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবাহ, আসাদুল গাবাহ, জীবনী: সালামাহ বিন আল-আকওয়া)। এই হিসাব অনুযায়ী ৬ হিজরিতে গাযওয়া-এ-যি কারাদের সময় তাঁর বয়স ১৩ বছর হয়, কিন্তু তার কিছুদিন আগে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল যাতে তাঁর অংশগ্রহণ প্রমাণিত। (সহীহ মুসলিম, হা: ৪৬৭৭)। বাস্তবতা হলো হুজুর (সা.) কোনো নাবালককে এই সফরে সাথে নেননি, তাই নিশ্চিতভাবেই তিনি তখন বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) ছিলেন। তবে তিনি পূর্ণ যুবক ছিলেন না বরং যৌবনের প্রারম্ভে ছিলেন, কারণ স্বয়ং সহীহ বুখারিতে যেখানে তাঁর যুদ্ধগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে বদর, ওহুদ এবং খন্দকের কোনো উল্লেখ নেই বরং হুদাইবিয়া, খয়বর এবং তার পরবর্তী যুদ্ধগুলোর উল্লেখ রয়েছে। (সহীহ বুখারি, হা: ৪২৭৩)। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হুদাইবিয়া ছিল তাঁর প্রথম সফর অর্থাৎ তিনি নিশ্চিতভাবেই বালেগ হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স অর্থাৎ ১২ বছর অতিক্রম করেছিলেন। যদি বালেগ হওয়ার বয়স ১৪-১৫ বছর ধরা হয়, তবে হুদাইবিয়ার সময় তাঁর বয়স ১৫-১৬ বছর হবে। গাযওয়া-এ-যি কারাদ হুদাইবিয়ার মাত্র কয়েক দিন পরেই ঘটেছিল। তাই সেই সময় তাঁর বয়স ১৫-১৬ বছর হবে। সুতরাং তাঁর শেষ বয়স ৮০ এবং ৭৫-এর মধ্যে দাঁড়ায়। তাই হাফেজ যাহাবী (রহ.) তাঁকে ‘আবনা-এ-তিসয়ীন’ (৯০ বছর বয়সী মুরুব্বি)-দের মধ্যে গণ্য করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/১৩৯, ত: আর-রিসালাহ), আল্লাহই ভালো জানেন।

[২] সহীহ বুখারি, কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায়: গাযওয়া-এ-যি কারাদ।

খায়বার যুদ্ধ (মুহাররম ৭ হিজরী)

আক্রমণকারী বনু ক্বারা গোত্র পালিয়ে বনু গাতফানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, যাদেরকে ইহুদিদের পক্ষ থেকে মদীনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত উস্কানি দেওয়া হচ্ছিল। এই সমস্ত আলামত খায়বারবাসীদের অপরাধ প্রমাণ করছিল। অবশেষে তাদের শায়েস্তা করার জন্য নবী আকরাম ﷺ ৭ হিজরীর মুহাররম মাসের শেষের দিকে চৌদ্দশ সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে খায়বারের দিকে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই চৌদ্দশ সাহাবীকেই নির্বাচন করেছিলেন যারা হুদায়বিয়ার সফরে সাথে ছিলেন। [১]

ইহুদিরা যদিও চারপাশ সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতভর সফর করে এত নিঃশব্দে সেখানে পৌঁছে গেলেন যে তারা কিছুই টের পায়নি। আপনি ﷺ সুবহে সাদেকের সময় খায়বারের দুর্গগুলোর সামনে ছাউনি ফেললেন। [২] অসতর্ক ইহুদিরা প্রাত্যহিক রুটিন অনুযায়ী চাষাবাদের সরঞ্জাম নিয়ে তাদের বাগানের দিকে বের হয়েছিল, কিন্তু যখনই লশকর বা বাহিনীর ওপর নজর পড়ল তখন তারা থমকে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে পুরো বিষয়টি বুঝতে পেরে উল্টো পায়ে নিজেদের দুর্গে ঢুকে পড়ল। জনপদে শোরগোল পড়ে গেল: "মুহাম্মদ বাহিনী নিয়ে চলে এসেছেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়েই দুর্গগুলো অবরোধ করতে শুরু করলেন। দুর্গ বিজয়ী সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, সা'দ বিন উবাদাহ এবং খাব্বাব বিন আল-মুনজির রাযিয়াল্লাহু আনহুম উল্লেখযোগ্য। [৩]

## কামুস বিজয় এবং মারহাবের হত্যা:

"কামুস" নামক দুর্গটি দুই দিন লাগাতার যুদ্ধের পরেও পদানত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে আপনি ﷺ ঘোষণা করলেন: "আগামীকাল আমি আক্রমণের ঝাণ্ডা তাকে দেব যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রিয় হবে।" [৪]

---

[১] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৫, আরও কিছু লোক সাথে হয়েছিল তবে তাদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তারা গনিমতে অংশীদার হবে না। (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৫)

[২] ওয়াকিদী খায়বার যুদ্ধের সময়কাল নির্ধারণে এক জায়গায় সফর বা রবিউল আউয়াল ৭ হিজরীর কথা উল্লেখ করেছেন। (আল-মাগাযী: ২/৪৩৪) ইবনে সাদ জুমাদাল উলা ৭ হিজরীর কথা উল্লেখ করেছেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/১০৬) মাওলানা ইসহাক আলভী মরহুমের মতে খায়বার যুদ্ধ হুদায়বিয়া থেকে ফেরার ৫ মাস পর জুমাদাল উলা ৭ হিজরী মোতাবেক মুহাররম ৮ হিজরীতে হয়েছিল। কিন্তু লেখকের কাছে এ বিষয়ে তাঁর দলিলগুলো শক্তিশালী মনে হয়নি। ইবনে ইসহাক, খলিফা বিন খাইয়াত, ইমাম তাবারী এবং ইবনে হাবিবসহ জুমহুর ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য হলো যে, খায়বার যুদ্ধ হুদায়বিয়া সন্ধি থেকে ফেরার প্রায় এক মাস পর মুহাররম ৭ হিজরীতে হয়েছিল। (সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩২৮; তারিখুত তাবারী: ৩/৯) এবং আলামত থেকে স্পষ্ট যে এই সময়কালই সঠিক। ইবনে হাবিব এই অতিরিক্ত তথ্যও দেন যে খায়বার থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন ১লা রবিউল আখের হয়েছিল। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১৫)

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/৬০ থেকে ২৬৫, ত. ইলমিয়্যাহ

[৪] রেওয়ায়েতে 'রায়াহ' (راية) শব্দ এসেছে যা সেই ছোট পতাকার জন্য ব্যবহৃত হতো যা আক্রমণকারী দলের সেনাপতির কাছে থাকত, একে 'আলাম'ও বলা হতো যা সাধারণত বর্শার মাথায় বেঁধে দেওয়া হতো। (العلم هو الراية، وقيل هو الذي يعقد على الرمح। ইযাহু শাওয়াহিদিল ইযাহ: ১/৩০৮) যদিও এটি প্রয়োজনে প্রধান সেনাপতি অর্থাৎ স্বয়ং নবী করীম ﷺ-এর কাছেও থাকত যেমনটি মুতার যুদ্ধে তিন সেনাপতির কাছে ছিল যারা একে একে শহীদ হয়েছিলেন। এটি সেই পতাকা থেকে আলাদা ছিল যা সেনাপতির কাছে থাকত, যাকে 'লিওয়া' বলা হতো যা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ময়দানে উপস্থিত থাকার প্রতীক হতো। যে অফিসার এটি বহন করত তাকে 'হামিলুল লিওয়া' বলা হতো। হামিলুল লিওয়া আমীরের সহকারী হিসেবে পছন্দনীয় ছিল, তাকে তাঁর সাথেই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ما من حامل لواء الا علىٰ امير (আল-মুযহির ফি উলুমিল লুগাতি ওয়া আনওয়াইহা: ২/৪০৯) এই কারণেই লিওয়া অবনমিত হওয়া বা পড়ে যাওয়া নেতৃত্বের মৃত্যু বা ائ‌پس (পিছু হটা)-এর সমার্থক মনে করা হতো। যুদ্ধগুলোতে লিওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থাকত। ঝাণ্ডাবাহী সাহাবী আপনার সাথেই থাকতেন। যেমন ওহুদ যুদ্ধে মুসআব বিন উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু হামিলুল লিওয়া ছিলেন। লিওয়া এবং রায়াহ-এর এই পার্থক্য না বোঝার কারণে অনেক সময় যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হয়। খায়বার যুদ্ধেও লিওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিল যখন রায়াহসমূহ বিভিন্ন সাহাবীকে দেওয়া হচ্ছিল। লিওয়া এবং রায়াহ-এর পার্থক্যের ওপর আল্লামা আইনী চমৎকার আলোচনা করেছেন। (উমদাতুল ক্বারী: ১৪/৩২২)

পরদিন সকালে সবাই প্রতীক্ষায় ছিলেন যে এই সৌভাগ্য কার ভাগ্যে জোটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডাকলেন, তাঁর চোখ দুটো ব্যথা করছিল। তিনি তাঁর চোখে লালা লাগিয়ে দিলেন, ফলে চোখ দুটি একেবারে ঠিক হয়ে গেল। তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বিশেষ নির্দেশনা দিলেন এবং আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। সেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। কামুস দুর্গের বিখ্যাত ইহুদি পালোয়ান 'মারহাব' কারো কাছে পরাজিত হতো না। হযরত আমের বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মোকাবিলায় বের হলেন। দুজনের তলোয়ার দুবার একে অপরের সাথে ধাক্কা খেল। মারহাবের পরবর্তী আঘাত হযরত আমের বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন, মারহাবের তলোয়ার তাঁর ঢালের ভেতরে ঢুকে গেল। হযরত আমের বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ঝুঁকে পড়ে নিজের তলোয়ার ঘুরালেন যাতে মারহাবের পায়ের নলা কেটে দিতে পারেন, কিন্তু সে সেই আঘাত থেকে বেঁচে গেল এবং তলোয়ারটি প্রচণ্ড বেগে ঘুরে স্বয়ং আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহরগে এসে লাগল। তিনি তখনই শহীদ হয়ে গেলেন। [১]

**হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে মারহাবের হত্যা:**

মারহাব ক্রমাগত মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করছিল, অবশেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মোকাবিলায় বের হলেন। মারহাব এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তাঁর দিকে এগিয়ে এল:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

"খায়বার জানে যে আমি মারহাব। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞ যোদ্ধা।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে এই রণসংগীত পাঠ করতে করতে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَة كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَة

"আমি সেই ব্যক্তি যার মা তার নাম রেখেছেন হায়দার অর্থাৎ সিংহ এবং আমি বনের সিংহের মতোই ভয়ংকর।"

সংঘর্ষ শুরু হতেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন জোরে আঘাত করলেন যে মারহাবের মাথা দুই টুকরো হয়ে গেল। [২]

**যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে ইয়াসির ইহুদির হত্যা:**

মারহাবের মৃত্যুর পর তার ভাই ইয়াসির রণসংগীত পাঠ করতে করতে ময়দানে নামল।

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي يَاسِرُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَاوِرُ

"খায়বার জানে যে আমি ইয়াসির, সশস্ত্র, সাহসী ও বীর।"

ওদিক থেকে হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু মোকাবিলায় এই কথা বলতে বলতে বের হলেন:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي زَبَّارُ قَرْمٌ لِقَوْمٍ غَيْرُ نَكْسٍ وَلَا فَرَّارُ

"খায়বার জানে যে আমি যুবাইর, কওমের সরদার... পলায়নকারী নই, আর অকর্মণ্যও নই।"

---

[১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৯, কিতাবুল জিহাদ, বাব গাযওয়ায়ে যি-ক্বারাদ, ত: দারুল জীল।

[২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৯, কিতাবুল জিহাদ, বাব গাযওয়ায়ে যি-ক্বারাদ... কিছু বর্ণনা অনুযায়ী মারহাবকে মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করেছিলেন। (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা: ৮২) তবে সনদের দিক থেকে সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটিই অগ্রগণ্য, যাতে একে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কৃতিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটাই জমহুর ওলামাদের অভিমত।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)

ইবনু হামাতিল মাজদি ওয়াবনু আখইয়ার ... ইয়াসিরু লা ইয়াগুররাননাকা জামউল কুফফার

“আমি সম্মানিত ও নেককারদের সন্তান... হে ইয়াসির! কাফেরদের দল যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।”

জামউহুম মিসলু সারাবিল জাররার

“তাদের বাহিনী মরীচিকার মতো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো।”

ইয়াসির অত্যন্ত শক্তিশালী ও বীর ছিলেন। জুবায়ের (রা.)-এর মা সাফিয়া (রা.) চিন্তিত হয়ে বললেন:

“আল্লাহর রাসূল! আজ আমার ছেলে শহীদ হয়ে যাবে।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “না, ইনশাআল্লাহ জুবায়েরই তাকে হত্যা করবে।”

এমনই হলো। ইয়াসির হযরত জুবায়ের (রা.)-এর হাতে নিহত হলো। [১]

## খায়বারের অন্যান্য দুর্গ বিজয়

নিজেদের নামী-দামী সরদারদের নিহত হওয়ার কারণে ইহুদিদের মনোবল ভেঙে গেল এবং ‘কামুস’ বিজিত হলো। শীঘ্রই নায়েম, সাব, শাক এবং ওয়াতীহ-এর মতো অন্যান্য দুর্গগুলোও পদানত হলো। অবশেষে ইহুদিরা চারদিক থেকে সরে এসে ‘ওয়াতীহ’ এবং ‘সুলালিম’ নামক দুর্গে অবরুদ্ধ হলো। চৌদ্দ দিন অবরোধের পর তারা আবেদন করল যে তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হোক এবং তারা খায়বার ছেড়ে চলে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই শর্তে তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন যে তারা সোনা, রূপা এবং অস্ত্রশস্ত্র রেখে যাবে এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ যেন কোনো কিছু গোপন না করে, অন্যথায় তাদের প্রাণের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। কিন্তু ইহুদিদের নেতা কিনানা বিন আবি আল-হুকাইক চুক্তির বরখেলাপ করে সোনা, রূপা এবং অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে মাটিতে পুঁতে রাখল। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখনও সে মিথ্যা বলল। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুজিজা হিসেবে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে সাথে বলে দিলেন যে তার ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র অমুক জায়গায় আছে। চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে ইহুদিদের অবস্থা এখন যুদ্ধবন্দীদের মতো হয়ে গেল। কিনানা বিন আবি আল-হুকাইক প্রতারণা ছাড়াও একজন মুসলমানকে হত্যার অপরাধী ছিল, তাই তাকে হত্যা করা হলো। তাদের নারীরা দাসী হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হলো এবং পুরো খায়বার তার উর্বর জমি, ক্ষেত এবং বাগানসহ মুসলমানদের দখলে চলে এল। [২]

---

[১] তারিখুত তাবারী: ২/১৩।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/২৯৮; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ২/১১০।

নোট: কিছু বর্ণনায় খায়বার বিজয়ের জন্য প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং তারপর হযরত ওমর (রা.)-কে পাঠানোর কথা উল্লেখ আছে। তাদের পক্ষ থেকে কোনো বিজয় অর্জিত না হওয়ায় মুহাজির ও আনসারদের পক্ষ থেকে ভীরুতার অভিযোগ এবং তারপর হযরত আলী (রা.)-কে পাঠানোর কথা উল্লেখ আছে। বড় বড় সাহাবীদের কোনো যুদ্ধ থেকে পিছপা হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়, আর না এটা প্রমাণিত যে তারা একে অপরকে ভীরুতার অপবাদ দিয়েছেন। বরং এই বর্ণনাগুলো সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) এই দুর্বলতার কারণ উল্লেখ করে লিখেছেন: “وفي اسناده من هو متهم بالتشيع” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/২৬৭)। এটাও মনে রাখা দরকার যে হযরত আলী (রা.)-এর হাতে শুধু খায়বার নয়, বরং ‘কামুস’ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ বিজিত হয়েছিল। বাকি দুর্গগুলো অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বিজয় করেছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও মর্তবা তার নিজ স্থানে অটুট, তবে এই অভিযানে অন্যান্য সাহাবীদের অবদানও মনে রাখা উচিত।

## তারিখে মিল্লাতে মুসলিমা

### হযরত সফিয়া (রা.)-এর সাথে বিবাহ:

বন্দীদের মধ্যে হযরত সফিয়া (রা.)-ও ছিলেন, যিনি হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইহুদিদের এক নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা এবং অন্য এক নেতা কিনানা ইবনে আবিল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন। [১] তিনি হযরত দিহিয়া কালবি (রা.)-এর অংশে পড়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ছিল যে, তাঁর মতো উচ্চবংশীয় ও সুন্দরী নারী কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হারামের (পরিবারের) যোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং হযরত দিহিয়া কালবি (রা.)-এর সম্মতিতে সফিয়াকে নিজের অংশে নিয়ে নিলেন। [২]

তাঁর চেহারায় মারধরের একটি স্পষ্ট চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন যে, কয়েকদিন আগে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে চাঁদ তাঁর কোলে এসে পড়েছে। তিনি যখন তাঁর স্বামী কিনানাকে এই স্বপ্নের কথা বললেন, তখন সে সজোরে এক চড় মারল এবং বলল: “তুমি কি আরবের সরদার মুহাম্মদের স্বপ্ন দেখছ?”

কিনানা মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিল এবং তার বিধবা সফিয়া ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন সত্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। [৩]

### ফাদাক এবং ওয়াদিউল কুরার বিজয়:

খায়বারের দক্ষিণ-পূর্বে মদিনা থেকে দুই-তিন মঞ্জিল দূরে ‘ফাদাক’ নামক একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা ছিল। এখানকার ইহুদিরা যুদ্ধ না করেই প্রাণভিক্ষার শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করল এবং দেশত্যাগের প্রস্তাব গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরের দিকে আরও অগ্রসর হলেন এবং ইহুদিদের আরেকটি জনপদ ওয়াদিউল কুরা পর্যন্ত পৌঁছালেন, যা আরবের শেষ জনপদ হিসেবে গণ্য হতো এবং এর পর থেকে শামের এলাকা শুরু হতো। এখানেও ইহুদিরা পরাজিত হলো এবং এই পুরো এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হলো। [৪]

### ইহুদিদের একটি অপবিত্র ষড়যন্ত্র:

খায়বারের দুর্গগুলো হারানোর পর ইহুদিরা রণক্ষেত্রে পুরোপুরি পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ চাল হিসেবে তারা এক ঘৃণ্য খেলা খেলল। তাদের নেতা সালাম বিন মিশকামের স্ত্রী জয়নব বিনতে আল-হারিস (মারহাবের বোন) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াত করল এবং ছাগলের ভুনা গোশত পেশ করল যাতে বিষ মেশানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেই প্রথম লোকমা মুখে নিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিপদ সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তৎক্ষণাৎ তা থুথু করে ফেলে দিলেন। তবে সেই সময় পর্যন্ত দাওয়াতে শরিক এক সাহাবী হযরত বিশর বিন বারা (রা.) লোকমা গলার নিচে নামিয়ে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) জয়নবের কাছে এই অপবিত্র কাজের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: “আমি আমার জাতির প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, যা আপনি করেছেন।” [৫]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৩১।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৩৫৭৮, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফাদলি ইতিয়াকি আমাতিহি সুম্মা ইয়াতাজাওয়াজুহা; সহীহ বুখারী, হা: ৩৭১১, ২২৩৫, ২৮৯৩; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩০২৩; ইসনাদুহু সহীহ।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/২৯০।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৩৩৫-৩৩৬।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৩৩৫-৩৩৬।

“যদি আপনি সত্য নবী হন তবে বেঁচে যাবেন এবং যদি সাধারণ বিজেতা হন তবে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব।”

নারীটি অবশ্যই উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল এবং তার চাতুর্য ছিল সন্দেহাতীত, কিন্তু এভাবে অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সত্তার জন্য প্রতিশোধ নেওয়া পছন্দ করতেন না, আর তাও আবার একজন নারীর থেকে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। [১] এটি ছিল জানী দুশমনের প্রতি ক্ষমা ও উদারতার এক সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

কিন্তু কিছুদিন পর বিশর বিন বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষের প্রভাবে ইন্তেকাল করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে গিয়ে সেই নারীকে নিহতের ওয়ারিশদের হাতে সোপর্দ করেন, যারা তাকে হত্যা করে। এটি ছিল আইনের শাসনের এক চমৎকার উদাহরণ। [২]

**ইয়াহুদিদের সাথে জমিদারি সংক্রান্ত বিষয়:**

খায়বারের ইয়াহুদিরা কৃষি ও বাগান পরিচর্যায় পারদর্শী ছিল। যদিও তাদের নির্বাসন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা এই সুযোগে প্রস্তাব পেশ করল যে, তাদের এই জমিগুলোতে শুধু কাজ করার জন্য থাকতে দেওয়া হোক, উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক হবে তাদের এবং অর্ধেক মুসলমানদের। রাসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তা করে দেখলেন যে এই প্রস্তাবে কল্যাণ নিহিত আছে; কারণ মুসলমানদের সংখ্যা এত বেশি ছিল না যে তারা একই সাথে জিহাদ এবং কৃষি কাজ করতে পারে। তিনি ﷺ মুসলমানদের জিহাদের জন্য অবসর রাখার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন, তবে এটি স্পষ্ট করে দিলেন যে যখন আমরা চাইব এই চুক্তি শেষ করে দেব। তিনি ﷺ খায়বারের ফসলের অংশ আদায় করার দায়িত্ব আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর অর্পণ করলেন। তিনি যখনই খায়বারে আসতেন এত সততা ও ন্যায়ের সাথে ফসল বণ্টন করতেন যে ইয়াহুদিরা বলে উঠত: “আসমান ও জমিন এই ধরনের ন্যায়ের কারণেই টিকে আছে।” [৩]

ইয়াহুদিরা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগ পর্যন্ত এখানেই বসবাস করত, কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওসিয়ত ছিল যে জাজিরাতুল আরবে যেন দুটি দ্বীন বাকি না থাকে এবং ইয়াহুদি ও নাসারাদের এখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাই হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে খায়বার ও এর আশপাশ থেকে সমস্ত ইয়াহুদিকে নির্বাসিত করে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন এবং তাদের বিকল্প জমি প্রদান করেন। [৪]

**حبشہ (হাবশা) এর মুহাজিরদের আগমন:**

রহমতে আলম ﷺ খায়বার বিজয় থেকে মাত্র অবসর হয়েছেন এমন সময় হাবশার মুহাজিররা, যারা তেরো-চৌদ্দ বছর ধরে প্রবাস জীবন অতিবাহিত করছিলেন, হযরত জাফর বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে আপনার খিদমতে এসে পৌঁছালেন। নাজ্জাশী তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী দুটি বড় নৌকায় পূর্ণ ব্যবস্থা ও আয়োজনের সাথে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাবশার মুহাজিরদের আগমনে এত খুশি হলেন যে বললেন:

“আমি বলতে পারছি না যে খায়বার বিজয়ের আনন্দ বেশি হচ্ছে নাকি জাফরের ফিরে আসার।” [৫]

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩১২৯, কিতাবুল জিজিয়া, বাব ইযা গাদারাল মুশরিকুন; সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩৩৭, ৩৩৮

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ২/২০১

[৩] আল-ইসাবাহ, উসদুল গাবাহ, জীবনী: আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু

[৪] আল-তারিখ আল-ইসলামি আল-আম, পৃ. ২০০

[৫] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ২/১০৮, ত: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া... মনে রাখতে হবে যে নাজ্জাশী এর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১/২০৭)

রহমতে আলম ﷺ মুসলমানদের উৎসাহিত করলেন যেন তারা এই নতুন মেহমানদের খায়বার থেকে প্রাপ্ত কৃষি জমিতে অংশীদার করে নেন যাতে তাদের পুনর্বাসন হয় এবং তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। মুসলমানরা সানন্দে এটি গ্রহণ করে নিলেন। [১]

হাবশার মুহাজিরদের সাথে ইয়ামেনের ৫৩ জন মুসলমানও আপনার খিদমতে উপস্থিত হলেন যাদের মধ্যে আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর দুই ভাই: আবু বুরদাহ ও আবু রুহমও ছিলেন। এই লোকেরা বহু বছর আগে হুজুর আকরাম ﷺ-এর হিজরতের খবর শুনে ইয়ামেন থেকে নৌকায় চড়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন কিন্তু ঝড় তাদের হাবশার উপকূলে নিক্ষেপ করে। সেখানে তারা জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু এবং হাবশার অন্যান্য মুহাজিরদের দেখা পান। তারাও তাদের সাথে থাকতে শুরু করেন। এখন তারা তাদের সফরসঙ্গী হয়ে হুজুর আকরাম ﷺ-এর খিদমতে পৌঁছে গেলেন। আপনি ﷺ তাদেরও খায়বারের সম্পদ থেকে অংশ দান করলেন। [২] আশআরী গোত্রের এই লোকেরা মসজিদে নববীতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কুরআন মাজিদ শিখতেন ও পাঠ করতেন। হুজুর আকরাম ﷺ নিজের হুজরা থেকে তাদের হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াত শুনে বলতেন: “আমি আমার আশআরী বন্ধুদের তাদের তিলাওয়াতের ঢং দেখে চিনে ফেলি।” [৩]

যখন হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু দরবারে রিসালাতের সাথে যুক্ত হলেন:

খায়বার বিজয়ের সময় হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। [৪] তাঁর সম্পর্ক ছিল ইয়ামেনের দাওস গোত্রের সাথে। মুসলমান হয়ে গোত্রের ৮০টি পরিবারের সাথে ইয়ামেন থেকে বের হলেন, পথে আত্মহারা হয়ে এই কবিতাটি পড়ছিলেন:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَسَائِهَا ... عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

“হায় এই রাত কত দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য, তবে যেমনই হোক, এটি কুফরের রাষ্ট্র থেকে মুক্তি দিয়েছে।” [৫]

এই খোদাপ্রেমিক দরবেশ সেই সময় মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছালেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের জিহাদে ব্যস্ত ছিলেন। তিনিও পেছনে রওনা হলেন এবং শেষ প্রহরে দরবারে কুদসে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কোথাকার?” হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু আরজ করলেন: “দাওসের?”

হুজুর ﷺ আনন্দ ও বিস্ময়ে কপালে হাত রাখলেন। [৬]

এরপর হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু দরবারে নববীর সাথে এমনভাবে যুক্ত হলেন যে সারা জীবন আকায়ে নামদার ﷺ-এর কথা শোনা, মুখস্থ করা এবং পুনরাবৃত্তি করার মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হাদীসের সবচেয়ে বড় হাফেজ মানা হয়।

এই ইয়ামেনী মুসলমানদের মধ্যে দাওসের প্রধান তুফায়েল ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এবং দাওসের সমস্ত মুসলমানদের খায়বারের সম্পদ থেকে অংশ দান করলেন। [৭]

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১/১৩০, ১৩১

[২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২৫66, ফাযায়েলুস সাহাবা, বাব ফাযায়েলু জাফর রাদিআল্লাহু আনহু, দারুল জীল; উসদুল গাবাহ, বাবুল কুনা, তরজমা: আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু

[৩] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ৪২৩২, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে খায়বার

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৬৩

[৫] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪২৯৩, কিতাবুল মাগাযী, বাব কিসসাতু দাওস

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৬৩

[৭] সীরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৮৫

## হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধের পর মদিনা রাষ্ট্রের অবস্থান:

হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং খায়বার যুদ্ধের পর আরবদের শত বছরের প্রাচীন বিকেন্দ্রীকরণের প্রায় সমাপ্তি ঘটেছিল। এখন আরবে মুসলমানরাই ছিল একমাত্র বড় শক্তি। কুরাইশদের মর্যাদা অনেক কমে গিয়েছিল এবং তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে কখনো মুসলমানদের পরাভূত করা সম্ভব ছিল না। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মক্কা এবং কুরাইশদের মিত্র গোত্রগুলোর এলাকায় ইসলামি বাহিনীর চলাচল প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে এই পুরো এলাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল।

দেখা যায় যে, মদিনা রাষ্ট্র এই প্রাথমিক যুগেই আঞ্চলিক সীমানা ছাড়িয়ে একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হতে শুরু করেছিল, যা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের বিশ বছরের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের বরকতময় ফল ছিল। মদিনা রাষ্ট্র কুরাইশদের থেকে সামান্য অবসর পেতেই এর শিরায় চঞ্চল শক্তিগুলো নতুন ফ্রন্ট খুঁজে নিল এবং এর সামরিক কার্যক্রমের মোড় উত্তর দিকে ঘুরে গেল। খায়বার, ফাদাক এবং ওয়াদিউল কুরার বিজয় ছিল এই মহান পরিবর্তনের প্রথম ধাপ, আর এর দ্বিতীয় ধাপ ছিল মুতাহ যুদ্ধ এবং তাবুক যুদ্ধ, যেখান থেকে মহান রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তবে আরবে তখনও ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। এ ধরনের রাষ্ট্রগুলো যেকোনো বড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু মুসলমানদের সেই সক্ষমতা ছিল যে তারা তাদের সাথে মিলিয়ে নেবে এবং যারা অস্বীকার করবে তাদের পরাভূত করবে। ফলে সেই যাযাবর গোত্রগুলো যারা কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর সংকল্প রাখত, তাদের মদিনা রাষ্ট্রের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

## গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা:

এই সিলসিলার গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আক্রমণ চালিয়ে গাতাফান গোত্র পর্যন্ত গিয়েছিলেন। [১] এই সফরে মুজাহিদদের কাছে সওয়ারির খুব অভাব ছিল। একেকটি উটের ওপর ছয়জন করে ব্যক্তি পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামকে সাধারণত পায়ে হেঁটেই চলতে হচ্ছিল [২] ফলে অনেক ব্যক্তির জুতো ছিঁড়ে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। অভিযানে শরিক হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের পা জখম হয়ে গিয়েছিল, অবশেষে বাধ্য হয়ে পায়ে কাপড়ের টুকরো বা তালি জড়াতে হয়েছিল (যাকে আরবিতে “রিকা” বলা হয়)। এজন্য এই অভিযান “গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা” নামে পরিচিতি পায়। [৩]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪১২৫, ৪১২৬, ৪১২৭, কিতাবুল মাগাজি, বাব গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪১২৮, কিতাবুল মাগাজি, বাব গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪১২৮।

জাতুর রিকা নামকরণের কারণ সম্পর্কে আরও কিছু অভিমত রয়েছে: ওয়াকিদীর মতে, এই অভিযান যে পাহাড়ি عِلْـ (অঞ্চলে) পরিচালিত হয়েছিল সেখানকার মাটি লাল, কালো এবং সাদা রঙের ছিল (আল-মাগাজি লিল ওয়াকিদী: ১/৩৯৫)। মাটি তালিযুক্ত মনে হওয়ার কারণে এই অভিযানকে “জাতুর রিকা” নাম দেওয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, জাতুর রিকা ওই এলাকার একটি গাছের নাম ছিল যেখানে অভিযান চালানো হয়েছিল। একটি মত এও আছে যে, লশকর বা বাহিনীর পতাকাগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোতে তালি লাগিয়ে জোড়া দেওয়া হয়েছিল। তবে পায়ে কাপড়ের টুকরো জড়ানোর মতটিই অধিক বিশুদ্ধ, কারণ অভিযানে শরিক আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু নিজেই তা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক গাজওয়ায়ে জাতুর রিকাকে গাজওয়ায়ে বনু নাযিরের পর (৪ হিজরিতে) উল্লেখ করেছেন। (তারিখুত তাবারী: ২/৫৫৫)। ওয়াকিদী এর তারিখ ১লা মহরম থেকে ১৫ই মহরম ৫ হিজরি বর্ণনা করেছেন। (আল-মাগাজি লিল ওয়াকিদী: ১/৩৯৫)। কিন্তু সঠিক হলো এই যে, এই অভিযান গাজওয়ায়ে খায়বারের পর সংঘটিত হয়েছিল, কারণ এতে আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু-ও শামিল ছিলেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৪১২৮, ৪১৩৬)। আর এই দুই মহান ব্যক্তি গাজওয়ায়ে খায়বারের সময়... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)।

**সালাতুল খাওফ:**

গাযওয়া যাতুর রিকা-তে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, তবে “নাখল” নামক স্থানে মুসলমানরা অবশ্যই যুদ্ধাবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে জামাতের সাথে ফরয সালাত “সালাতুল খাওফ”-এর পদ্ধতিতে আদায় করেছিলেন। [১]

**নাজাশি আসহামার মৃত্যু:**

এই বছরই হাবশার মুসলিম বাদশাহ নাজাশি আসহামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা এ সংবাদ প্রদান করেন, ফলে তিনি আসহামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেন; কারণ সেখানে অন্য কোনো মুসলিম ছিল না যে তাঁর জানাযা পড়াত। [২] মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেন যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত আসহামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কবর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যেত। [৩]

**সুমামা বিন উসাল-এর গ্রেফতারি, ইসলাম গ্রহণ, মক্কার খাদ্য অবরোধ:**

৭ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নজদের দিকে অতর্কিত অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। [৪] মুজাহিদগণ...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকাংশ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে এসেছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন: এটিই বনু সা’লাবা বিন গাতফানের মুহারিব খাসাফার যুদ্ধ, তারা নাখলে অবতরণ করেছিল এবং এটি খায়বারের পরের ঘটনা, কারণ আবু মুসা খায়বারের পরে এসেছিলেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৪১২৮) এর দ্বারা ধারণা করা যায় যে, এই যুদ্ধ খায়বারের পরবর্তী প্রথম মহররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল, অর্থাৎ ৭ হিজরীর মহররম যা অক্টোবর ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ (জুমাদাল উলা ৭ হিজরী মাদানী) অনুযায়ী। ওয়াকিদী এর সূচনা শনিবার দিন বলেছেন। ৭ হিজরীর মহররমের ৭ তারিখও শনিবার ছিল।

একটি সম্ভাবনা এমনও আছে যে, যাতুর রিকা নামে দুটি পৃথক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, একটি ৪ হিজরী বা ৫ হিজরীতে এবং অন্যটি ৭ হিজরীতে। (ফাতহুল বারী: ৭/ ৪১৭)

---

[১] যে স্থানে সালাতুল খাওফ আদায় করা হয়েছিল, হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে তাকে “নাখল” বা “নাখলা” হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আরবে এই নামে একাধিক স্থান ছিল যার মধ্যে দুটি অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। একটি মদীনার পার্শ্ববর্তী উপত্যকা যেখান থেকে বসরার রাস্তা বের হয়েছে। (মু’জামুল বুলদান: ১/ ৩৪৯) দ্বিতীয়টি তায়েফ থেকে মক্কার পথে মক্কা থেকে এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত “বাতনে নাখলা” উপত্যকা, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিনদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। (উমদাতুল কারী: ৬/ ৪৭৩) ধারণা করা হয় যে, এখানে প্রথমোক্ত স্থানটিই উদ্দেশ্য। যদিও কেউ কেউ এই অভিযান মদীনার পার্শ্ববর্তী নাখলা উপত্যকায় হয়েছে বলে মনে করেন, কিন্তু তা সঠিক নয় কারণ মদীনার নিকটবর্তী উপত্যকায় সফরে জুতো ছিঁড়ে যাওয়া এবং পা জখম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এটি নিশ্চিতভাবেই দূরপাল্লার সফর ছিল।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮৪৮, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাওতিন নাজাশি।
ফায়দা: আহনাফদের মতে, এই গায়েবানা জানাযার সালাত নাজাশি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্মানে সাময়িকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এটি যদি সাধারণ বিধান হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দূরবর্তী স্থানে ইন্তেকালকারী অন্যান্য সাহাবীদেরও জানাযার সালাত পড়তেন, অথচ এমন অন্য কোনো উদাহরণ নেই। (আল-মাবসূত লিস-সারখাসী: ২/ ৬৭, ত. আল-মা’রিফাহ)
ফায়দা: নাজাশি আসহামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, তা ৭ হিজরীর শুরুর দিকে হয়েছিল। এর প্রমাণাদি হলো: জানাযার সালাতে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু শরীক ছিলেন। (সহীহ বুখারী, হা: ১৩২৭, বাবুস সালাতি আলাল জানাইযি বিল মুসাল্লা ওয়াল মাসজিদ) যিনি ৭ হিজরীর মহররম মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/ ৩৬৩) এর দ্বারা বোঝা যায় এই ঘটনা ৭ হিজরীর মহররমের পরের। আবার দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সিংহাসনে আরোহণকারীর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ ৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাঠিয়েছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/ ২০৭) সুতরাং নাজাশি আসহামার ইন্তেকালের ঘটনা মহররম থেকে রবিউল আউয়াল ৭ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে হওয়া নিশ্চিত হয়।

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ২৫২৩, বাবুন্নুরি ইউরা ইনদা কাবরিশ শাহীদ, দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৪/ ৮৭।

[৪] বায়হাকীর বর্ণনায় এই অভিযানের মাস মহররম ৬ হিজরী উল্লেখ আছে। কিন্তু এই তারিখের ব্যাপারে আপত্তি হলো যে, সুমামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যার কিছু সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এটি তাঁর প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা। (তারীখুল মদীনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ২/ ৫৪৮) যেহেতু আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু সর্বসম্মতিক্রমে ৭ হিজরীতে মদীনায় এসেছিলেন, তাই এই ঘটনা ৭ হিজরীর আগের হতে পারে না। এই দিকটি সামনে রেখে সঠিক এটাই মনে হয় যে, সুমামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর গ্রেফতারির অভিযান ছিল গাযওয়া যাতুর রিকার ভূমিকা। সেই অভিযানটিও পূর্ব দিকে ছিল এবং এটিও। পার্থক্য শুধু এই যে, সেটি ছিল গাযওয়া (যুদ্ধ) আর এটি ছিল সারিয়্যাহ (ছোট অভিযান)। যাতুর রিকার সম্ভাব্য তারিখ জুমাদাল উলা ৭ হিজরী মাদানী, সেই হিসেবে সুমামা বিন উসাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণও প্রায় সেই সময়ে হওয়া যুক্তিযুক্ত।

অভিযানের সময় বনু হানিফার একজন নেতা সুমামা বিন উসালকে গ্রেপ্তার করা হয়। বন্দীকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার ইচ্ছা কী?" উত্তর এলো: "ইচ্ছা ভালো; যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তবে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেন যার হত্যা বৈধ। যদি অনুগ্রহ করেন, তবে এমন এক ব্যক্তির ওপর করবেন যে কৃতজ্ঞ। আর যদি সম্পদ চান, তবে যা খুশি চেয়ে নিন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও একই প্রশ্ন করলেন। বন্দীর উত্তরও একই ছিল। এই সময়ের মধ্যে বন্দী মুসলমানদের অবস্থা, মসজিদে নববীর দিন-রাত এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৌন্দর্য ও চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেন। তার মন সাক্ষ্য দিল যে এরা সাধারণ মানুষ নন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুমামাকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুক্ত হওয়া মাত্রই তিনি কাছের একটি বাগানে গেলেন, সেখানে গোসল করলেন এবং মসজিদে ফিরে এসে কালিমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এরপর তিনি রিসালাতের দরবারে আরজ করলেন: "গতকাল পর্যন্ত আপনার চেহারা আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল। আজ আপনার চেহারার চেয়ে প্রিয় আর কোনো চেহারা নেই। গতকাল পর্যন্ত আপনার দ্বীন আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল। আজ আপনার দ্বীনের চেয়ে প্রিয় আর কোনো দ্বীন নেই। গতকাল পর্যন্ত আপনার শহর আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ছিল। আজ আপনার শহরের চেয়ে প্রিয় আর কোনো শহর নেই।"

তিনি আরও আরজ করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম যখন আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে ধরে ফেলে। এখন আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন?" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উমরা সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন।

তিনি যখন মক্কায় পৌঁছালেন, তখন সেখানকার লোকেরা তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল। কেউ বলল: "তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ?" তিনি বললেন: "না! বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেবেন, ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও তোমাদের কাছে পৌঁছাবে না।"

আর এমনটাই হলো। ইয়ামামার বাণিজ্যিক পথ তার হাতে ছিল, যা তিনি অবরোধ করে দিলেন। [১]

**শত্রুতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ:**

মক্কাবাসীরা আগে থেকেই দুর্ভিক্ষের শিকার ছিল। খাদ্য ও রসদ সরবরাহের বাইরের পথগুলোই ছিল তাদের শেষ ভরসা। অধিকাংশ শস্য ইয়ামামা থেকে আসত, যার মহাসড়ক সুমামা (রা.) বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশেষে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দোহাই দিয়ে একটি আবেদন পাঠাল যে, তিনি যেন সুমামাকে অবরোধ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চাইলে কুরাইশদের সেই সময় নিজের পায়ে নত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নবীসুলভ চরিত্রের প্রমাণ দিয়ে এমন চরম শত্রুদের আবেদন গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে সুমামা (রা.) মক্কাবাসীদের জন্য খাদ্যের পথ খুলে দিলেন। [২] মানুষের অনুরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের জন্য দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়াও করলেন, যার ফলে মক্কা ও এর আশপাশে বৃষ্টি হলো। [৩] মক্কাবাসীদের অবস্থার উন্নতি হলো, তবুও তারা কুফর ও অবাধ্যতা থেকে বিরত হলো না। [৪]

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৩৭২, কিতাবুল মাগাযী, বাবু ওয়াফদি বনী হানীফা।

[২] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল-বায়হাকী, ৮০/৪।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৭৩৫, কিতাব সিফাতিল কিয়ামাহ, বাবুদ দুখান।

## সুলতানদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শুধু জাজিরাতুল আরবের সংস্কারই ছিল না, বরং সারা দুনিয়া তাঁর দাওয়াতের আওতায় ছিল; কারণ তিনি ছিলেন সবার শেষ এবং বিশ্বজনীন পয়গম্বর। এটাই কারণ ছিল যে তিনি কুরাইশদের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য রণাঙ্গন ও ময়দানগুলোর দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। সুলহে হুদায়বিয়ার বদৌলতে যখন তিনি এই সুযোগ পেলেন, তখন তিনি তাঁর সংগ্রামকে পরবর্তী ধাপে শুরু করতে একটুও দেরি করেননি।

"সুলহে হুদায়বিয়া" শুধু পুরো আরবে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের অগ্রদূত হিসেবেই প্রমাণিত হয়নি, বরং এটি ছিল ইসলামকে একটি বিশ্বজনীন দাওয়াত হিসেবে বিশ্বের বড় বড় দরবারগুলোতে পরিচিত করার সময়। সন্ধির বদৌলতে জাজিরাতুল আরবের সমস্ত পথ নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামের দূতগণ সবদিকে যেতে পারতেন।

**বাদশাহদের সাথে পত্রালাপের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ:**

দুনিয়ায় সে সময় বহু রাজত্ব ও সরকার ছিল এবং তাদের সবার জন্য ইসলামের জীবনদায়ী বার্তার প্রয়োজন ছিল। তবে হিকমত ও পরিস্থিতির দাবি ছিল যে, শুরুটা এমন দরবারগুলো থেকে করা হোক যা জাজিরাতুল আরবের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এই বার্তার মূল কেন্দ্রের সাথে সহজেই যোগাযোগ করে তাদের সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করতে পারে এবং সেই সাথে তারা ইসলামের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

হুজুর আকরাম ﷺ এই সিলসিলায় জাজিরাতুল আরবের বাইরের চারটি বড় সালতানাত: রোম, ইরান, মিসর এবং হাবশার সম্রাটদের তাঁর পয়গাম বা বার্তার প্রথম সম্বোধনকারী বানিয়েছিলেন। এ ছাড়া আরবের কয়েকজন আমীরকেও চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এটা জরুরি ছিল না যে এই শাসকরা তখনই ঈমান নিয়ে আসবে, তবে এতটুকুও যথেষ্ট ছিল যে তাদের সামনে একবার ইসলামের একটি সামগ্রিক রূপরেখা চলে আসুক এবং জাজিরাতুল আরব থেকে উত্থিত বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হওয়া থেকে বেঁচে যাক। এই শাসকদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে মুসলমানদের এটাও আন্দাজ হয়ে যেত যে মদিনা রাষ্ট্র, যা অচিরেই একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছিল, তাকে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর আচরণের মোকাবিলায় কী ধরনের পাল্টা কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ একই ধরনের বার্তা পাঠানোর পরিবর্তে প্রতিটি শাসককে তার ধর্মীয় ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আলাদা আলাদা ঢঙে সম্বোধন করেছিলেন। আপনার চিঠিগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত ও প্রভাবশালী, যাতে বিনয় ও নম্রতা ছিল, কোনো প্রকার অহংকার বা দম্ভ ছিল না। সেগুলোতে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতা ফুটে উঠত। এতে বোঝা যেত যে বার্তা প্রদানকারী তার দাওয়াতের ওপর অটল বিশ্বাস রাখেন। এই বড় বড় দরবারগুলোর শান-শওকত এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর কাছে খড়কুটোর সমানও মর্যাদা রাখত না এবং তিনি বুদ্ধিভিত্তিক ও আদর্শিক দিক থেকে সবার ঊর্ধ্বে এক সুউচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের সেই বিপদগুলো সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন যা তাদের নিচু দৃষ্টির আড়ালে ছিল।

প্রকৃত মতানুসারে, সম্রাটদের নামে এই দাওয়াতী পত্রগুলো খায়বার বিজয়ের পর ৭ হিজরীর শুরুতে পাঠানো হয়েছিল। [১]

হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের দাওয়াত:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম পত্রের সম্বোধিত ব্যক্তি ছিলেন হিরাক্লিয়াস (হারকিউলিস)। তিনি ইরানীদের কাছে পরাজিত দুর্ভাগ্যবান রোমান সম্রাট ফোকাস (Phocus)-কে ক্ষমতাচ্যুত করে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে بازنطینی (বাইজেন্টাইন) রোমের ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। এটি এমন এক সময় ছিল যখন ইউরোপ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ও মহান সাম্রাজ্য ইরানি বিজয়ীদের লাগামহীন শক্তির সামনে ধূলিসাৎ হচ্ছিল। হিরাক্লিয়াস সিংহাসনে আরোহণের ছয় বছর পর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি ইরানীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্বের শান-শওকত পুনরুদ্ধার করবেন। এটি সেই সময় ছিল যখন পবিত্র কুরআন সূরা আর-রূমে ইরানীদের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যদিও সেই সময় রোমের অবস্থা ছিল মুমূর্ষু। কিন্তু এই অবস্থায় যখন হিরাক্লিয়াস ইরান আক্রমণ করলেন, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে বিজয় তার পদচুম্বন করল। তিনি কিসরাকে ক্রমাগত পরাজয়ের সম্মুখীন করেন এবং সাত-আট বছরের যুদ্ধের মাধ্যমে এশিয়ায় রোমের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার পর ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে একজন খ্যাতিমান বিজয়ীর মতো তার ইউরোপীয় রাজধানী ‘কনস্টান্টিনোপল’-এ ফিরে আসেন।

কিসরা পারভেজের সাথে তার আলোচনা চলতে থাকে। পারভেজ তার কাছে পরাজিত হয়ে তার দাবিগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরিশেষে খ্রিস্টানদের ‘পবিত্র ক্রুশ’, যা ইরানীরা বহু বছর আগে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, তা রোমকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই ক্রুশটি বাইতুল মুকাদ্দাসে পুনরায় স্থাপন করার জন্য হিরাক্লিয়াস নিজেই কনস্টান্টিনোপল থেকে সিরিয়ায় আসেন। [২]

এটি ছিল প্রায় সেই দিনগুলো যখন হুজুর غزوہ ﷺ (গাজওয়া) খায়বার থেকে অবসর পেয়ে সম্রাটদের নামে পত্রগুলো লিখছিলেন।

হিরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফিয়ানের কথোপকথন:

হিরাক্লিয়াস প্রথমে তার এশীয় রাজধানী ‘হিমস’-এ আসেন এবং এখান থেকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পায়ে হেঁটে ‘ইলিয়া’ (বাইতুল মুকাদ্দাস) অভিমুখে রওনা হন। পারিষদবর্গ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের একটি মিছিল তার সাথে ছিল। বাইতুল মুকাদ্দাসে রাত্রিযাপনের সময় তিনি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন যাতে বলা হচ্ছিল যে, খতনা করা জাতির নেতা শীঘ্রই সবার ওপর বিজয়ী হবে।

---

[১] এই পত্রগুলো হুদায়বিয়ার সন্ধির পর জিলহজ ৬ হিজরীতে লেখা শুরু হয়েছিল। কিছু সাহাবীর পরামর্শে পত্রগুলোর নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য একটি মোহরও তৈরি করা হয়েছিল, যাতে ‘মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ খোদাই করা ছিল। পত্র পাঠানোর এই ধারা মহররম ৭ হিজরী থেকে রবিউল আউয়াল ৭ হিজরীর মধ্যে অব্যাহত ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/২৫৮, ৪০৭)। সম্ভবত খায়বার যুদ্ধের কারণে কিছু দূতের যাত্রায় কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। কিছু লোক এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, সম্রাটদের কাছে পত্রগুলো ৬ হিজরীতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদিও এটি সর্বসম্মতভাবে ভুল। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন: “তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, এর সূচনা মক্কা বিজয়ের আগে এবং হুদায়বিয়ার পরে হয়েছিল। কারণ আবু সুফিয়ান হিরাক্লিয়াসকে বলেছিলেন যখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন? তিনি বলেছিলেন: না, এবং আমরা তার সাথে এমন এক সময়ের মধ্যে আছি যাতে আমরা জানি না তিনি কী করবেন - আর এটি বুখারীর শব্দ: সেই সময়ের মধ্যে যখন আবু সুফিয়ান রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সন্ধি করেছিলেন।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/২৬৮)। কিছু লোক সহীহ বুখারীতে পত্র পাঠানোর উল্লেখ তাবুক যুদ্ধের পরে দেখে এই ধারণা করেছেন যে, এই পত্রগুলো ৯ হিজরীতে পাঠানো হয়েছিল, যদিও ইমাম বুখারী সময়ের ক্রম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি। ডক্টর আকরাম জিয়া উমারী লিখেছেন: “বুখারী নবম হিজরী সালে তাবুক যুদ্ধের পর কিসরার পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটি স্পষ্ট যে বুখারী তার সহীহ-এর বর্ণনাগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে সময়ের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি।” (আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ আস-সহীহাহ: ২/৪৫৫, ৪৫৬)।

[২] নবীয়ে রহমত ﷺ, পৃ. ৩৮১ থেকে ৩৮৩।

খতনা করার প্রথা ইহুদিদের মধ্যে ছিল নাকি আরবদের মধ্যে। হেরাক্লিয়াস জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই জানতে চাইলেন যে, এই দুই জাতির মধ্যে কোন জাতির মধ্যে কোনো বিপ্লব এসেছে কি না। কর্মচারীরা শীঘ্রই জানতে পারল যে, আরবদের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে।

হেরাক্লিয়াস আদেশ দিলেন যে, অবিলম্বে কোনো আরবকে নিয়ে আসা হোক যাতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। ভাগ্যের ব্যাপার যে, কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা তখন সিরিয়ায় এসেছিল। দীর্ঘকাল ধরে মক্কা ও মদিনার যুদ্ধগুলোর কারণে বাণিজ্যিক পথগুলো রুদ্ধ ছিল, কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। কুরাইশদের প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু না কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নেতৃত্বে এই কাফেলা পাঠিয়েছিল। এই লোকেরা গাজায় অবস্থান করছিল, এমন সময় হেরাক্লিয়াসের কর্মচারীরা হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হলো এবং তাদের আটক করে হেরাক্লিয়াসের কাছে নিয়ে এল। [১] হেরাক্লিয়াস দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলেন:

“তোমাদের মধ্যে কে সেই নবীর সাথে বংশীয়ভাবে সবচেয়ে নিকটবর্তী?” আবু সুফিয়ান বললেন: “আমি।”

হেরাক্লিয়াসের ইশারায় সৈন্যরা আবু সুফিয়ানকে সামনে বসাল এবং বাকি আরবদের পেছনে বসাল।

হেরাক্লিয়াস দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলা শুরু করলেন, তবে তার আগে বাকি আরবদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন:

“আমি এই ব্যক্তির (আবু সুফিয়ান) কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করব যিনি নবুওয়াতের দাবি করেছেন। যদি সে সত্য উত্তর দেয় তবে তোমরা তা সত্যায়ন করবে। কিন্তু যদি সে ভুল তথ্য দেয় তবে তোমরা বলে দেবে যে সে মিথ্যা বলছে।”

এই ব্যবস্থার পর হেরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন:

“বলো, তোমাদের যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করেছেন, তার বংশমর্যাদা কেমন?”

ততক্ষণ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেননি কিন্তু তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তাই বললেন:

“তিনি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং মধ্যম স্তরের বংশের অন্তর্ভুক্ত।”

হেরাক্লিয়াস প্রশ্ন করলেন: “তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কি কোনো রাজা ছিলেন?” আবু সুফিয়ান বললেন: “না।”

হেরাক্লিয়াস বললেন: “তিনি যখন নবুওয়াত ঘোষণা করেননি, তার আগে কি তোমরা কখনো তার ওপর মিথ্যার অভিযোগ আরোপ করেছিলে?”

আবু সুফিয়ানের উত্তর এবারও নেতিবাচক ছিল।

হেরাক্লিয়াস জানতে চাইলেন: “আচ্ছা, তার অনুসারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কোন ধরনের লোক? ধনী-প্রভাবশালী নাকি দুর্বল?”

---

[১] ধারণা করা হয় এই ঘটনাটি ৭ হিজরির গ্রীষ্মকালের; কারণ কুরাইশরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফর সবসময় গ্রীষ্মকালেই করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্রাটদের কাছে পত্রসমূহ ৭ হিজরির শুরুতে খায়বার যুদ্ধের সময় বা তার পরপরই পাঠিয়েছিলেন যা মে-জুন ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের দিনগুলো ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত দাহইয়া কালবি (রা.)-এর কায়সারের দরবারে পৌঁছাতে সম্ভবত এক মাস সময় লেগেছিল, অর্থাৎ ধারণা করা হয় কায়সার এই পত্রটি জুন বা জুলাই মাসে পড়েছিলেন। এর কিছুদিন আগে তিনি কুরাইশ বণিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন যারা মে বা জুন মাসে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সিরিয়ায় পৌঁছেছিলেন। এর মাধ্যমে এই দিকটি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, খায়বার যুদ্ধ জিল-মুহাররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল, জিল-হারাম (মোতাবেক জমাদি-উল-আউয়াল মাদানি) মাসে নয়। যদি এই যুদ্ধ ২ জমাদি-উল-আউয়াল মাদানি মাসে হতো যা সেপ্টেম্বর ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের বিপরীতে আসে, তবে দাহইয়া কালবি (রা.)-এর কায়সারের কাছে উপস্থিতি শীতকালেই হতে পারত। এখন কুরাইশদের উপস্থিতি সেই ঋতুতে মেনে নেওয়াও অসম্ভব; কারণ তারা শীতকালে সিরিয়ায় যেত না। সুতরাং হয় এটি বলতে হবে যে, কুরাইশরা সেই শীতকালের ছয়-সাত মাস পর পরবর্তী গ্রীষ্মে সিরিয়ায় পৌঁছেছিল অথবা বলতে হবে যে, তারা তার তিন-চার মাস আগে সিরিয়া সফর করে এসেছিল। এই উভয় সম্ভাবনাই ক্ষীণ; কারণ বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট যে, কুরাইশ প্রতিনিধি দল এবং দাহইয়া কালবি (রা.)-এর দূতিয়ালির সময় প্রায় একই ছিল।

আবু সুফিয়ানের উত্তর ছিল: “বেশিরভাগই দরিদ্র ও নিঃস্ব লোক।”

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন: “তাদের সাথীরা কি কমছে নাকি বাড়ছে?” আবু সুফিয়ান বললেন: “বেড়েই চলেছে।”

হিরাক্লিয়াস প্রশ্ন করলেন: “তাদের কোনো সাথী কি তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে?”

আবু সুফিয়ান বললেন: “না।”

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন: “তোমাদের কি তাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে?”

আবু সুফিয়ান ইতিবাচক উত্তর দিলে হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন: “এই যুদ্ধগুলোর ফলাফল কী হয়েছে?”

উত্তর পাওয়া গেল: “কখনো আমরা জয়ী হই, কখনো তারা।”

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন: “সে তোমাদের কিসের নির্দেশ দেয়?”

আবু সুফিয়ান বললেন: “সে বলে যে, আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না, তোমাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ ছেড়ে দাও। আর সে আমাদের সালাত আদায় করার, জাকাত প্রদান করার, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার, সত্য বলার এবং পবিত্র থাকার নির্দেশ দেয়।”

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন: “সে কি তোমাদের সাথে কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে?”

আবু সুফিয়ান বললেন: “না। তবে হ্যাঁ! বর্তমানে আমাদের সাথে তার একটি চুক্তি (হুদায়বিয়ার সন্ধি) হয়েছে, জানি না সে তা পালন করবে কি না।” আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় বলতেন:

“এই পুরো কথোপকথনে এই বাক্যটি ছাড়া আমি হুজুর (সা.)-এর ওপর কোনো দোষারোপ করার সুযোগ পাইনি।”

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন: “তার বংশে কি আগে কেউ এমন দাবি করেছে?” আবু সুফিয়ান বললেন: “না।”

আবু সুফিয়ান যতগুলো গুণের কথা বলেছিলেন, সেগুলো সবই পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে বর্ণিত নিদর্শনগুলোর সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছিল, তাই হিরাক্লিয়াস এই সব কথা শুনে বললেন:

“আমি তোমাকে তার বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তুমি বলেছ যে সে উচ্চবংশীয়। পয়গম্বরগণ এভাবেই উচ্চবংশীয় পরিবারে প্রেরিত হন।”

“আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো বাদশাহ ছিল কি না, তুমি বলেছ: না। যদি তার বড়দের মধ্যে কোনো বাদশাহ থাকত, তবে আমি বুঝতাম যে এই ব্যক্তি তার পৈতৃক রাজত্ব ফিরে পেতে চায়।”

“আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তার অনুসারীরা কি ধনী নাকি দুর্বল লোক? তুমি বলেছ: দুর্বল লোক। রাসুলদের অনুসারীরা এমনই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে সে কি কখনো মিথ্যা বলেছে? তুমি বলেছ যে না। আমি বুঝতে পারলাম যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলে না, সে আল্লাহর ব্যাপারে কীভাবে মিথ্যা বলবে।”

“আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তার কোনো সাথী কি তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে? তুমি বলেছ: না। প্রকৃতপক্ষে ঈমান যখন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে, তখন এমনই হয়।”

“আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তার সাথীরা কি কমছে নাকি বাড়ছে? তুমি বলেছ যে বাড়ছে।”

ঈমানের আন্দোলন এভাবেই পূর্ণতা লাভ করে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাদের সাথে কি তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে? তুমি বলেছ যে যুদ্ধ হয়েছে, আর কখনো তোমরা জিতেছ, কখনো তারা জিতেছে। রাসূলদের এভাবেই পরীক্ষা করা হয়, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত বিজয় তাদেরই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তারা কি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে? তুমি বলেছ যে কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনি। রাসূলগণ এমনই হন যে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এই দাবি কি আগে কেউ করেছিল? তুমি বলেছ: না। যদি এই দাবি আগে কেউ করত তবে আমি বলতাম যে এই ব্যক্তি পূর্ববর্তীদের দাবির অনুকরণ করছে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি তোমাদের কী আদেশ দেন? তুমি বলেছ যে তিনি আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ দেন, শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করেন। সালাত, সাওম, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং পবিত্রতার আদেশ দেন। যদি তুমি সত্য বলে থাকো তবে তিনি সত্যিই নবী। আমি জানতাম যে তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে তাঁর আবির্ভাব তোমাদের মধ্য থেকে হবে। যদি আমি জানতাম যে আমি তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব তবে আমি তাঁর খিদমতে যাওয়া পছন্দ করতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম তবে তাঁর পা ধুয়ে পান করতাম। নিশ্চয়ই তিনি এই ভূখণ্ডও জয় করে নেবেন যার ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। [১]

আবু সুফিয়ান বলেন: এরপর থেকে আমি হতোদ্যম হয়ে পড়লাম এবং আমার এই বিশ্বাস হয়ে গেল যে রাসূলুল্লাহ বিজয়ী হয়েই থাকবেন, এমনকি আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের হাকিকত (বাস্তবতা) ঢেলে দিলেন যদিও আমি তা অপছন্দ করছিলাম। [২]

**হিরাক্লিয়াসের সামনে পবিত্র পত্র এবং হিরাক্লিয়াসের নিজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ:**

এরই মধ্যে দিহয়া কালবী (রা.) হিরাক্লিয়াসের নামে হুজুর (সা.)-এর পত্র নিয়ে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর বসরায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। বসরার শাসক তাঁকে হিরাক্লিয়াসের কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসে পাঠিয়ে দেন। পত্রটি পড়ে হিরাক্লিয়াসকে শোনানো হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানিত পত্রে লেখা ছিল:

“আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম দয়ালু ও অত্যন্ত দয়াবান। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াসের নামে। হিদায়াতের অনুসরণকারীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করো শান্তিতে থাকবে এবং আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। যদি তুমি বিমুখতা প্রদর্শন করো তবে অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গোমরাহির (পথভ্রষ্টতার) দায়ভারও তোমার ওপর বর্তাবে।”

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ১৭৭৩, আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব কিতাবুন নবী (সা.) ইলা হিরাক্লিয়াস; সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭, বাদউল ওহী; সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৫৫৩, কিতাবুত তাফসীর, বাব কওলুহু: কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তাআলাও; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৪/২৬৮।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৯৪১, কিতাবুল জিহাদ, বাব দুআউন নবী (সা.) আন-নাস।

এরপর সূরা আল-ইমরানের এই আয়াতটি লিপিবদ্ধ ছিল:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“হে আহলে কিতাব! এমন একটি কথার দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন, তা হলো এই যে, আল্লাহ ছাড়া আমরা অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না এবং আমরা আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে রবের মর্যাদা দেব না। যদি তারা না মানে, তবে তোমরা বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো অনুগত।” [১]

হিরাক্লিয়াস, যিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং শেষ নবীর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বার্তার প্রতিটি অক্ষর সত্য এবং এটি গ্রহণ করতে দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু তার আশঙ্কা ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তার জাতি এবং বিশেষ করে পাদ্রিরা তাকে সমর্থন করবে না। তারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে এবং এটিও অসম্ভব ছিল না যে তারা তাকে হত্যা করবে।

দীর্ঘ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হিমসে ফিরে তিনি দরবার আহ্বান করলেন। যখন পাদ্রি ও আমীররা সমবেত হলেন, তখন তিনি দরজাসমূহে তালা লাগিয়ে দিলেন এবং এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে বললেন: “হে রোমবাসী! তোমরা কি চাও না যে তোমরা সফল হও, হিদায়েত লাভ করো এবং তোমাদের রাজত্বও অটুট থাকুক? অতএব তোমরা এই নবীর অনুসরণ করো।”

এ কথা শোবামাত্র উপস্থিত ব্যক্তিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং শোরগোল করতে করতে বাইরের দিকে ছুটল। যখন তারা দরজা বন্ধ দেখল, তখন ফিরে এল। তারা এতটাই ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করল যে হিরাক্লিয়াস তার সিংহাসন ও জীবন উভয়ই হারানোর আশঙ্কায় পড়ে গেলেন। তখন তিনি একটি রাজনৈতিক কৌশলের সাথে বললেন: “আমি তো তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এটি জিজ্ঞাসা করছিলাম যাতে বোঝা যায় তোমরা তোমাদের দ্বীনের ওপর কতটা অটল।” [২]

**হিরাক্লিয়াসের ফিরতি পত্র ও উপহারসামগ্রী:**

হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু জাতীয় গোঁড়ামি এবং ক্ষমতার মোহ তাকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখল। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রটি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে নিজের কাছে সংরক্ষণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে একটি ফিরতি পত্র দিহয়া কালবী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে হস্তান্তর করলেন। যাতে তিনি প্রকাশ করলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবী হিসেবে মানেন কিন্তু নিজ জাতির সামনে তিনি নিরুপায়। তিনি কিছু উপহারও পাঠালেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। [৩]

হিরাক্লিয়াস বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দেশ মুসলমানদের দখলে আসা এখন মাত্র কয়েক বছরের ব্যাপার। তাই তিনি শেষ চেষ্টা হিসেবে তার আমীরদের এই বিষয়ে রাজি করাতে চাইলেন যে, শুধুমাত্র সিরিয়া অঞ্চল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিয়ে দিয়ে নিজের বাকি সাম্রাজ্যের...

---

[১] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৬৪

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭, বাদউল ওহী; হা: ২৯৪০, ২৯৪১, কিতাবুল জিহাদ, বাব: দুআউন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন-নাসা ইলাল ইসলাম; হা: ৩৫৫৩, কিতাবুত তাফসীর, বাব: কওলুহু: কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তাআলাও ইলা কালিমাতিন।

[৩] আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৩৪-৩৩৫, ত ত আল-ইলমিয়্যাহ।

...রক্ষার নিশ্চয়তা নেওয়া হোক, কিন্তু আমীররা এই প্রস্তাবটিও কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে হেরাক্লিয়াস মানসিকভাবে সিরিয়া ত্যাগ করে ইউরোপে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। [১]

**রোমানদের কাছে নববী পত্রের সংরক্ষণ:**

হেরাক্লিয়াস এরপর আরও বারো-তেরো বছর (৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শাসন করেন। অবশেষে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে কনস্টান্টিনোপলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। ততদিনে তার এশীয় অঞ্চলগুলোতে ইসলামের পতাকা উড়তে শুরু করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বরকতময় পত্রটি তিনি সারাজীবন অত্যন্ত যত্নের সাথে তার বিশেষ কোষাগারে রেখেছিলেন। তার উত্তরসূরিরাও দীর্ঘকাল এটি সংরক্ষণ করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ এই পত্রটি থাকবে, ততক্ষণ তাদের রাজত্ব নিরাপদ থাকবে। [২]

**হারিস বিন আবি শামিরের নামে নববী পত্র:**

দ্বিতীয় পত্রটি ছিল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী আরব গভর্নর হারিস বিন আবি শামির গাসসানির নামে, যা হযরত শুজা বিন ওয়াহাব (রা.) নিয়ে গিয়েছিলেন। হারিস বিন আবি শামির বার্তাটিকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন এবং জবাবে মদীনা আক্রমণের হুমকি দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জবাব শুনে বললেন: "তার রাজত্ব ধ্বংস হবে।" [৩]

**মিশরের সম্রাট মুকাউকিসের নামে সম্মানীয় পত্র:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) তৃতীয় পত্রটি মিশরের শাসক জুরাইজ বিন মিনা-র নামে পাঠিয়েছিলেন, যাকে আরবরা 'মুকাউকিস' উপাধিতে ডাকত। তিনি ছিলেন কিবতি বংশোদ্ভূত। মিশরে কায়সারের প্রতিনিধি হওয়ার পাশাপাশি প্রধান পাদ্রী হিসেবে তিনি ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। তবে ধারণা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাকে পত্র লিখেছিলেন, তখন তিনি স্থানীয় কিবতিদের সমর্থনে মিশরের একজন স্বাধীন শাসক হয়ে উঠেছিলেন। একারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে "আযীমুল কিবত" (কিবতিদের প্রধান) বলে সম্বোধন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) পত্রে লিখেছিলেন:

"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কিবতিদের প্রধান মুকাউকিসের প্রতি: যারা হেদায়েত অনুসরণ করে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি অস্বীকার করেন, তবে আপনার জাতির পাপের বোঝাও আপনার ওপর বর্তাবে।" [৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই সম্মানীয় পত্রটি হযরত হাতিব বিন আবি বালতাআ (রা.) নিয়ে গিয়েছিলেন। মুকাউকিস খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের গভীর জ্ঞান রাখার কারণে শেষ যমানার নবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তবুও তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দূতের পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন: "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার মনিব একজন নবী?" হাতিব (রা.) উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ, অবশ্যই।"

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/৩৮১, ৩৮২, দারু হাজার।

[২] আর-রওযুল উনুফ: ৭/৩০০, ত. দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি; ইরশাদুস সারি, শারহুল বুখারি লিল কাসতালানি: ১/৮০, ত. আল-আমিরিয়্যাহ।

[৩] তারিখুত তাবারী: ২/৬৫২।

[৪] আল-ইকতিফা বিমা তাযাম্মানাহু মিন মাগাযি রাসূলিল্লাহ (সা.) ওয়াস সালাসাহ আল-খুলাফা লি আবিল রাবি আল-হুমাইরি (মৃ. ৬৩৩ হি.): ২/১৪, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

সে বলল: “যদি তোমার মনিব নবী হন, তবে তাঁর কওম তাঁকে কেন স্বদেশ থেকে বের করে দিল? তিনি কেন তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন না?”

হযরত হাতিব (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন: “তুমি কি ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মানো না?”

মুকাউকিস বলল: “কেন নয়!”

হযরত হাতিব (রা.) বললেন: “তাহলে তোমার ধারণা অনুযায়ী, যখন তাঁর কওম তাঁকে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করেছিল, তখন তিনি কওমের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া কেন করলেন না?”

মুকাউকিস নিরুত্তর হয়ে বলল: “তুমি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি।”

সে হুজুর আকরাম (সা.)-এর সম্মানিত পত্রটি চুম্বন করল এবং হযরত হাতিব (রা.)-এর মাধ্যমে নবী আকরাম (সা.)-এর খিদমতে উপহার হিসেবে একটি চমৎকার পোশাক, একটি উন্নতমানের খচ্চর এবং দুইজন দাসী পাঠাল। [১]

**কিসরা পারভেজের নামে সম্মানিত পত্র:**

চতুর্থ পত্রটি ছিল ইরানের বাদশাহ কিসরা পারভেজের নামে, যে ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং এক বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। তার শাসনের ৩৮ বছর পূর্ণ হতে চলেছিল এবং এই সময়ে সে সাসানীয় বংশের শৌর্য-বীর্যকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। যদি হেরাক্লিয়াস তার কাছ থেকে অধিকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার না করত, তবে ইরান বিশ্বের একমাত্র বিশ্বশক্তিতে পরিণত হতো। তবে হেরাক্লিয়াসের কাছে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত কিসরার সাম্রাজ্য চীনের সীমান্ত থেকে শুরু করে জাজিরাতুল আরবের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এদিকে ইয়েমেনও প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইরানি শোষণে পিষ্ট ছিল, তাই ইরানি শাসকরা আরবদের নিজেদের অধীনস্থ মনে করত। কিসরার নামে পত্রটি হযরত আবদুল্লাহ বিন হুজাফা (রা.) নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে লেখা ছিল:

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের প্রধান কিসরার নামে! শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর যে হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে আমি সমগ্র জগতের জন্য আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ আমাকে এই জন্য পাঠিয়েছেন যেন আমি প্রত্যেক জীবিত মানুষকে সতর্ক করি। ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদ থাকবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মজুসি জাতির গোমরাহির দায়ভার তোমার ওপরই বর্তাবে।” [২]

কিসরা পারভেজ হুজুর (সা.)-এর পত্রটি পড়ে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং তা টুকরো টুকরো করে ফেলল। সেই সাথে সে ইয়েমেনে তার গভর্নর বাযানকে কঠোর নির্দেশ পাঠাল যেন সে নবুওয়াতের এই দাবিদারকে গ্রেপ্তার করে তার দরবারে পাঠিয়ে দেয়। বাযান জানত যে হুজুর (সা.) কত উচ্চমর্যাদার নেতা, কিন্তু তার ধারণা ছিল যে কিসরার আদেশের সামনে বিশ্বের কোনো শাসকই টুঁ শব্দ করার সাহস পাবে না, তাই বাযান তাৎক্ষণিকভাবে দুইজন প্রতিনিধি এবং পঁচিশজন সৈন্য হুজুর (সা.)-এর...

---

[১] আল-আমওয়াল লি ইবনে যানজুয়াহ, হা: ৯৬৯, ত: মারকাজুল মালিক ফয়সাল; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৯২/৬

[২] তারিখুত তাবারী: ৯০/৩

...দিকে পাঠিয়ে দিলেন, সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে এই বার্তাও দিলেন:

“যদি আপনি সানন্দে কিসরার কাছে চলে যান, তবে আমি আপনাকে একটি কূটনৈতিক পত্র লিখে দেব যা কাজে আসবে। আর যদি আপনি অস্বীকার করেন, তবে কিসরা আপনার জাতিকে ধ্বংস করে দেবে এবং আপনার দেশকে তছনছ করে দেবে।”

এই প্রতিনিধিরা দ্রুত সফর করে মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে বাযানের বার্তা শোনালেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন:

“যদি এই নবুওয়াতের দাবি আমি নিজের পক্ষ থেকে করতাম তবে হেরে যেতাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরানি দূতদের লম্বা লম্বা গোঁফ এবং কামানো দাড়ি দেখে এতটাই ঘৃণা বোধ করছিলেন যে তাদের চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলেনও না। অবশেষে তিনি এই বলে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন:

“তোমাদেরকে এমন আকৃতি ধারণ করার নির্দেশ কে দিয়েছে?” তারা বলল: “আমাদের রব কিসরা।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন:

“কিন্তু আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি গোঁফ ছোট করি এবং দাড়ি লম্বা করি।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) দূতদের নিজের কাছে মেহমান হিসেবে রাখলেন এবং একদিন তাদের বিদায় দেওয়ার সময় বললেন:

“জাও! তোমাদের গভর্নর বাযানকে গিয়ে বলো যে, গত রাতে আমার রব তোমাদের রব কিসরাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।”

ইরানিরা সেই দিনের তারিখ লিখে নিল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে ফিরে চলল। নিজ দেশে পৌঁছে তারা জানতে পারল যে, মদিনার সরকারের (সা.) কথা একদম সঠিক ছিল। সেই তারিখেই কিসরা পারভেজ তার রাজধানী মাদায়েনে নিজ পুত্র শিরওয়াইহ-এর হাতে নিহত হয়েছিল এবং সাসানি বংশের বিশাল সাম্রাজ্য টালমাটাল হয়ে পড়েছিল। [১]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/২৮৩ থেকে ৩৯০, দার হিজর।

উপকারী তথ্যাবলি:

- ওয়াকিদি কিসরার মৃত্যুর তারিখ ১০ জমাদি-উল-আউয়াল ৭ হিজরির রাত উল্লেখ করেছেন। এই তারিখটি মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, যেখানে মাদানি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তারিখটি ছিল ১০ শাওয়াল। ওয়াকিদি এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, তখন রাতের ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছিল। ঈসায়ী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই তারিখটি ১০ ফেব্রুয়ারি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ। ফেব্রুয়ারি মাসে এশিয়ার অধিকাংশ দেশে সূর্য যে সময়ে অস্ত যায়, সেই হিসেবে এটি ছিল রাত প্রায় বারোটার ঘটনা।
- এখানে তারিখ-এ-তাবারির একটি বর্ণনার ভুল স্পষ্ট হওয়া উচিত, যাতে লেখা আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) কিসরা হত্যার সংবাদ হুদায়বিয়াতে পেয়েছিলেন। (তারিখ-এ-তাবারি: ২/১৮৫, ১৮৬)। অথচ এটি সঠিক নয়। ৬ হিজরিতে যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল, তখন সম্রাটদের নামে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পত্রগুলো পাঠানোই হয়নি।
- শিরওয়াইহ ক্ষমতা গ্রহণের পর ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে নির্দেশ দেন যে, সেই ব্যক্তির ওপর নজর রাখো যার بارے কিসরা তোমাকে আদেশনামা পাঠিয়েছিল। বাযান সেই আদেশ পালন করেননি, বরং ইয়েমেনে অবস্থানরত বহু পারস্য আমীরসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সংবাদে আনন্দিত হয়ে তাকে একটি কোমরবন্ধ (belt) পাঠান। যেহেতু হিময়ারি ভাষায় কোমরবন্ধকে “মিহরাহ” বলা হয়, তাই বাযানকে ইয়েমেনে “যুল মিহরাহ” এবং তার সন্তানদের “বানুল মিহরাহ” বলা হতে থাকে। (তারিখ-এ-তাবারি: ২/২২৪)
- আল্লামা ইবনুল জাওযি বর্ণনা করেছেন যে, কিসরা পারভেজ মরার আগে শিরওয়াইহকে হত্যার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। সে তার কোষাগারের সবচেয়ে সুরক্ষিত সিন্দুকে একটি শিশিতে কিছু বিষাক্ত বড়ি রেখে দিয়েছিল এবং তার ওপর এমন কিছু শব্দ লিখে দিয়েছিল যাতে মনে হয় যে এই বড়িগুলো যৌনশক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। শিরওয়াইহ যখন তার পিতার কোষাগার তল্লাশি করল, তখন শেষ পর্যন্ত সেই সুরক্ষিত সিন্দুকটি খুঁজে পেল। শিশির শিরোনাম দেখে সে বড়িগুলো খেয়ে নিল এবং বিষের প্রভাবে মারা গেল। (সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা ৬৭)

**নাজ্জাশির নামে সম্মানজনক পত্র:**

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পঞ্চম পত্রটি আবিসিনিয়ার (হাবশা) বাদশাহ নাজ্জাশির নামে ছিল, যা রবিউল আউয়াল ৭ হিজরিতে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরি (রা.)-এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। নাজ্জাশি সম্মানজনক পত্রটি পাঠ করে কোনো দ্বিধা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলেন: "যদি সম্ভব হতো, তবে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হতাম।" [১]

**আরব আমিরদের নামে পত্র:**

এই বাদশাহদের ছাড়াও রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাজিরাতুল আরবের অনেক স্বায়ত্তশাসিত শাসকদের কাছেও পত্র পাঠিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে বাহরাইনের শাসক মুনজির ইবনে সাওয়া, ইয়ামামার শাসক হাওজা ইবনে আলী, ওমানের শাসক আইয়াজ ইবনে জুলুন্দা এবং জিফার ইবনে জুলুন্দা উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে মুনজির ইবনে সাওয়া এবং ওমানের উভয় শাসক ভাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। [২]

**উমরাতুল কাযা**

৭ হিজরির জিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সাথে গত বছর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উমরাতুল কাযার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১লা জিলকদ যাত্রা শুরু হয়, যাতে প্রায় চৌদ্দশ সাহাবী সফরসঙ্গী ছিলেন যারা গত বছর বাইয়াতে রিদওয়ানে শরিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভাব্য বিপদের কথা বিবেচনা করে যুদ্ধের সরঞ্জাম অর্থাৎ শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং বর্শা ইত্যাদি সাথে রেখেছিলেন। কিন্তু মক্কায় প্রবেশের আগে চুক্তি অনুযায়ী এই যুদ্ধ সরঞ্জামগুলো সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার তত্ত্বাবধানে ওয়াদিয়ে ইয়াজাজে রেখে দেওয়া হয়। [৩]

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কায় প্রবেশে কোনো বাধা দেয়নি। তবে সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় প্রবেশের সময় সতর্কতামূলকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে রেখেছিলেন যাতে কেউ কোনো ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস না পায়। [৪]

---

[১] তবাকাত ইবনে সাদ: ১/২৭, ত. দার সাদির।

ফায়দা: সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসরা, কায়সার, নাজ্জাশি এবং প্রত্যেক প্রতাপশালী ব্যক্তির কাছে পত্র লিখেছিলেন এবং তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। (সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ২, পৃ: ৯৪, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব কুতুবুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলাল মুলুকিল কুফফার)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে বাদশাহদের কাছে যে পত্রগুলো পাঠানো হয়েছিল, তাতে নাজ্জাশিকেও ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, এটি ছিল দ্বিতীয় নাজ্জাশি। কারণ এটি স্পষ্ট যে, এই পত্রটি নাজ্জাশি আসহামার নামে ছিল না, বরং তার মৃত্যুর পর পাঠানো হয়েছিল। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর একটি বর্ণনায় স্পষ্ট আছে যে, যে নাজ্জাশির জানাজা পড়ানো হয়েছিল তার নাম ছিল আসহামা। (সহীহ বুখারী, খণ্ড: ১, পৃ: ৩৮৭, কিতাবুল মানাকিব, বাব মাউতুন নাজ্জাশি)। আর আবু হুরায়রা (রা.) (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ৭ হিজরির মহররম মাসে খায়বার যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়েছিলেন) আসহামার জানাজায় শরিক ছিলেন। "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাশির মৃত্যুর সংবাদ আমাদের দিয়েছিলেন যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।" (সহীহ বুখারী, খণ্ড: ১, পৃ: ১৬৪, বাব আস-সালাতু আলাল জানাইজি বিল মুসাল্লা)। সুতরাং আসহামার মৃত্যু মহররম ৭ হিজরিতে হয়েছিল এবং আবিসিনিয়ায় নতুন নাজ্জাশি নিযুক্ত হয়েছিল, যার কাছে এই সম্মানজনক পত্রটি রবিউল আউয়াল ৭ হিজরিতে পাঠানো হয়েছিল।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৯৫, ৭ হিজরির অধীনে।

[৩] তবাকাত ইবনে সাদ: ২/১২০, ১২১।

বাইয়াতে রিদওয়ানের সেই সব ব্যক্তিরা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা এই সময়ের মধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন বা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৪২৫৫, বাব উমরাতুল কাযা, কিতাবুল মাগাজি।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সেই দিন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সওয়ারির আগে আগে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে যাচ্ছিলেন:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ... الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ ... وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

(হে কাফেরের সন্তানরা! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পথ ছেড়ে দাও... আজ তাঁর আগমনের মুহূর্তে আমরা তোমাদের ওপর আঘাত করব। এমন আঘাত যা মাথাকে ঘাড় থেকে আলাদা করে দেবে... এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।)

হযরত উমর (রা.) তাঁকে এমন কবিতা আবৃত্তি করতে দেখে আপত্তির সুরে বললেন: “রাসূলুল্লাহর সামনে এবং আল্লাহর হারামে এমন কবিতা আবৃত্তি করছ?”

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “হে উমর! ওকে করতে দাও। নিশ্চয়ই এই কবিতাগুলো মুশরিকদের ওপর তীরের চেয়েও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী।” [১]

কুরাইশরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কুয়াইকিআন পাহাড়ে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে তারা মসজিদে হারামে মুসলমানদের কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে চস্তি ও সুস্থতা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে দ্রুত গতিতে চলেন। কুরাইশরা ধারণা করছিল যে মুসলমানরা মদিনায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তারা এটি দেখে বলতে লাগল: “এই লোকগুলো তো আরও বেশি চনমনে ও শক্তিশালী হয়ে গেছে।” [২]

তৃতীয় দিন কাফেররা হযরত আলী (রা.)-কে বলল: “আপনার মনিবকে বলে দিন এখান থেকে চলে যেতে, আজ সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে।” [৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ওয়াদা অনুযায়ী মক্কা থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিলেন। মক্কায় কিছু অসহায় মুসলমান অত্যন্ত কষ্টের জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত হামজা (রা.)-এর স্ত্রী উম্মে আম্মারা (সালমা বিনতে উমাইস রা.) এবং কন্যা আম্মারা (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে বের হতে লাগলেন, তখন আম্মারা (রা.) ‘চাচাজান চাচাজান’ বলতে বলতে পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে এবং তাঁর মাকে সাথে নিয়ে নিলেন। এই এতিম মেয়েটির লালন-পালনের সম্মান অর্জনের জন্য হযরত আলী, হযরত জাফর এবং হযরত জায়েদ বিন হারিসা (রা.) নিজেদের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এটি দেখে বললেন: “খালা মায়ের মতো হয়।” এই বলে তিনি হযরত জাফর (রা.)-কে অভিভাবক নিযুক্ত করে দিলেন; কারণ তাঁর বিবাহে মেয়েটির আপন খালা আসমা বিনতে উমাইস (রা.) ছিলেন। [৪]

যেহেতু কিছুকাল আগে সন্ধিপত্রের সেই শর্তগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল যার অধীনে মক্কার কোনো মুসলমানের মদিনায় যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাই এই অসহায়দের সাথে নিয়ে যাওয়ার পূর্ণ সুযোগ ছিল।

---

[১] সুনান তিরমিজি, হা: ২৮৪৭, আবওয়াবুল আদব, বাবু ফি ইনশাদিশ শি’র; সহীহ বুখারী, হা: ৪২৫৬, বাবু উমরাতিল কাযা, কিতাবুল মাগাযী। ফায়দা: আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এই উমরায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং তিনি একে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারটি উমরার মধ্যে একটি উমরা হিসেবে গণ্য করতেন। (সহীহ বুখারী, হা: ১৭৭৫, বাবু কাম ই’তামারান নবী)। অথচ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) রজব মাসে কোনো উমরা করেননি। (সহীহ বুখারী, হা: ১৭৭৭)। এই মতভেদের কারণ হলো এই উমরাটি তারিখ অনুযায়ী জিলকদ মাসে ছিল, অথচ তৎকালীন ক্যালেন্ডারে তা ছিল রজব মাস। হযরত আয়েশা (রা.) সেই সময়ের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী বলেছিলেন।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪২৫১; সহীহ মুসলিম, হা: ১২১৮, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু ইসতিহবাবির রামল।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ২৬৯৯, বাবু কাইফা ইয়ুকতাবু হাযা মা সালাহা আলাইহি ফুলান, কিতাবুস সুলহ; তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১২২/২।

**তারিখে উম্মতে মুসলিমা**

**প্রথম খণ্ড**

**হযরত মায়মুনা বিনতে আল-হারিস (রা.)-এর সাথে বিবাহ:**

মক্কায় হযরত আব্বাস, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং কিছু আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত চাপের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। [১] উম্মুল ফজল (আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী)-এর ছোট বোন মায়মুনা বিনতে আল-হারিস (রা.)-ও মক্কার সেই অসহায় মুসলমানদের একজন ছিলেন, তাঁর স্বামী আবু রুহম ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি মদিনায় যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর কোনো অভিভাবক ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.), যিনি মক্কার অসহায় মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, সমীচীন মনে করলেন যে মায়মুনা (রা.)-কে তাঁর বিবাহবন্ধনে গ্রহণ করা হোক। আব্বাস পরিবারেরও ইচ্ছা ছিল যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি পাক। রাসূলুল্লাহ (সা.) উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে আবু রাফে এবং আউস বিন খাওলি (রা.)-কে বিবাহের উকিল ও সাক্ষী হিসেবে হযরত আব্বাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে হযরত মায়মুনা (রা.) হযরত আব্বাসকে তাঁর অভিভাবক (ওয়ালি) নিযুক্ত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পৌঁছালে হযরত মায়মুনা (রা.) সম্মত হন। হযরত আব্বাস, আবু রাফে এবং আউস বিন খাওলি (রা.)-এর উপস্থিতিতে বিবাহ পড়িয়ে দেন।

উমরা থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে বের হয়ে 'সারিফ' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। আবু রাফে (রা.) হযরত মায়মুনা (রা.)-কে এখানে নিয়ে আসেন। বিদায় অনুষ্ঠান (রুখসতি) সম্পন্ন হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন। [২]

**হযরত জয়নব (রা.) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকাল**

উমরা থেকে ফেরার পর ৮ হিজরি সালের শুরুটা এক বেদনাদায়ক ঘটনার মাধ্যমে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বড় সাহেবজাদী হযরত জয়নব (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্বামী হযরত আবুল আস (রা.) গত বছর ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় বসবাস শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনে মাত্র এক বছর একসাথে কাটাতে পেরেছিলেন যে জয়নব (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। নবী করীম (সা.) খবর পেয়ে কাফন-দাফনের জন্য আবুল আস (রা.)-এর ঘরে তাশরিফ আনেন। হযরত উম্মে আয়মান, হযরত সাওদা এবং হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) গোসল দেন। [৩] মেয়েকে কবরে নামানোর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অত্যন্ত শোকাতুর দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তাঁর চেহারায় প্রশান্তি ফুটে ওঠে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "আমি আমার মেয়ের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা ভাবছিলাম। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি যেন তাকে কবরের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়, দোয়া কবুল করা হয়েছে। তার সাথে সহজ আচরণের ফয়সালা করা হয়েছে।" [৪]

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৩৫৭, বাব: ইজা আসলামাস সাবিয়্যু ফামাতা।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/১২২; সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৩৮ থেকে ২৪০।

হযরত মায়মুনা (রা.)-এর সাথে বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন কি না? এ বিষয়ে একটি মত নেতিবাচক এবং অন্যটি ইতিবাচক। এটি অত্যন্ত বিতর্কিত একটি মাসআলা যার ওপর মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। লেখক এর সারসংক্ষেপ এভাবে বুঝেছেন যে, যারা ইহরাম অবস্থায় বিবাহের কথা অস্বীকার করেন, তারা সেই সময়ের কথা বিবেচনা করেন যখন মদিনা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি ইহরাম বাঁধেননি। যারা বিবাহের চুক্তিকে ইহরাম অবস্থায় মনে করেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো উকিলদের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) উমরার জন্য রওনা হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় পৌঁছানোর আগেই হযরত আব্বাস বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন। সুতরাং বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। এটি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। হানাফী ফিকহ এখানে অবকাশ খুঁজে পায় এবং শাফেয়ীগণ সতর্কতার ওপর।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ, অনুবাদ: জয়নব বিনতে মুহাম্মদ (সা.)।

[৪] উসদুল গাবাহ, আলোচনা: জয়নব বিনতে মুহাম্মদ (সা.)।

## বাইজেন্টাইন রোমের সাথে প্রথম সংঘর্ষ - মুতার যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাসক ও রাজাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণের ধারা অব্যাহত ছিল। এই ধারাবাহিকতায় আপনি হারিস বিন উমাইর আল-আযদি (রা.)-কে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর বসরার শাসক শুরাহবিল বিন আমর আল-গাসসানির কাছে পাঠান। শুরাহবিল সমস্ত কূটনৈতিক ও নৈতিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে রাসূলের দূতকে শহীদ করে দেন। এটি এমন এক কাজ ছিল যা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হন। আপনি এ পর্যন্ত সিরিয়ার দিকে সৈন্য প্রেরণে বিরত ছিলেন এবং সম্ভবত পুরো আরব বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আপনি বিশ্বের এই বৃহত্তম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাননি। কিন্তু এখন মদিনা রাষ্ট্রের সম্মানের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এই বিষয়টি যদি উপেক্ষা করা হতো, তবে রোমানরা মদিনার দিকে অগ্রসর হতে দেরি করত না। সুতরাং এখন ধর্মীয় অবস্থানের পাশাপাশি প্রজ্ঞার দাবিও ছিল যে, এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে আঘাত করা হোক। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ৮ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে তিন হাজার মুহাজির ও আনসারের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে সিরিয়ার সীমান্তের দিকে প্রেরণ করেন। [১] আপনি যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-কে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুক্ত করা গোলাম এবং আপনার পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চান্ন বছর। রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দেন যে, যদি যায়েদ শহীদ হন তবে জাফর বিন আবি তালিব নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, আর তিনিও যদি শহীদ হন তবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে আমীর করা হবে। তিনিও যদি শহীদ হন, তবে মুসলমানরা যাকে ইচ্ছা আমীর বানিয়ে নেবে।

এই বাহিনী অত্যন্ত দীর্ঘ সফরে যাচ্ছিল। কেন্দ্র থেকে এর যোগাযোগ, সংবাদ আদান-প্রদান এবং খাদ্য ও রসদ সরবরাহের ধারা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তদুপরি মোকাবিলা ছিল এমন এক বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে যা মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমবেত করতে পারত। তাই পরাজয়, পিছু হটা বা জানমালের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। তবুও নবী করীম (সা.) দোয়ার সাথে বাহিনীকে বিদায় জানান। মুজাহিদিনরা প্রায় এগারোশ কিলোমিটারের কষ্টসাধ্য সফর শেষে রোমানদের সীমান্তে প্রবেশ করেন। সেখানে তারা জানতে পারেন যে, এক লক্ষ রোমান সৈন্য তাদের মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে এসেছে এবং লাখম, জুযাম ও অন্যান্য খ্রিস্টান আরবদের বাহিনীও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং তাদের সংখ্যাও প্রায় এক লক্ষ। মুসলমানরা 'মাআন' নামক স্থানে দুই দিন অবস্থান করে পরামর্শ করেন যে এখন কী করা উচিত? কারণ রওনা হওয়ার সময় তাদের ধারণা ছিল না যে এত বড় বাহিনী হঠাৎ সামনে চলে আসবে। কিছু বিজ্ঞ সাহাবী পরামর্শ দেন যে, এখানেই অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পত্র লিখে শত্রুর সংখ্যা জানানো হোক। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি অতিরিক্ত সৈন্য পাঠান বা অন্য কোনো নির্দেশ দেন তবে সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) মুসলমানদের ঈমানি শক্তিকে জাগ্রত করে বললেন: "হে মুসলমানরা! তোমরা..."

---

[১] এটি মাদানি সময়কাল যা মে ও জুন ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ (আগস্ট সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কী হয়েছে? আজ তোমরা সেই জিনিসটিকেই ভয় পাচ্ছ যার আকাঙ্ক্ষায় তোমরা ঘর থেকে বের হয়েছিলে। তোমরা শাহাদাতের সন্ধানে বের হয়েছিলে, আমরা কখনোই সংখ্যা, আধিক্য এবং শক্তির ভিত্তিতে লড়াই করিনি। আমরা এই দ্বীনের শক্তিতে লড়াই করে আসছি যার কারণে আল্লাহ আমাদের সম্মান দান করেছেন, এখন কেবল দুটি বিষয়ই আছে এবং উভয়টিই সর্বোত্তম; হয় বিজয় অর্জিত হবে নতুবা শাহাদাত।

একথা শুনে সবার মনোবল বৃদ্ধি পেল। সবাই বলল: "আল্লাহর কসম! আবদুল্লাহ সত্য বলেছেন।"

মুসলমানরা এখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ময়দান খুঁজতে খুঁজতে "মুতা" নামক একটি গ্রামের কাছে গিয়ে কাতারবন্দী হলো। এখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলমানদের সেনাপতি যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন্দ্রীয় পতাকা হাতে নিয়ে বাহিনীর মধ্যভাগে থেকে নিজ বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন, রোমানদের চাপ বাড়তে থাকল এবং তাদের অনেক সৈন্য যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করতে থাকলেন এবং অবশেষে বর্শার আঘাতে জর্জরিত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত জাফর বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা তুলে নিলেন এবং নিজ বাহিনীকে সাহস জুগিয়ে নতুন উদ্যমে শত্রুর মোকাবিলা শুরু করলেন, অবশেষে রোমানরা তাকেও ঘিরে ফেলল। তিনি পলায়নের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে নিজের লাল ঘোড়া থেকে নিচে লাফিয়ে পড়লেন। সেই সাথে ঘোড়ার সামনের পা দুটি কেটে দিলেন যাতে কোনো রোমান তাতে সওয়ার হতে না পারে। তিনি ডান হাতে পতাকা ধরে বাম হাতে লড়াই করতে থাকলেন, ডান হাত কাটা গেলে তিনি পতাকা বাম হাতে তুলে নিলেন, বাম হাতও কাটা গেলে তিনি পতাকাকে উভয় কাটা হাতের সাহায্যে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। শত্রুরা তার ওপর একের পর এক হামলা করতে থাকল, অবশেষে তলোয়ার ও বর্শার ৯০টি আঘাত সয়ে তিনি পড়ে গেলেন। এই সব আঘাত বুক এবং হাতের ওপর ছিল। একটি আঘাতও পিঠে ছিল না।

হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সাথে সাথে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং বাহিনীকে পরিচালনা করতে লাগলেন। যেহেতু মুসলমানরা তাদের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে খাদ্য ও রসদ থেকে বঞ্চিত ছিল, তাই আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েক দিন ধরে কিছু খাননি। তার অবস্থা বুঝতে পেরে তার চাচাতো ভাই সামান্য গোশত পেশ করলেন এবং বললেন: "কিছু খেয়ে নিন যাতে কিছুটা শক্তি আসে।" তিনি কেবল এক লোকমা মুখে নিয়েছিলেন এমন সময় একদিক থেকে রোমানদের এগিয়ে আসা এবং মুসলমানদের পাল্টা হামলার শোরগোল শোনা গেল। তিনি গোশত ফেলে দিলেন এবং নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "তুমি দুনিয়ায় মজে আছ আর মানুষ জীবনের বাজি ধরছে।" একথা বলে তলোয়ার হাতে সামনে এগিয়ে গেলেন, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়াই করতে থাকলেন।

যখন শত্রুদের চাপ অনেক বেড়ে গেল তখন পদব্রজে লড়াই করার জন্য ঘোড়া থেকে নিচে নামার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন কিন্তু এতে এই আশঙ্কা ছিল যে পলায়নের কোনো সুযোগ থাকবে না। নামার ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধা হলে নিজেকে সম্বোধন করে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ ... لَتَنْزِلَنَّ أَوْ لَتُكْرَهَنَّهْ

"হে মন! তোমাকে কসম, তোমাকে নামতেই হবে, খুশিমনে নেমে যাও নতুবা জোরপূর্বক নামানো হবে।"

إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّهْ ... مَالِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّهْ

"যদি কাফেররা একত্রিত হয়ে হুঙ্কার দেয়, তবে তোমার কী হলো যে তুমি জান্নাতের প্রত্যাশী নও?"

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অংশ: প্রথম

কাদ তলামা কুনতি মুতমাইন্নাহ, হাল আনতি ইল্লা নুতফাতুন ফি শান্নাহ

“তুমি দীর্ঘকাল প্রশান্তির জীবন অতিবাহিত করেছ, এখন তো মশক (পানির পাত্র)-এ এক ফোঁটা পানির মতো সামান্য জীবনই অবশিষ্ট আছে।”

সেই সাথে তিনি নিজের মনে বললেন: “এখন আর কিসের আকাঙ্ক্ষা বাকি আছে? যদি স্ত্রীদের প্রতি হয়, তবে তাদের তালাক। গোলামদের প্রতি হয়, তবে তারা আজাদ। বাগান ও সম্পদের প্রতি হয়, তবে তা আল্লাহর জন্য সদকা।”

একথা বলে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন এবং প্রথম সারিতে গিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; অবশেষে এক শত্রু বর্শার এমন এক আঘাত করল যা বুক ভেদ করে চলে গেল। তিনি মুসলিম ও রোমানদের সারির মাঝখানে পড়ে গেলেন এবং সেই সাথে চিৎকার করে বললেন: “হে মুসলমানগণ! তোমাদের ভাইয়ের লাশ রক্ষা করো।”

মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ রোমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের পেছনে হটিয়ে দিল এবং তাঁর লাশ তুলে নিল; তাঁর পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ইসলামি পতাকা সাবিত বিন আরকাম (রা.) তুলে নিয়েছিলেন। মুসলমানরা তাঁরই নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে চাইল, কিন্তু সেই মুহূর্তে এমন একজন অসাধারণ নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি তাঁর সাহসিকতা, রণকৌশল ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পুরো ইসলামি বাহিনীকে শত্রুর হাতে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। তাই সাবিত বিন আরকাম (রা.) তৎক্ষণাৎ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর হাতে পতাকা তুলে দিলেন এবং বললেন: “যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা বেশি।” বাকি সবাই একে সমর্থন করলেন এবং এভাবেই মক্কার প্রখ্যাত সেনাপতি প্রথমবারের মতো মদিনার বাহিনীর নেতৃত্বের সুযোগ পেলেন। [১]

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর যুদ্ধকৌশল ও নেতৃত্বের দূরদর্শিতার জন্য সেই সময় কঠিন পরীক্ষা ছিল এই যে, তিনি কীভাবে মুসলমানদের রোমানদের বিপজ্জনক বেষ্টনী থেকে রক্ষা করে নিয়ে যাবেন। তবে পিছু হটার ক্ষেত্রে তাদের জন্য রোমানদের পক্ষ থেকে কয়েকশ মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করার আশঙ্কা ছিল। এই বিপদ এড়ানোর জন্য জরুরি ছিল যে, ফিরে যাওয়ার আগে রোমানদের পরাজিত করা। কুদরতে ইলাহি হযরত খালিদ (রা.)-কে এই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিক দান করলেন। তিনি মুসলমানদের সামনের সারিগুলোকে পেছনে পাঠিয়ে দিলেন এবং পেছনের সারিগুলোকে সামনে নিয়ে এলেন। ডান বাহুকে বাম দিকে এবং বাম বাহুকে ডান দিকে মোতায়েন করলেন। স্থান পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন দুর্গম স্থানগুলোতে সতেজ সৈন্যরা দাঁড়ানোর সুযোগ পেল, অন্যদিকে এই নড়াচড়ার ফলে রোমানদের ওপর এক মনস্তাত্ত্বিক ত্রাস সৃষ্টি হলো। এখন যখন যুদ্ধ শুরু হলো, মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়াই করলেন এবং তারা শত্রুদের অপূরণীয় জানমালের ক্ষতি করলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নিজে এমন উদ্দীপনার সাথে তলোয়ার চালালেন যে, একের পর এক তাঁর নয়টি তলোয়ার আঘাতের তীব্রতায় ভেঙে গেল। পরিশেষে তিনি চওড়া ফলার একটি ইয়ামানি তলোয়ার ব্যবহার করলেন যা অকেজো হওয়া থেকে রক্ষা পেল। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে উভয় বাহিনী লড়াই বন্ধ করে দিল।

হযরত খালিদ (রা.) এই সময়ে মুসলমানদের কিছু দলকে বাহিনী থেকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন, যারা ভোরের সময় অত্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে বাহিনীতে এসে যোগ দিল। এতে রোমানদের মনে হলো যে, মুসলমানরা নতুন সাহায্য পাচ্ছে।

---

[১] আস-সিরাহ আল-হালাবিয়্যাহ: ৩/৯২, ৯৭, ত. আল-ইলমিয়্যাহ; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৪/৩১২ থেকে ৩২৮; উসদুল গাবাহ, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)।

তাই তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে লোকসান মনে করলেন এবং পিছিয়ে আসলেন। হযরত খালিদ (রা.) এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মদিনার দিকে যাত্রা করলেন। রোমানরা এই আশঙ্কায় ছিল যে, এটি মুসলমানদের কোনো যুদ্ধকৌশল এবং তারা তাদের মরুভূমির গোলকধাঁধায় ফাঁসাতে চায়, তাই তারা তাদের পিছু নেওয়ার চেষ্টা করেনি।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এই যুদ্ধের সমস্ত তথ্য দেওয়া হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) অশ্রুসজল চোখে সাহাবায়ে কেরামকে হযরত যায়েদ, হযরত জাফর এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দিলেন এবং তারপর বললেন: “এখন লশকর বা বাহিনীর ঝাণ্ডা আল্লাহর তলোয়ারগুলোর মধ্য থেকে এক তলোয়ার হাতে তুলে নিয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ বিজয় দান করেছেন।” রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। ফলে হযরত খালিদ (রা.)-কে ‘সাইফুল্লাহ’ (আল্লাহর তলোয়ার) বলা হতে লাগল।

যদিও এই যুদ্ধে রোমানদের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি বরং মুসলমানরা কৌশলগতভাবে ফিরে এসেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) একে “বিজয়” হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ সত্তর গুণ বড় বাহিনীর মোকাবিলায় এত দৃঢ়তার সাথে লড়া এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পিছু হটা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা কোনো সাধারণ সাফল্য ছিল না। যদিও মুসলমানদের জানমালের ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু এই যুদ্ধ তাদের বিশাল বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সাহস যুগিয়েছিল এবং রোমানদের যুদ্ধকৌশল বোঝার সর্বোত্তম সুযোগ করে দিয়েছিল। এই কারণেই যখন মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ মদিনায় প্রবেশ করলেন এবং কিছু লোক তাদের “ময়দান থেকে পলায়নকারী” বলে টিপ্পনী কাটল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তা খণ্ডন করলেন এবং গাজীদের মনোবল বৃদ্ধি করে বললেন: “তোমরা পলায়নকারী নও, বরং ইনশাআল্লাহ তোমরা পুনরায় আক্রমণকারী।” [১]

**মা’রাকা যাতুস সালাসিল**

মুতার যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনশ লোকের একটি দল উত্তর দিকে কুযাআ ও উযরা গোত্রের দিকে পাঠালেন। কারণ মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের পিছু হটার পর এই লোকেরা রোমানদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর দায়িত্ব ছিল তাদের পুনরায় মুসলমানদের সমর্থনে ফিরিয়ে আনা এবং শামের অধিবাসীদের বিরোধিতায় অটল রাখা। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মাতুলালয় এই উপত্যকায় বসবাসকারী গোত্রগুলোর সাথে ছিল, তাই তিনি এই কাজটি ভালোভাবে করতে পারতেন। তিনি ‘সালাসিল’ নামক ঝরনার কাছে পৌঁছে শত্রুর শক্তির আন্দাজ করলেন এবং অতিরিক্ত সৈন্য চাইলেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু উবাইদাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে পাঠালেন। এই অভিযানের মাধ্যমে উত্তরের অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো। [২]

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে মুতাহ; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/১৭৭, ১৮৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/২৮৬ থেকে ৩৩০।

[২] মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৬৯; তারিখুত তাবারী: ৩/৩১, ৩২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/১৮।

যাতুস সালাসিল মদিনা থেকে প্রায় দশ দিনের পথ লোহিত সাগরের উপকূলে উত্তর দিকে অবস্থিত। সীরাত লেখকরা এই অভিযানের সময়কাল জমাদিউল আখিরা ৮ হিজরি নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু মুতার যুদ্ধ জমাদিউল আউয়াল ৮ হিজরিতে হয়েছিল, তাই যাতুস সালাসিল অভিযান তার পরের মাসেই (জমাদিউল আখিরা ৮ হিজরি, অক্টোবর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) সম্পন্ন হয়েছিল। কোনো কোনো স্থানে একে মুতার যুদ্ধের মাত্র এক মাস পরের ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে সহীহ হাদিসে এসেছে যে, এক রাতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর গোসল ফরজ হয়েছিল কিন্তু প্রচণ্ড শীতের কারণে তিনি গোসল না করে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়িয়েছিলেন (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩৩৪, কিতাবুত তাহারাত, বাব ইযা খাফাল জুনুবুল বারদ)। জানা কথা যে, অক্টোবর মাসে এমন শীত হয় না। এ থেকে বোঝা যায় যে, এটি জমাদিউল আখিরা ৮ হিজরি (জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ যিলকদ ৮ হিজরি) ছিল। অর্থাৎ মুতার যুদ্ধ এবং যাতুস সালাসিলের মধ্যে প্রায় চার মাসের ব্যবধান ছিল।

## কুরাইশদের সাথে চুক্তি ভেঙে গেল

কুরাইশদের মধ্যে এখন আর সেই তেজ অবশিষ্ট ছিল না। খায়বার বিজয়ের পর তারা তাদের মিত্র ইহুদিদের সাহায্য থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকরাও দমে গিয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে কুরাইশদের কোনো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কেবল হুদায়বিয়ার সন্ধিই মক্কায় মুসলমানদের অভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর কুরাইশদের নিজেদেরই একটি ভুলের কারণে এই চুক্তিটিও নস্যাৎ হয়ে গেল।

ঘটনাটি ছিল এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত কুরাইশদের মিত্র গোত্র বনু বকর মদিনা রাষ্ট্রের মিত্র গোত্র বনু খুজআ-র ওপর আক্রমণ করে বসে। অথচ সন্ধিপত্রে দশ বছরের যুদ্ধবিরতির শর্ত নির্ধারিত ছিল, তাই এ ধরনের কোনো পদক্ষেপের কোনো অবকাশ ছিল না। অধিকন্তু, কুরাইশরা এই অন্যায় কর্মকাণ্ডে বনু বকরকে কেবল অস্ত্রই সরবরাহ করেনি, বরং বেশ কয়েকজন কুরাইশ নেতা তাদের লোকজনসহ এই আক্রমণে শরিক হয়েছিল এবং বনু খুজআ-র ওপর নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল। তারা যখন আশ্রয় নেওয়ার জন্য হারামে প্রবেশ করল, সেখানেও তাদের রেহাই দেওয়া হলো না। বনু খুজআ-র একজন মজলুম সালেম বিন আমর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই জুলুম ও নির্যাতনের কাহিনী শোনালেন, তখন তিনি বললেন: “তোমাদের অবশ্যই সাহায্য করা হবে।”

এখন সময় এসে গিয়েছিল যে, মুসলমানরা কুরাইশদের মিথ্যা অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কাবাকে শিরকের আবর্জনা থেকে পবিত্র করে আগের মতো তাওহীদের কেন্দ্রে পরিণত করবে। তবে চূড়ান্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের কাছে দূত পাঠিয়ে দাবি জানালেন যে, তারা যেন বনু খুজআ-র নিহতদের রক্তপণ আদায় করে অথবা যারা তাদের ওপর আক্রমণ করেছে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। যদি এর কোনোটিই মঞ্জুর না হয়, তবে হুদায়বিয়ার চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হোক। কুরাইশরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূতকে জবাব দিল যে, আমরা চুক্তি বাতিল করাকেই গ্রহণ করছি।

দূত যখন এই জবাব নিয়ে ফিরে গেল, তখন কুরাইশরা তাদের ভুল বুঝতে পারল। তারা অবিলম্বে আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠাল যাতে চুক্তির নবায়ন করা যায়। মদিনায় পৌঁছে তিনি প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসভবনে তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবিবা (রা.)-এর ঘরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ঘরে ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানায় বসতে চাইলেন, কিন্তু উম্মে হাবিবা (রা.) তাকে বাধা দিলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন: “আমি কি এই বিছানার যোগ্য নই, নাকি বিছানাটি আমার যোগ্য নয়?”

তিনি বললেন: “এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা, আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে অপবিত্র, আমি সহ্য করতে পারছি না যে আপনি এর ওপর বসবেন।” আবু সুফিয়ান এই বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন যে, “বেটি! আমাদের থেকে দূরে গিয়ে তুমি পুরোপুরি বদলে গেছ।”

এই দুশ্চিন্তার মধ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলেন এবং সন্ধি বহাল রাখার আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো জবাব দিলেন না। হতাশ হয়ে তিনি এবার হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর সাথে দেখা করলেন, কিন্তু কোথাও কোনো কাজ হলো না এবং তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হলো। [১]

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৩৯৬, ৩৯৭, ত. আল-বাবি আল-হালাবি

**ফাতহে মক্কা (রমজান ৮ হিজরি)**

হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং পূর্ণ চেষ্টা করেন যেন মক্কাবাসীরা এই খবর না পায়। গোপনীয়তার চরম অবস্থা এই ছিল যে, আপনি ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহাকে সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন কিন্তু এটি জানাননি যে সফরটি কোথায়। [১]

হুজুর আকরাম ﷺ চেয়েছিলেন যে, হঠাৎ করে মক্কাবাসীদের মাথার ওপর গিয়ে পৌঁছাতে যাতে তারা মোকাবিলা করতে না পারে এবং এভাবে মক্কার পবিত্র ভূমি কোনো রক্তপাত ছাড়াই তার আসল উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরে আসে। আপনি ﷺ এ বিষয়ে বিশেষ দোয়া করেন এবং বলেন: "হে আল্লাহ! কুরাইশদের কোনো সংবাদবাহক যেন তার কাজ করতে না পারে এবং আমরা যেন হঠাৎ তাদের কাছে পৌঁছে যাই।"

যখন সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো তখন আপনি সাহাবীদের অবহিত করলেন যে আমরা কোন দিকে যেতে চলেছি। [২]

এই সময়ে একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিআল্লাহু আনহু একজন মহিলার মাধ্যমে কুরাইশদের কাছে হুজুর ﷺ-এর সৈন্য অভিযানের সংবাদ সম্বলিত একটি চিরকুট পাঠিয়ে দেন। এটি ছিল একটি গুরুতর ভুল যা অন্য কারো দ্বারা সংঘটিত হলে তার ওপর নিফাকের সন্দেহ করা হতো, কিন্তু হযরত হাতিব রাদিআল্লাহু আনহু একনিষ্ঠ এবং পুরাতন সাহাবী ছিলেন। এই অস্থির আচরণের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, মক্কায় তার পরিবার-পরিজন অসহায় ছিল, সেখানে তাদের সমর্থন করার মতো অন্য কোনো আত্মীয় ছিল না। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, কুরাইশরা মুসলমানদের আক্রমণ করতে দেখে পাছে তার স্ত্রী-সন্তানদের জিম্মি না করে ফেলে। তাই কুরাইশদের প্রতি এই উপকার করে তিনি তার পরিবার-পরিজনের প্রতি তাদের সদাচরণের যোগ্য হতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে অবহিত করে দেন।

আপনি হযরত আলী, হযরত জুবায়ের এবং হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাদিআল্লাহু আনহুমকে সেই মহিলার পেছনে পাঠান। তারা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে মদিনার উপকণ্ঠের "রওজায়ে খাখ" [৩] নামক স্থানে তাকে ধরে ফেলেন এবং হযরত হাতিব রাদিআল্লাহু আনহুর চিরকুটটি উদ্ধার করেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাতিব রাদিআল্লাহু আনহুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি মক্কায় তার পরিবার-পরিজনের অসহায়ত্বের ওজর পেশ করেন এবং বলেন: "মক্কায় আমার পরিবার-পরিজনের কোনো আত্মীয় নেই। আমি চেয়েছিলাম মক্কাবাসীদের ওপর কোনো অনুগ্রহ করতে যাতে তারা আমার আত্মীয়-স্বজনের খেয়াল রাখে।"

হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু এই ওজরকে সন্তোষজনক মনে করেননি এবং রাগান্বিত হয়ে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই!" কিন্তু আপনি ﷺ হযরত হাতিব রাদিআল্লাহু আনহুর পূর্ববর্তী খিদমত বিশেষ করে বদর যুদ্ধে তার...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৫৮৯

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৫২০, দার হিজর

[৩] রওজায়ে খাখ মদিনা থেকে এক মঞ্জিল দূরে জুল হুলাইফার নিকট ওয়াদিয়ে আতিকের সীমানায় অবস্থিত। (ওয়াফাউল ওয়াফা: ৩/২৬; আল-মাআলিমুল আসিরা, পৃ. ১০৭)

অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের ওজর কবুল করে ক্ষমা করে দিলেন এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন: “তুমি কি জানো যে, আল্লাহ আহলে বদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।” [১]

**মক্কার দিকে অভিযান:**

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার জানবাজ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ১০ রমজানুল মুবারক ৮ হিজরিতে মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করলেন। [২] এই সফর ছিল প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে, রমজানের রোজাও ছিল। সফরের গতিও দ্বিগুণ রাখা হয়েছিল। যেহেতু মুসাফিরের জন্য রোজা না রাখার শরয়ী অবকাশ রয়েছে, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা রোজা না রাখেন। তিনি বললেন: “তোমাদের শত্রুর মোকাবিলায় শক্তিশালী থাকো।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সংকল্পের ওপর অটল থেকে রোজা পালনকারী ছিলেন। [৩]

তা সত্ত্বেও কিছু সাহাবী তাঁর পক্ষ থেকে ইফতারের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কষ্টের মধ্যে থাকবেন আর তারা পানাহার করবেন—এটি তারা মেনে নিতে পারছিলেন না। যখন ‘আল-আরজ’ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃষ্ণা বা উত্তাপের কারণে মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্ট দেখে কিছু সাহাবী চাইলেন যে তিনি যেন ইফতার করে নেন। তারা আরজ করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রোজা রেখেছেন, তাই কিছু লোকও রোজা রেখেছে।”

তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখতে থাকলেন, কিন্তু যখন মক্কা ৯০ কিলোমিটার দূরে রইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কদীদ’-এর খেজুর বাগানে যাত্রাবিরতি করলেন এবং সবার সামনে এক পেয়ালা পানি আনিয়ে পান করলেন। এটি দেখে সব মানুষ রোজা রাখা ছেড়ে দিল। [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩০০৭, কিতাবুল জিহাদ, বাবুজ জাসুস; তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ১ থেকে ৩।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/ ৫৩৭।

[৩] ফাতহুল মক্কার সফরে তিনি মানুষকে ইফতারের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: তোমাদের শত্রুর জন্য শক্তিশালী হও, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখলেন, (সুনানে আবু দাউদ, হা: ২৩৬৫, কিতাবুস সাওম, সহীহ সনদে)।

[৪] আবু বকর বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহুল মক্কার সফরে মানুষকে ইফতারের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের শত্রুর জন্য শক্তিশালী হও, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখলেন। আবু বকর বলেন: যিনি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল-আরজ নামক স্থানে তৃষ্ণা বা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ-কে বলা হলো: একদল লোক রোজা রেখেছে যখন আপনি রোজা রেখেছেন। বর্ণনাকারী বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদীদ নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন তিনি একটি পেয়ালা চাইলেন এবং পান করলেন, ফলে মানুষও ইফতার করল। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, বাবু মা জাআ ফিস সিয়ামি ফিস সাফার)।

মালিক বিন আনাস, সুমাই থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল-আরজ নামক স্থানে তৃষ্ণা বা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি। (আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হা: ১৫৭৮)।

নোট: আল-আরজ মদিনা থেকে মক্কা মহাসড়কের তৃতীয় মঞ্জিল যা আর-রাউহা এবং আল-আবওয়ার মাঝখানে অবস্থিত। (আহসানুত তাকাসিম ফী মা’রিফাতিল আকালিম, পৃ: ১০৬; মু’জামু মা ইস্তাজাম মিন আসমাইল বিলাদি ওয়াল মাওয়াজি’ লি-আবি উবাইদ আল-বাকরি আল-আন্দালুসি: ৩/ ৯৩০)। মদিনা থেকে এর দূরত্ব ১১৩ কিলোমিটার। (আল-মাআলিমুল আসীরা ফিস সুন্নাতি ওয়াস সিরাহ লি-মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শারাব, পৃ: ১১৮)। কদীদ মক্কা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে। (আল-মাআলিমুল আসীরা ফিস সুন্নাতি ওয়াস সিরাহ, পৃ: ২৩১)।

মক্কা বিজয়ের সময়কাল: উল্লিখিত সহীহ হাদীসসমূহ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয় প্রচণ্ড গরম মৌসুমের ঘটনা। এটি মাদানী রমজানে হতে পারে না; কারণ ৮ হিজরির রমজান ২২ ডিসেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল অর্থাৎ প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে। নিঃসন্দেহে এটি মক্কী রমজানের সময়কাল ২০ মে থেকে ১৭ জুন ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ, অর্থাৎ হাদীসের সাথে হুবহু মিল রেখে এটি গরমের মৌসুমে হয়েছিল। মাদানী ক্যালেন্ডারে এটি ছিল সফর ৯ হিজরি। অধিকতর পর্যালোচনার জন্য পেছনে গিয়ে দেখে নিন যে, মুতার যুদ্ধ জুমাদাল উলা ৮ হিজরি (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) এ হয়েছিল, এরপর প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে সারিয়্যা যাতুস সালাসিল পাঠানো হয়েছিল যাকে ঐতিহাসিকগণ জুমাদাল আখিরা ৮ হিজরির অভিযানই বলেন, আর নিঃসন্দেহে এটি মক্কী সময়কাল ছিল যখন মাদানী ক্যালেন্ডারে এটি ছিল যিলকদ ৮ হিজরি অর্থাৎ ৮ হিজরির মাদানী রমজান যাতুস সালাসিলের আগেই অতিক্রান্ত হয়েছিল। অতএব ঐতিহাসিকগণ মক্কা বিজয়ে মক্কী ক্যালেন্ডার বর্ণনা করেছেন। এ থেকে এটিও জানা যায় যে, রমজানের রোজা মক্কী ক্যালেন্ডার অনুযায়ীই রাখা হতো, যাতে প্রতি বছর রমজান গরমের মাসগুলোতে (মে-জুন) আসত।

**হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ:**

বাহিনীর চলাচল এতই নিস্তব্ধ ও দ্রুত ছিল যে, কুরাইশরা শেষ পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি এবং মুসলমানরা দুই সপ্তাহের পথ মাত্র এক সপ্তাহে পাড়ি দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-ও আপনার রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে বেখবর ছিলেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মক্কা থেকে ৮২ মাইল দূরে জুহফা নামক স্থানে তিনি মুসলমানদের বিশাল বাহিনীকে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে সফরসঙ্গী করে নিলেন। [১]

**আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিস মুসলমান হলেন:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার নিকটবর্তী "মাররুজ জাহরান" পৌঁছে ছাউনি ফেললেন। তখন কুরাইশদের হুঁশ ফিরল এবং তারা মক্কার প্রবেশপথে এত বড় বাহিনী দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কুরাইশদের গোঁড়া ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন, উভয়ের নামই ছিল "আবু সুফিয়ান"। একজন আবু সুফিয়ান বিন হারব, অন্যজন আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিস।

আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিস বনু হাশিমের বিশিষ্ট সদস্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। শৈশব ও যৌবনের বন্ধু ছিলেন। কবিতায়ও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, কিন্তু তিনি নবুওয়াতের শানে কুরুচিপূর্ণ কবিতা রচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়েছিলেন। তবে এখন তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল। অতীতের জন্য তিনি এতটাই অনুতপ্ত হলেন যে, তাঁর মন ভরে এল এবং তিনি নিজের এক অল্পবয়সী সন্তানকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। আপনি তাঁর আগমনের খবর পেলেন তখন তাঁর দেওয়া আঘাতগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, আপনি বললেন: "আমি দেখা করতে চাই না।"

তিনি যখন এটি জানতে পারলেন, তখন ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন: "আল্লাহর কসম! যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখা করার অনুমতি না দেন, তবে আমি আমার ছোট সন্তানের হাত ধরে কোনো মরুভূমিতে চলে যাব এবং আমরা সেখানেই না খেয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যাব।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই কথা জানানো হলে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন, তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং ইসলামে দীক্ষিত করলেন। আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিস (রা.) এখন তাঁর অতীতের ভুলত্রুটিগুলোর ক্ষতিপূরণ করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। [২]

**আবু সুফিয়ান বিন হারবের ইসলাম গ্রহণ:**

এদিকে আবু সুফিয়ান বিন হারব, যিনি কুরাইশদের সবচেয়ে সাহসী ও নামকরা সর্দার ছিলেন, দুই সঙ্গীকে নিয়ে ইসলামী বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে মুসলমানরা তাঁদের তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, মক্কাবাসীরা দূর থেকে শত শত আলোর ঝলকানি দেখে অভিভূত হচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বিন হারবও এই দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন: "এমন বাহিনী এবং এমন আলো আমি সারাজীবনে দেখিনি।" রাতের নিস্তব্ধতায় তাঁর উচ্চকণ্ঠ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

হযরত আব্বাস (রা.), যিনি এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নিজের খচ্চরের পিঠে চড়ে কাছেই টহল দিচ্ছিলেন। তিনি...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫২৭/৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৩২/৬, দার হিজর

অন্ধকারে কণ্ঠস্বর চিনে নিলেন এবং বললেন: “আরে আল্লাহর বান্দা! রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ হাজার মুসলমানের সাথে এসে গেছেন। আজ তোমাদের তাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই।” আবু সুফিয়ান বললেন: “বাঁচার কোনো পথ আছে?”

হযরত আব্বাস رضی اللہ عنہ জানতেন যে, যদি কোনো মুসলমান আবু সুফিয়ানকে দেখে ফেলে তবে তার বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানকে নিজের খচ্চরের পিঠে বসিয়ে নিলেন এবং দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে লশকর বা বাহিনীর বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে সরাসরি হুজুর ﷺ-এর খিদমতে পৌঁছে গেলেন। এদিকে হযরত উমর ফারুক رضی اللہ عنہ-ও পেছনে ছুটে এলেন এবং অনুমতি চাইতে লাগলেন যেন শত্রুদের সরদারের শিরশ্ছেদ করা হয়। কিন্তু হুজুর আকরাম ﷺ আবু সুফিয়ানের মতো শত্রুকেও সফল দেখতে চেয়েছিলেন।

হুজুর ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন:

“আবু সুফিয়ান! এখনো কি সেই সময় আসেনি যে তুমি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?”

আবু সুফিয়ান এই আচরণ দেখে বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন: “আমার মা-বাবা আপনার ওপর কুরবান হোক, আপনি কতই না দয়ালু, কতই না উদার এবং কতই না মুরুওয়াত সম্পন্ন। আল্লাহর কসম! আমি বুঝে গেছি যে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ থাকত তবে আজ অবশ্যই আমার কাজে আসত।”

যেন আবু সুফিয়ান তাওহীদের বিষয়টি বুঝে গিয়েছিলেন, হুজুর আকরাম ﷺ চাইলেন যে এখন তিনি নিজের মুখে কালিমা শাহাদাত পাঠ করুন এবং তাওহীদ ও রিসালাত উভয়েরই স্বীকৃতি দিন। তাই বললেন:

“আর এখনো কি এই কথার সময় আসেনি যে তুমি মেনে নাও যে আমি আল্লাহর রাসূল?”

আবু সুফিয়ান বললেন: “নিঃসন্দেহে আপনি রহীম ও করীম, কিন্তু এই বিষয়ে এখনো আমার কিছুটা দ্বিধা আছে।”

হযরত আব্বাস رضی اللہ عنہ পাশে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন। তিনি জানতেন যে আবু সুফিয়ানের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কেবল এক রাজকীয় অহংকার তাকে আল্লাহর গোলামি এবং রিসালাতের দরবারে আনুগত্য থেকে বিরত রাখছে। তিনি তৎক্ষণাৎ এই শয়তানি কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য বললেন: “আল্লাহর বান্দা! তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আগেই ইসলাম কবুল করে নাও।” এই কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হলো। আবু সুফিয়ান সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ইসলাম গ্রহণ করলেন। [১]

এই সুযোগে হযরত আব্বাস رضی اللہ عنہ হুজুর ﷺ-এর কাছে আবু সুফিয়ান বিন হারব رضی اللہ عنہ-কে কোনো সম্মান প্রদানের সুপারিশ করলেন। আনহযরত ﷺ বললেন: “কেন নয়! যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ, যে হারাম শরীফে আশ্রয় নেবে সে-ও নিরাপদ এবং যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে নেবে সে-ও নিরাপদ।”

রহমতে আলম ﷺ এই প্রস্তাব এজন্য দিয়েছিলেন যাতে মক্কাবাসীরা নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়ে লড়াই করার চেষ্টা না করে; কারণ কখনো কখনো ভয়ও মানুষকে আক্রমণে বাধ্য করে। আপনি ﷺ সবার জন্য শান্তির বাস্তব পথ তৈরি করে এই ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে মুসলমানরা কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়েই মক্কায় প্রবেশ করতে পারে এবং পবিত্র ভূমি রক্তপাত থেকে মুক্ত থাকে। [২]

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৪/৪০২, ৪০৩

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৪/৪০৩

## ইসলামের বাহিনীর দৃশ্য

১৭ রমজান ৮ হিজরি (৭ জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) যখন ইসলামী বাহিনী মক্কায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা.)-কে নিয়ে বাহিনীর পথের একটি পাহাড়ের গিরিপথে দাঁড়িয়ে গেলেন যাতে তিনি তাকে পুরো বাহিনীর দৃশ্য দেখাতে পারেন।

কিছুক্ষণ পর ইসলামী বাহিনীর বিভিন্ন দল নিজ নিজ গোত্রের পতাকাসহ তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে লাগল।

আবু সুফিয়ান (রা.) প্রতিটি দল দেখে জিজ্ঞাসা করতেন: “এটি কোন দল?”

হযরত আব্বাস (রা.) গোত্রের নাম বললে আবু সুফিয়ান (রা.) বলতেন: “তাদের সাথে আমার কী কাজ?”

সবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসারদের লৌহবর্ম পরিহিত বাহিনীর সাথে উপস্থিত হলেন।

হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ান (রা.)-কে জানালে তিনি বললেন:

“তাদের মোকাবিলা করার সাধ্য কার আছে? আব্বাস! তোমার ভাতিজা তো অনেক বড় বাদশাহ হয়ে গেছে।”

হযরত আব্বাস (রা.) বললেন: “হে আল্লাহর বান্দা! এটি রাজত্ব নয়, এটি নবুওয়াত।”

আবু সুফিয়ান (রা.) এরপর দ্রুত মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছালেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, যে ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করবে অথবা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে অথবা হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে। মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করতে দেরি করেনি, তবে সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং কিছু লোক মক্কায় প্রবেশকারী সেই দলের সাথে নিজ উদ্যোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলে যা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে ছিল। হযরত খালিদ (রা.) পাল্টা আক্রমণ করলে কয়েকজন নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। এই সংঘর্ষ ছাড়া শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। [১]

## মক্কায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ করলেন, তখন অতীতের প্রতিটি দৃশ্য তাঁর সামনে ভেসে উঠছিল। এটিই সেই ভূমি যেখানে তিনি ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন, বেড়ে উঠেছেন, সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে যৌবন কাটিয়েছেন, তারপর নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার পর সেই দায়িত্ব পালনের জন্য দাঁড়িয়েছেন এবং পুরো শহরের শত্রুতা কুড়িয়েছেন। কুরাইশদের প্রতিটি জুলুম ও নির্যাতন তাঁর মনে ছিল, যার চরম পর্যায় ছিল এই যে, তাঁকে তাঁর অনুসারীদের সাথে দেশত্যাগে বাধ্য হতে হয়েছিল। আজ সেই শহরই তাঁর সামনে মাথা নত করে ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এত বড় বিজয় সত্ত্বেও দুনিয়ার অন্য কোনো বিজয়ীর মতো অহংকার বা গর্বের অবস্থায় ছিলেন না। তিনি আল্লাহর দরবারে বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ছিলেন, কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে তাঁর পবিত্র মস্তক সওয়ারির পিঠের সাথে লেগে যাচ্ছিল।

রহমতে আলম ﷺ সরাসরি হারামে উপস্থিত হলেন এবং সওয়ারির ওপর থেকেই তা তাওয়াফ করলেন। তাঁর পবিত্র হাতে একটি লাঠি ছিল, তাওয়াফ চলাকালীন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার চত্বরে স্থাপিত মূর্তিগুলোর দিকে লাঠি দিয়ে ইশারা করতে থাকলেন এবং মূর্তিগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

এই সময়ে আপনার ﷺ পবিত্র জবানে এই আয়াতগুলো ছিল:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

“সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।” [১]

এরপর কাবার চাবি রক্ষক উসমান বিন তালহা (রা.)-এর কাছ থেকে চাবি নিয়ে কাবার দরজা খোলালেন। ভেতরে দেয়ালগুলোতে মুশরিকদের তৈরি করা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং ফেরেশতাদের ছবি দেখা গেল। আপনার নির্দেশে সাহাবীগণ ছবিগুলো মুছে ফেললেন। রহমতে আলম ﷺ কাবার ভেতরে সালাত আদায় করলেন। কুরাইশ বংশের লোকেরা কাবার প্রাঙ্গণে সমবেত ছিল। রহমতে আলম ﷺ কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন:

“আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। আজ জাহেলিয়াত যুগের প্রতিটি অহংকার এবং রক্তপাত আমার পায়ের নিচে। হে কুরাইশরা! আল্লাহ তোমাদের জাহেলিয়াত ভিত্তিক গর্ব ও অহংকার ভেঙে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে তৈরি হয়েছিলেন।”

সংক্ষিপ্ত খুতবার পর আপনি ﷺ কুরাইশ নেতাদের কাছে জানতে চাইলেন: “বলো, আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব?” কুরাইশ নেতারা তাদের প্রতিটি অপরাধের কথা মনে রেখেছিল কিন্তু তারা আপনার ﷺ কাছে দয়ার আশা করতে পারত, তারা অনুনয়ের সুরে বলল: “উত্তম আচরণ করুন। আপনি একজন দয়ালু ভাই এবং দয়ালু ভাইয়ের সন্তান।” রহমতে আলম ﷺ অত্যন্ত উদারতার সাথে বললেন: “যাও! তোমরা সবাই মুক্ত।” [২]

প্রাণ হরণকারীরা প্রাণ উৎসর্গকারী হয়ে গেল:

কুরাইশদের উদ্যমী যুবকদের মধ্যে তখনও এমন কিছু লোক ছিল যাদের ইসলাম গ্রহণে দ্বিধা ছিল, কিন্তু সত্য থেকে কতক্ষণ চোখ ফিরিয়ে রাখা যায়। আবার রাসূল ﷺ-এর অত্যধিক উদার আচরণও তাদের সামনে ছিল, তাই বেশি দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই প্রায় সবাই ঈমান নিয়ে এল।

তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফযালা বিন উমাইর, যিনি নবী করীম ﷺ-এর ওপর প্রাণঘাতী হামলার নিয়তে বের হয়েছিলেন। আপনি ﷺ তখন কাবার তাওয়াফ করছিলেন। তিনি কাছে পৌঁছাতেই নবী করীম ﷺ নিজেই তাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন: “ফযালা তো?” তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন: “জি হ্যাঁ।” রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চাইলেন: “মনে মনে কী ভেবে এসেছ?” তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন: “জি কিছু না।”

---

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৪০৯, ৪১২

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এবং বললেন: “আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।”

এই কথা বলে অত্যন্ত মমতার সাথে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর স্পন্দিত হৃদয় শান্ত হয়ে গেল। সেই সাথে মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা এত তীব্রভাবে হৃদয়ে গেঁথে গেল যে, তাঁর চেয়ে প্রিয় আর কেউ রইল না। [১]

তাঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ান বিন হারব (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাও ছিলেন, যিনি শুরুতে তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর সাথে কঠোর ঝগড়া করেছিলেন, কিন্তু রাতে যখন হারামে ইবাদতকারী মুসলমানদের কান্নাকাটি ও আহাজারি শুনলেন, তখন তাঁর হৃদয় সাক্ষ্য দিল যে, এই লোকেরা সত্যিই প্রকৃত মাবুদের ইবাদত করছে, ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তাঁদের মধ্যে সাফওয়ান বিন উমাইয়াও ছিলেন, যিনি মক্কায় মুসলমানদের বিজয়ী প্রবেশের সময় সশস্ত্র প্রতিরোধ করেছিলেন এবং এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর দুঃখ, ঘৃণা ও রাগে আত্মহারা হয়ে জেদ্দা বন্দরের দিকে রওনা হয়েছিলেন। তাঁর পুরনো বন্ধু উমাইর বিন ওয়াহাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে তাঁর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা (আমান) লাভ করেন এবং তাঁর পিছু নেন।

সাফওয়ান কোনো জাহাজ বা নৌকায় ওঠার আগেই উমাইর বিন ওয়াহাব (রা.) তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন এবং বললেন:

“আমার প্রিয় বন্ধু! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তোমার জন্য নিরাপত্তার সুসংবাদ হোক, এখন নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।”

সাফওয়ান আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন: “আমার নিহত হওয়ার ভয় হচ্ছে।”

হযরত উমাইর (রা.) বললেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার ভাবনার চেয়েও অনেক বেশি মহান এবং দয়ালু।”

সংক্ষেপে, উমাইর বিন ওয়াহাব (রা.) সাফওয়ানকে ফিরিয়ে আনতে সফল হলেন। সাফওয়ান যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হলেন, তখন ইসলাম গ্রহণের আগে চিন্তা-ভাবনার জন্য দুই মাসের অবকাশ চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চার মাসের অবকাশ দিলেন। সাফওয়ান চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলেন এবং অবশেষে গাযওয়ায়ে হুনাইনের পর ঈমান আনলেন। [২]

ইকরিমা বিন আবি জাহল ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু নৌকা ঝড়ের কবলে পড়ল। সবার মুখ থেকে বের হলো: কেবল আল্লাহকে ডাকো, অন্য মাবুদরা এখানে কোনো কাজে আসে না। ইকরিমা সংকল্প করলেন যে, যদি প্রাণ বেঁচে যায় তবে ইসলাম গ্রহণ করব। অবশেষে নৌকা ইয়েমেনের উপকূলে গিয়ে ভিড়ল। এই সময়ের মধ্যে ইকরিমার স্ত্রী উম্মে হাকিম (রা.), যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পিছু পিছু ইয়েমেনে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করে ফিরিয়ে আনলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ইকরিমা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে একজন জানবাজ মুজাহিদ হিসেবে প্রমাণিত হলেন। [৩]

বার্তাটি স্পষ্ট:

আল্লাহর ঘর শিরকের চিহ্ন থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল, হারাম তাওহীদের কেন্দ্র হওয়ার মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। কুরাইশদের বড় বড় সর্দার এবং ইসলামের বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৫৮৪, দার হিজর

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৫৮৭

[৩] মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল মুশরিক; মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৫০৫৬

গ্রহণ করছিলেন। হুজুর ﷺ এখন নিজের জন্মভূমি মক্কাবাসীদেরও সরদার ছিলেন। এমতাবস্থায় যদি এই ধারণা করা হতো যে, হুজুর আকদাস ﷺ এখন মক্কা মুকাররমাহতেই অবস্থান করবেন এবং একেই ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করবেন, তবে তা কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় হতো না। আনসারদের কিছু লোক এই কথাই বলছিলেন; কারণ তাদের মনে অনবরত এই ভয় কাজ করছিল।

হুজুর ﷺ সাফা পাহাড়ে দোয়ায় মগ্ন ছিলেন এবং আনসারদের দৃষ্টি আপনার ﷺ ওপর নিবদ্ধ ছিল যে, দেখা যাক আপনি এই বিষয়ে কী ফয়সালা করেন। হুজুর ﷺ ওহীর মাধ্যমে তাদের এই আশঙ্কার খবর পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই দোয়া থেকে অবসর হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কী বলছিলে?” তারা বললেন: “কিছু না, ইয়া রাসূলাল্লাহ!”

কিন্তু আপনি ﷺ যখন পীড়াপীড়ি করলেন, তখন তারা কম্পিত হৃদয়ে নিজেদের উদ্বেগের কথা আপনাকে জানিয়ে দিলেন। আপনি ﷺ আপনার এই উৎসর্গিত প্রাণ সাথীদের মনোবল কীভাবে ভাঙতে পারতেন, হুজুর আকরাম ﷺ ভালোবাসার উষ্ণতার সাথে বললেন:

“আল্লাহর পানাহ, এমন হতে পারে না... আল-মাহইয়া মাহইয়াকুম ওয়াল-মামাতু মামাতুকুম... বাঁচা-মরা তোমাদের সাথেই।” [১]

মক্কা বিজয়ের পরপরই হুজুর ﷺ আশেপাশের এলাকা জয় করা এবং শিরকের প্রাচীন কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করার দিকে মনোযোগ দিলেন। আপনার ﷺ নির্দেশে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ‘নাখলা’ নামক স্থানে অবস্থিত ‘উযযা’র মূর্তিশালাটি ধূলিসাৎ করে আসলেন। [২]

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৬২২, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফাতহি মক্কা, ত: দারুল জীল; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৪৭৬০; সীরাতে ইবনে হিশাম: ৪১৬/২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৬০৭/৬; আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৩৩২/২, ৮ হিজরীর অধীনে।

https://t.me/BoierSomahar

## গাযওয়ায়ে হুনাইন

মক্কা বিজয়ের খবর মুহূর্তের মধ্যে পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়ল। ইসলাম এখন আরব উপদ্বীপে একটি অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তবে কুফর ও শিরকের তূণে তখনও কিছু তীর বাকি ছিল। তায়েফের নিকটবর্তী জনপদ 'হাওয়াযিন'-এর লোকেরা, যারা বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল, মক্কার বিজয়ী বাহিনীর সাথে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হাওয়াযিন গোত্রের প্রধান আউফ বিন মালিক নিজের গোত্রের সাথে বনু সাকিফ, বনু সাদ, নাসর এবং জুশাম গোত্রের যোদ্ধাদেরও ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোয়াজ্জামায় আঠারো দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে বনু হাওয়াযিন এবং তাদের মিত্রদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর আসতে শুরু করে। আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ বিন হাদরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের গোয়েন্দাগিরির জন্য যান এবং তিনি ফিরে এসে শত্রুদের সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ প্রস্তুতির যে চাক্ষুষ বিবরণ দেন তা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মদীনার বিজয়ী বাহিনী যদি এই অভিযান এড়িয়ে যেত, তবে তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যেত। তাই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। আপনি সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে এই বলে একশ (১০০) বর্ম ধার নেন যে, সেগুলো পূর্ণ দায়িত্বের সাথে ফেরত দেওয়া হবে। [১]

৫ শাওয়াল ৮ হিজরিতে বারো হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মক্কা মোকাররমা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রওনা হয়। [২] দশ হাজার সৈন্য তারাই ছিল যারা মক্কা বিজয়ের সময় আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিল, [৩] আর দুই হাজার ছিল তারা যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। [৪]

বাহিনীটি অসাধারণ শান-শওকতের সাথে এগিয়ে যেতে থাকে। মুসলমানদের প্রত্যাশা ছিল যে, শত্রু তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পিছু হটবে এবং যদি সংঘর্ষ হয়ও তবে কোনো অসুবিধা ছাড়াই বিজয় অর্জিত হবে। এই ধারণা অমূলক ছিল না, কারণ বহু বছর ধরে মুসলমানরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও কয়েক গুণ বড় বাহিনীকে পরাজিত করে আসছিল, অথচ আজ তারা নিজেরাই আরবের সবচেয়ে বড় বাহিনী ছিল। বিকেলের দিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রাবিরতির নির্দেশ দেন এবং জোহরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এই সময়ে সংবাদবাহক খবর নিয়ে আসে যে, প্রতিপক্ষ বাহিনী তাদের গবাদি পশুর পালসহ হুনাইনের পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান করছে এবং মোরচাবন্দি করছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি শুনে হাসলেন এবং বললেন: "এসবই আগামীকাল মুসলমানদের গনিমত হবে।"

শত্রু খুব বেশি দূরে ছিল না, তাই আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত জাগার আগে গিরিপথগুলোতে অশ্বারোহী সৈন্যদের কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করেন যাতে হাওয়াযিনের অতর্কিত আক্রমণকারীরা রাতের অন্ধকারে হামলা করতে না পারে। [৫] এটি ১৩ শাওয়ালের ঘটনা। [৬]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/ ১০, ১১, দার হিজর

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/ ১৩

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৩৩৭, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতিত তায়েফ

[৪] জাওয়ামিউস সিরাতিন নববীয়্যাহ লি-ইবনে হাযম, পৃ. ১৮৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ... মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী এই লোকদের 'তুলাকা' বলা হতো।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/ ১৩, ১৪

[৬] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/ ১৫১... এটি ১৩ শাওয়াল ৮ হিজরি মোতাবেক ৩০ জুন ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ ছিল।

পরের দিন (৩ শাওয়াল) শত্রুর সাথে মুখোমুখি দেখা হলো। হাওয়াজিন গোত্রের শত শত তীরন্দাজ এই পাহাড়ী অঞ্চলের গিরিপথ ও গুহাগুলোতে ওত পেতে বসে ছিল। মুসলমানরা যখনই তাদের নাগালের মধ্যে এলো, তারা তাদের ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল। মুসলমানরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, ফলে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। এই সময়ে হাওয়াজিন গোত্রের অশ্বারোহীরাও আক্রমণ করে বসল এবং ইসলামী বাহিনীর ওপর চাপের সৃষ্টি করল। এই কঠিন সময়ে হযরত আলী বিন আবি তালিব, হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস, হযরত ফজল বিন আব্বাস, হযরত উসামা বিন যায়েদ এবং তাঁর ভাই হযরত আয়মান বিন উবাইদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন এই পরিস্থিতি দেখলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে মুসলমানদের থামানোর চেষ্টা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছিলেন: “হে লোকসকল! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এদিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল।”

এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং নিজের খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস (রা.) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে সাথে সাথে দৌড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে তখন এই কথাগুলো ছিল:

আনা আন-নাবিয়্যু লা কাযিব, আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব

“আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।” [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা.) আনসারদের ডাকলেন: “হে আনসারগণ! হে বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীরা!” তিনি অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, তাঁর ডাক অনেক দূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হলো এবং জবাবে মুসলমানরা ‘লাব্বাইক, লাব্বাইক’ বলতে বলতে ফিরে আসতে শুরু করল। যার সওয়ারি ঘুরতে দেরি করছিল, সে সওয়ারি থেকে লাফিয়ে পড়ে পায়ে হেঁটে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে দৌড়াতে লাগল। যখনই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারপাশে প্রায় ১০০ জন লোক একত্রিত হলো, তিনি তাদের নিয়ে শত্রুর ওপর পাল্টা আক্রমণ করলেন।

মুসলিম ও কাফেররা একে অপরের সাথে মিশে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বললেন: “এখন চুলা উত্তপ্ত হয়েছে (অর্থাৎ যুদ্ধ পূর্ণ গতি লাভ করেছে)।” বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি যে হাওয়াজিনদের সাহস দমে গেল। তাদের মধ্যে অনেকে নিহত হলো এবং অনেকে পালিয়ে গেল। তাদের নেতা মালিক বিন আউফও পালিয়ে গেল। পলায়নকারীদের উট ও ছাগলের পাল মুসলমানদের গনিমতের মাল হিসেবে হস্তগত হলো। [২]

## তায়েফ অবরোধ

হাওয়াজিন ও তাদের মিত্ররা যদিও ময়দানে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু এই যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় তখনও বাকি ছিল। হাওয়াজিনদের সর্দার মালিক বিন আউফ তার অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে পিছু হটে ‘তায়েফ’-এর প্রাচীরের ভেতরে অবস্থান নিল। পুরো আরবে এটি ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ এবং পাহাড়ের ওপর অবস্থিত হওয়ার কারণে এর ওপর আক্রমণ করা বেশ কঠিন ছিল; কারণ আক্রমণকারীরা প্রাচীরের তীরন্দাজদের নাগালের মধ্যে থাকত, অথচ তাদের নিজেদের তীর প্রাচীরের ওপর অবস্থানকারীদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না।

---

[১] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৩১, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কাওলিল্লাহি: ওয়া ইয়াওমা হুনাইনিন ইয আজাবাতকুম।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৮৭-৩০০, দারু হিজর; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫/৩১৮।

**তারিখে উম্মতে মুসলিমা**

রাসূলুল্লাহ এই যুদ্ধের প্রতিকূলতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই তিনি হুনাইন যুদ্ধের আগেই উরওয়াহ বিন মাসউদ এবং অন্য কিছু সাহাবীকে মিনজানিক ও দাব্বাবার মতো অবরোধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে এবং এই সরঞ্জাম তৈরির কৌশল শেখার জন্য 'জুরাশ' পাঠিয়েছিলেন। তারা তখনও এই বিদ্যা শিখে ফিরে আসেননি। যাই হোক, শত্রুকে বেশি সময় দেওয়া সমীচীন ছিল না, তাই তায়েফের দিকে যাত্রা করা হলো। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে শিবির স্থাপন করা হলো এবং সাহাবায়ে কেরাম প্রাচীর অবরোধ করলেন। [১]

নবী আকরাম রক্তপাত কমানোর জন্য ঘোষণা করেছিলেন যে, শহরবাসীদের মধ্য থেকে যে গোলামই বাইরে আসবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং সে স্বাধীন হবে। এই ঘোষণার পর তায়েফের কিছু গোলাম পালিয়ে ইসলামী লস্করে চলে আসে। তাদের মধ্যে নুফাই বিন মাসরুহ নামক এক গোলাম একটি চরকির সাহায্যে দড়ি বেয়ে নিচে নামতে সক্ষম হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। যেহেতু আরবিতে চরকিকে 'বাকরা' বলা হয়, তাই তিনি 'আবু বাকরা' কুনিয়াত (উপনাম) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নবী আকরাম তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। [২]

যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিল। তায়েফের তীরন্দাজরা অনবরত তীর নিক্ষেপ করে মুসলমানদের বেশি সামনে এগোতে দিচ্ছিল না। অনেক মুজাহিদ আহত ও শহীদ হলেন। মুসলমানরা তাদের তাবু শহর থেকে দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। তায়েফের অবরোধ প্রায় তিন সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। [৩] এই সময়ে উরওয়াহ বিন মাসউদ জুরাশ থেকে একটি মিনজানিক ও একটি দাব্বাবা নিয়ে ফিরে আসেন। শহরের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো। ইসলামী ইতিহাসে এটিই ছিল ভারী অস্ত্রের প্রথম ব্যবহার। সেই সাথে মুজাহিদিনরা দাব্বাবার সাহায্যে প্রাচীরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তায়েফের যোদ্ধারা দাব্বাবাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে মুজাহিদদের আবারও পিছু হটতে বাধ্য করে। [৪]

রাসূলুল্লাহ শত্রুর কঠোর প্রতিরোধ দেখে সাহাবায়ে কেরামকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন, কিন্তু শুরুতে তারা বিজয় ছাড়া ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তবে যখন জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ আবারও বললেন: "ইনশাআল্লাহ আগামীকাল ফিরে যাওয়া হবে।" সবাই সানন্দে তা সমর্থন করলেন; কারণ তারা নিজেরাও অবরোধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। [৫]

**দুধবোন শায়মা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ:**

এই অভিযানের ময়দান ছিল সেই এলাকা যেখানে রাসূলুল্লাহ তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন। দাই হালিমা (রা.)-এর গোত্র 'বানু সাদ'ও এই যুদ্ধে হাওয়াযিনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছিল এবং এখন তাদের নারী-পুরুষরা বন্দী হয়ে গিয়েছিল।

---

[১] জাওয়ামিউস সিরাহ লি-ইবনে হাযম, পৃ: ১৯৩।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৫/৭।

[৩] এক বর্ণনা অনুযায়ী অবরোধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৫৮, ১৫৯)।

[৪] জাওয়ামিউস সিরাহ লি-ইবনে হাযম, পৃ: ১৯৩।

[৫] সহীহ মুসলিম, হা: ১৭৭৩, কিতাবুল জিহাদ, বাব গাযওয়াতুত তায়েফ।

যাদের মধ্যে হালিমা সাদিয়া (রা.)-এর কন্যা শায়মাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন তিনি মুসলমানদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধবোন, তখন কেউ বিশ্বাস করল না। অবশেষে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনা হলো। শায়মার বয়স তখন প্রায় ৭০ বছরের কাছাকাছি ছিল, তিনি পুনরায় সেই মুহাম্মদ ﷺ-কে দেখছিলেন যাকে তিনি নিজের কোলে নিয়ে খেলাধুলা করতেন। মাঝখানে ষাট বছরেরও বেশি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো তিনিই ছিলেন। সবার থেকে আলাদা, সব থেকে বিশিষ্ট। শায়মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসে আরজ করলেন:

“হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার দুধবোন।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “এর কি কোনো চিহ্ন আছে?”

তিনি বলতে লাগলেন: “এই চিহ্ন কি যথেষ্ট নয় যে আমি আপনাকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম এবং আপনি আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলেন? তার চিহ্ন এখনো বিদ্যমান আছে।” রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসাধারণ স্মৃতির কারণে শৈশবের সেই কথা মনে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্মানে নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে দিলেন এবং তাঁকে কাছে বসালেন ও বললেন: “আপনি চাইলে আমার সাথেই থাকতে পারেন।”

তিনি নিজের কওমের সাথে ফিরে যাওয়া পছন্দ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে একজন গোলাম এবং একজন বাঁদি উপহার হিসেবে দিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিদায় জানালেন। [১]

## হালিমা সাদিয়া (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর সম্মান:

তায়েফ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘জি’রানা’ নামক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে বনু হাওয়াযিনের একটি প্রতিনিধি দল আপনার খেদমতে হাজির হলো। এই সময়ে একজন বৃদ্ধা গ্রাম্য মহিলাকে আসতে দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে দিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত আদবের সাথে বসিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলেন।

সাহাবীগণ এই সম্মান প্রদর্শন দেখে জিজ্ঞেস করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এই সম্মানিত মহিলা কে?”

তিনি বললেন: “ইনি আমার দুধমা (হালিমা সাদিয়া)।” [২]

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/৪৮৮; আর-রওযুল উনুফ: ৭/৩০৪, ৩০৫।

[২] আল-ইসাবাহ: ৮/৭৮, ৮৯; আল-ইসতিয়াব: ৪/১৮১৩।

ধারণা করা হয় হযরত হালিমা সাদিয়া (রা.)-এর বয়স তখন ৮৫ বছরের কাছাকাছি ছিল। তাঁকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর থেকে বর্ণিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত আব্দুল্লাহ বিন জাফরের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম এবং দুধপানের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এই রেওয়ায়েত হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহে অত্যন্ত মূল্যবান। আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে, ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ-তে এবং ইবনে ইসহাক তাঁর সীরাতে এটি উদ্ধৃত করেছেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হালিমা সাদিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হযরত খাদিজা (রা.)-এর বিয়ের পর একবার এসেছিলেন এবং নিজের এলাকায় অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত খাদিজা (রা.)-কে বললেন, ফলে তিনি তাঁকে চল্লিশটি বকরি এবং একটি উট দান করেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, রেওয়ায়েত ইবনুল জাওযী: ১/৩৮৩)।

কিছু রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত হালিমা সাদিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, হালিমা সাদিয়া (রা.) তাঁর স্বামী হারিসের সাথে (যাঁকে আবু কাবশা এবং যুদ-দুয়াইবও বলা হতো) মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন: “আমার এই পুত্র এমন কথা বলে যে, যতক্ষণ না আমি তা দেখে নিচ্ছি ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করব না।” (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, রেওয়ায়েত ইবনুল জাওযী: ১/৩৮৩)। রেওয়ায়েত অনুযায়ী হারিসের সাথে হযরত হালিমাও এসেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, রেওয়ায়েত ইবনুল জাওযী: ১/৩৮৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য দুধভাই-বোনও এই সময়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গোপন রাখতেন। শায়মার “হে আল্লাহর রাসূল” শব্দটিও একথাই প্রকাশ করে যে তিনি আগে থেকেই মুসলমান ছিলেন, এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।

**বনু হাওয়াজিনের বন্দীদের মুক্তি:**

বনু হাওয়াজিনের প্রতিনিধি দল যখন উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করল, তখন তারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল। তাদের ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী ছিল, যাদের মধ্যে নারী ও শিশুও ছিল, যারা মুসলমানদের অধীনে ছিল। প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য আবু বুরকান, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ-চাচা ছিলেন, তিনি অনুরোধ করলেন যেন তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই লোকদের ইসলাম গ্রহণ এবং নিজের দুধ-সম্পর্কের খাতিরে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। [১]

গনিমতের মালের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ভেড়া ও ছাগল, যা মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। আপনি ﷺ এর মধ্য থেকে একটি বড় অংশ সেই লোকদের দিয়েছিলেন যারা ইসলামের প্রতি আগ্রহী হচ্ছিল কিন্তু তখনও কালিমা পড়েনি। তাদের 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' বলা হতো, অর্থাৎ সেই লোক যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য ছিল। [২]

**গজওয়ায়ে হুনাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা:**

গজওয়ায়ে হুনাইনের সবচেয়ে শিক্ষণীয় দিক, যার প্রতি কুরআন মাজিদে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তা হলো মুসলমানদের যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কখনও এবং কোনো অবস্থাতেই নিজেদের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রের ওপর গর্বিত হওয়া উচিত নয়। বরং আসল ভরসা ও বিশ্বাস কেবল আল্লাহ তায়ালার ওপর রাখা উচিত, দোয়া ও তাওয়াক্কুলের প্রতি সর্বদা গুরুত্ব দেওয়া উচিত; কারণ আল্লাহর হুকুম না হলে বড় থেকে বড় সৈন্যবাহিনী এবং অধিক থেকে অধিকতর অস্ত্র সংগ্রহ করেও বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়।

**আবু মাহজুরার ইসলাম গ্রহণ:**

হুনাইন থেকে ফেরার পথে ওয়াদিয়ে জিরানায় যাত্রাবিরতি করা হলো। এই সময়ে আজান দেওয়া হলো, তখন লম্বা চুলওয়ালা এক স্থানীয় যুবক আবু মাহজুরা উপহাস করে আজানের অনুকরণ করতে শুরু করল। তার কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ ও সুমধুর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কানে যখন এই আওয়াজ পৌঁছাল, তখন তিনি যুবকটিকে ডেকে পাঠালেন। ধমক দেওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত স্নেহের সাথে তার চুলের ওপর হাত বুলিয়ে তাকে পুনরায় আজান দেওয়ার তালকিন (শিক্ষা) দিলেন। আবু মাহজুরার ওপর এর এমন প্রভাব পড়ল যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মসজিদে হারামের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করলেন। [৩] তিনি সারাজীবন সেই চুল কাটেননি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাত স্পর্শ করেছিল। [৪]

**মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন:**

মক্কায় পৌঁছে ওমরাহ আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিলম্বে মদিনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ২৩ জিলকদ মক্কা ও হুনাইন বিজয়ী লস্কর মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করল। এই দীর্ঘ অভিযানে দুই মাস ষোল দিন ব্যয় হয়েছিল। আপনার ﷺ অনুপস্থিতিতে মদিনার আমির ছিলেন হযরত আবু রুহম কুলসুম বিন হুসাইন আনসারী (রা.)। [৫]

---

[১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৫/৩৯০, ৩৯৩

[২] জাওয়ামিউস সিরাহ, পৃ. ১৯১, ১৯২, ১৯৩

[৩] সুনানে নাসায়ি, হা: ৬৩২, বাবু কাইফাল আজান; আল-ইসাবাহ: ৭/৩০২, ৩০৩

[৪] মারিফাতুস সাহাবাহ লি আবি নুয়াইম: ৩/১২১১

[৫] জাওয়ামিউস সিরাহ: পৃ. ১৯১, ১৯২, ১৯৩

## আত্তাব বিন আসীদের নেতৃত্বে হজ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার একজন কুরাইশ যুবক আত্তাব বিন আসীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কা ও এর আশপাশের অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর, তবে তিনি ছিলেন একজন ইবাদতকারী ও পরহেযগার যুবক।

মক্কা বিজয়ের তিন মাস পর তাঁরই নেতৃত্বে হজ আদায় করা হয় [১], যা যথারীতি যিলহজ মাসে ছিল। মুশরিকদের হজে বাধা দেওয়া হয়নি, কারণ ইসলামের মেজাজ হলো পর্যায়ক্রমিক সংস্কার। ফলে মুশরিকরা তাদের সমস্ত রীতি-নীতি অনুযায়ী যথারীতি এতে অংশগ্রহণ করেছিল। [২]

---

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৪৬৬

[২] সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের একটি মুরসাল বর্ণনা অনুযায়ী, এই বছর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমীরুল হজ বানানো হয়েছিল। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৯৭৩১)

কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর এর সমালোচনা করেছেন: “আর এই প্রসঙ্গের বর্ণনায় এক প্রকার অস্বাভাবিকতা রয়েছে এই দিক থেকে যে, ওমরায়ে জি’রানার বছর হজের আমীর ছিলেন আত্তাব বিন আসীদ, আবু বকর নন; তিনি কেবল নবম হিজরীতে আমীর ছিলেন।” (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/১০৩) মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক এবং সীরাত লেখকদের এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন:

“অতঃপর যখন তিনি শাওয়াল মাসে ফিরে আসলেন, তখন জি’রানা থেকে ওমরাহ করলেন, তারপর আত্তাব বিন আসীদ হজ করলেন এবং মানুষের জন্য হজ কায়েম করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন, এরপর আবু বকর নবম হিজরীতে হজ করেন।” (আত-তারিখুল আওসাত লিল বুখারী: ১/৩৩) “আত্তাব বিন আসীদ অষ্টম হিজরীতে হজ কায়েম করেন... এবং বাকি মানুষ তাদের শিরকের ওপর বহাল ছিল।” (আল-মুহাব্বার, পৃ. ৭) “সেই বছর আরবরা যেভাবে হজ করত সেভাবেই মানুষ হজ করেছিল এবং সেই বছর মুসলমানদের হজ করিয়েছিলেন আত্তাব বিন আসীদ, আর তা ছিল অষ্টম হিজরী।” (তারিখুত তাবারী: ৩/৯৫)

মুহাম্মদ বিন সাদ এবং ইবনে খালদুনও একই কথা লিখেছেন। (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৫/১৩৬, তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৪৬৬)

নোট: আত্তাব বিন আসীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমৃত্যু মক্কার গভর্নর ছিলেন। তবে তিনি স্বল্পায়ু লাভ করেছিলেন, ১৩ হিজরীর জমাদিউল আখির মাসে যৌবনকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। এটি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের শেষ দিনগুলোর ঘটনা। (আল-ইসতিয়াব: ৩/১০২৩)

## গজওয়ায়ে তাবুক (৯ হিজরি)

মক্কা বিজয়ের অভিযানের ফলে এর আশপাশের এলাকাগুলো বিজিত হয়েছিল এবং পুরো জাজিরাতুল আরব ইসলামের ছায়াতলে চলে এসেছিল। শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্ন থাকা মরুভূমির গোত্র এবং উটপালনকারীরা এখন একটি মহান উদ্দেশ্যের জন্য এক পতাকার নিচে সমবেত হয়েছিল। পূর্বে পারস্য সরকার অভ্যন্তরীণ ভাঙন ও বিশৃঙ্খলার শিকার হওয়ার কারণে সেই সময় জাজিরাতুল আরবের দিকে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য ছিল না, কিন্তু রোমানরা মুতার যুদ্ধের পর থেকে সতর্ক ছিল এবং জাজিরাতুল আরবে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসকারী খ্রিস্টান আরবরাও তাদের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছিল যে মুসলমানদের যত দ্রুত সম্ভব নির্মূল করা উচিত। কায়সারের রোম এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি সিরিয়ায় তাদের অধীনস্থ গাসসানি খ্রিস্টানদের হাতে সোপর্দ করেছিল, যারা মরুভূমির চড়াই-উতরাই সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। লাখম ও জুযাম গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। ৯ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং চল্লিশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত রোমানদের একটি অগ্রবর্তী বাহিনী অগ্রসর হয়ে “বালকা” পর্যন্ত পৌঁছে যায়। [১]

নবাতীয়রা, যারা সিরিয়া থেকে জাজিরাতুল আরবে জলপাইয়ের তেল বিক্রি করতে আসত, তাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে খবর আসছিল এবং তিনি ও সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। মদিনার মানুষ অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে ছিল। তাদের প্রতি মুহূর্তে গাসসানিদের আক্রমণের ভয় তাড়া করে ফিরত। [২]

প্রশ্নটি ছিল যে এত বড় শত্রুর সাথে কীভাবে যুদ্ধ করা হবে? কিন্তু শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করা হলে এটি নিশ্চিত ছিল যে যুদ্ধের আগেই মদিনার উত্তরের সমস্ত এলাকা শত্রুর দখলে চলে যাবে। আবার খন্দকের যুদ্ধের মতো পরিখা খনন করে যুদ্ধ করা হলেও এই আশঙ্কা থেকে যেত যে শত্রু হিজাজে প্রবেশ করার পর মদিনা পুরো জাজিরাতুল আরব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে মুসলমানরা নিজেরাই সিরিয়ার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হবে যাতে শত্রুর ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে এবং যুদ্ধের ময়দান যেন নিজেদের এলাকা না হয়। এই নির্দেশ পালন করা সহজ ছিল না। একদিকে ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন, অন্যদিকে ছিল খেজুর পাকার সময়। মদিনার অধিকাংশ সাহাবীর জীবিকা এর ওপরই নির্ভরশীল ছিল। [৩]

---

[১] শরহ আল-জারকানি আলাল মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া: ৩/৬৬ থেকে ৬৮; আর-রাহীকুল মাখতুম, মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী: পৃষ্ঠা ৫৮১, ৫৮২, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া, লাহোর।

[২] আল-মাগাজি লিল-ওয়াকিদি: ৩/৯৯০। দ্রষ্টব্য: নবাতীয়রা মূলত নাবিদ বিন ইসমাইলের বংশধর, যারা প্রথমে হিজাজে বসবাস করত, পরে সেখানে তাদের আধিপত্য শেষ হলে তারা কৃষক ও ব্যবসায়ী হয়ে যায়। (আর-রাহীকুল মাখতুম, পাদটীকা ৫৮১)

[৩] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২: পৃষ্ঠা ৩৭১, বাব ফিল ইবলাহ; সহীহ বুখারী, হাদিস: ৪৪১৮, কিতাবুল মাগাজি, হাদিস কাব বিন মালিক।

https://t.me/BoierSomahar

বাগান করার ওপর নির্ভরশীল ছিল, এমন সময়ে বাগান ছেড়ে যাওয়া মানে ফসল নষ্ট করা এবং সারা বছরের আয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার সমতুল্য ছিল। সবকিছুর ঊর্ধ্বে এটি যে, দীর্ঘ সময় ধরে দুর্ভিক্ষ চলছিল এবং মদিনাবাসীদের আর্থিক অবস্থা বেশ দুর্বল ছিল। তা সত্ত্বেও রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল অটল। মক্কাসহ আরবের সমস্ত গোত্রকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন তারা তাদের সৈন্যবাহিনী পাঠায়। [১] রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই সৈন্য অভিযানের লক্ষ্য প্রকাশ করতেন না, কিন্তু এবার সফরের দীর্ঘতা এবং রাস্তার প্রতিকূলতার কথা বিবেচনা করে তিনি (সা.) স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করতে হবে। এই প্রকাশের পেছনে সম্ভবত এই হিকমতও ছিল যে, এভাবে মদিনায় উপস্থিত শত্রুর গুপ্তচরদের মাধ্যমে এই খবর সিরিয়াবাসীদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে যার ফলে তারা আতঙ্কিত হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে তাঁদের জিহাদের জন্য সদকা ও খয়রাত করার উৎসাহ দিলেন। রিসালাতের শমার পরওয়ানা (রাসূলের প্রেমিক) সাহাবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করলেন। হযরত আসেম বিন আদি (রা.) ৯০ ওসাক খেজুরের ভাণ্ডার নজরানা দিলেন। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) সাজসরঞ্জামসহ তিনশ উট এবং এক হাজার আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা) পেশ করলেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) সোয়া ওকিয়া রূপা এবং হযরত উমর (রা.) দুইশ ওকিয়া রূপা ছাড়াও ঘরের অর্ধেক আসবাবপত্র হাজির করলেন। [২] হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তো কামালই করে দিলেন, ঘরে যা কিছু ছিল, সবই আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে দিলেন। [৩] গরিব, মিসকিনরাও পিছিয়ে থাকেনি এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা ও খয়রাত করল। এই সফর সওয়ারি ছাড়া পাড়ি দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল, তাই লশকর বা বাহিনী বিন্যাসের সময় খেয়াল রাখা হয়েছিল যেন প্রত্যেক ব্যক্তি সওয়ারি পায়। যেহেতু সাহাবীদের এক বিশাল সংখ্যা সাথে চলার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাই সওয়ারি কম পড়ে গেল। একেকটি উটের ওপর পালাক্রমে দুই-দুই, তিন-তিন জন মানুষের ব্যবস্থা করা হলো, তবুও কিছু লোকের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো না এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে দরবারে রিসালাত থেকে ফিরে গেলেন। [৪] অবশ্য মুনাফিকদের অবস্থা ছিল ভিন্ন। তারা নিজেরাও এই প্রচণ্ড গরমে সফর করা থেকে জি চুরাচ্ছিল (পিছপা হচ্ছিল) এবং অন্যদেরও বাধা দিচ্ছিল। [৫]

নবী আকরাম (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে মদিনা মুনাওয়ারায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে মুনাফিকরা আজেবাজে কথা বলতে শুরু করল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে সাথে নিয়ে যাচ্ছেন না। হযরত আলী (রা.) এই কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছালেন [৬] এবং আরজ করলেন: “আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন?” রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার সেই সম্পর্ক হোক যা হারুন (আ.)-এর মুসা (আ.)-এর সাথে ছিল? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোনো নবী হবে না।” [৭]

---

[১] আল-মাগাজি লিল ওয়াকিদি: ৩/৯৯০

[২] তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ২/৬২৮, ৬২৯

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ১৬৭৮, কিতাবুয যাকাত

[৪] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৫১৭... কাব বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনার শব্দাবলি: “ওয়া লা ইয়াজমাউহুম কিতাবুন হাফিজ” থেকেও স্পষ্ট যে গমনকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। (সহিহ বুখারি, হা: ৪৪১৮)

[৫] তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮১

[৬] আস-সুন্নাহ লি ইবনে আবি আসিম: ২/৬০০

হযরত আলী (রা.) এটি শুনে সন্তুষ্ট হলেন। [১]

**ইসলামী বাহিনী তাবুকের দিকে অগ্রসর:**

বৃহস্পতিবার ৩রা রজব ৯ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ত্রিশ হাজার লোকের সাথে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে রওনা হলেন। [২] মদিনা মুনাওয়ারা এবং এর আশপাশের এলাকাগুলো পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছিল। শুধু নারী ও শিশুরাই পেছনে রয়ে গিয়েছিল। এছাড়া এমন কিছু লোক ছিল যাদের গুরুতর কোনো ওজর ছিল এবং তারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনার (সা.) সাথে যেতে পারেনি; তবে মুনাফিকরা চরম ধৃষ্টতার সাথে এই সুযোগেও টস থেকে মস হয়নি এবং ঘরে লুকিয়ে রইল। [৩]

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বাহন না থাকার কারণে রওনা হতে পারেননি, কিন্তু পরে জিহাদের জজবা এতটাই প্রবল হলো যে, সফরের আসবাবপত্র কাঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটেই রওনা হলেন এবং ইসলামী বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। হযরত আবু খাইসামা আনসারী (রা.) নিজের বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। একদিন বাগানে নিজের স্ত্রীদের সাথে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ খেয়াল হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এই মুহূর্তে কত কষ্ট ও কাঠিন্য সহ্য করে জিহাদের সফরে বের হয়েছেন আর আমরা এখানে আরামদায়ক শীতল ছায়ায় আছি; বিবেক তাকে এমনভাবে নাড়া দিল যে, তখনই তিনি বাহিনীর পেছনে রওনা হয়ে গেলেন। উমাইর বিন ওয়াহাব (রা.)-ও কয়েক দিনের বিলম্বের পর রওনা হলেন, আবু খাইসামা (রা.) এবং তিনি একসাথে মিলিত হলেন এবং পথ অতিক্রম করতে থাকলেন। [৪]

মাত্র দশজন ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা কোনো ওজর ছাড়াই পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতেও শামিল হতে পারেননি। তাদের মধ্যে আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনজির, মুরারা বিন রাবী, হিলাল বিন উমাইয়া এবং কাব বিন মালিক (রা.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। [৫]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪১৬, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়া তাবুক; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩২০০৮। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিজের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনার জন্য মদিনা শহরে রেখে গিয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম: ৫১৯/২), তবে মুসনাদে আহমদের একটি দুর্বল বর্ণনায় আছে যে, "ইস্তাখলাফা আলিয়ান" শব্দ দ্বারা স্পষ্ট হয় যে হযরত আলী (রা.)-কে নায়েব (প্রতিনিধি) বানানো হয়েছিল। ইবনে হিশামের এই বর্ণনাটি হতে পারে যে হযরত আলী (রা.)-কে (পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি) মদিনার দেখাশোনার বিশেষ দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল, যেমন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে শহরের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিছু বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর পরিবর্তে অন্য সাহাবীদের প্রতিনিধিত্বের কথা উল্লেখ আছে। এর সবকটিই হওয়া সম্ভব।

[২] রজব ৯ হিজরি হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মত। ইবনে হাবীবের মতে রওনা হওয়ার তারিখ ছিল ১লা রজব বৃহস্পতিবার। (আল-মুহাব্বার, পৃ. ১১৬)

[৩] সহীহ বুখারীতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। "রাসূলুল্লাহ (সা.) বৃহস্পতিবার তাবুকের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তিনি বৃহস্পতিবার বের হওয়া পছন্দ করতেন" (সহীহ বুখারী, হা: ২৯৫০, কিতাবুল জিহাদ)। তাই প্রবল ধারণা এই যে, রওনা হওয়ার তারিখ ছিল ৩রা রজব বৃহস্পতিবার। এই রজবকে যদি রজব মুদার ধরা হয় তবে তারিখটি হয় ১১ এপ্রিল ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ, যা ছিল গ্রীষ্মকাল। কুরআন মাজীদের আয়াত "গরমের মধ্যে বের হয়ো না" (সূরা আত-তাওবাহ: ৮১)-এর আলোকে গাযওয়া তাবুক গ্রীষ্মকালে হওয়া প্রমাণিত হয়। হাদীসেও স্পষ্ট আছে যে খেজুর পাকার সময় ছিল। (সহীহ বুখারী, হা: ৪৪১৮, হাদীস কাব বিন মালিক)। অন্যদিকে যদি রজবকে অক্টোবর ধরা হয় তবে গাযওয়া তাবুকের সময়কাল গ্রীষ্মকাল হওয়া প্রমাণিত হয় না।

[৪] "আমি কেবল এমন লোককেই দেখতাম যাকে মুনাফিকির অপবাদ দেওয়া হয়েছে অথবা এমন লোক যাকে আল্লাহ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করে ওজর দিয়েছেন।" (সহীহ বুখারী, হা: ৪৪১৮, হাদীস কাব বিন মালিক)

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম: ৫২১/২

[৬] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২৭২/৫

[৭] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪১৮, হাদীস কাব বিন মালিক

**তারিখে উম্মতে মুসলিমা**

**অংশ: প্রথম**

**কওমে সামূদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভীতি:**

এই কঠিন সফরেও নবী করীম ﷺ-এর পথ অতিক্রম হয়েছিল ওয়াদিয়ে হিজর দিয়ে, যেখানে কওমে সামূদের ধ্বংসাবশেষ ছিল। হাজার বছর আগে এখানে হযরত সালেহ (আলাইহিস সালাম) তাওহীদের ডাক দিয়েছিলেন এবং তাঁর কওম তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া ভূমিকম্প এবং বিকট শব্দ তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিল; হ্যাঁ, পাহাড়ে খোদাই করা তাদের ঘরবাড়ি এবং ধ্বংসাবশেষগুলো তাদের শিক্ষণীয় কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আশঙ্কা হলো যে, মুসলমানরা যেন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইমারতগুলো দেখার জন্য থেমে না যায় এবং একে বিনোদন ও তামাশার বস্তু বানিয়ে আসল প্রভাব অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ এবং আল্লাহর ভয়কে ভুলে না যায় এবং এই উদাসীনতার পরিণামে নিজেরাও আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত না হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এখান দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের পবিত্র চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলেন যাতে ধ্বংসাবশেষের ভয়াবহ দৃশ্যের ওপর দৃষ্টিও না পড়ে। আপনি ﷺ সওয়ারির গতিও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই সাথে সাহাবায়ে কেরামকে তাকিদ করেছিলেন:

“এই জালিম লোকদের জনপদ দিয়ে যাওয়ার সময় তোমাদের এই ভয়ে কাঁদা উচিত যে, পাছে সেই আযাব তোমাদের ওপরও নাযিল হয়ে যায়।”

কওমে সামূদের কূপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুসলমানরা সেখান থেকে পানি ভরতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পেরে বললেন:

“এই পানি পান করো না এবং তা দিয়ে ওযুও করো না।” [১]

সংবেদনশীল এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ হাজার বছর পরেও আযাবগ্রস্ত স্থানগুলোতে এক প্রকার আতঙ্ক বিরাজ করতে অনুভব করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি এই প্রভাবগুলোর অনুভূতি আর কার হতে পারত? তাই আপনি সেই পানি ব্যবহার করাও সমীচীন মনে করেননি যে, পাছে আযাবের অশুভ প্রভাব তাতেও প্রবেশ করে না থাকে।

**তাবুকে অবস্থান এবং আশপাশের এলাকা দখল:**

অবশেষে এই সফর শেষ হলো এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সীমান্তে তাবুক নামক ঝরনার কাছে পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ঝরনার পানি ব্যবহার করতে আগেভাগেই নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু দুই ব্যক্তি খেয়াল করেনি এবং আগে পৌঁছে নির্দেশের লঙ্ঘন করে বসল। যখন ইসলামী বাহিনী সেখানে পৌঁছাল, তখন ঝরনায় নামমাত্র পানি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ লঙ্ঘনকারী সেই দুই মুজাহিদকে তিরস্কার করলেন। এরপর সেই পানিতে নিজের পবিত্র চেহারা ও হাত ধৌত করলেন। দেখতে দেখতে ঝরনায় পানি উপচে পড়তে লাগল। [২]

যদি এখানে আশপাশে আরব খ্রিস্টান গোত্রগুলো বসবাস করত, কিন্তু পরিস্থিতি ছিল একদম পরিষ্কার। রোমান বাহিনীর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনো হদিস ছিল না। মনে হচ্ছিল যে, নবী করীম ﷺ-এর সশরীরে সসৈন্যে আগমন তাদের ওপর ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং তারা মদীনা আক্রমণের ইচ্ছা ত্যাগ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের সীমান্ত এলাকায় পুরো বিশ দিন অবস্থান করলেন। এই সময়ে কায়সারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার পাল্টা ব্যবস্থা বা সামরিক তৎপরতার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছিল যেন রোমানরা মুসলমানদের ভয়ে ভীত হয়ে আক্রমণ থেকে বিরত রয়েছে। এই পরিস্থিতির কারণে খোদ আরব খ্রিস্টান সরদারদের রাজতন্ত্রের ওপর আস্থা শেষ...

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৫২১, ৫২২

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৬০৮৬, বাব ফি মুজিজাতিন নবী ﷺ

...হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'আয়লা'র শাসক 'ইউহান্না' উপস্থিত হয়ে মদিনা রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেন। এরপর 'জারবা' এবং 'আযরুহ'-এর নেতৃবৃন্দও এসে আত্মসমর্পণ করেন। তারা সবাই জিজিয়া দিতে সম্মত হন।

এখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রখ্যাত অশ্বারোহী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দুমাতুল জান্দালের খ্রিস্টান শাসক উকিদার বিন মালিককে শায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ করেন; কারণ দুমাতুল জান্দালে দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম কাফেলাগুলোকে উত্যক্ত করা হচ্ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি অতর্কিত অভিযানে উকিদারকে ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করেন যখন সে জঙ্গলে শিকার করছিল। অবশেষে উকিদারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। [১]

**জিজিয়ার বিধান:**

এই যুদ্ধক্ষেত্রেই জিজিয়া বিধিবদ্ধ হয় এবং এই বরকতময় আয়াতটি নাযিল হয়: [২]

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না এবং পরকালের ওপরও নয়, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা বিনীত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া প্রদান করে।" [৩]

**হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে ফিরে আসার পরামর্শ:**

তাবুকে অবস্থানের বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরবর্তী অগ্রযাত্রা সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! রোমানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি। আমরা তাদের কাছাকাছি এসে তাদের ভীত করে দিয়েছি। এই বছরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে আমরা তাদের আতঙ্কিত করে ফিরে যাই। এরপর ভবিষ্যতে যা হবে তা দেখে নেব। আল্লাহ তাআলা পথ খুলে দেবেন।' এই মতামতটি সতর্কতা ও প্রজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পছন্দ করলেন। [৪]

**কায়সারের দূতের প্রতি ইসলামের দাওয়াত:**

এর আগে তিনি হিরাক্লিয়াসকে তাবুক থেকে একটি পত্রও পাঠিয়েছিলেন। কিছু দিন পর হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে আরব গোত্র তানুখের এক ব্যক্তি তার উত্তর নিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি পত্রটি পাঠ করলেন যা অত্যন্ত বিনয়ী ও সৌজন্যমূলক কথায় পরিপূর্ণ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূতকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি কোন কওমের?' দূত উত্তর দিল: 'বনু তানুখের'।

---

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৪৬৮

[২] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৯। জিজিয়া হলো সেই সামান্য অর্থ যা ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের থেকে তাদের প্রদানকৃত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে বছরে একবার আদায় করত। এরপর থেকে প্রতিটি জিহাদী অভিযানে প্রতিপক্ষকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হতো। উভয়টি অস্বীকার করলে যুদ্ধ হতো। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লস্করের আমীর নিযুক্ত করার সময় এই নির্দেশনা দিতেন যে, যদি প্রতিপক্ষ ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হোক। 'ফাইন আবও ফাখুয মিনহুমুল জিজিয়া' (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড: ৭, ১৬১)। সম্ভবত এই নির্দেশটি প্রথমবারের মতো সেই সারিয়াগুলোর আমীরদের দেওয়া হয়েছিল অথবা এই আয়াত জিজিয়া নাযিলের পর তাবুকে অবস্থানের সময় পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে পাঠানো হয়েছিল। এছাড়াও উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনীও সম্ভবত এই নির্দেশ নিয়েই রওনা হয়েছিল।

[৩] আল-আমওয়াল লি আবি উবাইদ কাসিম বিন সালাম, পৃষ্ঠা ২৭

[৪] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩০০

আপনি (সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন: “তোমার কি ইব্রাহিম (আ.)-এর দ্বীনের প্রতি কোনো আগ্রহ আছে?”

সে ওজর পেশ করে বলল: “আমি এক কওমের দূত এবং এক ধর্মের অনুসারী। নিজের কওমের কাছে ফিরে না গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।” রাসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি হাসলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

(নিশ্চয়ই আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়েত দিতে পারেন না, বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দান করেন।) [১]

তারপর বললেন: “তুমি দূত। দূতের হক থাকে। আমরা যদি সফরে না থাকতাম, তবে তোমাকে ইনাম ও ইকরাম (পুরস্কার ও সম্মান) দিয়ে ভূষিত করতাম।” হযরত উসমান (রা.) তা শুনে তৎক্ষণাৎ একটি চমৎকার পোশাক এনে দিলেন। রাসূলের দরবার থেকে দূত এই খিলাত (সম্মানসূচক পোশাক) নিয়ে বিদায় হলো। [২]

**গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মসজিদে যিরার ধ্বংস:**

অবশেষে ইসলামী লস্কর সিরিয়ার সীমান্তে নিজেদের পতাকা উড়িয়ে ফিরে এল। যদিও মুনাফিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই জিহাদে শামিল ছিল না, কিন্তু কিছু মুনাফিক অনিষ্ট সৃষ্টির জন্য সাথে চলেছিল; তবে তাদের হাতে কিছুই আসেনি এবং তারপর সূরা আত-তাওবার আয়াতসমূহ তাদের অপদস্থ করতে কোনো কসুর করেনি। এই সূরার বহু আয়াতে তাদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং অনিষ্টকারিতাকে উন্মোচিত করে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দিনগুলোতে মুনাফিকরা মদিনা মুনাওয়ারার উপকণ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল, যা মূলত মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং তাদের শিকড় কাটার জন্য একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত।

মুনাফিকরা এই কেন্দ্রকে “সরকারি” মর্যাদা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন করল যে, আপনি এখানে এসে নামাজ আদায় করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ওয়াদা করেছিলেন যে, তাবুক থেকে ফিরে এসে সেখানে নামাজ পড়বেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অসৎ উদ্দেশ্য এবং এই তথাকথিত মসজিদের বাস্তবতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। ওহী নাযিল হলো:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

“আর যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে (মুসলমানদের) ক্ষতি করার জন্য, কুফরি করার জন্য, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং সেই ব্যক্তির ঘাঁটি হিসেবে যে আগে থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর তারা অবশ্যই কসম খাবে যে, আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (হে নবী!) আপনি এই (তথাকথিত মসজিদে) কখনো (নামাজের জন্য) দাঁড়াবেন না।” [৩]

এভাবে আল্লাহ এই মসজিদকে “মসজিদে যিরার” আখ্যা দিয়ে এর বাস্তবতা উন্মোচন করে দিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাবুক থেকে ফেরার পথে সাহাবীদের পাঠিয়ে এই তথাকথিত মসজিদটি ভেঙে ফেলার বা পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। [৪]

---

[১] সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৭।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৭৫।

[৩] সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০৮, ১০৭।

[৪] সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৫২৯, ৫৩০।

**মদীনায় আগমন - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের ইন্তেকাল:**

রমজান মাসে হুজুর ﷺ তাবুক থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন। [১] এদিকে আপনার কন্যা উম্মে কুলসুমের ইন্তেকাল হয়ে যায়। আসমা বিনতে উমাইস, উম্মে আতিয়্যাহ এবং হুজুর ﷺ-এর ফুফু সাফিয়্যাহ মিলে গোসল দেন। কবর খননের সময়ও নবী করীম ﷺ অশ্রুসজল চোখে কিনারায় বসে ছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় জামাতার একাকীত্বের কষ্টও ভালোভাবে অনুভব করেন এবং বলেন: "আমার যদি তৃতীয় কোনো কন্যা থাকত, তবে তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।" [২]

**কয়েকজন মুখলিস সাহাবীর পরীক্ষা - হযরত আবু লুবাবার তাওবা:**

তাবুক যুদ্ধ থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া মুনাফিকরা হুজুর ﷺ-এর সামনে অনুপস্থিতির মিথ্যা অজুহাত পেশ করে নিজেদের সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করে। তবে সেই সকল ব্যক্তিবর্গ যারা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন, তারা মিথ্যাচার করেননি এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন। তারা ছিলেন দশজন। তাদের মধ্যে সাতজন নিজেদেরকে মসজিদে নববীর সেই খুঁটিগুলোর সাথে বেঁধে ফেলেন যেখান দিয়ে নবী করীম ﷺ যাতায়াত করে মেহরাবে আসতেন। তাদের মধ্যে আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনজির আনসারীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা নিজেদের খুঁটির সাথে বেঁধে কসম করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবা কবুল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এভাবেই বাঁধা থাকবেন। [৩]

সপ্তম দিনে আবু লুবাবা বেহুঁশ হয়ে যান। এদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ চলে আসে। যখন আবু লুবাবাকে এই সুসংবাদ দেওয়া হলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন: "ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করব না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাকে মুক্ত করেন।" অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বরকতময় হাতে তাকে মুক্ত করেন। আবু লুবাবা এই গুনাহের কাফফারা হিসেবে নিজের সমস্ত সম্পদ সদকা করার সংকল্প করেন, তাঁর বাকি ছয়জন সাথীও একই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। [৪] তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট।" [৫]

---

[১] ইবনে ইসহাকের মতে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন রমজান মাসে (সীরাতে ইবনে ইসহাক: ২/৫৩৭) এবং ইবনে হাবীবের মতে শাওয়ালের শেষ তারিখে হয়েছিল (আল-মুহাব্বার পৃ. ৪৬)। একটি মত শাবান মাসেরও আছে যা অত্যন্ত দূরবর্তী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে ইবনে ইসহাকের মতটিই শক্তিশালী মনে হয়।

[২] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সাদ: ৮/৩৮; যাদুল মাআদ; [৩] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল-বায়হাকী: ৫/২৭২।

[৪] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ৯৭৩৫; [৫] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল-বায়হাকী: ৫/২৭২; [৬] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক খণ্ড: ৯৭৩৫।

হযরত আবু লুবাবার তাওবার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা: কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এটি বনূ কুরাইজা যুদ্ধের ঘটনা। বনূ কুরাইজার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্তের বিষয়ে আবু লুবাবার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল (যেহেতু তিনি ইহুদিদের মিত্র ছিলেন)। আবু লুবাবা গলায় হাত বুলিয়ে ইহুদিদের ইশারা করে দেন যে হত্যার সিদ্ধান্ত হবে। তখন ইহুদিরা সাদ বিন মুয়াজকে বিচারক বানানো উত্তম মনে করল। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, খণ্ড: ৯৭৩৬; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, খণ্ড: ৩৬৮৯৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ১০১৫৫; হাইসামী বলেন, এতে মুহাম্মদ বিন আমর বিন আলকামা রয়েছেন যিনি হাসানুল হাদিস এবং বাকি বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।) তবে এই বর্ণনাগুলোতে এটি উল্লেখ নেই যে আবু লুবাবা পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধেছিলেন। এই সংযোজনটি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২৩৭) তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী এটি মুসা বিন উকবা থেকে বর্ণনা করেছেন। (দালায়েলুন নুবুওয়াহ: ৩/১৩) ইমাম তাবারীর মতে এই বর্ণনাটি গ্রহণ করলে মানতে হবে যে আবু লুবাবা নিজেকে দুইবার বেঁধেছিলেন অথবা অনুরূপ কিছু। (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ২/৩০৭) হাফেজ ইবনে কাসীর দৃঢ়তার সাথে বলেন যে আবু লুবাবা নিজেকে দুইবার বেঁধেছিলেন। (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ৭/২৩০)

কাব বিন মালিক (রা.) ও তাঁর সাথীদের তওবা:

গজওয়ায়ে তাবুক থেকে পেছনে রয়ে যাওয়া বাকি তিন ব্যক্তি: কাব বিন মালিক, মুরারা বিন রবী এবং হিলাল বিন উমাইয়া (রা.), যাঁদের পরীক্ষা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়েছিল। হুজুর (সা.) আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের তাঁদের সাথে সালাম ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সামাজিক বয়কটের এই ধারা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত জারি ছিল। এই তিনজনের মধ্যে মুরারা বিন রবী এবং হিলাল বিন উমাইয়া (রা.) দুঃখ-বেদনা ও কান্নাকাটির কারণে ঘরেই আবদ্ধ হয়ে রইলেন। অন্যদিকে কাব বিন মালিক (রা.), যিনি অত্যন্ত মজবুত হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, তিনি মসজিদে নববী ও বাজারে যাতায়াত করতেন। তবুও কোনো মুসলমান তাঁর সাথে সালাম বা কথাবার্তা বলতেন না। এই দিনগুলোতে বনু গাসসানের খ্রিস্টান গভর্নর এক নবতী বণিকের মাধ্যমে তাঁদের কাছে এই পত্র পাঠান:

“আমি জানতে পেরেছি যে তোমার মনিব তোমার সাথে খারাপ আচরণ করেছেন। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনার স্থানে না রাখুন। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমাকে সম্মান ও মর্যাদা দেব।” [১]

কাব বিন মালিক (রা.) ঈমানি গায়রাত বা আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়ে এই পত্রটি এই বলে চুল্লিতে নিক্ষেপ করলেন: “এটিও একটি পরীক্ষা।” এই তিন ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে তওবা ও ইস্তিগফারে মশগুল রইলেন। তাঁদের এই অবস্থায় সাহাবীগণও ব্যথিত ছিলেন এবং স্বয়ং হুজুর (সা.)-ও এতে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। অবশেষে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর ফজরের নামাজের পর ওহী নাযিল হলো:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“আর সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দান করেছেন) যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, এমনকি যখন তাদের ওপর এই পৃথিবী তার সমস্ত প্রশস্ততা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে আল্লাহ (এর পাকড়াও) থেকে স্বয়ং তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় পাওয়া সম্ভব নয়, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করলেন যাতে তারা (ভবিষ্যতে আল্লাহর দিকেই) প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চিত জেনো! আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [২]

এই আয়াতে এই তিনজনের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। হুজুর (সা.) এবং সমস্ত সাহাবী সেই দিন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মসজিদে নববীতে আনন্দের একটি ঢেউ বয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরাম দৌড়ে দৌড়ে এই তিনজনকে মোবারকবাদ দিতে লাগলেন। স্বয়ং হুজুর আনোয়ার (সা.)-এর পবিত্র চেহারা খুশিতে চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

হযরত কাব বিন মালিক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কদমে বসে পড়লেন এবং আরজ করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! তওবা কবুল হওয়ার এই সংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে?” হুজুর (সা.) বললেন: “আল্লাহর পক্ষ থেকে।”

---

[১] কাব বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনার প্রেক্ষাপট থেকে জানা যায় যে, গাসসানি গভর্নরের পত্রটি বয়কটের চল্লিশতম দিনের আগে পৌঁছেছিল। এর থেকে জানা যায় যে, রোমানদের গোয়েন্দারা মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত থাকত এবং তারা এখানকার খবরাখবর দ্রুত সেখানে পৌঁছে দিত। অন্যথায় এটি কীভাবে সম্ভব ছিল যে গাসসানি গভর্নরের এলাকা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে কম-বেশি দুইশ কিলোমিটার দূরে ছিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে এই খবর পৌঁছে গিয়েছিল এবং চতুর্থ বা পঞ্চম সপ্তাহে তাঁর পত্রও মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিল।

[২] সূরা আত-তাওবাহ: আয়াত ১১৮।

হযরত কাব বিন মালিক (রা.) অনুমতি চাইলেন যে, এই ত্রুটির কাফফারা হিসেবে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করে দেবেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "কিছু সম্পদ রেখে দাও। তোমার জন্য তা উত্তম হবে।"

হযরত কাব (রা.) আরজ করলেন: "আল্লাহ আমাকে সত্য বলার কারণেই মুক্তি দিয়েছেন। আমি আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া হিসেবে অঙ্গীকার করছি যে, আমি কখনো মিথ্যা বলব না।" এরপর তিনি সারাজীবন তাঁর অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করেন। [১]

## প্রতিনিধিদলের আগমন

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাবুক থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর মদিনা মুনাওয়ারায় বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমন শুরু হয়। এরা সেই সব লোক ছিল যারা মক্কা বিজয়ের পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় এক বছরের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছিল এবং এরপর অন্তরের গভীর থেকে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এই প্রতিনিধিদলগুলোর আগমনের ফলে ইসলামের দাওয়াত খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিনিধিদলগুলোকে সম্মান করতেন, বিভিন্ন গোত্রের গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদের মর্যাদা ও গুণাবলী প্রকাশ করতেন, যার ফলে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেত। কোনো বিশেষ ত্রুটি দেখলে সতর্কও করে দিতেন। আপনি (সা.) এই প্রতিনিধিদলগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইসলামি আকিদা, রুকন এবং শরয়ী বিধান শিক্ষা দিতেন। যেহেতু এই যুগে ইলমের পিপাসু সাহাবীগণ প্রতি মুহূর্তে দরবারে রিসালাতে প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত থাকতেন, তাই এই বর্ণনাগুলো খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। আর যেহেতু এটি নবুওয়াতের শেষ সময় ছিল, তাই এই যুগে লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বা নতুন বিধানসমূহ পূর্ববর্তী বিধানগুলোর জন্য রহিতকারী (নাসিখ) হিসেবেও গণ্য করা হয়। [২]

## তায়েফের প্রতিনিধিদল

মক্কা বিজয় এবং গাযওয়ায়ে হুনাইনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফ অবরোধ করেছিলেন, কিন্তু শহরবাসীদের তীর নিক্ষেপে অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবীগণ আরজ করেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! বনু সাকিফের জন্য বদদোয়া করুন যে, তাদের তীর নিক্ষেপ আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।"

কিন্তু রহমতে আলম (সা.) দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ! সাকিফকে হেদায়েত দান করুন।" [৩] এই দোয়া কবুল হলো। গাযওয়ায়ে তাবুকের পর সর্বপ্রথম তায়েফের প্রতিনিধিদল এসে ইসলামে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) উসমান বিন আবিল আস (রা.)-কে তাদের আমির নিযুক্ত করেন, যিনি যুবক ছিলেন কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অত্যন্ত অগ্রগণ্য ছিলেন।

তায়েফের বিখ্যাত মূর্তি 'লাত' পুরো আরবে পূজিত হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং মুগীরা বিন শুবা (রা.)-কে পাঠিয়ে এই মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪১৮, কিতাবুল মাগাযী, বাব হাদীসে কাব বিন মালিক; তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৩৬৯, দারুল ফিকর

[২] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ওফদে বনী তামীম, বাব ওফদে আব্দুল কায়েস, বাব কুদুমুল আশআরিয়্যীন ওয়া আহলিল ইয়ামান, বাব কিসসাতে ওফদে তাই

[৩] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৯৪২, আবওয়াবুল মানাকিব

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/১৫১

## বনু তামীম প্রতিনিধিদল

বনু তামীমের লোকেরা উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের প্রশংসা করে বলতেন: “আমার উম্মতের মধ্যে এই লোকেরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর হবে।” হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কাছে বনু তামীমের একজন দাসী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে নির্দেশ দিলেন: “একে মুক্ত করে দাও, সে ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর।”

বনু তামীমের পক্ষ থেকে যাকাত পেশ করা হলে তিনি বললেন: “এটি আমার কওমের যাকাত।” [১]

বনু তামীমের প্রতিনিধিদলে সা’সা’আ বিন নাজিয়াহ (রা.)-ও ছিলেন। তিনি দ্বীনের বিধান ও কুরআন মাজীদের শিক্ষা লাভ করার পর আরজ করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি যেসব নেক কাজ করেছি, সেগুলোর কি প্রতিদান পাব?”

রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কী কাজ করেছ?” সা’সা’আ বিন নাজিয়াহ (রা.) আরজ করলেন:

“জাহেলিয়াতের যুগে একবার আমার দশ মাসের গর্ভবতী দুটি উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। আমি একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সেগুলোর সন্ধানে বের হলাম। খোলা মরুভূমিতে একটি ঘর দেখতে পেলাম, যার বাইরে একজন বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকে আমার উটনীগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল: ‘সেগুলো আমরা পেয়েছি এবং সেগুলো বাচ্চা প্রসব করেছে।’ এই সময় ঘর থেকে এক মহিলার আওয়াজ এল; প্রসব হয়েছে। বৃদ্ধ হাঁক দিল: ‘যদি ছেলে হয় তবে কওমে তার অংশ আছে, আর যদি মেয়ে হয় তবে তাকে দাফন করে দাও।’ মহিলা বলল: ‘মেয়ে হয়েছে।’ আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম: ‘এই মেয়েটি কার?’ সে বলল: ‘আমার মেয়ে।’ আমি বললাম: ‘আমি একে কিনতে চাই।’ বৃদ্ধ বলল: ‘কী দাম দেবে?’ আমি বললাম: ‘ঐ দুটি উটনী এবং তাদের বাচ্চারা।’ বৃদ্ধ বলল: ‘তোমার নিজের উটটিও দিয়ে দাও।’ আমি বললাম: ‘ঠিক আছে, তবে একজন লোক আমার সাথে যাক, আমি বাড়ি পৌঁছে তার হাতে উটটি পাঠিয়ে দেব।’ বৃদ্ধ রাজি হয়ে গেল। আমি বাড়ি পৌঁছে উটটি পাঠিয়ে দিলাম। সেই রাতে আমি ভাবতে লাগলাম যে, শিশুদের জীবন বাঁচানো এমন এক নেক কাজ যা আরবদের মধ্যে এর আগে কেউ করেনি। এভাবে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত আমি ৩৬০টি মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছিলাম। প্রত্যেকের বিনিময়ে আমি দুটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী এবং একটি উট দিয়েছি। তো আমি কি এই আমলের প্রতিদান পাব?”

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “এটি নেক কাজের একটি অধ্যায় যার প্রতিদান তুমি পাবে, কারণ আল্লাহ তোমাকে ইসলাম দিয়ে ধন্য করেছেন।” [২]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ২৩৬৬, কিতাবুল মাগাযী, বাব ওফদে বনী তামীম।

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩৮/৭।

[৩] আল-আহাদ ওয়াল মাসানী লি-ইবনে আবি আসিম, হা: ১১৯৯।

- ফায়দা: সা’সা’আ বিন নাজিয়াহ (রা.) বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের দাদা ছিলেন।
- ফায়দা: কোনো মুসলিম কুফর অবস্থায় থাকাকালীন যেসব নেক কাজ করেছে তার সওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববী বলেন যে, তারা এর সওয়াব পাবে, যেমনটি সা’সা’আ বিন নাজিয়াহ (রা.)-এর উল্লেখিত বর্ণনায় রয়েছে। এছাড়া সহীহ মুসলিমে হাকীম বিন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে: “তুমি ইতিপূর্বে যে নেক কাজ করেছ তার ওপরই ইসলাম গ্রহণ করেছ” (হা: ৩২৮), যা এর সমর্থন করে। কোনো কোনো আলেমের মতে নেক কাজের সওয়াব বলতে দুনিয়াবী প্রতিদান বোঝানো হয়েছে, আবার কোনো কোনো আলেম বলেন যে, ঐসব নেক কাজের বরকতে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক লাভ হয়। (শরহুন নববী আলা মুসলিম: ১৩০/২ এবং নাইলুল আওতার: ১১/৭)।

**আদী বিন হাতিমের ইসলাম গ্রহণ:**

এই বছর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আরবের বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ-এর গোত্র বনু তয়-এর এলাকায় জিহাদের জন্য গেলেন। এই লোকেরা রুকুসি সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান ছিল যাদের কিছু আকিদা সাবীয়দের সাথে মিল ছিল। [১] তারা 'ফুলস' নামক একটি মূর্তির পূজা করত যা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ভেঙে ফেলেন এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যে অনেককে বন্দী করে মদিনা মুনাওয়ারায় নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে হাতেম তাঈ-এর কন্যা 'সাফানা'-ও ছিলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পোশাক, সওয়ারি এবং সফরের খরচ দিয়ে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মুক্ত করে দিলেন। তিনি যখন নিজের এলাকায় ফিরে এলেন, তখন তার ভাই আদী বিন হাতিমের সাথে দেখা করলেন যিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আক্রমণের সময় পালিয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি বোনের মুখে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চ চরিত্রের সাক্ষ্য শুনলেন, তখন সরাসরি মদিনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর তার প্রথম দৃষ্টি তখন পড়ল যখন তিনি মদিনার একটি গলিতে দাঁড়িয়ে কোনো এক বৃদ্ধার আবেদন শুনছিলেন। বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ধরে তার কথা বলতে থাকলেন এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে থাকলেন। আদী বিন হাতিম এটি দেখে মনে মনে বললেন: "এই ব্যক্তি কেবল কোনো রাজা নন।" [২]

যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে পৌঁছালেন, তখন শোরগোল উঠল: "আদী বিন হাতিম এসে গেছেন।"

আপনি তাকে দেখে বললেন: "আদী, ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তিতে থাকবে।"

তিনি বললেন: "আমি তো আগে থেকেই একটি দ্বীনের অনুসারী।"

আপনি বললেন: "আমি তোমার দ্বীন সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশি জানি।"

তিনি অবাক হয়ে বললেন: "তা কীভাবে?" বললেন: "তুমি কি রুকুসি সম্প্রদায়ের নও?"

বললেন: "জি হ্যাঁ!"

আপনি বললেন: "তুমি কি কওমের কাছ থেকে মালের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করো না?"

বললেন: "জি হ্যাঁ।"

আপনি বললেন: "কিন্তু এটি তো তোমার দ্বীনে জায়েজ নয়!!" বললেন: "জি হ্যাঁ।"

আপনি বললেন: "আদী! তুমি কেন পালিয়েছিলে? এই জন্য কি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে হবে? তবে বলো, আল্লাহ ছাড়া কি আর কেউ ইবাদতের যোগ্য আছে? তুমি কি এই জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছ যে আল্লাহু আকবার বলতে হবে? তুমি নিজেই বলো, আল্লাহর চেয়ে বড় কি কেউ আছে?"

তারপর বললেন: "আদী, আমি জানি তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধা করছ, কেবল এই জন্য যে এই দ্বীনের অনুসারীরা দুর্বল লোক। শোনো আদী! তুমি কি হীরা সম্পর্কে জানো?" বললেন: "নামই শুনেছি, দেখিনি।"

বললেন: "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে একজন মুসাফির নারী হীরা থেকে যাত্রা করে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে এবং তার কারো নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে না।"

আদী বিন হাতিমের মনে এমন প্রভাব পড়ল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার দাওয়াতে তার কওমও মুসলমান হয়ে গেল। [৩]

---

[১] সাবীয়দের আলোচনা "আরবদের ধর্মীয় অবস্থা" শিরোনামের অধীনে আগে অতিক্রান্ত হয়েছে।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/১৫১ [৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২১৩ থেকে ২১৬; মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, হা: ১১৩৫

**আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু:**

যিলকদ ৯ হিজরিতে ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু এবং মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিশ দিন অসুস্থ থাকার পর মারা যায়। তার শেষ ইচ্ছা ছিল যে, হুজুর আকদাস ﷺ তাকে নিজের জামা দিয়ে কাফন দেন, তার জানাজার নামাজ পড়ান এবং মাগফিরাতের দোয়া করেন। তার ছেলে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুরও একই আবেদন ছিল, আপনি ﷺ ছেলের সম্মান রক্ষার্থে তেমনই করলেন। কিন্তু যখন আপনি দাফন এবং মাগফিরাতের দোয়া থেকে অবসর হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা আত-তাওবাহর আয়াতসমূহ নাজিল হলো যাতে এমন মুনাফিকদের জানাজার নামাজ পড়ানো এবং তাদের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। [১]

**গোত্রসমূহের ক্রমাগত আগমন:**

এখন ইসলাম গ্রহণকারী গোত্রসমূহের একটি অবিরাম ধারা শুরু হয়েছিল। প্রতিদিন কোনো না কোনো গোত্রের প্রতিনিধি দল মসজিদে নববীতে উপস্থিত হতো, ইসলাম গ্রহণ করত এবং দ্বীনের বিধানসমূহ শিখত। এজন্য এই বছরকে 'আমুল উফুদ' বলা হয়। বনু আসাদ, বনু ফাজারা, বনু মুররাহ, বনু কিলাব, বনু বুকা, বনু কিনানাহ, বনু সুলাইম, বনু হিলাল বিন আমির, বনু বকর বিন ওয়াইল এবং আজদ-এর মতো বিখ্যাত গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করল। ইয়েমেন, ওমান এবং বাহরাইন থেকে কাফেলাসমূহ এল। ইয়েমেনের মুলুকে হিমইয়ারের প্রতিনিধি দলও এল। ওয়াইল বিন হুজর, জারির বিন আবদুল্লাহ, আশআস বিন কায়েস এবং তামিম দারি রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই দিনগুলোতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বনু সাদ বিন বকরের সর্দার যিমাম বিন সালাবাও উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন এবং তারপর নিজের কওমের কাছে গিয়ে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাবলিগ করেন যে, একদিনেই পুরো গোত্র কালিমা পড়ে নিল। [২]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২১৮, ২১৯

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/১৫৫, ৯ হিজরির অধীনে

হাফেজ ইবনে কাসির একশ'রও বেশি পৃষ্ঠায় এই প্রতিনিধি দলগুলোর আগমনের কথা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/২৩২ থেকে ৩৬৪)

## হজ্জের ফরযিয়াত এবং প্রথম হজ্জ (৯ হিজরী)

প্রতিনিধিদের আগমনের ধারা অব্যাহত ছিল এমতাবস্থায় হজ্জের মৌসুম এসে গেল, হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়ে গিয়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ ৯ হিজরীর যিলকদ মাসে আবু বকর সিদ্দিক-কে আমীর বানিয়ে তিনশ হাজীর একটি কাফেলা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। সাহাবীদের অধিকাংশ হজ্জে শরীক হননি; কারণ রাসূলুল্লাহ তাশরীফ নিচ্ছিলেন না। আসলে এখন পর্যন্ত হজ্জে মুশরিকদের অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞার কোনো হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়নি এবং এই বছর মুশরিকরা প্রথা অনুযায়ী হজ্জে শরীক ছিল। তাদের অর্থহীন রীতিনীতি বিশেষ করে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা রাসূলুল্লাহ-এর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। [১]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল যে মুশরিকদের এই রীতিনীতিগুলো শীঘ্রই বন্ধ করে দেওয়া হবে। সুতরাং আবু বকর সিদ্দিক-এর রওয়ানা হওয়ার পর সূরা আত-তাওবাহ-এর আয়াতসমূহ নাযিল হলো, যার শুরুটা ছিল এইরকম:

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا o بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ o أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ o

(আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকার করেছিলে। সুতরাং হে মুশরিকরা! তোমরা যমীনে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারবে না, বরং আল্লাহই কাফেরদের লাঞ্ছিতকারী। আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত। অতঃপর যদি তোমরা তওবা করো তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।) [২]

এই আয়াতসমূহে সামনে এই নির্দেশও ছিল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا o

(হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন এই বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।) [৩]

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসীর: ৩/ ১০৩, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩

[২] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১-৩। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী মরহুম এই আয়াতসমূহের তাফসীরের অধীনে লিখেছেন: “মিনাল মুশরিকীন” দ্বারা বর্ণনায় ঐ সকল মুশরিক উদ্দেশ্য যারা অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। (তাফসীর মাজেদী, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১)

[৩] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮

নবী আকরাম ﷺ অবিলম্বে হযরত আলী (রা.)-কে সূরা আত-তাওবার এই আয়াতসমূহ এবং সেই অনুযায়ী এই ঘোষণা দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন: "আজকের পর কোনো মুশরিককে হজ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনো ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। যেসব গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি ছিল, তা তাদের মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। বাকি লোকদের কেবল চার মাসের অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। এরপর তাদের সাথে আর কোনো চুক্তি থাকবে না।" [১]

হজ-এ আকবর সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক আলোচনা: সীরাত লেখকদের ঐক্যের ভিত্তিতে এটি ৯ হিজরী (জিলহজ) মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ঈসায়ী সাল অনুযায়ী এর তারিখ সেপ্টেম্বর ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু মরহুম মাওলানা হানিফ নদভী সাহেবের মতে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর এই হজ গাজওয়ায়ে তাবুকের আগে সংঘটিত হয়েছিল। (আল-ফাউজুল মাওসুল, নম্বর: ১, পৃ: ১২)

তাঁর এই দাবির একটি দলিল হলো, সূরা আত-তাওবায় গাজওয়ায়ে তাবুকের পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। যেহেতু গাজওয়ায়ে তাবুক এই সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই সূরা আত-তাওবার যে আয়াতগুলো সিদ্দীক-এ আকবর (রা.)-কে দিয়ে পড়ানো হয়েছিল, তা এর আগেই নাযিল হয়েছিল। তবে মাওলানা মরহুমের এই দলিল তখন শক্তিশালী হতে পারে যদি এটি মেনে নেওয়া হয় যে, কুরআন মজিদ ঠিক সেই ক্রমেই নাযিল হয়েছে যে ক্রমে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ চার মাস যে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তা সূরা আত-তাওবার সেই সূরাগুলোর মধ্যে রয়েছে যা সম্পূর্ণ একসাথে নাযিল হয়েছে।

এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, কুরআন মজিদের বর্তমান বিন্যাস (মুসহাফের বিন্যাস) নাযিলের বিন্যাস থেকে ভিন্ন। নাযিলের দিক থেকে পরবর্তী আয়াত ও সূরাগুলো লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী এবং অগ্রবর্তী সূরাগুলো লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পরবর্তী হতে পারে। এমনকি একই সূরার কিছু অংশ নাযিলের ক্ষেত্রে কয়েক বছরের ব্যবধানও হয়ে থাকত এবং এর মাঝে অনেক সূরা নাযিল হয়ে যেত। যেমন সূরা আল-মায়িদাহর এই আয়াত: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম", যা বিদায় হজের সময় নাযিল হয়েছিল। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৬০৮)। অথচ এই সূরার অনেক আয়াত এর কয়েক বছর আগে গাজওয়ায়ে মুরাইসি-এর সময় নাযিল হয়েছিল। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৩৫)।

হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে: "যখন কোনো কিছু নাযিল হতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী লেখকদের ডেকে বলতেন: এই আয়াতগুলো অমুক সূরায় রাখো যেখানে অমুক অমুক বিষয় উল্লেখ আছে। আর যখন কোনো আয়াত নাযিল হতো, তখন তিনি বলতেন: এই আয়াতটি অমুক সূরায় রাখো যেখানে অমুক অমুক বিষয় উল্লেখ আছে।" (সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩০৮৬, আবওয়াব তাফসীরুল কুরআন, বাবু সূরাতুত তাওবাহ; সুনান আবু দাউদ, হা: ৭৮৬, কিতাবুস সালাত; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃ: ৩৯৯)।

বড় সূরাগুলোর মধ্যে এমন কিছু সূরা রয়েছে যা ৩০ পারার মধ্যে রয়েছে এবং সেগুলো একসাথে নাযিল হয়েছে। অন্যথায় সাধারণত বড় সূরাগুলো খণ্ড খণ্ড আকারে নাযিল হতো। এটিও মাথায় রাখা উচিত যে, এগুলো কোনো বই আকারে ধারাবাহিকভাবে লেখা হতো না, বরং প্রতিটি নাযিল হওয়া অংশ আলাদা আলাদা চামড়া বা কাগজের টুকরোয় লিখে রাখা হতো যা যুদ্ধের পর এই টুকরোগুলোকে একটি ফোল্ডারের মতো করে ক্রমানুসারে সহজে একত্রিত করা যেত। সূরা আত-তাওবাও এমন সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা খণ্ড খণ্ড আকারে নাযিল হয়েছিল, যার প্রমাণ হলো এটি একইভাবে আলাদা আলাদা টুকরোয় লেখা ছিল। যায়েদ বিন সাবিত (রা.) জামউল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সময় নিজের কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, সূরা আত-তাওবার শেষ দুই আয়াত (যা সম্ভবত একসাথে নাযিল হয়েছিল) তিনি আবু খুজাইমা (রা.)-এর কাছে লিখিত অবস্থায় পেয়েছিলেন। (সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৯৮৬, কিতাব ফাযাইলুল কুরআন)।

সুতরাং সম্ভব যে, গাজওয়ায়ে তাবুক সংক্রান্ত আয়াতগুলো মুসহাফে শুরুতে থাকলেও নাযিলের দিক থেকে প্রাথমিক আয়াতগুলোর পরে নাযিল হয়েছে। তবে নাযিলের সময় সেগুলোকে কোন সূরার সাথে রাখা হবে তা হযরত উসমান (রা.)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সূরা আল-আনফাল এবং সূরা আত-তাওবার মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ছিল না এবং সেই সময় উভয় সূরাকে একটিই সূরা মনে করা হতো। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, যখন গাজওয়ায়ে তাবুক সম্পর্কে আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন সেগুলোকে সূরা আত-তাওবার সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) বলেন: "আল-আনফাল মদীনায় নাযিল হওয়া প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সূরা আত-তাওবা কুরআনের শেষ দিকে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এগুলোর কাহিনী একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় এগুলোকে একসাথে রাখা হয়েছে।" (সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩০৮৬, আবওয়াব তাফসীরুল কুরআন, বাবু সূরাতুত তাওবাহ; সুনান আবু দাউদ, হা: ৭৮৬, কিতাবুস সালাত)।

যাই হোক, মাওলানা মরহুম যখন এই মত পোষণ করেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হজ গাজওয়ায়ে তাবুকের আগে হয়েছে, তখন তিনি এই বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হয়েছেন যে, ৯ হিজরী মাদানী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গাজওয়ায়ে তাবুকের শীতকালে হওয়া আবশ্যক। অথচ প্রাচীন সীরাত লেখকদের বর্ণনায় এটি স্পষ্ট যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর হজের নেতৃত্ব এবং গাজওয়ায়ে তাবুক মাদানী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইবনে আবি নাজীহ (যিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই কালচক্র আজ সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে যে অবস্থায় আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছিলেন।" কালচক্রের এই আবর্তনের কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর হজ কোন মাসে হয়েছিল? তারা উত্তরে বললেন: "যুলহজ মাসে যেমন মানুষ হজ করে থাকে।" (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ১০০)।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ৯ হিজরী জাহেলিয়াতের ক্যালেন্ডার অনুযায়ীও মুশরিকদের জন্য শরীক ছিল, যদিও এটি তাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মুশরিকদের হজের খেলাফ ছিল না। যখন আমরা এই হজকে কোনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মানি, তখন তা গাজওয়ায়ে তাবুকের আগে নয় বরং তার পরে পড়ে। অর্থাৎ গাজওয়ায়ে তাবুক এপ্রিল থেকে জুন ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর হজ তিন মাস পর সেপ্টেম্বর ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে (৯ হিজরী) আরাফাতের দিন ১২ সেপ্টেম্বর ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের ৯ মাস আগের ঘটনা। সুতরাং গাজওয়ায়ে তাবুকের আগে হওয়ার জন্য সীরাত লেখকদের স্পষ্ট বর্ণনার বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃ: ৭৯; হাসান সনদে। এবং এটি বুখারী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন (সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৬৯১; হা: ৪৬৫৭)।

এই ঘোষণাটি ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে সমগ্র আরব থেকে আগত হাজীদের শোনানো হয়েছিল, যাদের মধ্যে মুসলিম ও মুশরিক উভয়ই ছিল। হযরত আলী [রা.] এবং হযরত আবু হুরায়রা [রা.] সহ আরও বেশ কয়েকজন সাহাবী হাজীদের বিভিন্ন দল ও সমাবেশে ঘুরে ঘুরে এই ঘোষণাটি শোনান। হযরত আলী [রা.] বলেন যে, আমি এত উচ্চস্বরে চিৎকার করেছিলাম যে আমার কণ্ঠস্বর বসে গিয়েছিল। [১]

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বাইতুল্লাহ এবং হারাম পাকের সাথে সংশ্লিষ্ট মুশরিকী প্রথা ও রীতিনীতি, যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল, তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুরআন মজিদ এই হজ্জকে 'হজ্জে আকবর' নাম দিয়েছে। শত শত বছর পর এই মহান ইবাদতে এমন সব লোক শামিল হলো যাদের আকিদা কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইব্রাহিম [আ.]-এর আকিদা অনুযায়ী ছিল এবং দীর্ঘ সময় পর হারাম ও হজ্জের কার্যাবলী তার আসল ও পবিত্র রূপ ফিরে পেয়েছিল। [২]

**নাজরানের পাদ্রীদের সাথে মুনাজারা (বিতর্ক):**

১০ হিজরিতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ [রা.] রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর নির্দেশ অনুযায়ী নাজরান অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান চালান। এখানে খ্রিস্টান বসতি ছিল। হযরত খালিদ [রা.] তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। এর প্রতিক্রিয়ায় নাজরানের পাদ্রীদের একটি

# প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে এবং রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর সাথে ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হয়।

---

(গত পৃষ্ঠার পাদটিকার অবশিষ্টাংশ)

... নিঃসন্দেহে একটি বর্ণনায় যেমন ইমাম বুখারী নকল করেছেন, বারা বিন আযিব [রা.] থেকে বর্ণিত আছে: "সর্বশেষ যে সূরাটি নাযিল হয়েছে তা হলো সূরা বারাআত (আত-তাওবাহ)" (সহীহ বুখারী, খণ্ড ৩, হাদীস ৪৩৬৪)। কিন্তু ইমাম বুখারী নিজেই অন্য স্থানে এই বর্ণনাটি 'কামেলা' (পূর্ণাঙ্গ) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করেছেন। এটি সেই বর্ণনাকে স্পষ্ট করে যে সূরা আত-তাওবাহ একবারে নাযিল হয়নি, বরং এর নাযিল হওয়া অব্যাহত ছিল। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রা.] বলেন: "আত-তাওবাহ হলো আল-ফাদিহাহ (উন্মোচনকারী), এটি 'তাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে' নাযিল হতে থাকে যতক্ষণ না তারা মনে করল যে তাদের মধ্যে কেউ অনুল্লিখিত থাকবে না।" (সহীহ বুখারী, খণ্ড ৩, হাদীস ৪৮৮২, কিতাবুত তাফসীর; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৩৪)। তাই বারা বিন আযিব [রা.] থেকে বর্ণিত 'কামেলা' শব্দের বর্ণনাকারী দুর্বল অথবা এই শব্দটি প্রক্ষিপ্ত। 'কামেলা' শব্দটি কিছুই নয়... কারণ বারা [রা.] বলেছেন 'নাযালাত শাইয়ান বা'দা শাই' (এটি অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে), আমি বলি: এবং এই কারণেই তাফসীরের এই হাদীসে 'কামেলা' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি এবং শব্দগুলো হলো: "আখিরু সূরাতিন নাযালাত বারাআহ" (উমদাতুল কারী: ১৮/১৮)।

বর্তমান পৃষ্ঠার পাদটিকা:

[১] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৯, হাসান সনদসহ।

[২] এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, হজ্জে আকবর কোনো আলাদা বিশেষ হজ্জ নয় যেমনটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ, বরং হজ্জে আসগর (উমরাহ)-এর তুলনায় একে হজ্জে আকবর বলা হয়। (সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৭, "আবু হুরায়রার হাদীস অনুযায়ী নহরের দিনই হলো হজ্জে আকবরের দিন" (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৫৭)। মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী [রহ.] লিখেছেন: হজ্জে আকবরের দিন মানে হজ্জের দিন। কোনো বিশেষ ধরনের হজ্জ উদ্দেশ্য নয়। 'Akbar' শব্দটি 'Asghar' থেকে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা হলো উমরাহ। এই কারণে উমরাহকে হজ্জে আসগর বলা হয়। (খবর বিলাল মুজাহিদ: আল-হজ্জুল আকবর আল-কুরআন ওয়াল হজ্জুল আসগর আল-উমরাহ। (ইবনুল আরাবী)। কাজী বলেন: "যদি আমরা এই উক্তিগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তবে অগ্রগণ্য মত হলো হজ্জে আকবর হলো হজ্জ যেমনটি মুজাহিদ (ইবনুল আরাবী) এবং ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্যরা বলেছেন।" (তাফসীরে মাজিদী, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ৩)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং তার উত্তর: মুসলমানদের জাহেলী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হজ্জ করার প্রশ্নটি কীভাবে সমাধান হবে? উত্তর হলো, সেই সময় ওই ক্যালেন্ডারই প্রচলিত ছিল। যেমন মুসলমানরা দীর্ঘ সময় ধরে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন এবং সেগুলো বৈধ ছিল, তেমনি বিদায় হজ্জ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ [সা.] আল্লাহর জ্ঞানের ১২ মাসের ওপর ভিত্তি করে নতুন ক্যালেন্ডারকে চূড়ান্ত ঘোষণা না করা পর্যন্ত এই পুরনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হজ্জ পালিত হতো। যখন এই ক্যালেন্ডারকে আল্লাহ বাতিল ঘোষণা করলেন, তারপর থেকে সমস্ত ইসলামী বিষয় অর্থাৎ হিজরী চান্দ্র বর্ষপঞ্জি সে অনুযায়ী কার্যকর হতে শুরু করে এবং বিদায় হজ্জ এভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল।

তর্কে পরাজিত হওয়ার পর পাদ্রিরা মুবাহালার আহ্বান জানায়, অর্থাৎ উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে যে, যে মিথ্যাবাদী তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। নবী করীম (সা.) এর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আহলে বাইতের মধ্য থেকে সমস্ত উম্মাহাতুল মুমিনীন তো এই মুবাহালায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেনই, কিন্তু আপনি আরও গুরুত্ব প্রদানের জন্য নিজের সন্তানদেরও ডেকে নিলেন। যেহেতু সেই সময় পর্যন্ত নবী করীম (সা.)-এর কন্যাগণ: হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়্যাহ এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ইন্তেকাল করেছিলেন, তাই কেবল হযরত ফাতিমা (রা.) উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। হযরত আলী (রা.) জামাতা হওয়ার সুবাদে আপনার পুত্রদের মতোই ছিলেন, তিনিও এবং তাঁদের সাথে নবী করীম (সা.)-এর দুই নাতি হাসান ও হুসাইন (রা.)-ও চলে এলেন। [১]

এখনও মুবাহালা শুরু হয়নি, ঠিক সেই মুহূর্তে পাদ্রিদের সাহস হারিয়ে গেল এবং তাদের বিবেক সাক্ষ্য দিল যে, নবী করীম (সা.)-এর বদদোয়া বৃথা যাবে না।

তারা নিজেদের মধ্যে বলল: “যদি তিনি সত্যিই নবী হন, তবে আমরা কখনোই সফল হব না এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও নয়।”

তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং অনুরোধ করল যে, (আমাদের বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য) কোনো আমানতদার ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

নবী করীম (সা.) হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। [২]

**যাকাত আদায়কারী নিয়োগ:**

নবী করীম (সা.) এই বছর আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের আমীর এবং যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। অনেক সাহাবীকে এই কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে মারিব-এ, আমর বিন হাযম (রা.)-কে নাজরানে, যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারী (রা.)-কে হাদরামাউতে এবং ইয়ালা বিন উমাইয়্যাহ (রা.)-কে জানাদে পাঠানো হয়। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনের লোকদের দ্বীনি শিক্ষা ও দিকনির্দেশনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। হযরত আলী (রা.)-কেও ইয়ামেনে কর আদায়ের কাজে পাঠানো হয়েছিল। [৩]

**আরও প্রতিনিধিদলের আগমন:**

এই বছর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে বনু যুবাইদ-এর প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছিল, যার আমীর ছিলেন আমর বিন মাদী কারিব। আশআস বিন কায়েস বনু কিনদাহ-র আশি জন আরোহীর সাথে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহারিব, বনু আবস এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদলও আসে এবং ঈমানের দৌলতে ধন্য হয়। [৪]

**কিছু দুর্ভাগা লোক:**

কিছু দুর্ভাগা এমনও ছিল যারা বঞ্চিতই রয়ে গেল। বনু হানিফার মুসাইলামা একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে নবী করীম (সা.)-এর কাছে এল...

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/১৫৮, ১৫৯, ১০ হিজরির অধীনে।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪৩৮০, কিতাবুল মাগাযী, বাব কিসসা আহলে নাজরান।

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/১২৫, ১২৬, ১০ হিজরির অধীনে।

[৪] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/১৬২ থেকে ১৬৪, ১০ হিজরির অধীনে।

কিন্তু যার অন্তর অবাধ্যতা ও অহংকারে পরিপূর্ণ ছিল, তাতে ঈমান প্রবেশ করতে পারেনি। সে এই প্রস্তাব পেশ করল যে, আমরা আপনার নবুওয়াতের বিরোধিতা করব না এই শর্তে যে, আপনি আপনার পরে নবুওয়াত আমাদের নামে লিখে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে তখন একটি লাঠি ছিল। এই অযৌক্তিক দাবিতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন: “যদি তুমি আমার কাছে এই লাঠিটিও চাও, তবে আমি তোমাকে তা দেব না।”

তারপর দরবারে রিসালাতের খতীব সাবিত বিন কায়েস (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো যেন তিনি এই হতভাগাকে বিস্তারিত ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। [১]

সেই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর উভয় হাতে দুটি সোনার কঙ্কণ রয়েছে যা তাঁর কাছে অপছন্দনীয় মনে হচ্ছিল। তিনি সেগুলোতে ফুঁ দিলেন এবং সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা এই নিলেন যে, নবুওয়াতের দুইজন মিথ্যা দাবিদার আত্মপ্রকাশ করবে। আর তা-ই হলো। [২]

তাদের একজন ছিল আসওয়াদ আনসী, যে সেই বছরই ইয়ামেনে নবুওয়াতের দাবি করেছিল। অনেক মানুষ তার খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অগ্নিপূজকরা ছিল অগ্রগণ্য। দ্বিতীয়জন ছিল মুসাইলামা কাযযাব, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্ব্যর্থহীন জবাবে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল এবং কিছুকাল পর সে-ও ইয়ামামায় নবুওয়াতের দাবি করে হাজার হাজার মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল, যাদের অধিকাংশ ছিল তার গোত্র বনী হানিফার। [৩]

আমের বিন তুফাইলও, যে বনী আমেরের প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে কেবল ইসলাম গ্রহণ করা থেকেই বিরত থাকেনি বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই হুমকি দিয়ে গেল যে, আমি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন:

“হে আল্লাহ! বনী আমেরকে হেদায়েত দান করুন এবং মুসলমানদেরকে আমের বিন তুফাইল থেকে মুক্তি দিন।”

আমের বিন তুফাইল দ্রুতই তার ধৃষ্টতার শাস্তি পেয়ে গেল। সে মদীনা থেকে ফিরে যাচ্ছিল, পথিমধ্যে তার শরীরে প্লেগের এমন এক বড় টিউমার (গ্ল্যান্ড) দেখা দিল যেমনটি উটের হয়ে থাকে। সে বাধ্য হয়ে পথে বনী সালুলের এক মহিলার ঘরে অবস্থান নিল। আরবের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা এই হতভাগা আক্ষেপ ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলতে লাগল: “উটের মতো টিউমার! আর সালুলী মহিলার ঘর!”

অবশেষে নিজ দেশে গিয়ে মরার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে বের হলো, কিন্তু শীঘ্রই ঘোড়ার পিঠেই তার প্রাণবায়ু নির্গত হলো। [৪]

□□□

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৩, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কিসসাতিল আসওয়াদ আল-আনসী।

[২] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩, কিতাবুল মাগাযী।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/১৬৩, ১২৩, ১০ হিজরীর অধীনে... আসওয়াদ আনসীকে একজন ইয়ামেনী সাহাবী ফিরোজ দাইলামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ দিনগুলোতে হত্যা করেন। মুসাইলামার দমন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে খুলাফায়ে রাশেদীনের আলোচনায় আসবে।

[৪] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৩১; সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতি বি’রে মাউনা ওয়া যু’আল ওয়া যাকওয়ান; তারিখুল মদীনা লি-ইবনে শাব্বাহ: ২/৫২০; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/১৬৩, ১০ হিজরীর অধীনে।

স্পষ্ট থাকে যে, এই আমের বিন তুফাইল সেই হতভাগা ছিল যে বি’রে মাউনার ৭০ জন ক্বারী সাহাবীকে শহীদ করেছিল। তার সমনামীয় আমের বিন তুফাইল বিন আল-হারিস আল-আযদি একজন ভিন্ন ব্যক্তি, যিনি সাহাবী ছিলেন এবং তিনি সিদ্দীকী যুগে ইরতিদাদের ফিতনার সময় নিজ কওমকে ইসলামের ওপর অটল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। (আল-ইসতিয়াব: ২/৭৯২, ত: দারুল জীল)

**তারিখে উম্মতে মুসলিমা**

## বিদায় হজ ..... (১০ হিজরি)

হিজরতের দশম বছর শেষ হতে চলেছিল। ইসলাম আরবের মরুভূমি ছাড়িয়ে পারস্য ও রোমের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনার মাধ্যমে আল্লাহর শেষ দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছিল। দ্বীনের প্রতিটি দিক রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল তাঁর বাণীর মাধ্যমেই নয় বরং কর্মের মাধ্যমেও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন; তবে একটি ফরয আদায় করা বাকি ছিল আর তা হলো হজ্জের ফরয, যা ছিল মুসলমানদের ঐক্য ও উম্মতের সংহতির বহিঃপ্রকাশ।

মক্কা বিজয়ের তিন মাস পর আত্তাব বিন আসীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রথম হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর তার এক বছর পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় হজ্জ আদায় করা হয়েছিল। এভাবে মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সোয়া এক বছর পর্যন্ত মুশরিকরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে শরিক হতো এবং তাদের পঞ্জিকা অনুযায়ী তা চলত। মুশরিকদের অংশগ্রহণের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন পর্যন্ত নিজে হজ্জ করেননি, কারণ হজ্জের ইসলামী বিধানের শিক্ষা দেওয়া তখনও বাকি ছিল।

তবে এখন হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেওয়া অবকাশের সময়ও পার হয়ে গিয়েছিল। ফলে এই শেষ ফরযটি আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) ১০ হিজরির যিলকদ মাসে হজ্জের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন হজ্জ আদায়ের সাথে সাথে মানুষকে হজ্জের নিয়মকানুন শেখাতে, খোদায়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতে, সমস্ত কুফরি প্রথা ও জাহেলি অহংকার মিটিয়ে দিতে এবং নারী, দাস ও অবহেলিত শ্রেণির অধিকার সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষা প্রদান করতে। শত শত বছর পর এটিই ছিল প্রথম হজ্জ যা সঠিক প্রাকৃতিক সময়ে আদায় করা হচ্ছিল [১]।

রহমতে আলম (সা.) যখন হজ্জের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল এবং এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য মুসলমানরা পতঙ্গের মতো ছুটে আসতে লাগল। ২৫শে যিলকদ জুমার দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে সফর এবং হজ্জের নিয়মকানুন সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেন। পরের দিন রহমতে আলম (সা.) মদিনা থেকে কিছু দূরে যুল-হুলাইফা নামক স্থানে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন এবং এক বিশাল কাফেলার সাথে ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ ধ্বনি দিতে দিতে মক্কা মুকাররমার দিকে রওনা হন। সফরসঙ্গীদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। উম্মাহাতুল মুমিনীনগণও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। এই সফর কেবল একটি মহান ইবাদত আদায়ের জন্য ছিল না, বরং উম্মতকে হজ্জের নিয়মকানুনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমও ছিল। এর ফলে অসংখ্য মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যিয়ারত ও সাহচর্যের সুযোগও তৈরি হয়েছিল যারা সেই দিনগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

---

[১] সিদ্দিক আকবর (রা.)-এর হজ্জ সেপ্টেম্বর ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল যা ছিল চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকার শেষ সময়, এর ঠিক পাঁচ মাস পর বিদায় হজ্জের প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছিল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

আট দিনের সফরের পর ৪ জিলহজ রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন। বাইতুল্লাহর ওপর দৃষ্টি পড়তেই দুআ করলেন:

“হে আল্লাহ! আপনার এই ঘরের ইজ্জত, আজমত, বুজুর্গি এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন।”

রহমতে আলম ﷺ হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করার পর তাওয়াফ শুরু করলেন, এরপর সাঈর জন্য সাফা পাহাড়ে গমন করলেন এবং দুআ করলেন:

“আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।”

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাঈর আমল করে উমরা সম্পন্ন করলেন। [১]

শুক্রবার, ৯ জিলহজ হুজুর আকদাস ﷺ হজের রুকনে আজম উকুফে আরাফা আদায় করলেন এবং এই সময়ে আরাফাতের ময়দানে প্রায় এক লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের বিশাল সমাবেশের সামনে একটি ঐতিহাসিক খুতবা প্রদান করলেন যাতে পারস্পরিক লেনদেন, উত্তম চরিত্র, হাক্কুল ইবাদ এবং ইসলামী রাজনীতির বিষয়ে উম্মতে মুসলিমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত ছিল। এটি ছিল আল্লাহর শেষ রাসূল এবং মহাবিশ্বের সবচেয়ে মনোনীত নেতার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য একটি ওসিয়তনামা, যার প্রতিটি বাক্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবির মূলনীতি নিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন:

“হে লোকসকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, সম্ভবত এরপর তোমাদের সাথে এভাবে আর সাক্ষাৎ হবে না। লোকসকল! তোমাদের জান, তোমাদের মাল এবং তোমাদের ইজ্জত একে অপরের জন্য তেমনি সম্মানীয় যেমন এই দিন এবং এই মাস সম্মানীয়। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবের সামনে উপস্থিত হবে এবং তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

লোকসকল! শয়তান এই বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে তোমাদের এই জমিনে কখনো তার ইবাদত করা হবে, কিন্তু সে এতেই সন্তুষ্ট যে তোমরা ছোটখাটো বিষয়ে তার অনুসরণ করতে থাকবে, সুতরাং তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে শয়তানের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকো। আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: একটি আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদ এবং দ্বিতীয়টি আমার সুন্নাহ।

লোকসকল! তোমাদের নারীদের ওপর তোমাদের হক রয়েছে। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিঃসন্দেহে তারা তোমাদের অধীনস্থ। তোমরা তাদের আল্লাহর নামে নিজেদের জন্য হালাল করেছ।”

---

[১] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৬৫ থেকে ৩৬৮, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

হে লোকসকল! মনে রেখো, প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান আপসে ভাই ভাই। কারো জন্য তার ভাইয়ের সম্পদের কোনো কিছু তার অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। [১]

লোকদের ঐক্য, সংহতি এবং নিজেদের নেতার আনুগত্যের উপদেশ দিয়ে হুজুর ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বললেন: “যদি কোনো নাক-কাটা, কালো বর্ণের ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় যে তোমাদের আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তোমরা তার কথা শুনতে ও মানতে থাকবে।” [২]

হুজুর ﷺ আকিদাহ বিশুদ্ধ রাখা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ওপর জোর দিয়ে ইরশাদ করলেন: “আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। মানব প্রাণ যাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, কখনো হত্যা করো না, তবে এমন ক্ষেত্র ব্যতীত যেখানে শরিয়ত প্রাণ নেওয়ার অধিকার দিয়েছে। জিনা করো না, চুরি করো না।” [৩]

আন-হযরত ﷺ উম্মতকে বিভেদ ও গৃহযুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে ইরশাদ করলেন: “দেখো, আমার পর তোমরা যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না যে একে অপরের ঘাড় কাটতে শুরু করো।” [৪]

খুতবার শেষে খাতামুন নাবিয়্যীন ﷺ উপস্থিতদের তাকিদ দিয়ে বললেন: “যারা উপস্থিত আছো, তারা যেন এই কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেয় যারা এখানে নেই। অনেক সময় সরাসরি শ্রবণকারীর তুলনায় সেই ব্যক্তি কথাটি বেশি স্মরণ রাখে যার কাছে কোনো মাধ্যমে কথাটি পৌঁছেছে।” [৫]

নিজের কথা শেষ করে নবী আখিরুয যামান ﷺ পুরো উম্মতের এই প্রতিনিধি সমাবেশের কাছে জানতে চাইলেন: “কিয়ামতের দিন তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বলো, তোমরা কী জবাব দেবে?”

জনতা একস্বরে বলল: “আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি আপনার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণকামিতার হক আদায় করে দিয়েছেন।”

হুজুর আকরাম ﷺ নিজের পবিত্র আঙুল আসমানের দিকে উত্তোলন করলেন এবং আরজ করলেন: “হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।” [৬]

এরপর আপনি ﷺ জোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অত্যন্ত কান্নাকাটির সাথে দোয়া করতে থাকলেন। [৭]

---

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৪০২, ৪০৩

[২] সহিহ মুসলিম, হা: ৩১৯৮, কিতাবুল হজ, বাব ইস্তিহবাব রাময়ি জামরাতিল আকাবাহ; হা: ৩৮৬১, ৩৮৬২, কিতাবুল ইমারাহ, বাব উজুবু তায়াতিল উমারা, ত. দারুল জিল

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৮৯৯০ সহিহ সনদে

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২০৩৬ সহিহ সনদে

[৫] সহিহ বুখারি, হা: ৬৭, কিতাবুল ইলম, বাব কওলুন নবী ﷺ: রুব্বা মুবাল্লাগিন আওআ মিন সামিয়িন; হা: ১০৫, বাব লি-ইউবাল্লিগাল ইলমাশ শাহিদুল গায়িব

[৬] সহিহ মুসলিম, হা: ৩০০৯, কিতাবুল হজ, বাব হাজ্জাতুন নবী ﷺ সিরাতে ইবনে হিব্বান: ১/৩৯৬

[৭] সহিহ মুসলিম, হা: ৩০০৯; সিরাতে ইবনে হিব্বান: ১/৩৯৭

নবী আখিরুজ্জামান ﷺ বলছিলেন:

“হে আল্লাহ! আমি একজন বিপদগ্রস্ত অভাবী, ফরিয়াদী ও আশ্রয়প্রার্থী, আতঙ্কিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত, নিজের গুনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমি তোমার কাছে একজন মিসকিনের মতো, একজন অপরাধী ও নগণ্য ব্যক্তির মতো প্রার্থনা করছি। আমি এমন এক ভীত ও আতঙ্কিত বান্দার মতো দুআ করছি যার ঘাড় তোমার সামনে নুয়ে পড়েছে, যার অশ্রু তোমার সামনে ঝরছে, যার শরীর তোমার সামনে অনুগত হয়ে পড়েছে, যে তোমার দরবারে নাক ঘষছে। হে আল্লাহ, হে আমার রব! আমাকে তোমার কাছে প্রার্থনা করা থেকে বঞ্চিত করো না। আমার প্রতি দয়ালু ও মেহেরবান হও। হে শ্রেষ্ঠ প্রার্থিত সত্তা! হে সর্বশ্রেষ্ঠ দানকারী!” [১]

এই সময়ে কুরআন মাজীদের শেষ আয়াত নাযিল হলো, যাতে শরীয়ত পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলামই পছন্দনীয় দ্বীন হওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর চূড়ান্ত মোহর মেরে দেওয়া হলো। ইরশাদ হয়েছে:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” [২]

১২ই যিলহজ নবী করীম ﷺ মিনায় হজ্জের আহকাম পালন করছিলেন, এমন সময় সূরা আন-নাসর নাযিল হলো, যা নাযিলের দিক থেকে কুরআন মাজীদের শেষ সূরা। ইরশাদ হয়েছে:

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।” [৩]

এই বরকতময় সূরাটি ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, নবী আখিরুজ্জামান ﷺ যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আগমন করেছিলেন তা সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন তাঁর আখিরাতের সফরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই কারণেই এই সূরা নাযিলের সময় যেখানে অন্যান্য সাহাবীগণ আনন্দিত হচ্ছিলেন, সেখানে মাকামে রিসালাতের সবচেয়ে বড় রহস্যজ্ঞানী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কাঁদছিলেন; কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে, এই সূরায় হুজুর পুরনূর ﷺ-কে দুনিয়া থেকে বিদায়ের প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [৪]

---

[১] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৩৭, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩; তাফসীর ইবনে কাসীর, আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/১৫২

[৪] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আন-নাসর

## খুতবা গাদীর খুম

মক্কা থেকে ফেরার পথে ১৮ই জিলহজ মদিনার রাস্তায় ‘খুম’ নামক একটি পুকুরের পাড়ে যাত্রাবিরতি হয়। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত প্রদান করেন। [১]

ইরশাদ হলো: “আমি তোমাদের মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি: একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করো এবং একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো।”

অতঃপর বললেন: “আর আমার আহলে বাইত। আমি তাদের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।”

শেষ বাক্যটি নবী আখিরুজ্জামান ﷺ তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। এই ভাষণেই তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেন: “মান কুনতু মাওলাহু ফা-আলিয়্যুন মাওলাহু” (আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু)। [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানরা যেন হযরত আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজেদের প্রিয়পাত্র, নেতা ও বড় মনে করে, তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে, তাঁকে পূর্ণ সম্মান করে এবং কোনো প্রকার বেয়াদবি না করে।

প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এই নির্দেশনাসমূহ ঐসব লোকদের সতর্ক করার জন্য যারা পরবর্তী যুগে ‘নাসেবি’ হয়ে গিয়েছিল। এই দলটি হযরত আলী, ফাতিমা এবং হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি অহেতুক কটূক্তি করে আসছিল। কোনো মুসলমানের জন্য এমনটি করা মোটেও শোভনীয় নয়। প্রবল আশঙ্কা রয়েছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বা سادات (সাদাত) কিরামের অবমাননামূলক চিন্তা হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা, শাফায়াতে মুহাম্মদী থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অশুভ পরিণতির কারণ হবে।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/ ৬৬৬

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৩৫০, কিতাব ফাদাইলুস সাহাবা, বাব ফাদাইলু আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, দারুল জীল

[৩] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৩, পৃ: ১২৬, বাব মানাকিব আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

এর অনুবাদ যদি ‘আকা’ (মনিব/প্রভু) করা হয় তবুও তা সম্পূর্ণ সঠিক এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত ঈমানদারের আকা ও মাওলা এবং প্রত্যেক মুসলমান তাঁকে নিজের সরদার, অভিভাবক, নেতা ও আকা মনে করে, যেমনটি তারা বাকি তিন খলিফাকেও মর্যাদা দিয়ে থাকে।

তবে এই অনুবাদ করার পর কেউ যেন এই আপত্তি না তোলে যে, যখন তিনি সমস্ত মুসলমানের আকা, তবে তিনি তিন খলিফারও আকা হবেন; কারণ এই অর্থ স্বয়ং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গ্রহণ করেননি। তিনি কখনো নিজেকে হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেননি। এমনকি তাঁদের যুগে কখনো বলেননি যে খিলাফত আমার অধিকার ছিল। বরং তিনি নবীজীর বাণীর সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন যা প্রকৃতপক্ষে এর সহজ-সরল অর্থ। তিনি নিজেকে তিন খলিফার অনুগত রেখেছেন, তাঁদের খিলাফত কবুল করেছেন এবং তাঁদের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। সুতরাং আমরাও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণে এই অর্থই গ্রহণ করি।

শিয়া সম্প্রদায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণ ত্যাগ করে এই ভাষণে ‘মাওলা’ শব্দ থেকে ইমাম ও খলিফা অর্থ গ্রহণ করে এবং ধারণা করে যে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্ত হওয়া ও ইমামত প্রমাণিত হচ্ছে। অতঃপর তারা এর চেয়েও বাড়িয়ে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে অন্য কোনো সাহাবীর খলিফা হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ ছিল। কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন; কারণ ‘মাওলা’ শব্দের প্রায় ত্রিশটি অর্থ রয়েছে যেমন: বন্ধু, প্রিয়পাত্র, সাহায্যকারী, মুক্ত করা গোলাম, মালিক, সরদার, আকা ইত্যাদি। সাহাবায়ে কিরামের এক বিশাল জামাত এই বর্ণনা শুনেছেন কিন্তু কেউ এর এই অর্থ গ্রহণ করেননি যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্থলাভিষিক্ত বা খলিফা নির্ধারণ করা হয়েছে। সবাই এর দ্বারা এটাই বুঝেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা প্রকাশ করছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও এই অর্থই গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি বলতেন:

“আইয়্যুহান নাসু ইন্না রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা লাম ইয়াহাদ ইলাইঃ ফী হাযিহিল ইমারতি শাইয়ান”

“হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ ﷺ এই শাসনের (খিলাফতের) ব্যাপারে আমাদের জন্য কোনো অসিয়ত করেননি।” (দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/ ২২৩)

**সফর আখেরাত**

এখন সেই সময় এসে গিয়েছিল যখন শেষ জামানার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরস্থায়ী জগতের দিকে যাত্রা করবেন, কারণ শেষ জামানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছিলেন। আল্লাহর বাণী পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং এর প্রচারে প্রচেষ্টা, ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এখন শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছিল, ওহী নাযিল হওয়া সম্পন্ন হয়েছিল। সত্য দ্বীনের পতাকা এখন সমুন্নত ছিল এবং এর হেফাজত ও প্রসারের জন্য এমন এক উম্মত তৈরি করা হয়েছিল যাকে "খাইরে উম্মত" উপাধি দেওয়া হয়েছিল, যারা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির পথপ্রদর্শন, ইমামত ও নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।

২৩ বছরের অক্লান্ত সংগ্রাম ও কুরবানির মাধ্যমে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য এমন এক নতুন জগতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন যার আশ্রয়ে মানবতা কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। যদিও তখন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা জাজিরাতুল আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বিশ্বের বড় বড় সাম্রাজ্যগুলোর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল এবং প্রতিটি জাতি বিস্ময়ভরা চোখে সেই বিপ্লব দেখছিল যা আরব মরুভূমির প্রতিটি ধূলিকণায় এক নতুন উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছিল।

হজ থেকে ফেরার পর হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হতে লাগল। আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ইস্তিগফার এবং হামদ ও তাসবিহ পাঠে মগ্ন থাকতে শুরু করলেন, যেন আপনি পরকালের সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপনার বাণীসমূহও আপনার বিদায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য এমনভাবে দোয়া করলেন যেন আপনি সবাইকে বিদায় জানাচ্ছেন। তারপর আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এলেন এবং মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে এভাবে সম্বোধন করলেন:

"আমি তোমাদের আগে পরবর্তী গন্তব্যে চলে যাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দেব। এখন তোমাদের সাথে হাউজে কাউসারে সাক্ষাৎ হবে। আমার এই আশঙ্কা নেই যে তোমরা আমার পর শিরক করতে শুরু করবে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে তোমরা দুনিয়াদারিতে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করবে এবং যেভাবে পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে, তোমরাও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।" [১]

**রোমানদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযানের প্রস্তুতি:**

খায়বার, ফাদাক এবং ওয়াদিউল কুরার উত্তর দিকের বিজয়ের পর মদিনা রাষ্ট্রের সীমানা সেই বাইজেন্টাইন রোমের সীমানার সাথে গিয়ে মিশেছিল, যারা কিছুকাল আগেই পারস্যের মতো বিশ্বশক্তিকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে বিশ্বকে নিজেদের শক্তি ও শৌর্যের নতুন করে জানান দিয়েছিল। কিন্তু এই মহিমা ও প্রতাপ সত্ত্বেও রোমান শাসকরা আরব বিপ্লবের ঢেউয়ে অস্বাভাবিকভাবে ভীত ছিল।

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি আলাশ শহীদ; সহীহ মুসলিম, হা: ২২৯৬, ২২৯৭, কিতাবুল ফাদায়েল, বাবু ইসবাতিল হাউজ।

এই কারণেই তারা বালকার দিকে গমনকারী ইসলামী দূত হারিস বিন উমাইরকে হত্যা করেছিল। যার প্রতিক্রিয়ায় মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং বাইজেন্টাইনরা মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে পরবর্তী অগ্রযাত্রা উপযুক্ত সময়ের জন্য স্থগিত করে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এর কিছুকাল পরে রোমানদের শাস্তি দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তৈরি হয়েছিল, তা হলো সিরীয় সীমান্ত এলাকা "মাআন"-এর খ্রিস্টান আরব গভর্নর ফারওয়া বিন আমর জুজামি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এবং এ বিষয়ে একটি তথ্যমূলক পত্র মদিনায় পাঠিয়েছিলেন। রোমানরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ফারওয়া বিন আমরকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। [১] এই পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদকে আর বিলম্বিত করার সুযোগ দেখছিলেন না। যদিও ৮ হিজরির বসন্তকালের একটি বড় অংশ বিদায় হজে ব্যয় হয়েছিল, তা সত্ত্বেও মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার অত্যন্ত দুঃখের সাথে তাঁর পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর চাচাতো ভাই জাফর বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের কথা স্মরণ করতেন যারা রোমানদের সাথে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ফলে বিদায় হজ থেকে ফিরে এসে সফর মাসে আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটি বাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করেন। [২]

**উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব:**

প্রত্যাশার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবীণদের বাদ দিয়ে বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন, যাঁর বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর। তাঁকে এই সম্মান এজন্য দেওয়া হয়েছিল যে, মুতার যুদ্ধে বাহিনীর প্রথম সেনাপতি ছিলেন তাঁরই পিতা হযরত যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন পিতার অসম্পূর্ণ অভিযানের সমাপ্তি যেন পুত্রের হাতে হয়, যাতে রোমানদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের প্রভাব পড়ে এবং তারা জানতে পারে যে মুসলমানরা তাদের শহীদদের রক্ত ভুলে যায় না। [৩] এরপর ২৬ সফর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমির নিযুক্ত করে ইরশাদ করেন:

"আল্লাহর নাম নিয়ে সেখানে পর্যন্ত অগ্রসর হও যেখানে তোমার পিতা শহীদ হয়েছিলেন। দ্রুত সফর করবে। আল্লাহ বিজয় দান করলে সেখানে অল্প সময় অবস্থান করবে। পথপ্রদর্শকদের সাহায্য নেবে, গোয়েন্দা ও অগ্রবর্তী দলগুলোকে সামনে পাঠাবে।" [৪]

**অন্তিম অসুস্থতার সূচনা:**

সফর মাসের শেষ দিনগুলো ছিল [৫] যখন এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে গমন করেন এবং মৃতদের জন্য...

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ২/৫৯০, ৫৯১

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/১৮৯, ১৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৬/২৩৮

[৩] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৫/২০০

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/১৮৯, ১৯০; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ৬/২৩৮

[৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার মেয়াদ নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ১৩ দিন ছিল। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/২০৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১২/২৩৩) যেহেতু প্রসিদ্ধ মতানুসারে ১২ রবিউল আউয়াল ওফাত দিবস, তাই অসুস্থতার সূচনা ২৯ সফর নির্ধারিত হয়। এটি সেই দিন যেদিন হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল।

...ক্ষমার দোয়া করলেন। সকাল হলে আপনি ﷺ মাথায় তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, সেই দিনই হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হলেন। তিনি বলে উঠলেন: "হায় আমার মাথায় ব্যথা!" হুজুর আকরাম ﷺ বললেন: "আমার তোমার চেয়ে বেশি ব্যথা হচ্ছে।"

তারপর হুজুর আকরাম ﷺ রসিকতা করে বললেন: "আয়েশা! যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তবে তাতে কী ক্ষতি। আমি তোমার কাফন-দাফন সম্পন্ন করব।" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, যদি আমি আগে মারা যাই তবে আপনি এই ঘরে অন্য কোনো স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন।" হুজুর আকরাম ﷺ তাঁর এই উপস্থিত বুদ্ধিতে হেসে দিলেন। [১]

**জায়শ-এ-উসামার রওনা হওয়া:**

পরবর্তী দিনগুলোতে হুজুর আকরাম ﷺ-এর অসুস্থতা তীব্রতর হলো। এদিকে লশকর রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বৃহস্পতিবার ২রা রবিউল আউয়াল হুজুর ﷺ পতাকা তৈরি করে উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে প্রদান করলেন এবং দোয়ার সাথে তাঁকে বিদায় জানালেন। [২] উসামা বিন যায়েদ (রা.) রওনা হওয়ার আগে আরজ করলেন: "আশা করি আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুস্থতা দান করবেন। আপনি আমাকে আরও কয়েক দিন অবস্থান করার অনুমতি দিন। আমি যদি এই অবস্থায় রওনা হই তবে মনে অস্থিরতা থেকে যাবে।" হুজুর ﷺ নীরব থাকলেন এবং কোনো উত্তর দিলেন না। উসামা বিন যায়েদ (রা.) বাহিনীকে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে তিন মাইল দূরে "জুরুফ" নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিলেন। এই অভিযানে হুজুর ﷺ-এর অসাধারণ আগ্রহ দেখে সাহাবায়ে কেরাম দলে দলে সেখানে পৌঁছাতে লাগলেন। [৩] হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর মতো প্রথম সারির মহান সাহাবীগণও লশকরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য মনোনীত ছিলেন। [৪]

**হুজরা-এ-আয়েশা (রা.)-তে স্থায়ী অবস্থান:**

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার ব্যথা বাড়তে থাকল। তা সত্ত্বেও আপনি ﷺ প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে আযওয়াজে মুতাহহারাত-এর নিকট যেতেন। কিন্তু যখন কষ্ট অনেক বেড়ে গেল, তখন আপনি ﷺ আযওয়াজে মুতাহহারাত-এর নিকট অনুমতি চাইলেন যে, অসুস্থতার দিনগুলো যেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর নিকট কাটাতে পারেন যাতে ঘর পরিবর্তনের কষ্ট না হয়। সকলে সানন্দে অনুমতি দিলেন। তখন আপনি ﷺ হযরত আলী এবং হযরত ফজল বিন আব্বাস (রা.)-এর কাঁধে ভর দিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর হুজরার দিকে রওয়ানা হলেন। আপনার পবিত্র মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল এবং পা মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। [৫] রাসুলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ঘরে বিশ্রাম নিলেন। অসুস্থতার তীব্রতায় আপনি অনুভব করছিলেন...

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৫৯; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হাদিস: ৭০৩২; সিরাতে ইবনে হিশাম: ৬৩৩/২

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১৯০/২; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২৩৮/৬

[৩] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৪০০/৭

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ১৯০/২; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২৩৮/৬

[৫] সহীহ আল-বুখারী, হাদিস: ৪৪৪২, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারযুন নবী ﷺ ওয়া ওফাতুহু

খায়বারে জয়নব বিনতে সালাম বিন মিশকামের মেহমানদারিতে যে বিষযুক্ত লোকমা আপনি ﷺ মুখে নিয়েছিলেন, তার বিষক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছিল। আপনি ﷺ বলতেন: "এই সময়ে সেই বিষের প্রভাবে আমার শাহরগ (ঘাড়ের রগ) কেটে যাচ্ছে।" [১]

আপনার কষ্ট দেখে উম্মাহাতুল মুমিনীনগণও শোকে বিহ্বল ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছিলেন: "আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর নবী! আমি চাই আপনার কষ্ট আমার ওপর চলে আসুক।" [২]

**উম্মতকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ:**

এত তীব্র অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয় থেকে উদাসীন ছিলেন না। আপনি ﷺ মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, জাজিরাতুল আরবে যেন দুটি দ্বীন অবশিষ্ট না থাকে। [৩]

এই তাকিদও দিয়েছিলেন যে, ইহুদি, নাসারা এবং মুশরিকদের জাজিরাতুল আরবের সীমানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। [৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি এজন্য বলেছিলেন যে, এই অঞ্চলটি পুরো ইসলামি বিশ্বের কেন্দ্র এবং সদর দপ্তর (হেডকোয়ার্টার) হিসেবে গণ্য হতো এবং কেন্দ্রে অমুসলিমদের উপস্থিতি অনেক ফিতনার কারণ হতে পারত। [৫]

**রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজে শেষ জামাতে ইমামতি:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা বাড়তে থাকল। একদিন মাগরিবের নামাজ পড়ালেন যাতে সূরা আল-মুরসালাত তিলাওয়াত করলেন। এটি ছিল শেষ রাসূলের ইক্তাদায় শেষ উম্মতের শেষ নামাজ। [৬]

**হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইমামতির নির্দেশ এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ইঙ্গিত:**

এরপর জ্বরের তীব্রতায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা তৈরি হতে লাগল। এশার নামাজের সময় আপনি ﷺ কিছুটা সুস্থ বোধ করলে জিজ্ঞেস করলেন: "লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে?" হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরজ করলেন: "জি না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করে মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন কিন্তু দুর্বলতা ও মূর্ছা যাওয়ার কারণে তা সম্ভব হলো না।

তখন আপনি ﷺ সতেজ হওয়ার জন্য সাত মশক পানি আনালেন এবং একটি বড় পাত্রে বসলেন। ঘরের মহিলারা আপনার ﷺ ওপর একের পর এক পানি ঢাললেন। আপনি যখন শীতলতা অনুভব করলেন তখন হাতের ইশারায় আরও পানি ঢালতে নিষেধ করলেন এবং নামাজের জন্য উঠতে চাইলেন কিন্তু পুনরায় মূর্ছা গেলেন। জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞেস করলেন:

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৪২৮, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাদুন নবী ﷺ ওয়া ওয়াফাতুহু।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/১২৮, ত ত সাদির।

[৩] লা ইয়াজতামিউ দ্বীনানি ফী জাজিরাতিল আরব। (শারহু মুশকিলিল আসার লিল ইমাম আবি জাফর আত-তাহাবী, হা: ৩৭৬৩, ত মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ)।

[৪] আখরিজুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা মিন জাজিরাতিল আরব। (আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, হা: ৪৩২ আন আবি উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু), এবং আল-বাযযার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন (মুসনাদ আল-বাযযার, হা: ২৩০)। ইমাম তাহাবী এই মাসআলার ওপর বিস্তারিত কাজ করে রাজেহ ও মারজুহ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। (শারহু মুশকিলিল আসার: ৭/১৮৩ থেকে ১৯২)।

[৫] ইমাম আবু উবাইদ কাসিম বিন সালাম এই নির্দেশের একটি কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এই লোকেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল অথবা তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে মুসলমানদের জন্য বিপদ ছিল। (আল-মায়িদাহ: ৫১)। তিনি এটি এজন্য বলেছেন কারণ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি তাদের পক্ষ থেকে কোনো নতুন ঘটনার কারণে ছিল যা তারা সন্ধির পর ঘটিয়েছিল এবং এটি উমর তাদের বহিষ্কার করার আগে তাদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে স্পষ্ট। (আল-আমওয়াল লিল কাসিম বিন সালাম: ১২৯, ত দারুল ফিকর)।

[৬] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৪২৯, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাদুন নবী ﷺ ওয়া ওয়াফাতুহু।

“লোকেরা কি সালাত আদায় করে নিয়েছে?” আরজ করা হলো: “জি না, তারা আপনার অপেক্ষা করছে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় গোসল করলেন এবং মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু পুনরায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে এমনটি তিনবার হলো। অবশেষে তিনি নির্দেশ দিলেন: “আবু বকরকে বলো সে যেন সালাত পড়ায়।”

উম্মুল মুমিনীনগণ কিছুটা ইতস্তত করলেন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) আরজ করলেন: “তিনি একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।” রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কথা উপেক্ষা করে পুনরায় অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন: “আবু বকরকে বলো সে যেন সালাত পড়ায়।” [১]

এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য তাঁর নায়েব এবং উত্তরসূরি নির্ধারণের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরকালের সফরে রওনা হচ্ছিলেন এবং উম্মতের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তবে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি সাধারণ রাজাদের মতো ‘উত্তরাধিকার’ বা ‘মনোনয়ন’-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে চাননি যাতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি কেবল ‘উত্তরাধিকার’-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে পড়ে। তিনি এই বিষয়ে প্রশস্ততা ও উদারতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ, গভীর সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, আত্মত্যাগ, ঐকমত্য এবং চিন্তা ও উপলব্ধির মতো গুণাবলি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। এটি তখনই সম্ভব ছিল যখন ‘ক্ষমতা হস্তান্তর’-এর বিষয়ে তাদেরকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ না করে বরং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোত্তম রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে তাঁর উত্তরসূরির নাম অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল এবং সেই ব্যক্তিত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল যে, তারা সেই ব্যক্তিত্বকেই খলিফা হিসেবে নির্বাচন করবে। সেই ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নেতৃত্ব ও ইমামতের গুরুভার বহনে সবার চেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমামতের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতার কারণে তিনি এতটাই শোকাহত ও ভেঙে পড়েছিলেন যে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে হযরত উমর ফারুক (রা.) সালাত পড়াতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুজরা মুবারক থেকে হযরত উমর (রা.)-এর কিরাত শুনলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন: “না, না, কেবল আবু বকরই সালাত পড়াবে।” [২]

তিনি আরও ইরশাদ করেন: “আল্লাহ এবং মুমিনগণ আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে ইমাম হতে দেবেন না।” [৩]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৬৭৩, কিতাবুল আযান, বাব হাদ্দিল মারীদি আন ইয়াশহাদাস সালাত...

[২] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৬১, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি ইস্তিখলাফি আবি বকর।

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৬১, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফি ইস্তিখলাফি আবি বকর; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/২৩২, দার হাজার।

সুতরাং এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত সালাত হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ই পড়াতে থাকেন। মসজিদে নববীর মুসাল্লা এমন এক স্থান ছিল যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে অন্য কারো কদম রাখার সাহস ছিল না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের জীবদ্দশায় কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা এই কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, তিনি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কার ওপর আস্থা রাখেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা তাদের রাসূলের ইচ্ছা নিজেরাই বুঝে নিয়ে নিজেদের প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পেশ করুক। আর পরবর্তীতে এমনটাই হয়েছিল। বরাবরের মতো এবারও সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন।

যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উত্তরসূরি মনোনীত করাকে কৌশলের পরিপন্থী মনে করেছিলেন এবং একে মুসলমানদের শুরার ওপর ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হঠাৎ মনে হলো যে, পাছে এভাবে মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিবাদ সৃষ্টি না হয়ে যায়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “আবু বকর এবং তাঁর সাহেবজাদাকে ডেকে আনো! আমি কিছু লিখে দিই। পাছে এমন না হয় যে আবু বকরের উপস্থিতিতে ক্ষমতার অন্য কোনো প্রার্থী দাঁড়িয়ে যায়।” [১]

**রাসূলুল্লাহ ﷺ কী অসিয়ত লিখে দিতে চেয়েছিলেন?**

বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অবস্থায় কিছু নসিহত লিখে দেওয়ার জন্য কাগজ চাইলেন। [২] সেই সময় হযরত উমর, হযরত আব্বাস এবং কয়েকজন সাহাবী (রা.) খিদমতে উপস্থিত ছিলেন। কেউ কেউ নির্দেশ পালন করতে চাইলেন কিন্তু সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অসুস্থতার তীব্রতা প্রবল ছিল, বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন, তাই হযরত উমর (রা.) এবং অন্য কিছু সাহাবী তাঁর কষ্টের কথা বিবেচনা করে কিছু লেখালেখি করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন:

“রাসূলুল্লাহ ﷺ তীব্র কষ্টে আছেন। আমাদের কাছে কুরআন মাজীদ বিদ্যমান আছে। তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।”

এই বলাবলির কারণে মজলিসে আওয়াজ কিছুটা উচ্চ হতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব শুনছিলেন। শোরগোলে তাঁর অপছন্দ হলো কিন্তু এই বিষয়েও তিনি আশ্বস্ত হলেন যে, দ্বীন পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে এই প্রশিক্ষিত জামাতের ওপর আস্থা রাখা যায় এবং পরবর্তীতে সামনে আসা নতুন সমস্যাবলির সমাধান কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে বের করার যোগ্যতা তারা রাখে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নসিহত লিখে দেওয়ার ব্যাপারে আর জোর দিলেন না এবং মজলিস মুলতবি করার নির্দেশ দিয়ে বললেন: “আচ্ছা! এখন তোমরা যাও।”

তবে জরুরি অসিয়তগুলো মৌখিকভাবে জানিয়ে বললেন:

“মুশরিকদের জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দিও। উসামার বাহিনীকে সেই গুরুত্বের সাথে রওনা করো যেভাবে আমি বাহিনীগুলোকে রওনা করতাম...”

---

[১] “আবু বকর, তোমার পিতা ও তোমার ভাইকে আমার কাছে ডাকো, যাতে আমি একটি লিপি লিখে দিতে পারি। কেননা আমি আশঙ্কা করছি যে, কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কিছু বলবে বা কোনো প্রত্যাশী আকাঙ্ক্ষা করবে এবং বলবে: আমিই অধিক যোগ্য। অথচ আল্লাহ এবং মুমিনগণ আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে মেনে নেবেন না।” (সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাদাইলুস সাহাবা, বাব ফাদাইলু আবি বকর আস-সিদ্দিক রা.)। আরও বর্ণিত হয়েছে আহমাদ তাঁর মুসনাদে, হা: ২৫১১৩; আবু দাউদ আত-তায়ালিসি তাঁর মুসনাদে, হা: ১৬১১; এবং নাসায়ী তাঁর সুনানে কুবরায়, হা: ৭০২৩।

[২] আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) একে বৃহস্পতিবারের ঘটনা বলেছেন। (সহীহ বুখারী, হা: ৩১৬৮)। অর্থাৎ এটি মৃত্যুর দিন অর্থাৎ সোমবারের পাঁচ দিন আগের ঘটনা।

...বিদায় দিতেন এবং তাকে তেমনই সম্মান ও মর্যাদা দিতেন যেমন আমি দিতাম।“ [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফত নামা লেখার চিন্তাও ত্যাগ করলেন এবং বললেন: “আল্লাহ এবং মুমিনগণ আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে খলিফা হতে দেবেন না।” [২]

**হযরত আলী (রা.)-কে ওসিয়ত:**

একদিন হযরত আলী (রা.)-কে কাগজ ও কলম আনার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু ওসিয়ত লিখে দিতে চাচ্ছিলেন যাতে মানুষ পথভ্রষ্ট না হয়। অন্যান্য সাহাবীদের মতো হযরত আলী (রা.)-ও তখন লেখা সমীচীন মনে করেননি এবং আরজ করলেন: “আপনি মুখে বলে দিন, আমি মুখস্থ করে নেব।” রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “আমি ওসিয়ত করছি যে, সালাত, যাকাত এবং অধীনস্থদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে।” [৩]

**মসজিদে নববীতে শেষবারের মতো আগমন:**

ইসলামী লশকর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসুস্থতার কারণে বিচলিত হয়ে ‘জুরুফ’-এ অবস্থান করছিল। শনিবার ১০ই রবিউল আউয়াল লশকর প্রধান উসামা বিন যায়েদ (রা.) এবং অনেক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে ‘জুরুফ’ থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় আসলেন। [৪]

ঐদিন জোহরের নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন। আপনি হযরত আব্বাস এবং হযরত আলী (রা.)-এর কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে তাশরীফ নিলেন। আপনার পবিত্র মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। পবিত্র শরীর কম্বলে আবৃত ছিল। জামাত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) নামাজ পড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হুজরার দরজা প্রথম কাতারের বাম দিকে ছিল, যা মসজিদের ভেতরে খুলত, তাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আপনার আগমনের কথা অনুভব করলেন এবং ইমাম...

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩০৫৩, কিতাবুল জিহাদ; হা: ৩১৬৮ কিতাবুল জিজিয়া, বাবু ইখরাজিল ইয়াহুদি ওয়ান নাসারা; হা: ৩৩৩১, কিতাবুল মাগাজি, বাবু মারাদিন নবী ওয়া ওয়াফাতুহু; সহীহ মুসলিম, হা: ২৩১৯, কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ, বাবু তারকিল ওয়াসিয়্যাহ, দারুল জীল।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একথার ওপর দুঃখ প্রকাশ করতেন: “বৃহস্পতিবারের দিন, আহ! বৃহস্পতিবারের দিন।” এরপর পুরো ঘটনা বর্ণনা করতেন। (সহীহ বুখারী, হা: ১১৪, বাবু ইখরাজিল ইয়াহুদি মিন জাজিরাতিল আরব) এবং পরিশেষে বলতেন: “সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হলো সাহাবীদের মতভেদ ও শোরগোলের কারণে যা তাদের লিখতে বাধা দিয়েছিল।” (সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৩১, কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, বাবু কারাহিয়াতিল খিলাফ)।

কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ সময় কোনো আকিদাগত বা রুকন লিখে দিতে চাচ্ছিলেন, তবে তা ভুল। কারণ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বীনের গভীর জ্ঞান সম্পর্কে সবাই অবগত। আসলে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই ঘটনার সময় মাত্র তের-চৌদ্দ বছরের কিশোর ছিলেন, তবে তিনি আহাদিস সংগ্রহের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তার এই আক্ষেপ ছিল যে, ঐ মজলিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) যা লিখে দিতে চাচ্ছিলেন, তা কেন লিখে নেওয়া হলো না। সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হয়তো এমন কিছু ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য (খিলাফতের হকের ব্যাপারে) কোনো স্পষ্ট নির্দেশ বা কিছু শরয়ী বিধান বা ফয়সালা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। যেমন আল্লামা আইনী বলেন: “অর্থাৎ তিনি এমন কিছু লিখে দিতে চেয়েছিলেন যা ফিতনা-ফ্যাসাদ যেমন জঙ্গে জামাল ও সিফফীন... এর পথ বন্ধ করে দিত... তিনি খিলাফতের মৌলিক নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে খলিফাদের নাম লিখে দিতে চেয়েছিলেন।” (উমদাতুল কারী: ২/১৭১)।

যাই হোক, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, তিনি নিজের উত্তরসূরি হিসেবে হযরত আলী (রা.)-এর ইমামত বা খিলাফতের ফরমান লিখে দিতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনকাল পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ ছিল। যদি এটি ওয়াজিব হতো তবে তিনি অবশ্যই তা স্পষ্ট করে দিতেন (যা শিয়াদের নিকট দ্বীনের একটি রুকন)।

প্রকৃতপক্ষে ঐ মুহূর্তে উপস্থিত সাহাবীদের কোনো ধারণা ছিল না যে কোনো রুকন লিখে দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় তারা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করতেন যে এটি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ। পরে যখন ঘরে শোরগোল শুরু হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বিরক্ত হলেন, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো একজন কিশোরের মনে এই আক্ষেপ থেকে যাওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে, হায়! যদি ঐ বিষয়গুলো স্পষ্ট করে লিখে রাখা হতো। (খিলাফতের ব্যাপারে পরবর্তীতে যা সামনে এসেছে) তবে হয়তো এই ফিতনাগুলো সৃষ্টি হতো না।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৫৬৬৬, কিতাবুল মারদা; সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৮৭; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৪০৫১; মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসি, হা: ১৬০১।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৬৬৭২, বাসনাদে সহীহ লিগাইরিহি।

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/১৯০।

...এর জায়গা খালি করে পেছনে সরতে লাগলেন কিন্তু আপনি ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করে তাঁদেরকে নিষেধ করে দিলেন। [১]

হযরত আব্বাস এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নির্দেশ দিলেন: "আমাকে আবু বকরের বাম পাশে বসিয়ে দাও"। [২]

এখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর ইক্তাদায় সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকজন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তাকবীরের ওপর সালাত আদায় করছিলেন। [৩] এটি নিজের উপস্থিতিতে উম্মতকে নিজের উত্তরসূরির আনুগত্য করানোর একটি অত্যন্ত চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিল এবং এই কথার প্রমাণও যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুসরণ মূলত রহমতের নবী ﷺ-এরই অনুসরণ।

**উম্মতের প্রতি শেষ ভাষণ:**

সালাতের পর রাসূল ﷺ উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন যিনি বাহিনীকে জুরফ-এর ছাউনিতে রেখে আপনার ﷺ সেবা করার জন্য ফিরে এসেছিলেন। রাসূল ﷺ মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন এবং বললেন:

"আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে তিনি চাইলে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ গ্রহণ করতে পারেন, আর চাইলে আল্লাহর কাছে বিদ্যমান পুরস্কারসমূহ বেছে নিতে পারেন; সুতরাং সেই বান্দা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ পছন্দ করে নিয়েছেন।"

এই কথাগুলো শোনামাত্রই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন:

"আপনার ওপর আমার বাবা-মা কুরবান হোন, আমাদের জীবন ও সম্পদ আপনার ওপর উৎসর্গিত।" [৪]

এই কথা বলতে বলতে তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন; কারণ পুরো মজলিসের মধ্যে একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই কথাগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায়ের বার্তা। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কান্না সহ্য করতে পারলেন না। বললেন: "আবু বকর! কেঁদো না।" [৫]

**হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইহসানের উল্লেখ:**

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন:

"আমার ওপর সবচেয়ে বেশি ইহসান আবু বকরের রয়েছে। যদি আমাকে কোনো মানুষকে প্রিয় বন্ধু বানাতে হতো তবে আবু বকরকেই প্রিয় বন্ধু বানাতাম কিন্তু তাঁর সাথে সম্পর্ক দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের। শোনো! মসজিদে উন্মুক্ত হওয়া সব দরজা বন্ধ করে দাও। শুধু আবু বকরের ঘরের দরজা খোলা থাকতে দাও।" [৬]

**উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বহাল:**

উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অল্প বয়সের কারণে কিছু সাহাবীর তাঁর নেতৃত্বের ওপর সন্তুষ্টি ছিল না। এর আগে মুতা যুদ্ধে...

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৯৩৭, কিতাবুল জুমুআহ, বাব মান কালা ফিল খুতবাতি বা'দাত সানা আম্মা বা'দ; হা: ২৮৩, কিতাবুল আযান, বাব মান কামা ইলা জানবিল ইমাম লি-ইল্লাতিন, হা: ৭১২, ৭১৩, কিতাবুল আযান, বাব মান আসমাআন নাসা বিতাকবীরিল ইমাম

[২] সীরাত ইবনে হিব্বান: ৩৯৯/১

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৯২৮, কিতাবুস সালাত, বাব ইসতিখলাফুল ইমাম ইযা আরাযা লাহু উযরুন

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৪, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুন নবী ﷺ ওয়া আসহাবিহি ইলাল মাদিনা

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯০৪, কিতাবুল মানাকিব, বাব হিজরাতুন নবী ﷺ ওয়া আসহাবিহি ইলাল মাদিনা

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ৪৬৬, কিতাবুস সালাত, বাব আল-খাওখাতু ওয়াল মামাররু ফিল মাসজিদ

যখন তাঁর পিতাকে প্রথম আমির বানানো হয়েছিল, তখনও এই ধরণের কানাঘুষা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই বিষয়গুলোতে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাই তিনি আপত্তিকারীদের সম্বোধন করে তাদের তিরস্কার করলেন:

“যদি তোমরা উসামার নেতৃত্বের ওপর আপত্তি করো, তবে এর আগে তোমরা তাঁর পিতার নেতৃত্বের ওপরও আপত্তি করেছিলে। আল্লাহর কসম! তিনি এই পদের যোগ্য ছিলেন এবং আল্লাহর কসম! তিনি আমার কাছে সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। আর আল্লাহর কসম! এই (উসামা)-ও এই পদের যোগ্য।”

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উসামা (রা.)-এর ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে তাঁর নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন। [১]

**কবরকে সেজদাহগাহ বানানোর নিষেধাজ্ঞা:**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা অন্যান্য জাতির মতো নবী ও ওলিদের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের সতর্ক করে ইরশাদ করেছেন:

“পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবী ও নেককারদের কবরকে সেজদাহগাহ বানিয়ে নিয়েছিল। সাবধান! তোমরা এমন করো না। আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি।” [২]

**আনসারদের সাথে সদাচরণের তাকিদ:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসারদের অসীম অনুগ্রহ ও তাঁদের মূল্যবান খেদমত স্মরণ করে মুহাজিরদের তাঁদের সাথে সদাচরণের অসিয়ত করেন এবং বলেন:

“হে লোকসকল! আমি তোমাদের আনসারদের ব্যাপারে ভালো আচরণ করার তাকিদ করছি। সাধারণ মুসলমানরা বাড়তে থাকবে এবং আনসাররা কমতে থাকবে, এমনকি তারা খাবারের লবণের মতো হয়ে যাবে। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন তাদের দায়িত্ব পালন করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের শাসনকর্তাদের উচিত আনসারদের নেককার লোকদের কদর করা এবং তাদের মধ্যে যারা কোনো ভুল করে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া।” [৩]

তিনি আরও বলেন: “তোমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখা উচিত।” [৪]

এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ খুতবা ছিল। [৫] এর পর তিনি ঘরে ফিরে গেলেন।

---

[১] সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসন্তুষ্টির এই শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে: (ان تطعنوا فی امارته یعنی اسامه بن زید، فقد طعنتم فی امارة ابیه من قبله، وایم الله ان کان لخلیقاً لها، وایم الله ان کان لاحب الناس الی وایم الله ان هذا لها لخلیق یرید اسامه بن زید) (সহীহ মুসলিম, হা: ২৪২৬, কিতাবুল ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব ফাযায়িলু যায়েদ বিন হারিসা (রা.))। সীরাত লেখকরাও এই খুতবাটি সংরক্ষণ করেছেন— (সীরাত ইবনে হিশাম: ২/৬৫০)।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৫৩২, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, বাবুন নাহয়ু আন বিনাইল মাসাজিদ আলাল কুবুর, দারুল জীল।

[৩] এই শব্দগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, খলিফারা মুহাজিরদের মধ্য থেকে হবেন, আনসারদের মধ্য থেকে নয়— যেমনটি পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়েছিল।

[৪] সহীহ মুসলিম, হা: ২৮৭৭, কিতাবুল জান্নাহ ওয়া সিফাতু নাঈমিহা, বাবু আল-আমর বিহুসনিজ জান্নি বিল্লাহ, দারুল জীল।

[৫] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৭৯৯, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবিল আনসার। তবাকাত ইবনে সাদ: ২/১৯০।

**উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর জন্য নিরব দুআ:**

পরের দিন (রবিবার) উসামা বিন যায়েদ (রা.) পুনরায় খিদমতে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখলেন তো চোখে অশ্রু টলমল করতে লাগল। উসামা (রা.) ঝুঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে চুম্বন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বরকতময় হাত আসমানের দিকে তুলে উসামা (রা.)-এর ওপর রাখলেন, যেন তিনি তাঁর জন্য দুআ করছেন। [১]

**পার্থিব উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা:**

যেমন যেমন শেষ মুহূর্তগুলো ঘনিয়ে আসছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) এই নশ্বর জগতের উপকরণসমূহ থেকে সম্পর্কহীনতা অবলম্বন করছিলেন। ঘরে কিছু আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা) মজুদ ছিল। হযরত আয়েশা (রা.)-কে তাকিদ দিলেন যেন সেগুলো সদকা করে দেন। [২]

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন: "সেই আশরাফিগুলো কি সদকা করে দিয়েছ?"

আরজ করলেন: "এখনো না।"

আপনি সেগুলো আনালেন, বরকতময় হাতের ওপর রেখে সেগুলো গুনলেন। সেগুলো ছিল ছয়টি। বললেন:

"মুহাম্মদ তাঁর রবের সাথে কী ধারণা নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন, যদি এই সম্পদ তাঁর ঘরে থাকে।"

একথা বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই সমস্ত আশরাফি তৎক্ষণাৎ সদকা করিয়ে দিলেন। [৩]

পবিত্র দেহের ওপর একটি কম্বল ছিল যা রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্বরের তীব্রতায় কখনো চেহারার ওপর টেনে নিতেন আবার কখনো সরিয়ে দিতেন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) হঠাৎ বললেন:

"ইয়াহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত হোক, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদাহগাহ বানিয়ে নিয়েছে।" [৪]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আশঙ্কা ছিল যে পাছে তাঁর কবরেও সিজদাহ করা না শুরু হয়। (এই আশঙ্কার কারণেই তিনি এই ইরশাদ করেছেন)। যদি এই আশঙ্কা না থাকত তবে আপনার পবিত্র কবরও প্রকাশ্য রাখা হতো। (কিন্তু মুসলমানদের শিরকের সম্ভাবনা থেকে বাঁচানোর জন্য ঘরের ভেতরে দাফন করা হয়েছে এবং কবর পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে)।" [৫]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৯০/২

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৪৫৬০ সহিহ সনদে

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২৩৭/২

[৪] সহিহ বুখারি, হা: ৪৩৫, কিতাবুস সালাত, বাব আস-সালাতু ফিল বিয়াহ

[৫] সহিহ বুখারি, হা: ৪৪৪১, কিতাবুল মাগাজি, বাব মারাদুন নবী (সা.) ওয়া ওয়াফাতুহু

## হায়াতে মুবারাকার শেষ দিন..... ওফাতের দিন

এটি ছিল সোমবার। ১২ই রবিউল আউয়াল। হায়াতে মুবারাকার শেষ দিন। [১]

ফজরের আজানের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর কিছুটা ভালো মনে হচ্ছিল। যখন জামাত দাঁড়াল, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরার পর্দা উঠালেন। সারা জীবনের মেহনতের ফসল তাঁর সামনে ছিল। সাহাবায়ে কেরাম কাতারবদ্ধ হয়ে, হাত বেঁধে আল্লাহর দরবারে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ পড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই দৃশ্যটি এতই মনোরম ছিল যে, তাঁর নূরানি চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পেরে খুশি ছিলেন যে, ইসলামের উত্তরাধিকারী একটি উম্মত তৈরি হয়ে গেছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতে এবং বান্দাদের বন্দেগি শেখাতে প্রস্তুত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি জামাত রেখে যাচ্ছিলেন, যারা সব অবস্থায় ইসলামের দাওয়াত এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য পুরোপুরি কোমর বেঁধে প্রস্তুত ছিল।

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৩৮৭, কিতাবুল জানায়েয, বাবু মাওতি ইয়াওমিল ইসনাইন।

[২] ওফাত সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অভিমত হলো ১২ই রবিউল আউয়াল। হাফেজ ইবনে কাসীর হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন: “ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين، الثانى عشر من ربيع الاول بوفيه بعث، وفيه عرج به الى السماء، وفيه هاجر ومات” (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তী বর্ষে সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, ১২ই রবিউল আউয়াল। এই দিনেই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন, এই দিনেই তাঁর মেরাজ হয়, এই দিনেই তিনি হিজরত করেন এবং এই দিনেই তিনি ইন্তেকাল করেন) (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৪৫৫)। যদিও ইবনে কাসীর এর সনদকে মুনকাতে (বিচ্ছিন্ন) বলেছেন, তবে এর শব্দ “وفيه هاجر ومات” (এতেই তিনি হিজরত করেন এবং ইন্তেকাল করেন) দেখে জুমহুর সীরাতকারগণ ১২ই রবিউল আউয়ালকেই ওফাতের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এই অভিমতের ওপর একটি অত্যন্ত শক্তিশালী আপত্তি রয়েছে, তা হলো সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী ওফাতের দিন ছিল সোমবার। আর এর আগে ইয়াওমে আরাফা (৯ই জিলহজ) সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী শুক্রবার ছিল। সুতরাং ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল কোনোভাবেই হতে পারে না। যদি জিলহজ, মহররম এবং সফর তিনটি মাসই ৩০ দিনের ধরা হয়, তবে রবিউল আউয়ালের প্রথম সোমবার “২” তারিখে এবং দ্বিতীয়টি “৯” তারিখে হবে। যদি তিনটি মাসকেই ২৯, ২৯, ২৯ দিনের কল্পনা করা হয়, তবে রবিউল আউয়ালের প্রথম সোমবার “৫” তারিখে, দ্বিতীয়টি “১২” তারিখে এবং তৃতীয়টি “১৯” তারিখে হবে। যদি দুই মাস ২৯ এবং এক মাস ৩০ দিনের ধরা হয়, তবে প্রথম সোমবার “৭” তারিখে এবং দ্বিতীয়টি “১৪” তারিখে হবে। যদি দুই মাস ৩০ এবং এক মাস ২৯ দিনের ধরা হয়, তবে প্রথম সোমবার “৮” তারিখে, দ্বিতীয়টি “১৫” এবং তৃতীয়টি “২২” তারিখে মানতে হবে। মোটকথা, কোনোভাবেই সোমবার ১২ তারিখে আসতে পারে না। এই কারণেই কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ২রা রবিউল আউয়ালকে অগ্রগণ্য বলেছেন। কাজী সুলাইমান মনসুরপুরী মরহুম ১২ই রবিউল আউয়ালকে ওফাতের তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ জন্ম তারিখের (৯ই রবিউল আউয়াল) সাথে মিল রেখে ওফাতের তারিখের ব্যাপারেও ৯ তারিখকে উত্তম মনে করেছেন। কিন্তু যেহেতু “১২” বা “৯” এর সম্ভাবনা তখনই থাকে যখন জিলহজ, মহররম এবং সফর তিনটি মাসই ৩০ দিনের অথবা তিনটিই ২৯ দিনের হয় এবং এমনটি কমই ঘটে, তাই কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ১২ই রবিউল আউয়ালের অভিমত গ্রহণ করেছেন।

যাই হোক, এগুলো সবই যৌক্তিক সম্ভাবনা। ১২ই রবিউল আউয়ালের জুমহুর অভিমতের বিরুদ্ধে এই যৌক্তিক সম্ভাবনাগুলো তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন উল্লিখিত আপত্তির কোনো উত্তর না পাওয়া যায়। অথচ এর একটি শক্তিশালী উত্তর বিদ্যমান যা হাফেজ ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন:

“وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، افردته مع غيره من الاجوبة. وهو ان هذا انما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة فرآه اهل مكة قبل اولئك بيوم او على هذا يتم القول المشهور”

“আলহামদুলিল্লাহ, এর একটি সঠিক উত্তর বিদ্যমান যা অত্যন্ত সঠিক, তবে উত্তরগুলোর সাথে এটি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আমি একক। তা হলো এই সমস্যাটি মক্কা ও মদিনায় জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। মক্কাবাসী মদিনাবাসীদের একদিন আগে চাঁদ দেখেছিলেন। এই ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ অভিমতটি প্রমাণিত হয়ে যায়।” (আল-ফুসুল ফিস সীরাহ, পৃ: ২২০)

হাফেজ ইবনে কাসীরের এই ব্যাখ্যার ওপর কোনো আপত্তি সৃষ্টি হয় না, ওফাতের দিন ১২ই রবিউল আউয়ালই সাব্যস্ত হয় যা ধর্মীয় পর্যবেক্ষণের অনুকূল। বড়জোর কেউ বলতে পারেন যে, এভাবে মদিনায় টানা চার মাস ৩০ দিনের হয়েছিল, কিন্তু এটি অসম্ভব নয়। রঞ্জিত পাল কমিটি পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিলকদ, জিলহজ ১৩০৯ হিজরি এবং মহররম, সফর ১৩১০ হিজরির চারটি চাঁদ টানা ৩০ দিনের হয়েছিল; এর সাত বছর পর জিলহজ ১৩১৫ হিজরি এবং মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল ১৩১৬ হিজরির চারটি চাঁদ টানা ৩০ দিনের হয়েছিল। সুতরাং ৩০ দিনের চারটি চাঁদের উদয় বিরল হলেও অসম্ভব নয়।

সাহাবায়ে কেরাম অনুভব করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্দা সরিয়ে তাঁদের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। তিনি দুই দিন ধরে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হননি। সেই সকল বিশিষ্ট সাহাবী ব্যতীত যাঁরা প্রতিদিন ঘরে উপস্থিত হতেন, অধিকাংশ উৎসর্গকারী সাহাবী দুই দিন ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দর্শন পাননি। তাঁকে মনোযোগী দেখে সবার শিরা-উপশিরায় আনন্দের এক ঢেউ খেলে গেল এবং তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) হাতের ইশারায় তাঁদের সালাত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের ওপর বিদায়ী দৃষ্টি দেওয়ার পর হুজরা শরীফের পর্দা ফেলে দিলেন। [১]

খুব ভোরে হযরত আলী (রা.) উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবস্থা ভালো দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। বাইরে বের হলে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কুশল জানার জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

তাঁদের জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন: "আলহামদুলিল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা.) এখন ভালো আছেন।" সাহাবায়ে কেরাম আশ্বস্ত হয়ে নিজেদের স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। [২]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কিছু সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মদিনার উপকণ্ঠের গ্রাম 'সুন্হ'-এ তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে গেলেন। [৩] এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শারীরিক অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গেল। অচেতনতা শুরু হলো। বিকেলের সময় পুরো মদিনা মুনাওয়ারায় নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। রহমতে আলম (সা.)-এর ওপর মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা বিরাজ করছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র মাথা নিজের কোলে রেখে তাঁকে অবলম্বন দিয়েছিলেন। সেই সময় আশেপাশে কেবল পরিবারের সদস্যরাই ছিলেন। এই সময়ে শেষ নবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে বের হলো:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

(ঐ সকল লোকদের সাথে যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন: নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ।)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) যখন এটি শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দুনিয়ায় থাকা অথবা আখেরাতের সফর বেছে নেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এবং তিনি প্রস্থানকেই পছন্দ করে নিয়েছেন। [৪]

**শেষ ওসিয়ত: সালাতের গুরুত্ব এবং দুর্বলদের প্রতি দয়া:**

এখন জানকানির লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। শেষ মুহূর্তগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ধীরে ধীরে এটি বলছিলেন:

الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"সালাতের গুরুত্ব দিও। অধীনস্থ ও দুর্বলদের খেয়াল রেখো।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন, এমনকি কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল। কেবল ঠোঁট নড়তে দেখা যাচ্ছিল। [৫]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৪৮, কিতাবুল মাগাযী, বাব: নবী (সা.)-এর অসুস্থতা ও মৃত্যু।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৪৭; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৮৫।

[৩] আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৯৫; সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৫৪।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৪৫৮৬, কিতাবুত তাফসীর; সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৪৮।

[৫] আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ লি ইবনে কাসীর: ৪/৪৭৩; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২০৫।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দম করতে লাগলেন। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) আসমানের দিকে তাকালেন এবং বললেন: “ফী আর-রাফীকিল আ’লা, ফী আর-রাফীকিল আ’লা” (সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার বন্ধুর কাছে, সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার বন্ধুর কাছে)।

ইতিমধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ভাই হযরত আবদুর রহমান (রা.) পীলু গাছের একটি তাজা ডাল হাতে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হলো। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি ভাইয়ের কাছ থেকে ডালটি নিয়ে পরিষ্কার ও নরম করে মেসওয়াক তৈরি করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে পেশ করলেন। তিনি তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী ভালোভাবে মেসওয়াক করলেন, কিন্তু যখন শেষ করলেন তখন মেসওয়াকটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ওপর হেলান দিয়ে ছিলেন। তাঁর সামনে পানির একটি পেয়ালা রাখা ছিল। তিনি বারবার তাতে হাত ভিজিয়ে নিজের চেহারায় মুছছিলেন এবং বলছিলেন:
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইন্না লিল মাওতি সাকারাত। আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা সাকারাতিল মাওত”
“আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, নিঃসন্দেহে মৃত্যুর যন্ত্রণা ধ্রুব সত্য। হে আল্লাহ! মৃত্যুর যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য করুন।” [২]

নিজের পিতার কষ্ট দেখে হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন: “ওয়া কারবা আবাহ” (হায়! আব্বার কষ্ট)।

রহমতে আলম (সা.) তাঁর আদরের কন্যার দিকে তাকালেন এবং আস্তে করে বললেন: “বেটি! আজকের পর তোমার আব্বার আর কোনো কষ্ট হবে না।” [৩]

এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মুহূর্তের জন্য বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, তাঁর বরকতময় হাত পানির পেয়ালার এক পাশে হেলে পড়ল। যখন হুঁশ ফিরে এল, তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকালেন, হাত তুললেন এবং ওপরের দিকে ইশারা করে বললেন:
“আল্লাহুম্মা আর-রাফীকুল আ’লা” (হে আল্লাহ! সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার বন্ধু)।

তারপর ওপরের দিকে ইশারা করতে করতে বলতে থাকলেন:
“ফী আর-রাফীকিল আ’লা, ফী আর-রাফীকিল আ’লা”
এই বলতে বলতে তাঁর বরকতময় হাত এক পাশে হেলে পড়ল। তাঁর পবিত্র আত্মা ঊর্ধ্ব জগতের দিকে পাড়ি জমাল। [৪]
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তাঁর বরকতময় বয়স ছিল ৬৩ বছর। [৫] আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে ৬৫ বছরের কথাও বর্ণিত আছে। [৬]

---

[১] আস-সীরাতুন নববীয়্যাহ লি-ইবনে কাসীর: ৪/৪৭৩, ৪৭৫।

[২] সুনানে তিরমিযী, হা: ৯৭৮।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৬২, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাদুন নবী (সা.) ওয়া ওয়াফাতিহি।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৩৬।

[৫] সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৪৮, কিতাবুল ফাদায়েল। এটি চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী। জন্ম ১২ই রবিউল আউয়াল এবং মৃত্যু ১২ই রবিউল আউয়াল, তাই ৬৩ বছরই হবে।

[৬] সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৪৮, কিতাবুল ফাদায়েল। খাঁটি চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী বরকতময় বয়স ৬৫ বছর।

**সাহাবী কিরাম (রা.) শোকাতুর অবস্থায়:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম মুহূর্ত দেখে সাইয়িদা ফাতিমা (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে এবং সাইয়িদা হাফসা (রা.) তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের পৌঁছানোর আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। [১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের খবর শুনে সাহাবী কিরামের ওপর যেন বজ্রপাত হলো। কেউ নিজের কানে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে কেউ কাউকে এমন ভালোবাসেনি, যেমন সাহাবী কিরাম তাঁদের আঙ (আকা) ও মাওলা-কে বাসতেন। তাঁরা এই বিচ্ছেদ কীভাবে সহ্য করবেন? সময়টি ছিল বিকেল বেলা, কিন্তু শোকের তীব্রতায় মনে হচ্ছিল যেন মদীনা মুনাওয়ারার ওপর অন্ধকারের চাদর জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এসেছিল। [২]

হযরত ফাতিমা (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে বলছিলেন:

“يا ابتاه! اجاب ربا دعاه، يا ابتاه! من جنة الفِردوسِ ماواه، يا ابتاه! إِلى جِبرِيل ننعاه”

“হায় আমার আব্বাজান! আপনি মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার আব্বা, যাঁর ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস। হায় আব্বাজান! আমরা জিবরীলকে আপনার ইন্তেকালের দুঃখের সংবাদ দিচ্ছি।” [৩]

হযরত উসমান (রা.)-এর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যেন তাঁর কথা বলা ও শোনার শক্তি হারিয়ে গেছে। হযরত আলী (রা.) যেখানে বসেছিলেন সেখানেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। [৪] হযরত উমর (রা.) এই দুর্ঘটনায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়েছে বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। মুনাফিকদের এই ঘটনায় আনন্দিত হওয়া এবং মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখে তাঁর ওপর প্রচণ্ড ক্রোধের অবস্থা বিরাজ করছিল। [৫]

এই কঠিন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রহস্যের অংশীদার এবং বিশেষ বন্ধু সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। মহান নেতা ﷺ-এর ইন্তেকালের খবর শোনামাত্রই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে “সুন্‌হ” থেকে মদীনায় পৌঁছান এবং হুজরায় প্রবেশ করেন। পবিত্র দেহ চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি চাদর সরিয়ে কপাল মুবারকে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন: “আমার মা-বাবা আপনার ওপর কুরবান। আপনার জীবনও ছিল সর্বোত্তম এবং মৃত্যুও সর্বোত্তম।” [৬]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবার মসজিদে এলেন। দেখলেন হযরত উমর (রা.) মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উত্তেজনার সাথে বলছেন: “কিছু মুনাফিক প্রকৃতির লোক গুজব ছড়াচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়েছে। আল্লাহর কসম! তিনি জীবিত আছেন। তিনি তাঁর রবের সাথে দেখা করতে গেছেন, যেমন হযরত মূসা (আ.) গিয়েছিলেন। খুব শীঘ্রই তিনি ফিরে আসবেন এবং যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের খবর ছড়াচ্ছে তাদের হাত-পা কেটে দেবেন।” [৭]

---

[১] আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৩৯৯, ত. ইলমিয়্যাহ, সেই দিনটি ছিল ৯ জুন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১২২৩৩

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৪৬২, বাব মারাদুন নবী ﷺ ওয়া ওয়াফাতুহু

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ২/৩১২, ত. দার সাদির; আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ৩/৫০০, ত. ইলমিয়্যাহ

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭০২১ সহীহ সনদে

[৬] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৩৫২, কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাদুন নবী ﷺ ওয়া ওয়াফাতুহু; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭০২১ সহীহ সনদে

[৭] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৬৭, ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাব লাও কুনতু মুত্তাখিযান খালীলান

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণ:

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে শান্ত করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন:

“হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করত সে জেনে রাখুক যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি সর্বদা থাকবেন।” তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

“মুহাম্মদ (সা.) একজন রাসূল বৈ তো নন; তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? আর যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে প্রতিদান দেবেন।”

এই আয়াতসমূহ ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর শাহাদাতের মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর সাহাবায়ে কেরামের সান্ত্বনার জন্য নাযিল হয়েছিল। কিন্তু আজ যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সেগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে মনে হচ্ছিল যেন এই আয়াতগুলো এখনই আসমান থেকে নাযিল হচ্ছে।

হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর এই বাস্তবধর্মী ভাষণ শুনছিলেন, তখন তাঁর উত্তেজনা শোক ও দুঃখে পরিণত হলো। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর পা আর স্থির থাকতে পারল না, তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। [১]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৪৫৩

**উম্মতের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রশ্ন**

এই সময় প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত শোকাহত ও অস্থির হয়ে ভাবছিলেন যে এখন কী হবে? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটি মনে উঁকি দিচ্ছিল যে এখন উম্মতের নৌকার মাঝি কে হবেন? উদ্ভূত বিষয়গুলো কার সাথে পরামর্শ করে সমাধান করা হবে? সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কার ওপর হবে? দ্বীনি ও শরয়ী বিষয়ে মুসলমানরা কার কাছ থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবেন? সাহাবীগণ পদ ও ক্ষমতার লোভী ছিলেন না, তবে এই প্রশ্নটি অবশ্যই মনে উদিত হচ্ছিল যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আব্বাস (রা.) তাঁদের পারিবারিক নৈকট্যের কারণে কিছুটা ধারণা করেছিলেন যে, হয়তো তিনি ﷺ তাঁদের জন্য শাসনের অসিয়ত করে যাবেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, হয়তো পয়গম্বর ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বংশীয় আত্মীয়তার গুরুত্বও বিবেচনায় রাখা হবে। এই দুই মহান ব্যক্তি পূর্ণ নেক নিয়তে এটি মনে করতেন যে, যদি খলিফা আহলে বাইত থেকে হন, তবে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি অধিক টেকসই হবে।

হযরত আব্বাস (রা.) নবী আকরাম ﷺ-এর ইন্তেকালের কিছু আগে হযরত আলী (রা.)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন হুজুর ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে খেলাফত কার জন্য নির্ধারিত হবে, আমাদের আহলে বাইতের জন্য নাকি অন্যদের জন্য? যদি আমাদের জন্য নির্ধারিত হয় তবে আমরা আশ্বস্ত হব, আর যদি আপনি ﷺ এটি অন্যদের জন্য নির্ধারণ করতে চান তবে আমরা তাঁকে পরামর্শ দেব যেন তিনি এই দায়িত্ব আমাদের ওপর সোপর্দ করে যান। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে অপরাগতা প্রকাশ করেন এবং বলেন: “যদি আমরা হুজুর আকরাম ﷺ-এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি এবং তিনি ﷺ নিষেধ করে দেন, তবে পরবর্তীতে মানুষ আমাদের কখনোই ক্ষমতা দেবে না। তাই আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করব না।” [১]

হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে বেশি কে জানতেন যে হুজুর ﷺ নিজের পরিবারের সদস্যদের কুরবানির ক্ষেত্রে সামনে এবং পদের ক্ষেত্রে পেছনে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাই ভয় ছিল যে নিজে নেতৃত্ব চাইলে আপনি ﷺ অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এই একই আশঙ্কা হযরত আব্বাস (রা.)-এরও ছিল, অন্যথায় তিনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা ছিলেন। যদি তাঁর কোনো আশঙ্কা না থাকত তবে হযরত আলী (রা.)-কে বলার পরিবর্তে তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই আবেদন করতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে আহলে বাইতের ক্ষমতা পাওয়া ছিল কেবল এই মহান ব্যক্তিদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা এবং একটি সাময়িক রায় যা তাঁরা উপযুক্ত এবং মুসলমানদের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলেন, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোনো অসিয়ত না করেই চলে গেলেন, তখন এই রিসালাত-প্রেমিকগণও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে উম্মতের কল্যাণ এতেই মনে করলেন যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিজেদেরই নিতে দেওয়া হোক। এই কারণেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর খেলাফতের দাবির বিষয়ে মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

---

[১] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৩, কিতাবুল মাগাযী, বাব: নবী ﷺ-এর অসুস্থতা ও তাঁর ইন্তেকাল।

হ্যাঁ! আনসারগণ এই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছিলেন এবং সকিফাহ বনী সায়েদাহ-তে তাদের পক্ষ থেকে একটি বিচ্যুতি ঘটতে যাচ্ছিল।

সোমবার সন্ধ্যা: সকিফাহ বনী সায়েদাহ-তে কী ঘটেছিল?

সেই সময় ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল মদিনা মুনাওয়ারা, যার মুসলমানরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: মুহাজিরিন ও আনসার। মুহাজিরিন সংখ্যায় কম ছিল এবং আনসার বেশি। আবার আনসারদের মধ্যে দুটি গোত্র ছিল: আউস ও খাজরাজ। আউস কম ছিল এবং খাজরাজ বেশি। খাজরাজ গোত্রের লোকেরা সেই সময় কোনো বিশেষ পরিকল্পনা বা পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই তাদের নেতা সাদ বিন উবাদাহ (রা.)-এর ঘরের পাশে নির্মিত একটি চত্বরে সমবেত হয়েছিল। একে 'সকিফাহ বনী সায়েদাহ' বলা হতো, এখানে সমবেত হওয়া খাজরাজবাসীদের নিয়মিত অভ্যাস ছিল। এই সময়ে যদি তাদের মনে এই কথা আসছিল যে মুসলমানদের পরবর্তী নেতা খাজরাজ থেকে হওয়া উচিত, তবে এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল; কারণ অতীতে আরবদের কাছে ক্ষমতার ভিত্তি ছিল জনবল এবং এটি বাস্তবতা ছিল যে মদিনায় খাজরাজদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। ফলে এই চিন্তা মন থেকে মুখে চলে এল এবং কিছু লোক বলতে লাগল: "এখন খাজরাজ নেতা সাদ বিন উবাদাহকে আমির বানানো উচিত।"

একজন আনসারী কথাটি বাড়িয়ে বললেন: "আর যদি মুহাজিরিন এতে একমত না হয়, তবে আমরা বলব: আমাদের একজন আমির হওয়া উচিত এবং তোমাদের একজন।" এটি এমন একটি চিন্তা ছিল যা উম্মাহর ঐক্যকে তাৎক্ষণিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিতে পারত, তাই স্বয়ং খাজরাজ নেতা হযরত সাদ বিন উবাদাহ (রা.) বললেন: "এতে তো অস্থিতিশীলতার সূচনা হবে।" [১]

সকিফাহ বনী সায়েদাহ-তে হওয়া এই আলোচনার খবর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে পৌঁছাল, যিনি তখনও মসজিদে নববীতে ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে যদি বিভেদের এই ফাটল তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা না হয়, তবে উম্মাহর বিভক্তির প্রক্রিয়া শুরু হতে দেরি হবে না। তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই বাণীগুলোও ছিল যাতে শাসন ও নেতৃত্বের দায়িত্ব কুরাইশদের ওপর অর্পণ করার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, তাই তিনি প্রয়োজনীয় মনে করলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে মানুষের সন্দেহ দূর করে তাদের এই বিষয়ে রাজি করানো হোক যে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোত্রেরই কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে আমির হিসেবে নির্বাচন করে নেয়।

হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর এবং হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-কে সাথে নিয়ে দ্রুত 'সকিফাহ বনী সায়েদাহ'-তে পৌঁছালেন।

সেখানে প্রথমে আনসারদের একজন প্রতিনিধি তার ভাষণে আনসারদের মর্যাদা ও কৃতিত্ব বর্ণনা করলেন। এর জবাবে হযরত উমর (রা.) মানুষকে বোঝানোর জন্য মনে মনে একটি ভাষণ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাকে কথা বলতে নিষেধ করলেন এবং নিজে পরিস্থিতির উপযোগী অত্যন্ত যথাযথ আলোচনা করলেন। [২]

এটি ছিল একটি উন্মুক্ত পরামর্শ সভা যেখানে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত উদারতার সাথে একে অপরের কথা শুনছিলেন এবং কোনো বাধা বা চাপের সম্মুখীন না হয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ছিল এক এবং তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের কেন্দ্রিকতা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হয়। এই পরামর্শ সভায়...

---

[১] তারিখ আত-তাবারী: ২/৪৫৫

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাব কওলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাও কুনতু মুত্তাখিজান খলিলা

যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর প্রথম বড় পরামর্শ সভা ছিল, একে মুসলমানদের মধ্যে শুরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলা যেতে পারে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নববী নির্দেশনার আলোকে কুরাইশদের নেতৃত্বকে জরুরি মনে করতেন। অন্যদিকে আনসারদের মধ্য থেকে কাউকে আমির বানানোর ব্যাপারে খোদ আনসাররাও একমত হতে পারতেন না। আউস গোত্রের কাউকে আমির বানানো হলে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা অসন্তুষ্ট হতো, আর খাযরাজ গোত্রের কাউকে বানানো হলে আউস গোত্রের লোকেরা সন্তুষ্ট হতো না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের শুরু থেকে কথা আরম্ভ করে বললেন:

“আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ ﷺ-কে হিদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে প্রেরণ করেছেন, অতঃপর আল্লাহ আমাদের অন্তর ও ললাটকে দৃঢ় রেখে তাঁর দাওয়াত কবুল করার সৌভাগ্য দান করেছেন।” [১]

তিনি আনসারদের জাতীয় ও ধর্মীয় খিদমতের প্রশংসা করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং বললেন:

“আপনারা সেই সকল ফযিলতের যথাযথ হকদার, যা আপনারা উল্লেখ করেছেন।” [২]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আনসারদের ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো হাদীস বাদ দেননি এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করে এই নববী বাণীটি পুনরাবৃত্তি করলেন:

“যদি মানুষ এক পথে চলে আর আনসাররা অন্য পথে চলে, তবে আমি আনসারদের পথেই চলব।” [৩]

কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি লোকদের এটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এই সময়ে নেতৃত্ব কুরাইশদের হাতে অর্পণ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি বললেন:

“আমরা মুহাজিররা মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটাত্মীয়।” [৪]

“আল্লাহর কসম! আমরা আপনাদের ফযিলত, ইসলামের জন্য আপনাদের অবদান এবং আমাদের ওপর আপনাদের অধিকার অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনারা জানেন যে, আরবে কুরাইশ গোত্রের এমন মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে যা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। আরবের গোত্রগুলো কুরাইশ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ওপর একমত হবে না। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং ইসলামকে খণ্ড-বিখণ্ড করবেন না, ইসলামে ফাটল সৃষ্টিকারী প্রথম ব্যক্তি হবেন না।” [৫]

অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সমস্যার সমাধান পেশ করে বললেন: “আমির হবে আমাদের মধ্য থেকে আর উজির হবে আপনাদের মধ্য থেকে।” [৬]

কিন্তু একজন আনসারী সরদার হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.) বললেন: “এমন করা হোক যে, একজন আমির আমাদের মধ্য থেকে হবে আর একজন আপনাদের মধ্য থেকে।”

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন: “না! ইমারত আমাদের, নেতৃত্ব আমাদের; কারণ কুরাইশরা সবচেয়ে সম্মানিত ভূখণ্ডের অধিবাসী এবং حسب و نسب (বংশমর্যাদা) এর দিক থেকেও তারা সবার ঊর্ধ্বে।” [৭]

---

[১] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৪৩, ত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[২] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৩৯১

[৩] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১৮

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৪৩

[৫] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪৩৩, ত: আর-রুশদ

[৬] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাব: কওলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘লাও কুনতু মুত্তাখিযান খালীলান’

[৭] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাব: কওলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘লাও কুনতু মুত্তাখিযান খালীলান’

মূলত দুইজন শাসকের প্রস্তাব কার্যকর করা ইসলামী রাষ্ট্রকে শুরু থেকেই ধ্বংস করার শামিল ছিল; কারণ এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় যে, এক সাম্রাজ্যে দুইজন রাজা একত্রে থাকতে পারেন না। তাছাড়া আরবের লোকেরাও এ কথা মেনে নিতে পারত না যে, তাদের সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোত্র ছাড়া অন্য কোনো গোত্রের হবে। এই কারণেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন: 'এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না।' [১]

এই সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের অবস্থানের পক্ষে দলিল পেশ করে হযরত সাদ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন: 'হে সাদ! আপনি জানেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উপস্থিতিতে বলেছিলেন: নেতৃত্বের দায়িত্বভার কুরাইশদের ওপর, ভালো লোকেরা তাদের ভালোদের অনুসরণ করে এবং মন্দ লোকেরা তাদের মন্দদের অনুসরণ করে।' সাদ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদিসটি মনে পড়ে গেল, তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই বলে উঠলেন: 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা উজির এবং আপনারা আমির।' [২]

তখন আনসারদের মধ্য থেকে বশির বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের কওমকে সম্বোধন করে আবেগঘন কণ্ঠে বললেন: 'হে আনসার! নিঃসন্দেহে আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অগ্রণী ছিলাম, কিন্তু এর মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। আমাদের জন্য এটি শোভা পায় না যে, নিজেদের দ্বীনি খিদমতের বিনিময়ে কোনো পদ লাভের চেষ্টা করব বা দুনিয়ার প্রত্যাশী হব। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের ছিলেন এবং তাঁর গোত্রই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অধিক হকদার।' [৩]

অন্য একজন আনসারী উচ্চস্বরে বললেন: 'ভাইসব! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধিও মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারী ছিলাম, তাঁর প্রতিনিধিরও সাহায্যকারী হয়ে থাকব।' [৪]

আনসাররা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। আনসারদের স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর পর খিলাফতের সমস্যা সমাধান করা আর তেমন কঠিন ছিল না। দুটি বিষয়ে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল: এক. আমির একজনই হবেন। দুই. তাঁর নিয়োগ কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সমীচীন মনে করলেন যে, এখন পরবর্তী বিষয় অর্থাৎ আমির নির্বাচনের বিষয়টিও এই মজলিসেই চূড়ান্ত করে নেওয়া হোক। তাই তিনি বললেন: 'তাহলে উত্তম হয় যে, তোমরা উমর অথবা আবু উবাইদাহর হাতে বায়আত গ্রহণ করো।' [৫]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অসাধারণ মর্যাদা এ থেকেই স্পষ্ট ছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: 'যদি আমার পরে কোনো নবী হতো, তবে উমর হতো।' [৬]

---

[১] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৯৭৫৮, ত: আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৮; [৩] তারিখুত তাবারী: ২২১/৩

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২০/৮; তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির: ২৭৭/৩০ আন বায়হাকী

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৬৮। মূলত সেই সময়ে আশারায়ে মুবাশশারার মধ্য থেকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া এই দুইজন ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন, তাই তাঁদের নাম নেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে, হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে বেশি ছিল। হযরত উসমান এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মর্যাদা বাকি আশারায়ে মুবাশশারার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, যেমনটি অসংখ্য হাদিস দ্বারা স্পষ্ট যা হাদিসের কিতাবসমূহে "মানাকিব" এবং "ফাযায়েল" শিরোনামের অধীনে দেখা যেতে পারে।

[৬] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৬৮৬; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৭৩০৫

হযরত আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ (রা.)-ও আশারা মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর আমানতদারি ও নেতৃত্বের যোগ্যতার কারণে তাঁকে নবুওয়াতের দরবার থেকে 'আমীনুল উম্মত' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবার কাছে, বিশেষ করে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মর্যাদা অনেক বেশি ছিল। হযরত উমর (রা.) নিজেও এটা সহ্য করতে পারতেন না যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর উপস্থিতিতে অন্য কেউ বড় হোক। তিনি লোকদের ডেকে বললেন: "তোমরা কি জানো না যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামাজের জন্য সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি সবাইকে নামাজ পড়িয়েছিলেন?" সবাই বলল: "হ্যাঁ, অবশ্যই।" হযরত উমর (রা.) বললেন: "তাহলে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আবু বকর (রা.)-এর আগে বাড়তে চায়?" সবাই বলল: "আল্লাহ মাফ করুন। আমাদের মধ্যে কেউ এটা পছন্দ করবে না।" [১]

**হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বায়াত সম্পন্ন হলো:**

অতঃপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে বললেন: "আমরা সবাই আপনার হাতেই বায়াত গ্রহণ করব। আপনি আমাদের মুরুব্বি, সর্বোত্তম মানুষ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।" [২]

এদিকে হযরত উমর (রা.) বায়াত গ্রহণের জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর হাত ধরে টেনে সামনে আনলেন, আর ওদিকে বশীর বিন সাদ আনসারী (রা.) দ্রুত এগিয়ে এসে সবার আগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর হাতের ওপর হাত রেখে বায়াত ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন। এরপর সবাই একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সাহাবায়ে কেরামের এই প্রতিনিধি সভায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফতের ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। [৩]

**হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কেন বায়াত গ্রহণ করলেন?**

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নিজে ক্ষমতার প্রত্যাশী ছিলেন না, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি বিপদ অনুভব করছিলেন যে, যদি এই দায়িত্ব এখনই গ্রহণ না করা হয় তবে মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নিজের শব্দগুলো হলো:

"وَتَخَوَّفْتُ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةٌ بَعْدَهَا رِدَّةٌ"

"আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে এমন কোনো ফিতনা যেন দেখা না দেয় যার ফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" [৪]

---

[১] আশ-শরীয়াহ লিল-আজুররী, হা: ১১৯৮, ত: দারুল ওয়াতান; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ৮৫৫; মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩৩; সনদ হাসান।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৬৮, কিতাবুল মানাকিব, বাব: কওলুন নবী (সা.) লাও কুনতু মুত্তাখিযান খলীলান।

[৩] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৭০২৩, ত: আর-রুশদ; তারিখুত তাবারী: ২২১/৩।

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৩২; সনদ সহীহ।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরামর্শ, আলোচনা এবং বায়াতের এই মজলিস (যা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছিল) আধ থেকে পৌনে এক ঘণ্টার বেশি দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু গল্পকাররা এই মজলিস সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এবং হযরত সাদ বিন উবাদাহ (রা.)-এর বায়াত থেকে বিমুখ হওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বানিয়েছেন। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত দীর্ঘ আলোচনার কোনো অবকাশ ছিল না। আমরা এখানে ইতিহাসের অতিরঞ্জিত বর্ণনা বাদ দিয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহ, বিশেষ করে সহীহ বুখারী এবং মুসনাদে আহমাদ-এর নির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে লিখেছি, যা মাত্র দুই-তিনটি পৃষ্ঠায় তারিখুত তাবারী এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে নেওয়া হয়েছে। বুখারীর বর্ণনাটি "সহীহ" এবং মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনাটি "সহীহ মুরসাল"। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খিলাফতের পরামর্শ অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে হয়েছিল এবং হযরত সাদ বিন উবাদাহ (রা.) ওই মজলিসেই খিলাফতের জন্য কুরাইশদের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই আবু মাখনাফের মতো লোকদের ভিত্তিহীন বর্ণনার কোনো গুরুত্ব নেই। এসব ভিত্তিহীন বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা নিজের ঈমানকে বিপদে ফেলার নামান্তর।

**রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল ও কাফন:**

এই সময়ে পবিত্র গৃহের অভ্যন্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল এবং দাফন-কাফনের কার্যাদি সম্পন্ন করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিন তো শোক ও দুঃখের আতিশয্যের কারণে রিসালাতের প্রদীপের পতঙ্গরা এক প্রকার স্তব্ধ অবস্থায় ছিলেন, তাই কারও মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করার শক্তিই সঞ্চারিত হতে পারছিল না। আসলে কে-ই বা ছিল যে তার প্রিয় মাওলা ﷺ-এর পবিত্র দেহকে মাটির নিচে দাফন করার সাহস করত? কে-ই বা ছিল যে নিজ হাতে নিজের জীবনের আশাকে চোখের আড়াল করত? স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং মানসিক শক্তিগুলো পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর যখন জ্ঞান ও চেতনা ফিরে এল এবং সেই চরম অবস্থা কেটে গেল, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.), জামাতা হযরত আলী (রা.) এবং ফুফাতো ভাই হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) গোসল দেওয়া এবং কাফন পরানোর কাজে নিয়োজিত হলেন। [১] এই ব্যক্তিবর্গ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন, তাই তাঁর শেষ খেদমতগুলো আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তারাই বেশি হকদার ছিলেন।

**রাসুলের প্রতিনিধির আনুষ্ঠানিক বায়আত:**

সকিফা বনী সায়েদাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বায়আত সেই সব সাহাবীই করেছিলেন যারা সেখানে দৈবক্রমে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন আনসার, তাও আবার বনু খাযরাজ গোত্রের। যেহেতু সেখানে আকস্মিকভাবে খিলাফতের যোগ্যতার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাই কাউকে দাওয়াত দেওয়ার প্রশ্নই আসত না। ফলে অনেক সাহাবী এমনকি হযরত আলী, হযরত আব্বাস এবং হযরত জুবাইর (রা.)-এর মতো ব্যক্তিরাও এই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। মজলিসে শুরার সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে দাওয়াত দিয়ে পরামর্শ করা হয়নি, যেমনটি ইসলামী রাজনীতির মূলনীতির দাবি ছিল। [১] ফলে পরের দিন মঙ্গলবার সাহাবীদের সাধারণ সমাবেশে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি ও খলীফার বায়আতের ব্যবস্থা করা হলো। [২] হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে এই প্রারম্ভিক কথাগুলো বললেন:

---

[১] সীরাত ইবনে হিশাম: ৪/২৬২, ত. মুস্তফা আল-বাবি।

[২] এজন্য হযরত উমর (রা.) জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া একটি فیصلے এবং শরীয়তের স্থায়ী রাজনৈতিক মূলনীতির পার্থক্য স্পষ্ট করে পরবর্তীতে বলতেন: “আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, অমুক ব্যক্তি বলছে: যদি উমরের মৃত্যু হয় তবে আমি অমুকের হাতে বায়আত করব। কেউ যেন এই কথায় ধোঁকা না খায় যে, আবু বকর (রা.)-এর বায়আতও হঠাৎ হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে তা হঠাৎ করেই হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। তোমাদের মধ্যে এখন এমন কে আছে যে আবু বকর (রা.)-এর মতো মানুষের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে? যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন তখন তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন।” (সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৪১৪১-৪১৪২)। তিনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কারও হাতে বায়আত করবে, তবে তার অনুসরণ করা হবে না এবং যার হাতে বায়আত করা হয়েছে তারও নয়, বরং উভয়কেই হত্যা করা হবে।” (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৯৭৫৮, ত. আল-মাজলিস আল-ইলমি পাকিস্তান)।

প্রকৃতপক্ষে হযরত সিদ্দিক আকবর (রা.)-এর প্রাথমিক বায়আত যা সকিফা বনী সায়েদাতে হয়েছিল, তাতে হযরত উমর (রা.)-এর অত্যন্ত মৌলিক ভূমিকা ছিল এবং তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি এটি আঁচ করতে পেরেছিল যে, যদি অনেক বড় বড় সাহাবীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এই বিষয়টি এখনই মীমাংসা না করা হয় তবে মুসলমানরা প্রথম দিন থেকেই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাই তিনি নিজ থেকে এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এখানে কয়েকজন বড় প্রতিনিধির উপস্থিতি সবার স্থলাভিষিক্ত এবং ইনশাআল্লাহ হযরত আবু বকর (রা.)-এর পক্ষে সবার সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে। আর আলহামদুলিল্লাহ তেমনই হয়েছে। বায়আতের সৌভাগ্য এবং আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে শায়খাইন সকিফাতে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। আনসাররা তাদের কোনো নেতার হাতে বায়আত করেনি, অন্যথায় একবার বায়আত করে তারা তা ভাঙতে সহজে রাজি হতো না। কারণ আরবদের কাছে মৌখিক অঙ্গীকারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর আকস্মিক বায়আত সত্ত্বেও তাঁর ওপর সবার ঐক্যমত নিঃসন্দেহে তাঁর ইজমাঈ শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা, আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাঁর গায়েবী সাহায্যের এক সুস্পষ্ট দলিল।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৭৩১৯, কিতাবুল আহকাম, বাবু ইস্তিখলাফ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৩১৬।

“আমি তো আশা করতাম যে রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকবেন এমনকি আমাদের সবার পরে বিদায় নেবেন। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ আমাদের মাঝে সেই নূর বাকি রেখেছেন যা থেকে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পারো। এটি সেই হেদায়েতের নূর যা আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করেছিলেন। আবু বকর ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বস্ত সাহাবী। বলো, ‘ইয হুমা ফিল গারি’ (যখন তারা উভয়ে গুহায় ছিল) দ্বারা কোন দুজনকে বোঝানো হয়েছে? ‘ইয ইয়াকুলু লিসাহিবিহি’ (যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন)-এর লক্ষ্য আর কে? ‘লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা’ (চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন) কাদের সম্পর্কে? হে লোকসকল! ইনি হলেন ‘সানি ইসনাইন’ (দুইজনের দ্বিতীয়জন)। মুসলমানদের বিষয়াদি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনিই সবার চেয়ে উত্তম। অতএব আপনারা দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করুন।” [১]

তারপর হযরত উমর ﷺ জেদ করে হযরত আবু বকর ﷺ-কে মিম্বরে বসালেন এবং লোকজন বায়আত গ্রহণ করল। বায়আতের পদ্ধতি ছিল সেটিই যা আরবদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছিল অর্থাৎ হাতে হাত রেখে আনুগত্যের অঙ্গীকার করা হতো।

হযরত আলী এবং হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বায়আত করতে কেন দেরি করেছিলেন?

তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তখনও উপস্থিত ছিলেন না: এক খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সাদ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, দ্বিতীয় হযরত আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তৃতীয় হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। যেহেতু হযরত সাদ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু গতদিন খিলাফতের ওপর কুরাইশদের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এছাড়া তিনি অসুস্থও ছিলেন, তাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পুনরায় কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু হযরত আলী এবং হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা না থাকায় ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারত, তাই আপনি (আবু বকর) রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশেষভাবে তাঁদের দুজনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ ছিল এই যে, তাঁরা উভয়েই নববী গৃহে কাফন-দাফনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই উপস্থিত হতে পারেননি। [২]

কিন্তু যেহেতু মুনাফিকরা গুজব ছড়াতে পারত যে এই ব্যক্তিবর্গ বায়আতের সাথে একমত নন, তাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী এবং হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-র কেবল উপস্থিতিই জরুরি মনে করেননি বরং যখন তাঁরা আসলেন, তখন নিজের কোনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নয় বরং সম্ভাব্য গুজব নিরসনের জন্য সবার সামনে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ছড়াতে চাও?”

তাঁরা উভয়ে বললেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খলিফা, এমন কোনো কথা নয়।” এই বলে তাঁরা উভয়ে বায়আত করলেন। [৩]

তাঁরা উভয়ে এও বললেন: “আমাদের মনে কিছুটা কষ্ট তো হয়েছিল যে নির্বাচনের পরামর্শে আমাদের শরিক করা হয়নি, কিন্তু আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর আপনিই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।” [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৭২১৯, কিতাবুল আহকাম, বাবুল ইস্তিখলাফ; আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ী, হা: ১১১৫৫।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩১৬, ৩১৭।

[৩] আস-সুন্নাহ লি-আবদিল্লাহ বিন আহমাদ, হা: ১২৯২; মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৪৪৫৭; আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হা: ১৬৫৩৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এই বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমকে দেখানো হলে তিনি এর সত্যায়ন করেন। (আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হা: ১৬৫৩৯)। জানা গেল যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বায়আতে কিছুটা দেরি করার বর্ণনাটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/৩১৭। মূসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন, এর সনদ উত্তম এবং আল্লাহরই প্রশংসা... বায়আত বিলম্বিত করার যদি কোনো দলিল থেকে থাকে, তবে তা হলো ইমাম যুহরী কর্তৃক হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ বর্ণনা যার সারসংক্ষেপ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)।

একটি বর্ণনা অনুযায়ী, যখন আলী (রা.)-কে জানানো হলো যে আবু বকর (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করা হচ্ছে, তখন তিনি এত...

(পূর্ববর্তী টীকাংশ) ছয় মাস পর ফাতিমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। এরপর আলী (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে বায়আত করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাঁর কাছে এই বার্তা পাঠান যে, "হে আবু বকর! আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যে স্থান দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত। আমরা সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ঈর্ষান্বিত নই যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। কিন্তু আপনি আমাদের পরামর্শ ছাড়াই শাসক হয়ে বসেছেন; আমাদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আত্মীয়তার কারণে পরামর্শে আমাদেরও অংশ থাকবে।" এটি শুনে আবু বকর (রা.)-এর চোখে পানি চলে এল এবং তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আত্মীয়তা রক্ষা করা আমার কাছে নিজের আত্মীয়তা রক্ষা করার চেয়েও বেশি প্রিয়।" আরও কিছু আলোচনার পর আলী (রা.) বললেন: "আমি আগামীকাল আপনার সাথে দেখা করব।" যখন (পরের দিন) আবু বকর (রা.) মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন, তখন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর আলী (রা.)-এর অবস্থা এবং বায়আতে তাঁর বিলম্বের কারণ ঘোষণা করলেন এবং তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর আলী (রা.) মিম্বরের কাছে গিয়ে আবু বকর (রা.)-এর মহানুভবতা বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন: "আবু বকর (রা.)-এর প্রতি কোনো হিংসা আমাকে এমন করতে প্ররোচিত করেনি, আর আল্লাহ তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন আমি তা অস্বীকারও করি না। কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল যে পরামর্শে আমাদেরও অংশ থাকবে এবং তিনি তা ছাড়াই আমাদের শাসক হয়ে গেছেন। তাই আমরা মনে মনে কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলাম।" (সহীহ বুখারী, হা: ৪২৪০, অধ্যায়: গাযওয়ায়ে খায়বার; সহীহ মুসলিম, হা: ১৭৫৯, কিতাবুল জিহাদ)

এই বর্ণনাটিই কিছু মুহাদ্দিস এই সংযোজনসহ বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আলী (রা.) কি ছয় মাস পর্যন্ত বায়আত করেননি? তিনি বললেন: "না, আর বনু হাশিমের কেউই বায়আত করেনি যতক্ষণ না আলী (রা.) বায়আত করেছেন।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৯৭৮৪; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ৬/২৫৩)

একদল আলেম এই বর্ণনাগুলোকে হুবহু গ্রহণ করে এই মত পোষণ করেন যে, আলী (রা.) ছয় মাস পরেই বায়আত করেছিলেন। তবে এই ব্যক্তিবর্গ স্পষ্ট করেন যে, তা সত্ত্বেও আলী (রা.)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আনা যায় না এবং আবু বকর (রা.)-এর বায়আত সম্পন্ন হওয়াও সন্দেহযুক্ত হয় না। ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন:

"যেখানে আলী (রা.)-এর বায়আতে বিলম্বের বিষয়টি রয়েছে, আলী (রা.) নিজেই তা উল্লিখিত বর্ণনায় ব্যক্ত করেছেন এবং আবু বকর (রা.) তাঁর ওজর গ্রহণ করেছেন। আর তা সত্ত্বেও এই বিলম্ব বায়আতকে প্রভাবিত করে না এবং আলী (রা.)-কেও নয়। বায়আত সম্পর্কে আলেমদের ঐকমত্য হলো যে, এর শুদ্ধতার জন্য সমস্ত মানুষ বা সমস্ত 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ)-এর সমাবেশ শর্ত নয়। বরং আলেম, নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের বায়আতের ওপর ঐকমত্যই শর্ত। এটি (বায়আতে বিলম্ব) আলী (রা.)-এর মর্যাদাকে এজন্য ক্ষুণ্ণ করে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর এটি ওয়াজিব নয় যে সে খলিফার কাছে যাবে এবং তাঁর হাতে হাত রেখে বায়আত করবে। বরং ওয়াজিব হলো কেবল এটিই যে, যখন 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কারো ইমামতের (নেতৃত্বের) ওপর একমত হয়ে যাবে, তখন তাঁর আনুগত্য করা। কোনো মতভেদ না করা এবং সামষ্টিক পরিবেশ নষ্ট না করা। আলী (রা.)-এর বায়আতের পূর্বেও অবস্থা এমনই ছিল যে, তিনি আবু বকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো মতভেদ প্রকাশ করেননি, আর না তাঁর মর্যাদার কারণে বায়আতের জন্য উপস্থিতিতে বিলম্ব করেছিলেন যা এই বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে। (আবু বকর (রা.)-এর) বায়আত প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা না হওয়া আলী (রা.)-এর উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ছিল না। যখন এটি জরুরি ছিল না, তখন তিনি উপস্থিতও হননি। তাঁর থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বায়আতকে প্রভাবিত করে না এবং তাঁর বিরোধিতাও প্রকাশ করে না। হ্যাঁ, তবে তাঁর মনে কিছুটা অসন্তুষ্টি ছিল এবং যতক্ষণ তা দূর হয়নি, তিনি উপস্থিত হওয়া স্থগিত রেখেছিলেন। এই অসন্তুষ্টির কারণ ছিল এই যে, তিনি নিজের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং নবী (সা.)-এর সাথে নৈকট্যের কারণে মনে করতেন যে, খিলাফতের বিষয়টি তাঁদের পরামর্শ ও উপস্থিতিতেই নির্ধারিত হবে। কিন্তু আবু বকর, উমর এবং সমস্ত সাহাবী (রা.)-এর ওজর স্পষ্ট: কারণ তাঁরা তাৎক্ষণিক বায়আত গ্রহণকে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কল্যাণ মনে করেছিলেন এবং এতে বিলম্বের ফলে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ সৃষ্টির ভয় ছিল যা থেকে বড় ধরনের ফিতনা সৃষ্টি হতে পারত।"

---

(শারহু নববী: ১২/৮২, দারু ইহয়াইত তুরাস; এবং আইনীও উমদাতুল কারী: ১৭/২৫৮, তাবা দারু ইহয়াইত তুরাস-এ অনুরূপ বলেছেন)

এটি ছিল সেই সব ব্যক্তিবর্গের মত যারা ছয় মাস পর বায়আতের বর্ণনাগুলোকে হুবহু মেনে নেন। প্রকৃতপক্ষে এতেও জমহুর মুসলিমদের মাযহাবের ওপর কোনো আঁচ আসে না, যেমনটি ইমাম নববীর বক্তব্য থেকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অন্যদিকে আলেমদের একটি বড় দল এই বর্ণনাগুলোকে পর্যালোচনার যোগ্য মনে করেন। তাঁদের অবস্থান হলো, এই বর্ণনাগুলো সহীহ হলেও এটি জরুরি নয় যে সহীহ সনদের বর্ণনা কোনোভাবেই আলোচনার বিষয় হতে পারবে না। বিশেষ করে যখন এর বিপরীতে আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। এই আলেমদের মধ্যে ইমাম বায়হাকী (রহ.) শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন যিনি যুহরীর বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন:

"ফাতিমা (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আলী (রা.)-এর আবু বকর (রা.)-এর বায়আত থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যুহরীর বক্তব্যটি 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা, যার অনুযায়ী আলী (রা.) সাকীফার পর আবু বকর (রা.)-এর সাধারণ বায়আত করেছিলেন, সেটিই অগ্রগণ্য।" (আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১২৭৩২)

অন্যরা যুহরীর বর্ণনায় "ছয় মাস পর" শব্দটিকে ইমাম যুহরীর বিভ্রম এবং বর্ণনাকারীর প্রক্ষিপ্ত অংশ (ইদরাজ) হিসেবে গণ্য করেছেন। (আল-ইতিকাদ, পৃ: ৩৫৩, তাবা দারুল আফাক)

হাফিয ইবনে হাজার (রহ.) এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন:

"ইবনে হিব্বান এবং অন্যান্য আলেম আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এবং অন্যান্যদের সেই বর্ণনাগুলোকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন যার অনুযায়ী আলী (রা.) শুরুতেই বায়আত করে নিয়েছিলেন।" এরপর তিনি সেই আলেমদের মত উল্লেখ করেছেন যারা বর্ণনাগুলোর বৈপরীত্য দূর করার জন্য সমন্বয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তিনি বলেন:

"অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বর্ণনাগুলোকে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, এটি ছিল দ্বিতীয় বায়আত যা প্রথম বায়আতের গুরুত্বারোপের জন্য ছিল, যাতে মিরাসের কারণে যা কিছু ঘটেছিল তার নিরসন হয়ে যায় যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই অবস্থায় যুহরীর বক্তব্য যে আলী (রা.) ওই দিনগুলোতে বায়আত করেননি, তা আলী (রা.)-এর আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর... (বাকি টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন যে চাদর পর্যন্ত সাথে নেননি। [১]

**বাইয়াতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর প্রথম ভাষণ:**

বাইয়াতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

“আল্লাহর কসম! আমার কখনো নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমি কখনো আল্লাহর কাছে শাসনের জন্য দোয়া করিনি। কিন্তু ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই পদে আমি কোনো আরাম পাচ্ছি না। আমাকে তো এমন এক দায়িত্বের জোয়াল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর তাওফিক ছাড়া এটি বহন করার শক্তি আমার নেই।” [২]

তারপর তিনি বলেন:

“হে লোকসকল! আমাকে তোমাদের শাসক বানানো হয়েছে, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তবে আমাকে সহযোগিতা করো, আর যদি মন্দ কাজ করি তবে আমাকে সংশোধন করে দিও। সত্য হলো আমানত এবং মিথ্যা হলো খিয়ানত।”

তিনি সরকারের মৌলিক দায়িত্বের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন:

“জাতির সাধারণ মানুষ আমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যতক্ষণ না আমি তাকে তার হক আদায় করে দেই। আর জাতির শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে সাধারণ, যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে মজলুমের হক আদায় করে নেই।” [৩]

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)... আমরা মনে করি না যে উপস্থিত না থাকার কোনো ইচ্ছা ছিল বা এমন কোনো পরিস্থিতি ছিল। যেহেতু তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি আলাদা থাকতে পারেন না, তাই যখন মানুষ তাকে এই সন্দেহে ফেলল যে হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতে সন্তুষ্ট নন এবং তারা এই কথাটি প্রচার করে দিল, তখন হযরত আলী (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর বাইয়াতের বিষয়টি প্রকাশ্য করার জন্য পুনরায় বাইয়াত করেন। (ফাতহুল বারী: ৭/৪৯৪, ৩/৩৯৫, দারুল মা’রিফাহ)। হাফেজ ইবনে কাসীরও বলেছেন যে, ছয় মাস পর যা হয়েছে তা ছিল মূলত বাইয়াতের নবায়ন। আসল বাইয়াত আগেই হয়ে গিয়েছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৫/১৮৮)। ছয় মাস পর বাইয়াতের বর্ণনায় কিছু দুর্বল বর্ণনাও রয়েছে। যেমন একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী (রা.)-কে বাইয়াতে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, “আমি লক্ষ্য করলাম যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তাই আমি শপথ করলাম যে ফরজ নামাজ ছাড়া চাদর গায়ে দেব না যতক্ষণ না আমি কুরআন একত্রিত করি।” (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা: ৬/৪৪৭, এবং ইবনে সাদ আল-তাবাকাত-এ এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: “আমি লক্ষ্য করলাম যে আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে, তাই আমি শপথ করলাম যে কুরআন একত্রিত না করা পর্যন্ত চাদর গায়ে দেব না”)। অর্থাৎ তিনি বাইয়াত হতে কয়েক মাস দেরি করেছিলেন কারণ তিনি কুরআন একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছু আলেম বলেছেন যে, তিনি তার স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে ব্যস্ত ছিলেন এবং ছয় মাস পর তার ইন্তেকালের পর তিনি পুনরায় বাইয়াত করেন। তবে এটি স্পষ্ট যে, এই ওজর তাকে বাইয়াত থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং তিনি ঘরে বসে থাকেননি। হযরত আলী (রা.) আনসারদের সাথে নামাজের জন্য মসজিদে নববীতে উপস্থিত হতেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইমামতিতে নামাজ আদায় করতেন। এটি এমন একটি কাজ যা বাইয়াতের পর মাত্র এক মিনিটের ব্যাপার ছিল। সুতরাং এমন বর্ণনাও হতে পারে যে হযরত আলী (রা.) বাইয়াত করার পরও বাইয়াতের আনুষঙ্গিক খেদমত থেকে নিজেকে কিছুকাল দূরে রেখেছিলেন। এর ফলে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তিনি পরে তা দূর করার জন্য বাইয়াতের নবায়ন করেন। শিয়াদের নির্ভরযোগ্য ও প্রাচীন কিতাব থেকেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে হযরত আলী (রা.) শুরুতেই বাইয়াত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির থেকে বর্ণিত যে, ওসামা বিন জায়েদ যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের খবর শুনে মদিনায় ফিরে আসলেন, তখন দেখলেন যে মানুষ হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে একত্রিত হয়েছে। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাইয়াত করেছেন?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” (আল-ইহতিজাজ লিত-তাবারসি: ১/১৩১)। স্পষ্ট যে হযরত ওসামা (রা.)-এর মদিনায় ফেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের খবরের পরপরই হয়েছিল। সেই সময় হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বাইয়াতের স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে এটি শুরুতেই হয়েছিল। সুতরাং ছয় মাস পর বাইয়াতের বর্ণনাটি মারজুহ (অপ্রধান) এবং ব্যাখ্যার যোগ্য।

[১] বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা (১) তারিখ আল-তাবারী: ২/৪৪৭

[২] আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম: ৩/৪৪২, সহীহ সনদে

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৮২; তারিখ আল-খুলাফা লিস-সুয়ূতী, পৃ. ৫৯, ত. মাকতাবা নিযার।

এই নির্দেশগুলোর মধ্যে এই বার্তা নিহিত ছিল যে, সরকার প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ এবং দুর্বলদের দেখাশোনার জন্য অস্তিত্বে আসে। অন্যথায়, আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো তাদের মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে ঘরে বসেই অধিকার পেতে থাকে; সরকারি সেবার আসল প্রয়োজন সাধারণ মানুষের। তাই ইসলামি সরকার তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেবে। এই নির্দেশে এই সতর্কবাণীও ছিল যে, আমিরদের অন্যদের হক নষ্ট করার অভ্যাস থেকে দূরে থাকা উচিত; কারণ ইসলামি সরকার বঞ্চিত মানুষের সহায়তায় সদা প্রস্তুত এবং তাদের সমর্থক।

আপনি জিহাদের গুরুত্ব এবং গুনাহের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন:
“মনে রেখো! যখনই কোনো জাতি জিহাদ ত্যাগ করেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিয়েছেন। যখনই কোনো জাতির মধ্যে পাপাচার বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদের সর্বব্যাপী দুর্যোগে লিপ্ত করেন।”

পরিশেষে ইসলামি সরকারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত হওয়ার আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন:
“যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করি, ততক্ষণ আমার অনুসরণ করো। যদি আমি আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যতা করতে শুরু করি, তবে তোমাদের ওপর আমার অনুসরণ করা আবশ্যক নয়।” [১]

**যখন রিসালাতের প্রদীপ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল:**

হুজুর আকদাস ﷺ-এর দাফন-কাফনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে সাহাবায়ে কেরাম رضی الله عنهم জানাজার নামাজ আদায় করার জন্য সমবেত হলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক رضی الله عنه-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: “জানাজার নামাজ কীভাবে পড়ব?” তিনি বললেন: “দলে দলে বিভক্ত হয়ে ভেতরে যাও এবং নামাজ পড়তে থাকো।” সে অনুযায়ী জানাজার নামাজ আদায় করা হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জানাজা হুজরায়ে আয়েশাতেই ছিল; অল্প অল্প করে মানুষ হুজরার ভেতরে যেতেন এবং নিজেদের নামাজ পড়ে বাইরে চলে আসতেন। জানাজার নামাজের ইমামতি কেউ করেননি। এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এরই অসিয়ত ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকালের আগে বলেছিলেন:
“প্রথমে আমার পরিবারের সদস্যরা আমার জানাজার নামাজ আদায় করবে। সব মানুষ একা একা জানাজার নামাজ আদায় করবে।” [১]

এই নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে আহলে বাইত, তারপর পুরুষরা, তারপর মহিলারা, তারপর শিশুরা এবং এরপর গোলামরা জানাজার নামাজ পড়লেন। [২]
যেহেতু মানুষ ছিল হাজার হাজার, অথচ হুজরায়ে আয়েশায় এক সময়ে অল্প কিছু মানুষই প্রবেশ করতে পারত, তাই জানাজার নামাজের প্রক্রিয়ায় পুরো দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এখন এই প্রশ্ন দেখা দিল যে, কোথায় দাফন করা হবে? মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দিল এবং মতভেদ সৃষ্টি হতে লাগল। কেউ বলল: হুজরা শরীফেই দাফন করা হোক, আবার কেউ বলল: সাধারণ মুসলমানদের সাথে। তখন—

---

[১] তারিখুত তাবারী: ৩/২৩০

[২] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২৩৪

[৩] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২৫০

আদব হলো এই যে, হুজরা বলতে শুধু কক্ষ নয় বরং ঘরের সেই অংশকে বোঝায় যা কক্ষ ও আঙিনার মাঝখানে থাকে। মদিনা মুনাওয়ারা এয়ারপোর্ট রোডে ডক্টর আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামে সেই সময়ের মাদানি সভ্যতার একটি সম্ভাব্য নকশা মডেল আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে রিসালাতের যুগের মসজিদে নববী এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ঘরগুলোর মডেলও দেখা যেতে পারে। সেগুলো দেখে হুজরার সঠিক অর্থও বোঝা যায়। হুজরা শরীফের দুটি দরজা ছিল। একটি গলিতে এবং অন্যটি মসজিদের ভেতরের দিকে খুলত। তাই এটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, জানাজার নামাজের জন্য মানুষ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং জানাজার নামাজ পড়ে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবীকে সেই স্থানেই দাফন করা হয় যেখানে তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে।”

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা সরিয়ে সেখানেই কবর খনন শুরু করা হলো। [১]

মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে উম্মাহাতুল মুমিনীন নিজ নিজ হুজরায় শক্ত জমিনে কোদাল চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। [২]

কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম শাকরান রদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত একটি লাল চাদর কবরের ভেতরে বিছিয়ে দিলেন। হযরত আলী, হযরত আব্বাস এবং তাঁর পুত্র কুসাম বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুম কবরে প্রবেশ করে জাসাদে আতহারকে ভেতরে নামালেন। [৩]

সবশেষে হযরত মুগীরা বিন শু’বা রদিয়াল্লাহু আনহু মারকাদে নামলেন এবং হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন ঠিক করলেন, এরপর মারকাদে মাটি দিয়ে দেওয়া হলো। [৪] এবং হযরত বিলাল রদিয়াল্লাহু আনহু মশক নিয়ে কবরের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। [৫]

এভাবেই মাটির চাঁদ তাইয়্যেবার মাটিতে আত্মগোপন করল এবং সেই সাথে কান্নার শব্দে পুরো মদিনা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। আসমান ও জমিন এর চেয়ে বেশি শোকাবহ ও বেদনাদায়ক দৃশ্য কখনো দেখেনি। [৬]

পয়গম্বর আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানবাজদের জন্য এই অনুভূতি অসহ্য ছিল যে, এখন এই দুনিয়ায় তৃষ্ণার্ত চোখগুলো আর কখনো আকায়ে নামদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বাকি রাত জেগে কাটালেন। সুবহে সাদেকের সময় হযরত বিলাল বিন রাবাহ রদিয়াল্লাহু আনহু যথারীতি আযান দিতে লাগলেন। ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ পর্যন্ত পৌঁছালে আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। [৭]

**নামাজে জানাজা এবং দাফনে বিলম্ব কেন হলো?**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত সোমবার বিকেলে হয়েছিল এবং জানাজার নামাজ পরের দিন মঙ্গলবার যোহরের পর। এরপর দাফন মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে সম্পন্ন হয়। এসব কাজে বিলম্বের একটি কারণ ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের শোক ও দুঃখে ভেঙে পড়া। দ্বিতীয় বড় কারণ ছিল খেলাফতের বিষয়টি মীমাংসা করা। জানাজার নামাজ ও দাফনের কাজ এর পরেই সম্পন্ন হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাজার নামাজ ও দাফনের আগেই সম্পন্ন হওয়ার পেছনেও আল্লাহ তাআলার বড় মসলহাত প্রতীয়মান হয়। জানাজায় বিলম্ব হওয়ার কারণে এই সম্ভাবনা তো মোটেও ছিল না যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাসাদে আতহারে কোনো পরিবর্তন দেখা দেবে; কারণ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের দেহ ওফাতের পরেও সংরক্ষিত থাকে। হ্যাঁ, যদি খলিফা নির্বাচন অবিলম্বে না হতো তবে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতো।

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২৬০

[২] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২৫৬, ত. ইলমিয়্যাহ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৩৩, দারু হাজার

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২০৭৬৬

[৫] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২৬৩

[৬] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২৬৭

[৭] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৭/২৬৭

দাফন-কাফনের পূর্বে খিলাফতের সমস্যা সমাধান করা কেন জরুরি মনে করা হয়েছিল?

ইসলামের পয়গম্বর ﷺ-এর দাফন-কাফনের দায়িত্ব অসাধারণ গুরুত্ব রাখত। যদি এই মহান কাজ কোনো নেতার তত্ত্বাবধান ছাড়া সম্পন্ন করা শুরু হতো, তবে পদে পদে মতভেদ দেখা দিত। প্রথমত, এই বিষয়টিই বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত যে, জানাজার নামাজ কোথায় আদায় করা হবে? মানুষ আবেগের তীব্রতায় অভিভূত হয়ে পড়ছিল, তাই তারা খোলা ময়দানে জানাজার নামাজ আদায় করতে চাইত। অনেক মানুষ সাধারণ দিদারের (শেষ দেখা) আকাঙ্ক্ষাও করত। এমন অবস্থায় শেষ দৃষ্টি দেওয়ার সময় হাজার হাজার মানুষের শোকের আতিশয্যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা মোটেও অসম্ভব ছিল না। এই বিষয়েও মতভেদ হতো যে, জানাজার নামাজ কে পড়াবেন? দাফন কোথায় হবে? যখন প্রথমে নেতৃত্বের বিষয়টি মীমাংসা হয়ে গেল, তখন প্রতিটি কাজ একজন আমিরের কর্তৃত্বে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো।

খিলাফতের বিষয়ের গুরুত্ব এজন্যও বেশি ছিল যে, ইসলামের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর এমন কোনো সময় আসেনি যখন তারা কোনো আমির ছাড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই সবার ইমাম, পথপ্রদর্শক এবং আমির ছিলেন, যাঁর অধীনে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ও একমত ছিল। এখন কোনো আমির বা খলিফা থেকে সামান্য সময়ের বিচ্ছেদও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল এবং উম্মতের বড়রা বিপদ অনুভব করছিলেন যে, যদি এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে উম্মতে মুসলিমা কোনো বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার শিকার না হয়ে পড়ে। অনিষ্টকারী শক্তিগুলো যারা মুনাফিকদের বেশে নবুওয়াতের যুগেও সক্রিয় ছিল, তারা কোনো কথা ছড়িয়ে এই বিষয়টিকে মতভেদ এমনকি গৃহযুদ্ধের রূপ দিতে পারত, যেমনটি তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় অনেকবার এমন নিন্দনীয় চেষ্টা করেছিল। এসব কারণে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন ও দূরদর্শী মস্তিষ্কগুলোর মনোযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেদিকে নিবদ্ধ হলো যে, সবার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি মীমাংসা করে নেওয়া হোক। তারা স্থূলদর্শী বরং সংকীর্ণমনা যারা ধারণা করে যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতের চেয়ে ক্ষমতার চিন্তা বেশি ছিল, তাই তারা দাফন-কাফনের পরিবর্তে খিলাফতের যোগ্যতার বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন। বাস্তবতা ছিল এই যে, পয়গম্বর ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদের মনে পয়গম্বরের দ্বীনকে বাঁচানোর চিন্তা ছিল এবং এর জন্য এটি জরুরি ছিল যে, অবিলম্বে খিলাফতের পদ কোনো অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তির ওপর অর্পণ করে উম্মতে মুসলিমাকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত রাখা হোক।

**সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর দুঃখ ও শোক:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের বিয়োগান্তক ঘটনা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)-কে যে নিদারুণ দুঃখ ও শোকে নিমজ্জিত করেছিল, তার আন্দাজ কেবল সেই করতে পারে, যার ভাগ্যে আকায়ে নামদার ﷺ-এর মহব্বতের ব্যথা জুটেছে। হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাফন সম্পন্ন করে ফিরে এলে হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলছিলেন:

“আনাস! তোমরা কীভাবে সহ্য করলে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করে মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এলে?” [১]

শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুঃখের সাথী ও অভিভাবক হযরত উম্মে আয়মান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন...

---

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: ১৬৩১

ছিলেন: “আমরা ওহী নাযিলের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।” [১]

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-কে কয়েক মাস আগে হুজুর (সা.) ইয়ামেনের শহর ‘সানআ’ পাঠিয়েছিলেন, যেখানে তিনি মানুষকে দ্বীন শেখানো এবং শরীয়ত অনুযায়ী তাদের মাঝে ফয়সালা করার দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই রাতে তিনি নিজের বিছানায় ঘুমাচ্ছিলেন তখন কেউ একজন ডাক দিল: “মুআয! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে আর তুমি জীবনের স্বাদ গ্রহণ করছ।”

তিনি এমনভাবে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠলেন যেন কিয়ামতের শিঙায় ফুঁক দেওয়া হয়েছে। দৌড়ে সানআর গলিতে আসলেন এবং চিৎকার করে বললেন: “হে ইয়ামেনবাসী! আমাকে যেতে দাও। কী এমন ওলটপালট হয়ে গেল যে আমি আমার আকাল কদম ছেড়ে এখানে এসে বসলাম।”

মানুষ জিজ্ঞেস করতে থাকল কী হয়েছে? কিন্তু তিনি কিছু না বলে নিজের সওয়ারিকে তাড়া দিয়ে দ্রুত মদীনার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। মদীনা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল (৮০ কিলোমিটার) দূরে ছিলেন তখন সামনে থেকে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে আসতে দেখা গেল, যিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর আদেশে হুজুর (সা.)-এর ইন্তেকালের খবর নিয়ে ইয়ামেন যাচ্ছিলেন। হযরত মুআয (রা.)-কে চিনে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) তাঁকে থামালেন এবং দুর্ঘটনার সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন:

“আম্মার! এখন কার থেকে পথনির্দেশ নেব এবং কার কাছে ফরিয়াদ শোনাব?”

এই অবস্থায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর হুজরা পর্যন্ত পৌঁছালেন। দস্তক দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন এবং সমবেদনা জানালেন। তিনি বললেন: “মুআয! যদি তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ সময়টা দেখতে তবে দুনিয়ার জীবন চাই যত দীর্ঘই হোক না কেন, কখনো ভালো মনে হতো না।”

এ কথা শুনে হযরত মুআয (রা.) এত কাঁদলেন যে তাঁর ওপর মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা তৈরি হলো। [২]

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ ... فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ ... فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

“হে সেই সবচেয়ে পবিত্র সত্তা যাঁর অস্থিসমূহ মাটির নিচে দাফন করা হয়েছে
অতঃপর তাঁর সুঘ্রাণে এই জমিনও সুবাসিত হয়ে উঠেছে এবং এই গাছপালা ও ফলমূলও
আমার প্রাণ সেই কবরের ওপর উৎসর্গ হোক যাতে আপনি অবস্থান করছেন
শরাফত, দানশীলতা এবং জূদ ও করম-এর সকল গুণ এখানেই পুঞ্জীভূত।”

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩২১৫

[২] সীরাতে ইবনে হিব্বান: ২/ ৪২৭, ৪২৮

## শামায়েলে মুস্তফা ﷺ

হুজুর রহমতে দো আলম ﷺ-এর শামায়েল, স্বভাব ও গুণাবলি পরিবেষ্টন করা কোনো বড় থেকে বড় সীরাত লেখক, বাগ্মী এবং সূক্ষ্মদর্শীর পক্ষেও সম্ভব নয়। এই বিষয়ে চৌদ্দশ বছর ধরে লেখা হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলির গণনা শেষ হবে না। এখানে আমরা এই বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা ও রিক্তহস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে অত্যন্ত সংক্ষেপে হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহের ঝিনুক থেকে কিছু খাঁটি মুক্তা পেশ করছি। [১]

### হুলিয়া মুবারক:

হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রা.) নবী করীম ﷺ-এর হুলিয়া মুবারক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

“রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল। আপনার ﷺ-এর উচ্চতা ছিল মধ্যম গড়নের মানুষের চেয়ে কিছুটা বেশি, কিন্তু খুব বেশি দীর্ঘকায়দের মতো নয়। মাথা মুবারক সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বড় ছিল। চুল মুবারক কিছুটা কোঁকড়ানো ছিল। যদি সহজে সিঁথি হতো তবে সিঁথি করতেন, অন্যথায় কষ্ট করে সিঁথি করতেন না (অন্য কোনো সময়ে যখন চিরুনি ইত্যাদি থাকত তখন সিঁথি করতেন)। যে সময়ে হুজুর ﷺ-এর চুল মুবারক বেশি হতো, তা কানের লতি ছাড়িয়ে যেত।

রঙ মুবারক উজ্জ্বল ছিল এবং কপাল মুবারক প্রশস্ত ছিল। ভ্রুদ্বয় সূক্ষ্ম ও ঘন ছিল, উভয় ভ্রু আলাদা আলাদা ছিল, একে অপরের সাথে মিলিত ছিল না। এই দুইয়ের মাঝখানে একটি রগ ছিল যা রাগের সময় ফুলে উঠত।

নাক মুবারক উন্নত ছিল এবং তার ওপর একটি উজ্জ্বলতা ও নূর ছিল। শুরুতে কেউ দেখলে তাকে অনেক উঁচু মনে করত (কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যেত যে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার কারণে উঁচু মনে হচ্ছে, অন্যথায় তা খুব বেশি উঁচু নয়)।

দাড়ি মুবারক ছিল ঘন ও পূর্ণ এবং চোখের মণি ছিল অত্যন্ত কালো। গাল মুবারক মসৃণ ছিল। মুখ মুবারক সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রশস্ত ছিল (অর্থাৎ সংকীর্ণ মুখ ছিল না)। আপনার ﷺ-এর দাঁত মুবারক ছিল সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল এবং সামনের দাঁতগুলোর মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল। ঘাড় মুবারক অত্যন্ত সুন্দর ও সরু ছিল, যেন মূর্তির ঘাড় পরিষ্কার ও খোদাই করা এবং রঙে রূপার মতো পরিষ্কার ও সুন্দর ছিল।“

---

[১] শামায়েল মুবারকের ক্ষেত্রে যেখানে শামায়েলে তিরমিযীর উদ্ধৃতি রয়েছে, সেখানে ইবারতের অনুবাদ এবং ব্র্যাকেটের ভেতরের ব্যাখ্যায় শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)-এর সংকলিত “খাসায়েলে নববী শরহে শামায়েলে তিরমিযী” থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত সুষম ও মাংসল ছিল এবং শরীর সুসংহত ছিল। পেট ও সিনা মোবারক সমান ছিল, কিন্তু সিনা প্রশস্ত ও চওড়া ছিল। আপনার ﷺ দুই কাঁধের মাঝখানে কিছুটা বেশি দূরত্ব ছিল, জোড়ার হাড়গুলো শক্তিশালী ও বড় ছিল (যা শক্তির প্রমাণ)। কাপড় খোলার অবস্থায় আপনার শরীর মোবারক উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় দেখা যেত, নাভি ও সিনার মাঝখানে একটি রেখার মতো চুলের চিকন সারি ছিল। এই রেখা ছাড়া উভয় স্তন ও পেট মোবারক চুলমুক্ত ছিল, তবে উভয় বাহু, কাঁধ এবং সিনা মোবারকের উপরিভাগে চুল ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবজিগুলো দীর্ঘ ছিল এবং হাতের তালু প্রশস্ত ছিল, এছাড়া হাতের তালু ও উভয় পদতল নরম ও মাংসল ছিল। হাত ও পায়ের আঙুলগুলো আনুপাতিকভাবে লম্বা ছিল।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ের তলা কিছুটা গভীর ছিল এবং পা মসৃণ ছিল যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কোমলতার কারণে পানি তার ওপর স্থির থাকত না, তৎক্ষণাৎ গড়িয়ে পড়ে যেত। যখন রসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটতেন তখন শক্তি দিয়ে কদম উঠাতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন, কদম জমিনে ধীরে পড়ত, জোরে পড়ত না। হুজুর ﷺ দ্রুতগামী ছিলেন এবং কিছুটা প্রশস্ত কদম রাখতেন, ছোট ছোট কদম রাখতেন না। যখন হাঁটতেন তখন মনে হতো যেন ঢালু জায়গা দিয়ে নিচে নামছেন। যখন কোনো দিকে মনোযোগ দিতেন তখন পুরো শরীর ঘুরিয়ে মনোযোগ দিতেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি নিচু থাকত। আকাশের তুলনায় জমিনের দিকেই দৃষ্টি বেশি থাকত। পবিত্র অভ্যাস সাধারণত চোখের কোণ দিয়ে দেখার ছিল (অর্থাৎ লজ্জার কারণে চোখের দিকে চোখ রেখে তাকাতেন না)। চলার সময় সাহাবীদের নিজের আগে করে দিতেন এবং নিজে পেছনে থাকতেন, যার সাথে দেখা হতো তাকে সালাম দিতে নিজেই আগে শুরু করতেন। [১]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “রসূলুল্লাহ ﷺ সবার চেয়ে বেশি প্রশস্ত হৃদয়, উদার মন, সত্যবাদী, কোমল স্বভাবের এবং আচার-আচরণ ও লেনদেনে অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিলেন। যে ব্যক্তি প্রথমবার আপনাকে দেখত সে অভিভূত হয়ে যেত এবং যে ব্যক্তি আপনার ﷺ সান্নিধ্যে থাকত ও জানাশোনা লাভ করত সে আপনার ﷺ প্রতি মুগ্ধ ও অনুরক্ত হয়ে যেত। আপনার ﷺ গুণগান বর্ণনাকারী বলত যে, আপনার ﷺ পূর্বে আমি আপনার ﷺ মতো কোনো ব্যক্তি দেখিনি এবং আপনার ﷺ পরেও দেখিনি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।” [২]

হিন্দ বিন আবি হালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন এবং অন্যদের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। আপনার নূরানী চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল।” [৩]

---

[১] শামাইলুত তিরমিযী, বাব মা জাআ ফি খালকি রসূলিল্লাহ ﷺ

[২] শামাইলুত তিরমিযী, বাব মা জাআ ফি খালকি রসূলিল্লাহ ﷺ

[৩] শামাইলুত তিরমিযী, বাব মা জাআ ফি তাওয়াজুয়ি রসূলিল্লাহ ﷺ

https://t.me/BoierSomahar

বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.) মাঝারি গড়নের ছিলেন। আমি একবার তাঁকে লাল রঙের জুব্বায় দেখেছি, আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কোনো ব্যক্তিত্ব কখনো দেখিনি।” [১]

হযরত আনাস (রা.) বলেন:

“আমি এমন কোনো রেশম বা সিল্ক স্পর্শ করিনি যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র হাতের চেয়ে বেশি নরম ছিল। আমি আম্বর বা কস্তুরী অথবা এমন কোনো জিনিস ঘ্রাণ নেইনি যার সুগন্ধি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র ঘামের চেয়ে উত্তম ছিল।” [২]

উচ্চতর চরিত্র:

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রা.) বলেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় আখেরাতের চিন্তায় এবং আখেরাতের বিষয়াবলির ভাবনায় মগ্ন থাকতেন। এর একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকত যে, কোনো সময় তিনি স্বস্তিতে থাকতেন না। অধিকাংশ সময় দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করতেন, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। কথা শুরু করলে পবিত্র মুখ দিয়ে স্পষ্টভাবে শব্দ উচ্চারণ করতেন (অর্থাৎ অহংকারীদের মতো অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার সাথে অসম্পূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতেন না) এবং একইভাবে শেষ করতেন। তাঁর কথা ও বর্ণনা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন; তাতে অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘসূত্রতা ছিল না আবার অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততাও ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠোর মেজাজের ছিলেন না এবং কারো অবমাননা পছন্দ করতেন না। তিনি নেয়ামতের অনেক কদর করতেন এবং সেটিকে অনেক বড় মনে করতেন, তা যতই সামান্য হোক না কেন (যা সহজে নজরেও আসে না) এবং তার দোষ ধরতেন না। পানাহারের জিনিসের দোষও ধরতেন না আবার প্রশংসাও করতেন না। দুনিয়া এবং দুনিয়া সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না, কিন্তু যখন আল্লাহর কোনো হক নষ্ট করা হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতাপের সামনে কোনো কিছুই টিকতে পারত না, যতক্ষণ না তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন। তিনি নিজের সত্তার জন্য রাগান্বিত হতেন না এবং তার জন্য প্রতিশোধও নিতেন না। যখন ইশারা করতেন তখন পুরো হাত দিয়ে ইশারা করতেন। যখন কোনো বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতেন তখন হাত উল্টে দিতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের তালুকে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে মেলাতেন। রাগ বা অপছন্দের কোনো বিষয় হলে পবিত্র চেহারা সেদিক থেকে পুরোপুরি ফিরিয়ে নিতেন এবং বিমুখ হতেন। খুশি হলে দৃষ্টি নিচু করে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাসি ছিল মূলত মুচকি হাসি, যাতে কেবল তাঁর পবিত্র দাঁতগুলো প্রকাশ পেত, যা বৃষ্টির শিলার মতো পবিত্র ও স্বচ্ছ ছিল।” [৩]

---

[১] শামায়েল তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফী খালকি রাসূলিল্লাহ (সা.)।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়েল, বাবু তীবু রাইহাতিন নবী (সা.)।

[৩] শামায়েল তিরমিযী, বাবু কাইফা কানা কালামু রাসূলিল্লাহ (সা.)।

https://t.me/BoierSomahar

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.) অশ্লীলভাষী ও নির্লজ্জতা থেকে দূরে ছিলেন। বাজারে কখনো উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন।” [১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এরই বর্ণনা:

“তিনি (সা.) কখনো কারো ওপর হাত তোলেননি (প্রহার করেননি), তবে আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্র ব্যতীত। কোনো খাদেম বা নারীর ওপরও তিনি (সা.) কখনো হাত তোলেননি।” [২]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) আরও বলেন:

“আমি তাঁকে (সা.) কখনো নিজের ওপর হওয়া কোনো জুলুম বা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, যতক্ষণ না আল্লাহর নির্ধারিত কোনো সীমানা লঙ্ঘন করা হতো। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর কোনো বিধান পদদলিত করা হতো, তবে তিনি (সা.) সে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হতেন।” [৩]

হযরত আনাস (রা.) বলেন:

“আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনো ‘উফ’ বলেননি। কোনো কাজ করার পর বলেননি যে, তুমি কেন এমন করলে? আবার কোনো কাজ ছেড়ে দিলে বলেননি যে, তুমি কেন তা করলে না।” [৪]

**প্রশাসনিক গুণাবলি:**

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন:

“যখনই দুটি বিষয় সামনে আসত, রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা সহজ বিষয়টি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না তা নাজায়েজ হতো।” [৫]

হযরত আলী (রা.) বলেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের পবিত্র জবানকে সংযত রাখতেন এবং কেবল সেই বিষয়েই কথা বলতেন যা তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। মানুষের মন জয় করতেন এবং তাদের দূরে সরিয়ে দিতেন না। কোনো জাতির কোনো সম্মানিত ব্যক্তি আসলে তাঁর সাথে সম্মান ও মর্যাদার সাথে আচরণ করতেন এবং তাকেই সেই জাতির নেতা বানিয়ে দিতেন। মানুষের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন, তবে নিজের প্রফুল্লতা ও উত্তম চরিত্র থেকে তাদের বঞ্চিত করতেন না। নিজের সাহাবীদের খবরাখবর রাখতেন, মানুষের মধ্যকার বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। ভালো কাজের প্রশংসা করতেন এবং তাকে শক্তিশালী করতেন, আর মন্দ কাজের নিন্দা করতেন এবং তাকে দুর্বল করতেন।”

---

[১] শামায়েল আত-তিরমিযী, পৃ. ১৯৭, ত: এহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী

[২] শামায়েল আত-তিরমিযী, পৃ. ১৯৮, ত: এহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী

[৩] শামায়েল আত-তিরমিযী, পৃ. ১৯৬, বাব মা জাআ ফি খুলুকি রাসূলিল্লাহ (সা.), ত: এহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী

[৪] শামায়েল আত-তিরমিযী, পৃ. ১৯৯, ত: এহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী

https://t.me/BoierSomahar

আপনার আচরণ ছিল ভারসাম্যপূর্ণ ও অভিন্ন, এতে কোনো পরিবর্তন বা রদবদল হতো না। আপনি কোনো বিষয়েই গাফিলতি করতেন না এই আশঙ্কায় যে, পাছে অন্য লোকেরাও গাফেল হয়ে পড়ে এবং বিরক্ত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকত। তিনি হকের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করতেন না এবং সীমা লঙ্ঘনও করতেন না। যারা আপনার ﷺ নিকটবর্তী থাকত তারা ছিল সর্বোত্তম ও মনোনীত। আপনার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল যার কল্যাণকামিতা ও চরিত্র ছিল ব্যাপক। আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা ও সম্মান ছিল তার, যে দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, সহানুভূতি এবং অন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতায় সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। [১]

**মজলিসের সৌন্দর্য ও শোভা:**

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের সৌন্দর্য ও শোভা তাঁর প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যিকির করতে করতে দাঁড়াতেন এবং আল্লাহর যিকির করতে করতে বসতেন। কোথাও তাশরীফ নিয়ে গেলে যেখানে মজলিস শেষ হতো সেখানেই বসতেন এবং এর নির্দেশও দিতেন। মজলিসে উপস্থিত ও সহচরদের প্রত্যেককে (নিজের মনোযোগ ও দৃষ্টির মাধ্যমে) পূর্ণ অংশ দিতেন। আপনার মজলিসের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মনে করত যে, আপনার ﷺ দৃষ্টিতে তার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান আর কেউ নেই।

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো উদ্দেশ্যে আপনাকে ﷺ বসিয়ে রাখত অথবা কোনো প্রয়োজনে আপনার ﷺ সাথে কথা বলত, তবে অত্যন্ত ধৈর্য ও প্রশান্তির সাথে তার পুরো কথা শুনতেন যতক্ষণ না সে নিজেই নিজের কথা শেষ করে বিদায় নিত। যদি কোনো ব্যক্তি আপনার ﷺ কাছে কিছু সওয়াল করত এবং কোনো সাহায্য চাইত, তবে তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাকে ফিরিয়ে দিতেন না, অথবা অন্তত নরম ও মিষ্ট ভাষায় উত্তর দিতেন।

আপনার উত্তম চরিত্র সকল মানুষের জন্য ছিল প্রশস্ত ও ব্যাপক এবং আপনি ﷺ তাদের জন্য পিতার মতো হয়ে গিয়েছিলেন। হকের ব্যাপারে সকল মানুষ আপনার ﷺ দৃষ্টিতে সমান ছিল। আপনার মজলিস ছিল ইলম ও মা'রিফাত, লজ্জা-শরম এবং ধৈর্য ও আমানতদারীর মজলিস। সেখানে উচ্চস্বরে কথা বলা হতো না, কারো দোষ বর্ণনা করা হতো না, কারো সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা হতো না এবং কারো দুর্বলতা প্রচার করা হতো না। সবাই একে অপরের সমান ছিল এবং কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতেই তারা একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করত। সেখানে লোকেরা বিনয়ের সাথে থাকত। বড়দের সম্মান এবং ছোটদের সাথে দয়া ও স্নেহের আচরণ করত। অভাবী ব্যক্তিকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিত এবং মুসাফির ও নবাগতদের খেয়াল রাখত। [২]

---

[১] শামাইলুত তিরমিযী, পৃ. ১৯৩, ১৯৪, বাব মা জাআ ফী তাওয়াযুয়ি রাসূলিল্লাহ ﷺ, ত. ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী।

[২] শামাইলুত তিরমিযী, পৃ. ১৯৩, বাব মা জাআ ফী তাওয়াযুয়ি রাসূলিল্লাহ ﷺ, আন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। ত. ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী।

## প্রফুল্লতা ও সদালাপিতা

হযরত আলী (রা.) বলেন:

“রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা প্রফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। তিনি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের ও নম্র প্রকৃতির ছিলেন (অর্থাৎ দ্রুত দয়ালু হয়ে যেতেন এবং খুব সহজেই ক্ষমা করে দিতেন)। তিনি কঠোর মেজাজের অধিকারী ছিলেন না, কঠোর কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন না, চিৎকার করে কথা বলতেন না, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ (নিকৃষ্ট) কথা বলতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং সংকীর্ণমনা কৃপণ ছিলেন না। যে জিনিস রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দ হতো না, তা থেকে তিনি উপেক্ষা করতেন (অর্থাৎ তা এড়িয়ে যেতেন এবং পাকড়াও করতেন না) এবং স্পষ্টভাবে সেই জিনিস থেকে নিরাশও করতেন না আর তার উত্তরও দিতেন না।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখতেন: এক. ঝগড়া-বিবাদ, দুই. অহংকার এবং তিন. অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কাজ। মানুষকেও তিনি তিনটি বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন: তিনি কারো নিন্দা করতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারো দুর্বলতা ও গোপন বিষয় অনুসন্ধানে লিপ্ত হতেন না। তিনি কেবল সেই কথাই বলতেন যাতে সওয়াবের আশা থাকত।

তিনি যখন কথা বলতেন, তখন মজলিসের সাথীরা আদবের সাথে এমনভাবে মাথা নিচু করে রাখতেন যে মনে হতো তাদের সবার মাথায় পাখি বসে আছে (অর্থাৎ এমন স্থির ও নিশ্চল থাকতেন যেন নড়াচড়া করলে পাখি উড়ে না যায়)। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকতেন, তখন তারা কথা বলতেন; রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে তারা কখনো বিবাদ করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মজলিসে যদি কোনো ব্যক্তি কথা বলত, তবে বাকি সবাই চুপচাপ শুনত যতক্ষণ না সে তার কথা শেষ করত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে প্রত্যেক ব্যক্তির কথার মর্যাদা তেমনই হতো যেমনটি তাদের প্রথম ব্যক্তির হতো। (অর্থাৎ পূর্ণ প্রশান্তির সাথে নিজের কথা বলার সুযোগ পেত এবং সেই কদর ও মনোযোগের সাথেই তা শোনা হতো)। যে কথায় সবাই হাসত, তাতে তিনিও হাসতেন; যে বিষয়ে সবাই বিস্ময় প্রকাশ করত, তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। মুসাফির ও পরদেশীদের অভদ্রতা এবং সব ধরণের প্রশ্ন ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে শুনতেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ (রা.) এমন লোকদের নিজেদের দিকে মনোযোগী করে নিতেন (যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর কোনো চাপ না পড়ে)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, “তোমরা কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তাকে সাহায্য করো।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল সেই ব্যক্তির প্রশংসা গ্রহণ করতেন যে পরিমিতিবোধ বজায় রাখত। কারো কথা বলার সময় তিনি কথা বলতেন না এবং কারো কথা কখনো কাটতেন না; হ্যাঁ, যদি সে সীমা লঙ্ঘন করতে শুরু করত, তবে তাকে নিষেধ করে দিতেন অথবা মজলিস থেকে উঠে গিয়ে তার কথা বন্ধ করে দিতেন। [১]

---

[১] শামাইলুত তিরমিযী, পৃষ্ঠা ১৯৯, ২০০, বাব মা জাআ ফী খুলুকি রাসূলিল্লাহ (সা.), তবা ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী।

**অসুস্থদের সেবা:**

নবী করীম ﷺ-এর মুবারক অভ্যাস ছিল যে, যখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখন তিনি তাঁর সেবা ও খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তাশরিফ নিয়ে যেতেন। তিনি একজন ইহুদি খাদেম এবং তাঁর মুশরিক চাচার সেবা করতেও গিয়েছিলেন এবং তাঁদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ফলে ইহুদিটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। [১]

**জিকির ও ইবাদত:**

নবী করীম ﷺ তাঁর নিয়মিত আমল (তিলাওয়াত)-এর পাবন্দি করতেন। আপনি কুরআন পাক তারতিলের সাথে (প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট করে) পাঠ করতেন, প্রতিটি আয়াতে বিরতি নিতেন, মদ্দের অক্ষরগুলোকে টেনে পড়তেন; যেমন 'আর-রাহমানির রাহিম'-কে মদ্দের সাথে পড়তেন এবং তিলাওয়াতের শুরুতে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম" পাঠ করতেন।

আপনি ﷺ মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর টেনে অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে কুরআন পাক তিলাওয়াত করতেন। অন্যদের মুখ থেকে কুরআন শোনাও পছন্দ করতেন। একবার আপনি ﷺ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি আপনার সামনে তিলাওয়াত করলেন। শোনার সময় আপনার ওপর এমন খুশু (একাগ্রতা) আচ্ছন্ন হলো যে, চোখ দুটি ভিজে গেল এবং অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। [২]

**আল্লাহর জিকির ও খাশিয়াত:**

নবী করীম ﷺ আল্লাহ তায়ালার জিকির সবচেয়ে বেশি করতেন, বরং আপনার প্রতিটি কথা আল্লাহর জিকির এবং তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকত। আপনার উম্মতকে আদেশ করা, নিষেধ করা এবং আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলি) এবং তাঁর বিধান ও ওয়াদা-ওয়াহিদের (প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী) বিস্তারিত বর্ণনা—সবই জিকিরে ইলাহির অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে তাঁর অগণিত নিয়ামতের ওপর হামদ ও সানা (প্রশংসা) এবং তাসবিহ ও তামজিদও আল্লাহর জিকির ছিল।

আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা ও দোয়া এবং ভয় ও খাশিয়াতও জিকিরই ছিল, এমনকি আপনার নীরবতাও হৃদয়ের দিক থেকে জিকিরে ইলাহির ওপর নির্ভরশীল ছিল। যেভাবে জিকিরুল্লাহর মাধ্যমে জিহ্বা সিক্ত থাকত, তেমনিভাবে অন্তর ও কলিজাও তাতে ভরপুর থাকত।

সংক্ষেপে কথা এই যে, আপনি প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি অবস্থায় জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং আল্লাহর জিকির আপনার নিঃশ্বাসের সাথে জারি থাকত। ওঠা-বসা, চলাফেরা, সওয়ার হওয়া বা নামা, সফর ও অবস্থান—সব সময় এবং প্রতিটি অবস্থায় আপনি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতেন এবং তাঁর জিকির ও ফিকিরে থাকতেন। যখন আপনি ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, তখন এই দোয়া পড়তেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর (নিদ্রার) পর জীবিত করেছেন এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

একইভাবে নবী করীম ﷺ থেকে প্রতিটি মুহূর্তের দোয়া বর্ণিত আছে। যেমন: যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হন, যখন নামাজ শুরু করেন, যখন ঘর থেকে বের হন, যখন মসজিদে প্রবেশ করেন, সকাল-সন্ধ্যার দোয়া, যখন পোশাক পরিবর্তন করেন, যখন ঘরে প্রবেশ করেন, যখন শৌচাগারে প্রবেশ করেন, ওজুর দোয়া, আজানের দোয়া, চাঁদ দেখার দোয়া, খাবারের দোয়া এবং হাঁচি দেওয়ার দোয়া। [৩]

---

[১] জাদুল মাআদ: ১/৪৫৭, ত: আর-রিসালাহ

[২] জাদুল মাআদ: ১/৩৩৭, ৩৬৫, ফাসল ফি হাদয়িহি ﷺ ফি কিরাআতিল কুরআন, ত: আর-রিসালাহ

পারিবারিক জীবন:

নবী করীম ﷺ-এর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। যখন তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করতেন, তখন সাধারণ মানুষের মতোই থাকতেন; নিজের কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের যাবতীয় প্রয়োজন নিজেই সম্পন্ন করতেন। [১]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: "নবী করীম ﷺ-এর বিছানা ছিল জীর্ণ ও খসখসে। আমি চাইলাম এর পরিবর্তে অন্য একটি বিছানা রাখতে যা আপনার জন্য আরামদায়ক হবে, তাই আমি একটি নরম বিছানা বিছিয়ে দিলাম। নবী করীম ﷺ যখন আসলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন: 'হে আয়েশা! এটা কী?' আমি বললাম: 'আমি আপনার বিছানা অত্যন্ত শক্ত ও খসখসে দেখতাম, তাই আমি এই নরম বিছানাটি পছন্দ করেছি।' নবী করীম ﷺ বললেন: 'এটি সরিয়ে ফেলো, আল্লাহর কসম! আমি বসব না যতক্ষণ না তুমি এটি সরিয়ে ফেলো।' ফলে আমি সেই বিছানাটি সরিয়ে ফেললাম।" [২]

হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো: "নবী করীম ﷺ ঘরে কী করতেন?" হযরত আয়েশা (রা.) বললেন: "তিনি মানুষের মধ্যে একজন মানুষই ছিলেন। নিজের মাথা পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন, নিজের জুতো মেরামত করতেন; সাধারণ মানুষ তাদের ঘরে যা করে তিনিও তাই করতেন এবং নিজের পরিবারের সেবা করতেন। কিন্তু যখন মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনতেন, তখন সালাতের জন্য বেরিয়ে পড়তেন।" [৩] [৪] [৫]

নবী করীম ﷺ আযওয়াজে মুতাহহারাত (পবিত্র স্ত্রীগণ)-এর মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন এবং দুআ করতেন: "হে আল্লাহ! এটি আমার পক্ষ থেকে সমতা যা আমার ইখতিয়ারে আছে। সুতরাং সেই বিষয়ে (অর্থাৎ অন্তরের ভালোবাসা) আমাকে পাকড়াও করবেন না যা আপনার ইখতিয়ারে আছে, আমার নয়।" [৬]

উম্মতকেও তিনি পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম আচরণের তাকিদ দিতেন। আপনার ইরশাদ হলো: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের নিকট সবচেয়ে বেশি উত্তম।" [৭]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, (যখন আমার বিয়ের শুরুর দিক ছিল তখন) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে পুতুল দিয়ে খেলা করতাম এবং আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসতেন, তখন আমার বান্ধবীরা (লজ্জায়) আপনার ﷺ থেকে লুকিয়ে পড়ত। কিন্তু আপনি ﷺ তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সাথে খেলতে শুরু করত। [৮]

---

১. যাদুল মাআদ: ২/৩৩৪ থেকে ৩৪০, ফাসল ফি হাদয়িহি ﷺ ফিল আযকার, ত. আর-রিসালাহ।

২. শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. ১৯৩, বাবু মা জাআ ফি তাওয়াযুয়ি রাসূলিল্লাহ ﷺ, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, ত. ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি।

৩. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ: ৭/৩৫৬।

৪. মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৪১৯৩।

৫. সুনানে আবু দাউদ, হা: ২১৩৩, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফিল কাসমি বাইনান নিসা।

৬. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফি ফাদলি আযওয়াজিন নাবী ﷺ।

৭. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফাদায়িল, বাবু ফাদলি আয়েশা (রা.)।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন: “যে সময় তুমি আমার ওপর খুশি থাকো আমি তা বুঝতে পারি এবং যখন তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হও তাও আমি বুঝতে পারি।”

আমি আরজ করলাম, আপনি তা কীভাবে বুঝতে পারেন? তিনি বললেন:

“যখন তুমি আমার ওপর খুশি থাকো তখন তুমি এভাবে বলো: না, মুহাম্মাদ (সা.)-এর রবের কসম! আর যখন তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট থাকো তখন বলো: না, ইব্রাহিম (আ.)-এর রবের কসম!” (অর্থাৎ আমার নাম নাও না)। [১]

হযরত আয়েশা (রা.) বললেন: “হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! এ কথা ঠিক, কিন্তু আমি শুধু আপনার নাম (মুখ থেকে) ত্যাগ করি।” (অন্তর থেকে নয়)। [১]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন: আমার মনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং হাবশিরা মসজিদে তাদের বর্শা দিয়ে খেলা দেখাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নিজের চাদর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন যাতে আমি তাঁর কান ও কাঁধের মাঝখান দিয়ে ওই হাবশিদের খেলা দেখতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে সেখান থেকে সরে না আসতাম ততক্ষণ তিনি (সা.) এভাবেই (আড়াল করে) দাঁড়িয়ে থাকতেন। এখন তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করো যে, একজন অল্পবয়সী মেয়ে যে খেলা দেখার শৌখিন ছিল, সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। [২]

**কথোপকথনের ভঙ্গি:**

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা বলার ভঙ্গি সাধারণ মানুষের মতো একটানা ও দ্রুত ছিল না। তিনি (সা.) ধীরে ধীরে কথা বলতেন, বিষয়বস্তু এত সাবলীল ও স্পষ্ট হতো যে শ্রোতা তা ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নিতে পারত। [৩] অন্য এক বর্ণনায় আছে: “যদি কেউ চাইত তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বলা শব্দগুলো গণনা করতে পারত।” [৩]

**শিশুদের প্রতি ভালোবাসা:**

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে আচরণ করতেন, তাদের লালন-পালনের জন্য অত্যন্ত চমৎকার পদ্ধতিতে চেষ্টা করতেন, এমন স্নেহের সাথে নির্দেশনা দিতেন যা শিশুদের হৃদয়ে গেঁথে যেত। নবী করীম (সা.) নিজের অসীম ব্যস্ততা সত্ত্বেও শিশুদের কখনো অবহেলা করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের জন্মের সময় কানে আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। হযরত আবু রাফে (রা.) বর্ণনা করেন: “যখন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে হাসান বিন আলী (রা.)-এর জন্ম হলো, তখন আমি দেখলাম যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কানে আযান দিলেন।” [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাব গায়রাতুন নিসা।

[২] সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাব হুসনুল মুয়াশারাত মাআল আহল।

[৩] শামায়েলে তিরমিযী, বাব কাইফা কানা কালামু রাসূলিল্লাহ (সা.)।

[৪] সুনানে ইবনে মাজাহ: ৫১০৫, কিতাবুল আদব, বাব ফিল সাবি ইউলাদু; সুনানে তিরমিযী: ১৫১৩, আবওয়াবুল আজাহি, বাব আল আযান ফি উযুনিল মাওলুদ, হাদীসটি সহীহ।

এর মধ্যে হিকমত এই যে, শিশু যেন শুরু থেকেই দ্বীনের ডাক শুনতে পায় এবং ইসলাম ও তাওহীদ তার অবচেতন মনে গেঁথে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে জীবনের আদব-কায়দা শেখাতেন, কেউ সাথে খেতে বসলে তাকে খাওয়ার নিয়মও বলে দিতেন। তাঁর সৎ ছেলে উমর ইবনে আবি সালামাহকে আদবের পরিপন্থী খেতে দেখে তিনি বললেন: "হে বৎস! যখন খাওয়া শুরু করবে তখন বিসমিল্লাহ বলে শুরু করো এবং ডান হাত দিয়ে খাও আর তোমার সামনের দিক থেকে খাও।" [১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের জন্মের সময় তাহনীক (মুখে চিবানো খেজুর দেওয়া) করতেন। হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমার এখানে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল, আমি তাকে নিয়ে খিদমতে আকদাসে হাজির হলাম, আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম ইবরাহীম রাখলেন এবং খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন, তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, তারপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।" [২]

শিশুদের প্রতি এতই খেয়াল রাখতেন যে, ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটলেও অসন্তুষ্ট হতেন না। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। যখন আপনি সিজদায় যেতেন তখন হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আপনার পিঠে চড়ে বসতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদেরকে সরাতে চাইলে আপনি ইশারায় বলতেন যে, থাকতে দাও। সালাত শেষ করে আপনি তাদেরকে নিজের কোলে বসাতেন এবং বলতেন: "যে আমাকে ভালোবাসে, তার উচিত এই দুজনকে ভালোবাসা।" [৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সুন্দর নাম রাখার নির্দেশ দিতেন, একে পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করতেন। এই বিষয়ে প্রচুর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।" [৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। পথে না আপনার সাথে আমার কথা হলো, না আমার সাথে আপনার। এমনকি বনু কাইনুকার বাজার চলে এল। তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর পর্যন্ত আসলেন। আপনি বলছিলেন: "এখানে কি মুন্না (হুসাইন) আছে? এখানে কি মুন্না আছে?"
তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে তৈরি করছেন। কিছুক্ষণ পর হুসাইন চলে আসলেন, এবং হুসাইন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অপরের গলায় হাত দিলেন (কোলাকুলি করলেন)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:
"হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যে তাকে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসুন।" [৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু শৈশবে একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সওয়ারিতে বসে ছিলেন। আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নসিহত করে বললেন:
"হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি: আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, তো..."

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৫৩৭৬, কিতাবুল আতইমাহ, বাবুত তাসমিয়াহ আলাত তায়াম

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৫৪৬৭, কিতাবুল আকীকাহ, বাবু তাসমিয়াতিল মাওলুদ

[৩] মুসনাদে আবু ইয়ালা, হা: ৭০১, হাসান সনদে

[৪] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৯৪৯, কিতাবুল আদব, বাবু ফি তাগয়ীরিল আসমা; সুনানে তিরমিযী, হা: ২৮৩৩, আবওয়াবুল আদব, বাবু মা জাআ মা ইউস্তাহাব্বু মিনাল আসমা

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ২১২২, কিতাবুল বুয়ূ, বাবু মা যুকিরা ফিল আসওয়াক

তাকে নিজের সামনে পাবে। যখন চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছে করবে। খুব ভালো করে বুঝে নাও যে, সারা দুনিয়া যদি একমত হয়ে যায় যে তোমাকে কোনো উপকার পৌঁছাবে, তবুও তারা তোমাকে কোনো উপকার পৌঁছাতে পারবে না, কেবল ততটুকুই যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন। যদি সারা দুনিয়া একমত হয়ে যায় যে তারা মিলেমিশে তোমার কোনো ক্ষতি করবে, তবে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু ততটুকুই যতটুকু আল্লাহ লিখে দিয়েছেন। কলম শুকিয়ে গেছে এবং দপ্তর গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। [১]

রসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের হাসাতেন এবং ভোলাতেনও। হযরত আনাস رضى الله عنه বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে তাশরীফ আনতেন। আমার এক ছোট ভাই আবু উমায়ের ছিল, তার কাছে একটি নুঘাইর (লাল ঠোঁটওয়ালা ছোট একটি পাখি) ছিল যা দিয়ে সে খেলত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং দেখলেন যে আবু উমায়ের বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “কী হয়েছে? আবু উমায়ের বিষণ্ণ কেন?” বাড়ির লোকজন আরজ করল: “ইয়া রসূলাল্লাহ! তার সেই পাখিটি মারা গেছে যা দিয়ে সে খেলত।” রসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: “হে আবু উমায়ের! নুঘাইরের কী হলো?” [২]

**মনোরম কৌতুকবোধ:**

হযরত আবু হুরায়রা رضى الله عنه থেকে বর্ণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম رضى الله عنهم আরজ করলেন: “ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন?” নবী করীম ﷺ বললেন: “হ্যাঁ! তবে আমি কখনো ভুল কথা বলি না।” [৩]

একদিন মজলিসে নবী করীম ﷺ বললেন: “জান্নাতে এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে চাষাবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন: তোমার কি প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ হয়নি? সে বলবে: জ্বি হ্যাঁ! কিন্তু আমি চাই যে এখনই বীজ বপন করব আর সাথে সাথেই তা প্রস্তুত হয়ে যাবে। সুতরাং সে বীজ ফেলবে, সাথে সাথেই তা অঙ্কুরিত হবে, বড় হবে এবং কাটার উপযোগী হয়ে যাবে।” এক বেদুইন বসে এই কথাগুলো শুনছিল। সে বলল: “এই সৌভাগ্য তো কেবল কোনো কুরাইশী বা আনসারীর নসিব হবে; কারণ তারাই কৃষি পেশার সাথে জড়িত, আমরা নই।” এটি শুনে নবী করীম ﷺ মুচকি হাসলেন। [৪]

একবার এক বৃদ্ধা মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন: “ইয়া রসূলাল্লাহ! দুআ করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।”

---

[১] সুনান আত-তিরমিযী: ২৫১৬ হাদীস সহীহ

[২] সুনান আবু দাউদ: ৪৯৬৯, কিতাবুল আদব; মুসনাদে আহমাদ: ১৩০৭১ সহীহ সনদে

[৩] সুনান আত-তিরমিযী: ১৯৯০

[৪] সহীহ আল-বুখারী: ২৩৫৩, কিতাবুত তাওহীদ, বাব কালামুর রব মাআ আহলিল জান্নাহ

নবী করীম (সা.) বলেছেন: “জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না।”

সেই মহিলা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে লাগলেন, তখন নবী করীম (সা.) বললেন: “তাকে বলে দাও যে, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না (বরং যুবতী হয়ে জান্নাতে যাবে)।” [১] কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (আমি এই নারীদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদের কুমারী বানিয়েছি।) [২]

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর খিদমতে এসে নিজের জন্য একটি সওয়ারি চাইলেন।

নবী করীম (সা.) বললেন: “আমি তোমাকে উটনীর বাচ্চা দেব।”

সে আরজ করল: “হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কী করব?”

নবী করীম (সা.) বললেন: “প্রতিটি উটই তো উটনীর বাচ্চা হয়ে থাকে।” [৩]

একবার হযরত সাওদা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে দেখা করতে আসলেন। সেখানে হযরত হাফসা (রা.)-ও ছিলেন। হযরত সাওদা (রা.) খুব সেজেগুজে ভালো অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁর পরনে একটি সুন্দর অর্থাৎ নকশা করা চাদর ছিল। হযরত হাফসা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন: “নবী করীম (সা.) تشريف আনছেন এবং তিনি (সাওদা) আমাদের মাঝে বসে আছেন। আমি আজ অবশ্যই তাঁর সাজসজ্জা নষ্ট করে দেব।” তাঁদের দুজনের এই কানাকানি শুনে হযরত সাওদা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: “তোমরা কী বলছ?” হযরত হাফসা (রা.) বললেন: “কানা (দাজ্জাল) বের হয়েছে।”

হযরত সাওদা (রা.) খুব ঘাবড়ে গেলেন এবং তাঁর ওপর কম্পন শুরু হলো। বললেন: “হ্যাঁ! আমি কোথায় লুকাব?” হযরত হাফসা (রা.) বললেন: “তাঁবুতে চলে যাও।”

তিনি সেখানে চলে গেলেন। সেটি ছিল আসবাবপত্র রাখার ঘর যাতে আবর্জনা ও মাকড়সার জাল ছিল। নবী করীম (সা.) আসলেন তো হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা.) হাসছিলেন, হাসির চোটে কথা বলতে পারছিলেন না। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: “কেন হাসছ?” তাঁরা দুজনেই তাঁবুর দিকে ইশারা করলেন।

নবী করীম (সা.) তাঁবুর কাছে গেলেন। সেখানে হযরত সাওদা (রা.) কাঁপছিলেন। বললেন: “সাওদা! কি হয়েছে?” হযরত সাওদা (রা.) বললেন: “কানা (দাজ্জাল) বের হয়েছে।”

আপনি বললেন: “এখনো বের হয়নি। তবে বের হবে। এখনো বের হয়নি। তবে অবশ্যই বের হবে।”

এ কথা বলে নবী করীম (সা.) হযরত সাওদা (রা.)-এর কাপড় থেকে ধুলোবালি ও মাকড়সার জাল ঝাড়তে লাগলেন। [৪]

---

[১] শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী: ১৩/১৮৩, বাবু আল-মিজাহ, আল-মাকতাব আল-ইসলামী দামেস্ক।

[২] সূরা আল-ওয়াকিআ, আয়াত: ৩৫, ৩৬।

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৯৯৮, কিতাবুল আদাব, বাবু মা জাআ ফিল মিজাহ।

[৪] মুসনাদে আবি ইয়ালা আল-মাওসিলি: ৪/৪৯১, ত: দারুল মামুন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবী করীম (সা.)-এর কাছে হারীরা (এক প্রকার হালুয়া) নিয়ে আসলাম। নবী আকরাম (সা.) আমার এবং হযরত সাওদা (রা.)-এর মাঝখানে ছিলেন। আমি সাওদা (রা.)-কে বললাম: খাও। তিনি (কোনো কারণে) অস্বীকার করলেন। আমি বললাম: খাও, অন্যথায় এটি তোমার মুখে মেখে দেব। এরপরও তিনি অস্বীকার করলে আমি হারীরাতে হাত দিলাম এবং তাঁর মুখে মেখে দিলাম। নবী করীম (সা.) হাসছিলেন। এরপর নবী করীম (সা.) হযরত সাওদা (রা.)-কে বললেন: তুমিও তাঁর মুখে মেখে দাও। তিনি আমার মুখে মেখে দিলেন এবং নবী করীম (সা.) হাসছিলেন। [১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি একবার সফরে নবী করীম (সা.)-এর সাথে ছিলাম। আমি আপনার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং আপনার থেকে এগিয়ে গেলাম। এরপর যখন (কিছুকাল পরে) আমি স্থূলকায় হয়ে গেলাম, তখন আবার আমাদের দৌড় প্রতিযোগিতা হলো এবং এবার আপনি আমার থেকে এগিয়ে গেলেন। তখন আপনি বললেন: “এটি সেটির বদলা।” (অর্থাৎ আগে তুমি জিতেছিলে, এখন আমি জিতেছি, তাই উভয়ই সমান)। [২]

---

[১] মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ৬৮৩৭, হাইসামি বলেন: এটি আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ-এর বর্ণনাকারী।

[২] সুনানে আবু দাউদ, হা: ২৫৭৮, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিস সাবকি আলার রাজুল।

https://t.me/BoierSomahar

**শ্রদ্ধাঞ্জলি**

রাসূলের দরবারের কবি হযরত কাব বিন জুহাইর (রা.)

নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) এমন এক তলোয়ার যা থেকে আলো গ্রহণ করা হয়, তিনি আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি কোষমুক্ত তলোয়ার।

“নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই তলোয়ার যা থেকে আলো লাভ করা হয়, তিনি আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি কোষমুক্ত তলোয়ার।”

□□□

ইসলামের মুজাহিদ, মুতার যুদ্ধের শহীদ হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)

আমার প্রাণ তাঁর ওপর উৎসর্গ হোক যাঁর চরিত্র সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা।

“আমার প্রাণ তাঁর ওপর উৎসর্গ হোক যাঁর চরিত্র সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা।”

□□□

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.) [১]

কিন্তু কাসেমের এক মুষ্টি ধুলার এই মর্যাদা কোথায়

যে আপনার পবিত্র গলিতে ধূলিকণা হয়ে মিশে যাবে।

□□□

প্রাচ্যের কবি ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল (রহ.)

তিনি পথের দিশারী, শেষ রাসূল, সকলের নেতা যিনি

পথের ধূলিকণাকে দান করেছেন সিনাই উপত্যকার উজ্জ্বলতা।

প্রেম ও মত্ততার দৃষ্টিতে তিনিই প্রথম তিনিই শেষ

তিনিই কুরআন, তিনিই ফুরকান, তিনিই ইয়াসিন, তিনিই ত্বহা।

□□□

---

[১] দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা।

**খাইরুল আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে সালাম**

(হযরত সৈয়দ নাফিস শাহ আল-হুসাইনি মাদাজিল্লাহু)

হে আল্লাহ! সারা জাহানের মাহবুবকে অন্তর ও কলিজার সালাম পৌঁছাক
প্রতিটি নিঃশ্বাসের দরুদ পৌঁছাক, প্রতিটি দৃষ্টির সালাম পৌঁছাক

বিশ্বের বিস্তৃতি থেকে, ঊর্ধ্ব জগতের উচ্চতা থেকে
ফেরেশতাদের দরুদ বর্ষিত হোক, প্রতিটি মানুষের সালাম পৌঁছাক

হুজুরের প্রতিটি সন্ধ্যা সুবাসিত হোক, হুজুরের প্রতিটি রাত জাগ্রত থাকুক
ফেরেশতাদের সুন্দর মিছিলে, প্রতিটি ভোরের সালাম পৌঁছাক

প্রকৃতির ভাষা এতেই মুখর, সত্যবাদী নবীর দরবারে
প্রতিটি বৃক্ষের দরুদ যাক, প্রতিটি পাথরের সালাম পৌঁছাক

রহমতের নবীর ইহসানের বোঝা সমস্ত সৃষ্টির কাঁধে রয়েছে
তাই এমন মহসীনকে প্রতিটি জনপদ ও প্রতিটি নগরের সালাম পৌঁছাক

আমার কলমও তাঁরই দান, আমার প্রতিভার ওপর তাঁরই রহমত
হুজুর খাজার প্রতি আমার কলমের ও আমার প্রতিভার সালাম পৌঁছাক

এই মিনতি যে হাশরের দিন গুনাহগারদের ওপরও যেন নজর থাকে
উম্মতের শাফায়াতকারীর প্রতি আমাদের মতো গরীবদের অশ্রুসিক্ত চোখের সালাম পৌঁছাক

নাফিসের শুধু এই দোয়াই, এই ফকীরের এখন এই ডাকই
সওয়াদে তাইয়্যেবায় বসবাসকারীদের প্রতি সারা জীবনের সালাম পৌঁছাক

https://t.me/BoierSomahar

## হায়াতে তাইয়্যেবার কালানুক্রমিক রূপরেখা

দ্রষ্টব্যসমূহ:

- সীরাতে নববীর প্রাচীন উৎসগুলোতে বর্ণিত অধিকাংশ তারিখ মক্কী পঞ্জিকা অনুযায়ী; কারণ সে সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরই প্রচলন ছিল যার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু যদি কোনো তারিখ কোনো দলিল বা আলামতের ভিত্তিতে মাদানী পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, তবে তার বিপরীতে ঈসায়ী তারিখও অবশ্যই পরিবর্তিত হবে।

- কালানুক্রমিক ছকগুলোতে যেখানে কোনো তারিখকে ছায়াযুক্ত করে দেখানো হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো সীরাত বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রসিদ্ধ বর্ণিত তারিখ এটিই। পক্ষান্তরে ছায়াহীন তারিখগুলো পঞ্জিকার হিসাব, ঋতুভিত্তিক আলামত বা অন্যান্য প্রমাণের মাধ্যমে আনুমানিকভাবে বের করা হয়েছে।

## মক্কী যুগ... নবুওয়াতের পূর্বে

ঘটনা মক্কী (সৌর/চন্দ্র) পঞ্জিকা ঈসায়ী পঞ্জিকা মাদানী হিজরী পঞ্জিকা মক্কী পঞ্জিকা অনুযায়ী হুজুর ﷺ-এর পবিত্র বয়স

আবরাহার মক্কা আক্রমণ ১৮ রজব, ৫৩ বছর হিজরতের পূর্বে। ৫০ বছর হিজরতের পূর্বে। ২৩ মার্চ, ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ ১৮ মহররম (৫৩ বছর হিজরতের পূর্বে) ৫৫০ দিন মিলাদে নববীর পূর্বে

বরকতময় জন্ম সোমবার, ৮ রমজান (৫৩ বছর ৪ মাস হিজরতের পূর্বে)। ১ মিলাদে নববী। সোমবার, ১৩ আগস্ট, ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দ সোমবার, ৮ রবিউল আউয়াল (৫৫ বছর হিজরতের পূর্বে) জন্মের দিন

বক্ষ বিদারণ ৩ মিলাদে নববী ৫৭২ খ্রিষ্টাব্দ

দুই বছরের কিছু বেশি

•

দাই হালিমা-র কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন ৫ মিলাদ নববী ৫৭৩ খ্রি.

•

মহীয়সী মাতার ইন্তেকাল ৭ মিলাদ নববী ৫৭৫ খ্রি.

•

আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল ৯ মিলাদ নববী মে ৫৭৭ খ্রি.

•

রমজানের শুরু

•

চাচা জনাব আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফর ১৩ মিলাদ নববী এপ্রিল ৫৮২ খ্রি.

•

হারবুল ফিজার-এ অংশগ্রহণ শাওয়াল ১৫ মিলাদ নববী জুন ৫৮৩ খ্রি.

•

বকরি চরানো ১৭ মিলাদ নববী ৫৮৫, ৫৮৬ খ্রি.

•

চাচা জনাব জুবায়েরের সাথে ইয়েমেন সফর ১৯ মিলাদ নববী অক্টোবর-নভেম্বর ৫৮৭ খ্রি.

•

হিলফুল ফুজুল-এ অংশগ্রহণ জিলকদ ২১ মিলাদ নববী জুলাই ৫৮৯ খ্রি.

•

ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর রজব ২৫ মিলাদ নববী মার্চ-এপ্রিল ৫৯৩ খ্রি.

•

হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ শাওয়াল ২৬ মিলাদ নববী জুন ৫৯৪ খ্রি.

•

হযরত জয়নাব (রা.)-এর জন্ম ৩১ মিলাদ নববী-র শুরু ৫৯৯ খ্রি.

•

হযরত রুকাইয়া (রা.)-এর জন্ম ৩৩ মিলাদ নববী ৬০২ খ্রি.

•

গায়েবি নূর প্রত্যক্ষ করা ৩৩ মিলাদ নববী ৬০৩ খ্রি.

•

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর জন্ম ৮ বছর বেসাতের আগে ৬০৩ খ্রি.

•

৪ বছর থেকে কিছু বেশি

•

৬ বছর থেকে কিছু বেশি

•

জমাদিউল আখিরা ৮ বছর থেকে কয়েক দিন বেশি

•

প্রায় সাড়ে ১২ বছর

•

১৫ বছর এক মাস

•

১৬, ১৭ বছর (প্রায়)

•

১৮ বছর থেকে বেশি (প্রায়)

•

২০ বছর দুই মাস

•

২৩ বছর ১০ মাস (প্রায়)

•

২৫ বছর দুই মাস (প্রায়)

•

৩০ বছর থেকে কিছু বেশি

•

১০ বছর বেসাতের আগে

•

৩২ বছর থেকে কিছু বেশি

•

৭ বছর বেসাতের আগে

•

৩২, ৩৩ বছরের মাঝামাঝি

•

৭ বছর বেসাতের আগে

•

৩২ বছর

- কাবার পুনর্নির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদ স্থাপন | ১২ শাবান ৩৬ মিলাদ নববী | এপ্রিল ৬০৪ খ্রি. | ১২ রবিউল আউয়াল ৩৪ বছর ১১ মাস (নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে)
- ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্ম | শাবান ৩৬ মিলাদ নববী | এপ্রিল ৬০৪ খ্রি. | রবিউল আউয়াল ৩৪ বছর ১১ মাস (নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে)
- ইরহাসাত (নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহ)-এর প্রকাশ | ৩৭, ৩৮, ৩৯ মিলাদ নববী | ৬০৮ খ্রি., ৬০৯ খ্রি. | ৩৮, ৩৯ বছর
- হেরা গুহায় নির্জনতা ও নিভৃতবাসের দিনগুলো | ৪০, ৪১ মিলাদ নববী | ৬০৯ খ্রি., ৬১০ খ্রি. | ৪০ বছর

**নবুওয়াত পরবর্তী মক্কী যুগ**

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত ঘোষণা থেকে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত ঘটনাবলীর কালানুক্রম সম্বলিত একটি ছক। নীতিগতভাবে কালানুক্রমিক হিসেবে নবুওয়াতের বছরগুলো রমজান থেকে রমজান পর্যন্ত গণনা করা উচিত; কারণ আমরা হাফেজ ইবনে কাসীরের অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে নবুওয়াতের সূচনা রমজানে হওয়াকে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছি। কিন্তু সাধারণত ঐতিহাসিকগণ এতে মক্কী ক্যালেন্ডারের মহররম থেকে মহররম পর্যন্ত হিসাব রেখেছেন। আমরাও সেটিই গ্রহণ করছি যাতে পাঠকরা সাধারণ ক্যালেন্ডারের সাথে এই ক্যালেন্ডারের বাহ্যিক বৈপরীত্য দেখে বিভ্রান্ত না হন। তবে এর জন্য অনিবার্যভাবে আমাদের নবুওয়াতের প্রথম বছরকে ষোল মাস হিসেবে গণনা করতে হয়েছে।

এই বিষয়টি যা-ই হোক মাথায় রাখা উচিত যে, নবুওয়াতের প্রতিটি আসল বছর প্রচলিত বছরের চার মাস পূর্বে রমজানে পূর্ণ হতো এবং কিছু বর্ণনাকারী এই হিসাব অনুযায়ীও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাই এমন স্থানে যিলহজ ৯ নবুওয়াতের দুই মাস পর সফর ৯ নবুওয়াত, অথবা শাবান ৫ নবুওয়াতের এক মাস পর রমজান ৬ নবুওয়াত দেখে বিস্মিত হবেন না; কারণ প্রকৃত কালানুক্রম অনুযায়ী বছর রমজানে পরিবর্তিত হচ্ছে, মহররমে নয়। এই সঠিক হিসাবের কারণে সীরাত লেখকদের বর্ণিত কিছু তারিখ থেকে বিচ্যুতি ঘটে, তবে এই কঠিন পথটি সীরাত শাস্ত্রের কিছু জটিলতা এবং কিছু বাহ্যিক বৈপরীত্য দূর করে দেয়।

https://t.me/BoierSomahar

ঘটনা মক্কী ক্যালেন্ডার ঈসায়ী ক্যালেন্ডার মাদানী ক্যালেন্ডার হুজুর (সা.)-এর বয়স মুবারক মক্কী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী

নবুওয়াতের প্রথম বছর রমজান মে ৬০৯ খ্রি.

প্রথম ওহী সোমবার ৯ রমজান, নবুওয়াতের প্রথম বছরের শুরু, হিজরতের ১৩ বছর ৪ মাস আগে, ৯ রবিউল আউয়াল (সৌর-চন্দ্র ক্যালেন্ডার) ১০ আগস্ট ৬০৯ খ্রি. ৯ জমাদিউল আখিরা মক্কী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৪০ বছর পূর্ণ

গোপন দাওয়াত শুরু নবুওয়াতের প্রথম বছরের শুরু রমজান মে ৬০৯ খ্রি.

৪১তম বছরের শুরু

নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর মহররমের শুরু সেপ্টেম্বর ৬১০ খ্রি.

নবুওয়াতের তৃতীয় বছর মহররমের শুরু সেপ্টেম্বর ৬১১ খ্রি.

প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু নবুওয়াতের তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর - রমজান মাস, হিজরতের ১০ বছর ৪ মাস আগে মে ৬১২ খ্রি. রজব - ১০ বছর ৭ মাস হিজরতের আগে ৪৩ বছর পূর্ণ

নবুওয়াতের চতুর্থ বছর মহররমের শুরু সেপ্টেম্বর ৬১২ খ্রি.

উকায মেলায় দাওয়াত; হজ্জযাত্রীদের মাঝে দাওয়াত শুরু শাওয়াল, জিলহজ জুন ৬১৩ খ্রি., আগস্ট ৬১৩ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

**নবুওয়াতের পঞ্চম বছর** ..... আগাযে মুহররম

হিজরতে হাবশা আউয়াল ..... রজব ৫ নবুওয়ী, ৮ বছর ৫ মাস হিজরতের পূর্বে

সূরা আন-নাজম নাযিল ..... রমজান ৫ নবুওয়ী

হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ .....

যিলহজ ৫ নবুওয়ী, ৮ বছর ১ মাস হিজরতের পূর্বে

**নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর** ..... আগাযে মুহররম

হিজরতে হাবশা আউয়াল থেকে প্রত্যাবর্তন ..... ৭ নবুওয়ীর শুরু (আন্দাজ)

হিজরতে হাবশা সানিয়া ..... ৬ নবুওয়ীর শেষভাগ (আন্দাজ)

**নবুওয়াতের সপ্তম বছর** ..... মুহররম

কুরাইশ প্রতিনিধি দলের নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিতি ..... ৭ নবুওয়ীর শুরু

আউস ও খাযরাজের মধ্যে বুয়াস যুদ্ধ ..... ৭ নবুওয়ীর মাঝামাঝি

**নবুওয়াতের অষ্টম বছর**

শিয়াবে আবু তালিবে অবরোধ ..... মুহররম ৭ নবুওয়ী

সেপ্টেম্বর ৬১৪ খ্রি.

মার্চ ৬১৫ খ্রি. ..... জুমাদিউল আখিরা ৪৪ বছর ১০ মাস, ৮ বছর ৭ মাস হিজরতের পূর্বে

মে ৬১৫ খ্রি.

আগস্ট ৬১৫ খ্রি. ..... যিলকদ ৪৫ বছর ৩ মাস, ৮ বছর ২ মাস হিজরতের পূর্বে

সেপ্টেম্বর ৬১৫ খ্রি.

শরৎকাল ৬১৫ খ্রি. (আন্দাজ)

শরৎকাল ৬১৫ খ্রি. (আন্দাজ) ..... ৪৬ বছরের কাছাকাছি

সেপ্টেম্বর ৬১৬ খ্রি.

৬১৭ খ্রি.-এর শুরু ..... ৪৬ বছর কয়েক মাস

সেপ্টেম্বর ৬১৭ খ্রি.

সেপ্টেম্বর ৬১৭ খ্রি. ..... মুহররম, ৪৭ বছর ৪ মাস

https://t.me/BoierSomahar

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মক্কায় ফিরে আসা ..... রমজান ৮ নবুওয়াত, মে ৬১৭ খ্রি.

নবুওয়াতের নবম বছর ..... সেপ্টেম্বর ৬১৭ খ্রি.

হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাবশায় হিজরত ও প্রত্যাবর্তন

নবুওয়াতের দশম বছর ..... মহররম সেপ্টেম্বর ৬১৮ খ্রি.

শি'বে আবু তালিবের অবরোধ সমাপ্তি ..... ৫ রবিউস সানি ১০ নবুওয়াত, ৪ ডিসেম্বর ৬১৮ খ্রি., শাবান ৩ বছর ১০ মাস

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... ১০ রমজান ৩০ মে ৬১৯ খ্রি., শাওয়াল ৫০ বছর ৭ মাস ২ দিন

হযরত সাওদা (রা.)-এর সাথে বিবাহ ..... ১০ রমজান মাঝামাঝি জুন ৬১৯ খ্রি., শাওয়াল ৫০ বছর ৭ মাস ১৫ দিন

জনাব আবু তালিবের ইন্তেকাল ..... ১৫ শাওয়াল ৩ জুলাই ৬১৯ খ্রি., ১৫ জিলকদ ৫০ বছর ৮ মাস ২১ দিন

তায়েফ সফরের সূচনা ..... ২৭ শাওয়াল ৯ জুলাই ৬১৯ খ্রি., ২৭ জিলকদ ৫০ বছর ৮ মাস ২৭ দিন

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন ..... ২৫ জিলকদ ৫ আগস্ট ৬১৯ খ্রি., ২৫ জিলহজ ৫০ বছর ৯ মাস ২৩ দিন

জ্বিনদের কুরআন শ্রবণ ..... ১০ জিলহজ শেষ আগস্ট ৬১৯ খ্রি., মহররম ৫০ বছর ১০ মাস

নবুওয়াতের একাদশ বছর ..... মহররম সেপ্টেম্বর ৬১৯ খ্রি.

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহ ..... শাওয়াল জুন ৬২০ খ্রি., জিলকদ ৫১ বছর ১ মাস

প্রথম বাইয়াতে আকাবা ..... জিলহজ আগস্ট ৬২০ খ্রি., মহররম ৫১ বছর ৩ মাস

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর ..... মহররম সেপ্টেম্বর ৬২০ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

সফর-এ-মিরাজ | ২৭ রজব | ২৬ এপ্রিল ৬২১ খ্রি. | ২৭ রমজান | ৫১ বছর ১০ মাস ২০ দিন

বাইয়াতে আকাবা সানিয়া | ১২ জিলহজ | শুরুর দিকে সেপ্টেম্বর ৬২১ খ্রি. | সফর | ৫২ বছর ৩ মাস

নবুওয়াতের ১৩তম বছর | মহররম | শেষের দিকে সেপ্টেম্বর ৬২১ খ্রি.

সাহাবীদের মদিনায় হিজরত | শাবান থেকে জিলকদ পর্যন্ত | এপ্রিল ৬২২ খ্রি. থেকে জুলাই ৬২২ খ্রি. পর্যন্ত | শাওয়াল থেকে মহররম পর্যন্ত | ৫৩ বছর থেকে কিছু বেশি

**মাদানি যুগ**

মাদানি যুগে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় যে, ঘটনাবলীকে প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মক্কি যুগের পুরো বছরগুলোতে মাত্র এক বা দুটি ঘটনা বর্ণিত পাওয়া যায়, যেগুলোতে দিন বা তারিখ নির্ধারণ করা খুবই কম; সাধারণত বছর বা তার চেয়ে বেশি, এর সাথে মাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মাদানি যুগের এক এক বছরের অনেক ঘটনা তারিখ ও দিনসহ সংরক্ষিত আছে।

এই যুগে মক্কি ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি মাদানি ক্যালেন্ডারও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এজন্য এখানে মক্কি ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি মাদানি ক্যালেন্ডারের ওপর ভিত্তি করে বর্ণনাও পাওয়া যায়। বছরগুলোকে হিজরি বছর বলা হয়। তবে একটি জটিলতা এই যে, বর্ণনাকারী এই হিজরি বছরগুলোর শুরু ও শেষ সম্পর্কে কখনো মক্কি ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেছেন আবার কখনো মাদানি ক্যালেন্ডার। নিশ্চিত না হওয়ার কারণে আজও সীরাতের ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণে বিভিন্ন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। পেশকৃত ছকে এই জটিলতা দূর করার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। মক্কি ক্যালেন্ডার যা ‘নাসি’ প্রথার ওপর ভিত্তি করে ছিল, বিদায় হজের সময় তা বাতিল করা হয়েছিল। এজন্য এর আগের যুগের ওপর মক্কি ক্যালেন্ডারের গভীর ছাপ দেখা যায়।

ঘটনা মক্কি ক্যালেন্ডার ঈসায়ী ক্যালেন্ডার মাদানি ক্যালেন্ডার হুজুর (ﷺ)-এর বরকতময় বয়স মক্কি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী

- | জিলকদ | শুক্রবার ১৬ জুলাই ৬২২ খ্রি. | ১ হিজরির শুরু। পহেলা মহররম | -

হুজুর (ﷺ)-এর গুহায় আত্মগোপন | ২৭ জিলহজ | ১০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি. | শুক্রবার ২৭ সফর ১ হিজরি | ৫৩ বছর ৫ মাস ২০ দিন

মক্কী সন ১

হিজরীর সূচনা

১লা মহররম

গারে সওর থেকে প্রস্থান ১লা মহররম

কুবাতে আগমন, মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন ৮ই মহররম

মসজিদে বনু সালেমে প্রথম জুমুআ ১২ই মহররম

মদিনায় প্রথমবার শুভাগমন ১২ই মহররম

কুবাতে অবস্থান ত্যাগ করে মদিনায় স্থায়ী আগমন (কুবাতে চৌদ্দ দিন অবস্থানের সমাপ্তি)

২২শে মহররম

মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন

সারিয়্যাহ হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) রজব

সারিয়্যাহ উবাইদাহ বিন হারিস (রা.) শাবান

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বিদায় শাওয়াল

১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.

১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি., সোমবার, ১লা রবিউল আউয়াল, ১ হিজরী, ৫৩ বছর ৫ মাস ২৩ দিন

২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি., সোমবার, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১ হিজরী, ৫৩ বছর ৬ মাস পূর্ণ

২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি., শুক্রবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১ হিজরী

২৭ অক্টোবর ৬২২ খ্রি., শুক্রবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১ হিজরী

১২ অক্টোবর ৬২২ খ্রি., সোমবার, ২২শে রবিউল আউয়াল, ১ হিজরী

অক্টোবর ৬২২ খ্রি. এর শুরুতে, রবিউল আউয়াল ১ হিজরী এর শুরুতে

মার্চ ৬২৩ খ্রি., রমজান - ১ হিজরী, ৫৩ বছর ১০ মাস পূর্ণ

এপ্রিল ৬২৩ খ্রি., শাওয়াল - ১ হিজরী, ৫৪ বছর ১ মাস

জুন ৬২৩ খ্রি., জিলহজ, ৫৪ বছর ১ মাস

https://t.me/BoierSomahar

- মঙ্গলবার ৫ জুলাই ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ
- মাদানি সন ২ হিজরির শুরু
- ১ মহরম
- গজওয়ায়ে আবওয়া, সফর
- গজওয়ায়ে জাতুল উশাইরা (একটি ধারাবাহিক সফরের দুটি অভিযান)
- কুরজ বিন জাবিরের মদিনায় আক্রমণ, রবিউল আউয়াল
- গজওয়ায়ে বুওয়াত, রবিউস সানি
- কিবলা পরিবর্তন, জমাদিউল আউয়াল
- সারিয়া আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.), জমাদিউস সানি ও রজব
- গজওয়ায়ে বালিগ, শাবানের শুরু
- গজওয়ায়ে বনু গিফার ও আসলাম, শাবানের মধ্যভাগ
- রমজানের রোজা ফরজ হওয়া, শাবান
- গজওয়ায়ে বদর, জুমা ১৭ রমজান
- ১২ অক্টোবর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ
- মাক্কি সন ২ হিজরির শুরু
- ১ মহরম
- নভেম্বর ৬২৩ খ্রি., জমাদিউল আউয়াল ২ হিজরি, ৫৩ বছর ২ মাস
- ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রি., জমাদিউস সানি ২ হিজরি, ৫৩ বছর ৭ মাস
- জানুয়ারি ৬২৪ খ্রি., রজব ২ হিজরি, ৫৩ বছর ৮ মাস
- ফেব্রুয়ারি ৬২৪ খ্রি., ১৫ শাবান ২ হিজরি, ৫৩ বছর ৯ মাস
- মার্চ ৬২৪ খ্রি., রমজান ২ হিজরি, ৫৩ বছর ১০ মাস
- মে ৬২৪ খ্রি.-এর শুরু, জিলকদ ২ হিজরি, ৫৩ বছর ১১ মাস
- মে ৬২৪ খ্রি.-এর মধ্যভাগ, ৫৩ বছর ১১ মাস
- মে ৬২৪ খ্রি., ৫৩ বছর ১১ মাস
- ১২ জুন ৬২৪ খ্রি., ১৭ জিলহজ ২ হিজরি, ৫৫ বছর ৯ দিন

•

ওফাত রুকাইয়া (রা.)

•

রুকসতি হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)

•

সদকায়ে ফিতর ও জাকাত বিধিবদ্ধ হওয়া

•

মাদানি সন ৩ হিজরির শুরু। ১লা মহরম

•

প্রথম ঈদুল ফিতরের নামাজ

•

গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা, শুরু

•

গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা, সমাপ্তি

•

গাজওয়ায়ে সাউইক

•

প্রথম ঈদুল আজহার নামাজ

•

কাব বিন আশরাফ হত্যা

•

মক্কি সন ৩ হিজরির শুরু। ১লা মহরম

•

ফাতহে বদরের খবর মদিনায় পৌঁছার পূর্বে (১৯ রমজান আন্দাজ), ১৫ জুন ৬২৪ খ্রি.

•

রমজানের শেষ দশক, জুন ৬২৪ খ্রি.-এর শেষভাগ, ২ হিজরির শেষভাগ, ৫৪ বছর...

•

২৭ রমজান, ২২ জুন ৬২৪ খ্রি., ২৮ জিলহজ ২ হিজরি, ৫৪ বছর ৯ দিন

•

শনিবার ২৩ জুন ৬২৪ খ্রি.

•

১ শাওয়াল, ২৩ জুন ৬২৪ খ্রি., ১ মহরম ৩ হিজরি, ৫৫ বছর ২২ দিন

•

১৫ শাওয়াল ২ হিজরি, ৭ জুলাই ৬২৪ খ্রি., ১৪ মহরম ৩ হিজরি, ৫৫ বছর ১ মাস ৬ দিন

•

২৯ শাওয়াল ২ হিজরি, ২২ জুলাই ৬২৪ খ্রি., ২৯ মহরম ৩ হিজরি, ৫৫ বছর ১ মাস ২১ দিন

•

৫ জিলহজ ২ হিজরি, ২৬ আগস্ট ৬২৪ খ্রি., ৫ রবিউল আউয়াল ৩ হিজরি, ৫৫ বছর ২ মাস ১৬ দিন

•

১০ জিলহজ ২ হিজরি, জুমুআ ৩১ আগস্ট ৬২৪ খ্রি., ১০ রবিউল আউয়াল ৩ হিজরি, ৫৫ বছর ৩ মাস ২ দিন

•

১৪ জিলহজ ২ হিজরি, ৪ সেপ্টেম্বর ৬২৪ খ্রি., ১৪ রবিউল আউয়াল ৩ হিজরি, ৫৫ বছর ৩ মাস ৬ দিন

•

বৃহস্পতিবার ২০ সেপ্টেম্বর ৬২৪ খ্রি.

**তারিখে উম্মতে মুসলিমা**

সারিয়া যায়েদ বিন হারেসা - যুল ক্বাদা-র অভিযান (ইরাকের মহাসড়কে) | রবিউল আউয়াল ৩ হিজরি | নভেম্বর ৬২৪ খ্রি. | জুমাদিউল আখিরা ৫৫ সাল ৬ মাস

উম্মে কুলসুম (রা.)-এর সাথে বিবাহ | রবিউল আউয়াল ৩ হিজরি | নভেম্বর ৬২৪ খ্রি. | জুমাদিউল আখিরা ৫৫ সাল ৩ মাস

গাযওয়ায়ে উহুদ | রজব ৩ হিজরি | ৩০ মার্চ ৬২৫ খ্রি. | ১৫ শাওয়াল ৩ হিজরি ৫৫ সাল ১০ মাস ৮ দিন

গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ | ৩১ মার্চ ৬২৫ খ্রি. | ১৬ শাওয়াল | ৫৫ সাল ১০ মাস ৯ দিন

**মাদানি সনের ৩ হিজরির শুরু। ১ মহররম। বৃহস্পতিবার ১৩ জুন ৬২৫ খ্রি.**

সারিয়া রাজী - সাহাবীদের বন্দিত্ব | যুল ক্বাদা ৩ হিজরি | জুলাই ৬২৫ খ্রি. | সফর ৪ হিজরি ৫৬ সাল ২ মাস

**মক্কি ৪ হিজরির শুরু। ১ মহররম। সোমবার ৯ সেপ্টেম্বর ৬২৫ খ্রি.**

রাজী ট্র্যাজেডি - সাহাবীদের হত্যা | সফর ৪ হিজরি | অক্টোবর ৬২৫ খ্রি. | জুমাদিউল উলা ৪ হিজরি ৫৬ সাল ৫ মাস

বি'রে মাউনা ট্র্যাজেডি | সফর ৪ হিজরি | অক্টোবর ৬২৫ খ্রি. | জুমাদিউল উলা ৪ হিজরি ৫৬ সাল ৫ মাস

গাযওয়ায়ে বনু লিহিয়ান (১৪ দিনের সফর) | সফর ৪ হিজরি | অক্টোবর ৬২৫ খ্রি. | জুমাদিউল উলা ৪ হিজরি ৫৬ সাল ৫ মাস

গাযওয়ায়ে বনু নাযীর (২৩ দিনের অভিযান) | ১২ রবিউল আউয়াল ৪ হিজরি | ১৯ নভেম্বর ৬২৫ খ্রি. | ১২ জুমাদিউল আখিরা ৪ হিজরি ৫৬ সাল ৬ মাস

তারিখ মাদিনা

৫ রবিউল আখের ৪ হিজরী | ১১ ডিসেম্বর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ | ৫৬ বছর ৭ মাস

গাযওয়া বনু নাযীর সমাপ্তি

শাবান ৪ হিজরী | এপ্রিল ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ | ৫৬ বছর ১১ মাস

গাযওয়া বদরুল মাওউদ

৫ রমজান (রওয়ানা) | ২ মে ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ | ৫৬ বছর ১১ মাস ২৫ দিন

সারিয়া আবদুল্লাহ বিন উনাইস

আবু রাফে ইহুদির হত্যা (হত্যার তারিখ আনুমানিক ১৯ রমজান / ১৬ মে)

২৩ রমজান (প্রত্যাবর্তন) | ২০ মে ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ | ৫৭ বছর ৬ দিন

মাদানি ৫ হিজরীর সূচনা - ১লা মহররম, সোমবার ২ জুন ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ

২৫ রবিউল আউয়াল ৫ হিজরী | ২৪ জুলাই ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ | ৫৭ বছর ২ মাস ৭ দিন

গাযওয়া দুমাতুল জান্দাল (রওয়ানা)

২০ রবিউস সানি (প্রত্যাবর্তন) | ১৭ আগস্ট ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ | ৫৭ বছর ৩ মাস ১ দিন

মাক্কী ৫ হিজরীর সূচনা - ১লা মহররম, রবিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ

জমাদিউল আখিরা | ৯ নভেম্বর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ

চন্দ্রগ্রহণ

২ শাবান ৫ হিজরী | ২৭ ডিসেম্বর ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ | ৫৭ বছর ৬ মাস ২২ দিন

গাযওয়া মুরাইসী (গাযওয়া বনু মুস্তালিক) - রওয়ানা

১লা রমজান (প্রত্যাবর্তন) | ২৫ জানুয়ারি | ৫৭ বছর ৭ মাস ২৩ দিন

(২৯ দিন পর প্রত্যাবর্তন, ১লা রমজান ৫ হিজরী)

https://t.me/BoierSomahar

ইফক এর ঘটনা: ৫ জমাদিউল আউয়াল ৫ হিজরী; জানুয়ারি ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; রমজান ৫ হিজরী; ৪৭ বছর ৮ মাস।

খন্দক যুদ্ধ: ২৫ জমাদিউল আউয়াল ৫ হিজরী; ১৮ ফেব্রুয়ারি ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; ২৫ রমজান ৫ হিজরী; ৪৭ বছর ৮ মাস ১৭ দিন।

খন্দক খনন শুরু: ৫ হিজরী।

সময়কাল: ১৫ দিন

খনন সম্পন্ন: ১০ জমাদিউল আখিরা ৫ হিজরী; ৪ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; ১০ শাওয়াল ৫ হিজরী; ৪৭ বছর ৯ মাস ২ দিন।

খন্দক যুদ্ধের অবরোধ শুরু: ১১ জমাদিউল আখিরা ৫ হিজরী; ৫ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; ১১ শাওয়াল ৫ হিজরী; ৪৭ বছর ৯ মাস ৩ দিন।

মোট সময়কাল: ২১ দিন

অবরোধ সমাপ্ত: ১ রজব ৫ হিজরী, সকাল; ২৫ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; ১ জিলকদ ৫ হিজরী; ৪৭ বছর ৯ মাস ২৩ দিন।

বনু কুরাইজা যুদ্ধের অবরোধ শুরু: ১ রজব ৫ হিজরী, সন্ধ্যা; ২৫ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ, সন্ধ্যা; ১ জিলকদ ৫ হিজরী, সন্ধ্যা; ৪৭ বছর ৯ মাস ২৩ দিন।

সময়কাল: ২৫ দিন

অবরোধের সমাপ্তি: ২৬ রজব ৫ হিজরী; ১৯ এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; ২৬ জিলকদ ৫ হিজরী; ৪৭ বছর ১০ মাস ১৮ দিন।

মক্কায় দুর্ভিক্ষ শুরু: শাবান ৫ হিজরী (আন্দাজ); বসন্তকাল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ (আন্দাজ); জিলহজ ৫ হিজরী (আন্দাজ)।

মাদানী সন ৬ হিজরীর শুরু: শুক্রবার ২২ মে ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১লা মহররম।

সারিয়্যাহ উকাশা বিন মিহসান (রা.): জিলকদ ৫ হিজরী; জুলাই ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; রবিউল আউয়াল ৬ হিজরী।

গামর মারজুক অভিযান।

সারিয়্যাহ মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ (রা.): জিলহজ ৫ হিজরী; আগস্ট ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ; রবিউল আখির ৬ হিজরী।

জুল কিসসা অভিযান।

https://t.me/BoierSomahar

৬ হিজরী মক্কী-এর সূচনা, ১লা মুহররম ..... বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ৬২৭ খ্রি.

সারিয়া যায়িদ বিন হারিসা (রা.) - আবুল আস বিন রাবী-এর গ্রেফতারি এবং ইসলাম গ্রহণ ..... জুমাদাল উলা ৬ হিজরী

উম্মে কিরফার হত্যা ..... জানুয়ারি ৬২৮ খ্রি., রমজান ৬ হিজরী

খাইবরের প্রধান ইউসাইর বিন রিযাম-এর হত্যা ..... ফেব্রুয়ারি ৬২৮ খ্রি., শাওয়াল ৬ হিজরী

গাযওয়া হুদাইবিয়া - ১লা রজব মদিনা থেকে রওনা ..... ১৩ মার্চ ৬২৮ খ্রি., ১লা যিলকদ ৬ হিজরী, ৫৮ বছর ৯ মাস ২২ দিন

সুলহ হুদাইবিয়ার পর ২৯ শাবান ৬ হিজরী মদিনায় আগমন ..... ১০ মে ৬২৮ খ্রি., ২৯ যিলহজ ৬ হিজরী, ৫৮ বছর ১০ মাস ২১ দিন

৭ হিজরী মাদানী সনের সূচনা, ১লা মুহররম ..... বুধবার, ১১ মে ৬২৮ খ্রি.

গাযওয়া যী-কারাদ - রমজানের শুরু, সালামা বিন আকওয়া (রা.)-এর বীরত্ব ..... মে ৬২৮ খ্রি.-এর মাঝামাঝি, ৭ হিজরীর মুহররমের শুরু, ৫৯ বছর

গাযওয়া খাইবর - রওনা, রমজানের শুরু ..... মে ৬২৮ খ্রি.-এর মাঝামাঝি, ৭ হিজরীর মুহররমের শুরু, ৫৯ বছর থেকে কিছু দিন বেশি

গাযওয়া ফাদাক এবং ওয়াদিউল কুরা, যিলকদ ..... জুলাই ৬২৮ খ্রি., রবিউল আউয়াল ৭ হিজরী, ৫৯ বছর ২ মাস থেকে কিছু বেশি

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুলতানদের ইসলামের দাওয়াত

খায়বার ও ফাদাক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন

মক্কী ৭ হিজরির সূচনা ১লা মহরম

গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা-র উদ্দেশ্যে যাত্রা

প্রত্যাবর্তন

সুমামা বিন উসালের ইসলাম গ্রহণ এবং মক্কার খাদ্য অবরোধ

কিসরা পারভেজের হত্যাকাণ্ড

উমরাতুল কাযা-র উদ্দেশ্যে যাত্রা

মাদানি সন ৮ হিজরির সূচনা ১লা মহরম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল

মে, জুন, জুলাই ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ; মহরম, সফর, রবিউল আউয়াল ৭ হিজরি; ৫৯ বছরের বেশি

৭ আগস্ট ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ; ১লা রবিউস সানি; ৫৯ বছর ৫ মাস ২২ দিন

বুধবার ১৫ অক্টোবর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ; ১লা জমাদিউল আউয়াল ৭ হিজরি

১৫ অক্টোবর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ; ১১ই জমাদিউল আউয়াল ৭ হিজরি; ৫৯ বছর ৪ মাস ৩ দিন

২৯ অক্টোবর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ; ২৫শে জমাদিউল আউয়াল ৭ হিজরি; ৫৯ বছর ৪ মাস ১৭ দিন

নভেম্বর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের শুরু; জমাদিউল আউয়াল ৭ হিজরির শুরু

১০ ফেব্রুয়ারি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ; ১০ই শাওয়াল ৭ হিজরি

মার্চ ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ; ১লা জিলকদ ৭ হিজরি; ৫৯ বছর ৯ মাস ২২ দিন

১লা মে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ; মহরম ৮ হিজরির শুরু

মে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ; রমজান; ৬০ বছর পূর্ণ

https://t.me/BoierSomahar

- জিলহজ

- মুতা যুদ্ধের জন্য রওনা — জমাদিউল আউয়াল ৮ হিজরি — আগস্ট ৬২৯ খ্রি. — ৬০ বছর ৪ মাস

- মক্কি ৮ হিজরির সূচনা ১লা মহররম — সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রি. — জমাদিউল আখিরা ৮ হিজরি — ৬০ বছর ৫ মাস

- যাতুস সালাসিল যুদ্ধ — জমাদিউল আখিরা ৮ হিজরি — ফেব্রুয়ারি ৬৩০ খ্রি. — যুলকাদা — ৬০ বছর ৯ মাস

- মাদানি ৯ হিজরির সূচনা ১লা মহররম — শুক্রবার ২০ এপ্রিল ৬৩০ খ্রি. — শাবান

- মক্কা বিজয়ের জন্য রওনা — ১০ রমজান ৮ হিজরি — ২৯ মে ৬৩০ খ্রি. — সফর ৯ হিজরি — ৬১ বছর ২ দিন

- মক্কা বিজয় — ১৭ রমজান ৮ হিজরি — ৫ জুন ৬৩০ খ্রি. — সফর ৯ হিজরি — ৬১ বছর ৯ দিন

- গাযওয়ায়ে হুনাইন — ৩ শাওয়াল ৮ হিজরি — ১ জুলাই ৬৩০ খ্রি. — রবিউল আউয়াল ৯ হিজরি — ৬১ বছর ১ মাস ৫ দিন

- গাযওয়ায়ে তায়েফ — শাওয়াল, যুলকাদা ৮ হিজরি — জুলাই, আগস্ট ৬৩০ খ্রি. — রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি — ৬১ বছর ২ মাস

- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহিমের জন্ম — যিলহজ ৮ হিজরি — আগস্ট ৬৩০ খ্রি.

- আত্তাব বিন আসীদ ﷺ-এর নেতৃত্বে হজ — যিলহজ ৮ হিজরি — আগস্ট ৬৩০ খ্রি. — জমাদিউল আউয়াল ৯ হিজরি

- মক্কি ৯ হিজরির সূচনা ১লা মহররম — শুক্রবার ১৪ সেপ্টেম্বর ৬৩০ খ্রি. — জমাদিউল আখিরা

প্রতিনিধিদের আগমন — বিভিন্ন মাসে

রজব

মাদানি সন ১০ হিজরির শুরু ১লা মহরম

গাজওয়া তাবুক — রওনা — বৃহস্পতিবার ৩ রজব ৯ হিজরি

গাজওয়া তাবুক — প্রত্যাবর্তন — রমজান ৯ হিজরি

হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর হজের নেতৃত্ব — ৯ জিলহজ ৯ হিজরি

মক্কি ১০ হিজরির শুরু ১লা মহরম

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্র ইব্রাহিমের ইন্তেকাল

প্রতিনিধিদের আগমন — বিভিন্ন মাসে

বিদায় হজের জন্য জুলহুলাইফা থেকে রওনা

মক্কায় প্রবেশ

বিদায় হজ — আরাফার দিন

মক্কি ক্যালেন্ডার রহিত

গাদিরে খুমের ভাষণ

৬১ বছরের বেশি

মঙ্গলবার ৯ এপ্রিল ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ

মহরম

মহরম ১০ হিজরি

১৯ এপ্রিল ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ — ৬১ বছর ৯ মাস ২৪ দিন

জুন ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ — রবিউল আউয়াল ১০ হিজরি — ৬২ বছর পূর্ণ

১২ সেপ্টেম্বর ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ — জমাদিউল আখিরা ১০ হিজরি — ৬২ বছর তিন মাস একদিন

বৃহস্পতিবার ৩ অক্টোবর ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ — রজব ১০ হিজরি

মঙ্গলবার ১০ রবিউল আউয়াল — ১০ ডিসেম্বর ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ — রমজান — ৬২ বছর ৬ মাস ২ দিন

২৩ ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ — ২৬ জিলকদ ১০ হিজরি — ৬২ বছর ৮ মাস ১৮ দিন

২ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ — ৪ জিলহজ — ৬২ বছর ৮ মাস ২৬ দিন

৭ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ — ৯ জিলহজ ১০ হিজরি শুক্রবার — জমাদিউল আখিরা — ৬২ বছর ৯ মাস একদিন

শুক্রবার — শুক্রবার

১৬ মার্চ — ১৮ জিলহজ — ৬২ বছর ১০ মাস ২২ দিন

১লা রজব

২৮ মার্চ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ; মাদানী সন ১১ হিজরীর সূচনা; মহররম

উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ

২৯ শাবান, ২৫ মে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ; ২৯ সফর ১১ হিজরী, ৬৩ বছর ১১ মাস ২২ দিন

অসুস্থতার সূচনা

২৫ মে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ; সোমবার ২৯ সফর ১১ হিজরী, ৬৩ বছর ১১ মাস ২২ দিন

উসামার বাহিনীর যাত্রা

২ রমজান, ২৮ মে; বৃহস্পতিবার ২ রবিউল আউয়াল, ৬৩ বছর ১১ মাস ২৫ দিন

কাগজ-কলমের ঘটনা (ওয়াকিয়া-এ-কিরতাস)

৪ জুন; বৃহস্পতিবার ৪ রবিউল আউয়াল, ৬৩ বছর পূর্ণ

মসজিদে নববীতে শেষবারের মতো আগমন এবং উম্মতের প্রতি শেষ ভাষণ

৬ জুন; শনিবার ১০ রবিউল আউয়াল, ৬৩ বছর ২ দিন

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বেদনাদায়ক ইন্তেকাল

১২ রমজান, ৮ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ; সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী, বিকেল বেলা। নোট: বিশুদ্ধ চান্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী মোবারক বয়স ৬৩ বছর ৪ দিন।

দাফন

১৩ রমজান, ৯ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ; ১৩ রবিউল আউয়াল, মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাত।

https://t.me/BoierSomahar

হিজরি সালগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির কিছু ঝলক

১ হিজরি সাল (৬২২, ৬২৩ খ্রি.)

- বায়আতে আকাবার বারোজন নকীবের (নেতা) মধ্যে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বারা বিন মা'রুর রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের এক মাস পূর্বে সফর মাসে ইন্তেকাল করেন।

- আনসারদের নেতা আসআদ বিন যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মসজিদে নববী নির্মাণের দিনগুলোতে ইন্তেকাল করেন।

- কুলসুম বিন হাদাম আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে প্রথম অবস্থান করেছিলেন, তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

- মক্কার একজন মুসলিম যামরাহ বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু, অসুস্থ অবস্থায় হিজরতের সফরকালে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

- হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের ঘরে প্রথম পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে; মুহাজিরদের ঘরে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আনসারদের ঘরে নুমান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু। [২]

২ হিজরি সাল (৬২৩, ৬২৪ খ্রি.)

- মুহাজিরদের মধ্য থেকে হযরত উসমান বিন মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন।

- ১৫ই শাবান বাইতুল্লাহ কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়।

- আযান শুরু হয়। রমজানের রোজা ফরজ হয়। আশুরার রোজা যা আগে ফরজ ছিল, তা মানসুখ (রহিত) হয়ে নফল হিসেবে রয়ে যায়। [৩]

- জমাদিউল আখিরাহ মাসের শেষের দিকে সারিয়্যাহ আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রেরিত হয়।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন।

- বদর যুদ্ধের পর হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর রুখসতী (বিদায়) সম্পন্ন হয়।

- ১৫ই শাওয়াল গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা সংঘটিত হয়। [৪]

৩ হিজরি সাল (৬২৪, ৬২৫ খ্রি.)

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহ হয়, তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর। [৫]

- ১৫ই শাওয়াল গাযওয়ায়ে উহুদ সংঘটিত হয়।

---

[১] মুখতাসার সীরাতুর রাসূল লিশ-শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব: ১৭১

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ১/৫১১

[৩] মুখতাসার সীরাতুর রাসূল: ২০৫

[৪] আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার: ২ হিজরি

[৫] উসদুল গাবাহ, জীবনী: হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা

- রমজানে হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর জন্ম হলো। [১]

- **৪ হিজরি (৬২৫, ৬২৬ খ্রি.)**

- শাবানে হযরত হুসাইন বিন আলী (রা.)-এর জন্ম হলো। [২]

- হুজুর আকরাম (সা.)-এর হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা (রা.)-এর সাথে বিবাহ হলো, যিনি তাঁর দানশীলতার কারণে উম্মুল মাসাকিন উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। বিবাহের মাত্র ছয় মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। [৩]

- হযরত আবু সালামা (রা.) ইন্তেকাল করলেন। তাঁর বিধবা উম্মে সালামা (রা.) ইদ্দত পালনের পর হুজুর আকরাম (সা.)-এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর পুত্র উমর বিন আবি সালামাকে নবী করীম (সা.) নিজের লালন-পালনে গ্রহণ করেন। [৪]

- **৫ হিজরি (৬২৬, ৬২৭ খ্রি.)**

- রবিউল আউয়ালের শেষ থেকে রবিউল আখেরের মধ্যভাগ পর্যন্ত গাজওয়ায়ে দুমাতুল জান্দালে ব্যস্ততা ছিল।

- শাবানে গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিক থেকে ফেরার পথে তায়াম্মুমের হুকুম নাজিল হলো।

- হুজুর (সা.) হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর সাথে বিবাহ করলেন।

- রমজানে ইফকের ঘটনা সংঘটিত হলো।

- হদ্দে কাজাফ সম্পর্কে সূরা আন-নূরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাজিল হলো।

- মধ্য শাওয়াল থেকে জিলকদ পর্যন্ত গাজওয়ায়ে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

- জিলকদ মাসে গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা সংঘটিত হলো।

- জিলকদ মাসে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশের সাথে হুজুর (সা.)-এর বিবাহ হলো।

- পর্দার হুকুম নাজিল হলো। [৫]

- **৬ হিজরি (৬২৭, ৬২৮ খ্রি.)**

- উত্তরের দিকে যায়েদ বিন হারিসা (রা.) এবং উপকূলীয় অঞ্চলে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে অভিযানসমূহ পাঠানো হলো।

- হাবশায় নাজ্জাশী আসহামা (রহ.) হুজুর (সা.)-এর বিবাহ হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সাথে পড়ালেন।

- জিলকদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি হলো।

- বছর শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগে গাজওয়ায়ে জি-কারাদ সংঘটিত হলো।

---

[১] আবু বিশর আল-আনসারী আদ-দুলাবী তাঁর সনদে লাইস বিন সাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) ৩ হিজরির রমজান মাসে হাসান বিন আলীকে জন্ম দেন এবং ৪ হিজরির শাবান মাসের কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুসাইনকে জন্ম দেন। (আয-যুররিয়াতুত তাহিরাহ লিদ-দুলাবী: হা: ১০১)

[২] আয-যুররিয়াতুত তাহিরাহ লিদ-দুলাবী: হা: ১৬১

[৩] আল-ইসতিয়াব, জয়নব বিনতে খুজাইমা (রা.)-এর আলোচনা।

[৪] আল-ইসাবাহ, উম্মে সালামা (রা.)-এর আলোচনা।

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫ হিজরি, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৫ হিজরি।

https://t.me/BoierSomahar

- নাজ্জাশী আসহামা (রা.) হাবশায় ইন্তেকাল করেন, নবী করীম (সা.) তাঁর গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেন। [১]

সপ্তম হিজরী সন (৬২৮, ৬২৯ খ্রি.)

- ১লা মহররম থেকে বাদশাহদের নিকট দাওয়াতী পত্র প্রেরণের ধারা অব্যাহত থাকে। [২]
- মহররম ও সফর মাসে খায়বার ও ফাদাক অঞ্চল বিজিত হয়।
- খায়বারের রাজকন্যা সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (রা.)-এর সাথে হুজুর (সা.)-এর নিকাহ সম্পন্ন হয়।
- হাবশার মুহাজিরগণ প্রত্যাবর্তন করেন।
- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) খিদমতে হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করে হাদীস হিফয করার জন্য জীবন ওয়াকফ করে দেন।
- যিলকদ মাসে হুজুর (সা.) উমরাহ কাযা করেন।
- যিলকদ মাসে হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রা.)-এর সাথে হুজুর (সা.)-এর নিকাহ সম্পন্ন হয়। [৩]

অষ্টম হিজরী সন (৬২৯, ৬৩০ খ্রি.)

- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এবং আমর ইবনুল আস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।
- জুমাদাল উলা মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা আরবের সীমানার বাইরে কোনো বিদেশী শক্তির সাথে প্রথম নিয়মিত যুদ্ধ ছিল।
- ১৭ই রমজানুল মুবারক মক্কা বিজয় হয়।
- ১২ই শাওয়াল হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- যিলকদ মাসে তায়েফ অবরোধ করা হয়।
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়।
- হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-এর গর্ভে নবী করীম (সা.)-এর শেষ সন্তান হযরত ইবরাহিম জন্মগ্রহণ করেন। [৪]

নবম হিজরী সন (৬৩০, ৬৩১ খ্রি.)

- রজব মাসে তাবুক অভিযান পরিচালিত হয়।
- রমজান মাসে নবী আকরাম (সা.) তাবুক সফর থেকে ফিরে আসলে তাঁর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ইন্তেকাল করেন।
- যিলকদ মাসে মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করে।

---

[১] গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করা নবী আকরাম (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল; কারণ জানাযার সালাতে জানাযাহগাহে লাশের উপস্থিতি শর্ত। ইমাম সারাখসী বলেন: অনুপস্থিত লাশের ওপর সালাত আদায় করা যাবে না, আর শাফেয়ী বলেন তার ওপর সালাত আদায় করা যাবে, কেননা নবী (আ.) নাজ্জাশীর ওপর সালাত আদায় করেছেন অথচ তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা বলি: (তাঁর জন্য) জমিন সংকুচিত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ছিলেন ওলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওলী, আর অন্যের ক্ষেত্রে এমনটি পাওয়া যায় না। (আল-মাবসুত: ২/৬৭, ত. দারুল মা'রিফাহ)

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬ হিজরী, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৭ হিজরী সন।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৭ হিজরী, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৭ হিজরী সন।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৮ হিজরী, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৮ হিজরী সন।

https://t.me/BoierSomahar

- সত্তরটিরও বেশি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মদিনায় উপস্থিত হন।
- হজ ফরজ হয়, হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমিরুল হজ বানিয়ে মক্কায় পাঠানো হয়। [১]

দশ হিজরি (৬৩১, ৬৩২ খ্রি.)

- রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্র হযরত ইব্রাহিম (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়।
- নাজরানের পাদ্রিরা বিতর্কের জন্য মদিনায় আসেন।
- ইয়ামেনে আসওয়াদ আনসি এবং ইয়ামামায় মুসাইলামা কাজ্জাব নবুওয়াতের দাবি করে।
- বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়, ওহী পূর্ণতা লাভ করে। [২]

এগারো হিজরি (৬৩২, ৬৩৩ খ্রি.)

- নবী করীম (সা.) রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন।
- ইন্তেকালের চার দিন আগে হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের জায়নামাজে নিযুক্ত করেন।
- ১২ই রবিউল আউয়াল নবী করীম (সা.) ৬৩ বছর বয়সে ইহকাল ত্যাগ করেন। [৩]

দ্রষ্টব্য:

সীরাতে নববী এবং ইসলামী ইতিহাসের প্রাচীন উৎসগুলোতে অধিকাংশ ঘটনার হিজরি তারিখ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের সীরাত ও ইতিহাসের বইগুলোতে ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী হিজরির পাশাপাশি সৌর তারিখও উল্লেখ করা হয়। তবে এই সমন্বয়টি অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়, একে চূড়ান্ত মনে করা উচিত নয়। আমরা প্রথমত মরহুম আলী মুহাম্মদ খানের “তাকভীমে আহদে নববী” থেকে উপকৃত হয়েছি। দ্বিতীয়ত মরহুম ডক্টর আব্দুল কুদ্দুস হাশমীর “তাকভীমে তারিখি”-এর ওপর আস্থা রেখেছি। কিছু স্থানে ক্যালেন্ডার সফটওয়্যার, বিশেষ করে ডক্টর আব্দুল আজিজ মুহাম্মদ গানিমের “বারনামাজ লিত-তাকভীম আল-হিজরি ওয়াল মিলাদি” থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যদি অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে কিছু তারিখ ভিন্ন দেখা যায়, তবে তা গাণিতিক হিসাবের পার্থক্য হিসেবে গণ্য করা উচিত।

□□□

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/৪, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: পৃষ্ঠা ৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ৯ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/১০, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: পৃষ্ঠা ১০, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ১০ হিজরি।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১/১১, আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: পৃষ্ঠা ১১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: সন ১১ হিজরি।

https://t.me/BoierSomahar

**সীরাতে মুস্তফার পয়গাম**

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী মাদ্দাজিল্লুহু

“যদি মুসলমানরা কেবল ব্যবসার জন্যই সৃষ্টি হতো, তবে মক্কার সেই ব্যবসায়ীদের যারা সিরিয়া ও ইয়েমেনে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মদীনার সেই বড় ইহুদি সওদাগরদের এই প্রশ্ন করার অধিকার ছিল যে, এই খিদমতের জন্য কেন একটি নতুন উম্মত সৃষ্টি করা হচ্ছে? যদি কৃষি কাজই উদ্দেশ্য হতো, তবে মদীনা ও খায়বরের, তায়েফ ও নজদের, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরাকের কৃষকদের এবং কৃষি পেশার জনবসতির এই প্রশ্ন করার অধিকার ছিল যে, চাষাবাদ ও কৃষিকাজে আমরা মেহনত ও প্রচেষ্টার কোন সূক্ষ্ম দিকটি বাকি রেখেছি যে যার জন্য একটি নতুন উম্মত পাঠানো হচ্ছে? যদি দুনিয়ার চলমান যান্ত্রিকতায় কেবল খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং সরকারগুলোর শাসনব্যবস্থা ও দাপ্তরিক কাজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচালনা করাই উদ্দেশ্য হতো, তবে রোম ও পারস্যের সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের এই বলার অধিকার ছিল যে, এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা অনেক আছি এবং আমাদের অনেক ভাই বেকার আছে, তাদের জন্য নতুন প্রার্থীদের কী প্রয়োজন? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা একেবারেই এক নতুন এবং এমন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছিল, যা দুনিয়ায় কেউ আঞ্জাম দিচ্ছিল না এবং দিতে পারত না; আর এর জন্য একটি নতুন উম্মত পাঠানোরই প্রয়োজন ছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে:

‘তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।’ [১]

এই উদ্দেশ্যের খাতিরেই মানুষ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, নিজেদের ব্যবসার ক্ষতি করেছে, নিজেদের সারাজীবনের সঞ্চয় বিলিয়ে দিয়েছে, নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-বাণিজ্য ধূলিসাৎ করেছে, নিজেদের চাষাবাদ ও বাগানসমূহ উজাড় করেছে, নিজেদের বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশকে বিদায় জানিয়েছে, দুনিয়ার সমস্ত সফলতা ও সচ্ছলতা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং সুবর্ণ সুযোগগুলো হাতছাড়া করেছে, পানির মতো নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছে এবং নিজেদের সন্তানদের এতিম ও নিজেদের স্ত্রীদের বিধবা করেছে।

আজ মুসলমানরা যেসব উদ্দেশ্য ও ব্যস্ততায় সন্তুষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর জন্য এই হাঙ্গামা ও এই প্রলয়ঙ্করী পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল না, সেগুলোর অর্জনের পথ তো ছিল একেবারেই নিরাপদ ও মসৃণ। যদি মুসলমানদের সেই স্তরেই চলে আসতে হতো যে স্তরে নবুওয়াত প্রাপ্তির সময়ের সমস্ত কাফের জাতিগুলো ছিল এবং বর্তমানেও দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে, আর যদি তাকে জীবনের সেই সব ব্যস্ততায় নিমগ্ন ও আপাদমস্তক নিমজ্জিত হতে হতো, যেগুলোতে পশ্চিমা বিশ্ব এবং রোম ও পারস্যের অধিবাসীরা ডুবে ছিল এবং সেই সব সাফল্যকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য বানাতে হতো যেগুলোকে তাদের পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্বোত্তম সুযোগে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন...”

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০

ছিলেন, তবে এটি ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের ওপর পানি ঢেলে দেওয়ার সমতুল্য এবং এই কথার ঘোষণা যে, বদর, হুনাইন, আহযাব এবং কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকে মানুষের যে মূল্যবান রক্ত ঝরানো হয়েছে, তা অপ্রয়োজনে ঝরানো হয়েছে।

আজ যদি কুরাইশ নেতাদের কথা বলার শক্তি থাকত, তবে তারা মুসলমানদের সম্বোধন করে বলতে পারত যে, তোমরা যেসব জিনিসের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছ এবং যেসব জিনিসকে তোমরা তোমাদের জীবনের অর্জন মনে করে নিয়েছ, সেইসব জিনিসই আমরা পাপীরা তোমাদের পয়গম্বর (ﷺ)-এর সামনে পেশ করেছিলাম। সেই সমস্ত জিনিস এক ফোঁটা রক্ত না ঝরিয়েই অর্জন করা সম্ভব ছিল। তবে কি সমস্ত সংগ্রামের ফসল এবং সেই সমস্ত কোরবানির মূল্য সেই জীবনধারা যা তোমরা গ্রহণ করেছ? আর সেইসব প্রচেষ্টার বিনিময় কি জীবন ও নৈতিকতার সেই স্তর যার ওপর তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে গেছ?

যদি কুরাইশ নেতাদের মধ্য থেকে যারা ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাদের কাউকে এই জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে আজ আমাদের বড় থেকে বড় যোগ্য উকিলও এর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে না এবং উম্মতের জন্য এ নিয়ে লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের ব্যাপারে এই আশঙ্কা করতেন যে, তারা দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ভুলে না যায় এবং দুনিয়ার সাধারণ স্তরে নেমে না আসে। তিনি ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন:

“আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের ভয় করি না। আমি বরং এই আশঙ্কা করি যে, তোমাদের জন্য দুনিয়াকে তেমনি প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল, ফলে তোমরাও তাদের মতো দুনিয়ার লোভে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমন তাদের ধ্বংস করেছিল।” [১]

মুসলমানদের আসল পরিচয় এটাই যে, হয় তারা ইসলামের দাওয়াত ও আমলি সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে অথবা এই দাওয়াত ও আমলি সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হবে, সেই সাথে আমলি সংগ্রামে অংশ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প ও আগ্রহ থাকবে। একজন সন্তুষ্ট নাগরিক এবং নিছক ব্যবসায়িক জীবন কোনো ইসলামী জীবন নয় এবং কোনোভাবেই এটি একজন মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সীরাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর এটিই সবচেয়ে বড় পয়গাম, যা খাঁটি মুসলমানদের নামে। [২]

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০১৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব শুহুদুল মালাইকা বদর।

[২] হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর খুতবাত থেকে সংগৃহীত।

## ইসলাম কি জোরপূর্বক প্রচার করা হয়েছিল?

প্রাচ্যবিদ এবং একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত তীব্রতার সাথে এই অপপ্রচার চালিয়ে আসছেন যে, ইসলামের পয়গম্বর (সা.) এবং তাঁর উত্তরসূরিরা মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়েছেন এবং ইসলাম মানুষের হৃদয় জয় করে নয় বরং তলোয়ারের জোরে প্রচার করা হয়েছিল। এই ঘৃণ্য অপপ্রচারের খণ্ডনে এখানে মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব (রহ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সীরাতে খায়রুল আম্বিয়া (সা.)' থেকে দুটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। হযরত (সা.)-এর প্রথম ওহী থেকে হিজরতে মদিনা পর্যন্ত অবস্থা বর্ণনা করার পর তিনি লিখেছেন:

"ততদিনে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে সব ধরনের বিপদের লক্ষ্যবস্তু হতে রাজি হয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, তারা কোনো পার্থিব লোভ বা সরকারের জবরদস্তি বা তলোয়ারের মাধ্যমে বাধ্য হতে পারতেন না।

এই সুস্পষ্ট হেদায়েত দেখেও কি সেই সব লোক আল্লাহর কাছে লজ্জিত হবে না যারা ইসলামের সত্যতাকে আড়াল করার জন্য বলে থাকে যে ইসলাম তলোয়ারের জোরে ছড়িয়েছে? তারা কি এর কোনো উত্তর দিতে পারে যে, যারা কেবল মুসলমানই হননি বরং ইসলামের সমর্থনে তলোয়ার তুলে নিতে এবং নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করতে রাজি হয়েছিলেন, সেই তলোয়ার চালনাকারীদের ওপর কে তলোয়ার চালিয়েছিল? তারা কি বলতে পারে যে আবু বকর সিদ্দিক, ফারুক আজম, উসমান গনি, আলী মুর্তজা (রা.)-দের ওপর কে তলোয়ার চালিয়ে তাদের মুসলমান বানিয়েছিল? আর আবু যর (রা.) ও ওয়াইস (রা.) এবং তাদের গোত্রকে কে বাধ্য করেছিল যে তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেল? যিমাদ আযদীকে কে বাধ্য করেছিল? আর তুফাইল বিন আমর দাওসী এবং তাঁর গোত্রের ওপর কে তলোয়ার চালিয়েছিল? আর বনী আবদিল আশহাল গোত্রকে কে দাবিয়ে রেখেছিল? আর মদিনার সমস্ত আনসারদের ওপর কে জোর খাটিয়েছিল?

যারা কেবল ইসলাম গ্রহণই করেননি বরং আপনাকে (সা.) নিজেদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং আপনার (সা.) জন্য নিজেদের জান ও মাল উৎসর্গ করেছিলেন। ইয়াযিদ আসলামী (রা.)-কে কে বাধ্য করেছিল যে তিনি সত্তর জন লোকের একটি দল নিয়ে মদিনায় এসে আপনার (সা.) খেদমতে হাজির হলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে মুসলমান হলেন? হাবশার বাদশাহ নাজাশীর ওপর কোন তলোয়ার চলেছিল যে নিজের রাজত্ব ও শান-শওকত থাকা সত্ত্বেও হিজরতের আগেই মুসলমান হয়েছিলেন? আবু হিন্দ এবং তামীম ও নুয়াইম প্রমুখ সিরিয়া সফর করে আপনার (সা.) খেদমতে পৌঁছে আপনার (সা.) গোলামি গ্রহণ করেছিলেন, ইতিহাস যার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

একথা বলে প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্বাস রাখতে বাধ্য যে, ইসলাম তার প্রসারে এমনটি করতে পারে না যে মানুষের গলায় তলোয়ার রেখে বলা হবে মুসলমান হয়ে যাও, বরং সেখানে তো জিজিয়ার বিধান এবং কাফেরদের নিরাপত্তা ও জিম্মি বানিয়ে তাদের..."

জান ও মাল হেফাজতের ক্ষেত্রে একদম মুসলমানের মতো আচরণের ব্যাপারে ইসলামী নীতিমালা নিজেই এর সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলাম কখনো কাফিরদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি।

তাই একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের কর্তব্য হলো ঠান্ডা মাথায় এ বিষয়ে চিন্তা করা যে, ইসলামে জিহাদ কেন এবং কী কী উপকারের জন্য ফরজ করা হয়েছে। আর তখন তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, যে ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা যায় না যা মানুষকে শ্বাসরোধ করে জোরপূর্বক নিজের অন্তর্ভুক্ত করেছে, তেমনি সেই ধর্মও পূর্ণাঙ্গ নয় যাতে রাজনীতি নেই। সেই রাজনীতি রাজনীতি নয় যার সাথে তলোয়ার নেই। সেই ডাক্তার তার বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারে না যে শুধু মলম লাগানো জানে কিন্তু পচে যাওয়া দূষিত অঙ্গ অপারেশন করতে জানে না।

আরবের সাথে হোক কিংবা আজমের সাথে,
কিছুই নয়, যদি কলমের সাথে তলোয়ার না থাকে।

বুঝুন এবং ভালো করে বুঝুন যে, যখন বিশ্বের শরীরে শিরকের বিষাক্ত জীবাণু জন্ম নিল এবং তা একটি রুগ্ন শরীরের মতো হয়ে গেল, তখন আল্লাহর রহমত তার জন্য একজন সংস্কারক ও দয়ালু চিকিৎসককে (আপনাকে) পাঠালেন, যিনি তিপ্পান্ন বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তার প্রতিটি অঙ্গ এবং প্রতিটি শিরা-উপশিরার সংশোধনের চিন্তা করেছেন, যার ফলে সংশোধনযোগ্য অঙ্গগুলো সুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু অঙ্গ যা পুরোপুরি পচে গিয়েছিল, সেগুলোর সংশোধনের আর কোনো উপায় ছিল না, বরং আশঙ্কা ছিল যে সেগুলোর বিষক্রিয়া পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তাই বিজ্ঞোচিত মূলনীতি অনুযায়ী পরম রহমত ও হিকমতের দাবি এটাই ছিল যে, অপারেশন করে সেই অঙ্গগুলো কেটে ফেলা হোক। এটাই জিহাদের হাকিকত এবং এটাই সমস্ত আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

এই কারণেই রণক্ষেত্র উত্তপ্ত হওয়ার সময়েও ইসলাম তার প্রতিপক্ষ দলের মধ্য থেকে কেবল সেই লোকদেরই হত্যার অনুমতি দিয়েছে যাদের রোগ ছিল সংক্রামক, অর্থাৎ যারা ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করত এবং যুদ্ধ করতে আসত। আর তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, নারী, শিশু ও বৃদ্ধ এবং ধর্মীয় আলেম যারা লড়াইয়ে অংশ নেয় না, তারা তখনও মুসলমানদের তলোয়ার থেকে নিরাপদ ছিল; বরং সেই সব লোক যারা কোনো চাপের মুখে বাধ্য হয়ে মোকাবিলায় এসেছিল, তারাও মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদ ছিল।

হযরত মুফতি সাহেব (দা.বা.) এ বিষয়ে কয়েকটি রেওয়ায়েত পেশ করার পর বলেন:

“পরিশেষে, রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল উন্নত চরিত্রের প্রচার এবং ইসলামের সুরক্ষা ও দাওয়াত, ইসলামের পথে যেসব বাধা সৃষ্টি করা হতো তা দূর করা। এই সমস্ত ঘটনার ওপর নজর দেওয়ার পর যেভাবে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এবং মারগোলিউথ প্রমুখের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অপবাদ হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জোরপূর্বক মুসলমান করা এবং লুটতরাজ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করা। তেমনিভাবে ইসলামী রেওয়ায়েত এবং সাহাবীগণের (রা.) আমল একত্রিত করার পর এতেও কোনো সন্দেহ থাকে না যে, ইসলামে যেভাবে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে রক্ষণাত্মক জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে, তেমনিভাবে”

অগ্রিম সতর্কতা এবং দাওয়াতের পথে বাধা দূর করার জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদকেও কিয়ামত পর্যন্ত আবশ্যক করা হয়েছে। আর যেভাবে রক্ষণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্য মানুষকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানো নয়, তেমনি আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্যও কোনোভাবেই তা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসলামের প্রশস্ত আঁচল জিহাদের চরম মুহূর্তেও কাফিরদের আশ্রয় দেয় এবং কুফরের ওপর অটল থাকা সত্ত্বেও তাদের জান-মাল ও মান-সম্মানের তেমনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়, যে ক্ষেত্রে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার জিহাদই সমান। এছাড়া পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, দুর্বলদের জুলুম থেকে মুক্ত করা ইত্যাদি জিহাদের যে উদ্দেশ্যসমূহ রয়েছে, তাতেও উভয় প্রকার জিহাদ অভিন্ন। তাই ইসলামী ঐতিহ্যকে বিকৃত করে আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই, যেমনটি আমাদের কিছু মুক্তমনা ঐতিহাসিক বলেছেন। [১]

**ন্যূনতম জানমালের ক্ষতি - সর্বোচ্চ সুফল:**

সীরাতে তাইয়্যেবার গাযওয়া ও সারিয়্যাসমূহকে রক্তপাত ও গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িতকারীদের এই বাস্তবতার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের সকল যুদ্ধে জানমালের ক্ষতির পরিমাণ কত ছিল এবং এর ফলাফল কী ছিল? গবেষকদের মতে, এই সকল যুদ্ধে ২৫৯ জন মুসলিম শহীদ এবং প্রতিপক্ষের ৫৯৭ জন নিহত হন। এভাবে উভয় পক্ষের মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৮৫৬ জন। [২] এখন একদিকে আরব উপদ্বীপের বিশালতা দেখুন এবং অন্যদিকে আরব গোত্রগুলোর যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও কঠোর মেজাজের কথা চিন্তা করুন, তবে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না যে, এত সামান্য জানমালের ক্ষতি এত বিশাল ভূখণ্ডে বসবাসকারী শত শত মূর্তিপূজারী গোত্রকে তাদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারত?

এর সাথে যদি সেই ঈমানি ও নৈতিক বিপ্লবের কথা কল্পনা করা হয়, যা কয়েক বছরের এই সংগ্রামের পর আরবের বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং একটি জাহিলিয়াতগ্রস্ত সমাজকে বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে বসিয়েছিল, তবে এই মহান সুফলের তুলনায় এক হাজার প্রাণের বিনাশের কি কোনো গুরুত্ব থাকে? ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা ভালো করেই জানেন যে, অধিকাংশ যুদ্ধে হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। তদুপরি পরিতাপের বিষয় হলো, নিহতের মধ্যে সৈন্য বা সাধারণ নাগরিকের কোনো পার্থক্য থাকে না। এই যুদ্ধগুলো পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না। তা সত্ত্বেও এই যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতিকে বৈশ্বিক বিপ্লবের একটি অপরিহার্য অংশ মনে করে উপেক্ষা করা হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় গণতন্ত্রের খাতিরে যে রক্তপাত হয়েছে, তা কারো অজানা নয়। এরপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে, কোটি কোটি মানুষ কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদের রাজ্য জয়ের লালসার বলি হয়েছে। এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও পৃথিবীতে কোনো কল্যাণকর বিপ্লব আসেনি, বরং পুঁজিবাদীদের বিশ্বায়ন সুসংহত হয়েছে এবং দরিদ্র জাতিগুলোর শোষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের এই অতীত নিয়ে কোন মুখে সীরাতে তাইয়্যেবার ওপর আঙুল তোলার দুঃসাহস দেখায়!!

---

[১] সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া (সা.), পৃ. ২১ থেকে ২৭

[২] রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.), ১/৩৬৩

## ইতিহাসের পাঠ

- জনাব রিসালাত মাব ﷺ তেষট্টি বছর পর দুনিয়া থেকে পর্দা গ্রহণ করেছেন কিন্তু আপনার শিক্ষার আলো আজও বিদ্যমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ এর নূর থেকে উপকৃত হতে পারবে।

- হুজুর আনোয়ার ﷺ-এর ফয়েজ ও দৃষ্টিতে ধূলিকণা সূর্য হয়ে গেল এবং আরবের মাটি পরশপাথর হয়ে গেল! উট চালকরা বিশ্ব শাসনকর্তা হয়ে গেল এবং দস্যুরা পথপ্রদর্শক। ইতিহাসে কি এমন অন্য কোনো শিক্ষক, এমন অন্য কোনো নেতা জন্ম নিয়েছে??

- রহমতে আলম ﷺ আরবের সরদার হওয়া সত্ত্বেও কোনো সম্পদ রেখে যাননি! ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও কি এমন উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে?

- নবী করীম ﷺ-কে মৌখিক ও শারীরিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, পাথর মারা হয়েছে, হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু যখন আল্লাহ আপনাকে বিজয় ও ক্ষমতা দান করলেন এবং মক্কায় আপনি বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলেন, তখন আপনি আদর্শ দয়া ও করুণার আচরণ করলেন। নিকৃষ্টতম শত্রুদেরও ক্ষমা করে দিলেন। উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ইতিহাস ছাড়া কি এমন উদাহরণ কোথাও মিলবে? আর আমরা কি কাফের শত্রুদের তো নয়ই, বরং নিজেদের কালিমা পাঠকারী বিরোধীদের সাথেও এমন নম্র আচরণ করতে প্রস্তুত? যদি না হয়, তবে আমরা কোন মুখে এই হাদীয়ে আলম ﷺ-এর অনুসারী বলে দাবি করি?

- যে সকল ব্যক্তি হযরত দোজাহান ﷺ-এর আহ্বানে সর্বপ্রথম সমবেত হয়েছিলেন এবং "আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন" নামে অভিহিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, সাইয়্যিদুনা উমর ফারুক, সাইয়্যিদুনা উসমান গনি এবং সাইয়্যিদুনা আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো সম্মানিত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তেমনি সেখানে ইয়ামেন থেকে আসা এক দরিদ্র পরিবারের আম্মার বিন ইয়াসির, হাবশার কৃষ্ণাঙ্গ বিলাল এবং গোলাম হিসেবে বিক্রি হওয়া সুহাইব রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো নিঃস্ব লোকেরাও ছিলেন। প্রতিটি স্তরের মানুষ এই ফয়েজের ঝরনাধারা থেকে সিক্ত হয়েছেন। আমরা কি দ্বীনের দাওয়াত সকল স্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করার জজবা রাখি??

- জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ বান্দাদের ছিন্ন সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আজ আমরা হুজুর ﷺ-এর উম্মত হয়েও কেন এই সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছি?

- হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমান ও সত্যের পতাকা উত্তোলন করেছেন এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বীজ বপন করেছেন। আজ আমরা কেন অনিষ্ট, ফাসাদ, জুলুম ও নির্লজ্জতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি?

- হুজুর আকদাস ﷺ সারা জীবন কোরবানি দিয়েছেন এবং নিজের উম্মতকে বিশ্বজয়ী বিজয় দান করে শান্তি ও ন্যায়বিচারের রাজত্ব কায়েম করেছেন। আজ আমরা কেন জুলুম ও নিপীড়নের মিথ্যা উপাস্যদের সামনে মাথা নত করে আছি?

- হুজুর আকরাম ﷺ আমাদের যা কিছু দিয়েছিলেন, আজ কি আমরা আমাদের মন্দ আমলের কারণে সে সব কিছু হারিয়ে ফেলিনি? যদি তাই হয়, তবে তা ফিরে পাওয়ার চিন্তা কেন নেই?

- কি আমাদের পথভ্রষ্ট জীবন এবং আমাদের কালো কার্যাবলীর মাধ্যমে মানবতার এই মহান হিতৈষীর সম্মানে কোনো আঘাত আসছে না? আমরা আমাদের জীবনকে কবে পরিবর্তন করব?

- আমাদের দ্বীনি অবস্থা কেন এত অধঃপতিত? আমরা হুজুর আকদাস ﷺ-এর নিয়ে আসা শরীয়তের ব্যাপারে কেন এমন উদাসীন?

- আমরা কেন সালাতে অভ্যস্ত নই? আমরা কেন যাকাত এবং সদকা ও খয়রাতের ক্ষেত্রে কৃপণতা করি? সেই পরহেজগারী এবং সুন্নাহ অনুসরণের সেই আবেগ কোথায় গেল যা একসময় মুসলিম উম্মাহর শিশুদেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল?

- আমরা কেন হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্য করি না? কেন সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকি না? আমাদের জীবন কেন হুজুর আকদাস ﷺ-এর সত্যকার উৎসর্গকারী অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়?

- সীরাতুন্নবীর প্রতিটি পাতা অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, সত্য দ্বীন কী ছিল? সত্যকার মুসলিমরা কেমন ছিলেন? কত কষ্টসাধ্য ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামকে প্রচার করা হয়েছে। এই পাতাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, আজ আমাদের ইশক ও মহব্বতের দাবিগুলো কেবলই লোকদেখানো। আমাদের মুখে নিজেকে নবীর গোলাম বলা এবং নিজের জন্য জান্নাতের টিকিট নিশ্চিত মনে করা কেবল একটি নফসের ধোঁকা যাতে আমরা নিজেদের লিপ্ত করে রেখেছি।

- আল্লাহ আমাদের মন্দ আমলের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নেয়ামতসমূহ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আমরা স্বাধীন থেকে গোলাম, মালিক থেকে প্রজা এবং সচ্ছল থেকে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

- ইরশাদে নববী ছিল যে, একজন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার তুলনায় আল্লাহর নিকট সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া অধিক সহজ। কিন্তু আমাদের সমাজে আজ মানুষের জীবনের কী মূল্য আছে? মুসলিম সমাজ কি এমন হয়!!

- হুজুর রহমতে আলম ﷺ আমাদের বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং জাতীয়তার নামে গোঁড়ামি বজায় রাখার অনুমতি দেননি। তিনি ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার বার্তা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আজ আমাদের মেজাজে সব ধরণের গোঁড়ামি পূর্ণ শক্তিতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। শেষ পর্যন্ত কেন?

- সীরাত বা ইতিহাস অধ্যয়ন হওয়া উচিত নিজের আত্ম-সমালোচনার জন্য। আমরা কি আমাদের আত্ম-সমালোচনার জন্য প্রস্তুত?

- হাদীয়ে বরহক ﷺ-এর জীবন কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষদের জন্য আলোকবর্তিকা। আপনার মহব্বত মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আবশ্যক হলো যে, আমরা রাসূল পাক ﷺ-এর মহব্বতে নিমজ্জিত হয়ে একজন ভালো ও সত্যকার মুসলিমের মতো জীবন অতিবাহিত করি এবং মুসলিম উম্মাহর বিনির্মাণে নিজেদের উৎসর্গ করি। জনাব খালিদ ইকবাল তায়েব-এর ভাষায়:

দিওয়ানাগী শওক বাড়িয়ে তো দেখুন
উলফতে তাঁর নিজেকে মিটিয়ে তো দেখুন
খুলে যাবে বাবে রহমতে হক আপনার তরে
হুব্বে নবীকে দিলে বসিয়ে তো দেখুন

# তৃতীয় অধ্যায়

## উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস (প্রথম অংশ)

## খিলাফতে রাশিদাহ

উত্থান ও বিজয়ের যুগ

১১ হিজরী ..... থেকে ..... ৩২ হিজরী

(৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ ..... থেকে ..... ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)

https://t.me/BoierSomahar

আত্মহনন তোমাদের রীতি, তারা ছিল আত্মমর্যাদাশীল ও আত্মনির্ভর

তোমরা ভ্রাতৃত্ব থেকে বিমুখ, তারা ভ্রাতৃত্বের তরে উৎসর্গিত

তোমরা আপাদমস্তক কেবল কথা, তারা ছিল আপাদমস্তক কর্ম

তোমরা একটি কলির জন্য তৃষ্ণার্ত, তাদের কোলে ছিল পুরো বাগান

জাতিসমূহ আজও তাদের কাহিনী মনে রেখেছে

অস্তিত্বের পাতায় তাদের সত্যনিষ্ঠা অঙ্কিত হয়ে আছে

(মরহুম ইকবাল)

https://t.me/BoierSomahar

# হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু-এর খিলাফত

রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী থেকে জমাদিউল আখিরা ১৩ হিজরী পর্যন্ত

(৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)

https://t.me/BoierSomahar

খিলাফতে রাশেদা বলতে কী বোঝায়?

খিলাফতে রাশেদা বলতে সেই আদর্শ ও অনুকরণীয় শাসনকালকে বোঝায় যা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়ে হযরত আলী (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-এর ছয় মাসের শাসনকালকেও আলভী খিলাফতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী থেকে রবিউল আউয়াল ৪১ হিজরী পর্যন্ত এই সময়কাল পূর্ণ ত্রিশ বছর হয়। একেই খিলাফতে রাশেদা বলা হয়।

এই বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস বিদ্যমান:

“আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে, এরপর রাজতন্ত্র শুরু হবে।” [১]

জমহুর মুসলিমদের আকিদাও এই যে, খিলাফতে রাশেদা ত্রিশ বছর। ‘আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ’-তে রয়েছে:

“আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে খিলাফতের জন্য প্রথমে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে সমগ্র উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান মনে করে সাব্যস্ত করি। এরপর উমর বিন খাত্তাব, এরপর উসমান, এরপর আলী বিন আবু তালিব (রা.)-এর জন্য খিলাফত সাব্যস্ত করি। এরাই হলেন খিলাফায়ে রাশেদীন এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত ইমাম।” [২]

এই যুগকে খিলাফতে রাশেদা এই জন্য বলা হয় যে, এটি পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী রাজনীতি ও নববী শাসন পদ্ধতির একটি নমুনা। এই যুগে উম্মতের নেতৃত্ব ছিল সেই সকল শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের হাতে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেছিলেন। এই ব্যক্তিবর্গ সেই প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন প্রতিটি পদক্ষেপে কঠোর ত্যাগ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো। তারা ইসলামের খাতিরে হিজরত করেছেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন। ইসলামের ভিত্তি স্থাপন, প্রচার ও প্রসারে এই মহান ব্যক্তিদের মৌলিক অবদান রয়েছে। এই চারজন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে নিকটতম ও প্রিয় এবং সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণেই নবুওয়াতের যবান থেকে তাদের অনুসরণের জন্য তাকিদপূর্ণ নির্দেশ জারি হয়েছে। নববী ফরমান:

“তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খিলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো এবং তা দাঁত দিয়ে মজবুতভাবে কামড়ে ধরো।” [৩]

এই কারণেই মুসলমানদের ইতিহাসে এই অংশটিকে পরবর্তী যুগ থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয়, যদিও পরবর্তীতেও ন্যায়পরায়ণ খলিফা ও নেককার বাদশাহগণ এসেছেন।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ‘ইযালাতুল খাফা’ গ্রন্থে খিলাফতে রাশেদা সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন।

---

[১] সুনানে তিরমিযী: ২২২৬, বাব মা জাআ ফিল খিলাফাহ। আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

[২] আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৮১, আল-মাকতাব আল-ইসলামী বৈরুত।

[৩] আলাইকুম বি সুন্নাতী ওয়া সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদীনাল মাহদিয়্যীন ওয়া আদ্দু আলাইহা বিন-নাওয়াজিজ (সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬০৭, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফী লুযুমিস সুন্নাহ) এবং তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে, হা: ২৬৭৬, এবং তিনি বলেছেন: হাসান সহীহ, এবং আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

আলোচনা করা হয়েছে যার সারসংক্ষেপ লেখক সহজবোধ্য শব্দে পেশ করছেন:

- খলিফায়ে রাশেদের মধ্যে খেলাফতের সাধারণ শর্তাবলী ছাড়াও একটি শর্ত এই যে, তাঁর সাথে হুজুর ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র ও কার্যাবলীতে বিশেষ সাদৃশ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ তিনি নবী ﷺ-এর গুণাবলীর নমুনা ও প্রতিচ্ছবি হবেন। শুধুমাত্র কিছু গুণাবলীতে সাদৃশ্য থাকা যথেষ্ট নয়, কারণ কিছু না কিছু সাদৃশ্য তো প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই থাকে; যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা। এমন পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য কেবল সেই ব্যক্তিদেরই অর্জিত হতে পারে যারা উম্মতের সর্বোচ্চ স্তরের অন্তর্ভুক্ত, মধ্যম বা নিম্ন স্তরের নয়।

- নবীর খলিফা, নবী বা রাসূল হন না, তবে নবীর গুণাবলীর নমুনা ও প্রতিচ্ছবি হন। সুতরাং খলিফায়ে রাশেদ তিনিই, যিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক শক্তিতে পয়গম্বরের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক শক্তির সদৃশ ও সমগোত্রীয় হন। যে উদ্দেশ্যগুলোর জন্য পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে, সেগুলোর পূর্ণতা এই খলিফার হাতেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ নবী ও রাসূল যে কাজের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে সেই কাজগুলো ওই নবীর বিশেষ খলিফার হাতে পূর্ণতা দান করেন। অতএব, যে খলিফা পয়গম্বরের অবশিষ্ট বিষয়গুলোকে জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক দিক থেকে পূর্ণতায় পৌঁছান, তিনিই তাঁর বিশেষ খলিফা এবং খলিফায়ে রাশেদ।

- কিতাব ও হিকমতের শিক্ষার পর্যায়গুলো তো হুজুর ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে কিছু পর্যায় বাকি ছিল। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, সেগুলোর পূর্ণতা যেন খুলাফায়ে রাশেদীনের হাতে হয়। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহু এর জন্য নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো দিয়েছেন:

- সিদ্দীকী যুগে কুরআন মাজীদকে কিতাব আকারে সংকলন করা

- আহকামের হাদীসসমূহের যাচাই-বাছাই ও প্রচার

- হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করানো

- অনেক মতভেদপূর্ণ ফিকহী মাসআলা পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে মীমাংসা করে ইজমার ভিত্তি স্থাপন করা

- নস (স্পষ্ট বিধান) নেই এমন মাসআলাসমূহে ইজতিহাদের পদ্ধতি চালু করা

- সেই সকল বিজয় সম্পন্ন করা যেগুলোর সুসংবাদ লিসানে নবুওয়াত থেকে দেওয়া হয়েছিল

- খলিফায়ে রাশেদের সাথে পয়গম্বরের সেই সম্পর্ক, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের থাকে। নির্দেশ হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্ক থেকে জারি হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা পালন করে। একইভাবে খেলাফতে রাশেদাতেও শাসনকর্তৃত্ব পয়গম্বরেরই থাকে। নবুওয়াতের যুগ এবং খেলাফতে রাশেদার যুগের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আগে পয়গম্বর তাঁর পবিত্র জবান দিয়ে নির্দেশ দিতেন। এখন লিসানে নবুওয়াত নীরব, কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীন নবুওয়াতের উদ্দেশ্য বুঝে পয়গম্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় সক্রিয়। এই কারণেই খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা ও কাজ শরয়ী দলিল হওয়ার ব্যাপারে পুরো উম্মতে মুসলিমা একমত। যে ব্যক্তি এই মহান ব্যক্তিদের বুঝতে ভুল করেছে, তা তার নিজস্ব বুঝের ত্রুটি। [১]

---

[১] শাহ সাহেব নূরুল্লাহু মারকাদাহু-এর বিস্তারিত আলোচনা তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ইযালাতুল খাফা'-তে দেখুন।

## হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মতে মুসলিমার খলিফায়ে বিলা ফাসল (অবিচ্ছিন্ন খলিফা) হলেন, অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত লাভের পরপরই উম্মতে মুসলিমা তাঁকে নিজেদের খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মতের এই ঐক্যমত্য সত্ত্বেও শুরা বা পরামর্শ ব্যবস্থার পূর্ণতার জন্য সতর্কতা স্বরূপ তিন দিন পর্যন্ত খেলাফতের মসনদ থেকে দূরে থাকেন। প্রতিদিন আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করতেন:

"আমি তোমাদের বায়আত মাফ করে দিলাম। তোমরা যার কাছে চাও, বায়আত হয়ে যাও।"

প্রতিবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বলতেন: "আমরা বায়আত ভাঙব না এবং আপনাকে পদত্যাগও করতে দেব না। আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কে আছে যে আপনাকে পেছনে সরাতে পারে?" [১]

এর মাধ্যমে একদিকে যেমন হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সতর্কতার আন্দাজ পাওয়া যায় যে, আপনি মুসলমানদের সন্তুষ্টি ও আগ্রহ ছাড়া তাদের নেতৃত্বের কল্পনাও করতে পারতেন না। অন্যদিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইখলাস এবং ইশকে রিসালাতেরও আন্দাজ পাওয়া যায় যে, যাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম বানিয়ে গিয়েছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মর্যাদায় সামান্যতম কমতির কথা চিন্তাও করতে পারতেন না।

## হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত:

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং লকব ছিল সিদ্দিক ও আতীক। আবু বকর ছিল আপনার কুনিয়াত। পিতার নাম ছিল উসমান বিন আমির, যিনি আবু কুহাফা কুনিয়াতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাতার নাম ছিল সালমা বিনতে সাখর, তবে তিনিও তাঁর কুনিয়াত "উম্মুল খায়ের" নামেই পরিচিত ছিলেন। আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশ বংশের বনু তায়িম শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [২]

আপনি চারটি বিবাহ করেছিলেন: প্রথম বিবাহ কুতাইলা বিনতে আব্দুল উযযার সাথে হয়েছিল। তাঁদের থেকে আবদুল্লাহ এবং আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিবাহ উম্মে রোমানের সাথে হয়েছিল, যাঁর গর্ভে আব্দুর রহমান এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় বিবাহ আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে হয়েছিল, যিনি হযরত জাফর বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিধবা স্ত্রী ছিলেন, তাঁদের থেকে মুহাম্মদ বিন আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্থ বিবাহ হাবিবা বিনতে খারিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে হয়েছিল। প্রথম দুটি বিবাহ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং শেষ দুটি বিবাহ ইসলাম গ্রহণের পরে করেছিলেন। [৩]

---

[১] ফাযাইলুস সাহাবা লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১০২, ত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ।

[২] বংশপরম্পরা হলো: আবদুল্লাহ বিন আবু কুহাফা উসমান বিন আমির বিন আমর বিন কাব বিন সাদ বিন তায়িম বিন মুররাহ বিন কাব বিন লুয়াই। মুররাহ-তে গিয়ে আপনার বংশধারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছে। মুররাহ-এর এক ছেলে কিলাবের বংশ থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্য ছেলে তায়িমের বংশধর থেকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। (আল-ইসাবাহ: ৩/১৩৩, ১৩৫, ত: আল-ইলমিয়্যাহ)।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/২৯৩, ১৩ হিজরীর অধীনে।

আপনি (রা.) শুরু থেকেই অত্যন্ত শরীফ, পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং সদাচারী ছিলেন। মক্কাতুল মুকাররমায় আপনার একজন সম্মানিত ব্যক্তির মর্যাদা ছিল। আপনার জীবিকার মাধ্যম ছিল ব্যবসা, যার কারণে আপনার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। এই কারণেই আপনি আরবদের বংশপরম্পরা বিষয়ক বড় আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। আপনি জাহেলিয়াত যুগে মানুষের বিবাদ-বিসংবাদের ফয়সালাও করতেন, তাই আপনি রাজনীতি ও বিচারিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা যৌবনের শুরু থেকেই লাভ করেছিলেন। আপনার তথ্য ও সম্পর্কের এই ব্যাপকতা এবং বিচারালয়ের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে ইসলামের প্রচার ও খিলাফতের জন্য বড় সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

আপনি (রা.) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর আপনি হুজুর নবী কারীম (সা.)-এর সাহচর্য এবং দ্বীনের খিদমতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আপনি হুজুর (সা.)-এর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করেছিলেন। আপনি এমন সব অসহায় ব্যক্তিদের কাফেরদের জুলুম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাঁদেরকে কিনে আজাদ করে দিয়েছিলেন, যাদেরকে ইসলাম গ্রহণের কারণে চরম নির্যাতন করা হতো। [১]

হিজরতের কঠিনতম অভিযানে আপনি হুজুর (সা.)-এর সাথে সাথে ছিলেন, গারে সওরে নবী কারীম (সা.)-এর পাহারাদারি করেছেন, বদর যুদ্ধে শময়ে রিসালাতের রক্ষক হয়েছেন, নিজের কলিজার টুকরো হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে রিসালাতের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। সমস্ত যুদ্ধ ও অভিযানে হুজুর নবী কারীম (সা.)-এর সহযাত্রী ছিলেন। হুজুর (সা.) তাঁর খিলাফতের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। একবার ইরশাদ করেছেন: “ইকতাদূ বিল্লাযীনা মিম বা’দী আবী বাকরিন ওয়া উমার।”
“আমার পরে এই দুজনের অর্থাৎ আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করো।” [২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইমামতির জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এটি এই বিষয়ের প্রতি ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা ছিল যে, নবীর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের তাঁরই অনুসরণ করা উচিত।

**সৈয়্যদনা সিদ্দিক আকবর (রা.)-এর সম্মুখীন পরীক্ষাসমূহ:**

ষাট বছর বয়সী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যখন খিলাফতের দায়িত্ব নিজ হাতে নিলেন, তখন নিজেকে হুজুর নবী কারীম (সা.)-এর পূর্ণতম উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণ করে দেখালেন। আপনি “খলিফাতুল্লাহ” বলা পছন্দ করেননি বরং “খলিফাতুর রাসূল” উপাধিটি উপযুক্ত মনে করেছেন। খলিফা হওয়ার পরেও আপনি নিজের জীবিকার বোঝা কারো ওপর চাপাননি, মুসলমানদের সামষ্টিক তহবিল বায়তুল মাল থেকে একটি দিরহাম নেওয়াও পছন্দ করেননি। আপনি নিয়ম অনুযায়ী সকালে বাজারে বেরিয়ে যেতেন এবং কাপড় বিক্রি করতেন, যোহরের পর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতেন। একদিন হযরত উমর এবং হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) আপনাকে কাঁধে কাপড় নিয়ে বাজারে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?”
বললেন: “বাজারে যাচ্ছি।”

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/২৬৩, ২৬৫ যিকর বা’য আখবারিহি ওয়া মানাকিবিহি

[২] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৬৬২, আবওয়াবুল মানাকিব; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ২৯০২

প্রশ্ন করা হলো: “আপনাকে মুসলমানদের বিষয়াবলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনি কীভাবে ব্যবসা করতে পারেন?” তিনি বললেন: “তাহলে আমার সন্তান-সন্ততিদের ভরণপোষণ কীভাবে করব?” তারা দুজনেই এ বিষয়ে চিন্তা করলেন এবং অনেক পীড়াপীড়ির পর তাঁকে রাজি করালেন যে, তিনি ‘বাইতুল মাল’ থেকে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ গ্রহণ করবেন, যাতে পুরো সময় মুসলমানদের বিষয়াবলি দেখাশোনার কাজে ব্যয় করা যায়। [১]

আপনার সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ইসলামী শরীয়ত এবং আল্লাহর আইনকে সেই রূপে বজায় রাখা যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে ছিল। শরীয়তের উৎস কুরআন কারীম আপনার সামনে ছিল। এর ব্যাখ্যা সুন্নতে রাসূলের আকারে বিদ্যমান ছিল। এগুলো ছিল শরীয়তের উৎস এবং আপনি উম্মতকে ধাপে ধাপে সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।

**মিরাসে নববী... একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৃঢ়তা:**

স্বভাব ও আবেগের ওপর শরীয়তকে প্রাধান্য দেওয়ার আরেকটি পরীক্ষা মিরাসে নববীর সমস্যার আকারে সামনে এল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তানদের মধ্যে তখন কেবল হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জীবিত ছিলেন। তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা হলো যে, পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের অংশ থাকে, সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিরাসে আমাদের অধিকার থাকবে। তবে এই ধারণায় তিনি একা ছিলেন না। অধিকাংশ উম্মাহাতুল মুমিনীনও একই প্রত্যাশা করতেন। সারা জীবনের মতো ইন্তেকালের সময়ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র ঘরে কোনো দিরহাম বা দিনার ছিল না, ছিল না কোনো আসবাবপত্র। তবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের জীবনযাত্রার জন্য তিন ধরনের সম্পদ ছিল:

- মদিনায় বনু নযীর থেকে জিহাদে অর্জিত মালে ফায়-এর উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ। [২]
- খয়বরের জিহাদ থেকে অর্জিত মালে গনীমতের অংশ।
- খয়বরের উত্তর-পূর্বে ফাদাক নামক উর্বর এলাকার বাগানসমূহের উৎপাদন।

খয়বরের গনীমত এবং ফাদাকের কৃষি জমিগুলো এই জিহাদে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবী, যারা সংখ্যায় ১৪০০ ছিলেন, তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। একটি অংশ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও পেয়েছিলেন। আয়ের এই উৎসগুলোর অধিকাংশ অংশই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের প্রয়োজনে ব্যয় করতেন, তবে কিছু অংশ নিজের পরিবার-পরিজনের ওপরও ব্যয় করতেন।

হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন আয়ের এই উৎসগুলোকে মিরাসে নববী মনে করে প্রত্যাশা করতে লাগলেন যে, এ থেকে একটি অংশ তাঁদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে শরয়ী মাসআলা ছিল ভিন্ন। বনু নযীরের জমি তো মালে ফায় ছিল যা আল্লাহর রাসূলের মালিকানাধীন ছিল না বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুসলমানদের শরয়ী খলীফার তত্ত্বাবধানে চলে আসে।

---

[১] তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৩/১১৩, ত তদমুরী।

[২] শত্রুদের সাথে যুদ্ধ না করে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাকে মালে ফায় বলা হয়। এর এক-পঞ্চমাংশ মুসলিম প্রধান তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানে প্রয়োজন হতো ব্যয় করতেন। আল-ফায়ু মা উখিযা মিন আমওয়ালি আহলিল হারবি বি-হাক্কিন মিন গয়রি কিতালিন, কাল-আমওয়ালিল্লাতি ইয়াহরুবুল কুফফারু ওয়া ইয়াতরুকুনা-হা ফাযাআন ইনদা ইলমিহিম বি-কুদুমিল মুসলিমীন। আম্মা মাসরিফুহু ফাহুওয়া ফী মাসালিহিল মুসলিমীনা বি-হাসাবি মা ইয়ারা-হুল ইমামু কা-রিযকিল কুদাতি ওয়াল মুয়াযযিনীনা ওয়াল আইম্মাতি ওয়াল ফুকাহা-ই ওয়াল মুয়াল্লিমীনা ওয়া গয়রি যালিকা। (আল-ফিকহুল মুয়াসসার ফী দাউইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ১০৭)।

...তিনি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী এর আয় আহলে বাইতের ওপর অবশ্যই খরচ করতে পারতেন, কিন্তু একে কারো মালিকানাধীন করতে পারতেন না। যেখানে খায়বার ও ফাদাকের অংশের সম্পর্ক রয়েছে, তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মালিকানাধীন ছিল, কিন্তু নবী কারীম (সা.) স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছিলেন: "ইন্না মা'শারাল আম্বিয়া লা নূরাসু, মা তারাকনা সাদাকাহ"। "আমরা নবীদের জামাতের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সদকা।" [১]

পূর্ববর্তী উম্মতদের নবীদের জন্যও এই একই বিধান ছিল যে, তাদের মালিকানায় যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস থেকেও যেত, তবে তাদের মৃত্যুর পর তা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা যেত না, বরং তার ব্যবহার সদকা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় হিকমত এই ছিল যে, রাসূলদের অস্বীকারকারীরা যেন এই বলার সুযোগ না পায় যে, রিসালাতের পদটিও পরিবার-পরিজন লালন-পালন এবং নিজের বংশকে ধনবান করার একটি বাহানা মাত্র।

কিন্তু হযরত ফাতিমা (রা.) এবং অধিকাংশ উম্মাহাতুল মুমিনীন (রা.)-এর হয় এই শরয়ী মাসআলা সম্পর্কিত হাদীসটি জানা ছিল না অথবা তাদের নিকট এর অর্থ অন্য কিছু ছিল। কিন্তু যেহেতু এটি একটি অনন্য আর্থিক বিষয় ছিল এবং এই উম্মত প্রথম ও শেষবারের মতো এর সম্মুখীন হয়েছিল, তাই আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মতো মাত্র কয়েকজন বড় ব্যক্তিত্বের এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। একইভাবে অধিকাংশ মহিলার এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা, শোনার পর ভুলে যাওয়া বা এর সঠিক অর্থ না বোঝা কোনো অসম্ভব বিষয় ছিল না। যা-ই হোক, হযরত আবু বকর (রা.) এই শরয়ী মাসআলার ঠিক সেভাবেই অনুসরণ করেছিলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল। তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম, আমি সেই কর্মপন্থা কখনোই ত্যাগ করব না যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করতেন।" [২]

ফলে তিনি খায়বারের সম্পদ এবং ফাদাকের বাগানগুলোকে মিরাস হিসেবে আহলে বাইতের মধ্যে বণ্টন করার পরিবর্তে মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণের জন্য ওয়াকফ করে দেন, যেন এই সম্পত্তিকে সদকা ও খয়রাতের সর্বোত্তম রূপ "সদকায়ে জারিয়া"য় রূপান্তরিত করে দিলেন। কিন্তু এর অর্থ এই ছিল না যে, হযরত আবু বকর (রা.) আহলে বাইতকে নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। বরং তিনি তো বলতেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আত্মীয়তা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়তার চেয়ে বেশি প্রিয়।" [৩]

তিনি অত্যন্ত যথাযথ ফয়সালা করেছিলেন যে, কাউকে মালিকানা স্বত্ব না দিয়ে, এই সম্পত্তিগুলোর মুতাওয়াল্লী হিসেবে এগুলোর আয় আহলে বাইতের ওপর খরচ করার ধারা অব্যাহত রাখেন। এর মধ্যেই আহলে বাইত এবং সাদাত কিরামের কল্যাণ নিহিত ছিল। কারণ যদি কয়েকজন ব্যক্তিকে মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেওয়া হতো, তবে সম্ভব ছিল কয়েক প্রজন্ম পর এই আয়ের উৎস শেষ হয়ে যেত এবং পরবর্তী সাদাতগণ এর থেকে কোনো অংশ পেতেন না। এখন এই সম্পত্তি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সংরক্ষিত হওয়ার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত আহলে বাইতের বংশধরদের কাছে এই সম্পদ থেকে অংশ পৌঁছাতে থাকে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল থাকেন। [৪]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৬৭২৬, কিতাবুল ফারায়েজ, বাব: নবী (সা.)-এর বাণী 'লা নূরাসু মা তারাকনা সাদাকাহ'।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৬৭২৬, কিতাবুল ফারায়েজ।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৩০৩৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব: হাদীসে বনী নাযীর।

[৪] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা: ১২৭৩৩, ত: ইলমিয়্যাহ।

https://t.me/BoierSomahar

যাই হোক, যখন এই সম্পদসমূহ আহলে বাইতের মধ্যে বণ্টন করা হলো না, তখন হযরত ফাতিমা (রা.) এবং অধিকাংশ উম্মাহাতুল মুমিনীন মাসআলাটি সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে অভিযোগ করেন। তাঁরা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে তাঁদের দাবির কথা জানিয়ে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে পাঠাতে চাইলেন। এই সময়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) একমাত্র পবিত্র স্ত্রী ছিলেন যিনি নবীদের উত্তরাধিকারের সঠিক ব্যবহারের আইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) কি বলেননি যে, আমরা যা রেখে যাই তা সদকা?" [১]

যখন উম্মাহাতুল মুমিনীন এই মাসআলাটি জানতে পারলেন, তখন তাঁরা তাঁদের দাবি ত্যাগ করলেন। তবে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর তখনও এই ধারণা ছিল যে, মিরাসে তাঁর অংশ থাকা উচিত। সম্ভবত তাঁর মতে হাদীসের অর্থ ছিল এই যে, নবীদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে দিরহাম ও দিনার বা সোনা-রূপার মতো জিনিসগুলোতে উত্তরাধিকার কার্যকর হবে না, কারণ কিছু হাদীসে আছে: "আমার উত্তরাধিকারীরা কোনো দিনার বা দিরহাম বণ্টন করবে না।" [২] তাঁর কাছে ক্ষেত, জমি এবং বাগানের মতো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই বিধান ছিল না। তাই তাঁর সংশয় রয়ে গিয়েছিল। নিজের সন্তুষ্টির জন্য তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে গেলেন। প্রথম খলিফা তাঁকে এই হাদীসটিই শোনালেন যে, নবীরা যা রেখে যান তা সদকা। [৩]

এই পর্যায়ে রাসূলের কলিজার টুকরা তাঁর ইলমী আগ্রহের ভিত্তিতে প্রশ্ন তুললেন যে, শেষ পর্যন্ত আপনার সন্তানরা আপনার ওয়ারিশ হবে, তাহলে আমি কেন আমার পিতার ওয়ারিশ হতে পারব না?

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূলের কলিজার টুকরা! আপনার সম্মানিত পিতা কোনো ঘর, কোনো গোলাম, কোনো মাল, কোনো রূপা বা সোনা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি।"

হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: "আর ফাদাকের সেই জমির মর্যাদা কী যা আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং সাফিয়া (গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ)-এর ব্যবহার কী যা আমাদের জন্য আপনার হাতে রয়েছে?"

খলিফায়ে রাসূল বললেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইরশাদ ছিল যে, এটি রিযিকের একটি লোকমা যা আল্লাহ আমাকে খাওয়াচ্ছেন, আমি মারা গেলে এটি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ।" [৪]

হযরত ফাতিমা (রা.) এই বাণীর সামনে নীরবতা অবলম্বন করলেন। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালেও এই বিধান এভাবেই বহাল ছিল।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস (রা.) এই বিষয়ে তাঁর সাথে দুইবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর দলিলের সামনে এই দুই ব্যক্তিই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। [৫]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৬৭৩০; সহীহ মুসলিম, হা: ৪৬৭৯, মাত দারুল জাবাল

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৭৭৬, কিতাবুল ওয়াসায়া, বাব নাফাকাতুল কাইয়্যিম

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৬৭২৬, কিতাবুল ফারায়িয

[৪] এটি কেবল একটি জীবিকা যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমাকে দান করেছেন, সুতরাং আমি যখন মারা যাব তখন তা মুসলমানদের মধ্যে (বণ্টনযোগ্য) হবে। (শারহু মা'আনিল আসার, খণ্ড: ৫৩৩৭)

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৬৭২৮, কিতাবুল ফারায়িয

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ফয়সালা সঠিক হওয়ার এবং বনু হাশিম এর ওপর সন্তুষ্ট থাকার অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ হলো এই যে, হযরত ফাতিমা (রা.) বা তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ আর এই দাবি পুনরাবৃত্তি করেননি। বরং হযরত আলী (রা.)-ও তাঁর খিলাফতকালে এই আদেশকে একইভাবে বহাল রেখেছিলেন এবং ফাদাক বাগানকে আহলে বাইতের মালিকানায় দেননি। যদি এটি প্রকৃতপক্ষে বনু হাশিমের হক হতো, তবে হযরত আলী (রা.)-এর তাঁর আমলে পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল যে, তিনি এই হক হকদারদের দিয়ে দিতেন। যদি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ফয়সালা জুলুম হতো, তবে হযরত আলী (রা.)-এর ওপরও ইখতিয়ার ও ক্ষমতা লাভের পর সেই জুলুমকে সমর্থন করার অভিযোগ আসবে। নাউযুবিল্লাহ যে আমরা এই মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে এমন কিছু চিন্তা করব।

কিছু লোক এই মিথ্যা দাবি করে যে, "হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর সাথে মিলে আহলে বাইতকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।" অথচ মিরাস বণ্টন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীর কারণেই বন্ধ রাখা হয়েছিল। আবার এই ধারণা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর যে, কেবল হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বঞ্চিত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্য থেকেও কেউ মিরাস পাননি। যদি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) মিরাস বণ্টন করাতেন, তবে এতে তাঁদের নিজেদেরই ফায়দা ছিল যে, তাঁদের কন্যারা অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.)-ও অংশ পেতেন। কিন্তু তাঁরা সকল স্বার্থকে তুচ্ছ করে নববী ফরমানের আনুগত্য করেছেন।

**হযরত ফাতিমা (রা.)-এর হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্টির বর্ণনা এবং এর ব্যাখ্যাসমূহ:**

কিছু সহীহ বর্ণনার বাহ্যিক শব্দ থেকে সন্দেহ হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই ফয়সালায় হযরত ফাতিমা (রা.) এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি পুনরায় তাঁর সাথে কথা বলেননি। অথচ:

- এই বর্ণনাগুলোর সহজ অর্থ হলো এই যে, মিরাস সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি পুনরায় কথা বলেননি।
- যদি ধরে নেওয়া হয় যে হযরত ফাতিমা (রা.) স্বাভাবিকভাবে মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তবে এর দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ওপর কোনো অভিযোগ আসে না, আর না হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ওপর। পরিশেষে তিনি একজন মানুষ ছিলেন। এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, মানুষের কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে এবং পরে যখন জানতে পারে যে নিয়মানুযায়ী তার অধিকার নেই, তখন মনে কিছুটা কষ্ট সৃষ্টি হয়।
- সম্ভব যে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর এই প্রত্যাশাও ছিল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলীফা ও অভিভাবক হওয়ার সুবাদে ফাদাক তাঁর নামে করে দেওয়ার ইখতিয়ার রাখেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শরীয়ত অনুযায়ী এই ইখতিয়ার ছিল না। তাই তিনি যা করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু করা তাঁর জন্য বৈধও ছিল না। যদি মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কিছুটা দুঃখ ও মনোকষ্ট হয়ে থাকে তবে তা অসম্ভব নয়। কিন্তু এমনটি কখনোই হয়নি যে, এই মনোকষ্ট সম্পর্ক ছিন্ন করা পর্যন্ত পৌঁছেছে।
- নীরবতা এক জিনিস আর সালাম ও কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া অন্য কথা। সালাম ও কথাবার্তা বন্ধ করা তখন প্রমাণিত হতো যখন আগে হযরত সিদ্দিক আকবর (রা.)-এর সাথে তাঁর প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো এবং এই সমস্যার পর সেই সিলসিলা বন্ধ হয়ে যেত। স্পষ্ট কথা হলো যে, আবু বকর (রা.) তাঁর জন্য গায়রে মাহরাম ছিলেন। আগেও তিনি তাঁর সাথে তীব্র প্রয়োজন ছাড়া দেখা করতেন না, তবে এখন কেন করবেন।
- হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর দেখা না হওয়ার আরেকটি বড় কারণ এটিও ছিল যে, হযরত ফাতিমা (রা.)

...নিজের পিতার ইন্তেকালের পর শোক ও দুঃখে নিমজ্জিত থাকতেন। এরই মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ছয় মাস পর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এদিকে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তখন মুরতাদ এবং খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ইরান ও শামের জন্য সৈন্য প্রেরণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের সময় কোথায় পাওয়া যেত।

**হযরত ফাতিমা (রা.)-এর হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি সন্তুষ্টির প্রমাণ:**

এটি প্রমাণিত যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতে আগমন এবং খোঁজখবর নেওয়ায় হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রা.) সান্ত্বনা লাভ করেন। পরবর্তীতেও তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। [১]

**হযরত ফাতিমা (রা.)-এর হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল:**

এটিও প্রমাণিত যে, ফাতিমা (রা.)-এর সাথে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর শেষ পর্যন্ত এতই সুসম্পর্ক ছিল যে, তিনি তাঁর কাছে গোপনীয় কথাও বলতেন। چنانچہ যখন উম্মুল মুমিনীন জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকালের আগে আপনার কানে কানে কী বলেছিলেন যে আপনি প্রথমে কাঁদলেন এবং পরে হাসলেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রথমে নিজের ইন্তেকালের খবর দিয়েছিলেন যাতে আমার কান্না চলে আসে। তারপর জানালেন যে, আমার পরিবারের মধ্যে সবার আগে তুমিই আমার সাথে মিলিত হবে। এতে আমি হেসে দিয়েছিলাম। [২]

যদি ফাতিমা (রা.)-এর আবু বকর (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্টি থাকত, তবে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে আসা কেন পছন্দ করতেন এবং তাঁর মেয়ের সাথে গোপনীয় কথা কেন বলতেন।

**হযরত আলী (রা.)-এর হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ:**

একইভাবে হযরত আলী (রা.) তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী লায়লা বিনতে মাসউদ থেকে জন্মগ্রহণকারী এক ছেলের নাম আবু বকর রেখেছিলেন। [৩] হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর ছেলে মুহাম্মদ বিন আবি বকর আড়াই বছর বয়সী ছিলেন। [৪] হযরত আলী (রা.) তাঁকে নিজের পালক পুত্র হিসেবে লালন-পালন করেন। [৫]

এটি কি হযরত আলী (রা.)-এর হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসার স্পষ্ট প্রমাণ নয়? সত্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কলিজার টুকরো এবং আহলে বাইতকে খুলাফায়ে রাশেদীনের বিরোধী হিসেবে বিশ্বাসকারীরা এই মহান ব্যক্তিদের মর্যাদা ও চরিত্র সম্পর্কে অবগতই নয়।

**হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রা.)-এর ইন্তেকাল:**

সিদ্দিকের খিলাফতের ষষ্ঠ মাসে, ৩ রমজান ১১ হিজরিতে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়। [৬] একটি বর্ণনা অনুযায়ী...

---

[১] আল-ইতিকাদ লিল বায়হাকী, পৃ. ৩৫৩, আন ত্বরিকিশ শা'বী বি-ইসনাদিন সহীহিন মুরসাল।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৫২, বাব ফাযায়েলে ফাতিমা (রা.)।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/২৫ ... বা আবু বকর বিন আলী কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন।

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ, তরজমা: মুহাম্মদ বিন আবি বকর।

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২৯, ত. সাদির।

[৬] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২৮, ত. সাদির।

জানাযার নামায হযরত আলী (রা.) পড়িয়েছেন এবং অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) পড়িয়েছেন। [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকাল হযরত ফাতিমা (রা.)-এর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি প্রায়ই এই কবিতাটি পড়তেন:

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا ... صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

“আমার ওপর এমন বিপদ আপতিত হয়েছে যে, যদি তা দিনের ওপর আপতিত হতো তবে দিনও রাতে পরিণত হতো।”

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে আর কখনো হাসতে দেখা যায়নি। তিনি সর্বদা শোক ও দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন।

সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল ২৮ বছর। [২]

---

[১] হযরত ফাতিমা আয-যাহরা (রা.)-এর জানাযার নামায কে পড়িয়েছেন?

এই বিষয়ে ইবনে সাদ তিনটি বর্ণনা পেশ করেছেন, তিনটিই দুর্বল।

- আমরা বিনতে আবদুর রহমানের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রা.) জানাযার নামায পড়িয়েছেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২৮, তাবারানি) কিন্তু বর্ণনাকারী আমরা বিনতে আবদুর রহমান (মৃত্যু ৯৮ হি.) নিশ্চিতভাবে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন।
- উরওয়াহ বিন যুবাইরের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) জানাযার নামায পড়িয়েছেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২৯) এর সনদে মুহাম্মদ বিন ওমর (ওয়াকিদী) আছেন; তিনি যুহরী থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন... স্পষ্ট যে উরওয়াহ বিন যুবাইরও এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন কারণ তাঁর জন্ম ২৩ হিজরীতে। (তারীখে খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ১৫২) সুতরাং এই সনদটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) এবং ওয়াকিদীর কারণে এটি দুর্বলও বটে।

এই বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমও নকল করেছেন (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাবু কওলিন নবী (সা.) লা নূরাসু)। এর প্রাথমিক অংশ তো অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। কিন্তু পরবর্তী অংশ যুহরীর ইদরাজ (সংযোজন) এবং উরওয়াহ বিন যুবাইর থেকে মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন), যেমনটি ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন যে হযরত আলী (রা.)-এর বায়আত থেকে ছয় মাস পিছিয়ে থাকার ঘটনাটি উরওয়াহর উক্তি, যা জানাযার নামাযের ঘটনার মতোই মুরসাল ও মুনকাতি।

- শাবী-র বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) জানাযার নামায পড়িয়েছেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২৯) সনদটি হলো: আখবারানা মুহাম্মদ বিন ওমর হাদ্দাসানা কাইস বিন রাবী’ আন মুজালিদ আনিশ শাবী।

ওয়াকিদীর দুর্বলতা স্পষ্ট। কাইস বিন রাবী’ সত্যবাদী কিন্তু (তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৫৫৩)। মুজালিদ বিন সাঈদকে লীন, লাইসা বিশাই বলা হয়েছে (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৬৭৮৩)। ইমাম মুসলিম তাঁর থেকে বর্ণনা নিলেও তা কেবল শাহিদ (সমর্থনকারী) হিসেবে। ইমাম শাবী-র সনদটিও মুনকাতি কারণ তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। তবে এই বর্ণনার একটি মুতাবা’ (সমর্থনকারী বর্ণনা) বিদ্যমান:

صلى ابوبكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله فكبر عليها اربعا... (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২৯)

সনদটি হলো: শাবাবাহ বিন সাওয়ার, আবদুল আলা বিন আবি আল-মুসাওয়ার, হাম্মাদ (শায়খুল ইমাম আবু হানিফা), ইবরাহিম (নাখঈ)।

এই সনদটিও মুনকাতি। এছাড়া আবদুল আলার কারণে এতে দুর্বলতা রয়েছে কারণ তাকে ‘মাতরুক’ ও ‘লাইসা বিশাই’ বলা হয়েছে (মিযানুল ইতিদাল: ৩/৫৩)। সংক্ষেপে এই সিলসিলার সমস্ত বর্ণনা দুর্বল। তবে প্রথমোক্ত মুতাবা’ (সমর্থনকারী) বিদ্যমান থাকার কারণে এটি তুলনামূলক শক্তিশালী মনে হয়।

[২] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ২২/৩৯৯।

এক ৩৫ বছর বয়সের বর্ণনাটিও বিদ্যমান কিন্তু তা দুর্বল ও সত্যের পরিপন্থী, যেমনটি আমরা সীরাতে নববী অধ্যায়ের অধীনে স্পষ্ট করেছি।

**তিনটি বড় ফিতনা**

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই এমন তিনটি ফিতনার সম্মুখীন হন যে, যদি তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দৃঢ়তা এবং বিস্ময়কর ঈমানী শক্তির সাথে সেগুলোর মোকাবিলা না করতেন, তবে সেগুলো ইসলামের প্রাথমিক যুগেই উম্মতের অস্তিত্বকে তছনছ করে দিত।

প্রথম ফিতনাটি ছিল সেই সব উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেষ দিনগুলোতে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে আরব ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং হাজার হাজার নওমুসলিম ও অজ্ঞ লোক তাদের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। এই মিথ্যা নবীদের মধ্যে আসওয়াদ আনসি, তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ, মুসাইলামা কাযযাব এবং বনু তামীমের এক মহিলা সাজাহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় ফিতনাটি ছিল ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের। নজদ, ইয়ামেন এবং অন্যান্য অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ এই ধারণা করে যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সাথে সাথে ইসলামের প্রদীপও নিভে গেছে, মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা পুনরায় তাদের পৈতৃক ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

তৃতীয় ফিতনাটি ছিল সেই সব লোকদের, যারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল।

**যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে আচরণ:**

যাকাত অস্বীকারকারীরা খিলাফতের দরবারে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দাবি করেছিল যে, তারা তাওহীদ ও রিসালাত এবং ইসলামের অন্যান্য সমস্ত রুকন মানে, কিন্তু তাদের যাকাত মাফ করে দেওয়া হোক। কিছু সাহাবী (রা.) পরিস্থিতির নাজুকতা এবং সময়ের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আপাতত তাদের এই দাবি মেনে নেওয়া হোক এবং যাকাত আদায় না করার ছাড় দেওয়া হোক। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মতো সাহসী ও উচ্চ হিম্মতসম্পন্ন ব্যক্তিরও পরামর্শ ছিল যে, বিদ্রোহের নতুন ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য তাদের এই শর্ত মেনে নেওয়া হোক। তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে বলেছিলেন:

“এই লোকেরা তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছে; আপনি তাদের সাথে কেন যুদ্ধ করতে চান?”

কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাজনৈতিক কৌশল এবং সময়ের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ইসলামকে তার আসল রূপে টিকিয়ে রাখার সংকল্প করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন: “আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি যাকাতকে সালাতের সমান গুরুত্ব দেবে না, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে যারা যাকাত হিসেবে একটি ছাগলের বাচ্চাও দিত, আজ যদি তারা তা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরব।” [১]

**উসামার বাহিনী প্রেরণ:**

বাতিলের এই সমস্ত দলগুলোর মোকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরি ছিল, তবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যে কাজটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব...

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু উজুবিয যাকাত; সুনানে নাসাঈ মুজতবা, খণ্ড: ২, হা: ৩০৯২, তহাভী। এটি কেবল কিয়াস ছিল না বরং নস (দলিল) এর ওপর ভিত্তি করে ছিল: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة (সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ১, পৃ: ৩৮)।

এটি ছিল হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর সেই বাহিনীর যাত্রা, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শেষ দিনগুলোতে প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা এবং পরবর্তীতে ইন্তেকালের কারণে এই বাহিনী এখন পর্যন্ত মদিনা মুনাওয়ারার বাইরে অবস্থান করছিল। এখন অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ছিল যে, এই বাহিনীকে থামিয়ে দিয়ে প্রথমে জাজিরাতুল আরবে প্রাদুর্ভূত বিদ্রোহগুলো দমন করা উচিত, যাতে নিজেদের শক্তি বিক্ষিপ্ত না হয়ে পড়ে।

এই চতুর্মুখী পরীক্ষায় একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এরই সাহস ছিল যা নবুওয়াতের রাজনীতির মানদণ্ডকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। তিনি তাওয়াক্কুল এবং কৌশলের এমন এক সংমিশ্রণ পেশ করেছিলেন যে, মুসলমানরা পরিস্থিতির এই কঠিনতম ঝড়গুলো থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল এবং দ্বীন ও শরীয়তের কোনো স্তম্ভে সামান্যতম ফাটল ধরার উপক্রমও হয়নি।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যদি সেই সময় দ্বীনি দৃঢ়তা এবং ঈমানি অবিচলতায় সামান্যতম দুর্বলতা প্রদর্শন করতেন, তবে ইসলাম একটি প্রায়োগিক দ্বীন এবং শাশ্বত জীবনব্যবস্থার স্তর থেকে নিচে নেমে স্রেফ একটি দর্শনে পরিণত হতো অথবা কেবল ইবাদতের একটি ব্যক্তিগত রুটিন হিসেবে গণ্য হতো। তখন থেকেই এটি ধরে নেওয়া হতো যে, এই দ্বীনও রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিষয়াবলীতে সঙ্গ দিতে অক্ষম; সুতরাং প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়গুলো শরীয়ত থেকে মুক্ত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সমাধান করা উচিত।

কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা এই বিপদ আঁচ করতে পেরেছিল এবং তিনি সময়মতো এর প্রতিকার করেছিলেন।

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর বাহিনীর যাত্রার বিষয়টি যখন সামনে এল, তখন হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আপনার খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং এই যাত্রা স্থগিত করার পরামর্শ দিয়ে বললেন: “আরবের চারদিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। এই বাহিনীকে সিরিয়ায় পাঠানোর কোনো ফায়দা নেই, একে মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন। এই বাহিনীর অনুপস্থিতিতে মদিনা নিরাপদ থাকবে না। এখানে আমাদের শিশু ও মহিলারা রয়েছে; আপনি রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখুন যতক্ষণ না মুরতাদদের বিষয়টি মীমাংসা হয়।”

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁদের কথাগুলো শুনলেন এবং এরপর বললেন: “আরো কিছু বলার আছে?”

তাঁরা বললেন, “না। আমরা আমাদের কথা বলে ফেলেছি।”

তখন খলিফায়ে বিলা ফাসল (রা.) বললেন: “সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি হিংস্র পশুরা মদিনায় ঢুকে আমাকে ছিঁড়ে খায়, তবুও আমি অবশ্যই এই বাহিনীকে পাঠাব। এটা কীভাবে সম্ভব যে আমি একে থামিয়ে দেব, অথচ জনাবে রাসূলুল্লাহ (সা.), যাঁর ওপর আসমান থেকে ওহী নাযিল হতো, তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে এই বাহিনীকে রওনা করে দাও।” [১]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর অটল সিদ্ধান্ত শুনে সবাই চুপ হয়ে গেলেন। তবে কিছু লোক প্রস্তাব দিলেন যে, উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর পরিবর্তে প্রবীণ সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর নিযুক্ত করা হোক। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এটি শুনে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন: “যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমীর বানিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বরখাস্ত করার পরামর্শ দিচ্ছ!”

---

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১০১; কানযুল উম্মাল, হা: ৩০২৬৬, ৩০২৬৭।

লশকর রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মুজাহিদদের উৎসাহিত করার জন্য এমনভাবে সাথে চললেন যে, তিনি ছিলেন পদব্রজে আর হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) ছিলেন ঘোড়ায় সওয়ার। হযরত উসামা (রা.) বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন: "খলিফাতুর রাসূল! আপনি সওয়ার হোন নতুবা আমিও পায়ে হেঁটে চলব।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন: "না তোমার নামার প্রয়োজন আছে, না আমার সওয়ার হওয়ার। এতে কী ক্ষতি আছে যে, আমার পায়ে আল্লাহর পথের কিছু ধূলি লাগুক, মুজাহিদ তো প্রতি কদমে সাতশ নেকি পায়।"

তিনি (রা.) পরামর্শের জন্য হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে নিজের সাথে মদিনা মুনাওয়ারায় রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি উসামার লশকরে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার এক উচ্চতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাকে নিজে আটকানোর পরিবর্তে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর নিকট থেকে তাকে নিজের কাছে রাখার বিধিবদ্ধ অনুমতি নিলেন। এভাবে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমিরের মর্যাদা কী এবং শৃঙ্খলা কাকে বলে। রওনা হওয়ার সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত উসামা (রা.)-কে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলি প্রদান করেন:

"খিয়ানত ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের হত্যা করো না, খেজুর গাছ ও ফলবান বৃক্ষ কেটো না। তোমরা সেখানে উপাসনালয়গুলোতে নির্জনে অবস্থানরত সন্ন্যাসীদের পাবে, তাদের কোনো ক্ষতি করো না।" [১]

উসামার লশকরে দুই হাজার পদাতিক এবং এক হাজার অশ্বারোহী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় যারা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কম ছিল না। [২]

**উসামার লশকর চলে যাওয়ার পর মদিনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষা:**

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর লশকর রওনা হওয়ার পর মদিনা মুনাওয়ারায় সামরিক শক্তি অনেক কমে গিয়েছিল, তাই মুরতাদ গোত্রগুলো মদিনা মুনাওয়ারার চারপাশে সমবেত হতে শুরু করল। মদিনার উত্তর দিক থেকে আবস ও যুবইয়ান, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বনু ফাজারা এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বনু গাতফানের মুরতাদরা ধেয়ে এল। শহরকে বিপদের মুখে দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অত্যন্ত তৎপরতার সাথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সমস্ত মহাসড়ক ও পথগুলোতে পাহারা বসালেন এবং তাদের মদিনাকে সর্বদা প্রস্তুত ও সতর্ক থাকার তাকিদ দিলেন। [৩]

এদিকে হযরত উসামা (রা.)-এর লশকর সিরিয়ার সীমান্তের দিকে বের হলে পথে এমন অনেক গোত্রের পাশ দিয়ে তাদের অতিক্রম হলো যারা ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের জন্য ডানা ঝাপটাচ্ছিল, কিন্তু যখন তারা ইসলামী লশকরকে এই শান-শওকত ও নির্ভীকতার সাথে অতিক্রম করতে দেখল তখন তারা প্রভাবিত হয়ে গেল এবং বিদ্রোহের পরিকল্পনা স্থগিত করল। হযরত উসামা (রা.)-এর লশকর সিরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে "বালকা" এবং "দারুম" অঞ্চলে রোমানদের সাথে মোকাবিলা করল এবং তাদের পরাজিত করল। [৪]

উসামার লশকরের সফলতার খবর শুনে সেই বিদ্রোহী গোত্রগুলো যারা মদিনার উত্তর ও পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থান নিয়েছিল...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

[৩] আল-মাগাজি লিল ওয়াকিদি: ১ / ৪০৭

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৩৩৩, দার হিজর

...হয়ে তারা ভীত হয়ে পড়েছিল, তারা বলছিল: 'যদি মদিনাবাসীদের মধ্যে অসাধারণ শক্তি না থাকত, তবে এই অবস্থায় তারা এই বাহিনী পাঠাতে পারত না।' [১] ফলে তাদের মদিনা আক্রমণের সাহস হয়নি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ও উসামার বাহিনীর ফিরে আসা পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং মদিনার প্রতিরক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি।

**বিদ্রোহীদের দমন:**

চল্লিশ দিন পর হযরত উসামা (রা.) যখন বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে ফিরে এলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে মদিনা মুনাওয়ারায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং নিজে বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। সাহাবায়ে কেরাম জেদ করেছিলেন যে আপনার দারুল খিলাফতে থাকা জরুরি, কিন্তু তিনি থামেননি। বাহিনী নিয়ে স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব পালন করে তিনি মদিনার আশপাশে অগ্রসর হন। এটি ছিল জমাদিউল আখিরা মাসের দিনগুলো। আবস, জুবইয়ান, বনু মুররা এবং বনু কিনানার ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা মদিনার চারপাশে ঘোরাফেরা করছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হঠাৎ আক্রমণ করেন এবং একদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই তাদের ধরে ফেলেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা তাঁকে হঠাৎ সামনে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, মুসলমানরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সূর্য ওঠার আগেই প্রতিপক্ষ লাশের স্তূপ ফেলে পালিয়ে যায়। এটি ছিল বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়। [২]

এভাবে তিনি বিদ্রোহীদের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন।

**খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ**

এরপর তিনি মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বারো মাইল (২০ কিলোমিটার) দূরে 'যুল কাসসা' নামক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে বাহিনীকে এগারোটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি অংশের জন্য অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামকে আমির নিযুক্ত করেন এবং একটি সুসংগঠিত যুদ্ধের নকশা তৈরি করে এই এগারোটি বাহিনীকে পুরো আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে দেন। তাঁর সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল এখন ভণ্ড নবীদের দমন করা।

তিনি এর আগে সমস্ত মুরতাদ সর্দার, নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদের কাছে নিজের দূত পাঠিয়ে তাদের পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিনিধিরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে এই পথভ্রষ্ট লোকেরা পুনরায় হেদায়েতের পথে ফিরে আসে, কিন্তু ফিতনার মেঘ এতটাই ঘন ছিল যে খুব কম লোকের ওপরই এই দাওয়াতের প্রভাব পড়েছিল, ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ও পূর্ণ শক্তি, সাহস এবং ঈমানি উদ্দীপনার সাথে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন। [৩]

**তুলাইহার দমন:**

বনু আসাদের সর্দার তুলাইহা নবুওয়াতের দাবি করে নিজের চারপাশে এক বিশাল জনসমাবেশ ঘটিয়েছিল। তার দাবি ছিল যে জিবরাঈল (আ.) তার কাছেও আয়াত নিয়ে আসেন, তার মনগড়া আয়াতগুলো ছিল অনেকটা এরকম:

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/৩৩৩

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/২২৮, ২২৯

“শহুরে কবুতর, বুনো কবুতর এবং রোজা পালনকারী লটোরার কসম, তারা তোমাদের বহু বছর আগে রোজা রেখেছে। আমাদের রাজত্ব অবশ্যই সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।”

“শহুরে কবুতর এবং বুনো কবুতর এবং রোজা পালনকারী লটোরার কসম [১], তারা সবাই তোমাদের থেকে বহু বছর আগে রোজা রেখেছে। আমাদের রাজত্ব সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।” [২]

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সে বিভিন্ন ধরণের জাদুকরী কৌশল দেখাত। একবার সে মরুভূমিতে পানির বড় বড় কলস লুকিয়ে রেখেছিল। যখন তার সঙ্গীরা পানির অভাব অনুভব করল, তখন সে বলল: “ঘোড়ায় চড়ে এই দিকে কয়েক মাইল যাও। পানির কলস পাবে।” মানুষ যখন সেই জায়গায় পানি পেল, তখন তারা একে তুলাইহার “মুজিজা” মনে করল। এই জাদুকরী কৌশলের মাধ্যমে সে বনু আসাদ, বনু গাতফান এবং বনু তায়্যি গোত্রকেও নিজের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিল। মোটকথা, এটি ছিল এক মারাত্মক ফিতনা যা মদিনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। [৩]

তুলাইহাকে দমন করার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করেন। সেই সময় তুলাইহা তার বাহিনী নিয়ে “বুজাখা” নামক স্থানে অবস্থান করছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন: “প্রথমে বনু তায়্যি গোত্রের কাছে যাবে, তারপর বুজাখার দিকে রওনা হবে। এই অভিযান শেষ করে বাতাহ-এ (বনু তামিমে মালিক বিন নুওয়াইরাহ) এর শাস্তি বিধান করবে এবং আমার পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে।”

এই নির্দেশগুলোর প্রতিটিই ছিল গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ অনুযায়ী আক্রান্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছালেন এবং সবার আগে বনু তায়্যি গোত্রের সাথে যোগাযোগ করলেন। এই লোকেরা তুলাইহার সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তখনও ইসলামে অটল ছিল। বনু তায়্যি-এর সরদার আদি বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি পরামর্শ দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন, এই সময়ের মধ্যে তিনি তার গোত্রকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজি হলেন। হযরত আদি বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রচেষ্টা সফল হলো এবং বনু আদির লোকেরা তুলাইহার সঙ্গ ত্যাগ করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীতে যোগ দিল। [৪]

এটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর রণকৌশল অনুসরণ করার ফল ছিল যে, যুদ্ধের আগেই শত্রুর সারিতে ফাটল ধরে গেল এবং মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। এখন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তুলাইহার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। “বুজাখা” নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মুখোমুখি মোকাবিলা হলো। এই স্থানটি মদিনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় চারশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। তুলাইহা নিজে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যানের ভঙ্গিতে এমনভাবে বসে পড়ল যেন তার ওপর ওহী নাজিল হতে যাচ্ছে। তার বাহিনীর সেনাপতি উয়াইনা বিন হিসন, যার কাছে বনু ফাজারার সাতশ যোদ্ধা ছিল, মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করল। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

শীঘ্রই উয়াইনা অনুভব করল যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরাজিত করা কঠিন। সে তুলাইহার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: “জিবরাঈল কি কোনো বার্তা এনেছেন?” তুলাইহার উত্তর ছিল: “এখনও না।”

---

[১] লটোরা হলো বাজপাখির মতো এক প্রকার পাখি যা ছোট পাখিদের শিকার করে।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির ঘটনাবলি।

[৩] সিরাত ইবনে হিব্বান: ২/৩১২।

[৪] তারিখুত তাবারি: ৩/২৫৩।

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলো এবং উয়াইনার কাছে যখন বিজয় সুদূরপরাহত মনে হতে লাগল, তখন সে ঘাবড়ে গিয়ে তুলাইহার কাছে এল এবং চিৎকার করে বলল: “তোমার ধ্বংস হোক, জিবরাঈল কি কোনো নির্দেশ নিয়ে এসেছেন কি না?” তুলাইহা বলল: “এখনো তো আসেননি।”

উয়াইনা আবার ফিরে গিয়ে বাহিনীকে যুদ্ধে নিয়োজিত করল। কিন্তু যখন সঙ্গীদের পা টলমল করতে দেখল, তখন সে আবার দৌড়ে এল এবং বলল: “জিবরাঈল এসেছেন কি না?” তুলাইহা বলল: “হ্যাঁ, এসেছিলেন।” উয়াইনা খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল: “কী নির্দেশ নিয়ে এসেছেন?”

তুলাইহা বানোয়াট আয়াত পাঠ করল: “ইন্না লাকা রাহাঁ কারাহাহু। ওয়া হাদিসাঁ লা তানসাহু” (তোমার ভাগ্যে আছে একটি যাঁতা, যেমন তার যাঁতা। তোমার অবস্থা এমন হবে যে, তুমি কখনো ভুলবে না)।

এই আবোল-তাবোল বাক্য শুনে উয়াইনা বুঝে গেল যে, তুলাইহা নবুওয়াতের ভণ্ডামি করছে। সে লস্করের মধ্যে গিয়ে উচ্চস্বরে বলল: “হে লোকসকল! প্রাণ বাঁচিয়ে পালাও, এই ব্যক্তি তো মিথ্যাবাদী ও প্রতারক।”

উয়াইনা ও তার গোত্র পালিয়ে যেতেই মুরতাদদের পা উপড়ে গেল। উয়াইনা তো ধরা পড়ল, কিন্তু তুলাইহা এমন পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাতে সওয়ার হলো এবং এই বলতে বলতে পালিয়ে গেল: “হে লোকসকল! যে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পালাতে পারে, সে যেন পালিয়ে যায়।”

সে প্রাণ বাঁচিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে গেল, তারপর দীর্ঘকাল এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াল। অবশেষে পুনরায় মুসলমান হলো এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দরবারে ক্ষমার আবেদন পাঠাল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মুরতাদ অবস্থা থেকে তওবাকারীদের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করতেন, ফলে তার ওজর কবুল করা হলো। পরবর্তীতে তুলাইহা ইরাকের জিহাদে ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। উয়াইনা ইসলাম গ্রহণ করলে তাকেও মুক্তি দেওয়া হলো। [১]

**উম্মে জিমলের দমন:**

তুলাইহার লস্করকে মোকাবিলা করার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ওই এলাকায় অবস্থান করতে থাকেন। এই অবস্থানের যৌক্তিকতা এই ছিল যে, এই সময়ে আশেপাশে ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের যে সামান্য প্রভাব পুনরায় প্রকাশ পেয়েছিল, হযরত খালিদ (রা.)-কে তা নির্মূল করার জন্য দ্বিতীয়বার অভিযান চালাতে হয়নি।

সেই দিনগুলোতে বনু গাতফান, হাওয়াজিন এবং বনু সুলাইমের মুরতাদরা উম্মে জিমল (সালমা বিনতে মালিক) নামক এক মহিলার নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছিল। এক জিহাদে সে বন্দি হয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর দাসী হয়েছিল। তিনি অনুগ্রহ করে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তার মা উম্মে কুরফাও নিজের গোত্রের সর্দার ছিল, যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। উম্মে জিমল মায়ের প্রতিশোধের নেশায় আরব গোত্রগুলোকে নিজের চারপাশে একত্রিত করল এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করল।

তার সংকল্পের খবর পেয়ে হযরত খালিদ (রা.) লস্কর নিয়ে অগ্রসর হলেন। উম্মে জিমল একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তার ভক্তদের বেষ্টনীতে মোকাবিলা করতে এল। এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলমানরা তার উটকে ধরাশায়ী করে তাকে...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে।

হত্যা করে দিল। এই লড়াইয়ে সত্তর জন মুরতাদ উম্মে যুমাইলের হিফাজত করতে করতে নিহত হয়। [১]

**আসওয়াদ আনসির ফিতনা:**

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের মধ্যে আসওয়াদ আনসি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই ফিতনা সৃষ্টি করেছিল। হাজার হাজার গ্রামবাসী তার অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। তার শক্তির কারণে সমগ্র ইয়েমেনবাসী ভীত ছিল। আসওয়াদ আনসির অত্যাচারের অবস্থা এমন ছিল যে, সে ইয়েমেনের বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রা.)-কে (যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি) তার মিথ্যা নবুওয়াত প্রকাশ্যে অস্বীকার করার অপরাধে গ্রেফতার করে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আবু মুসলিম খাওলানী সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন, আল্লাহর রহমতে তাঁর একটি চুলও পোড়েনি। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে আসওয়াদ আনসির সঙ্গীরা তাকে বলল: "একে এখান থেকে বের করে দিন, নতুবা মানুষ আপনার থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।" আসওয়াদ তাকে ইয়েমেন থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল। তিনি নিজেও এই পাপিষ্ঠদের থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন, তাই ইয়েমেন ছেড়ে চলে গেলেন।

এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতকালীন অসুস্থতার সময়ের। [২] রাসূলুল্লাহ (সা.) আসওয়াদের বিদ্রোহ দমনের জন্য স্থানীয় নেতাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে তারা যেন আসওয়াদের ফিতনা দমন করে। ফলে ইয়েমেনের একজন সাহাবী ফিরোজ দাইলামি (রা.) গোপনে এক রাতে আসওয়াদের বাসভবনে ঢুকে তাকে হত্যা করেন। এভাবে সাময়িকভাবে এই ফিতনা দমে গিয়েছিল। [৩] কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে তার অনুসারীরা ইয়েমেনে পুনরায় বিদ্রোহ শুরু করে। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত মুহাজির বিন উমাইয়া (রা.)-কে সৈন্য দিয়ে ইয়েমেনে পাঠান। তিনি দুষ্কৃতিকারীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং ইয়েমেনে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনেন। [৪]

এই দিনগুলোতে আবু মুসলিম খাওলানী (রা.) মদিনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) তাকে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তে দেখে চমকে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?" তিনি বললেন: "ইয়েমেন থেকে।" জিজ্ঞেস করলেন: "সেই লোকটির কী হলো যাকে আসওয়াদ কাজ্জাব আগুনে নিক্ষেপ করেছিল?" তিনি বললেন: "আবদুল্লাহ বিন সাওব।" (এটিই ছিল তাঁর আসল নাম)। হযরত উমর (রা.) বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "আপনিই কি সেই ব্যক্তি?" তিনি বললেন: "জি হ্যাঁ।" হযরত উমর (রা.) আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তারপর তাকে সাথে নিয়ে আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং পুরো ঘটনা শোনালেন। তিনি বললেন: "আল্লাহর শোকর যে মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে এই উম্মতের এমন এক ব্যক্তির যিয়ারত করালেন যার সাথে আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মতো আচরণ করেছেন।" [৫]

**মালিক বিন নুওয়াইরাহ হত্যা:**

বুতাহ নামক স্থানে বনু তামীমের প্রধান মালিক বিন নুওয়াইরাহ অবাধ্যতা প্রদর্শন করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শেষ দিনগুলোতে নিজের আমিলদের...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: খণ্ড ১, হিজরি ১১।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩২৯/৬।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৯৪/২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩৩১, ৩৩৫/৬।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২২৩/২ থেকে ২২৯; যিকর খবর রিদ্দাতুল ইয়ামান সানিয়া।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩২৯/৬।

যাকাত আদায় করার জন্য তার কাছে পাঠানো হয়েছিল, এই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের খবর আসে। তখন মালিক বিন নুওয়াইরা এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, এখন যাকাত মদিনায় পাঠানো হবে না বরং তা অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমিলগণ যাকাতের অর্থ মদিনা মুনাওয়ারায় পাঠানোর জন্য জোর দিলেন, তখন মালিক বিন নুওয়াইরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সেই দিনগুলোতে ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকা "আল-জাজিরা" থেকে নবুওয়াতের দাবিদার নারী সাজাহ বিনতে হারিস সেখানে পৌঁছে গেল। তার সাথে একটি বিশাল বাহিনী ছিল যার মধ্যে বনু তাগলিবের খ্রিস্টানরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে ইন্ধন জোগাতে প্রস্তুত ছিল।

সাজাহ এই বাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করতে চেয়েছিল। পথে সে বনু তামীমকে নিজের সাথে নেওয়ার জন্য মালিক বিন নুওয়াইরার সাথে আলোচনা করল। মালিক তাকে বুঝিয়ে বলল যে, এখনই মদিনায় আক্রমণ করার চেয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা উত্তম। সাজাহর কাছে এই পরামর্শ পছন্দ হলো কারণ সেই দিনগুলোতে ইয়ামামায় মুসাইলামা কাযযাবের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই সাজাহ সেই দিকে রওনা হয়ে গেল। মালিক বিন নুওয়াইরা এই পরামর্শ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এই পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে মদিনা থেকে রওনা হওয়ার সময় বাতাহবাসীদের সম্পর্কেও খবর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে বাতাহ পৌঁছানোর সাথে সাথেই তারা সেখানে আক্রমণ করলেন। মালিক বিন নুওয়াইরা তার সঙ্গীদেরসহ বন্দী হলো। সে যাকাত এবং ইসলামের অন্য কোনো রুকন অস্বীকার করেনি, তবে সে খেলাফতে ইসলামিয়ার বিদ্রোহী ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত খালিদ (রা.) তাকে হত্যা করতে চাননি, কারণ সে একজন শরীফ, সাহসী এবং বীর মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু যা ভাগ্যে ছিল তা-ই ঘটল। মালিক বিন নুওয়াইরা বন্দি হওয়ার পর একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে একজন সৈনিকের হাতে নিহত হলো। মালিকের ভাই মুতাম্মিম একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন; তিনি তার ভাইয়ের স্মরণে যে কবিতাগুলো লিখেছিলেন তা আরবি সাহিত্যের অংশ হয়ে গেছে। তিনি বলেন:

نَحْنُ كُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيْمَةَ حِقْبَةً
مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا
وَعِشْنَا بِخَيْرٍ فِي الْحَيَاةِ وَقَبْلَنَا
أَصَابَ الْمَنَايَا رَهْطَ كِسْرَى وَتُبَّعَا
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكاً
لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

"আমরা জাযিমার দুই সঙ্গীর মতো দীর্ঘকাল একসাথে ছিলাম, এমনকি বলা হতো যে তারা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। আমরা জীবনে কল্যাণের সাথে ছিলাম, অথচ আমাদের আগে মৃত্যু কিসরা ও তুব্বা-এর মতো রাজাদেরও পাকড়াও করেছে। অতঃপর যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম, তখন আমার ও মালিকের অবস্থা এমন মনে হলো যেন দীর্ঘকাল একসাথে থাকা সত্ত্বেও আমরা একটি রাতও একসাথে কাটাইনি।" [১]

---

[১] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ১৫৮/১; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১০৫, ১০৬।

এইভাবে তার এই কবিতাগুলোও রয়েছে:

لَقَدْ لَامَنِي عِنْدَ الْقُبُورِ عَلَى الْبُكَاءِ
رَفِيقِي لِتَذْرَافِ الدُّمُوعِ السَّوَافِكِ
وَقَالَ أَتَبْكِي كُلَّ قَبْرٍ رَأَيْتَهُ
لِقَبْرٍ ثَوَى بَيْنَ اللِّوَى فَالْكَادِكِ
فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْأَسَى يَبْعَثُ الْأَسَى
فَدَعْنِي فَهَذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِ

“কবরগুলোর পাশে আমাকে অঝোরে কাঁদতে দেখে আমার সাথী আমাকে তিরস্কার করে বলল: ‘থুওয়ী’ থেকে ‘দাকাদাক’ পর্যন্ত যে কবরই তোমার নজরে আসবে তুমি কি তার ওপর বিলাপ করবে? আমি বললাম: শোক শোককে বাড়িয়ে দেয়, সুতরাং আমাকে এই অবস্থায় থাকতে দাও, আমার জন্য প্রতিটি কবরই মালিকের কবর।” [১]

**হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর একটি অন্যায় অভিযোগ এবং তার জবাব:**

এখানে এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, মালিক বিন নুওয়াইরাহ-এর হত্যাকাণ্ডে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো ভূমিকা ছিল না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে প্রচণ্ড শীতের কারণে বন্দীদের সম্পর্কে সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন: “أَدْفِئُوا أَسْرَاكُمْ” “তোমাদের বন্দীদের উষ্ণতা দাও অর্থাৎ তাদের গরম কাপড়, লেপ ইত্যাদি সরবরাহ করো।”

ওই অঞ্চলের বনু কিনানাহ গোত্রের ভাষায় এই শব্দটি হত্যার জন্য ব্যবহৃত হতো, তাই কিছু সৈন্য ভুলবশত বন্দীদের হত্যা করতে শুরু করে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিষেধ করার আগেই মালিক বিন নুওয়াইরাহও ওই সৈন্যদের হাতে নিহত হন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন:

“যখন আল্লাহ কোনো দুর্ঘটনার ইচ্ছা করেন, তখন তা হয়েই থাকে।” হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিক বিন নুওয়াইরাহ-এর বিধবা উম্মে তামিম-এর চোখের পানি মুছতে এবং তার ভরণপোষণের খাতিরে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাকে বিবাহ করেন। [২]

লক্ষ্য করুন! যদি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিক বিন নুওয়াইরাহ-এর হত্যাকাণ্ডে ইচ্ছাকৃতভাবে লিপ্ত হতেন, তবে উম্মে তামিম তাকে বিবাহ করার প্রশ্নই আসত না, বরং তিনি আরবদের স্বভাবজাত আত্মমর্যাদাবোধ অনুযায়ী নিহত স্বামীর প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়ে যেতেন। এই বিষয়টিও ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, এমনকি দিয়ত-এর বোঝাও তার ওপর চাপাননি। এর কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছেও নির্দোষ ছিলেন। যদি ঘটনাটি তেমন হতো যেমনটি অসতর্ক ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেন, অর্থাৎ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি মালিক বিন নুওয়াইরাহকে হত্যা করতেন এবং তারপর তার স্ত্রীকে জোরপূর্বক নিজের বিবাহে গ্রহণ করতেন, তবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে এই জুলুম সহ্য করা সম্ভব হতো না।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৩৬২, দার হিজর

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

## মুসায়লামা কাযযাবের ফিতনা

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের মধ্যে মুসায়লামা কাযযাবের শক্তি সবচেয়ে বেশি ছিল, যে জাযিরাতুল আরবের পূর্ব অঞ্চল নজদ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে অত্যন্ত ধূর্ত ও চতুর ছিল। মিষ্টি মিষ্টি কথা এবং সুন্দর সুন্দর ওয়াদার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা তার বাম হাতের কাজ ছিল। সে নিজের এখানে মুসলমানদের মতো আযান ও সালাতের ব্যবস্থা করেছিল। বনু হানিফার পুরো গোত্র তার সাথে যোগ দিয়েছিল। 'ইয়ামামা'কে সে নিজের কেন্দ্র বানিয়ে একে মক্কা মুকাররমার মতো 'হারাম' ঘোষণা করেছিল। [১] কুরআন মাজীদের শৈলীর সাথে মিল রেখে আয়াত বানানোরও সে ব্যর্থ চেষ্টা করত। তার জাল 'ওহী'র কয়েকটি নমুনা লক্ষ্য করুন:

১. وَالشَّاةِ وَأَلْوَانِهَا، وَأَعْجَبِهَا السُّودِ وَأَلْبَانِهَا، وَالشَّاةِ السَّوْدَاءِ وَاللَّبَنِ الْأَبْيَضِ، إِنَّ هَذَا لَعَجَبٌ مَحْضٌ، وَقَدْ حُرِّمَ الْمَذْقُ فَمَا لَكُمْ لَا تَمْجَعُونَ

"কসম ছাগলের এবং তাদের রঙের; তাদের মধ্যে কালো ছাগল এবং তাদের দুধ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক জিনিস, কালো ছাগল এবং সাদা দুধ। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয়। নিশ্চয়ই লস্যি (দুধের সাথে পানি মেশানো) হারাম করা হয়েছে। তো তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা দুধের সাথে খেজুর খাচ্ছ না?"

২. يَا ضِفْدَعُ ابْنَةَ ضِفْدَعٍ، نَقِي مَا تَنِقِّينَ، أَعْلَاكِ فِي الْمَاءِ وَأَسْفَلُكِ فِي الطِّينِ، لَا الشَّارِبَ تَمْنَعِينَ وَلَا الْمَاءَ تُكَدِّرِينَ

"হে ব্যাঙের মেয়ে ব্যাঙ! ডাকো যা তুমি ডাকো, তোমার উপরের অংশ পানিতে এবং নিচের অংশ কাদায়। না তুমি পানকারীকে বাধা দাও, না পানি ঘোলা করো।"

৩. وَالْمُبْذِرَاتِ زَرْعًا، وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا، وَالذَّارِيَاتِ قَمْحًا، وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا، وَالْخَابِزَاتِ خُبْزًا، وَالثَّارِدَاتِ ثَرْدًا، وَاللَّاقِمَاتِ لَقْمًا، إِهَالَةً وَسَمْنًا، لَقَدْ فُضِّلْتُمْ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ، وَمَا سَبَقَكُمْ أَهْلُ الْمَدَرِ، رِيفُكُمْ فَامْنَعُوهُ، وَالْمُعْتَرَّ فَآوُوهُ

"কসম সেই নারীদের যারা ক্ষেতে বীজ বপন করে, যারা ফসল কাটে, যারা গমের দানা ঝাড়ে, যারা আটা পিষে, যারা রুটি পাকায়, যারা সুরিদ তৈরি করে, যারা লোকমা বানায় সালন ও চর্বির সাথে। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে যাযাবরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, আর গ্রামবাসীরা তোমাদের থেকে এগিয়ে নেই। তোমাদের উর্বর ভূমি রক্ষা করো এবং অভাবীদের আশ্রয় দাও।" [২]

মুসায়লামার অনুসারীরা এই ধরণের অদ্ভুত ও আজব আয়াতগুলো খুব আগ্রহের সাথে শুনত। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ছিল তারা জানত যে এটি মিথ্যা নবী, কিন্তু গোত্রীয় গোঁড়ামি তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। এরা ছিল আরবদের বিখ্যাত গোত্র রবী'আ-এর একটি শাখা যারা দীর্ঘকাল ধরে 'মুদার' গোত্রের বিরোধী ছিল। যেখানে কুরাইশ, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ-এর বংশীয় সম্পর্ক ছিল, মুদার গোত্রের শাখা ছিল। রবী'আ গোত্রের লোকদের এই হিংসা ছিল যে কেন মুদার গোত্রে নবী জন্ম নিল। এখন যেহেতু তাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করেছে, তাই তারা যেন প্রতিশোধ নেওয়ার একটি বাহানা পেয়ে গেল।

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: তাহত ১ হিজরি।

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/২৮৩।

তাদের বংশীয় গোঁড়ামি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, যখন মুসাইলামার এক অনুসারীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে সে কি সত্যিই এই বিশ্বাস রাখে যে মুসাইলামা নবী? তখন সে উত্তর দিল: "আমি জানি যে মুহাম্মদ ﷺ সত্য নবী এবং মুসাইলামা মিথ্যাবাদী, কিন্তু আমার কাছে মদিনার সত্য নবীর চেয়ে ইয়ামামার মিথ্যা নবী বেশি প্রিয়।" [১]

এই গোত্রীয় শত্রুতার সাথে আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বার্থের আশাও ছিল যা হাজার হাজার মানুষকে মুসাইলামার চারপাশে একত্রিত করেছিল। মুসাইলামার এই শক্তি তখন আরও বেড়ে গেল যখন মিথ্যা নবী সাজাহ তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ইয়ামামায় পৌঁছাল এবং মুসাইলামার সাথে সরাসরি আলোচনা করল। মুসাইলামা তাকে প্রলোভন দেখাল যে তারা দুজনে মিলে আরব জয় করবে। সাজাহ কেবল রাজিই হলো না, বরং ঐক্যকে মজবুত করার জন্য সে মুসাইলামার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাবও গ্রহণ করে নিল।

বিয়ের পর সাজাহ যখন তার বাহিনীর কাছে ফিরে এল, তখন তার অনুসারীরা জিজ্ঞাসা করল: "আপনাকে মোহরানা হিসেবে কী দেওয়া হয়েছে?" সে বলল: "কিছুই না।" তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল: "ফিরে যান এবং কিছু মোহরানা নিয়ে আসুন।"

সাজাহ এই দাবি নিয়ে তার কাল্পনিক স্বামীর কাছে গেলে সে খুব নির্লিপ্তভাবে বলল: "তোমার কওমের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, মুসাইলামা তাদের জিম্মা থেকে দুটি সালাত মাফ করে দিয়েছে: ফজর এবং ইশা।"

সাজাহর অনুসারীরা এই অদ্ভুত মোহরানায় খুব খুশি হলো যে দুটি সালাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। তারা কায়মনোবাক্যে সাজাহর পাশাপাশি মুসাইলামারও গুণগান গাইতে লাগল। [২]

মুসাইলামা মদিনা মুনাওয়ারার ইসলামি রাষ্ট্রকে পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তার ইসলাম বিদ্বেষের অবস্থা এমন ছিল যে, আসা-যাওয়া করা এবং আশপাশ দিয়ে অতিক্রমকারী প্রত্যেক মুসলিমকে সে ধরে ফেলত এবং জোরপূর্বক নিজের কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করত। যে মানত না তাকে সে হত্যা করে ফেলত। একজন সাহাবি আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব (রা.)-এর যাতায়াত এই পথ দিয়ে হলে মুসাইলামা তাকেও গ্রেপ্তার করে এবং নিজের কালিমা পড়তে বাধ্য করে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) কুরআন মজিদের দেওয়া অবকাশ ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [৩] থেকে ফায়দা গ্রহণ করে মৌখিক স্বীকৃতি দিলেন, ফলে মুসাইলামা তাকে হত্যা করার পরিবর্তে বন্দি করে রাখল। [৪]

বিখ্যাত সাহসী সাহাবিয়া হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)-এর পুত্র হযরত হাবিব বিন যায়েদ (রা.)-কেও মুসাইলামা গ্রেপ্তার করেছিল। মুসাইলামার সাথে তার বিতর্ক হলো। মুসাইলামা তাকে বলত: "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল?" তিনি বলতেন: "হ্যাঁ, অবশ্যই।" মুসাইলামা জিজ্ঞাসা করত: "আর তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসুল?" তিনি না শোনার ভান করে বলতেন: "আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।"

মুসাইলামা তার একটি একটি করে অঙ্গ কাটাতে লাগল কিন্তু তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর খতমে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা থেকে বিরত হলেন না এবং এভাবে চরম নির্যাতন সহ্য করে শহীদ হয়ে গেলেন। [৫]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

[৩] "তবে তার জন্য নয় যাকে বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানে অটল" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬)

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩১৬, দার সাদির

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/৩১৮, দার হাজার

## মুসাইলামার বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযান:

এমন এক জালিম, জবরদস্ত এবং ধূর্ত শত্রুর ফিতনা নির্মূল করার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) দুটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন: প্রথম বাহিনীটি হযরত ইকরিমা বিন আবি জাহল (রা.)-এর নেতৃত্বে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয়টি হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-এর কমান্ডে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত ইকরিমা (রা.)-কে এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ না শুরাহবিল বিন হাসানার বাহিনী পৌঁছায়, ততক্ষণ তুমি মুসাইলামার অনুসারীদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে না। কিন্তু হযরত ইকরিমা (রা.) এই নির্দেশনার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেননি এবং নজদ পৌঁছানোর সাথে সাথেই শত্রুর ওপর আক্রমণ করে বসেন। মুসাইলামার সৈন্যরা ছিল বড় যোদ্ধা, তারা ইসলামী বাহিনীকে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করে। হযরত ইকরিমা (রা.) পরাজয়ের খবর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে পাঠালে তিনি অবিলম্বে হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-এর বাহিনীকে, যারা মুসাইলামার সাথেই লড়াই করার জন্য যাচ্ছিল, পথে থামিয়ে দেন এবং নির্দেশ পাঠান যে খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করো। আসলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মুসাইলামা কাযযাবের শক্তি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন, তাই তার ওপর আক্রমণের জন্য একটি বড় বাহিনী প্রস্তুত হওয়া জরুরি মনে করতেন। অবশেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তুলাইহাকে দমন করে মদিনায় ফিরে এলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নতুন নির্দেশনাসহ তাকে মুসাইলামা কাযযাবের মোকাবিলার কমান্ড অর্পণ করেন এবং সেই সাথে নির্দেশ দেন যে পথ থেকে শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-এর বাহিনীকে সাথে নিয়ে নিতে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-এর বাহিনীকে সাথে নিয়ে ইয়ামামার উপকণ্ঠে পৌঁছান। [১]

## চূড়ান্ত যুদ্ধ:

মুসাইলামার হাতে শহীদ হওয়া হাবিব বিন যায়েদ (রা.)-এর মা উম্মে আম্মারা (রা.)-ও তার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.)-এর সাথে এই সৈন্য অভিযানে শরিক ছিলেন। [২] বাহিনীর আগমনের খবর শুনে মুসাইলামা কাযযাব বনু হানিফার চল্লিশ হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে আকরাবার ময়দানে ব্যূহ রচনা করেছিল। মুসলমানরা পৌঁছানোর সাথে সাথেই তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বনু হানিফা তাদের মিথ্যা নবী এবং জাতীয় মর্যাদার খাতিরে অসাধারণ জোশ ও জযবার সাথে লড়াই করে। মুসলমানদের এর আগে কোনো যুদ্ধে এত কঠোর প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা হয়নি। অনেক নামী সাহাবী একে একে শহীদ হয়ে যান। মুহাজিরদের পতাকাবাহী হযরত আবদুল্লাহ বিন হাফস (রা.) শহীদ হলে হযরত সালিম মাওলা আবি হুজাইফা (রা.) পতাকা তুলে নেন, যার কিরাআতের প্রশংসা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছিলেন। যুদ্ধের তীব্রতা দেখে কেউ তাকে বলল: “আপনার কি নিজের জীবনের পরোয়া নেই?” তিনি বললেন: “প্রাণের পরোয়া করলে আমার চেয়ে অধম হাফেজে কুরআন আর কে হবে?” তাদের মনিব আবু হুজাইফা (রা.)-ও সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে বলছিলেন: “হে কুরআনের কারীগণ! কুরআন মাজীদকে তোমাদের কর্মতৎপরতার ভূষণ বানিয়ে রাখো।”

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরীর অধীনে

[২] সিরাতে ইবনে হিশাম: ২ / ৩০৬

হযরত উমর (রা.)-এর বড় ভাই হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) সাহাবায়ে কেরামকে সাহস জুগিয়ে বললেন: “হে লোকসকল! শত্রুর ওপর আঘাত করো এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলো।”

যুদ্ধের অবস্থা এমন ছিল যে, কখনো মুসলমানরা বিজয়ী হতে শুরু করত আবার কখনো কাফেররা। একবার মুসলমানদের পা পিছলে গেল এবং শত্রুরা তাদের ঠেলে তাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

হযরত সাবিত বিন কায়েস (রা.) মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে চিৎকার করে বললেন: “হে আল্লাহ! আমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।” এই বলে তিনি আক্রমণ করলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত সালেম, হযরত আবু হুযাইফা এবং হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-ও নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ লাশের স্তূপ জমতে থাকল, অবশেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মুসলমানদের সংগঠিত করে এক শক্তিশালী আক্রমণ করলেন এবং শত্রুদের কাতার তছনছ করে দিলেন। খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছুটা দূরে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বাগান ছিল যাকে “হাদিকাতুর রহমান” বলা হতো, খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা পালিয়ে গিয়ে সেই বাগানে অবস্থান নিল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছালে তারা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ভেতরে প্রবেশ করার কোনো উপায় ছিল না। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর ভাই বারা (রা.) এই দৃশ্য দেখে জেদ ধরলেন যে, তাকে যেন দেয়াল টপকে বাগানের ভেতরে ফেলে দেওয়া হয় যাতে তিনি ভেতর থেকে দরজা খুলে দিতে পারেন। প্রথমে মুসলমানরা রাজি হননি, কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে তাকে ভেতরে ফেলে দেওয়া হলো। তিনি লড়াই করতে করতে দরজা খুলতে সক্ষম হলেন, ততক্ষণে তার শরীরে আশিটিরও (৮০) বেশি ক্ষত লেগে গিয়েছিল। এখন মুসলমানরা স্রোতের মতো ভেতরে ঢুকতে শুরু করল। [১]

শত্রুরা তাদের থামানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল, এই সংঘর্ষের মধ্যেই আবু দুজানা (রা.) বাগানের দরজায় শহীদ হয়ে গেলেন। উম্মে আম্মারা এবং তার সাহেবজাদা আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.) মুসাইলামা কাজ্জাবের সন্ধানে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে বাগানে প্রবেশ করতে লাগলেন। এই সময়ে এক ব্যক্তি উম্মে আম্মারা (রা.)-এর হাত কেটে ফেলল, যিনি আগেই তলোয়ার ও বর্শার ৯টি আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উচ্চ সাহসী নারী সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। [২]

বনু হানিফার সেনাপতি মুহকাম মুরতাদদের সাহস দিচ্ছিল। হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) লক্ষ্যভেদ করে এমন এক তীর মারলেন যে তা তার কণ্ঠনালী ভেদ করে চলে গেল। অবশেষে শত্রুদের মনোবল ভেঙে গেল। মুসলমানরা তাদের তলোয়ারের মুখে নিয়ে নিল। শত্রুরা হতাশ হয়ে বাগান থেকে পালাতে শুরু করলে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করল। মুসাইলামা কাজ্জাবও পলায়নকারীদের সাথে পালানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওয়াহশি বিন হারব (রা.) ওত পেতে ছিলেন, যিনি ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামজা (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিকে হত্যার বদলে এক বড় নেকির কাজ হিসেবে এই নিকৃষ্টতম মানুষকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে এমন এক বর্শা নিক্ষেপ করলেন যে অভিশপ্তটি আহত হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। [৩]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

[২] মাগাজি লিল ওয়াকিদি: ১/২৬৯, হিলয়াতুল আউলিয়া: ২/৬৫

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরির অধীনে

এই মুহূর্তে উম্মে আম্মারা (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রা.) তলোয়ারের আঘাতে তার কাজ শেষ করে দিলেন। এদিকে উম্মে আম্মারা (রা.)-ও সেখানে পৌঁছে গেলেন। নিজের পুত্রের তলোয়ারে পাপিষ্ঠের রক্ত মাখা দেখে তিনি খুশিতে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। [১]

এই ভয়াবহ যুদ্ধে মদীনার মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে তিনশত ষাট (৩৬০) জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, যাদের মধ্যে পঁয়ত্রিশ (৩৫) জন ছিলেন প্রখ্যাত ক্বারী এবং হাফেজে কুরআন।

শত্রুপক্ষের সাত (৭) হাজার লোক রণক্ষেত্রে, সাত (৭) হাজার 'মউত বাগানে' এবং প্রায় সমসংখ্যক পলায়নের সময় নিহত হয়। [২]

ইয়ামামার যুদ্ধ ১১ হিজরীর শেষের দিকে সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল জাজিরাতুল আরবে সৃষ্ট বিদ্রোহের বিরুদ্ধে শেষ বড় পদক্ষেপ। এর ফলে ফিতনার জোর পুরোপুরি ভেঙে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সেনাপতিরা আরবের প্রতিটি বিদ্রোহী কোণে পৌঁছে সেখানে বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা ও পরিকল্পনার বদৌলতে এক বছরের মধ্যে পুরো দেশে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩]

**কুরআন মাজীদের হিফাযত:**

ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফেজ ও ক্বারী শহীদ হওয়ায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেই সময় পর্যন্ত কুরআন মাজীদ লিখে সংরক্ষণ করার সাধারণ রেওয়াজ ছিল না। মৌখিকভাবে মুখস্থ করার প্রচলনই বেশি ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আশঙ্কা করলেন যে, হাফেজদের শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে কুরআন যেন হারিয়ে না যায়; তাই তিনি কুরআন কারীমকে কিতাব আকারে সংকলন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রথমে হযরত উমর (রা.)-এর সামনে নিজের মতামত পেশ করেন, উভয় সাহাবী এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে এই কাজটি অপরিহার্য। আনসারদের মধ্য থেকে হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-কে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যিনি ওহী লেখক ছিলেন এবং তরুণ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে জ্ঞান ও ফযীলতের দিক থেকে অনন্য ছিলেন। তিনি দিন-রাত এক করে এই মহান কাজ সম্পন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত পর্যন্ত যেহেতু ওহী নাযিল হচ্ছিল, তাই একটি পূর্ণাঙ্গ মুসহাফ বিন্যাস করা সম্ভব ছিল না। কারণ শরীয়ত অনুযায়ী মুসহাফকে নাযিল হওয়ার ক্রম অনুসারে নয় বরং জিবরাঈল (আ.)-এর নির্দেশিত বিন্যাস অনুযায়ী সাজাতে হতো এবং এই বিন্যাস শেষ সূরা ও শেষ আয়াত নাযিল হওয়ার পরেই পূর্ণাঙ্গভাবে জানা সম্ভব ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত ও সূরাগুলো চামড়ার টুকরো, খেজুরের ছাল এবং পশুর কাঁধের চওড়া হাড়ের ওপর বিভিন্ন সাহাবীর কাছে লেখা ছিল। মৌখিক হিফযের প্রচলন ছিল ব্যাপক এবং হাফেজগণ নাযিলকৃত বিন্যাসের পরিবর্তে লাওহে মাহফুজের বিন্যাস অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তারা জানতেন কোন আয়াত বা সূরা আগে এবং কোনটি পরে।

---

[১] মাগাযী লিল ওয়াকিদী: ১/২৬৯; হিলয়াতুল আউলিয়া: ৩/৬৫, ত. আস-সাআদাহ

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১১ হিজরীর অধীনে

[৩] আল-ইবার লিয যাহাবী: ১২ হিজরী

হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.) এই সমস্ত লিখিত উপকরণ এবং হাফেজদের স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষিত কপি তৈরি করেন যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কাছে রাখা হয়েছিল। [১] এই কপিটি পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কাছে এবং তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে ছিল। হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে যখন অভিযোগ আসতে শুরু করল যে দূর-দূরান্তের এলাকাগুলোতে মানুষ কুরআন মাজীদের কিরাআতের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের শিকার হচ্ছে, তখন এই কপিটি পুনরায় হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর কাছে হস্তান্তর করা হলো এবং তিনি কুরআন মাজীদের বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের একটি দলের সাথে মিলে মূল কপি থেকে একাধিক কপি তৈরি করে পুরো মুসলিম বিশ্বে সেগুলো প্রচার করেন।

নবুওয়াতী যুগ, সিদ্দিকী যুগ এবং ওসমানী যুগে কুরআন সংকলনের মধ্যে পার্থক্য ছিল:

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে লিখিত নথিপত্রে আয়াতগুলো আলাদা আলাদা লেখা ছিল।

২. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে প্রতিটি সূরার পূর্ণাঙ্গ আলাদা সহীফা (পুস্তিকা) তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই সমস্ত সহীফাকে এক জায়গায় একত্রিত করা হয়েছিল। একে মূল কপি (মাস্টার কপি) এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। একে 'আল-উম্ম' বলা হতো।

৩. হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে 'আল-উম্ম'কে সামনে রেখে বিভিন্ন সূরার আলাদা আলাদা সহীফাকে একটি বড় সহীফায় (মুসহাফে) নকল করা হয়েছিল। এবং তারপর এই মুসহাফের অনুলিপি তৈরি করা হয়েছিল। [২]

আলা বিন আল-হাদরামি (রা.), বাহরাইনের রণাঙ্গনে:

মুরতাদদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হযরত আলা বিন আল-হাদরামি (রা.) বাহরাইন অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমিল মুনজির বিন সাওয়া (রা.)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথেই মানুষ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলা বিন আল-হাদরামি (রা.)-এর লস্করে হযরত আবু হুরায়রা এবং বনু হানিফার সুমামা বিন উসাল (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পথে এক বিশাল মরুভূমিতে রাতের সফরের সময় এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যে সমস্ত উট যাদের ওপর পানি ও খাদ্যের ভাণ্ডার ছিল, সেগুলো হঠাৎ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা যখন জেগে এই দৃশ্য দেখল তখন তারা অত্যন্ত বিচলিত হলো কারণ প্রচণ্ড গরমের দিন ছিল, মরুভূমিতে পানি ছাড়া আগে সফর করা তো দূরের কথা বেঁচে থাকাও অসম্ভব ছিল। মানুষ একে অপরকে শেষ অসিয়ত করতে শুরু করল।

তা সত্ত্বেও হযরত আলা বিন আল-হাদরামি (রা.) মোটেও ঘাবড়ালেন না এবং বললেন:

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাব ফাযাইলুল কুরআন, বাব জামউল কুরআন, হা: ৪৯৮৬, ৪৯৮৭।

[২] ফাতহুল বারী: ৯/১১-২২, কিতাব ফাযাইলুল কুরআন, বাব জামউল কুরআন।

'জামউল কুরআন' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকাল প্রচুর পড়াশোনার কারণে কিন্তু সঠিক বুঝের অভাবের শিকার কিছু ব্যক্তি তিন খলিফার যুগে কুরআন সংকলনের অভিযানের ওপর রাফেযী ও প্রাচ্যবিদদের আপত্তির এই জবাব বের করেছেন যে, সহীহ বুখারীতে ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণিত ইবনে আফফানের বর্ণনাটি জাল এবং ইবনে শিহাব যুহরী ছিলেন একজন তাকিয়াবাজ ইসলামবিদ্বেষী; সিদ্দিকী ও ওসমানী যুগে কুরআন সংকলনের কোনো অভিযান চলেনি, বরং পুরো কুরআন মাজীদ বর্তমান আকারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এই জবাবের মাধ্যমে একটি আপত্তি তো দূর হয়ে গেল কিন্তু অন্যদিকে হাদীস অস্বীকার এবং এর ফলে উদ্ভূত বিভ্রান্তির অনেকগুলো দরজা পুরোপুরি খুলে গেল। পাঠকদের উচিত এই বিষয়ে ডক্টর আলী বিন সুলাইমান আল-উবাইদ-এর "জামউল কুরআন হিফযান ওয়া কিতাবাতান" এবং হযরত মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী সাহেবের "উলূমুল কুরআন" (উর্দু) অধ্যয়ন করা যাতে এই বিষয়ে এমন বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যার ফলে হাদীস অস্বীকারের ফিতনাও মাথাচাড়া দেয় না এবং প্রাচ্যবিদ ও রাফেযীদের আপত্তিগুলোও ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

“চিন্তিত হবেন না, আপনারা আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী। আল্লাহ আপনাদের একা ছেড়ে দেবেন না।”

ফজরের সালাতের পর তিনি কান্নাকাটি করে দুআ করলেন। সকল মুসলিম দুআয় শরিক হলেন। অবসর হওয়ার পর দূরে পানির চমক দেখা গেল। সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল একটি বিশাল ঝরনা উত্তাল হয়ে বইছে। পুরো লশকর সেখান থেকে পানি পান করল এবং সতেজ হলো। সূর্য তখনও উঁচুতে ওঠেনি যে সমস্ত উটও আসবাবপত্রসহ ফিরে এল।

পরবর্তী সফর শুরু হলে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি নিজের পানিভর্তি মশক ঝরনার পাড়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন, হঠাৎ ফিরে এলেন। গিয়ে দেখলেন সেই স্থানে একটি ছোট পুকুর ছাড়া আর কিছুই নেই। মশকটি একইভাবে পূর্ণ অবস্থায় পাড়ে রাখা ছিল। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “আমি বুঝতে পারলাম যে এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।”

আলা বিন আল-হাদরামি রাদিয়াল্লাহু আনহু ‘হজর’ নামক স্থানে মুরতাদদের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। অবশিষ্ট শত্রু পালিয়ে ‘দারিন’-এর দিকে চলে গেল, যা পারস্য উপসাগরের একটি ভূখণ্ডের ওপারে প্রাচীরবেষ্টিত শহর ছিল। পলায়নকারীরা নৌকায় চড়ে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। আলা বিন আল-হাদরামি রাদিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গীদের বললেন: “আল্লাহ স্থলে তাঁর সাহায্যের নিদর্শন দেখিয়েছেন যাতে তোমরা সমুদ্রেও তাঁর সাহায্যের পরীক্ষা নিতে পারো। এখন শত্রুর দিকে আক্রমণ করো এবং সমুদ্র পার হয়ে যাও।”

সবাই দ্রুত অগ্রসর হয়ে উপকূলে পৌঁছালেন, এখান থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নৌকায় যাতায়াত ছিল পুরো চব্বিশ ঘণ্টার পথ, কিন্তু মুরতাদদের জন্য কোনো নৌকা অবশিষ্ট ছিল না। আলা বিন আল-হাদরামি রাদিয়াল্লাহু আনহু দুআ করলেন:

“ইয়া আরহামার রাহিমীন! ইয়া কারীমু ইয়া হালীমু ইয়া আহাদু ইয়া সামাদু ইয়া হাইয়্যু ইয়া মুহয়িয়াল মাওতা, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূমু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ইয়া রাব্বানা”

(হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু! হে অনুগ্রহকারী! হে ধৈর্যশীল! হে অদ্বিতীয় সত্তা! হে অমুখাপেক্ষী সত্তা! হে মৃতদের জীবিতকারী! হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী! আপনি ছাড়া আমাদের কোনো মাবুদ নেই, হে আমাদের রব!)

এই দুআ করে ঘোড়া সমুদ্রে নামিয়ে দিলেন। সমস্ত মুজাহিদ যারা ঘোড়া, উট এবং গাধার পিঠে সওয়ার ছিলেন, এই দুআ পুনরাবৃত্তি করতে করতে কোনো দ্বিধা ছাড়াই তাদের আমিরের পেছনে পানিতে নেমে পড়লেন এবং এই বিশাল সমুদ্র অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে পার হয়ে গেলেন, একজন ব্যক্তিও ডুবে যায়নি। দারিনে লুকিয়ে থাকা মুরতাদরা এটি দেখে অবাক হয়ে গেল। আলা তাদের সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়েই ঘিরে ফেললেন এবং তাদের শক্তি খতম করে দিলেন। ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্র পার হওয়া সাহাবায়ে কেরামের এমন এক কারামত ছিল যা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। এটি দেখে ইসলাম গ্রহণকারী এক খ্রিস্টান পাদ্রীর বক্তব্য ছিল:

“যদি আমি এই কারামতগুলো দেখেও ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তবে ভয় ছিল যে আল্লাহ আমার চেহারা বিকৃত করে দেবেন।” [১]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২ হিজরি সনের অধীনে, জিকর রেদ্দাত আহলে বাহরাইন।

**মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস**

**প্রথম খণ্ড**

## বৈদেশিক যুদ্ধসমূহ..... ইরান ও রোম

অভ্যন্তরীণ অভিযানসমূহ থেকে অবসর নিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বৈদেশিক হুমকির দিকে মনোনিবেশ করলেন। সে সময় আরব উপদ্বীপ বিশ্বের দুটি বৃহত্তম শক্তির চোখে কাঁটার মতো বিঁধছিল। পূর্বে ছিল সাসানীয় ইরানি সাম্রাজ্য এবং পশ্চিমে বাইজেন্টাইন রোম। এই উভয় সাম্রাজ্যেরই আরবদের সাথে দীর্ঘদিনের শত্রুতা ছিল। তারা বেশ কয়েকবার আরব উপদ্বীপে সৈন্য পাঠিয়েছিল এবং বারবার সীমান্তে সংঘর্ষ হয়েছিল। ইরানিরা আরবদের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষ পোষণ করত; তারা কেবল নিজেদের সভ্যতা এবং সামরিক ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অত্যন্ত গর্বিত ছিল না, বরং নিজেদের বংশকেও বিশ্বের সমস্ত জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। এই কারণেই তারা আরবদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদের অজ্ঞ, দরিদ্র ও বন্য বলে গণ্য করত। তারা তাদের জীবনযাপন, চালচলন ও আচার-আচরণের উপহাস করত।

ইসলামের আগে যেহেতু আরবদের কোনো শক্তিশালী সরকার ছিল না, বরং জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট সর্দারদের একাধিপত্য ছিল, তাই তাদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ইরানি শাসকরা আরব ভূখণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে থাকত এবং কখনো কখনো তাদের সর্দারদের নিজেদের অধীনস্থ করে তাদের কাছ থেকে করও আদায় করত। কিন্তু আরবদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা তাদের বেশিদিন কারো দাসত্বে থাকতে দিত না, ফলে তারা বারবার বিদ্রোহ করে ইরানিদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে থাকত। ইসলামের পর আরব গোত্রগুলো এক পতাকার নিচে সমবেত হয়ে একটি সুসংহত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তাই ইরানি সাম্রাজ্য আরব উপদ্বীপ নিয়ে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ইরাকের সীমান্তে বসবাসকারী আরবদের সেই খ্রিস্টান গোত্রগুলোও ইরানিদের ব্যাপারে মুসলমানদের কাছে একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে তুলে ধরছিল। তাই ইরানি নেতারা চাইতেন যে কোনোভাবে মুসলমানদের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হোক, কিন্তু সে সময় ইরান নিজেই চরম রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন ছিল, তাই ইরানি দরবার কোনো বৈদেশিক ফ্রন্টে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না।

এই রাজনৈতিক সংকটের সূচনা হয়েছিল খসরু পারভেজের মৃত্যুর মাধ্যমে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতী পত্র ছিঁড়ে ফেলার কয়েক দিন পরেই সে তার পুত্র শিরোয়ার হাতে নিহত হয়েছিল। তারপর যখন শিরোয়া বিদ্রোহের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার সমস্ত ভাইকে হত্যা করল, তখন সাসানীয় সাম্রাজ্য হঠাৎ করেই উত্তরাধিকারীদের শূন্যতায় পড়ে গেল। নিজের শাসনের স্থায়িত্বের জন্য এই অতিরঞ্জিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবান শিরোয়া মাত্র আট মাস শাসন করার পর এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার পেছনে তার সাত বছর বয়সী ছেলে আরদাশির ছাড়া আর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। তাকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল কিন্তু অল্প বয়সের কারণে সে সরকারি দায়িত্ব পালনের যোগ্য ছিল না, অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কখনো কখনো সরকারি বিষয়াদি...

নারীদের সামলাতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবনের শেষ বছরগুলো থেকে শুরু করে সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমল পর্যন্ত ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একই রকম ছিল। 'টিউরান দুখত' এবং 'আরজমি দুখত' নামক দুই রাজকন্যা সালতানাতের বিষয়াবলীতে প্রভাবশালী ছিলেন এবং ইরানি রাজনীতি তার সংকটময় অবস্থা থেকে বের হতে পারছিল না। [১]

মোদ্দাকথা, এসব কারণে ইরানিরা এখন পর্যন্ত জাজিরাতুল আরবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পায়নি, তবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত ছিলেন যে ইরানিদের অবস্থা সামলে ওঠার সাথে সাথেই তারা আরব ভূখণ্ডে আক্রমণ করতে দেরি করবে না, তাই তিনি পূর্ব সীমান্তগুলোর ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক ছিলেন।

**ইরানে সৈন্য অভিযানের সুযোগ:**

আল্লাহর ইচ্ছায় সেই দিনগুলোতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য ইরানি সীমান্তে প্রথমবারের মতো সৈন্য অভিযানের বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নিতে কোনো দ্বিধা রইল না। ঘটনাটি ছিল এই যে, ইরাকের সীমান্তে বসবাসকারী কিছু আরব গোত্র যারা শতাব্দী ধরে ইরানিদের জুলুম সহ্য করে আসছিল, তাদের রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। এই আরব গোত্রগুলো খ্রিস্টান ছিল কিন্তু তারা দেশীয় মর্যাদাবোধের কারণে ইরানিদের গোলামির জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং এখন আরবের সাথে সংযুক্ত ইরানি প্রদেশ 'সাওয়াদ' (ইরাক)-এ ঢুকে অভিযান চালাচ্ছিল। এই গোত্রীয়দের মধ্যে প্রতিরোধের চেতনা জাগ্রত করতে কাবিলা ওয়ায়েলের একজন প্রধান মুসান্না বিন হারিসা আশ-শায়বানি রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রণী ছিলেন যিনি ৯ হিজরিতে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার কওমকে নিয়ে ইরানিদের চৌকিগুলোতে অতর্কিত হামলা চালাতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অভিযানের খবর পেলে তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। লোকজন জানাল:

"ইনি মুসান্না বিন হারিসা, যিনি কোনো অখ্যাত ব্যক্তি নন, বরং সুপরিচিত এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।" [২]

মুসান্না বিন হারিসা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কিসরার বাহিনীর মধ্যে এখন আর আগের মতো তেজ নেই। তিনি ভাবলেন যদি মদিনা মুনাওয়ারা থেকে সৈন্য সরবরাহ করা হয় তবে ইরান জয় করা খুব একটা কঠিন হবে না। ফলে তিনি নিজেই মদিনা মুনাওয়ারা এলেন এবং খিলাফত দরবার থেকে ইরাক আক্রমণের অনুমতি চাইলেন এবং সাহায্যকারী বাহিনীর দাবিও করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আট হাজার সৈন্যের সহায়তাসহ এই সৈন্য অভিযানের অনুমোদন দিয়ে দিলেন। তবে তিনি অনুভব করছিলেন যে ইরানের মতো বিশাল সালতানাতের সাথে টক্কর দেওয়ার জন্য কোনো অসাধারণ নেতার প্রয়োজন। তার নির্বাচনের দৃষ্টি আবারও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর পড়ল, যিনি মুরতাদ এবং খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে নিজের সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

---

[১] আল-আখবারুত তিওয়াল লি-আবি হানিফা আদ-দিনাওয়ারি, পৃ. ১১১, ত. দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবি।

[২] ফুতুহুল বুলদান লি-আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি, পৃ. ২৩৮, ত. মাকতাবাতুল হিলাল; আল-ইসতিয়াব: ৩/৩৫৬, ১৩৫৭।

দ্রষ্টব্য: মুসান্না বিন হারিসা একজন সাহাবী যিনি ৯ হিজরিতে মদিনায় এসে জিয়ারত ও সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। (আল-ইসতিয়াব: ৪/১৩৫৬, যদিও কেউ কেউ তা বলেননি।)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁদেরকে ইরাকের দিকে যাত্রা করার এবং মুসান্না বিন হারিসা (রা.)-এর অভিযানকে সফল করার নির্দেশ দেন। হযরত খালিদ (রা.) আবেদন করেন যে তাঁকে যেন সাহায্যকারী বাহিনী প্রদান করা হয়, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত কা'কা বিন আমর (রা.)-কে প্রেরণ করেন যিনি যুদ্ধ ও কূটনৈতিক বিষয়ে নিজের তুলনা নিজেই ছিলেন। লোকেরা আপত্তি করল যে মাত্র একজন মানুষ পাঠালে কী লাভ হবে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উত্তর দিলেন: "তাঁর মতো একজন মানুষ যে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়।" [১]

ইরাকের ওপর এই প্রথম আক্রমণের সাফল্যের জন্য জরুরি ছিল যে প্রতিপক্ষের ওপর জোরালো হামলা করা হোক যাতে মুসলমানদের শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, এই উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে মিলে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে যুদ্ধের নকশা তৈরি করেন, সেই সাথে হযরত ইয়াজ বিন গানাম (রা.)-কেও তাকিদ দেন যে তিনি যেন তাঁর বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। [২]

## ইরানিদের প্রতি বার্তা

রণকৌশল অনুযায়ী এই সমস্ত বাহিনী পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী উপকূলীয় স্থান "উবাল্লা"-র কাছে একত্রিত হলো। এর একদিকে ছিল ইরান এবং অন্যদিকে আরব উপদ্বীপ, আর তৃতীয় দিকে ছিল পারস্য উপসাগরের গভীর পানি। এখানে দখলদার বাহিনী কেবল একই সাথে ইরাক ও আরবের সীমান্তে আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না বরং সমুদ্রপথে কোনো বাধা ছাড়াই হিন্দুস্তান পর্যন্ত যেতে পারত। ইরাকের এই অঞ্চলে ইরানিদের গভর্নর "হুরমুজ"-এর শাসন ছিল, যার জুলুম ও অত্যাচারে প্রজারা এতটাই অতিষ্ঠ ছিল যে তাকে অভিশাপ দিত। মানুষের মধ্যে হুরমুজের নাম একটি গালি হয়ে গিয়েছিল। কাউকে গালি দেওয়ার জন্য "হুরমুজের চেয়ে বড় কাফের" সাধারণ প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। [৩] হযরত খালিদ (রা.) এসেই হুরমুজকে পত্র পাঠান যে হয় ইসলাম গ্রহণ করো অথবা জজিয়া দিয়ে আমাদের নিরাপত্তায় চলে আসো। অন্যথায় তোমাদের মোকাবিলায় এমন এক জাতি আসছে যাদের কাছে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ঠিক ততটাই প্রিয় যতটা তোমাদের কাছে মদ প্রিয়। [৪]

## অগ্নিউপাসকদের সাথে প্রথম যুদ্ধ..... জাতুস সালাসিল

হুরমুজ এই চিঠি ইরানের রাজধানী মাদায়েনে কিসরার আরদাশিরের কাছে পাঠিয়ে দিল এবং নিজে তার সমস্ত বাহিনী সাথে নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে বেরিয়ে পড়ল, তার সাথে নামকরা শাহজাদা ও পালোয়ানরাও ছিল। ইরানি বীরেরা তাদের কাতারগুলোকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল যাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা মাথায় না আসে, এজন্য এই যুদ্ধকে "জাতুস সালাসিল" অর্থাৎ শিকলবদ্ধদের যুদ্ধ বলা হয়।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২ হিজরির অধীনে।

[২] প্রাগুক্ত।

[৩] প্রাগুক্ত।

[৪] "আমি তোমাদের কাছে এমন এক কওমকে নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালোবাসে যেমন তোমরা মদ পান করাকে ভালোবাসো।" (তারিখুত তাবারি: ৩/৪০)। আরও দেখুন: "আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ওয়া নুবুওয়াহ" পৃ. ১০৮; আব্দুল ফাত্তাহ মাহমুদ, ইবনে দাহলানের বরাতে: আল-ফুতুহাত, পৃ. ৯৮।

যেহেতু এটি আরবীয় মুসলিম এবং পারস্যের অগ্নিপূজকদের (মজুস) মধ্যে প্রথম বিধিবদ্ধ যুদ্ধ ছিল, তাই যখন যুদ্ধের সারি বিন্যস্ত হলো, তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) শত্রুর ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির জন্য তলোয়ার হাতে দুই বাহিনীর মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এবং একক যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালেন। মুসলিম প্রধান সেনাপতিকে তলোয়ার হাতে দেখে হুরমুজও তার জাতির মনোবল বজায় রাখার জন্য ময়দানে নেমে এল, তবে সে সাথে সাথেই তার কিছু সৈন্যকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা যেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যুদ্ধ শুরু হলো, হযরত খালিদ (রা.) এবং হুরমুজ উভয়েই নিজ নিজ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে মুখোমুখি হলেন। উভয় পক্ষ থেকে তলোয়ারের কয়েকটি আঘাত হলো এবং অবশেষে হযরত খালিদ (রা.) হুরমুজকে নিজের বাহুবন্দি করলেন। এটি দেখে হুরমুজের সাথে থাকা সৈন্যরা হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে ধাবিত হলো; তবে অপর দিক থেকে হযরত কাকা বিন আমর (রা.) সঠিক সময়ে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত খালিদ (রা.) হুরমুজের কাজ শেষ করে দিলেন, যার ফলে ইরানিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তাদের বীররা নিজেদের শিকল ভেঙে পালিয়ে গেল; মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে অসংখ্য সৈন্যকে হত্যা করল।

এটি ১২ হিজরির শুরুর দিকের ঘটনা। পারস্যের সীমান্তে এই প্রথম বিজয়ের সুসংবাদ গনিমতের মালের পঞ্চমাংশসহ খিলাফতের দরবারে পাঠানো হলো।

**ছানি-র যুদ্ধ:**

এই সময়ে পারস্য দরবার থেকে কারিন নামক এক বিখ্যাত জেনারেলের নেতৃত্বে হুরমুজের সাহায্যের জন্য এক সাহায্যকারী বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। এই বাহিনী পথিমধ্যে হুরমুজের পরাজিত বাহিনীর দেখা পেল। কারিন তার জাতির ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের খবর শুনে ভীত হয়ে পড়ল এবং 'ছানি' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। এদিকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তার বাহিনীকে এগিয়ে নিলেন এবং ইরানিদের ওপর আক্রমণ করলেন। শত্রু বাহিনী এখানে টিকতে পারল না; কারিন নিহত হলো এবং তার ত্রিশ (৩০) হাজার সৈন্য মৃত্যুর মুখে পতিত হলো। [১]

**ওয়ালাজা-র যুদ্ধ:**

ইরানি দরবারে যখন এই অপমানজনক পরাজয়ের খবর পৌঁছাল, তখন দুই সেনাপতি আন্দারজাঘার এবং বাহমান জাদুইয়াহ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের থেকে প্রতিশোধ নিতে রওনা হলো।

সফর ১২ হিজরিতে 'ওয়ালাজা' নামক স্থানে মুসলিম এবং অগ্নিপূজকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত খালিদ (রা.) তার বাহিনীর একটি অংশ পার্শ্ববর্তী নিচু জমিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন মুসলিমদের এই সতেজ বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে বসল। ইরানিরা এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। তাদের সর্দার আন্দারজাঘার পালানোর সময় প্রচণ্ড তৃষ্ণায় মারা গেল। [২]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২ হিজরির অধীনে

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২ হিজরির অধীনে

## আন-গিশিয়ার গনিমতের মাল

ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের খ্রিস্টান আরবরা ইরানি সাম্রাজ্যের সমর্থক ছিল এবং ওল্লাজার যুদ্ধে তারা ইরানিদের সাহায্য করেছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের একটি শিক্ষা দেওয়া জরুরি মনে করলেন এবং ফোরাত নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। খ্রিস্টান আরব ও ইরানি সেনাপতি জাবান-এর বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে এল। হযরত খালিদ (রা.) এখানেও শত্রুদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের (মুবায়েজাত) আহ্বান জানালেন। বিখ্যাত খ্রিস্টান যোদ্ধা মালিক বিন কায়েস মোকাবিলায় এল এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে নিহত হলো। এরপর এক সাধারণ যুদ্ধ শুরু হলো যাতে সত্তর হাজার ইরানি ও খ্রিস্টান আরব নিহত হলো। তাদের আস্তানা 'আন-গিশিয়া'-তে ছিল, যেখানে প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র এবং গবাদি পশু জমা ছিল। শত্রুরা ভয়ে এসব কিছু ফেলে পালিয়ে গেল। হযরত খালিদ (রা.) যখন এই গনিমতের মালের ওপর কবজা করলেন, তখন এর পঞ্চমাংশ মদিনা মুনাওয়ারায় পাঠালেন। ধন-সম্পদের এই স্তূপ দেখে মানুষ অবাক হয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন:
"কোনো মা খালিদের মতো সন্তান জন্ম দিতে পারে না।" [১]

## হিরা বিজয়

ফোরাত নদীর তীরে 'হিরা' খ্রিস্টান আরবদের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। ইসলামী লস্কর সামনে এগিয়ে গিয়ে তা অবরোধ করল। শহরের অধিবাসীরা মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পড়লে তাদের একজন নেতা আমর বিন আব্দুল মাসীহ-কে সন্ধির আলোচনার জন্য পাঠাল।

হযরত খালিদ (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা যুদ্ধ চাও নাকি শান্তি?" সে বলল: "শান্তি।"

আমর বিন আব্দুল মাসীহ-এর সাথে তার খাদেম বিষের একটি থলি নিয়ে ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: "এটি সাথে কেন এনেছ?" সে বলল: "ভয় পাচ্ছি যে যদি সন্ধির আলোচনায় ব্যর্থ হই, তবে নিজের কওমকে কী মুখ দেখাব। এর চেয়ে ভালো হবে যে বিষ খেয়ে মরে যাই।" হযরত খালিদ (রা.) থলিটি নিয়ে নিজের হাতের তালুতে রাখলেন এবং বললেন: "যতক্ষণ সময় পূর্ণ না হয়, মৃত্যু আসতে পারে না।" আপনি "بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الأَسْمَاءِ، رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، الَّذِي لَيْسَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" [২] পড়ে বিষ পান করে নিলেন এবং আপনার কোনো ক্ষতি হলো না।

আমর বিন আব্দুল মাসীহ এটি দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং বলে উঠল: "যতক্ষণ মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের মতো মানুষ বিদ্যমান থাকবে, তোমরা যা ইচ্ছা করবে তা অর্জন করেই ছাড়বে।" পরিশেষে হিরাবাসীরা এক লক্ষ নব্বই হাজার দিরহাম বার্ষিক করের বিনিময়ে সন্ধি করল।

এটি রবিউল আউয়াল ১২ হিজরির ঘটনা। মুসলমানরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করল। এই আচরণ দেখে আশেপাশের জমিদার ও নেতারাও জিজিয়া প্রদান করে মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে নিল। [৩]

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ১২ হিজরি; তারিখ ইবনে খালদুন: ২/৫১০, দারুল ফিকর; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/৫২২।

[২] সমস্ত নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহর নামে, যিনি আসমান ও জমিনের মালিক, যাঁর নামের সাথে কোনো রোগ ক্ষতি করতে পারে না, যিনি পরম দয়ালু ও অত্যন্ত মেহেরবান।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/৫২২-৫২৩।

## আইনুত তামর যুদ্ধ

প্রাসাদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইরানি রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক মতপার্থক্য নিজ জায়গায় ছিল, কিন্তু মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা সবাই এক ছিল এবং নিজ দেশ রক্ষার জন্য অত্যন্ত উদ্দীপ্ত ছিল। তারা মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের সেনাপতি বাহমান জাদুইয়াকে অযোগ্য মনে করে তার স্থলে 'বাহরাম চুবিন'কে নিযুক্ত করেছিল।

বাহরাম মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পুত্র মিহরানকে একটি বাহিনী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যে উত্তর ইরাকের আইনুত তামর অঞ্চলে শিবির স্থাপন করেছিল। তার সাহায্যের জন্য একজন খ্রিস্টান আরব নেতা আক্কা বিন আবি আক্কাও তার গোত্রীয় বাহিনী নিয়ে পৌঁছেছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-ও উত্তরের দিকে অগ্রসর হন এবং আনবারসহ পথের জনপদগুলোকে পদানত করে 'আইনুত তামর'-এ পৌঁছে যান।

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত খালিদ (রা.) স্বয়ং খ্রিস্টান নেতা আক্কার ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে বন্দি করেন। এটি দেখে শত্রুদের পা উপড়ে যায় এবং তাদের একটি বড় অংশ পালিয়ে একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়, অন্যদিকে মিহরান ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) দুর্গটি অবরোধ করে তা শক্তি প্রয়োগে জয় করেন এবং শত্রুদের কাজ শেষ করে দেন। [১]

## হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) দুমাতুল জান্দালে

এই সময়ে জাজিরাতুল আরবের উত্তরে দুমাতুল জান্দাল অঞ্চলে খ্রিস্টান আরব গোত্র বনু গাসসান, বনু তাগলিব এবং বনু কালব মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হচ্ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাদের দমনের জন্য আয়ায বিন গানাম (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিলেন না, তখন হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইলেন।

হযরত খালিদ (রা.) কালক্ষেপণ না করে সেখানে পৌঁছে গেলেন। খ্রিস্টান আরবরা তাকে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেল। তাদের নেতা উকাইদির বিন মালিক, যে তাবুক যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা.)-এর আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছিল, সে তার কওমকে সন্ধি করার পরামর্শ দিল, কিন্তু খ্রিস্টান গোত্রগুলো মরণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল।

উকাইদির যখন এই অবস্থা দেখল, তখন সে একপাশে সরে গেল কিন্তু পথিমধ্যে একজন মুসলমানের হাতে নিহত হলো। অন্যদিকে একজন খ্রিস্টান আরব নেতা জুদি বিন রাবিয়া গোত্রগুলোকে আরও উত্তেজিত করল। তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে হযরত খালিদ (রা.) এবং আয়ায বিন গানাম (রা.)-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আলাদা আলাদা দিক থেকে বের হলো।

tumul যুদ্ধের পর উভয় রণাঙ্গনে খ্রিস্টানরা পরাজিত হলো। জুদি বন্দি হলো এবং অবশিষ্ট খ্রিস্টানরা পিছু হটে দুর্গে আবদ্ধ হলো। তবে হযরত খালিদ (রা.) তরবারির জোরে এই দুর্গটিও জয় করে নিলেন। এভাবে খ্রিস্টান আরবদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। [২]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১২ হিজরির অধীনে।

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫১২/২, ত. দারুল ফিকর।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

অংশ প্রথম

**ফিরাযের যুদ্ধ:**

এখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) পুনরায় 'হীরা'র দিকে ফিরে এলেন যেখানে অনারব রাজনীতিবিদ এবং আরব খ্রিস্টান নেতারা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) একে একে মুসাইয়্যাখ, সানি এবং যুমাইলের ময়দানে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাদের ঐক্য তছনছ করে দেন।

'ফিরায' সিরিয়া, ইরাক এবং হীরা রাজ্যের সীমান্তের সংযোগস্থল হওয়ার কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। যিলকদ ১২ হিজরিতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এটি জয় করার জন্য সৈন্য বিন্যস্ত করেন। সিরিয়ার রোমান, ইরাকের অনারব এবং হীরার খ্রিস্টান গোত্রগুলোর কেউ এটি সহ্য করতে পারছিল না যে এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মুসলমানদের দখলে চলে আসুক, তাই যখন ইসলামী বাহিনী এখানে পৌঁছাল তখন ইরানি এবং খ্রিস্টান আরবদের পাশাপাশি রোমান বাহিনীও মুসলমানদের মোকাবিলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, উভয় বাহিনীর মাঝে ফোরাত নদী অন্তরায় ছিল।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) প্রতিপক্ষকে নদী পার হওয়ার সুযোগ দিলেন। এখানে এক অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর সাহস ভেঙে পড়ল, যখন তারা পলায়ন করল তখন ফোরাত নদীর ঢেউ ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। ফলাফল এই দাঁড়াল যে প্রায় পুরো মিত্রবাহিনী মারা পড়ল, কমবেশি এক লক্ষ লোক নিহত হলো। [১]

**হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর হজ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সতর্কবাণী:**

এই গৌরবময় বিজয়ের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ওপর হঠাৎ বাইতুল্লাহর হজের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল, যার জন্য মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি ছিল। যেহেতু ইসলামী বাহিনীর সেনাপতির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিতি সৈন্যদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারত, তাই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নিজের ইচ্ছা কারো কাছে প্রকাশ হতে দেননি এবং গোপনে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আরব মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মক্কায় পৌঁছে গেলেন। হজের আহকাম পালন করে তিনি একই দ্রুততায় পুনরায় ইরাকে ফিরে এলেন এবং কেউ টেরও পেল না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সেই বছর নিজে হজের জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর আসা-যাওয়ার ব্যাপারে তিনিও তখন বেখবর ছিলেন। মদিনায় ফিরে যখন জানতে পারলেন তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে নিজের পত্রে লিখে পাঠালেন:

"সাবধান! ভবিষ্যতে এমন ঝুঁকি নিও না। খেয়াল রেখো যেন তোমার মধ্যে আত্মতুষ্টির ভাব সৃষ্টি না হয় অন্যথায় ক্ষতি হবে। নিজের কোনো কৃতিত্বের জন্য গর্ব করো না কারণ এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনিই সর্বোত্তম প্রতিদান দানকারী।"

এর পাশাপাশি তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে তাৎক্ষণিক নির্দেশ জারি করলেন যে তিনি যেন ইরাক ছেড়ে সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছে যান, কারণ এখন সেখানে কঠিন যুদ্ধের সময় এসে গিয়েছিল এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর সেখানে বেশি প্রয়োজন ছিল। [২]

---

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৫১৩, ৫১৪/২

[২] আল-মুনতাযাম লি ইবনিল জাওযি: ১১১/৪

## রূমী বাদশাহত

সিরিয়া ছিল রোম সম্রাটের সাম্রাজ্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ, যেখানে খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানসমূহ অবস্থিত ছিল। ইরানীরাও আরবদের মতো রোমানদের চিরশত্রু ছিল, কিন্তু ইরানীদের শত্রুতার মধ্যে রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক (সাংস্কৃতিক) উপাদান প্রবল ছিল, যেখানে রোমানদের শত্রুতার মধ্যে ধর্মীয় কারণ বেশি জড়িত ছিল। ইসলামের পূর্বে ইয়েমেনের খ্রিস্টান শাসক আবরাহা কাবার মোকাবিলায় সানায় একটি গির্জা নির্মাণ করে আরবদের সেখানে হজের দাওয়াত দিয়েছিল, যাকে আরবরা চরম ঘৃণার চোখে দেখেছিল। যখন আরবরা ইসলাম গ্রহণ করে একটি সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত হলো, তখন বাইজেন্টাইন রোমানরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। কারণ ইসলামের গুণাবলী ও সৌন্দর্যের সামনে খ্রিস্টধর্মের কৃত্রিম জৌলুস ম্লান হয়ে যাচ্ছিল এবং এই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে ইসলামের দাওয়াত পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টধর্মকে একটি বিস্মৃত কাহিনীতে পরিণত করবে। এই কারণেই সিরিয়ার খ্রিস্টান শাসকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত। এই সরকারই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দূত হযরত হারিস বিন উমাইর আযদি (রা.)-কে হত্যা করেছিল, যার প্রতিশোধ নিতে নবী করীম (সা.) মুতাহ নামক স্থানে একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, যারা লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। এরপর এই অভিযান সম্পন্ন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর বাহিনী প্রস্তুত করে প্রেরণ করেছিলেন। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) ৯ হিজরিতে রোমানদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য স্বয়ং তাবুক পর্যন্ত শেষ জিহাদী সফর করেছিলেন এবং তাবুক পর্যন্ত ইসলামের ঝাণ্ডা গেড়েছিলেন, যা আরব ও সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। রোমানরা ইসলামকে তাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে করে কেবল আরবদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণের প্রস্তুতিই নিচ্ছিল না, বরং ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসকারী আরব খ্রিস্টানদের সমর্থনও তাদের ছিল। মুতাহ এবং তাবুকের যুদ্ধে রোমানরা আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন এটি জরুরি হয়ে পড়েছিল যে রোমানদের শক্তির দম্ভ চিরতরে চূর্ণ করা হোক, এশিয়া মাইনরের লক্ষ লক্ষ অসহায় ও মজলুম মানুষকে তাদের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত ও এর ন্যায়বিচার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যের তন্তু ছিঁড়ে ফেলা হোক।

## রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান

এত বড় শক্তির সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি ছিল, তাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এ পর্যন্ত সিরিয়ার দিকে প্রেরিত বাহিনীকে খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেননি। আপনি হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.)-কে সিরিয়ার সীমান্তে নিযুক্ত করেছিলেন এবং এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে তিনি যেন সামনে অগ্রসর হন কিন্তু রোমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হন এবং হঠকারীভাবে অগ্রসর না হন।

https://t.me/BoierSomahar

হযরত খালিদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশনায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রোমানদের মোকাবিলায় অগ্রসর হচ্ছিলেন, যারা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে তাদের সেনাপতি বাহানের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছিল। হযরত খালিদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করে সেই বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেন, কিন্তু রোমানদের সামরিক শক্তির কোনো সীমা ছিল না, তাই হযরত খালিদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত দরবারে আরও সৈন্য পাঠানোর আবেদন জানালেন। [১]

**নতুন সৈন্যবাহিনী বিন্যাস:**

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিলেন। তিনি ইয়ামেন, তুহামা, ওমান এবং বাহরাইন থেকে সমবেত হওয়া স্বেচ্ছাসেবকদের হযরত ইকরিমা বিন আবি জাহল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে সিরিয়ার সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এতে প্রয়োজন পুরোপুরি মিটল না। সেখানে একটি বড় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ছিল, যার প্রস্তুতি ও নেতৃত্বের জন্য বড় মাপের সাহাবীদের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি হযরত আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে সদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, পরামর্শ দিলেন যে তিনি যেন এই পদ ছেড়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খিদমতের জন্য প্রস্তুত হন। হযরত আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন:

“আমি ইসলামের তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর। আপনিই নিক্ষেপকারী। যে লক্ষ্যটি সবচেয়ে বিপজ্জনক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশি সওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখা যায়, আমাকে সেখানেই নিক্ষেপ করুন।”

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাকে নতুন সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগের দায়িত্ব দিলেন। যখন একটি বড় দল তৈরি হয়ে গেল, তখন তিনি তিনটি নতুন বাহিনী গঠন করলেন। এক বাহিনীর সেনাপতি হযরত আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে করে ফিলিস্তিনের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সোপর্দ করলেন এবং তাকে জর্ডানের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। [২]

**ঐতিহাসিক অসিয়ত:**

তৃতীয় বাহিনীটি ছিল সবচেয়ে বড়, যা হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বড় ভাই হযরত ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে দেওয়া হলো। এই বাহিনীকে তিনি নিজে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিদায় জানালেন এবং মদিনার বাইরে পর্যন্ত তাদের সাথে পায়ে হেঁটে চললেন। বাহিনীর সেনাপতিকে তিনি এই ঐতিহাসিক নির্দেশনা দিলেন:

“তোমাদের এই নেতৃত্ব এজন্য দেওয়া হয়েছে যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয় এবং তোমাদের যোগ্যতা প্রকাশ পায়। তোমরা যদি ভালো পারদর্শিতা দেখাও তবে তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। আর যদি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করো তবে তোমাদের বরখাস্ত করা হবে। আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি। তিনি তোমাদের গোপন বিষয়গুলো ঠিক সেভাবেই জানেন যেভাবে তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলো জানেন। মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি তাঁর অনুগত থাকে। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজের আমলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে।”

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ১৩ হিজরি।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ১৩ হিজরি।

...চেষ্টা করে। সাবধান! জাহেলি গোঁড়ামি থেকে বেঁচে থেকো, আল্লাহ তাআলা গোঁড়ামি এবং গোঁড়ামি প্রদর্শনকারীদের অপছন্দ করেন। নিজের সৈন্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করো, তাদের ভালো আশা দিতে থাকো। যখন তাদের উপদেশ দেবে তখন সংক্ষেপে কথা বলো, কারণ দীর্ঘ বক্তৃতার কিছু অংশ মনে থাকে আর কিছু অংশ মানুষ ভুলে যায়। নিজের নফসকে নেককার বানিয়ে নাও, লোকেরাও তোমার সাথে নেক আচরণ করবে। নামাজসমূহকে তাদের নির্দিষ্ট সময়ে রুকু ও সিজদার পূর্ণ আদব এবং খুশু-খুজুর সাথে আদায় করো। শত্রুর দূতদের সম্মান ও আপ্যায়ন করো কিন্তু তাদের বেশিক্ষণ নিজের কাছে থাকতে দিও না, পাছে তারা তোমাদের গোপন রহস্য জেনে ফেলে।

নিজের গোপন বিষয়গুলো কখনো প্রকাশ হতে দিও না অন্যথায় পুরো ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যাবে। যখন পরামর্শ করবে তখন সত্য বলবে এবং পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে পরিস্থিতির কোনো দিক গোপন করো না। পাহারার খুব গুরুত্ব দেবে। সৈন্যদের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল থেকো না, তবে তাদের গোপন বিষয়গুলোর খোঁজেও থেকো না। নিজের উঠাবসা সত্যবাদী হিতাকাঙ্ক্ষী এবং অনুগত ব্যক্তিদের সাথে রেখো, ভীরুতা দেখিও না, অন্যথায় সৈন্যরাও ভীরু হয়ে যাবে। শত্রুদের মধ্যে যারা নিজেদের উপাসনালয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের বিরক্ত করো না। [১]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই উপদেশগুলো যেকোনো দ্বীনি কাজের নেতৃত্ব দানকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদের জন্য একটি দিকনির্দেশনার মর্যাদা রাখে।

পরাজয় এবং নতুন রণকৌশল:

হযরত খালিদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার সীমান্তে সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলেন, যখনই তিনি ইসলামী বাহিনী রওনা হওয়ার সংবাদ পেলেন, তিনি সিরিয়ার সীমান্তে অগ্রসর হতে শুরু করলেন এবং ফিলিস্তিনের মারজ আস-সুফফার নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু এখানে রোমান জেনারেল বাহান এক বিশাল বাহিনীর সাথে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবরোধ করে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করল যে হযরত খালিদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো, তাঁর পুত্রসহ বিপুল সংখ্যক মুসলমান শহীদ হলেন। হযরত খালিদ বিন সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অতি কষ্টে কিছু লোকসহ জীবিত ও নিরাপদে বেঁচে ফিরতে সক্ষম হলেন এবং সরাসরি মদিনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মদিনায় রেখে হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা, হযরত মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান এবং হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামকে সিরিয়ার রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের আগে কিছু সাহায্যকারী বাহিনী হযরত ইকরিমা বিন আবি জাহল এবং হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর নেতৃত্বে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। [২]

যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সতেজ বাহিনী সিরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে আলাদা আলাদা স্থানে অবস্থান নিল। হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু জাবিয়ায়, হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বালকায় এবং হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা রাযিয়াল্লাহু আনহু—

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে

জর্ডানের ময়দানে তাঁবু গেড়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে সাত সাত হাজার সৈন্য ছিল। এভাবে ইসলামী লস্করের মোট সংখ্যা ছিল একুশ হাজার।

রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন মুসলমানদের এই সুসংগঠিত আক্রমণের খবর পেলেন, তখন তিনি দ্রুত যাত্রা ও যাত্রাবিরতি করে নিজের রাজধানী হিমসে পৌঁছালেন এবং এখান থেকে প্রত্যেক মুসলিম আমিরের মোকাবিলায় আলাদা আলাদা বাহিনী প্রেরণ করলেন যাতে মুসলমানরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করতে না পারে। তাদের মধ্যে হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর মোকাবিলায় প্রেরিত লস্করটি ষাট হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, যার নেতৃত্ব ছিল কাইকার নামক এক অফিসারের হাতে। অন্যদিকে হেরাক্লিয়াসের আপন ভাই তাজারিক ৯০ হাজারের এক লস্কর নিয়ে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর দিকে রওনা হয়েছিল।

মুসলিম সেনাপতিরা এই পরিস্থিতি দেখে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সবাই এক জায়গায় একত্রিত হবেন এবং খিলাফত দরবারে আরও সাহায্যের আবেদন করবেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এই ব্যক্তিদের প্রস্তাবের সাথে একমত হয়ে তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পিছিয়ে গিয়ে ইয়ারমুক নদীর তীরে কোনো উপযুক্ত এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। [১]

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর সিরিয়া যাত্রা:

এই সেই দিনগুলো ছিল যখন খিলাফত দরবার থেকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর কাছে বার্তা পৌঁছেছিল যে, তিনি যেন ইরাক রণাঙ্গনের নেতৃত্ব মুসান্না বিন হারিসা (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করে যত দ্রুত সম্ভব নিজের অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়া রণাঙ্গনে পৌঁছে যান। [২]

এই পরিস্থিতিতে যখন সিরিয়ার সীমান্তে যুদ্ধের ভয়াবহ মেঘ ছেয়ে ছিল এবং রোমান লস্কর ক্রমাগত চলাচলের মধ্যে ছিল, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর পক্ষে তাদের ফাঁকি দিয়ে নিজের গন্তব্যে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর তলোয়ার, নিজের লক্ষ্যের আগে থামতে জানতেন না। তিনি ইরাকের অর্ধেক বাহিনী নিয়ে, যা নয় হাজার মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, হীরা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করে এমন এক পানিশূন্য ও উদ্ভিদহীন মরু পথ বেছে নিলেন যা অতিক্রম করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। এই মরুভূমি "কাওয়াকির" থেকে "সুওয়া" পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রোমান বাহিনী এর দক্ষিণ-পশ্চিমে সীমান্ত অবরোধ করে অবস্থান করছিল। এই মরুভূমিতে কোনো ঝরনা বা মরূদ্যান ছিল না।

বনু তায়ি গোত্রের হযরত রাফি বিন উমাইরা (রা.), যাকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি বললেন: "এই মরুভূমি তো একজন দ্রুতগামী একাকী আরোহীও সহজে অতিক্রম করতে পারে না, সেখানে আপনি সৈন্যবাহিনী ও কাফেলা নিয়ে এখান দিয়ে কীভাবে যাবেন?" হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বললেন: "আমাকে এখান দিয়েই যেতে হবে, রোমানদের এড়িয়ে সাহায্যের অপেক্ষায় থাকা মুসলমানদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এটি জরুরি।" [৩]

---

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/৩৯, ত. দারুল মাআরিফ

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরীর অধীনে

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরীর অধীনে

**মরুভূমি, তৃষ্ণা এবং ঝরনা:**

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা উটগুলোকে ভালোভাবে পানি পান করিয়ে নেয় এবং যতটা সম্ভব পানি সাথে নিয়ে নেয়। এখন মরুভূমির দুর্গম সফর শুরু হলো। প্রচণ্ড গরম এবং তীব্র তৃষ্ণার কারণে অবশেষে পানি শেষ হয়ে গেল, ঘোড়াগুলো তৃষ্ণায় নিস্তেজ হতে শুরু করলে উট জবাই করে তাদের কুঁজে সংরক্ষিত জলীয় অংশ তাদের পান করানো হলো। পঞ্চম দিনে কাফেলার প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। পথপ্রদর্শক হযরত রাফে বিন উমাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখ অসুস্থতার কারণে ব্যথা করছিল, তিনি কষ্টে মরুভূমির বিস্তৃতির দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি কাফেলাকে এক দিকে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন:

"দেখো, কোথাও এমন কোনো গাছ দেখা যায় কি, যা দেখতে বসে থাকা মানুষের মতো?"

উত্তর এলো: "না।"

তিনি বললেন: "তাহলে তো তোমরাও শেষ আর আমিও। দেখো, আবারও মনোযোগ দিয়ে দেখো।"

তখন হঠাৎ একজন চিৎকার করে বলল: "হ্যাঁ, একটি গাছের কাটা কাণ্ড দেখা যাচ্ছে।"

হযরত রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে গিয়ে বললেন: "এর শিকড়ে খনন করো।"

লোকেরা খনন করলে নিচ থেকে একটি ঝরনা প্রবাহিত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হলেন যে রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে পানির সম্ভাবনার কথা কীভাবে আন্দাজ করলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "আমি কেবল একবার শৈশবে বাবা-মায়ের সাথে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন এই গাছের পাশে ঝরনা প্রবাহিত হতো।"

কাফেলা তৃষ্ণা মিটিয়ে সামনে এগিয়ে চলল এবং পঞ্চম দিনে সহিহ-সালামতে মৃত্যুর উপত্যকা থেকে বের হয়ে নিস্তব্ধ ভূমি থেকে সিরিয়ার সীমানায় প্রবেশ করল যে শত্রু টেরও পেল না। [১]

**বুসরার বিজয়:**

সিরিয়ায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের একটি বড় দুর্বলতা আঁচ করতে পারলেন, তা হলো এখন পর্যন্ত তারা কোনো শহর বা দুর্গ জয় করেননি। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুভব করলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কোনো প্রাচীরবেষ্টিত শহর পদানত না হবে, সিরিয়ায় পা জমানো সম্ভব নয়। ফলে তিনি তার পথে আসা প্রথম শহর "বুসরা"-র সামনে তাবু গাড়লেন। এই সময়ে অন্যান্য ইসলামী সেনাপতিদের বাহিনীও সাহায্যের জন্য পৌঁছে গেল। শহরবাসী জিজিয়া দিতে রাজি হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করল এবং শহরটি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হলো। [২]

**জঙ্গ-এ-আজনাদাইন:**

এখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইসলামের অন্যান্য আমিরগণ আজনাদাইনের দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মোকাবিলায় হেরাক্লিয়াসের ভাই ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল। এই এলাকাটি ফিলিস্তিনের রামলা এবং বাইত জিবরিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে

[২] তারিখ তাবারী: ২/৪৭, দারুল মাআরিফ

যুদ্ধের আগে রোমান সেনাপতি একজন আরব গুপ্তচরকে মুসলমানদের শিবিরের দিকে পাঠিয়েছিলেন। সে ফিরে এসে এই রিপোর্ট পেশ করল: 'বাল্লাইলি রুহবানুন, ওয়াবিননাহারি ফুরসানুন' (রাতে ইবাদতকারী, দিনে অশ্বারোহী)।

সাথে সে আরও বলল: 'তাদের মধ্যে আইনের শাসন এতটাই যে, যদি তাদের শাসকের ছেলেও চুরি করে তবে তার হাত কেটে দেওয়া হবে, আর যদি ব্যভিচার করে তবে তাকেও পাথর মেরে হত্যা করা হবে।'

একথা শুনে রোমান সেনাপতি বলল:

'তাহলে তাদের সাথে লড়াই করার চেয়ে মাটির নিচে জ্যান্ত দাফন হওয়া ভালো। হায়! যদি আমাকে তাদের সাথে লড়াই করতে না হতো।'

অবশেষে ২৭ জুমাদাল উলা ১৩ হিজরিতে আজনাদাইনের ময়দানে অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। মুসলিম বাহিনীর সকল সেনাপতি সর্বসম্মতিক্রমে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন, তাই হযরত আমর ইবনুল আস, হযরত ইয়াজিদ বিন সুফিয়ান, হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা এবং হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) সহ সকল বড় বড় সাহাবী তাঁরই নেতৃত্বে লড়াই করছিলেন। [১] শেষ পর্যন্ত রোমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো, হেরাক্লিয়াসের ভাই তাদারিক নিহত হলো এবং যুদ্ধক্ষেত্র মুসলমানদের দখলে রইল। [২]

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) রোমানদের সামলে ওঠার সুযোগ দেননি এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পুরো বাহিনীকে নিয়ে উত্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন, এমনকি ইয়ারমুক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন যেখানে হেরাক্লিয়াসের এক বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবিলা অনিবার্য ছিল। [৩]

**হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকাল:**

কিন্তু ইয়ারমুকের ময়দান দুই জাতির মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্য দেখার আগেই মদিনা মুনাওয়ারায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল। তিনি ৬৩ বছর বয়স পেয়েছিলেন। তিনি বেশ কয়েক দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন।

এক বছর আগে তিনি এবং আরবের বিখ্যাত চিকিৎসক হারিস বিন কালদাহ একসাথে খাবার খেতে বসেছিলেন, দস্তরখানে ভাত ছিল, হারিস লোকমা গিলার সাথে সাথেই বলেছিলেন: 'খলিফায়ে রাসূল! খাবার থেকে হাত সরিয়ে নিন, এতে বিশেষ ধরনের বিষ মেশানো আছে, যার প্রভাব ঠিক এক বছর পর প্রকাশ পায়।'

ইতিহাস এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না যে বিষ খাওয়ানোর ষড়যন্ত্রকারী কে ছিল। আল্লামা ইবনুল আসির (রহ.) বলেন: 'এই খাবারে ইহুদিরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।' কিন্তু এটা জানা যায় না যে ইহুদিরা কখন এবং কীভাবে খলিফাতুল মুসলিমিনের খাবারে বিষ মিশিয়েছিল? তারা এই ষড়যন্ত্রে কীভাবে সফল হলো, ষড়যন্ত্রকারী ইহুদি কে ছিল? এই সব প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়, যাই হোক যে ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কেও বিষাক্ত লোকমা খাওয়াতে সফল হতে পেরেছিল, তারা খলিফায়ে রাসূলের জন্য এমন জাল কেন বিছাতে পারবে না।

বিষের প্রভাবে হারিস বিন কালদাহ এক বছর পর মারা যান এবং ঠিক সেই দিনই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ও ইন্তেকাল করেন। [৪] [৫]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরি; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৫৫২

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৭/৫১

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরি

[৪] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৬৫, ত নজার

**উত্তরসূরি নিয়োগের জন্য পরামর্শ:**

নিজের ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী অনুভব করে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শের জন্য হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ডাকলেন যে, কাকে উত্তরসূরি নিয়োগ করা যায়। আপনার মনে আগে থেকেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম ছিল, যিনি নিঃসন্দেহে এই পদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন: "উমর সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?"

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:
"তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং যোগ্যতার ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই, তবে তাঁর মেজাজে কিছুটা কঠোরতা রয়েছে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "তাঁর মধ্যে কঠোরতা এই কারণে যে আমি নরম, যখন তাঁর ওপর খিলাফতের দায়িত্ব পড়বে তখন তিনি নিজে থেকেই নরম হয়ে যাবেন। আমি অনেকবার দেখেছি যে, যখন আমি কারো ওপর রাগ করতাম তখন তিনি আমাকে তার সাথে সন্তুষ্ট করাতেন, আর যখন আমি কোনো বিষয়ে নমনীয়তা দেখাতাম তখন তাঁকে কঠোর মেজাজে দেখা যেত।"

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন:
"আপনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা বানাতে যাচ্ছেন, অথচ মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁর কঠোর মেজাজ সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ প্রশান্তির সাথে বললেন:
"হ্যাঁ, যখন আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব তখন বলতে পারব যে, আমি তোমার বান্দাদের ওপর সর্বোত্তম মানুষকে খলিফা বানিয়ে এসেছি।"

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন: "তাঁর মতো গুণাবলি সম্পন্ন আমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।"

এই ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার পর আপনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অসিয়তনামা লেখার নির্দেশ দিলেন। আপনি কেবল এতটুকুই লিখিয়েছিলেন যে, "আবু বকর বিন আবি কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য অসিয়ত..." এমন সময় আপনার ওপর মূর্ছা ভাব প্রবল হলো।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতেন যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারেই, তিনি এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে এই বেহুঁশ অবস্থায় খলিফার মৃত্যু না হয়ে যায় এবং অসিয়তনামা অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার কারণে খিলাফতের বিষয়টি বিতর্কিত না হয়ে পড়ে, তাই তিনি নিজেই এই বাক্যটি লিখে দিলেন:
"আমি উমরকে তোমাদের জন্য খলিফা নিযুক্ত করেছি। আমি তোমাদের কল্যাণ কামনায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।"

কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞান ফিরে পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন: "কী লিখেছ?"

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লেখাটি পড়ে শোনালেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে বললেন: "আল্লাহু আকবার!"

তারপর তাঁর প্রজ্ঞার প্রশংসা করে বললেন:
"আল্লাহ তোমাকে সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।" [১]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

## হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর প্রতি বিশেষ অসিয়তসমূহ:

এর পর তিনি হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে ডেকে এনে তাঁকে বললেন:

“আমি তোমাকে হুজুর আকদাস (সা.)-এর সাহাবীদের জন্য খলিফা বানিয়ে রেখে যাচ্ছি।”

অতঃপর তিনি তাঁকে খিলাফতের দায়িত্বসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করলেন:

“হে উমর! আল্লাহর কিছু হক রাতের এবং কিছু দিনের। রাতের হক তিনি দিনে কবুল করেন না এবং দিনের হক রাতে কবুল করেন না। তিনি নফল ইবাদত ততক্ষণ কবুল করেন না যতক্ষণ না ফরজসমূহ আদায় করা হয়।”

যেহেতু হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর প্রভাব ও গাম্ভীর্যের কারণে কিছু সাহাবায়ে কিরামের মনে এই ভয় ছিল যে, তিনি হয়তো কোথাও অহেতুক কঠোরতা করে ফেলবেন, তাই তিনি তাঁকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার বিশেষ অসিয়ত করে বললেন:

“উমর! তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে কঠোরতার সাথে কোমলতার এবং আজাবের সাথে রহমতের উল্লেখ করেছেন, যাতে বান্দারা আশা ও ভয়ের মধ্যে থাকে এবং আজাবের ভয়ে কম্পিতও থাকে; যাতে কেউ এত বেশি আত্মতুষ্টিতে না ভোগে যে আল্লাহর কাছে নিজের হকের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে, আবার এমন হতাশও না হয় যে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।”

অতঃপর নিজের অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করে বললেন:

“হে উমর! তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ জাহান্নামীদের কথা তাদের মন্দ আমলসহ উল্লেখ করেছেন, যা পড়ে আমার ভয় হয় যে পাছে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই; আর জান্নাতীদের কথা তাদের সর্বোত্তম আমলসহ উল্লেখ করেছেন, যা পড়ে আমি ভাবি যে আমি কীভাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব। উমর! যদি তুমি আমার এই কথাগুলো মনে রাখো, তবে দৃষ্টির আড়ালে থাকা পরকাল তোমার কাছে এই দৃশ্যমান দুনিয়ার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে, আর তুমি অবশ্যই তা করতে পারো।” [১]

এই নসিহত ও অসিয়তসমূহের পর মঙ্গলবার, ২২ জমাদিউল আখিরা ১৩ হিজরিতে উম্মতে মুসলিমার এই দরদী মানুষটি, যাঁর হৃদস্পন্দনের প্রতিটি স্পন্দন তাঁর আঃ (সা.)-এর দ্বীনের উচ্চতার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল, মৃত্যুর ডাককে লাব্বাইক বললেন এবং তাঁর প্রিয় হুজুর সরওয়ারে দোজাহান (সা.)-এর পাশেই সমাহিত হলেন। [২]

## হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ব্যক্তিত্বের ওপর এক নজর:

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আখলাক ও চরিত্রে হুজুর (সা.)-এর এত নিকটবর্তী ছিলেন যে, উম্মতে মুসলিমার কোনো ব্যক্তি এই বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তিনি (রা.) কোমল হৃদয়, দয়ালু, দানশীল এবং সহজ-সরল মেজাজের অধিকারী ছিলেন। ইব্রাহিম নাখয়ি বলতেন:

“হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর কোমলতা ও দয়ার্দ্র হৃদয়ের কারণে আওয়াহ (অত্যধিক রোনাজারি ও আহাজারি করা ব্যক্তি) বলা হতো।” [৩]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/১৭১, ত. সাদির

স্বভাবগত পবিত্রতা এমন ছিল যে, জাহেলিয়াত যুগেও কখনো মূর্তিপূজা করেননি এবং কখনো মদ স্পর্শ করেননি। [১] প্রচণ্ড গরমে প্রচুর রোজা রাখতেন [২] যার ফলে শরীরে চর্বির কোনো নামনিশানা পর্যন্ত ছিল না, একেবারে কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন। [৩] আপনি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলামের জন্য অকাতরে ব্যয় করতে থাকেন। [৪] খলিফা হওয়ার পর সমস্ত অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দিয়েছিলেন। [৫]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কিছু গুণাবলি:

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মর্যাদার আন্দাজ এই কথা থেকে করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন:

مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারের প্রতিদান দিয়ে দিয়েছি, আবু বকর ব্যতীত; আমাদের ওপর তার এত বেশি এহসান রয়েছে যে, তার প্রতিদান কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাই দান করবেন।) [৬]

নবী আকরাম (সা.)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো: “আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে?” তিনি বললেন: “আয়েশা।” জিজ্ঞাসা করা হলো: “পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে?” তিনি বললেন: “আয়েশার বাবা (আবু বকর রা.)।” [৭]

নবী করীম (সা.) বলতেন:

“لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا”

(যদি আমি আমার রব ছাড়া অন্য কাউকে নিজের খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল বানাতাম।) [৮]

একবার বললেন: “যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আমার সঙ্গ দিয়েছে এবং আমার খাতিরে নিজের সম্পদ সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছে, সে হলো আবু বকর। যদি আমি কাউকে নিজের খলীল বানাতাম তবে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল বানাতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব (নিজ স্থানে যথেষ্ট)।” [৯]

সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমত ছিল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেন যে, আমরা সাহাবীরা নবী (সা.)-এর যুগে কোনো সাহাবীকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমতুল্য মনে করতাম না। [১০]

হযরত আলী (রা.)-কে তার সাহেবজাদা মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া জিজ্ঞাসা করলেন: হুজুর (সা.)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি দ্বিধাহীনভাবে বললেন: “হযরত আবু বকর (রা.)।” [১১]

---

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৯, ত. বাজ্জার

[২] আয-যুহদ লি আহমাদ বিন হাম্বল, খণ্ড ৫, পৃ. ৫৮৫, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৩] তারিখুত তাবারী, ৩/৩২৩

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৩/১৭১, ত. সাদির

[৫] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৩/১১৩, ত. তাদমুরী

[৬] সুনানুত তিরমিযী, হা. ৩৬৬১, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আবি বকর (রা.) সহীহ সনদে

[৭] সহীহ মুসলিম, হা. ৬২২৮, ফাযাইলুস সাহাবা, বাবু ফাযাইলি আবি বকর (রা.)

[৮] সহীহ মুসলিম, হা. ৬২২৭, ফাযাইলুস সাহাবা, বাবু ফাযাইলি আবি বকর (রা.)

[৯] সহীহ মুসলিম, হা. ৬২২০, ফাযাইলুস সাহাবা, বাবু ফাযাইলি আবি বকর (রা.)

[১০] সহীহ বুখারী, হা. ৩৬৯৭, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি উসমান বিন আফফান

[১১] সহীহ বুখারী, হা. ৩৬৭১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফাযাইলি আবি বকর (রা.)

একবার রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু-কে বললেন: “তুমি গুহায় আমার সঙ্গী এবং হাউজে কাউসারে আমার সাথী।” [১]

একবার হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর সাথে হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হলো। হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু দ্রুতই এ জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনায় এতটাই ব্যথিত হলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সতর্কতার জন্য এক বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে বললেন: “আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে আর আবু বকর আমাকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল। নিজের জান ও মাল দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। তবে কি তোমরা আমার খাতিরে আমার বন্ধুকে ক্ষমা করতে পারো না?” [২]

হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন: “আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু আমাদের নেতা, আমাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয়।” [৩]

একবার রসূল আকরাম ﷺ বললেন: “জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে জান্নাতের সেই দরজা দেখালেন যা দিয়ে আমার উম্মতের লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।” হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু আরজ করলেন: “ইয়া রসূলুল্লাহ! আফসোস, সেই সময় যদি আমি আপনার সাথে থাকতাম তবে জান্নাতের দরজা দেখার সৌভাগ্য হতো।” হুজুর ﷺ বললেন: “أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي” (আবু বকর! জেনে রাখো যে, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি তুমিই হবে।) [৪]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি অনেক সম্পদশালী ছিলেন। তিনি চল্লিশ হাজার দিরহামের মালিক ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেন। [৫]

এই কারণেই আনহযরত ﷺ বলতেন: “مَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ” (আবু বকরের সম্পদ আমাকে যতটুকু উপকার দিয়েছে, অন্য কারো সম্পদ আমাকে ততটুকু উপকার দেয়নি।) [৬]

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিআল্লাহু আনহু ঘরের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য নিয়ে আসলেন। হুজুর আকরাম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন: “مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ” (পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?) আরজ করলেন: “أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ” (তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে রেখে এসেছি।) [৭]

খলিফা হওয়ার পরেও আপনার রাদিআল্লাহু আনহু বিনয় ও সরলতায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। তিনি নিজে দরিদ্র, বিধবা এবং...

---

[১] সুনান আত-তিরমিজি, হা: ৩৬৭০, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আবি বকর রাদিআল্লাহু আনহু, যয়ীফ সনদে।

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৬১, বাবু লাও কুনতু মুত্তাখিযান খলীলান।

[৩] সুনান আত-তিরমিজি, হা: ৩৬৫৬, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আবি বকর রাদিআল্লাহু আনহু।

[৪] সুনান আবু দাউদ, হা: ৪৬৫২, বাবু ফিল খুলাফা, যয়ীফ সনদে।

[৫] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৩৩, ত. নিযার।

[৬] সুনান আত-তিরমিজি, হা: ৩৬৬১, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আবি বকর রাদিআল্লাহু আনহু, সহীহ সনদে।

[৭] সুনান আবু দাউদ, হা: ১৬৭৮, কিতাবুজ জাকাত, বাবুর রুখসাতি ফী যালিকা, হাসান সনদে।

অভাবীদের সেবা করে তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। কারো ছাগলের দুধ দোহন করে দিতেন, কারো উট চরাতে নিয়ে যেতেন, কারো ঘরে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আসতেন। [১]

আল্লাহ তাআলার ভয় সর্বদা বিরাজমান থাকত, দুনিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র মন বসাতেন না, প্রতিটি মুহূর্তে আখেরাতের চিন্তা দিল ও মস্তিষ্কে ছেয়ে থাকত। কখনো বলতেন: "হায়, আমি যদি কোনো গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হতো।" [২] কখনো বলতেন: "হায়, আমি যদি কোনো মুমিনের শরীরের একটি পশম হতাম।" [৩] কখনো বলতেন: "হায়, আমি যদি কোনো ঘাস হতাম যা পশুরা খেয়ে ফেলত।" [৪]

**রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থাপনায় খোদাপ্রদত্ত দক্ষতা:**

এই আল্লাহভীতি, পরহেজগারী এবং বিনয় সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাজনৈতিক দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাজগুলো পূর্ণ উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতার সাথে পালন করতেন। এখানে তাঁকে সতর্কতা ও সজাগতার চরম শিখরে দেখা যায়। মদিনা মুনাওয়ারায় বসে তিনি দূর-দূরান্তের অঞ্চলের বিষয়গুলো এমনভাবে সামলাতেন যেন পুরো জাজিরাতুল আরব, ইরাক ও শাম তাঁর হাতের তালুতে আঁকা রয়েছে। ইরান থেকে শাম পর্যন্ত প্রতিটি পথ এবং প্রতিটি জনপদ তাঁর নজরে ছিল। কোন সেনাপতি কোথায় আছেন, শত্রুর গতিবিধি কোন দিকে এবং কত সৈন্য কোথা থেকে সরিয়ে কোথায় মোতায়েন করতে হবে, এ সবই তাঁর মস্তিষ্কে উপস্থিত থাকত। শত শত মাইল বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে যে লড়াই চলছিল, সেগুলোর মূল কমান্ড তাঁর হাতেই ছিল।

তিনি দ্রুততম সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের এমনভাবে সামনে বাড়াতেন এবং পেছনে সরাতেন যেমন দাবার ঘুঁটি পরিবর্তন করা হয়। তাঁর পক্ষ থেকে সামান্য পরিবর্তন যুদ্ধক্ষেত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিত। আরব-আজম এবং শাম-রোমের যুদ্ধে বেড়ে ওঠা বড় বড় সামরিক বিশেষজ্ঞদের মস্তিষ্ক সম্মিলিতভাবেও তাঁর পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার মোকাবিলা করতে পারত না। [৫]

**পরীক্ষার দৃঢ় মোকাবিলা:**

হযরত আবু বকর সিদ্দিক খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলো মোকাবিলা করা কারো সাধ্যের কথা ছিল না। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত থেকে স্থানান্তরিত বিশেষ ফয়জানের প্রভাব ছিল যে, আবু বকর সিদ্দিক এই সমস্ত বিপদে অবিচল ছিলেন। মদিনা মুনাওয়ারা অবরুদ্ধ হচ্ছিল, জাকাত দিতে অস্বীকার করা হচ্ছিল, ভণ্ড নবীরা বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছিল, গোত্রগুলো মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল, রোমান বাহিনী ধেয়ে আসার জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিকের ঈমানি শক্তি, অসাধারণ দৃঢ়তা এবং উত্তম কৌশলী পরিকল্পনা সমস্ত ফিতনার জোর ভেঙে দিয়েছিল। মুরতাদ, খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারী, ইরানি, আরব গোত্র এবং রোমান—সবাই মোকাবিলায় ছিল, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক দক্ষতার সামনে সবাই নবিশ প্রমাণিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এই অসাধারণ যোগ্যতাগুলো ছিল সেই নূরে নবুওয়াতের প্রভাব, যা পুরো উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবু বকর সিদ্দিক...

---

১. তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২৫, ৭৩, ত নজার

২. তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৮৬, ত নজার

৩. আয-যুহদ লি আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ৫০৬, ৫৮৩, ত আল-ইলমিয়্যাহ

৪. এর উদাহরণগুলো বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে যুদ্ধের বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

প্রথম অংশ

রাসূলুল্লাহ [সা.] যে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তাকে স্থায়িত্ব দান করা হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.]-এর এক মহান কীর্তি। তিনি জাজিরাতুল আরব এবং নববিজিত এলাকাগুলোকে দশটি অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশের জন্য নিজের পক্ষ থেকে একজন আমির নিযুক্ত করেন, যিনি শাসকের পাশাপাশি বিচারকের ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন।

হযরত আবু বকর [রা.] ইসলামী বাহিনীকে উন্নত বিন্যাসে সজ্জিত করেন। প্রতিটি রণাঙ্গনের জন্য তিনি বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করতেন, তারপর তাদের সবাইকে একজন প্রধান সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করতেন; এভাবে সংহতিও বজায় থাকত এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে অগ্রসর হওয়াও সহজ হয়ে যেত। [১]

সৈন্যদের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন ফসল ও বাগানের ক্ষতি না করে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অশক্তদের কষ্ট না দেয়, কারো প্রতি বাড়াবাড়ি না করে, ধোঁকা বা প্রতারণা না করে এবং জিজিয়া প্রদানকারীদের নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করে। [২]

এই নৈতিক গুণাবলীতে সজ্জিত ইসলামী বাহিনী যেখানেই পা রেখেছে, সাধারণ মানুষ তাদের অনুরাগী হয়ে পড়েছে।

**ইসলাম আগে, মুসলমান পরে:**

হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা.] তাঁর খিলাফতকালে কেবল রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর প্রতিনিধিত্বের হকই আদায় করেননি, বরং খিলাফতের দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড পেশ করেছেন। তিনি ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ), নবুওয়াতের দাবিদার এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের ফিতনার সময় যে ঐতিহাসিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন, তা খলিফা ও মুসলিম নেতাদের জন্য এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, বিপদ যতই চরম হোক না কেন, আকীদা ও ইসলামী বিধানে কোনো রদবদল করা হবে না এবং মূলনীতির ওপর কোনো আপস করা হবে না।

সংক্ষেপে, তিনি বিশ্ববাসীর জন্য “ইসলাম আগে এবং মুসলমান পরে”-এর এমন এক ধারা প্রবর্তন করে গেছেন, যার কারণে আজ পর্যন্ত ইসলাম তার সঠিক রূপে জীবন্ত ও বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১] আসরে খিলাফতে রাশিদা, ডক্টর আকরাম জিয়া উমারি, পৃষ্ঠা ৩৫৩ থেকে ৩৫৬। এছাড়া তারিখুত তাবারী এবং মাগাযীয়ে ওয়াকিদীতে বাহিনীর বিন্যাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করুন।

[২] মালিক ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর সিদ্দিক [রা.] শামের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের সাথে বের হন... এবং বলেন: “আমি তোমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি: কোনো নারী, শিশু বা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, জনপদ ধ্বংস করবে না, আহারের প্রয়োজন ব্যতীত ছাগল বা উট জবাই করবে না, খেজুর গাছ পুড়িয়ে দেবে না এবং তা পানিতে ডুবিয়ে দেবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং ভীরুতা প্রদর্শন করবে না।” (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস: ৯২৭, কিতাবুল জিহাদ, আন-নাহয়ু আন কাতলিন নিসা, পৃষ্ঠা ৩৭৭, মুয়াসসাসা জায়েদ বিন সুলতান আল-ইমারাত)।

তারীখে মিল্লাতে ইসলামিয়া

প্রথম খণ্ড

## হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু-এর খিলাফত

২৩ জমাদিউল আখিরা ১৩ হিজরী..... থেকে..... ১লা মহররম ২৪ হিজরী

(৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

https://t.me/BoierSomahar

## হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু

হযরত উমর ফারুক (রা.) কুরাইশ বংশের বনু আদি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনার পিতার নাম খাত্তাব বিন নুফাইল এবং মাতার নাম হানতামাহ বিনতে হাশিম। পিতা আদভী এবং মাতা মাখযুমী ছিলেন। [১] আপনার জন্ম হারবুল ফিজারের চার বছর পর হয়েছিল। [২] রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে 'আবু হাফস' কুনিয়াত (উপনাম) দিয়েছিলেন। হাফস অর্থ সিংহ, অর্থাৎ আপনি সিংহের মতো সাহসী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে 'ফারুক' উপাধি দিয়েছিলেন যার অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। [৩]

যদিও আপনার পিতা খাত্তাব আপনাকে শৈশবে উট চরাতে লাগিয়েছিলেন, তবুও আপনি পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন যা মক্কার খুব কম লোকই জানত। যৌবনে আপনি ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং আরবের বাইরেও সফর করেছিলেন, যার ফলে আপনি বিশ্বের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগে দূতিয়ালির (সিফাত) পদ আপনার কাছেই ছিল। [৪]

কুরাইশ বংশের লোকেরা শুরু থেকেই আপনার সাহস, ইচ্ছাশক্তি, যুদ্ধবিদ্যা, বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার ভক্ত ছিল। আপনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আপনার স্বভাবে আত্মমর্যাদাবোধ ও উদ্দীপনা প্রচুর ছিল। শরীর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও দীর্ঘকায়। যৌবনে আপনি ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনার যোগ্যতা ও গুণাবলির প্রেক্ষিতে আপনার হিদায়াতের জন্য বিশেষ দোয়া করেছিলেন যা কবুল হয়েছিল। [৫] হযরত উমর (রা.) সে সময় কমবেশি ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সী ছিলেন। [৬]

সেই সময় পর্যন্ত মাত্র চল্লিশজন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানরা প্রকাশ্যে নামাজ পড়তে পারতেন না, কিন্তু আপনি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই মুসলমানদের সাথে নিয়ে মসজিদে হারামে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করেন এবং কারো বাধা দেওয়ার সাহস হয়নি। হিজরতের সময় যখন কুরাইশদের অত্যাচারের ভয়ে সব মুসলমান গোপনে মদিনায় যাচ্ছিলেন, তখন হযরত উমর (রা.) কাফেরদের প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে মক্কা থেকে বের হন এবং বলেন, "কারো সাহস থাকলে আমার পথ আটকে দেখাক।" [৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর ঈমানি সাহসের প্রশংসা করে বলতেন: "নিশ্চয়ই শয়তান উমরকে দেখে ভয় পায়।" [৮]

---

[১] বংশলতিকা হলো: উমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উযযা বিন রিয়াহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরত বিন রাযাহ বিন আদি বিন কাব বিন লুয়াই। কাব-এর নিকট আপনার বংশ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মিলে যায়। কাব-এর এক ছেলে মুররাহ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধারা এবং দ্বিতীয় ছেলে আদি থেকে হযরত উমর (রা.)-এর বংশধররা জন্ম নেন। (তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ২/৫৩)

[২] আল-ইসতিয়াব: ১১৫৩/৩।

[৩] মিরকাতুল মাফাতিহ লি-মোল্লা আলী আল-কারী: ৪০/১, দারুল ফিকর।

[৪] আল্লাহুম্মা আইয্যাল ইসলামা বি-আহাব্বিল হাযাইনির রাজুলাইনি ইলাইকা বি-আবি জাহল আও বি-উমারা বিন আল-খাত্তাব, ওয়া কানা আহাব্বুহুমা ইলাইহি উমারা (সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৬৮১)।

[৫] আপনি ৬ হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ২/৩৭৪) এবং নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী আপনার বয়স ছিল ২৮ বা ২৯ বছর। (তাহযীবুত তাহযীব: ৭/৪৪১)। এই হিসেবে ৬ হিজরিতে আপনার বয়স ২৮ বছরই হয়। যদিও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ২৬ এবং ৩৩ বছরের বর্ণনাও রয়েছে। একইভাবে এক বর্ণনা অনুযায়ী শাহাদাতের বয়স ৬৩ বছর, তবে এটি বিতর্কিত।

[৬] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৯৩।

[৭] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২২৯৮৯।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন:
“وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ”
(সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শয়তান যদি তোমাকে কোনো পথে চলতে দেখে, তবে সে সেই পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করে।) [১]

হযরত উমর (রা.)-এর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের বিশেষ উপদেষ্টা বানিয়েছিলেন। আপনার কন্যা হযরত হাফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহে ছিলেন, সেই সুবাদে শ্বশুর হওয়ার খাতিরে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক বিষয়াবলি দেখাশোনা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক বিষয়ে আপনার মতামতের অনেক গুরুত্ব ছিল।

হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের সমস্ত যুদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে আপনি খলিফার ডান হাত এবং নিকটতম উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আপনার মধ্যে নেতৃত্বের এমন গুণাবলি সৃষ্টি করেছিলেন যা উম্মতের অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বলেছিলেন: “لَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ”
(আমি মানুষের মধ্যে এমন কোনো প্রতিভাবান দেখিনি যে তাঁর মতো কাজ করতে পারে।) [৩]

হযরত উমর (রা.) দ্বীনি জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং ফিকহ শাস্ত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আপনার থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭টি। আপনিই প্রথম খলিফা যাঁকে ‘আমীরুল মুমিনীন’ উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

আপনার আংটিতে খোদাই করা ছিল: “كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا” (উপদেশ হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট)। [৪]

মদিনা মুনাওয়ারার শাসন ব্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আপনি কাজীর (বিচারক) দায়িত্ব পালন করতেন এবং আপনি আপনার গভীর জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের ফয়সালা করতেন। আপনি সেই সাহাবী ছিলেন যাঁর প্রস্তাব ও পরামর্শকে অনেকবার আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে সমর্থন করেছেন। অনেকবার এমন হয়েছে যে আপনার মনে যা এসেছে, কুরআন মজিদের আয়াত সে অনুযায়ী নাযিল হয়েছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে নিজের উম্মতের সেই বিশেষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতেন যাঁর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য কথা ঢেলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ”
“আল্লাহ তাআলা উমরের জিহ্বা ও অন্তরে সত্য ও সততাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।” [৫]

একবার বললেন: “لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرُ”
“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে মুহাদ্দাস (যাঁদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হয়) ব্যক্তিরা ছিলেন। যদি আমার উম্মতে এমন কেউ থাকে, তবে সে হলো উমর।” [৬]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩২৯৪; কিতাবুল মানাকিব; সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৯৫; ফাযায়েলুস সাহাবা; দারুল জীল।

[২] তারিখুল খুলাফা, পৃ: ৯৫ থেকে ১০১; তিবরায।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৯৩; ফাযায়েলুস সাহাবা; ফাযায়েলু উমর (রা.); দারুল জীল।

[৪] আল-ইসাবাহ: ২/৩০৭।

[৫] আল-ইসতিয়াব: ৩/১১৫৩।

[৬] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৬৮২; মানাকিবে উমর (রা.); সনদ সহীহ।

[৭] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৮৯; কিতাবুল মানাকিব; মানাকিবে উমর (রা.)।

মুহাদ্দিস বলতে এমন মানুষকে বোঝায় যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সঠিক কথা ঢেলে দেওয়া হয় এবং তারপর তা অন্যদের কাছে পৌঁছায়। হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক (রা.) এই গুণে ভূষিত ছিলেন, এজন্যই তাঁর মতের সমর্থনে কুরআন মাজীদের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। [১] তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনের জন্য এই হাদীসটিই যথেষ্ট: "যদি আমার পরে কোনো নবী হতো, তবে উমর বিন খাত্তাব হতো।" [২]

সংক্ষেপে, হযরত উমর ফারুক (রা.) যখন এই গুণাবলীতে ভূষিত হয়ে খিলাফতের মসনদে আসীন হলেন, তখন ইসলামী বিজয়ের প্লাবন পূর্ব ও পশ্চিমকে নিজের কব্জায় নিতে শুরু করল।

## ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ

ফারুকে আযম (রা.)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত প্রথম বড় যুদ্ধ ছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধ, যা রোমানদের প্রতিরোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল এবং তাদের রাজধানী হিমস পর্যন্ত বিজয়ের পথ সহজ করে দিয়েছিল।

ইয়ারমুকের এই প্রথম যুদ্ধটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকালের মাত্র চৌদ্দ দিন পর সংঘটিত হয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানদের কাছে তাঁর ইন্তেকালের খবর পৌঁছায়নি। [৩]

---

[১] ইমাম সুয়ূতী 'মুওয়াফাকাত-এ-উমর' (রা.) শিরোনামে এর নজিরসমূহের ওপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন এবং ২০টি নজির গণনা করেছেন। (তারিখুল খুলাফা, পৃ. ৯৯-১০৩)

[২] সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৬৮৬, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিব উমর (রা.)।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৫-৭, দার হিজর।

- দ্রষ্টব্য ১: হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় নিয়ে কারো কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, তা কি এর আগে হয়েছিল? এ বিষয়ে একটি বিভ্রান্তি এই যে, আজনাইন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধ কি একই, কারণ উভয় যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্ব ও রোমানদের রণকৌশল প্রায় একই রকম ছিল। কিন্তু সঠিক কথা হলো আজনাইনের যুদ্ধ আলাদা এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধ আলাদা। আজনাইনের যুদ্ধ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শেষ দিনগুলোতে হয়েছিল এবং যুদ্ধের পর ফারুকী খিলাফতের সময় তাঁর ইন্তেকালের খবর পৌঁছেছিল। উভয় যুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লড়া হয়েছিল।

- দ্রষ্টব্য ২: ইয়ারমুক যুদ্ধের বিবরণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য রয়েছে। তাবারী, ইবনুল আসীর জাযারী এবং হাফিজ ইবনে কাসীর প্রমুখ একে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ১৩ হিজরীর জমাদিউল আখিরাতে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনে ইসহাক, আযদী এবং খলীফা বিন খাইয়াত প্রমুখ একে ১৫ হিজরীর রজব মাসে উল্লেখ করেছেন।

এর বাইরে আরও অনেক মতপার্থক্য রয়েছে; যেমন যুদ্ধে কেন্দ্র থেকে কোনো নির্দেশনা পৌঁছেছিল কি না। কিছু বর্ণনায় আছে যে, যুদ্ধ হঠাৎ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং কোনো নির্দেশনা পৌঁছায়নি, আবার কিছু বর্ণনায় আছে যে, এটি উভয় পক্ষ থেকে দীর্ঘ পরিকল্পিত যুদ্ধ ছিল। কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এই যুদ্ধ সিরিয়ার সীমান্ত দুর্গসমূহ বিজয়ের পর শুরু হয়েছিল; আবার কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এটি দামেস্ক এবং রোমানদের রাজধানী হিমস বিজয়ের পর হয়েছিল। কিছু বর্ণনা বলে যে, বাহিনীর সেনাপতিরা আলাদা আলাদা ছিলেন, যারা নিজ নিজ বাহিনীকে একত্রিত করে যুদ্ধ করেছিলেন; আবার কিছু বর্ণনায় আছে যে, খিলাফতের পক্ষ থেকে একজন আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিছু বর্ণনায় আছে যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নিজেই নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, আবার কিছু বর্ণনায় আছে যে, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.)-কে খিলাফতের পক্ষ থেকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হযরত খালিদ (রা.) তাঁর অধীনে ছিলেন। সংক্ষেপে, এই যুদ্ধের বর্ণনার খুঁটিনাটি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এগুলোই কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য যা গবেষকদের জন্য চিন্তার বিষয়। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ কেবল বর্ণনাগুলোই উদ্ধৃত করতেন। পাঠ্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং গবেষণা তাদের লক্ষ্য ছিল না; তাই এই সমস্যাটি আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আল্লামা শিবলী মরহুম ১৫ হিজরীর মতটি গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য বর্ণনাগুলোকে একেবারেই উপেক্ষা না করা জরুরি মনে করেছেন।

যেখানে লেখক চিন্তা করেছেন তাতে মনে হয় যে, ইয়ারমুকের ময়দানে দুটি যুদ্ধ লড়া হয়েছিল এবং উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটি যুদ্ধ ১৩ হিজরীতে এবং দ্বিতীয়টি ১৫ হিজরীতে হয়েছিল। প্রথমটিতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সেনাপতি ছিলেন এবং দ্বিতীয়টিতে হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) সেনাপতি ছিলেন। এভাবে বর্ণনার সমস্ত মতপার্থক্য নিজে থেকেই দূর হয়ে যায় এবং সমস্ত যোগসূত্র একে অপরের সাথে মিলে যায়। এই পৃষ্ঠাগুলোতে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করেই ঘটনাবলী লেখা হচ্ছে।

ইয়ারমুকের ময়দানে সিরিয়ার রণাঙ্গনের সমস্ত মুসলমান একত্রিত হয়েছিলেন, যাদের মোট সংখ্যা ছিল ছত্রিশ হাজার। তাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস, হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান এবং হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা.)-এর প্রত্যেকের কাছে সাত-সাত হাজার সৈন্য ছিল। হযরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহল (রা.)-ও ছয় হাজার লোক নিয়ে সিরিয়ার সেই মহাসড়কে মোতায়েন ছিলেন যেখান থেকে রোমানদের হামলার আশঙ্কা ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে আসা নয় হাজার সৈন্যের সাথে মিলিত হওয়ার পর মুজাহিদদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার হয়েছিল। অন্যদিকে রোমানরা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবিলার জন্য চলে এসেছিল। তারা পরিখা খননের মাধ্যমে নিজেদের শিবির ও অবস্থানকে সুরক্ষিত করে নিয়েছিল।

এখন পর্যন্ত মুসলমানদের সমস্ত সেনাপতি নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত ছিলেন এবং তাদের ধারণা ছিল যে, তারা এভাবেই নিজ নিজ বাহিনীর স্বতন্ত্র রূপ বজায় রেখে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর দূরদর্শী দৃষ্টি বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহ পরিণাম আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে পরামর্শের সময় তাদের সম্বোধন করে বললেন:

“রোমানদের সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ বাহিনীর মোকাবিলায় এভাবে আলাদা আলাদা বাহিনীর রূপ বজায় রেখে যুদ্ধ করা সঠিক নয়। খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর (রা.) এই বিন্যাস কেবল এজন্য করেছিলেন যাতে আমরা সহজে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে পারি। যদি তিনি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানতেন, তবে তিনি আমাদের একটি বাহিনীর রূপ দিতেন। আমাদের এই বিন্যাস শত্রুর কাজ সহজ করে দেবে এবং আমাদের কঠিন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।”

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন: “ঠিক আছে, আপনিই বলুন এখন কী করা উচিত?”

হযরত খালিদ (রা.) বললেন:
“আমরা এক বাহিনী হয়ে একজন আমিরের অধীনে যুদ্ধ করব। হ্যাঁ, নেতৃত্বের সুযোগ সবাইকে দেওয়া উচিত। একদিন একজন আমির হবেন, অন্যদিন অন্যজন। আর আপনারা যদি অনুমতি দেন, তবে আজ প্রথমে আমাকে আমির নিযুক্ত করুন।”

হযরত খালিদ (রা.) এই অনুরোধ এজন্য করেছিলেন যে, তিনি রোমানদের যুদ্ধকৌশল বুঝে তার পাল্টা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছিলেন। সবাই সানন্দে তাকে নেতৃত্বের অনুমতি দিলেন।

পরের দিন যখন উভয় বাহিনী ময়দানে নামল, তখন রোমানদের কাতারবন্দি বা বিন্যাস এমন শান-শওকতের ছিল যা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যেত। কিন্তু অন্যদিকে যখন মুসলমানদের সারির ওপর নজর পড়ত, তখন বিশ্বাসই হতো না যে এটি জাজিরাতুল আরবের কোনো বাহিনী।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তার সামরিক পরিকল্পনার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী বাহিনীকে ছত্রিশটি অংশে বিভক্ত করে তাদের আলাদা আলাদা সারি গঠন করেন। এর আগে আরবদের কোনো বাহিনী এমন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে ময়দানে নামেনি। মাঝখানে ষোলোটি দল রাখা হয়েছিল এবং সেখানে হযরত আবু উবাইদা (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল। দশটি দল ডান দিকে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং হযরত শুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা.)-এর নেতৃত্বে এবং দশটি দল বাম দিকে...

হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর কমান্ডে দিলেন। তারপর লশকর থেকে সাহসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্বাচন করে প্রতিটি দলের জন্য একজন আলাদা অফিসার নিযুক্ত করলেন। হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি কুরআন মাজিদের আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে মুসলমানদের আত্মাকে উজ্জীবিত করেন। হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে সিরাত ও হাদিসের ঘটনাবলী শোনানোর জন্য নিযুক্ত করা হলো যাতে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। [১]

যুদ্ধের আগে কোনো এক মুসলমানের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল: "রোমানরা কত বেশি আর আমরা কত কম!!"

হযরত খালিদ (রা.) তা শুনে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে বললেন:

"না, এই রোমানদের জন্য এই মুসলমানরা অনেক বেশি এবং এতজন মুসলমানের জন্য এই রোমানরা অনেক কম। যে লশকর আল্লাহর সাহায্য লাভ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই বেশি হয়। আর যে তা লাভ করে না, সে যেভাবেই হোক কমই প্রমাণিত হয়। আল্লাহর কসম! আজ যদি আমার ঘোড়া সুস্থ থাকত, তবে রোমানরা এর দ্বিগুণ হলেও আমি পরোয়া করতাম না।"

যুদ্ধের দামামা বাজার উপক্রম হয়েছিল, এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রোমানদের সেনাপতি জর্জ (জারজাহ) ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এল এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে কথা বলতে চাইল। হযরত খালিদ (রা.)-ও এগিয়ে গেলেন।

জর্জ জিজ্ঞেস করল: "খালিদ! সত্য করে বলো, আল্লাহ কি তোমাদের নবীর ওপর আসমান থেকে কোনো তলোয়ার নাজিল করেছিলেন যা তিনি তোমাকে দিয়েছেন, যার কারণে তোমরা প্রতিটি যুদ্ধে বিজয়ী হও?"

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) নেতিবাচক উত্তর দিলে জর্জ জিজ্ঞেস করল:

"তাহলে তোমাকে আল্লাহর তলোয়ার কেন বলা হয়?"

হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বললেন:

"দেখো, এক সময় আমিও নবী আকরাম (সা.)-এর বিরোধী ছিলাম। আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, কিন্তু তারপর আল্লাহ তাআলা আমাকে হেদায়েত দিলেন, আমি আপনার অনুসরণ করলাম, তখন আপনি আমাকে বললেন যে তুমি আল্লাহর তলোয়ার, যা আল্লাহ কাফেরদের ওপর উন্মুক্ত রেখেছেন। হুজুর (সা.) আমার জন্য আল্লাহর সাহায্যের দোয়াও করেছিলেন।"

জর্জ, যে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে এই কথাগুলো শুনছিল, বলল: "আমাকে বলো, তিনি তোমাদের কিসের দিকে আহ্বান করতেন?"

হযরত খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন: "তিনি বলতেন ইসলাম গ্রহণ করো, অথবা জিজিয়া দাও, অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো।"

এটি শুনে জর্জ জিজ্ঞেস করল: "যে এই পয়গাম গ্রহণ করে তোমাদের দলে শামিল হবে, তার মর্যাদা কী হবে?"

হযরত খালিদ (রা.) বললেন: "সে আমাদের মতোই এবং সমমর্যাদার হবে, বরং একদিক থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। কারণ আমরা নবী আকরাম (সা.)-কে এবং তাঁর মুজিজা ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছি, অথচ তুমি তা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করছ, তাই তোমার মাকাম আমাদের চেয়েও উঁচুতে হবে।"

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৫৩৫, দার হিজর

এটি শুনে জর্জ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সাথে নিজের জাতির বিরুদ্ধে তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। [১]

অবশেষে লড়াই শুরু হলো এবং উভয় পক্ষের সৈন্যরা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সারাদিন যুদ্ধ চলতে থাকল। এই সময়ে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এক দ্রুতগামী বার্তাবাহক এল এবং এসেই সংবাদ দিল যে, হযরত আবু বকর ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর স্থলে হযরত উমর আমিরুল মুমিনিন নিযুক্ত হয়েছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ সমস্ত মুসলমানের সেনাপতি হবেন।

হযরত খালিদ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই সংবাদ শুনলেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত এটি গোপন রাখার ব্যবস্থা করলেন, কারণ খলিফার মৃত্যুতে মুসলমানদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়তে পারত এবং সেনাপতি পরিবর্তনের ফলে যুদ্ধের পুরো নকশা ওলটপালট হয়ে যেতে পারত।

যুদ্ধের সময় এমন এক মুহূর্ত এল যখন রোমানরা মুসলমানদের হঠাতে হঠাতে তাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এই সময়ে হযরত ইকরিমা বিন আবি জাহল চিৎকার করে বললেন: “আমি রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বহুবার লড়েছি, আজ পরীক্ষার সময়, ইসলাম গ্রহণের পর আজ যখন কুরবানি দেওয়ার দিন এল, তখন কি আমি পালিয়ে যাব?”

তারপর গর্জন করে বললেন: “কে আছ যে মৃত্যুর ওপর বায়াত করে আমার সাথে যাবে?”

চারশ মুজাহিদ তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন। হযরত ইকরিমা এবং তাঁর চাচা হযরত হারিস বিন হিশাম (আবু জাহলের ভাই) এই মুজাহিদদের নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের নিজেদের তাঁবু থেকে পেছনে হঠিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধে হযরত জুবায়ের বিন আওয়াম এবং তাঁর তেরো বছর বয়সী পুত্র আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরও শরিক ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের বলেন:

“অল্প বয়সের কারণে আমি যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, তবে আমার আব্বার সাথে ময়দানে গিয়েছিলাম। আমি দেখতাম যে আবু সুফিয়ান বিন হারবসহ কুরাইশদের বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ একটি টিলার ওপর চড়ে মুসলমানদের উৎসাহিত করছেন। যখন মুসলমানরা পিছু হটত, তখন তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনে আবার কদম জমিয়ে নিত।” [২]

হযরত খালিদ এবং নওমুসলিম জর্জও বীরত্বের সাথে লড়লেন। যুদ্ধের তীব্রতার কারণে মুসলমানরা জোহর ও আসরের সালাত ইশারায় আদায় করলেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। অবশেষে সন্ধ্যার সময় রোমানদের সাহস দুর্বল হতে শুরু করল এবং তারা পিছু হটতে লাগল। তখন হযরত খালিদ শত্রুর মূল বাহিনীর ওপর এক জোরালো আক্রমণ করে তাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর কাতার ওলটপালট করে দিলেন। রোমানরা পালাতে গিয়ে নিজেদের পরিখায় পড়তে লাগল। মুসলমানরা তাদের লাশের স্তূপ বানিয়ে দিল।

বিশ হাজার রোমান ময়দানে নিহত হলো। মুসলমানদেরও ক্ষয়ক্ষতি হলো। হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব, যিনি যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাহস জোগানোর দায়িত্ব পালন করছিলেন, তীরের আঘাতে তাঁর একটি চোখ হারালেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নওমুসলিম জর্জ বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করলেন। ইকরিমা এবং তাঁর...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে

ইকরিমাহ বিন আবু জাহল মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। বিজয়ের পরের দিন ভোরে তাঁর শেষ নিঃশ্বাসও ওষ্ঠাগত ছিল। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের মাথা নিজের কোলে রাখলেন এবং পরম মমতায় তাঁদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাপ-বেটা উভয়েই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জান-আফরিনের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আরদাহুম।

**হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু... ইসলামের প্রথম প্রধান সেনাপতি:**

যুদ্ধের শেষ দিনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের খবর পান। তিনি সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখার জন্য একে গোপন রাখেন। সেই সন্ধ্যায় যখন হাঙ্গামা থেমে গেল, তখন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের এই সংবাদ দিলেন এবং সেই সাথে জানালেন যে, নতুন খলিফা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার সমস্ত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিযুক্ত করেছেন। এর অর্থ ছিল এই যে, এখন থেকে সমস্ত অভিযানে প্রধান অফিসার হবেন হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত খালিদ, হযরত আমর ইবনুল আস, হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং অন্যান্যরা তাঁর নির্দেশনায় চলবেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে থেকে এমন কোনো বিন্যাস নির্ধারণ করেননি যে, যখন বাহিনীগুলো এক জায়গায় হবে তখন প্রধান সেনাপতি কে হবে। এটাই কারণ ছিল যে, ইয়ারমুকের এই প্রথম যুদ্ধে মুসলমানদের নিজেদের পরামর্শে কেন্দ্রীয় কমান্ড হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি অভিযান এবং প্রতিটি নতুন যুদ্ধের আগে নতুন করে কেন্দ্রীয় কমান্ডার নির্বাচন করা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারত, তাই হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আমির নিযুক্ত করেন। কথা রয়ে যায় যে, যখন সামরিক বিষয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার চেয়ে সফল প্রমাণিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁকে কেন স্থায়ীভাবে প্রধান সেনাপতি করা হলো না? এর কারণ এই মনে হয় যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ সামরিক ব্যক্তিত্ব; তাঁর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল না। অন্যদিকে হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। যেহেতু এখন অভিযানের ধরন বদলে গিয়েছিল এবং যুদ্ধের সাথে সাথে বিজিত শহরগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বও সামনে আসছিল, তাই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্বাচন করেছিলেন, যা সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

এখানে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইখলাস এবং শৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করতে হয় যে, নিজের অতুলনীয় সামরিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি খিলাফতের নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেন এবং হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আনুগত্য গ্রহণ করে নেন।

**গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা:**

কিছু ঐতিহাসিক ১৩ হিজরিতে পদমর্যাদার এই পুনর্গঠনের আদেশকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অপসারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা সঠিক নয়। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই সিদ্ধান্ত হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সমস্ত কমান্ডারদের হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধীনে করার সাথে সম্পর্কিত ছিল। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অপসারিত করা হয়নি, বরং তিনি যথারীতি তাঁর বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৫৭, দার হিজর।

তাঁর অপসারণের ঘটনাটি ১৭ হিজরির, যা সামনে আসবে।

যেহেতু হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) 'আল্লাহর তলোয়ার'-এর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, তাই তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর যোগ্যতাকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগান এবং অধিকাংশ যুদ্ধে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করেন।

**দামেস্ক বিজয়:**

ইয়ারমুকের যুদ্ধ থেকে অবসর নেওয়ার পর হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং সিরিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর দামেস্কে পৌঁছান। তিনি এক দিক থেকে নিজেই অবরোধ করেন, অন্য দিকের অবরোধের দায়িত্বে হযরত খালিদ (রা.)-কে নিযুক্ত করেন এবং তৃতীয় দিকে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। এই ঐতিহাসিক শহরের প্রাচীর অত্যন্ত মজবুত ছিল, মুসলমানরা অনেক দিন বাইরে অবস্থান করেন। উভয় পক্ষ থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ চলতে থাকে। হেরাক্লিয়াস দামেস্কবাসীদের সাহায্যের জন্য সিরিয়ার রাজধানী হিমস থেকে সাহায্য পাঠান, কিন্তু হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) পথ অবরোধ করে রেখেছিলেন, ফলে দামেস্কে কোনো সাহায্য পৌঁছাতে পারেনি।

একদিন শহরবাসী কোনো উৎসব উদযাপনে মগ্ন ছিল, সেই সুযোগে হযরত খালিদ (রা.) কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকের সাথে রশির সাহায্যে প্রাচীরে আরোহণ করেন এবং প্রাচীরের দরজা খুলে বাহিনীকে ভেতরে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন। শহরবাসী এই অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ অন্য দিকের দরজা খুলে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সন্ধির কিছু শর্ত পেশ করে। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর অভিযান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি শর্তগুলো গ্রহণ করে নেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে শহরে প্রবেশ করেন। যখন তাঁরা চকে পৌঁছান, তখন দেখেন যে অন্য দিক থেকে হযরত খালিদ (রা.) প্রতিরোধকারী রোমানদের পরাজিত করতে করতে এগিয়ে আসছেন। তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, শহরের এক দিক তলোয়ারের জোরে বিজিত হয়েছে এবং অন্য দিক সন্ধির মাধ্যমে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, যেহেতু হযরত খালিদ প্রথমে শক্তির জোরে যুদ্ধ করে শহরে প্রবেশ করেছেন, তাই আমরা শহরবাসীদের কোনো শর্ত মানতে বাধ্য নই। অন্য ব্যক্তিবর্গ বললেন যে, আমির হলেন আবু উবাইদাহ, তিনি শর্ত মেনে শহরে পা রেখেছেন, তাই সন্ধির শর্তগুলো বহাল থাকবে। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অর্ধেক শহরের ব্যবস্থাপনা হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী হবে এবং বাকি অর্ধেক তলোয়ারের জোরে বিজিত বলে গণ্য হবে। [১]

আল্লামা বালাজুরি (রহ.)-এর মতে, দামেস্কের অবরোধ ১৪ হিজরির মহরম মাসে শুরু হয়েছিল এবং বিজয় অর্জিত হয়েছিল রজব মাসে। [২]

দামেস্ক বিজয়ের পর হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় শহরগুলো জয় করতে বেরিয়ে পড়েন। এই বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সেনাপতি ছিলেন তাঁর ভাই হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.), যিনি এই বিজয়গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। "গাজা" শহরটি তিনি নিজেই জয় করেন। এটিই ছিল প্রথম সুযোগ যখন তাঁর নেতৃত্বে...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৫৮৫, দার হিজর।

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১২৩, ১২৬, মাতবাআতুল হিলাল।

জাওহার খুল্লা, সাইদা, জুবাইল এবং বৈরুতও এই অভিযানের সময় বিজিত হয়। [১]

**ফাহলের যুদ্ধ**

দামেস্ক বিজয়ের ফলে রোমানরা চরম আঘাত পেয়েছিল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা তাদের বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে একত্রিত করল যাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার এবং জর্ডানের "বাইসান" এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করল। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) তাদের প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হলেন এবং তাদের সামনে ফাহলের সমতল ভূমিতে তাবু ফেললেন। রোমানরা ভীত হয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিলে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে পাঠালেন। রোমানরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের সেনাপতির তাবুতে নিয়ে গেল, যেখানে দামী কার্পেট বিছানো ছিল। হযরত মুয়াজ (রা.) কার্পেট এড়িয়ে মাটিতে বসলেন। রোমানরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমি এমন কার্পেটে বসা পছন্দ করি না যা গরীবদের হক নষ্ট করে তৈরি করা হয়েছে।"

তারা বলল: "আমরা তো আপনার সম্মান করতে চেয়েছিলাম।"

তিনি বললেন: "তোমরা যাকে সম্মান মনে করো আমার তার প্রয়োজন নেই। আর যদি মাটিতে বসা গোলামদের কাজ হয়, তবে নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর গোলাম। তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তবে বলো, অন্যথায় আমি ফিরে যাচ্ছি।"

তারা বলল: "আমরা কারণ জানতে চাই যে, তোমরা হাবশা এবং পারস্য ছেড়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে কেন এসেছ? অথচ আমাদের রাজত্ব সবচেয়ে বড়, আমাদের সৈন্য সংখ্যা আকাশের নক্ষত্র এবং বালুকণার মতো।"

হযরত মুয়াজ (রা.) উত্তর দিলেন: "আমাদের আসার কারণ হলো আল্লাহ আমাদের নিজেদের সীমানা সংলগ্ন দেশগুলোর সাথে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের প্রস্তাব হলো তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। আমাদের ভাই হয়ে যাবে। যদি এটি মঞ্জুর না হয় তবে জিজিয়া দিয়ে আমাদের নিরাপত্তায় চলে এসো। এটিও কবুল না করলে তলোয়ারের মাধ্যমে ফয়সালা হবে। আর এই কথা যে তোমাদের বাদশাহ বড় এবং সৈন্য সংখ্যা অনেক, তবে শুনে রাখো আমাদের বাদশাহ হলেন আল্লাহ এবং আমাদের শাসক আমাদেরই মতো একজন মানুষ যিনি কোনো বিষয়েই শ্রেষ্ঠ নন। যদি তিনি কুরআন ও সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেন তবে পদে বহাল থাকবেন অন্যথায় তাঁকে অপসারিত করা হবে। ব্যভিচার করলে তাঁর ওপরও হদ জারি হবে। চুরি করলে তাঁরও হাত কাটা হবে। তিনি কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকেন না। নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করেন না।"

রোমানরা এটি শুনে অবাক হয়ে গেল এবং হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে আলোচনার জন্য তাদের দূত পাঠাল। সে যখন ইসলামী সৈন্যশিবিরে পৌঁছাল তখন হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) মাটিতে বসে তীরগুলো বাছাই করে দেখছিলেন। দূত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল যে সেনাপতি কে। কিছুই বুঝতে পারল না, কারণ সবাইকে একই রকম মনে হচ্ছিল। অবশেষে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল:

"তোমাদের আমির কোথায়?"

জানানো হলো যে ইনিই লস্করের আমির, তখন সে হতভম্ব হয়ে গেল। অবশেষে সে তার আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে বলল:

"আমাদের সরকার আপনাদের মাথাপিছু দুটি করে আশরাফি দেবে। আপনারা ফিরে যান।"

---

(১) আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করলেন কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা, সম্পদ আহরণ করা নয়। [১]

অবশেষে রোমানরা মোকাবিলার জন্য কাতারবদ্ধ হলো এবং যুল-কাদাহ ১৩ হিজরি (৬৩৫ খ্রি.) সনে ফাহল-এর ময়দানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবু উবাইদাহ এবং বাম বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)। পদাতিক বাহিনীর আমীর ছিলেন হযরত ইয়াদ বিন গানাম এবং অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত যিরার বিন আযওয়ার (রা.)। এক কঠিন যুদ্ধের পর এখানেও রোমানরা পরাজিত হলো এবং মুসলমানরা এই এলাকাটি দখল করে নিল। [২]

হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর কাছে বিজয়ের সংবাদ পাঠালেন এবং জানতে চাইলেন যে স্থানীয় লোকদের সাথে কী আচরণ করা হবে? হযরত উমর (রা.) নির্দেশ পাঠালেন যে প্রজাদেরকে যিম্মি হিসেবে গণ্য করা হোক এবং জমি আগের মতোই জমিদারদের কাছে থাকতে দেওয়া হোক।

ফাহল-এর যুদ্ধের পর জর্ডানের সমস্ত এলাকা সহজেই বিজিত হলো। প্রতিটি স্থানে সন্ধির শর্তাবলীতে এটি স্থির করা হলো যে স্থানীয় লোকদের জান-মাল, ঘরবাড়ি, স্থাবর সম্পত্তি এবং উপাসনালয়সমূহ সব নিরাপদ থাকবে; মুসলমানরা কেবল মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জমি গ্রহণ করবে। [৩]

**বাইজেন্টাইন রাজধানী হিমস অবরোধ:**

সিরিয়ায় এখন মাত্র তিনটি বড় শহর বাকি ছিল। সবার আগে ছিল হিমস, যা ছিল কায়সারের এশীয় রাজধানী; এরপর ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস, যা ধর্মীয় দিক থেকে সবচেয়ে মহিমান্বিত শহর ছিল; উত্তরে ছিল আনতাকিয়া, যেখানে কায়সার সেই দিনগুলোতে অবস্থান করছিলেন। ইসলামী লশকর পথে বালবাক-এর ঐতিহাসিক শহর জয় করে “হিমস”-এর সামনে গিয়ে থামল। এটি ছিল প্রচণ্ড শীতের দিন, কিন্তু মুসলমানরা অবরোধে ক্লান্ত হলো না। শীতের তীব্রতা এমন ছিল যে সাধারণ মানুষের হাত-পা অবশ হয়ে যেত। রোমানদের মধ্যে এমন কত লোক ছিল যারা মোজা এবং গরম জুতো পরা সত্ত্বেও চলাফেরা করতে সক্ষম ছিল না; কারো আঙুল অকেজো হয়ে যেত, কারো হাত-পা। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সাধারণ পোশাক এবং সাধারণ জুতো পরে আবহাওয়ার কঠোরতা সহ্য করতে থাকলেন এবং তাঁদের কারো কোনো ক্ষতি হলো না।

যখন অবরোধ দীর্ঘায়িত হলো, তখন একদিন সাহাবায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিলেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। সেই সাথে হিমস-এর সুউচ্চ অট্টালিকাগুলোতে এমন কম্পন সৃষ্টি হলো যে অনেক দেয়ালে ফাটল দেখা দিল। শহরবাসী এটি দেখে কেঁপে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ শহরটি মুসলমানদের হাতে তুলে দিল। [৪]

---

[১] ফুতুহুল শাম, আবু ইসমাইল আল-আযদি, পৃ. ৯৫ থেকে ১০৯, ত. কলকাতা।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৫৮৯।

[৩] ফুতুহুল শাম, আবু ইসমাইল আল-আযদি, পৃ. ১২২, ১২৩।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৬৩৯, দার হিজর।

## ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ

ফাহল, দামেস্ক এবং হিমস থেকে পরাজিত হয়ে পলায়নকারী রোমান অফিসাররা হেরাক্লিয়াসের কাছে আন্তাকিয়ায় একত্রিত হয়েছিল। [১] হেরাক্লিয়াস, যিনি কয়েক বছর আগে নবী করীম (সা.)-এর পত্র পড়েছিলেন, তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে তাঁর জাতির নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে গেছে এবং দ্বীন-এ-আহমদ (সা.)-এর বীরদের পথ রোধ করা সম্ভব নয়। তিনি আবারও একবার তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং বললেন: "আরবদের সাথে যুদ্ধ এখন নিরর্থক। তোমরা যদি আমার কথা মানো তবে তাদের সাথে সন্ধি করে নাও। এভাবে অন্তত এশিয়া মাইনরের এলাকাগুলো আমাদের কাছে থেকে যাবে; কিন্তু মনে রেখো, যদি তোমরা যুদ্ধ করতে চাও তবে সিরিয়া দখলের পর আরব বাহিনী এশিয়া মাইনরের পাহাড় পর্যন্ত আমাদের পিছু ধাওয়া করবে।"

কিন্তু রোমান অফিসাররা হেরাক্লিয়াসের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে জেদ ধরল যে যেভাবেই হোক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। [২] তখন হেরাক্লিয়াস জাতীয় মর্যাদার খাতিরে কনস্টান্টিনোপল, এশিয়া মাইনর, আল-জাজিরা এবং আরমেনিয়াসহ সমস্ত এলাকা থেকে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে নতুন সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। শীঘ্রই খুব বড় আকারে রোমান বাহিনী আন্তাকিয়ায় পৌঁছাতে শুরু করল। রোমানদের মধ্যে এমন উন্মাদনা ছিল যে গির্জার পাদ্রী এমনকি দুনিয়াত্যাগী সন্ন্যাসীরাও, যারা কখনও তাদের নির্জন উপাসনালয় থেকে বের হয়নি, এই সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বেরিয়ে পড়ল। পূর্ণ প্রস্তুতির পর এই পঙ্গপালের মতো বিশাল বাহিনী দক্ষিণের দিকে যাত্রা করল যেখানে মুসলমানরা তাদের পতাকা উড়িয়েছিল। [৩]

আল্লামা আযদী, সিরিয়া বিজয়ের যুদ্ধগুলোর বর্ণনায় যার বর্ণনা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, রোমানদের সংখ্যা চার লক্ষ বর্ণনা করেছেন। [৪] যেখানে অন্যান্য ঐতিহাসিকরা দুই লক্ষ বলেন। [৫] মনে হয় যে পেশাদার রোমান সৈন্য ছিল দুই লক্ষ এবং বাকিরা ছিল খ্রিস্টান আরব, স্বেচ্ছাসেবক এবং নতুন নিয়োগকৃত লোক।

সিপাহসালার-এ-ইসলাম হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) তাঁর বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে হিমস শহরের প্রাচীরের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। অনেক মুজাহিদিনের পরিবারও সাথে ছিল কারণ এখানে মুসলমানদের নিয়মিত শাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় যখন রোমানদের এত বড় সমাবেশের খবর এল, তখন প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ করতে বসলেন। প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বললেন: "হে মুসলমানগণ! শত্রু এত বিপুল সংখ্যায় আসছে যে জমিন কেঁপে উঠছে। এখন বলো তোমাদের প্রস্তাব কী?"

হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) প্রস্তাব দিলেন যে নারী ও শিশুদের শহরে রেখে নিজেরা খোলা ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। কিন্তু হযরত শুরাহবিল বিন হাসনাহ (রা.) বললেন:

"শহরের অধিবাসীরা সবাই খ্রিস্টান, আশঙ্কা আছে যে আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা আমাদের পরিবার-পরিজনকে জিম্মি করে নেবে।"

---

[১] ফুতুহুশ শাম লি-আবি ইসমাইল আল-আযদী, পৃ. ১৩২

[২] ফুতুহুশ শাম লি-আবি ইসমাইল আল-আযদী, পৃ. ১৩৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫৩৬/৯

[৪] ফুতুহুশ শাম লিল-আযদী, পৃ. ১৯৩

হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বললেন: “এর প্রতিকার এই হতে পারে যে, আমরা শহরবাসীদের প্রথমে বের করে দিই।”

হযরত শুরাহবিল (রা.) বললেন: “হে আমির! এটি কীভাবে বৈধ হবে? আমরা তাদের নিরাপত্তা দিয়েছি, নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে জজিয়া গ্রহণ করেছি। তাদের সাথে কীভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি।”

হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) নিজের মত থেকে ফিরে এসে বিকল্প পদ্ধতি অনুসন্ধান করলেন। এত সময়ও ছিল না যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাঁর সাহায্যের অপেক্ষা করা যায়, যিনি সেনাবাহিনীর অন্য অংশের সাথে দামেস্কে অবস্থান করছিলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, মুসলমানরা নিজেরাই হিমস খালি করে দামেস্কে চলে যাবেন।

সিদ্ধান্ত হওয়ার সাথে সাথেই হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) সরকারি কোষাগারের কর্মকর্তা হযরত হাবিব বিন মাসলামাহ (রা.)-কে তলব করে নির্দেশ দিলেন যে, খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জজিয়া বাবদ নেওয়া প্রতিটি দিরহাম ফেরত দিয়ে দেওয়া হোক; কারণ এই অর্থ তাদের নিরাপত্তার বিনিময়ে নেওয়া হয়েছিল এবং এখন আমরা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ত্যাগ করে এখান থেকে প্রস্থান করছি।

এই একই নির্দেশ অন্যান্য জনপদ ও শহরগুলোতেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো, যেগুলো জয় করার পর এখন মুসলমানরা ছেড়ে দিতে বাধ্য ছিল। শহরবাসীদের এই লক্ষ লক্ষ দিরহাম ফেরত দেওয়ার পর মুসলমানরা সফরের প্রস্তুতি নিলেন।

অবস্থা এমন ছিল যে, শহরের লোকেরা অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এই সদাচরণ ও সততায় মুগ্ধ হয়ে অশ্রুসিক্ত ছিল, খ্রিস্টানরা দোয়া করছিল: “ঈশ্বর তোমাদের ফিরিয়ে আনুন।” আর ইহুদিরা বলছিল: “যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি, কায়সারকে এই শহর দখল করতে দেব না।”

হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) মুসলমানদের কাফেলা নিয়ে দামেস্কে পৌঁছালেন, এখানে সমস্ত কর্মকর্তাদের একত্রিত করে যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ করলেন এবং তারপর জর্ডানের দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে ইয়ারমুকের ময়দান ছিল এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) নিজের সেনাবাহিনীর সাথে আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন ছিলেন। এখানে পুরো এলাকাটি ছিল সমতল এবং আরবের সীমান্ত নিকটবর্তী ছিল, পরাজয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানরা পিছিয়ে গিয়ে নিরাপদ এলাকায় প্রবেশ করতে পারত। [১]

হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) হিমস থেকে রওনা হওয়ার সময় হযরত উমর (রা.)-এর কাছে রোমানদের আধিক্যের সংবাদ এবং জরুরি সাহায্যের আবেদন সম্বলিত একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু দূত হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনো বড় বাহিনী প্রস্তুত করে পাঠানোর সময় হাত থেকে চলে গিয়েছিল। তাই হযরত উমর (রা.) আবু উবাইদাহ (রা.)-এর নামে সাহস, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে একটি পত্র লিখলেন এবং সেই সাথে সাঈদ বিন আমিরকে জরুরি ভিত্তিতে এক হাজার লোকের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। [২]

আমিরুল মুমিনীন সাধারণ মুজাহিদদের জন্য একটি বিশেষ বার্তাও এই তাকিদের সাথে পাঠালেন যে, যুদ্ধের আগে সেনাবাহিনীর সারিতে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের এটি শুনিয়ে দেওয়া হয়, যাতে আপনি বলেছিলেন: “হে মুসলমানগণ! শত্রুর সাথে অটল হয়ে লড়াই করো, তাদের ওপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো। তারা যেন তোমাদের কাছে পিঁপড়ার চেয়েও তুচ্ছ মনে হয়। আমাদের বিশ্বাস যে আল্লাহর পক্ষ থেকে...”

---

[১] ফুতুহুল শাম লিল আজদি, পৃ. ১৩৯ থেকে ১৪৮

[২] ফুতুহুল শাম লিল আজদি, পৃ. ১৩৮ থেকে ১৪৩

...থেকে বিজয় ও সাহায্য তোমাদের কদম চুম্বন করবে।

এই সাহায্য এবং হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু-এর পয়গাম একই দিনে এমন এক সময়ে রণাঙ্গনে পৌঁছাল যখন লড়াই শুরু হতে যাচ্ছিল। [১] মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি ছিল না, কিন্তু তাদের মধ্যে এক হাজার সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম ছিলেন, যাদের মধ্যে একশ জন বদরী সাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ আযদ গোত্রের দশ হাজারের বেশি সাহসী যোদ্ধা মুসলমানদের সারিতে উপস্থিত ছিলেন, ইয়ামেন থেকে খাশআম গোত্রের জানবাযরাও বড় সংখ্যায় এসেছিলেন। ইসলামী লশকারের ডান বাহুর আমীর হযরত মুআয বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু, বাম বাহুর হযরত কুবাস বিন আশইয়াম রাদিআল্লাহু আনহু, পদাতিক বাহিনীর হযরত হাশিম বিন উতবা রাদিআল্লাহু আনহু এবং অশ্বারোহী বাহিনীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহু নিযুক্ত ছিলেন। প্রধান সেনাপতি যদিও হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহু-এর পরামর্শে স্থির করছিলেন, তাঁরই পরামর্শে ব্যূহ রচনার বিন্যাস ঠিক করা হয়েছিল এবং অফিসারদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। [২]

এখনো নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হয়নি যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহু বাছাইকৃত অশ্বারোহীদের একটি দলের সাথে আক্রমণ চালিয়ে রোমানদের তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। রোমানরা যারা এই ধারণা করে বসে ছিল যে মুসলমানরা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে হয়তো নিজেরাই পিছু হটে যাবে, হযরত খালিদ রাদিআল্লাহু আনহুকে আসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল এবং তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। লড়াই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে শুরু হলো। রোমানদের পক্ষ থেকে এক বিশালদেহী অশ্বারোহী বেরিয়ে এল। এদিকে হযরত খালিদ রাদিআল্লাহু আনহু-এর ইশারায় হযরত কাইস বিন হুবাইরা রাদিআল্লাহু আনহু, যিনি হযরত খালিদ রাদিআল্লাহু আনহু-এর অধীনে একজন অফিসার ছিলেন, তলোয়ার কোষমুক্ত করে সামনে এলেন এবং প্রতিপক্ষ সামলে ওঠার আগেই এমন এক আঘাত করলেন যে তলোয়ার তার শিরস্ত্রাণসহ মাথা কেটে ঘাড় পর্যন্ত নেমে গেল।

এরপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু হলো, কিন্তু জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হতে পারল না, তবে রোমানরা মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ল। তারা যুদ্ধ থামিয়ে মুসলমানদেরকে আবারও ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে যুদ্ধ এড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করল এবং দূত পাঠিয়ে হযরত আবু উবাইদাহ রাদিআল্লাহু আনহু-এর কাছে আবেদন করল যে, আপনাদের কোনো নির্ভরযোগ্য দূত পাঠান যাতে সন্ধির আলোচনা শুরু করা যায়। [৩]

হযরত আবু উবাইদাহ রাদিআল্লাহু আনহু-এর আদেশে হযরত খালিদ রাদিআল্লাহু আনহু রোমানদের শিবিরে গেলেন। তাদের সেনাপতি বাহান নিজের জাতীয় শান-শওকতে আকাশ-পাতাল এক করার পর বলল: ‘হে আরববাসী! আমরা তোমাদের ভালো প্রতিবেশী ছিলাম, তোমাদের যে গোত্রগুলোই আমাদের দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে, আমরা তাদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করেছি। আমাদের আশা ছিল যে আরবরা এই সদাচরণের জন্য আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, কিন্তু এর বিপরীতে তোমরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদের এখান থেকে বিতাড়িত করতে চাচ্ছ। অথচ এই চেষ্টায় পারস্যবাসীসহ বিশ্বের কোনো জাতি আজ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। আর তোমরা তো বিশ্বের সবচেয়ে অনগ্রসর ও মূর্খ জাতি, তোমাদের এই সাহস কীভাবে হলো? যাই হোক, আমরা তোমাদের প্রস্তাব দিচ্ছি যে যদি তোমরা এখনো ফিরে যাও, তবে আমরা তোমাদের সেনাপতিকে দশ হাজার, অফিসারদের এক হাজার করে এবং সৈন্যদের মাথাপিছু একশ করে দিনার দেব।’

---

[১] ফুতুহুল শাম লিল আযদি, পৃ. ১৬৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৯১, ফুতুহুল শাম লিল আযদি, পৃ. ১৬৫ থেকে ১৬৮, ১৯৫

[৩] ফুতুহুল শাম লিল আযদি, পৃ. ১৭০, ১৭৩

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বাহানের কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন: “তোমাদের শক্তি ও শান-শওকত সম্পর্কে আমরা ভালোভাবেই জানি। তবে তোমরা আরবদের সাথে যে সদাচরণের কথা উল্লেখ করেছ, সেই অনুগ্রহ ছিল কেবল তাদের খ্রিস্টান বানানোর জন্য। ফলে তাদের কত গোত্রই না আজ খ্রিস্টান হয়ে তোমাদের কাতারে আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। আর আমাদের অভাব-অনটন, দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দুর্ভাগ্যের কথা যদি বলো, তবে নিঃসন্দেহে আমরা এর চেয়েও অধম ছিলাম। আমরা ছিলাম মরুচারী যাযাবর, আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলের ওপর জুলুম করত, আমরা আল্লাহর সাথে শিরক করতাম এবং পাথরের পূজা করতাম। মোটকথা, আমরা ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে পাঠিয়ে আমাদের হেদায়েত দান করলেন। তিনি আমাদের কুফর ও শিরক থেকে নিষেধ করলেন এবং ভ্রান্ত আকিদার লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন যে, তাওহীদের এই পয়গাম অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও; যারা তা মেনে নেবে তারা আমাদের ভাই, আর যারা মানবে না তারা জিজিয়া দেবে এবং আমরা তাদের রক্ষক হব। আর যে এটিও অস্বীকার করবে, তার জন্য রয়েছে তলোয়ার।”

বাহান এটি শুনে বুঝতে পারল যে, যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। [১]

পরিশেষে এক সাময়িক বিরতির পর আবার যুদ্ধ শুরু হলো। সেদিন ফজরের নামাজে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) সূরা আল-ফজর তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ (অতঃপর আপনার প্রতিপালক তাদের ওপর আজাবের কশাঘাত বর্ষণ করলেন) আয়াতে পৌঁছালেন, তখন মুসলমানরা অনুভব করলেন যে, রোমানদের ওপর আল্লাহর আজাব অবশ্যই নাজিল হবে এবং বিজয় ইসলামেরই হবে। [২]

এখন উভয় পক্ষ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে নামল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে এক সুঠামদেহী যুবক সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর কাছে এসে আরজ করল:

“আমি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প করেছি। আপনি যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কোনো বার্তা দিতে চান, তবে বলুন।”

হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন: “হ্যাঁ, আকা (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পেশ করো এবং বলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ (আপনার মাধ্যমে) আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ হয়েছে।”

এই ঘটনাকে শায়েরে মাশরিক ইকবাল মরহুম এভাবে বর্ণনা করেছেন:

আরব যুবকগণ তলোয়ার হাতে সারিবদ্ধ ছিল,
শাম দেশের জমিন যেন মেহেদি রাঙা কনের অপেক্ষায় ছিল।
পারদের মতো অস্থির এক যুবক,
এসে সেনাপতির সাথে কথা বলল।
হে আবু উবাইদাহ! আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিন,
আমার ধৈর্য ও প্রশান্তির পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

---

[১] ফুতুহুল শাম লিল-আজদি, পৃষ্ঠা ১৭৭ থেকে ১৮৩।

[২] ফুতুহুল শাম লিল-আজদি, পৃষ্ঠা ১৬০।

আমি যাচ্ছি রাসূলের (সা.) দরবারে

যদি কোনো বার্তা থাকে, তবে আমি তা আনন্দের সাথে নিয়ে যাব।

এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে সেই চোখ অশ্রুসিক্ত হলো

যার দৃষ্টি ছিল খাপমুক্ত তলোয়ারের মতো।

সেনাপতি বললেন, তুমিই সেই যুবক

তোমার ভালোবাসার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বড়দের জন্য আবশ্যক।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর আল্লাহ তোমার মনের আশা পূর্ণ করুন

তোমার ভালোবাসার মর্যাদা কতই না উচ্চ!

যখন তুমি বিশ্বস্ত রাসূলের (সা.) দরবারে পৌঁছাবে

সালামের পর আমার পক্ষ থেকে এই আরজি পেশ করো—

আত্মমর্যাদাবান আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন

রাসূল (সা.) যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে।

এই যুবকই যুদ্ধের আগুনে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হন। [১]

অবশেষে রোমানদের নিয়মিত আক্রমণ শুরু হলো, তাদের ত্রিশ হাজার সৈন্য শিকল পরে লড়াই করতে এসেছিল যাতে তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে না পারে। সামনে ছিল হাজার হাজার তীরন্দাজ যারা তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে আসছিল। এরপর ছিল বর্শাধারীরা যারা ঘোড়া ছুটিয়ে আক্রমণ করল এবং মুসলমানরা চাপের মুখে পড়ে পিছু হটতে শুরু করল। মুসলমানদের ডান বাহুতে আযদ গোত্র অত্যন্ত বীরত্বের সাথে অটল রইল, খ্রিস্টানরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তাদের পিছু হটাতে পারল না। তবে ডান বাহুর অন্যান্য দলগুলো তুফানি প্লাবনের সামনে টিকতে পারল না এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। রোমানরা আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের তাদের তাঁবু পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে গেল। এখানে মুসলিম মহিলারা যখন তাদের পুরুষদের পিছু হটতে দেখলেন, তখন তারা তাঁবুর খুঁটি হাতে নিয়ে দৌড়ে এলেন এবং চিৎকার করে বললেন যে, যদি তোমরা পিছু হটো তবে আমরা তোমাদের মাথা ভেঙে দেব।

মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠল এবং তারা পুনরায় ফিরে এসে লড়াই শুরু করল। মুআয বিন জাবাল (রা.) ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে উচ্চস্বরে বললেন:
“আমি পায়ে হেঁটে অটল থেকে লড়াই করতে পারি। কেউ যদি এই ঘোড়ার হক আদায় করতে পারে তবে সে এটি নিয়ে নিক।”

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/৫৬১... কিছু লোক দাবি করেন যে, এই যুবক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.) বা হুসাইন (রা.)। কিন্তু কোনো বর্ণনা দ্বারা এই দাবি প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ, একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইয়ালা বিন আল-আস (রা.) ইয়ারমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। (যদিও প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আল-ইসাবাহ, নং: ৫৬৯৩)। এই ব্যক্তিদের একমাত্র দলিল ইবনে আসাকিরের একটি ইবারত, যাতে কোনো সনদ ছাড়াই শুধু এতটুকু আছে: বংশবিদ্যা বিশারদ কিছু আলেম উল্লেখ করেছেন যে তিনি ইয়ারমুকের দিন নিহত হন (তারিখে দামেশক: ৮/৩৩)। এই বর্ণনাটি সনদবিহীন হওয়া সত্ত্বেও যদি মেনে নেওয়া হয় যে একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইয়ালা বিন আল-আস (রা.) ইয়ারমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, তবুও এটি কীভাবে মেনে নেওয়া যায় যে আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে উল্লিখিত কথোপকথনটি তারই ছিল? অথচ কথোপকথনকারী যুবকের নাম কোথাও উল্লেখ নেই। ইয়ারমুক যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। কোন দলিলের ভিত্তিতে এই নির্দিষ্টকরণ করা হচ্ছে যে তিনি ইয়ালা বিন আল-আস (রা.)-ই ছিলেন।

**তারিখে উম্মতে মুসলিমা**

**প্রথম খণ্ড**

তাঁর ছেলে হযরত আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ বললেন: “এই হক আমি আদায় করব।” আর ঘোড়ায় চড়ে বসলেন, বাবা ও ছেলে উভয়ই সিংহের মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিক থেকে জুবাইদ গোত্রের সরদার হাজ্জাজ বিন আবদ ইয়াগুস পাঁচশ মুজাহিদ নিয়ে রোমানদের পথে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পিছু হটতে থাকা মুজাহিদদের অনুসরণ করতে তাদের বাধা দিলেন।

এটি ছিল ডান বাহুর অবস্থা, ওদিকে মুসলমানদের বাম বাহুও রোমানদের অস্বাভাবিক চাপ সহ্য করতে না পেরে পিছু হটে নিজেদের তাঁবু পর্যন্ত চলে এল। এখানেও মুসলিম মহিলারা বিস্ময়কর বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে রোমানদের মোকাবিলায় নিজেদের বাহিনীর কদম মজবুত করলেন। মুসলিম অফিসারদের মধ্যে হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান, হযরত আমর ইবনুল আস এবং হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-এর মতো সাহাবায়ে কেরাম এই দিকে ছিলেন এবং পাহাড়ের মতো অটল থেকে যুদ্ধ করছিলেন।

হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-এর চারদিকে রোমানদের ভিড় ছিল এবং তিনি এই আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে পাহাড়ের মতো অটল ছিলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।”

তিনি বারবার আওয়াজ দিচ্ছিলেন: “আল্লাহর সাথে সওদা করার লোক কোথায়?” যে মুসলমানই এই ডাক শুনল, সে ফিরে এল। অবশেষে পিছু হটতে থাকা মুসলমানরা পুনরায় কদম জমাতে সক্ষম হলো।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি উচ্চস্বরে ডাকছিলেন:
“হে মুসলমানগণ! হুর-ঈনদের জন্য সুসজ্জিত হয়ে সামনে অগ্রসর হও, তোমাদের রবের জান্নাতের দিকে ধাবিত হও।”

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-ও একইভাবে মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করতে করতে তাঁর ছেলে হযরত ইয়াজিদ (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি বাহিনীর এক-চতুর্থাংশের কমান্ডার ছিলেন। তিনি বললেন: “বেটা! ময়দানে আমাদের একেকজন সিপাহি জানের বাজি লাগিয়ে লড়ছে, তোমার ওপর আরও বেশি দায়িত্ব বর্তায় যে, জান হাতের তালুতে রেখে যুদ্ধ করো।”

হযরত ইয়াজিদ (রা.) এটি শুনে আরও জোশ ও উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

বাম বাহুর সালার হযরত কুবাস বিন আশয়াম (রা.) যুদ্ধবিদ্যায় ছিলেন অতুলনীয়। তিনি এত তীব্রভাবে লড়ছিলেন যে তলোয়ারগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ে যেত এবং নেজাগুলো বেঁকে যেত। তিনি বারবার ডাকতেন: “এমন কেউ আছে কি যে আল্লাহ তাআলার নামে মরা-মারার কসম গ্রহণকারীকে অস্ত্র হাতে তুলে দেবে?” মানুষ তৎক্ষণাৎ তাঁকে অস্ত্র দিয়ে দিত এবং তিনি পুনরায় শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

বাম বাহুতে হযরত হানজালা বিন খুওয়াইয়া (রা.)-ও বীরত্বের সাথে লড়তে থাকেন। রোমানদের একজন বর্ম পরিহিত পালোয়ান, যে আরবদের পোশাক পরে ছিল, সে এই বলতে বলতে এল: “হে আরববাসী! তোমাদের গ্রাম ও ইয়াসরিবের দিকে ফিরে যাও।”

হযরত হানজালা (রা.) তাকে দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সেও আক্রমণ করল, তলোয়ারের পর তলোয়ারের আঘাত চলল কিন্তু পাল্লা সমান রইল। অবশেষে হযরত হানজালা (রা.) তাকে বাহুবন্দি করে আছাড় দিয়ে ফেলে দিলেন, কয়েক মুহূর্তের কুস্তির পর দুজনেই আবার উঠে দাঁড়ালেন।

...হয়ে, হযরত হানজালা (রা.) দেখলেন প্রতিপক্ষের বর্ম ঘাড়ের কাছে সামান্য খোলা রয়েছে। তিনি লক্ষ্য স্থির করে সেখানেই আক্রমণ করলেন এবং তলোয়ার লক্ষ্যভেদ করে ওপারে চলে গেল।

ইসলামী লশকরের কালব-এর অফিসার হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) হাঁটু গেড়ে বর্শা সামলে নিজ স্থানে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শত্রুর দলগুলো আক্রমণ করলে তিনি তার দাঁতভাঙা জবাব দিতেন এবং তাদের প্রতিটি দলের প্রথম আক্রমণকারীকে বর্শা বিদ্ধ করে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিতেন। [১]

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) রোমানদের ওপর এমন তীব্রভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন যে, দুইবার তাদের কাতার চিরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ফেরার সময় তাঁর কাঁধে দুটি অত্যন্ত গভীর ক্ষতও সৃষ্টি হয়েছিল। [২]

যুদ্ধে উদ্দীপনার অবস্থা এমন ছিল যে, কারো নিজের মাথা বা শরীরের কোনো হুঁশ ছিল না। হযরত খাব্বাস বিন কায়েস (রা.) এমন জোশ ও উদ্দীপনার সাথে লড়ছিলেন যে, শত্রুর আঘাতে তাঁর পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি টেরও পাননি। কিছুক্ষণ পর যখন ব্যথা অনুভব করলেন, তখন নিজের পা খুঁজতে লাগলেন। [৩]

এই সময়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) অশ্বারোহীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শত্রুর দশ হাজার সৈন্যকে পিষে ফেললেন। দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চরম পর্যায়ে ছিল এবং আন্দাজ করা যাচ্ছিল না যে কে জিতবে আর কে হারবে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে রোমানদের দম ফুরিয়ে আসছে। তিনি তাঁর অশ্বারোহীদের সাহস জুগিয়ে বললেন: “মুসলমানগণ! রোমানদের যতটুকু শক্তি ছিল তারা তা দেখিয়ে ফেলেছে, অতএব এখন একটি জোরালো আক্রমণ করো। আল্লাহর কসম! আমরা এখনই বিজয় লাভ করব।”

এই বলে তিনি তাঁর এক হাজার শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীকে সাথে নিলেন এবং রোমানদের অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর, যারা সংখ্যায় এক লক্ষ ছিল, এমন ভয়াবহ আক্রমণ করলেন যে তাদের সারিগুলো ওলটপালট হয়ে গেল।

ওদিকে হযরত কায়েস বিন হুবাইরা (রা.), যিনি সতেজ সৈন্যদের নিয়ে বাম পার্শ্বের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ বেরিয়ে এলেন এবং রোমানদের সারিগুলো চিরে তছনছ করে দিলেন।

ইসলামী লশকরের কালব থেকে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) আক্রমণ শুরু করলেন এবং রোমানদের কালব-কে ময়দানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেলেন। রোমানদের পা এখন এমনভাবে উখড়ে গেল যে তারা আর দাঁড়াতে পারল না। মুসলমানরা ধাওয়া করে লাশের স্তূপ বানিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ ইয়ারমুকের ময়দানে বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। এক লক্ষের বেশি রোমান নিহত হয়েছিল। মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি, যাদের মধ্যে হযরত জিরার বিন আজওয়ার এবং হযরত হিশাম বিন আস (রা.)-এর মতো মূল্যবান ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

[১] ফুতুহুশ শাম লিল আযদি, পৃ. ১০০ থেকে ১০৭।

[২] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ২, পৃ. ৩২৬, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবুয যুবায়ের বিন আওয়াম, ৩৯৯৫, কিতাবুল মাগাযী, কতলু আবি জাহল।

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৩৮, খাব্বাস-কে কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে খামাশ-ও লেখা হয়েছে। তবে ‘খাব্বাস’-ই সঠিক।

হেরাক্লিয়াস সেই সময় আন্তাকিয়ায় নিজের জাতির ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন। যখনই তিনি শোচনীয় পরাজয়ের খবর পেলেন, তখনই তিনি এশিয়াকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে কনস্টান্টিনোপলের দিকে যাত্রা করার প্রস্তুতি শুরু করলেন। সিরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে যখন তিনি রুহা (এডেসা) পৌঁছালেন, তখন তিনি শেষবারের মতো সেই ভূখণ্ডের দিকে ফিরে তাকালেন যেখানে কয়েক বছর আগে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আকাশ ছুঁয়েছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আরবের ইসলামী বিপ্লব তাঁকে অসহায় করে দিয়েছে। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন: “বিদায় হে সিরিয়া! তোমাকে শেষ সালাম!” এবং নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। [১]

**ইরান রণাঙ্গন**

এই সময়ে ইরানের রণাঙ্গনেও অবিরাম যুদ্ধ চলছিল। ১৩ হিজরিতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর আদেশে ইরানে মোতায়েনকৃত অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইরানি বিজিত অঞ্চলগুলো সামলানোর দায়িত্ব হযরত মুসান্না বিন হারিসা (রা.)-এর ওপর অর্পিত হয়, যাঁর সামরিক কেন্দ্র ছিল ইরাকের ঐতিহাসিক শহর হীরা। সেই সময় ইরানের সিংহাসনে “শাহরিয়ার” নামক এক ব্যক্তি আসীন ছিলেন, যিনি ইরানিদের রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে পূর্ববর্তী অল্পবয়স্ক রাজা শিরুয়াহ বিন খসরুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। যদিও এই শাসক সাসানীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন না, তবে রোমানদের সাথে যুদ্ধে অগ্রভাগে থাকার কারণে সামরিক বিষয়ে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। [২]

যখনই তিনি জানতে পারলেন যে মুসলিম বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য সিরিয়া রণাঙ্গনের দিকে চলে গেছে, তিনি দশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে মুসলমানদের হীরা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেন। হযরত মুসান্না (রা.) তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহিনী বিন্যস্ত করে অগ্রসর হন এবং প্রাচীন ইরাকি শহর বাবিলের নিকট ইরানি বাহিনীর মুখোমুখি হন। ইসলামী বাহিনীর ডানে ও বামে হযরত মুসান্না (রা.)-এর ভাই হযরত মাসউদ মোতায়েন ছিলেন। তাঁরা বীরত্বের সাথে অগ্রসর হয়ে সাহসিকতার পরিচয় দেন। অবশেষে পারস্য বাহিনী পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ইরানি রাজধানী মাদায়েন পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু যেহেতু তাঁদের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল, তাই হযরত মুসান্না (রা.) এই অভিযান স্থগিত করে খিলাফতের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য মদীনা মুনাওয়ারার দিকে যাত্রা করেন। [৩]

**হযরত মুসান্না বিন হারিসা মদীনায়:**

এটি ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর শেষ সময়। হযরত মুসান্না (রা.) এই অবস্থায় তাঁকে ইরাক রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে জানান এবং ইরানিদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য আরও সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করেন। যেহেতু মদীনা তাইয়্যেবা এবং আরবের হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ প্রাণ ইতিপূর্বেই সিরিয়া রণাঙ্গনে চলে গিয়েছিল, তাই এই রণাঙ্গনের জন্য নতুন লোক নিয়োগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সেই সময় একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন:

---

[১] ফুতুহুল শাম, আল-আজদি, পৃ. ২০৭ থেকে ২১৩।

[২] আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার: ৫৬, ৫৫/১।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

“সম্ভবত আজ আমার জীবনের শেষ দিন। যদি আজ আমি মারা যাই, তবে তোমরা সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষা না করে লোকদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে মুসান্নার সাথে পাঠিয়ে দিও। আমার মৃত্যুর শোক যেন তোমাদের এই দ্বীনি দায়িত্ব পালন থেকে বিরত না রাখে।”

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সেই রাতেই ইন্তেকাল করেন এবং হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী পরের দিন লোকদের মসজিদে নববীতে একত্রিত করে ইরানীদের বিরুদ্ধে জিহাদের উৎসাহ দিতে শুরু করেন। তিন দিন পর্যন্ত তিনি লোকদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে বনু সাকিফ গোত্রের আবু উবাইদ বিন মাসউদ (রা.) নিজের গোত্রসহ এই অভিযানের জন্য নাম লেখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, এরপর অন্য লোকেরাও শামিল হন। হযরত মুসান্না (রা.)-কে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে তিনি বলেন:

“ভাইয়েরা! কিসরার শক্তিতে ভীত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা তাদের সবুজ-শ্যামল সীমান্ত জয় করে ফেলেছি, ইনশাআল্লাহ এর পরের এলাকাও জয় হয়ে যাবে।”

বাহিনী বিন্যস্ত করার পর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবাইদ সাকিফি (রা.)-কে আমির নিযুক্ত করেন, যদিও তিনি একজন তাবেয়ি ছিলেন। কেউ আপত্তি তুললেন যে, সাহাবীদের উপস্থিতিতে একজন তাবেয়িকে কেন তাদের আমির নিযুক্ত করা হলো? হযরত উমর ফারুক (রা.) উত্তর দিলেন: “আল্লাহর কসম! আমি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমির বানাব না যে জিহাদের ডাকে সবার আগে লাব্বাইক বলেছে।”

এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবাইদ সাকিফি (রা.)-কে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত সাহাবীদের সাথে প্রতিটি পদক্ষেপে পরামর্শ করতে এবং বাহিনীর সাথে ভালো ব্যবহার করার নসিহত করে বিদায় দিলেন। [১]

**ইরানি অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ:**

ইরানি দরবারের অবস্থা এমন ছিল যে, একজন শাসক পা জমানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই অন্যজন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করত। সেই দিনগুলোতে সেখানে আরও একটি পরিবর্তন এসেছিল। ইরানি আমিররা তাদের সামরিক শাসক শাহরিয়ারকে হত্যা করে, যে বিদ্রোহ করে আরদাশির বিন শিরওয়াইহ-এর কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। তারা শাসনভার কিসরা পারভেজের কন্যা “বুরান”-এর হাতে তুলে দেয়, কারণ রাজবংশের পুরুষদের মধ্যে তখন শাসনের যোগ্য কেউ অবশিষ্ট ছিল না। বুরান রাজনৈতিক বিষয়ে তৎপর প্রমাণিত হন। তিনি ইরানীদের সবচেয়ে রণকুশলী সেনাপতি রুস্তমকে মুসলমানদের মোকাবিলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। রুস্তম আরবের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জমিদার ও কৃষকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্রোহে উসকে দেয় এবং মুসলমানদের কাছ থেকে ইরাকের অধিকাংশ জেলা ছিনিয়ে নেয়। হযরত মুসান্না (রা.) এই সময়ে খেলাফত দরবারে সাহায্যের আবেদন পেশ করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি হীরায় থাকাকালীন সাধারণ বিদ্রোহের ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। এও জানা গেল যে, রুস্তমের একজন সেনাপতি জাবান ফোরাত নদীর তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং অন্য একটি বাহিনী নারসি নামক এক সরদারের নেতৃত্বে কাসকারের দিকে যাত্রা করছে।

হযরত মুসান্না (রা.) এ কথা শোনামাত্রই হীরা খালি করে দেন এবং পিছিয়ে গিয়ে হযরত আবু উবাইদ সাকিফি (রা.)-এর কমান্ডে আসা সাহায্যকারী বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে আবু উবাইদ (রা.)-এর সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছাল এবং হযরত মুসান্না (রা.)-এর বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

‘নামারিক’ নামক স্থানে জাবানের সাথে যুদ্ধ হলো। এটি ছিল হযরত উমর (রা.)-এর পাঠানো প্রথম বাহিনী, যারা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেছিল। ইরানি সেনাপতি জাবান পরাজিত হয়ে বন্দি হলো, কিন্তু যেহেতু বন্দিকারী মুসলমান তার মর্যাদা সম্পর্কে জানতেন না, তাই জাবান তার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিজের বিনিময়ে দুইজন যুবক দাস দেওয়ার শর্তে নিরাপত্তা লাভ করল। ইতিমধ্যে অন্য মুসলমানরা তাকে চিনে ফেলল এবং ধরে সেনাপতি হযরত আবু উবাইদ সাকাফি (রা.)-এর কাছে নিয়ে এসে বলল: “এ হলো ইরানিদের সর্দার জাবান, একে হত্যা করা উচিত।”

কিন্তু হযরত আবু উবাইদ সাকাফি (রা.) পুরো ঘটনা শুনেছিলেন। তিনি জানতেন যে এত বড় শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে, কিন্তু তিনি আইন এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বললেন:

“তাকে একজন মুসলমান আশ্রয় দিয়েছে এবং মুসলমানরা একটি দেহের মতো। একজনের মুখের প্রতিশ্রুতি সবার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য হয়। আমি আল্লাহকে ভয় করি যে তাকে হত্যা করে যেন গুনাহগার না হয়ে যাই।” [১]

এরপর হযরত আবু উবাইদ (রা.) ‘কাসকার’-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে ব্যূহ রচনা করা নারসির বাহিনীকেও পরাজিত করে তাড়িয়ে দিলেন। রুস্তম এই পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে জালিনুস নামক আরেকজন নামকরা সর্দারকে মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পাঠাল, কিন্তু হযরত আবু উবাইদ সাকাফি (রা.) তাকেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। জালিনুস অবশিষ্ট লোকজনকে নিয়ে অনেক কষ্টে রুস্তমের কাছে পৌঁছাল।

**জঙ্গ-এ-জিসর:**

এবার রুস্তম পারস্যের অত্যন্ত অভিজ্ঞ সেনাপতি বাহমান জাদুইয়াকে যুদ্ধের জন্য নির্বাচন করল এবং তাকে হাওজা ও আফরাসিয়াবের জন্য সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিশেষ রাজকীয় পতাকা “দিরাফশ-ই-কাভিয়ানি” প্রদান করল। এই বাহিনী ফোরাত নদীর পূর্ব তীরে ‘কুস নাতিফ’ নামক স্থানে অবতরণ করল। ইসলামী বাহিনী পশ্চিম তীরে ‘মারওয়াহা’ নামক স্থানে তাবু গেড়েছিল। এটি ছিল হিজরি ১৩ সনের শাবান মাস। যুদ্ধের আগের রাতে ইসলামের সেনাপতি হযরত আবু উবাইদ সাকাফি (রা.)-এর স্ত্রী স্বপ্নে দেখলেন যে, আকাশ থেকে এক ব্যক্তি শরবতের পাত্র নিয়ে নেমে এল এবং আবু উবাইদ (রা.) সহ বেশ কয়েকজন মুসলমান সেই শরবত পান করলেন। হযরত আবু উবাইদ (রা.) স্বপ্ন শুনে স্ত্রীকে বললেন:

“ইনশাআল্লাহ তাআলা এটি শাহাদাতের সুসংবাদ।”

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ইরানি সেনাপতি বাহমান হযরত আবু উবাইদ (রা.)-কে প্রস্তাব দিল যে, হয় তোমরা নদী পার হয়ে এপাশে এসো অথবা আমাদের নদী পার হওয়ার সুযোগ দাও। জবাবে হযরত আবু উবাইদ (রা.) মুসলমানদের সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার অভিজ্ঞ সঙ্গীরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তিনি বললেন:

“আমরা ইরানিদের কাছে এটি প্রমাণ হতে দেব না যে আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই।”

অবশেষে নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হলো এবং মুসলমানরা ওপারে চলে গেল। [২] যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন শুরুতেই অনুভূত হলো যে এত বড় বাহিনীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রটি বেশ সংকীর্ণ। মুসলমানরা সামান্য পিছিয়ে গেলেই নদীর ঢেউয়ের কবলে পড়ে যেত।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

[২] আরবিতে সেতুকে ‘জিসর’ বলা হয়। এই কারণে এই যুদ্ধকে ‘হারবুল জিসর’ বলা হয়।

যুদ্ধের তীব্রতার সময় ইরানিরা তাদের যুদ্ধহস্তীগুলোকে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। আরবীয় ঘোড়াগুলো আগে কখনো হাতি দেখেনি, তাই তারা সেগুলোকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল; যখনই মুসলিম অশ্বারোহীরা আক্রমণ করার চেষ্টা করত, তাদের ঘোড়াগুলো সহযোগিতা করত না। যখন ইরানিরা তাদের হাতিগুলো নিয়ে অগ্রসর হতো, তখন মুসলিমদের ঘোড়াগুলো ভড়কে গিয়ে এদিক-ওদিক ছুটত এবং কাতারগুলো এলোমেলো হয়ে যেত। এর সাথে ইরানিরা তীরন্দাজি করছিল, যার ফলে মুসলিমদের চরম ক্ষতি হচ্ছিল। এই উদ্বেগজনক অবস্থা দেখে লস্কর-প্রধান হযরত আবু উবাইদ সাকাফি (রা.) তাঁর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং তলোয়ার কোষমুক্ত করে হাতিগুলোর দিকে তেড়ে গেলেন; তাঁর সাথে আরও অনেক মুসলিম একইভাবে সামনে এগিয়ে এলেন এবং হাতিগুলোর ওপর আক্রমণ চালালেন, কিন্তু হাতিগুলো কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না। হযরত আবু উবাইদ (রা.) উচ্চস্বরে ডেকে বললেন: “হাতিগুলোর পেট চিরে দাও এবং তাদের হাওদাগুলো উল্টে দাও।”

এখন মুসলিমরা জীবন বাজি রেখে হাতিগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনেকগুলো হাতিকে মেরে ধরাশায়ী করলেন এবং তাদের আরোহীদের নিপাত করলেন। হযরত আবু উবাইদ সাকাফি (রা.) নিজে একটি সাদা হাতির সাথে লড়াই করছিলেন, যেটি ছিল সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী; অবশেষে হযরত আবু উবাইদ (রা.) সেটির ওপর তলোয়ারের এক জোরালো আঘাত করলেন। হাতিটি আঘাত সহ্য করে নুইয়ে পড়ল এবং হযরত আবু উবাইদ (রা.)-কে নিজের শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় দিল এবং তারপর তাঁর ওপর নিজের পাহাড়সম পা রেখে দাঁড়িয়ে গেল। হযরত আবু উবাইদ (রা.)-এর দেহ পিষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে গেলেন।

এই দৃশ্য দেখে মুসলিমরা ঘাবড়ে গেলেন; এদিকে হযরত আবু উবাইদ (রা.)-এর হাত থেকে পড়ে যাওয়া ইসলামের ঝাণ্ডা বনু সাকাফের অন্য এক জানবাজ যোদ্ধা তুলে নিলেন, সাথে সাথে হাতির ওপর আক্রমণ করে সেটিকে হযরত আবু উবাইদ (রা.)-এর লাশের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন; হাতিটি লাশ থেকে সরতেই ওই দ্বিতীয় জানবাজের ওপর আক্রমণ করল এবং তাকেও পিষ্ট করে ফেলল। এভাবে একে একে বনু সাকাফের সাতজন ব্যক্তি একে অপরের থেকে ঝাণ্ডা গ্রহণ করে হাতিগুলোর ওপর আক্রমণ করতে থাকলেন এবং শহীদ হতে থাকলেন। [১]

এই মুষ্টিমেয় জানবাজ যোদ্ধা ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম পিছু হটছিলেন; এই অবস্থা দেখে বনু সাকাফের এক স্বেচ্ছাসেবী নদীর ওপর নির্মিত অস্থায়ী সেতুটি ভেঙে দিলেন যাতে মুসলিমরা পলায়নের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেন। এখন মুসলিমদের কাছে পিছু হটার কোনো জায়গাও অবশিষ্ট রইল না এবং ইরানিরা তাদের ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলতে লাগল; হাজার হাজার মুসলিম এভাবেই আহত ও শহীদ হলেন।

এই নাজুক সময়ে হযরত মুসান্না বিন হারিসা (রা.), যিনি নিজেও আহত হয়েছিলেন, অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে মুসলিমদের সাহস জোগালেন। তিনি কিছু মুজাহিদের সাথে ইরানিদের সামনে অটলভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেতুটি পুনরায় মেরামতের ব্যবস্থা করলেন। এরপর বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন: “আমি তোমাদের হেফাজতের জন্য বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে নদী পার হও।”

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

আফসোস যে, আবু উবাইদ সাকাফির মতো মুজাহিদ এবং ইসলামের একনিষ্ঠ প্রাণপুরুষের ছেলে মুখতার সাকাফি অত্যন্ত নিকৃষ্ট এক ফিতনা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সত্য এটাই যে, মাঝেমধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের সন্তানও নিকৃষ্ট হতে পারে এবং খায়রুল কুরুন (সর্বোত্তম যুগ) নিজেও দুষ্ট ব্যক্তিদের থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না। সুতরাং কিছু লোক প্রথম যুগের সুপরিচিত মন্দ ব্যক্তিদের নেক ও সৎ সাব্যস্ত করার জন্য যে বলে থাকে— “সৎ ব্যক্তিদের বংশধর, তাও আবার খায়রুল কুরুনে, মন্দ হয় কীভাবে?”—এটি কোনো যুক্তিসঙ্গত দলিল নয়।

এভাবে তাঁদের দৃঢ়তার কারণে অবশিষ্ট মুসলমানরা নিজেদের সামলে নেওয়ার এবং বেঁচে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। হযরত মুসান্না (রা.) অবশিষ্ট তিন হাজার মুসলমানকে নিয়ে ফিরে এলেন। নয় হাজার সৈন্যের লশকর থেকে চার হাজার শত্রুর তলোয়ার এবং নদীর ঢেউয়ের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, আর দুই হাজার বিশৃঙ্খল অবস্থায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও যুদ্ধে ছয় হাজার ইরানিও নিহত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় তাদেরই হয়েছিল। নবুওয়াতের যুগ থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানদের এত বড় পরাজয়ের সম্মুখীন আর কখনো হতে হয়নি।

হযরত উমর ফারুক (রা.) এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং বললেন:
“আল্লাহ আবু উবাইদের ওপর রহম করুন। আফসোস! তিনি যদি পিছু হটে আমার কাছে চলে আসতেন, তবে আমাকে নিজের আশ্রয়দাতা হিসেবে পেতেন।” [১]

**বুওয়াইবের প্রতিশোধ, বুওয়াইবের যুদ্ধ:**

একটি ময়দানে বিজয়ী হয়ে ইরানিদের সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে মুসলমানরা বিস্ময় ও অনুশোচনার এক মিশ্র অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলেন। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য ইরানিদের সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ অনিবার্য ছিল, যা হযরত উমর ফারুক (রা.) এক মুহূর্তের জন্যও উপেক্ষা করেননি। তিনি জিহাদের ডাক দিয়ে নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের হযরত মুসান্না (রা.)-এর সাহায্যে পাঠাতে শুরু করলেন। বনু বাজিলার সর্দার জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-ও তাঁর মুজাহিদদের নিয়ে ইরাক রণাঙ্গনে পৌঁছে গেলেন। হযরত মুসান্না (রা.) নিজের গোত্র থেকেও নতুন যুবক সংগ্রহ করলেন, এভাবে মুসলমানদের সামরিক অবস্থা সুসংহত হলো।

ইরানি প্রধান সেনাপতি রুস্তম মুসলমানদের এই প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে মেহরানকে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ১৩ হিজরির রমজান মাসে ফোরাত নদীর তীরে ‘বুওয়াইব’ নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। হযরত মুসান্না ইবনে হারিসা (রা.) নদী পার হওয়ার ভুল করেননি, বরং প্রতিপক্ষ বাহিনীকে পার হয়ে আসার আহ্বান জানালেন।

ইরানিরা পূর্ববর্তী বিজয়ের নেশায় মুসলমানদের কোনো পাত্তাই দিচ্ছিল না, তাই তারা নির্ভয়ে নদী পার হয়ে এপাশে চলে এল। মুসলমানরা পিছিয়ে গিয়ে তাদের জন্য খোলা ময়দান ছেড়ে দিলেন এবং কাতারবদ্ধ হলেন। হযরত মুসান্না (রা.)-এর এক ভাই হযরত মুআন্না অশ্বারোহী বাহিনীর এবং অন্য ভাই হযরত মাসউদ পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। হযরত মুসান্না ইবনে হারিসা (রা.) মুজাহিদদের সারিতে টহল দিচ্ছিলেন এবং তাঁদের সাহস জোগাচ্ছিলেন। পরিশেষে তিনি ঘোষণা করলেন:
“আমি তিনটি তাকবির দেব। তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাবে। চতুর্থ তাকবির দিলে একসাথে আক্রমণ করবে।”

এই সময়ে ইরানিরা সামনে থেকে কাতারবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসছিল। তাদের তিনটি কাতার ছিল, যার প্রতিটিতে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছাড়াও যুদ্ধংদেহী হাতি ছিল। সেই সাথে দামামা ও শিঙার আওয়াজ এত তীব্র ছিল যে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হযরত মুসান্না (রা.) তাঁর বাহিনীকে বুঝিয়ে বললেন:
“তোমরা যা কিছু দেখছ, তা ভীরুতার প্রমাণ। তোমরা শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।”

কিছুক্ষণ পর হযরত মুসান্না (রা.) একে একে তিনটি তাকবির দিলেন। মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

এখনও চতুর্থ তাকবীরের আওয়াজ উচ্চকিত হয়নি, এমন সময় বনু ইজলের কিছু অশ্বারোহী কাতার থেকে বেরিয়ে শত্রুর দিকে ধাবিত হতে শুরু করল।

হযরত মুসান্না তীব্র আক্ষেপের সাথে নিজের দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলেন এবং চিৎকার করে বললেন:—

“আল্লাহর জন্য আজ ইসলামকে লজ্জিত করো না।” অশ্বারোহীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ফিরে এল।

এরপর সেনাপতির নির্দেশনা অনুযায়ী সুশৃঙ্খল আক্রমণ শুরু হলো। হযরত মুসান্না (রা.) মধ্যভাগের নেতৃত্ব দিয়ে প্রতিপক্ষের মধ্যভাগে আক্রমণ করলেন এবং তাদের হটিয়ে ডান পার্শ্ব পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এখানে উভয় বাহিনী এমনভাবে একে অপরের সাথে মিশে গেল যে, কারও মাথা-পায়ের হুঁশ রইল না। এই তীব্র লড়াইয়ে ইরানি সেনাপতি মেহরান নিহত হয়, যার ফলে ইরানিদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এদিকে মুসলিম বাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্বের সৈন্যরা ইরানি বাহিনীর উভয় পার্শ্বকে পিছু হটিয়ে ময়দানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গেল। ইরানিদের জন্য এখন নদী পার হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু এরই মধ্যে হযরত মুসান্না (রা.) নিজে তাঁর কিছু জানবাজ সঙ্গীকে নিয়ে সেতু পর্যন্ত পৌঁছে শত্রুর পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দিলেন।

ইরানিরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ডানে-বামে ছুটতে লাগল এবং মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকল, যা কেবল সারা রাত নয় বরং পরের দিনও অব্যাহত ছিল। এই বিজয়, যাতে এক লক্ষ ইরানি সৈন্য নিহত হয়েছিল, আবারও পারস্যের মাটিতে আরবদের অবস্থান সুদৃঢ় করে দিল। নিহত ইরানিদের হাড় দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে রইল। এই যুদ্ধে হযরত মুসান্না বিন হারিসা (রা.)-এর ভাই মাসউদ শহীদ হয়েছিলেন। হযরত মুসান্না (রা.) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ালেন এবং বললেন:

“এই ভেবে আমার দুঃখ লাঘব হয়েছে যে, আমার ভাই ময়দানে অটল থেকে লড়াই করেছে এবং পরাজয় বরণ করেনি।” [১]

**ইয়াজদগিরদ, শেষ কিসরা:**

বুওয়াইবের পরাজয় ইরানিদের কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নারীদের শাসনের অধীনে তারা আরবদের মোকাবিলা করতে পারবে না। ইরানি দরবারে এই আলোচনা শুরু হলো যে, মুসলমানদের সাথে টক্কর দেওয়ার জন্য কিসরার বংশধরদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষের সিংহাসন আরোহণ জরুরি। ফলে দরবারীরা রানী ‘পুরান দুখত’-কে অপসারিত করল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাসানি বংশের এক একুশ বছর বয়সী যুবক ইয়াজদগিরদকে নিজেদের বাদশাহ নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। এই ইয়াজদগিরদই শেষ কিসরা হিসেবে প্রমাণিত হলো। [২]

এখন রুস্তমকে আবারও মুসলমানদের প্রবহমান স্রোতের সামনে বাঁধ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং সেই সাথে হুমকি দেওয়া হলো যে, ব্যর্থ হলে তাকে হত্যা করা হবে। রুস্তম বড় পরিসরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করল এবং একই সাথে দূর-দূরান্তের গ্রাম ও জনপদগুলোকে আবারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। ইয়াজদগিরদের সিংহাসন আরোহণের ফলে মনোবল হারিয়ে ফেলা অনারবদের আকাঙ্ক্ষা আবারও সজীব হয়ে উঠল এবং তারা বিদ্রোহ করে মুসলমানদের সমস্ত বিজিত জেলা থেকে বের করে দিল। এটি জিলকদ ১৩ হিজরির ঘটনা।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

[২] আল-আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১১৯।

হযরত উমর ফারুক (রা.) যখন উদ্বেগজনক সংবাদ পেলেন, তখন তিনি হযরত মুসান্না (রা.)-কে আরবের সীমান্তের দিকে পিছিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে তিনি নতুন করে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতির কাজ শুরু করলেন এবং বললেন: "আল্লাহর কসম, আমি অনারবদের (আজম) শাহজাদাদের মোকাবিলায় আরবদের শাহজাদাদের দাঁড় করাব।" তিনি আরবের সমস্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন গোত্রপতি, নামকরা বীর, শ্রেষ্ঠ কবি এবং বাগ্মীদের কাছে দূত পাঠিয়ে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন এবং তাদের মদিনা মুনাওয়ারায় আসার দাওয়াত দিলেন। হজের দিনগুলো ঘনিয়ে আসছিল, হযরত উমর ফারুক (রা.) নিজেই হজের জন্য তাশরিফ নিলেন, আর ততক্ষণে তাঁর পক্ষ থেকে আরবের সব প্রান্তে জিহাদের প্রস্তুতির পয়গাম পৌঁছে গিয়েছিল। [১]

হজ থেকে ফিরে আসার পর মদিনায় হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী চলে এসেছিলেন, কিন্তু সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতির পাশাপাশি এর নেতৃত্বের বিষয়টিও হযরত উমর (রা.)-এর ওপর এক বিরাট দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইরাকে প্রধান সেনাপতি হযরত মুসান্না (রা.) জিসরের যুদ্ধের জখম থেকে তখনও সুস্থ হয়ে ওঠেননি, বরং দিন দিন তাঁর শারীরিক কষ্ট বেড়েই চলছিল। হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সিরিয়ার রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনার কোনো অবকাশ ছিল না। অন্যদিকে ইরানিদের অসাধারণ সামরিক প্রস্তুতির খবর থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে, এখন যে যুদ্ধ হবে তার ওপরই উভয় শক্তির পূর্ণ জয় বা পরাজয় নির্ভর করবে। অবশেষে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর হযরত উমর (রা.) নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আপনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এর ফলে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং তারা ইরানি ফ্রন্টে দৃঢ়ভাবে লড়াই করবে।

আপনি মহররম ১৫ হিজরিতে সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করলেন। হযরত আলী (রা.)-কে মদিনা মুনাওয়ারায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করলেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। মদিনা থেকে কয়েক মঞ্জিল দূরে পৌঁছানোর পর এটি দেখে চারদিকে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো এবং সবাই মাথায় কাফন বেঁধে নিল। আপনি মদিনা তায়্যিবা থেকে তিন মাইল (প্রায় পাঁচ কিলোমিটার) দূরে 'জু কার' নামক ঝরনার কাছে ছাউনি ফেললেন এবং এখানে আকাবিরদের মজলিসে শুরায় সৈন্যবাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে নিজেই ইরাক ফ্রন্টে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত চাইলেন। অনেক ব্যক্তিই ইতিবাচক মত দিলেন, কিন্তু হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) কোনো দ্বিধা ছাড়াই এর বিরোধিতা করলেন এবং বললেন:
"হে আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ না করুন, যদি আপনি পরাজিত হন তবে সমস্ত ফ্রন্ট থেকে আমাদের পা উপড়ে যাবে। আমার রায় হলো আপনি মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করুন এবং অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে সৈন্যবাহিনীর কমান্ড দিয়ে পাঠিয়ে দিন।"

হযরত উমর ফারুক (রা.) এই কথার যৌক্তিকতা অনুভব করে নিজেই ফ্রন্টে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করলেন এবং সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করলেন: "তাহলে সৈন্যবাহিনীর কমান্ড কার হাতে দেওয়া যায়?"

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) বললেন: "সিংহ-বিক্রম সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে।"

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩ হিজরির অধীনে।

হযরত উমর (রা.) এই মতের সাথে একমত হয়ে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং তাঁকে বিদায় জানানোর সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই নসিহতগুলো করেন:

“হে সাদ! তোমাকে এই কথা যেন আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত না করে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মামা এবং তাঁর সাহাবী হিসেবে পরিচিত। আল্লাহ তাআলা মন্দের মাধ্যমে মন্দকে নয়, বরং নেকির মাধ্যমে মন্দকে ক্ষমা করেন। আল্লাহর সাথে কারো কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, তাঁর সাথে সম্পর্ক কেবল আনুগত্য ও বাধ্যতার মাধ্যমেই তৈরি হয়। এর বাইরে মানুষ উচ্চ মর্যাদার হোক বা সাধারণ শ্রেণির, আল্লাহর নিকট সবাই সমান। সর্বদা সেই জীবনধারা সামনে রাখবে যার ওপর তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছ। এটাই আমাদের ভিত্তি।”

“তুমি অত্যন্ত ধৈর্য-পরীক্ষামূলক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে যাচ্ছ, সুতরাং ধৈর্যের আঁচল আঁকড়ে ধরো। এর মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে। মনে রেখো, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুটি জিনিসের মাধ্যমে তৈরি হয়। এক, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে। আল্লাহর আনুগত্য, আখিরাতের ভালোবাসা এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণে অস্তিত্ব লাভ করে এবং গুনাহ দুনিয়ার লোভ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার কারণে জন্ম নেয়।”

“লোকদের নিকট প্রিয় হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করো না। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-ও এরই দোয়া করেছেন, কারণ যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে নিজের প্রিয় করেন তখন মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন এবং যখন কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন মানুষের নিকট তাকে ঘৃণ্য করে দেন; অতএব তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের অবস্থান জানার জন্য এটি দেখতে থাকো যে, মানুষ তোমার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে।” [১]

**হযরত মুসান্না (রা.)-এর ইন্তেকাল:**

হযরত উমর ফারুক (রা.) এই চার হাজার সৈন্যের বাহিনীকে দোয়ার সাথে এমনভাবে বিদায় করলেন যে, মুহূর্তের খবর পাওয়া এবং ধাপে ধাপে নির্দেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইরাকের সীমান্তে ‘জরুদ নদী’ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যখন ইরাকি রণাঙ্গনের সেনাপতি হযরত মুসান্না বিন হারিসা (রা.)-এর ইন্তেকালের খবর পাওয়া গেল।

হযরত মুসান্না (রা.) নিঃসন্দেহে ইরাক ও পারস্যের জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সেই সময়ে যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মুরতাদ এবং খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন, হযরত মুসান্না (রা.) কেবল নিজের শক্তিতে আরবের সীমানা অতিক্রম করে কিসরার এলাকায় অতর্কিত হামলা শুরু করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজে খিলাফতের দরবারে আসেন এবং নিয়মিত যুদ্ধের জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নিকট থেকে অনুমতি ও সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে যান। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের সমস্যা শেষ হতেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কেও তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সিরিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত হযরত মুসান্না (রা.) একাই ইরাকের রণাঙ্গন সামলে রেখেছিলেন। [২]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/৬১৩, ৬১৪ দার হিজর; আল-ইবার লিয-যাহাবি: সন ১৫ হিজরি।

[২] উসদুল গাবাহ, তরজমা: মুসান্না বিন হারিসা।

তার মৃত্যুর পর হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ইরাকের সকল সেনাপতির সাধারণ সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। এদিকে হযরত উমর (রা.) ইরাক রণাঙ্গনে মুজাহিদদের সতেজ বাহিনী ক্রমাগত পাঠাতে থাকেন, এমনকি হযরত সাদ (রা.)-এর পতাকাতলে সমবেত মুজাহিদদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারে পৌঁছে যায়। তাদের মধ্যে তিনশ'র বেশি সাহাবী ছিলেন, যাদের মধ্যে সত্তর জনেরও বেশি এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সাতশ তরুণ ছেলেও এই রণাঙ্গনে পৌঁছেছিলেন। সিরিয়া রণাঙ্গন থেকে হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) সাহায্য নিয়ে চলে এসেছিলেন। [১]

এই সময়ে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর বার্তা এসে পৌঁছায় যে, সামনে এগিয়ে গিয়ে কাদিসিয়া নামক স্থানে তাবু স্থাপন করো এবং এমনভাবে ব্যূহ রচনা করো যাতে সামনে ইরাকের ময়দান এবং পেছনে আরবের বৃক্ষহীন পাহাড় থাকে, যাতে বিজয় অর্জিত হলে সামনে এগিয়ে যেতে পারো এবং যদি পিছু হটতে হয় তবে আরবের এই পাহাড়গুলোতে অবস্থান নিতে পারো, যেগুলোর সাথে অনারবরা (পারসিকরা) অপরিচিত।

**ইসলামের سفير (দূতগণ) ইরানের দরবারে:**

কাদিসিয়া পৌঁছে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) নুমান বিন মুকাররিন, আসিম বিন আমর এবং মুগীরা বিন শু'বা (রা.)-কে আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি দলের সাথে পারসিকদের রাজধানী মাদায়েনে প্রেরণ করেন, যাতে কিসরা ইয়াজদগিরদকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সেই জাতির ওপর হুজ্জত কায়েম করা যায়।

যখন এই ব্যক্তিবর্গ মাদায়েনে পৌঁছালেন, তখন তাদের দেখার জন্য স্থানীয় লোকদের এক বিশাল জনতা সমবেত হলো। ইসলামের এই বীর সেনানীদের শরীরে ছিল সাধারণ চাদর এবং পায়ে ছিল সাধারণ চটি জুতো। হাতে চাবুক নিয়ে তারা কৃশকায় ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন, যাদের শক্তিশালী খুরের শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল। পারসিকরা অবাক হচ্ছিল যে, এই সাধারণ ধরনের মানুষগুলো কীভাবে এত বড় বড় বাহিনীকে তছনছ করে আসছে।

প্রতিনিধি দলটি ইয়াজদগিরদের দরবারে পৌঁছাল, যে অত্যন্ত অহংকার ও ভ্রুকুটি করে তাদের অপেক্ষায় ছিল। সে প্রথমে মুসলমানদের পোশাক ও বেশভূষার উপহাস করে প্রতিটি জিনিসের নাম এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল যেন ইরানের বিলাসপুরীতে এমন সাধারণ ও নিম্নমানের জিনিসের কোনো অস্তিত্বই নেই। তারপর বিদ্রূপের সুরে বলল: "তোমরা এখানে কেন এসেছ? আমাদের পারস্পরিক বিভেদ দেখে কি তোমাদের ভুল ধারণা হয়েছে যে আমরা দুর্বল হয়ে গেছি? এই জন্য কি এত সাহস দেখাচ্ছ?"

প্রতিনিধি দলের প্রধান হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.) জবাবে অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও সুন্দরভাবে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। শেষে এও স্পষ্ট করে দিলেন যে, ইসলামের শিক্ষা বুঝতে না পারলে জিজিয়া দিয়ে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করা যেতে পারে। অন্যথায় যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

ইয়াজদগিরদ তাদের দাওয়াত উপেক্ষা করে বলল: "আমার জ্ঞান অনুযায়ী তোমাদের চেয়ে বেশি হতভাগা, তোমাদের চেয়ে বেশি দুর্বল এবং তোমাদের চেয়ে বেশি বিশৃঙ্খল জাতি আর কেউ নেই। আমরা যখনই তোমাদের সোজা করতে চাইতাম, তখন সীমান্তের কোনো শাসককে বলে দিতাম..."

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/ ৬৩৫, ৬৪০

ছিলেন, সে তোমাদের কান মলে দিত। তোমরা পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে কখনো টক্কর দিতে পারবে না। এর মোকাবিলায় মাথা তোলার কথা চিন্তাও করো না। যদি তোমাদের সংখ্যা কিছুটা বেড়ে গিয়ে থাকে, তবে এতে আত্মতুষ্টিতে ভোগো না। হ্যাঁ, যদি তোমাদের দারিদ্র্য ও ক্ষুধা আমাদের এলাকার দিকে আসতে বাধ্য করে থাকে, তবে বলো আমরা তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং কাপড়েরও। আমরা তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান করব এবং তাদের কাপড় দেব, জোড়া জোড়াও দেব। আমরা তোমাদেরই পছন্দের কোনো দয়ালু শাসক তোমাদের ওপর নিযুক্ত করে দেব। বলো তোমাদের কী অভিমত?“

ইয়াজদগিরদের এই বিদ্রূপাত্মক ভাষণ শুনে হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দরবারি আনুষ্ঠানিকতা ত্যাগ করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বললেন:

“মহামান্য সম্রাট! আমার সাথে আসা এই সকল ব্যক্তি আরবের অত্যন্ত শরীফ লোক; তাই তারা আভিজাত্যের খেয়াল রাখছেন। আপনি আমার সাথে কথা বলুন। আমি আপনার প্রতিটি কথার উত্তর দেব। আপনি আমাদের যে অবস্থার কথা বলেছেন, তা আমাদের পূর্ববর্তী হীন অবস্থার পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে না। আপনি আমাদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, সত্যিই আমাদের চেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত আর কেউ ছিল না। আমরা পোকামাকড়, সাপ এমনকি বিচ্ছু পর্যন্ত খেয়ে ফেলতাম। খোলা জমিন ছিল আমাদের ঘরবাড়ি। আমরা উট ও ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি কাপড় পরতাম; একে অপরকে হত্যা করা ও জুলুম করা ছিল আমাদের স্বভাব। আমাদের কেউ কেউ মেয়েকে খাবার খাওয়ানোর ভয়ে জীবন্ত কবরে পুঁতে ফেলত। আমাদের অবস্থা এমনই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে একজন সুপরিচিত ও বিখ্যাত মানুষকে নবী বানিয়ে পাঠালেন। যিনি বংশমর্যাদা, পরিবার ও শহরের দিক থেকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সবার চেয়ে সত্যবাদী ও দয়ালু ছিলেন। তিনি আমাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন; কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকলাম এবং তিনি আমাদের সাথে লড়াই করতে থাকলেন। তাঁর সাথীরা বাড়তে থাকল এবং আমরা কমতে থাকলাম। অবশেষে আল্লাহ আমাদের অন্তরে তাঁর সত্যতার বিশ্বাস ঢেলে দিলেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা সত্য। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো, যে এই দ্বীন গ্রহণ করবে তাকে নিজের মতো অধিকার ও দায়িত্ব দাও, আর যে গ্রহণ করবে না কিন্তু জিজিয়া দেবে তাকে নিজের হেফাজতে নিয়ে নাও এবং যে তা অস্বীকার করবে, তার সাথে যুদ্ধ করো। তো হে সম্রাট! এখন আপনি চাইলে জিজিয়া দিন, চাইলে যুদ্ধ করুন। আর চাইলে মুসলমান হয়ে নিজেকে নিরাপদ করুন।”

ইয়াজদগিরদ এ কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল এবং বলল: “আমার সাথে এমন কথা বলার সাহস তোমার হলো কী করে?”

হযরত মুগীরা (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “আপনিই আমার সাথে তেমন কথা বলেছিলেন, তাই আমি আপনার সাথে এমন কথা বলেছি। যদি আপনি ওসব কথা না বলতেন, তবে আমিও আপনার সাথে এসব কথা বলতাম না।”

ইয়াজদগিরদ রাগে লাল হয়ে গেল এবং চিৎকার করে বলল:

“যদি দূতদের হত্যা করা বৈধ হতো, তবে আমি তোমাদের জীবিত ছাড়তাম না। যাও, তোমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বলো যে, আমি রুস্তমকে তোমাদের মোকাবিলার জন্য পাঠাচ্ছি। সে তোমাদের সবাইকে কাদিসিয়ার পরিখায় দাফন করে দেবে এবং তোমাদেরকে এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করবে।”

এরপর সে তার দরবারীদের আদেশ দিল যে, মাটির একটি ঝুড়ি নিয়ে এসো এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির মাথায় তা চাপিয়ে দিয়ে এখান থেকে বের করে দাও। যখন মাটির ঝুড়ি আনা হলো, তখন সাহাবীদের প্রতিনিধি দলের মধ্য থেকে হযরত আসিম বিন আমর (রা.) সামনে এগিয়ে এসে বললেন:

“আমিই এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়।”

যখনই মাটির ঝুড়ি তার মাথায় তুলে দেওয়া হলো, তিনি দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং ঝুড়িটি নিজের ঘোড়ার ওপর রেখে তাতে চাবুক মারলেন।

এদিকে রুস্তম যখন মুসলিম দূতদের সাথে ইয়াজদগিরদের এই আচরণের কথা জানতে পারল, তখন সে হতভম্ব হয়ে গেল এবং বলল:

“আল্লাহর কসম, তারা আমাদের ভূমির চাবিকাঠি নিয়ে গেছে।”

তারপর সে তার অধীনস্থদের উদ্দেশ্যে বলল: “যদি আমরা এই মাটি পথেই আটকাতে পারি, তবে মনে করো আমাদের দেশ বেঁচে গেল। কিন্তু যদি এই মাটি তাদের সেনাপতি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে আমাদের দেশ তাদের দখলে চলে যাবে।”

এই বলে সে লোক পাঠাল যেন কোনোভাবে মুসলিম প্রতিনিধি দলকে কাদিসিয়া পৌঁছানোর আগেই আটকে দেওয়া হয় এবং মাটির ঝুড়িটি উদ্ধার করা যায়। কিন্তু তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হযরত আসিম বিন আমর (রা.) একের পর এক মঞ্জিল অতিক্রম করে কাদিসিয়া পৌঁছে গেলেন এবং মাটির ঝুড়িটি হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর সামনে রেখে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত সাদ (রা.) আনন্দিত হয়ে বললেন: “আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের এই মাটির রূপে ইরান সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি দান করেছেন।”

রুস্তম যখন জানতে পারল যে প্রতিনিধি দল হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে এখন ইরানের সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। [১]

**রুস্তমের দরবারে:**

কাদিসিয়ার সামরিক ছাউনিতে হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশনাবলী সম্বলিত পত্রসমূহ ক্রমাগত আসছিল। তাঁর একটি পত্রে তিনি মুসলমানদেরকে শত্রুদের সংখ্যা ও সরঞ্জামে ভীত না হতে এবং অধিক পরিমাণে ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পাঠ করার উপদেশ দেন।

হযরত সাদ (রা.) এক মাস পর্যন্ত কাদিসিয়ায় অবস্থান করেন। এই সময়ে ইরানের সম্রাট ইয়াজদগিরদ তার রাজধানী মাদায়েন থেকে রুস্তমের নেতৃত্বে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, যার সাথে আরও আশি হাজার উপজাতীয় যোদ্ধার সাহায্যও ছিল। রুস্তম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতার ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী ছিল না, তাই সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়েছিল। যাত্রাপথেও যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সে গতি অত্যন্ত ধীর রেখেছিল। বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি করতে করতে অবশেষে সে ‘সাবাত’-এ তাবু স্থাপন করল।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/৬২৫ থেকে ৬২৯, দার হিজর।

এই বাহিনীর অগ্রবর্তী দলে চল্লিশ হাজার যুদ্ধবাজ যুবক ছিল, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল জালিনুস। ডান পার্শ্বে ছিল ত্রিশ হাজার সৈন্য যাদের কমান্ড ছিল হরমুজানের হাতে, যে ছিল অত্যন্ত চতুর একজন অফিসার। বাম পার্শ্বের ত্রিশ হাজার সৈন্যের অফিসার ছিল মেহরান, যার মুসলমানদের সাথে লড়াই করার ভালো অভিজ্ঞতা ছিল। এছাড়া তেত্রিশটি যুদ্ধংদেহী হাতি ছিল যা মুসলমানদের পিষে ফেলার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

এই সমস্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও রুস্তমের চেষ্টা ছিল যেন যুদ্ধের প্রয়োজন না পড়ে, তাই সে আলোচনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে হযরত সাদ (রা.)-এর কাছে একজন প্রতিনিধি চাইল। তিনি হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.)-কে পাঠালেন। রুস্তম বলল: "তোমরা আমাদের প্রতিবেশী, আমরা তোমাদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করেছি, তোমাদের কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছি। তোমাদের উচিত ফিরে যাওয়া। আমরা তোমাদের ব্যবসা করতে বাধা দিই না।"

হযরত মুগীরা (রা.) উত্তর দিলেন: "আমাদের লক্ষ্য দুনিয়া নয়, আমরা তো আখিরাতের প্রত্যাশী। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে তাঁর সত্য রাসূল পাঠিয়ে আমাদের আসল দ্বীন দিয়েছেন, যে এর ওপর আমল করবে সে সফল হবে, আর যে একে বর্জন করবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"

রুস্তম আগ্রহ প্রকাশ করে ইসলামের পরিচয় জানতে চাইলে হযরত মুগীরা (রা.) সংক্ষেপে ইসলামের শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করলেন। রুস্তম প্রতিটি কথায় বলতে লাগল: "এটি অত্যন্ত চমৎকার বিষয়।"

সবশেষে সে জিজ্ঞেস করল: "যদি আমরা এই দ্বীন গ্রহণ করি তবে তোমরা কী আচরণ করবে?" তিনি বললেন: "আমরা তোমাদের দেশের ধারেকাছেও আসব না।"

রুস্তম আনন্দ প্রকাশ করল এবং তাকে বিদায় দেওয়ার পর নিজের সরদারদের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে নিজের সাম্রাজ্য বাঁচানোর প্রস্তাব রাখল, কিন্তু সবাই বিগড়ে গেল এবং জেদ করতে লাগল যে মুসলমানদের শক্তির ভাষাতেই জবাব দেওয়া উচিত।

রুস্তম তবুও লড়াইয়ে গড়িমসি করতে লাগল। সে আবারও মুসলমানদের একজন প্রতিনিধি চাইল। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) হযরত রিবয়ী বিন আমির (রা.)-কে পাঠালেন। এবার রুস্তম এক জাঁকজমকপূর্ণ দরবার বসিয়ে মুসলমানদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করল যাতে সম্ভবত প্রতিপক্ষের ওপর কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু দরবারের সমস্ত সাজসজ্জা ও চাকচিক্য হযরত রিবয়ী বিন আমির (রা.)-এর ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলল না বরং নিজের নির্লিপ্ততা প্রকাশের জন্য তিনি ঘোড়াসহ তাদের গালিচা মাড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং ঘোড়াটিকে একটি বিশাল বালিশের সাথে বেঁধে দিলেন।

ইরানি প্রহরীরা তাঁর অস্ত্র খুলে রাখতে চাইলে তিনি বললেন: "আমি তোমাদের অনুরোধে এসেছি। যদি এভাবেই ভেতরে যেতে দাও তবে ঠিক আছে, অন্যথায় আমি ফিরে যাচ্ছি।" প্রহরীরা হতবাক হয়ে গেল এবং তিনি নিজের বর্শার অগ্রভাগ গালিচার ওপর ঠেকিয়ে এমনভাবে সামনে এগিয়ে গেলেন যে রুস্তমের তাঁবুর...

...এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিছানো দামী কার্পেট ছিঁড়ে যেতে লাগল।

রুস্তম এই নির্ভীক আচরণে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সে জিজ্ঞেস করতে লাগল: "বলো তো, তোমরা এখানে কেন এসেছ?"

হযরত রিবয়ী বিন আমির رضی اللہ عنہ এই উপলক্ষে মুসলমানদের আগমনের উদ্দেশ্য যে প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় অমলিন চিহ্ন হয়ে জ্বলজ্বল করছে। তিনি বললেন:

"اللَّهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ"

"আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন যাতে তিনি যাকে চান, তাকে বান্দার গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর গোলামিতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে এর প্রশস্ততায় এবং অন্যান্য ধর্মের জুলুম-অবিচার থেকে বের করে ইসলামের ইনসাফের গণ্ডিতে নিয়ে আসতে পারেন।"

রুস্তম রিবয়ী বিন আমির رضی اللہ عنہ-এর এই ভাষণ শুনে আবারও চিন্তা-ভাবনার জন্য সময় চাইল। [১]

তৃতীয়বার মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত হুযাইফা বিন মিহসান رضی اللہ عنہ আলোচনার জন্য গেলেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। পরিশেষে আবারও হযরত মুগীরা বিন শু'বা رضی اللہ عنہ-কে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য পাঠানো হলো। তিনি রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন এবং অত্যন্ত সাবলীলভাবে সরাসরি তার সিংহাসনে তার পাশেই গিয়ে বসলেন। দরবারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে শোরগোল শুরু করলে হযরত মুগীরা رضی اللہ عنہ বললেন:

"এতে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি, আর তোমাদের প্রভুর সম্মানেও কোনো ঘাটতি পড়েনি।"

ততক্ষণে রুস্তম বুঝে ফেলেছিল যে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব নয়, তাই সে মুসলমানদের প্রতিনিধিকে ভীত করার আপ্রাণ চেষ্টা করল। রুস্তম অহংকারী সুরে আরবদের তুচ্ছজ্ঞান করে বলল:

"তোমরা সেই মাছির মতো যারা অন্যের সাহায্যে মধুর পাত্র পর্যন্ত পৌঁছায় এবং তারপর তাতে পড়ে এমনভাবে আটকে যায় যে বের হওয়ার জন্য অন্যের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে হয়। তোমরা সেই কৃশকায় ও লোভী শিয়ালের মতো যে একটি গর্ত দিয়ে আঙুর বাগানে প্রবেশ করে এবং খেয়ে খেয়ে এত মোটা হয়ে যায় যে আর বের হতে পারে না এবং মালির হাতে মারা পড়ে।"

তার এই কথাগুলো থেকে সেই অহংকারের ভালো ধারণা পাওয়া যায় যা অনারবদের (আজমিদের) রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছিল। এটাই ছিল সেই ব্যাধি যা তাদের সত্য কথা গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছিল।

হযরত মুগীরা رضی اللہ عنہ তার আস্ফালন শুনতে থাকলেন এবং সে চুপ হওয়া মাত্রই মোক্ষম জবাব হিসেবে চমৎকারভাবে বললেন:

"আসল কথা হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী صلی اللہ علیہ وسلم-এর উসিলায় আমাদের হেদায়েতও দান করেছেন এবং রিজিকও। সেই রিজিকের একটি অংশ তোমাদের এই ভূখণ্ডে রয়েছে। যখন থেকে আমরা এর কিছু দানা আমাদের পরিবার-পরিজনকে খাইয়েছি, তারা জেদ ধরছে যে এই দেশ দ্রুত জয় করো যাতে আমরা এই ফসল সর্বদা খেতে পারি।"

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৬২২, দার হিজর

রুস্তম এ কথা শুনে আত্মহারা হয়ে গেল এবং চিৎকার করে বলল: “ঠিক আছে, তাহলে আমরা তোমাদের হত্যা করেই দম নেব।”

হযরত মুগীরা বিন শুবা অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বললেন:

“আমরা যদি নিহত হই তবে জান্নাতে প্রবেশ করব, আর তোমরা নিহত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।”

রুস্তম রাগ চেপে রেখে এবং আবারও উদারতা প্রদর্শন করে বলল: “তোমাকে একটি খিলআত (রাজকীয় পোশাক) দেওয়া হচ্ছে এবং তোমাদের সেনাপতিকে পোশাক ও ঘোড়াসহ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। ব্যাস, এখন তোমরা ফিরে যাও।”

হযরত মুগীরা বিন শুবা পাল্টা বিদ্রূপ করে বললেন:

“বাহ! তোমাদের সাম্রাজ্যকে পরাজিত করার এবং তোমাদের শান-শওকত ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার পর আমরা এত সহজে কীভাবে চলে যাব? এখন তো শুধু এতটুকুই বাকি আছে যে, আগামীকাল তোমরা নাক ঘষে আমাদের গোলামি করতে বাধ্য হবে।”

রুস্তমের সারা শরীরে আগুন ধরে গেল। সে গর্জন করে বলল:

“সূর্যের কসম! আগামীকাল আমি তোমাদের সবাইকে মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দেব।”

“যা হওয়ার তা তোমরা আগামীকালই জানতে পারবে।”

হযরত মুগীরা নির্ভীকভাবে এ কথা বললেন এবং ফিরে আসলেন। [১]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/৬২৩, ৬২৪, দার হিজর।

## জঙ্গ-এ-কাদিসিয়া

সেই দিন রুস্তম বাহিনীকে কুচকাওয়াজের নির্দেশ দিল। দ্বিগুণ বর্ম এবং উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ পরিধান করে সে এক লাফে তার বিদ্যুৎগতির ঘোড়ায় চড়ে বসল এবং চিৎকার করে বলল: "কাল আমি আরবদের মিটিয়ে দেব।" একজন অফিসার বলল: "যদি আল্লাহ চান।" রুস্তম ধমক দিয়ে বলল, "আল্লাহ না চাইলেও।"

সে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সাবাতের ছাউনি থেকে বের হলো; মুসলমানরা ফোরাত নদীর পশ্চিমে তাঁবু গেড়েছিল। রুস্তম এখানে পৌঁছে নৌকার অস্থায়ী সেতু তৈরির পরিবর্তে কাঠ, মাটি ও পাথর ভরাট করে রাতারাতি একটি মজবুত রাস্তা তৈরি করাল। সকাল হতেই সে নদী পার হয়ে তীরের সাথে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নিল। ত্রিশ হাজার বাছাইকৃত ইরানি বীর শিকল পরে কাতারবদ্ধ হয়েছিল যাতে কেউ তাদের কাতার ভাঙতে না পারে এবং তারা নিজেরাও পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। আঠারোটি যুদ্ধ-হাতি লস্করের মাঝখানের কাতারগুলোতে এবং পনেরোটি উভয় পার্শ্বের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের হাওদায় অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজরা বসে ছিল। রুস্তম তার বাহিনীর পেছনে নদীর তীরে একটি চমৎকার সিংহাসনে বসে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করছিল। ইরানের সম্রাট ইয়াজদগিরদ যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে মুহূর্তের খবর জানার জন্য কাদিসিয়া থেকে তার শহর মাদায়েন পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় ঘোষক নিযুক্ত করেছিলেন, যারা একে অপরের কাছ থেকে বার্তা শুনে উচ্চস্বরে সামনে পৌঁছে দিচ্ছিল। এভাবে রুস্তমের কথা ইয়াজদগিরদ পর্যন্ত এবং তার কথা রুস্তম পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছিল।

এদিকে মুসলমানরা তাদের কাতার বিন্যাস করছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে, লস্করের আমির সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীরে ফোঁড়া হয়েছিল। তিনি এত কষ্টে ছিলেন যে বসতেও পারতেন না, দাঁড়াতেও পারতেন না। তিনি তার লস্করের পেছনে একটি ধ্বংসাবশেষ সদৃশ দালানের ছাদে বুকের নিচে বালিশ দিয়ে এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন যে পুরো যুদ্ধক্ষেত্র তার সামনে ছিল। এটি ছিল ১৫ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের দিনগুলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থতা সত্ত্বেও বাহিনীকে সম্বোধন করলেন এবং তাদের সাহস জুগিয়ে বললেন: "হে মুসলমানগণ! আল্লাহ জাল্লা শানুহু-এর ইরশাদ হলো:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [১]

(আমরা উপদেশের পর যবুরেও লিখে দিয়েছি যে, আমার নেক বান্দারাই হবে জমিনের উত্তরাধিকারী।) হে লোকসকল! এই জমিন তোমাদের মিরাস, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কৃত ওয়াদা। যদি তোমরা দুনিয়ার লোভী না হও এবং আখিরাতের প্রত্যাশী হও, তবে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়াও দেবেন এবং আখিরাতও। আর যদি তোমরা ভীরুতা ও দুর্বলতা দেখাও, তবে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চলে যাবে এবং তোমাদের আখিরাতও বরবাদ হয়ে যাবে।"

---

[১] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৫

বাহিনীর অন্যান্য সেনাপতিরাও নিজ নিজ জানবাজ সৈন্যদের সামনে ভাষণ দিয়ে তাদের সাহস ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। যেহেতু হযরত সাদ (রা.)-এর অসুস্থতার কথা অধিকাংশ সৈন্যের জানা ছিল না, তাই তাকে বাহিনীর পেছনে একটি ভবনে দেখে কিছু লোক আপত্তি তুলল এবং একে আরামপ্রিয়তা হিসেবে গণ্য করতে লাগল। হযরত সাদ (রা.) যখন এটি জানতে পারলেন, তখন সামনে এসে নিজের শরীরের ফোঁড়াগুলো দেখালেন, যাতে কারো আপত্তির সুযোগ না থাকে।

আপনি হযরত খালিদ বিন উরফুতা উজরি (রা.)-কে ময়দানে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন যাতে অধীনস্থ সেনাপতিরা তার আহ্বানে সাড়া দেয়। আবু মাহজান সাকাফি (রা.) খালিদ বিন উরফুতা (রা.)-এর নিয়োগের সাথে একমত হননি। হযরত সাদ (রা.) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে সেই ভবনেই বন্দি করে দিলেন যার ছাদে তার বসার স্থান ছিল। [১] হযরত সাদ (রা.) এই নিয়ম করলেন যে, চিরকুটে নির্দেশনা লিখে লিখে নিচে খালিদ বিন উরফুতা (রা.)-এর কাছে পাঠাতে থাকলেন এবং তিনি এই বার্তাগুলো বাহিনীর সেনাপতিদের কাছে পৌঁছে দিতে থাকলেন। [২]

**ইয়াওমে আরমাস:**

জোহরের সময় পর্যন্ত উভয় বাহিনী নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে রইল। [৩] আমীরুল লশকরের নির্দেশে কাতারগুলোর বিভিন্ন স্থানে সূরা আল-আনফাল তিলাওয়াত করা হতে লাগল। মুসলমানরা কাতারবদ্ধ অবস্থাতেই জোহরের নামাজ আদায় করলেন। অবশেষে হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-এর প্রথম তকবির ধ্বনিত হলো এবং সবাই বুঝে নিলেন যে এখন আক্রমণ শুরু হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় তকবির উচ্চকিত হলো এবং সবাই অস্ত্রশস্ত্র সামলে নিলেন। তৃতীয় তকবির শুনে ইসলামী বাহিনীও ‘আল্লাহু আকবার’ বলে আকাশবিদারী স্লোগান দিল। সেই সাথে তীরন্দাজরা তীর বর্ষণ করল এবং অশ্বারোহীরা নেজা তাক করে সামনে এগিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর চতুর্থ তকবির ধ্বনিত হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরো ইসলামী বাহিনী একযোগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। [৪]

যুদ্ধে ইরানি শাহজাদা হরমোজ মুকুট পরিহিত অবস্থায় হযরত গালিব বিন আব্দুল্লাহ আসাদি (রা.)-এর মোকাবিলায় এল এবং বন্দি হলো। আরেকজন পারস্য অফিসার মূল্যবান কঙ্কণ ও রত্নখচিত কোমরবন্ধ পরে আস্ফালন করতে করতে সামনে এলে হযরত আমর বিন মাদি কারিব (রা.) তার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে খঞ্জর দিয়ে জবাই করে দিলেন। [৫] এখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হযরত সাদ (রা.) প্রাসাদের ছাদ থেকে অনবরত বাহিনীর নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তার নির্ভীকতার অবস্থা এমন ছিল যে, প্রাসাদের দরজাগুলো খোলা ছিল এবং কোনো প্রহরী ছিল না। ঐতিহাসিকরা লেখেন যে, যদি মুসলমানদের পিছু হটতে হতো, তবে ইরানিরা সরাসরি প্রাসাদে ঢুকে হযরত সাদ (রা.)-কে বন্দি করতে পারত, কিন্তু হযরত সাদ (রা.)-এর এই বিপদের কোনো পরোয়া ছিল না। [৬]

আরবদের বনু বাজিলা গোত্রের অশ্বারোহীরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল, ইরানিরা সতেরোটি হাতির বহর নিয়ে তাদের...

---

[১] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ১০/ ১০১, ১০৭... আবু মাহজানকে বন্দি করার পরিবর্তে তার কিছু কবিতাও ছিল। বিস্তারিত সামনে আসছে।

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ১০/ ১০৭

[৩] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওজি: ৩/ ৭২

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/ ৩০৩

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/ ৩০৩, ত দারুল কিতাব আল-আরাবি

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/ ১৩২, দার হাজার

...বুখারের দিকে। ঘোড়াগুলো হাতি দেখে ভড়কে গেল এবং বনু বাজিলাহ-এর ব্যূহ ভেঙে যেতে লাগল। হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ বনু আসাদ-এর একটি বাহিনীকে তাদের সাহায্যের জন্য পাঠালেন। এখন হাতির পাল বনু আসাদ-এর দিকে ধাবিত হলো এবং তাদের পিষ্ট করতে শুরু করল। হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অস্থির হয়ে হযরত আসিম বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন: "এই হাতিগুলো থেকে বাঁচার কি কোনো উপায় আছে?" তিনি বললেন: "কেন নয়।" এই বলে তিনি নিজের গোত্রের সেরা তীরন্দাজদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন এবং তীরের এমন তীব্র বর্ষণ করলেন যে কোনো মাহুতই আহত হওয়া থেকে রক্ষা পেল না। বনু তামিম-এর বীররা হাতির হাওদাগুলো উল্টে দিলেন এবং সেগুলো ভেঙে চুরমার করে দিলেন। মাহুতরা নিচে পড়ে গিয়ে পিছু হটল এবং এভাবেই এই কালো ঝড়ের গতিপথ ঘুরে গেল। [১]

ইতিহাসের পাতায় এই প্রথম দিনের যুদ্ধকে 'ইয়াওমুল আরমাছ' নামে স্মরণ করা হয়।

**ইয়াওমুল আগওয়াছ:**

প্রথম দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক শহীদ ও আহত হয়েছিলেন। শহীদদের দাফন এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পর পরের দিন মুসলমানরা পুনরায় সারিবদ্ধ হলেন। যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি, এমন সময় হঠাৎ হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই হযরত হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সিরিয়া রণাঙ্গনে হযরত আবু উবাইদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অধীনে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদাহকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, ইরাক রণাঙ্গন থেকে যে সকল মুসলমান খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাহায্যের জন্য সিরিয়া পাঠানো হয়েছিল, তাদের যেন হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাহায্যের জন্য পুনরায় ইরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এই বাহিনী পুনরায় এখানে ফিরে আসে, যার ফলে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

এই বাহিনীর আগমনের বিন্যাস এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, দশজন করে সৈন্য তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে কিছুক্ষণ পরপর এসে ইসলামী লস্করে যোগ দিতে থাকে। সারাদিন এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং শত্রু মনে করে যে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য বিশাল এক বাহিনী এসেছে। সর্বপ্রথম যে বাহিনীটি এসে যোগ দেয় তার আমির ছিলেন হযরত কাকা বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, যাঁর বীরত্ব ও দূরদর্শিতার ব্যাপক খ্যাতি ছিল। তাঁর সম্পর্কে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি ছিল: "যে লস্করে তাঁর মতো ব্যক্তি থাকে, তারা পরাজিত হতে পারে না।" তিনি এসেই ইরানিদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন যে, "কোনো বীর থাকলে সামনে এসো।"

মোকাবিলায় পারস্য সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সেনাপতি বাহমান স্বয়ং এগিয়ে এল, যে যুল হাজিব উপাধিতে পরিচিত ছিল। সে-ই জাসরের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করেছিল, যাতে হযরত আবু উবাইদাহ সাকাফি রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছিলেন।

হযরত কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখামাত্রই চিৎকার করে উঠলেন: "হায় আবু উবাইদাহ এবং জাসরের শহীদদের প্রতিশোধ!!!"

এই বলে তিনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ উভয়ের তলোয়ারের ঝনঝনানি চলল, অবশেষে হযরত কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধরাশায়ী করলেন। এরপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সিরিয়া থেকে আসা সাহায্যকারী বাহিনীর দশজন করে লোকের কোনো দল যখনই দিগন্তে দৃশ্যমান হতো, হযরত কাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে যোগ দিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। গত দিনের যুদ্ধের...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩০৬

মুসলমানরা হাতিদের হাওদাগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, ইরানিরা তখন পর্যন্ত সেগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারেনি, তাই তারা সেদিন হাতিগুলোকে ময়দানে আনতে পারেনি। ফলে মুসলিম অশ্বারোহীরা বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল।

এদিকে হযরত কা'কা' বিন আমর (রা.) ইরানিদের ঘোড়াগুলোকে আতঙ্কিত করার জন্য এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি নিজের উটগুলোকে কালো চাদর পরিয়ে ইরানি অশ্বারোহীদের সামনে নিয়ে আসলেন। উটগুলোকে এমনভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল যাতে তারা ময়দান থেকে পালাতে না পারে এবং শত্রুর ওপর একযোগে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু যখন এই আরবীয় উটগুলো চাদর পরিহিত অবস্থায় সামনে আসলো, তখন ইরানি ঘোড়াগুলো ভড়কে গেল এবং তাদের কাতারগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

ইরানি বাহিনীর একটি দক্ষ তীরন্দাজ দল ছিল যারা উজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত ছিল এবং তাদের স্বর্ণ ও রূপার কঙ্কণ ও কোমরবন্ধ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন তীরন্দাজ অনবরত মুসলমানদের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছিল। এই সময় আমর বিন মাদী কারিব (রা.) চিৎকার করে বললেন: "হে মুসলমানরা! পারস্যের ভেড়াগুলোকে দেখাও যে নেকড়েরা এসে গেছে।" এই বলে তিনি সেই দিকে অগ্রসর হলেন।

একজন মুসলমান চিৎকার করে বললেন: "আবু সাওর! এই পারসিক থেকে বেঁচে থেকো, তার কোনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।" হযরত আমর বিন মাদী কারিব (রা.) সেই তীরন্দাজের দিকে তাকালেন এবং তারপর তার দিকে ধাবিত হলেন। তীরন্দাজ ধনুকে তীর চড়িয়ে ছেড়ে দিল যা শোঁ শোঁ শব্দ করে আসছিল। হযরত আমর বিন মাদী কারিব (রা.) সতর্ক ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে নিচু করলেন, তীরটি তার ওপর দিয়ে চলে গেল। এর আগে যে তীরন্দাজ দ্বিতীয় তীরটি ধনুকে চড়াবে, আমর বিন মাদী কারিব (রা.) তার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তাকে জাপটে ধরে তার ঘাড় মটকে দিলেন। এরপর তার স্বর্ণের কঙ্কণ, সোনালী কোমরবন্ধ এবং রেশমি জ্যাকেট খুলে নিলেন। [১]

আবু মাহজান (রা.)-এর বীরত্ব:

আবু মাহজান সাকাফি (রা.)-কে যুদ্ধের আগে সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে পায়ে শিকল পরিয়ে প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, যার ছাদে হযরত সা'দ (রা.) বসে ছিলেন। হযরত আবু মাহজান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার দুঃখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই কবিতাগুলো পড়তে লাগলেন:

كَفَى حُزْنًا أَنْ تَدْحَمَ الْخَيْلُ بِالْقَنَا وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا

"কতই না দুঃখের বিষয় যে, ঘোড়সওয়াররা বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে এখানে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে।"

হযরত সা'দ (রা.)-এর দাসী যাহরা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবু মাহজান তাকে অনুরোধ করলেন:

"আমার শিকল খুলে দাও এবং আমাকে একটি ঘোড়া দাও। আমি যদি সন্ধ্যায় ফিরে আসি তবে আমাকে আবার বেঁধে দিও।"

দাসীর দয়া হলো, সে তাকে মুক্ত করে হযরত সা'দ (রা.)-এর ঘোড়াটি তার হাতে তুলে দিল। তিনি সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেলেন এবং এমন বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন যে লাশের স্তূপ জমিয়ে দিলেন। মানুষ অবাক হয়ে ভাবছিল যে ময়দানে আসা এই বীর কে?

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/৬৩৩।

হযরত সাদ (রা.)-এর দৃষ্টি যখনই তাদের ওপর পড়ত, তিনি অনুভব না করে পারতেন না যে, এই যোদ্ধা আবু মিহজানের মতোই লড়াই করছে এবং ঘোড়াটিও আমার ঘোড়ার মতোই। আবার ভাবতেন যে, আবু মিহজান তো বন্দি। সারাদিন এই রহস্যের সমাধান হলো না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যুদ্ধ থেমে গেল এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল। আবু মিহজান (রা.)-ও নিজের জায়গায় ফিরে এসে আগের মতো নিজেকে শিকলবন্দি করে নিলেন। হযরত সাদ (রা.) নিচে নেমে সবার আগে নিজের ঘোড়ার কাছে গেলেন এবং দেখলেন সেটি ঘামছে। তদন্ত করলে সব সত্য সামনে চলে এল। হযরত সাদ (রা.) আবু মিহজান (রা.)-এর বীরত্বে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাকে মুক্ত করে দিলেন। [১]

**আবু মিহজানের ওপর মদ্যপানের অভিযোগ এবং এর বাস্তবতা:**

এখানে এই বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আবু মিহজান (রা.)-কে মদ্যপানের কারণে বন্দি করা হয়েছিল। তবে এই বর্ণনাগুলো অত্যন্ত দুর্বল। গবেষকদের মতে, হযরত আবু মিহজান (রা.)-কে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ তিনি হযরত সাদ (রা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে খালিদ বিন আরফাতাহ (রা.)-এর নিয়োগের ওপর আপত্তি জানিয়েছিলেন, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে আরও একটি কারণ ছিল, আর তা হলো তিনি এমন কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন যাতে মদ্যপানের উল্লেখ ছিল। হযরত সাদ (রা.)-এর কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হয়েছিল। ইবনুল আসির আল-জাযারি (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবু মিহজান (রা.)-কে তার শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম, আমি কোনো হারাম জিনিস পান করার কারণে বন্দি হইনি। বরং আমি ইসলাম গ্রহণের আগে কবি ছিলাম এবং মদ্যপায়ীও ছিলাম। মদ্যপান সম্পর্কে কিছু কবিতা আমার মুখে চলে আসত। তাই হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস আমাকে বন্দি করেছেন।” [২]

দ্বিতীয় দিনের এই লড়াই ‘ইয়াওমে আগওয়াস’ নামে স্মরণ করা হয়। এতে প্রায় দুই হাজার মুসলমান শহীদ ও আহত হন, যেখানে ইরানিদের ক্ষয়ক্ষতি দশ হাজার ব্যক্তির কম ছিল না। [৩]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/৬৩৪, দার হিজর।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৩০৬ থেকে ৩০৯।

ফায়দা ১: কিছু বর্ণনায় আবু মিহজান (রা.)-কে শিকল থেকে মুক্ত করা এবং ঘোড়া সরবরাহ করার ক্ষেত্রে হযরত সাদ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত সালমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা অধিকতর সঠিক মনে হয়। কিছু বর্ণনায় আছে যে, এই কাজটি হযরত সাদ (রা.)-এর অগোচরে করা হয়েছিল। এর সঠিক রূপ হলো এই যে, তিনি হযরত সালমার অনুমতিতে এই কাজ করেছিলেন। দাসীদের জন্য পর্দার বিধান কিছুটা শিথিল, তাই তারা এই ধরনের কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। এটি অনেক দূরের কথা যে হযরত সালমা আবু মিহজান (রা.)-কে মুক্ত করা এবং ঘোড়া দেওয়ার কাজ নিজেই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কারণ সেই সময়ের শরীয়তসম্মত পর্দার পরিবেশে এটি মূল্যবোধের পরিপন্থী ছিল। তবে যদি এমন কোনো কঠোর প্রয়োজন দেখা দেয় তবে শরীয়তে এর অবকাশ রয়েছে, যেমনটি যুদ্ধের অবস্থায় আহতদের সেবা-শুশ্রূষার ক্ষেত্রে সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। (সহীহ বুখারী, হা: ২৮৮৩, ২৮৮৪, কিতাবুল জিহাদ, বাব মুদাওয়াতুন নিসা আল-জারহা ফিল গাযউ)। তবে জিহাদে নারীদের অংশগ্রহণ এবং পুরুষদের সেবা-শুশ্রূষার অর্থ এই নেওয়া যে, ‘প্রথম যুগের ইসলামী সমাজে পর্দার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং পর্দা পরবর্তীকালে মৌলভীরা উদ্ভাবন করেছেন’—এটি সম্পূর্ণ ভুল হবে।

ফায়দা ২: সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর এই স্ত্রীর নাম ছিল সালমা বিনতে হাফসা। তিনি প্রথমে মুসান্না বিন হারিসা (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন, তার শাহাদাতের পর সাদ (রা.)-এর সাথে তার বিবাহ হয়। (আল-ইসাবাহ: ৫/৫৬৯; আসাদুল গাবাহ: ৫/৫৫; আল-ইসতিয়াব: ৩/১৩৫৬, তরজমা মুসান্না বিন আল-হারিসাহ)।

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৩০৯।

**খানসা বিনতে আমরের জিহাদের জযবা:**

খানসা বিনতে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহা (যাঁর আসল নাম ছিল "তামাযুর") আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কাব্যশিল্পের বিশেষজ্ঞদের মতে, আরবদের ইতিহাসে তাঁর মতো উচ্চমানের নারী কবি তাঁর আগে কখনও অতিবাহিত হয়নি এবং পরেও নয়। জাহেলিয়াত যুগের একটি যুদ্ধে তাঁর এক ভাই মুয়াবিয়া নিহত হন এবং অন্য ভাই সাখর গুরুতর আহত হন। খানসা এক বছর পর্যন্ত সাখরের সেবা-শুশ্রূষা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। খানসা শোক ও দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। এর আগে তিনি মাঝেমধ্যে দু-একটি কবিতা বলতেন, কিন্তু এখন শোকের আগুন শোকগাথা (মারসিয়া) রচনার রূপ ধারণ করল এবং আল্লাহর এই বান্দী এমন হৃদয়বিদারক শোকগাথা রচনা করলেন যে বড় বড় কবিরা বিস্ময়ে মাথা দোলাতে থাকতেন।

এরপর আল্লাহ তাঁকে ইসলামের সৌভাগ্য দান করেন। তিনি তাঁর গোত্র বনু সুলাইমের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং নিজের সন্তানদেরসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবিতাগুলো খুব পছন্দ করতেন। তিনি অনুরোধ করে তাঁর কালাম শুনতেন এবং প্রশংসা করতেন। [১]

কাদিসিয়ার যুদ্ধে খানসা বিনতে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর চার সন্তানসহ অংশগ্রহণ করেন। যে রাতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা ছিল, তিনি সন্তানদের একত্রিত করলেন এবং বললেন:

"হে আমার সন্তানেরা! তোমরা নিজেদের ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ। নিজেদের ইচ্ছায় হিজরত করেছ। সেই আল্লাহর কসম যাঁর ছাড়া কোনো মাবুদ নেই! তোমরা একই পিতার সন্তান যেমন তোমাদের মা একজনই। আমি না তোমাদের পিতার সাথে খেয়ানত করেছি, না তোমাদের মামাদের লজ্জিত হতে দিয়েছি। তোমাদের বংশমর্যাদায় কোনো কলঙ্ক লাগাইনি। তোমরা জানো যে, আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিনিময়ে কত বড় প্রতিদান রেখেছেন। মনে রেখো! আখেরাতের আবাস চিরস্থায়ী, আর দুনিয়ার জীবন নশ্বর। আল্লাহর বাণী: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। [২] সকালে তোমরা পূর্ণ জযবার সাথে তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য যাবে। ইনশাআল্লাহ তোমরা আল্লাহর সাহায্যে তাঁর শত্রুদের ওপর বিজয়ী হবে। যখন তোমরা দেখবে যে যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তখন এর কঠিনতম স্থানগুলোতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ তোমরা জান্নাতে সম্মানের স্থান লাভ করবে।"

পরের দিন চার সন্তান বীরত্বগাথা (রজয) পাঠ করতে করতে পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একের পর এক শহীদ হতে থাকেন। এমনকি চারজনই শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হন। সেই খানসা রাযিয়াল্লাহু আনহা যিনি নিজের দুই ভাইয়ের শোকে শোকগাথা গেয়ে পুরো আরবকে কাঁদিয়েছিলেন, চার সন্তানের শাহাদাতের খবর শুনে বললেন: "আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে তাঁদের শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আশা করি তিনি আমাকে তাঁদের সাথে তাঁর রহমতের দরবারে স্থান দেবেন।" [৩] [৪]

---

[১] আল-ইসতিয়াব: ৪/১৮২৭; আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত: ১০/২৩৯ থেকে ২৪২

[২] সূরা আল ইমরান, আয়াত: ২০০

[৩] উসুদুল গাবাহ: ৭/৮৯, ত. ইলমিয়্যাহ

ইয়াওমে ইমাস:

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ 'ইয়াওমে ইমাস' নামে পরিচিত। রাতেই হযরত কাকা (রা.) কয়েকজন সেনাদলকে রণক্ষেত্র থেকে বেশ দূরে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সকালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যেন তারা নিজেদের একশ একশ জনের দলে বিভক্ত করে একের পর এক ময়দানে আসতে থাকে। ফলে সকালে যখন মুসলমান ও ইরানিরা মুখোমুখি হলো, তখন তারা তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে দলে দলে আসতে শুরু করল, যার ফলে ইরানিদের ওপর ত্রাস সৃষ্টি হলো। সবশেষে হযরত হাশিম বিন উতবা (রা.) তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে এভাবে দলে দলে বিভক্ত হয়ে ময়দানে নামলেন।

যুদ্ধ শুরু হলে প্রথমে এক বিশালদেহী পারস্য বীর এসে হুঙ্কার দিল। একজন খর্বকায় মুসলমান শুবর বিন আলকামা তার দিকে এগিয়ে গেলেন। বীরটি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল, শুবর বিন আলকামাকে বাহুবন্দি করে নিচে ফেলে দিল এবং তার বুকের ওপর চড়ে বসে তাকে জবাই করার জন্য তলোয়ার বের করল। কিন্তু তার তলোয়ারটি ভোঁতা ছিল, যার ফলে সেটি তার ঘোড়ার জিনের সাথে আটকে গিয়েছিল। বীরটি যখন আবার উঠে দাঁড়াল এবং ঘোড়ার জিনের সাথে ধস্তাধস্তি করতে লাগল, শুবর (রা.) তা দেখে তার পেছনে দৌড়ালেন এবং সেই বীরকে খতম করে দিলেন।

এই দিন ইরানিদের হাতিগুলো ময়দানে উপস্থিত ছিল এবং তাদের সুরক্ষার জন্য পদাতিক ও অশ্বারোহীদের কঠোর পাহারা ছিল। ফলে মুসলমানদের আক্রমণে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ আগের মতোই ঘোড়াগুলো হাতির সামনে আসতে ভয় পাচ্ছিল। হযরত আমর বিন মাদি কারিব (রা.) একটি হাতির দিকে ইশারা করে নিজের গোত্রের লোকদের বললেন: "আমি এই হাতি এবং এর পাহারাদারদের ওপর আক্রমণ করছি, যদি আমি কিছুক্ষণ না ফিরি তবে তোমরা আমার পেছনে চলে এসো, অন্যথায় আমাকে হারাবে, আর আমার মতো কাউকে আর পাবে না।"

এই বলে তিনি ইরানিদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং ধুলোবালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যখন বেশ কিছুক্ষণ তিনি ফিরে এলেন না, তখন তার সঙ্গীরা ইরানিদের ব্যূহ ভেঙে তার পেছনে গেলেন। ততক্ষণে তিনি আহত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বীরত্বের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। তার সঙ্গীরা তাকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করে আনলেন। তার ঘোড়াও আহত হয়েছিল। ইতিমধ্যে একজন পারস্য সৈন্য তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি তার ঘোড়ার পা ধরে ফেললেন। ইরানি সৈন্যটি তার ঘোড়াকে অনেক চাবুক মারল কিন্তু কোনো লাভ হলো না, অবশেষে সে নিচে নেমে পালিয়ে গেল এবং তিনি তার ঘোড়ায় চড়ে বসলেন।

হাতিদের ধ্বংসলীলা দেখে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন যে, এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সবার আগে জরুরি। ইরানিদের একটি সাদা এবং একটি খুজলিযুক্ত হাতি সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল। হযরত সাদ (রা.) হযরত কাকা বিন আমর এবং হযরত আসিম বিন আমর (রা.)-কে বার্তা পাঠালেন: "সাদা হাতিটিকে খতম করো।"

আমিরের নির্দেশে লাব্বাইক বলে হযরত আসিম এবং হযরত কাকা (রা.) বর্শা হাতে নিয়ে সাদা হাতির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দুজনেই একসাথে তার চোখে আঘাত করলেন। চোখে আঘাত লাগার সাথে সাথেই সাদা হাতিটি চিৎকার করতে লাগল, এর ওপর বসা মাহুত এবং তীরন্দাজরা নিচে পড়ে গেল। এদিকে হযরত কাকা (রা.) তলোয়ার দিয়ে হাতির শুঁড়ে আঘাত করে তা কেটে ফেললেন।

আঘাতপ্রাপ্ত হাতিটিরও একইভাবে চোখ উপড়ে ফেলে সেটিকে অকেজো করে দেওয়া হলো। এই হাতিগুলো আহত হয়ে পলায়ন করলে অন্য হাতিগুলোও তাদের অনুসরণ করল এবং ময়দান তাদের থেকে খালি হয়ে গেল। এখন মুসলিম অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর জন্য শক্ত হয়ে লড়াই করার সুযোগ তৈরি হলো। ততক্ষণে সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করেছিল। মুসলিমরা জীবন বাজি রেখে সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। বিপরীতে ইরানিরাও অসাধারণ উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। [১]

**লায়লাতুল হারীর**

এটি ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ, তাই সূর্যাস্তের পরেও তলোয়ারের ঝিলিক অব্যাহত ছিল। যোদ্ধারা ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল, কিন্তু কোনো এক পক্ষের পূর্ণ পরাজয় ছাড়া যুদ্ধ থামা এখন অসম্ভব ছিল। মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে লড়াই করে যাচ্ছিল। সারা রাত কেউ পানাহারের সুযোগ পায়নি, না বিশ্রাম বা কথা বলার। সবার হাতে ছিল অস্ত্র আর মুখে ছিল রণধ্বনি, তাই এই রাতকে 'লায়লাতুল হারীর' (শোরগোল ও আর্তনাদের রাত) বলা হয়, যাতে বীরদের হুঙ্কার আর আহতদের আর্তনাদে কিয়ামতের দৃশ্য বিরাজ করছিল।

হযরত কাকা বিন আমর (রা.) হযরত আসিম বিন আমর এবং হযরত কাইস বিন হুবাইরা (রা.)-এর মতো ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে সারা রাত কৌশল পরিবর্তন করে করে আক্রমণ চালিয়ে যান, যার পরিকল্পনা তিনি নিজেই করেছিলেন। হযরত সাদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন: "হে আল্লাহ! তাদের ক্ষমা করুন, তাদের সাহায্য করুন, আমার পক্ষ থেকে তাদের অনুমতি রইল, যদিও তারা আমার থেকে অনুমতি নিতে পারেনি।" [২]

এই আক্রমণগুলো ইরানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করল, কিন্তু তবুও জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হতে পারল না।

**ইয়াওমে কাদিসিয়া**

সকাল নাগাদ উভয় বাহিনী লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এটি ছিল শেষ দিনের লড়াই যা 'ইয়াওমে কাদিসিয়া' নামে পরিচিত, যা দুপুর পর্যন্ত সমানতালে চলতে থাকে। হযরত কাকা (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখন শত্রুর নেতৃত্বকে খতম করার মাধ্যমেই যুদ্ধকে সমাপ্তিতে পৌঁছানো সম্ভব। তিনি নিজের বীরদের উৎসাহিত করে বললেন:

"এখন যে-ই এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করবে, সেই জয়ী হবে। তোমরা আর কিছুক্ষণ দৃঢ়পদ থাকো এবং আক্রমণ করো, আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের সাথে শর্তযুক্ত।"

একথা বলে তিনি হযরত আমর বিন মাদি কারিব (রা.) এবং তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদের মতো অনেক নামকরা তলোয়ারবাজদের সাথে নিয়ে ইরানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইরানি সেনাপতি ফিরুজান ও হরমুজান বাধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুসলিমদের এই স্রোত তাদের সারিগুলো তছনছ করে রুস্তমের কাছাকাছি পৌঁছে গেল, যে সেনাবাহিনীর পেছনের দিকে তার জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসনে বসে ছিল। মুসলিমদের আসতে দেখে রুস্তম নদীতে ঝাঁপ দিল, কিন্তু হিলাল বিন আলকামা নামক এক মুসলিম তার পেছনে পানিতে নেমে পড়লেন এবং তাকে পা ধরে টেনে কিনারায় নিয়ে এলেন। এরপর তলোয়ার দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন এবং তার সিংহাসনে চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন যে, "আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি।"

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/ ৩০৯, ৩১১

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/ ৩১১, ৩১২

এটি দেখে ইরানিদের অবশিষ্ট হুঁশও উড়ে গেল এবং তারা ময়দান থেকে পালাতে শুরু করল। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে দূর পর্যন্ত তাদের লাশের স্তূপ বানিয়ে দিল। [১] শিকল দিয়ে বাঁধা প্রখ্যাত ইরানি বীররা, যারা সংখ্যায় ত্রিশ হাজার ছিল, প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; মুসলমানরা বর্শা ও তীর মেরে তাদের সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। মোদ্দাকথা, ইরানি বাহিনীর অধিকাংশ অংশ কাদিসিয়াতে নাম-নিশানহীন হয়ে গেল। মুসলমানদের মোট সাড়ে ছয় হাজার ব্যক্তি শাহাদাতের সুধা পান করলেন। [২]

ইসলামি বাহিনীতে শিশুরাও ছিল এবং মহিলারাও। তাদের জিম্মায় মুজাহিদদের সেবার কাজ ছিল; শহীদদের কবর খনন করা এবং আহতদের দেখাশোনা করার দায়িত্বও তাদের ওপর ছিল। যুদ্ধ শেষ হলে শত্রুদের নিহতদের দেহ থেকে মূল্যবান পোশাক খোলার কাজ শিশুদের ওপর ন্যস্ত করা হলো যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের সামনে লাশের পর্দা নষ্ট না হয়। [৩]

কাদিসিয়া যুদ্ধের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; একটি মত হলো ১৪ হিজরির মহরম মাস, যা নিশ্চিতভাবেই ভুল; একটি মত ১৫ হিজরির শাওয়াল এবং একটি ১৬ হিজরির শাওয়াল মাস। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, শেষোক্ত মতটিই সঠিক।

**আমি কোনো বাদশাহ নই:**

হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কাদিসিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, প্রতিদিন খুব ভোরে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে ইরাকগামী মহাসড়কে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দুপুর পর্যন্ত প্রত্যেক আগন্তুক আরোহীর কাছে ইরাকি মুজাহিদদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতেন। এদিকে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দূতের মাধ্যমে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে মদিনা তাইয়্যেবার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে যখন মদিনার কাছে পৌঁছাল, তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইরেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে দেখামাত্রই জিজ্ঞাসা করলেন:

‘কোথা থেকে এসেছ?’ দূত হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিনত না এবং তার খলিফার কাছে পৌঁছানোর তাড়া ছিল, তাই সে না থেমেই বলল: ‘কাদিসিয়া থেকে।’ আপনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, ‘আল্লাহর বান্দা! আমাকে বলো সেখানে কী হয়েছে?’

দূত বলল: ‘আল্লাহ মুশরিকদের পরাজিত করেছেন।’

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে প্রশ্ন করতে থাকলেন এবং সে উত্তর দিতে থাকল। এমনকি আরোহী শহরে প্রবেশ করল। যখন সে দেখল যে লোকেরা তার সাথে দৌড়ানো ব্যক্তিকে আমিরুল মুমিনিন বলে সালাম করছে, তখন সে কেঁপে উঠল এবং বলল: ‘হযরত! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি আমাকে কেন বললেন না যে আপনি আমিরুল মুমিনিন।’

আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: ‘আমার ভাই! এতে সমস্যাই বা কী।’ [৪]

এরপর আপনি রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের একত্রিত করে একটি হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিলেন এবং বললেন:

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/ ৩১২ থেকে ৩১৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/ ৫৬৩, দারুল মাআরিফ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬/ ৫৩৬, দারু হাজার

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/ ৩১৫

“হে মুসলমানগণ! আমি কোনো বাদশাহ নই যে তোমাদের গোলাম বানিয়ে রাখব। আমি তো আল্লাহর গোলাম। হ্যাঁ, খিলাফতের দায়িত্ব আমার কাঁধে রাখা হয়েছে। আমি যদি আমার দায়িত্বগুলো এমনভাবে পালন করি যে তোমরা তোমাদের ঘরে শান্তিতে ঘুমাতে পারো, তবে তা হবে আমার সৌভাগ্য। আর যদি আমার ইচ্ছা এই হয় যে তোমরা আমার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকো, তবে তা হবে আমার দুর্ভাগ্য। আমি তোমাদেরকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চাই, কথার মাধ্যমে নয়।” [১]

**বাবেল থেকে মাদায়েন পর্যন্ত:**

রুস্তমসহ ইরানিদের অনেক বড় বড় সেনাপতি কাদিসিয়ায় নিহত হয়েছিল, কিন্তু হুরমুজান, কারিন এবং আরও অনেক সর্দার বেঁচে গিয়েছিল। তারা ছাড়াও আরও অনেক অভিজ্ঞ ইরানি সৈন্য এখনও বিভিন্ন কেল্লা ও শহরে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল।

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) হিদায়াতের ওপর ভিত্তি করে তাদের নির্মূল করার জন্য কাদিসিয়ার যুদ্ধের দুই মাস পর যুল-হিজ্জাহ ১৫ হিজরিতে সামনে অগ্রসর হলেন এবং ঐতিহাসিক শহর ‘বাবেল’ জয় করলেন। এরপর ‘কুফা’র দিকে হযরত যুহরাকে আমির বানিয়ে পাঠালেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এই শহরটি হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্মস্থান। এখানে নওয়াব শাহরিয়ার মোকাবিলার জন্য ব্যূহ রচনা করে নিজে সামনে এগিয়ে এসে হুঙ্কার দিল। হযরত যুহরা (রা.) তার দর্প চূর্ণ করার জন্য একজন শক্তিশালী গোলাম নায়েল বিন জুশামকে মোকাবিলার জন্য পাঠালেন। উভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হলেন। শাহরিয়ার নায়েলকে দুর্বল মনে করে নিজের বর্শা ছুড়ে মারল এবং তার ঘাড়ের দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। নায়েলও খালি হাতে ধস্তাধস্তি শুরু করলেন এবং উভয়েই ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে গেলেন। শাহরিয়ার এক হাত দিয়ে নায়েলের মুখ চেপে ধরল এবং অন্য হাত দিয়ে খঞ্জর বের করল যাতে তার গলায় চালিয়ে দিতে পারে। হঠাৎ নায়েল তার বৃদ্ধাঙ্গুলি এত জোরে কামড়ে ধরল যে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। শাহরিয়ার ব্যথায় কুঁকড়ে গেল এবং নায়েল তাকে নিচে ফেলে তার বুকের ওপর চড়ে বসলেন এবং চোখের পলকে তার খঞ্জর কেড়ে নিয়ে তার পেট চিরে ফেললেন। শাহরিয়ার মারা যাওয়ার সাথে সাথেই তার বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেল এবং সামান্য প্রতিরোধের পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। হযরত সাদ (রা.) পরে এখানে পৌঁছালেন। হযরত নায়েলের এই বীরত্বগাথা শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং শাহরিয়ারের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ও সওয়ারি পুরস্কার হিসেবে তাকে দান করলেন। নায়েল যখন শাহরিয়ারের দামী পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুসলমানদের মজলিসে এলেন, তখন একজন গোলামের এই শান-শওকত দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন।

ইরানি রাজধানী মাদায়েন দজলা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল। নদীর পশ্চিম তীরে এর নিরাপত্তার জন্য একটি কেল্লা ছিল যেখানে কিসরার পোষা একটি সিংহ রাখা হয়েছিল; এই কারণে এই স্থানটিকে ‘বহর শির’ বলা হতো। এখানে যুদ্ধ শুরু হলে ইরানিরা এই সিংহটিকেও মুসলমানদের ওপর ছেড়ে দিল। এদিক থেকে হযরত হাশিম বিন উতবা (রা.) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তলোয়ারের এমন আঘাত করলেন যে সিংহটি সেখানেই প্রাণ হারাল। এই বীরত্ব দেখে হযরত সাদ (রা.) হযরত হাশিম বিন উতবা (রা.)-এর কপালে চুমু খেলেন। ‘বহর শির’ কেল্লাটি দীর্ঘ অবরোধের পর সফর ১৬ হিজরিতে বিজিত হলো। [২]

---

[১] তারিখুত তাবারী: ৫/৫৭৩, দারুল মাআরিফ।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩২, ৩৩৫।

ইসলামী লশকর দজলার ঢেউয়ের মাঝে:

‘বহুরসীর’ দুর্গের পেছনের দরজা দজলা নদীর তীরে খুলত, যার ওপারে ইরানীদের রাজধানী মাদায়েন দেখা যেত। মুসলমানরা সেদিকে অগ্রসর হলেন কিন্তু মাঝপথে নদী উত্তাল ছিল। ইরানীরা সমস্ত পুল ভেঙে দিয়েছিল এবং নৌকাগুলো সরিয়ে ফেলেছিল। হযরত সাদ (রা.) সংবাদ পেলেন যে, ইয়াজদগিরদ তার সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র নিয়ে মাদায়েন থেকে পলায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি নদী পার হতে দেরি হয়, তবে সে সবকিছু নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যাবে এবং কোনো নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছে পুনরায় নতুন করে সৈন্য সমাবেশ করবে। তাই দজলা নদী অবিলম্বে পার হওয়া অপরিহার্য ছিল। হযরত সাদ (রা.) এই সমস্ত দিক মুসলমানদের সামনে তুলে ধরে বললেন:

“তোমাদের শত্রু সবদিক থেকে পালিয়ে নদীর ওপারে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এই এক ফোঁটা (পানি) তোমাদের থামাতে পারবে না। আমার অভিমত হলো, শত্রু সামলে ওঠার আগেই তাদের ঘিরে ফেলো। তাই আমি এখন আমার ঘোড়া নদীতে নামানোর সংকল্প করেছি।”

সবাই বললেন: “আমরা আপনার পেছনে আছি, আপনি কদম বাড়ান।” [১]

লশকর বা বাহিনীর প্রথম সারিতে উপস্থিত হুজর বিন আদি (রা.) উচ্চস্বরে ডেকে বললেন: “হে মুসলমানগণ! তোমাদের সামনে এই এক ফোঁটা পানির কী মর্যাদা? একে চিরে শত্রুর কাছে পৌঁছে যাও।” আল্লাহর বাণী হলো: “আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো প্রাণের মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়, এটি একটি সুনির্ধারিত সময়।” (আর কোনো প্রাণের জন্য মৃত্যু সম্ভব নয় আল্লাহর হুকুম ছাড়া, এটি একটি লিখিত সময়।) [২]

একথা বলে তিনি ঘোড়াসহ দজলা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। [৩]

এদিকে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) হযরত আসিম বিন আমর (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন ছয়শ তীরন্দাজ নিয়ে নদীর ঘাটে অবস্থানরত ইরানীদের থেকে সতর্ক থাকেন যাতে নদী পার হওয়ার সময় শত্রুর তীর নিক্ষেপের কোনো আশঙ্কা না থাকে। আসিম (রা.) ষাটজন অশ্বারোহী নিয়ে অপর তীরে পৌঁছালে সেখান থেকে পারস্যের প্রহরীরাও পথ রোধ করতে নদীতে নেমে এল। হযরত আসিম (রা.)-এর নির্দেশে মুসলমানরা বর্শা দিয়ে তাদের চোখের নিশানা বানিয়ে তাদের হত্যা করলেন। এদিকে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মুসলমানদের বললেন: “সবাই এই দোয়াটি পড়ুন:

‘نَسْتَعِيْنُ بِاللهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ وَلِيَّهُ وَلَيُظْهِرَنَّ دِيْنَهُ وَلَيُهْزِمَنَّ عَدُوَّهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ’ [৪]

(আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর ওপর ভরসা করি, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক; আল্লাহ অবশ্যই তাঁর বন্ধুকে সাহায্য করবেন, অবশ্যই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং অবশ্যই তাঁর শত্রুকে পরাজিত করবেন; গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো শক্তি এবং নেক কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই মহান আল্লাহর তৌফিক ছাড়া।)”

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৩৩৯

[২] আল-ইমরান, আয়াত: ১৪৫

[৩] তাফসীর ইবনে আবি হাতিম: ৩/৭৭৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

এই কথাগুলো বলতে বলতে সবাই নদীতে নেমে পড়লেন। সবার আগে হযরত সাদ [রা.] ঘোড়া নদীতে নামালেন। এই ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে এমনভাবে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যেন কোনো পাকা মহাসড়ক দিয়ে চলছেন।

হযরত সালমান ফারসি [রা.] হযরত সাদ [রা.]-কে বলছিলেন: "ইসলামি রূহ এখনো সতেজ আছে, তাই স্থলের মতো পানিকেও মুসলমানদের জন্য অনুগত করে দেওয়া হয়েছে। বাহিনী যেভাবে নদীতে নেমেছে, ঠিক সেভাবেই বাইরে বেরিয়ে আসবে।"

হযরত সাদ [রা.] বলছিলেন: "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল - যদি লস্করের মধ্যে অবাধ্যতা না থাকে এবং এমন গুনাহ না থাকে যা নেক আমলের ওপর প্রবল হয়ে যায়, তবে এমনই হবে।" [১]

মুসলমানদের এভাবে নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক চিত্তে পানির ওপর দিয়ে চলতে দেখে ইরানিদের ওপর এমন আতঙ্ক ছেয়ে গেল যে, তাদের অধিকাংশ "দিওয়ান আমদান, দিওয়ান আমদান" (জ্বিন-ভূত এসে গেছে) বলতে বলতে পালিয়ে গেল। [২]

**মুজাহিদের পেয়ালা এবং নদীর আমানতদারি:**

যে শত্রুরা মোকাবিলার জন্য দাঁড়িয়েছিল, মুসলমানরা তাদের মারতে কাটতে তীরে নেমে পড়লেন। পুরো বাহিনী হুবহু পার হয়ে গেল, শুধু একজন সিপাহি হযরত মালিক বিন আমের [রা.]-এর একটি পেয়ালা নদীতে পড়ে গিয়েছিল। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: "তকদীরের লিখন ছিল যে ওটা হারিয়ে গেছে।" তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! আমার তো ওই পেয়ালাটির খুব প্রয়োজন ছিল।"

তারপর দোয়া করলেন: "ইলাহি! পুরো বাহিনীর মধ্যে শুধু আমার জিনিসটিই হারিয়ে যাবে, আমাকে এমন বঞ্চিত করো না।"

যখন সবাই নদী পার হয়ে গেলেন, তখন হঠাৎ পানির একটি ঢেউ সেই পেয়ালাটি তীরে এনে ফেলল। কোনো এক সিপাহি তা চিনে হযরত আমের বিন মালিক [রা.]-এর কাছে পৌঁছে দিলেন। [৩]

ইয়াজদগিরদ তার পরিবার-পরিজন ও ধনভাণ্ডার আগেই "হুলওয়ান"-এ পাঠিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের নদী পার হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই সে নিজেও রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেল। যদিও ইরানিরা ধন-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার সাথে নিয়ে গিয়েছিল, তবুও অধিকাংশ আসবাবপত্র পেছনে রয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা যখন সাসানিদের এই প্রাচীন বিলাসপুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন চারদিকে নীরবতা বিরাজ করছিল। [৪]

**কিসরার ধনভাণ্ডার পদতলে:**

সামনে ছিল আলে সাসানের সেই সুমহান কসর-এ-আবিয়াজ (শ্বেত প্রাসাদ), যার বিজয়ের সুসংবাদ রাসুলের বাণী থেকে দেওয়া হয়েছিল। [৫] এটি এমন এক স্থাপত্যকর্ম ছিল যার গাম্ভীর্য ও বিশালতা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে যেত। যার দেয়াল, মেহরাব ও স্তম্ভগুলোর সৌন্দর্য দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিত। কিন্তু আজ কসর-এ-আবিয়াজের আকাশচুম্বী বুরুজগুলো তাদের সমস্ত উচ্চতা সত্ত্বেও আজ অবনত মনে হচ্ছিল।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩২৯, ৩৩০; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৩৩

[২] তারিখুত তাবারি: ৩/১৩

[৩] তারিখুত তাবারি: ৩/১২; আল-মুনতাজাম: ৪/২০৬

[৪] "উসবাতুম মিনাল মুসলিমিনা ইয়াফতাতীহুনাল বাইতাল আবিয়াজা বাইতা কিসরা" মুসলমানদের একটি ছোট দল কিসরার শ্বেত প্রাসাদ জয় করবে। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড: ৫, ৩৮১, কিতাবুল ইমারাহ, বাবুন নাসু তাবিউন লি-কুরাইশ)

হযরত সাদ (রা.) যখন কিসরার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আয়াতগুলো চলে এল:

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

(তারা কত বাগান ও ঝরনা, এবং শস্যক্ষেত্র ও চমৎকার সব অট্টালিকা, এবং আরাম-আয়েশের উপকরণ রেখে গেছে যাতে তারা আনন্দিত ছিল। এভাবেই হয়েছিল এবং আমরা অন্য এক জাতিকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছিলাম।) [১]

শতাব্দীকাল ধরে অর্ধেক এশিয়ার ওপর রাজত্ব করা খসরু সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার আজ মুসলমানদের পদতলে ছিল, কিন্তু এই নজিরবিহীন বিজয়ের কোনো উৎসব পালন করা হয়নি। মুসলমানরা কিসরার দরবারে গিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তাঁর তাওফিকে কুফর ও শিরকের কেন্দ্রে ইসলামের পতাকা উত্তোলনের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। [২]

মাদায়েন থেকে এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ হস্তগত হয়েছিল যে, হযরত জাবির বিন সামুরা (রা.), যিনি তাঁর পিতার সাথে এই বিজয়ে শরিক ছিলেন, বলতেন যে, যখন শরীয়ত অনুযায়ী চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হলো, তখন প্রত্যেকের ভাগে বারো-বারো হাজার দিরহাম করে পড়ল। (যা বর্তমান সময়ের হিসেবে পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকার কম নয়)

সোনা-রূপা এত বেশি ছিল যে, কিছু বস্তাকে শস্য মনে করে উঠানো হয়েছিল, কিন্তু যখন খোলা হলো তখন সোনা-রূপা বেরিয়ে এল। কিছু সৈন্য ইয়াজদগিরদ এবং তার সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা নাহরাওয়ান খালের ব্রিজের ওপর কিসরার খাদেমদের একটি দল দেখতে পেলেন যারা একটি খচ্চরকে পাহারায় নিয়ে যাচ্ছিল। খচ্চরটি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলে তার ওপর বোঝাই করা মালামালের মধ্যে কিসরার পোশাক, অলঙ্কার, জুতো এবং বর্ম পাওয়া গেল যা হীরা ও জহরত খচিত ছিল। [৩]

**আমানত ও দিয়ানতের উচ্চতর দৃষ্টান্ত:**

মুসলমানদের আমানতদারি এবং খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, যে যা পেয়েছে তা এনে আমীরুল লশকর-এর খেদমতে পেশ করে দিয়েছে। কিছু জিনিসের মূল্য বর্তমান সময়ের হিসেবে কোটি কোটি টাকা ছিল, কিন্তু মুজাহিদগণ বিন্দুমাত্র হেরফের করেননি। আল্লাহর এক বান্দার হাতে এমন একটি বাক্স পড়ল যাতে কিসরার মুকুট ছিল, তিনি তা হুবহু পেশ করে দিলেন। এই স্বর্ণমুকুট যা দুর্লভ হীরা ও মুক্তা দ্বারা খচিত ছিল, তা এত ভারী ছিল যে কোনো মানুষ মাথায় এর ওজন সহ্য করতে পারত না; একে রাজসিংহাসনের ডানে ও বামে থাকা দুটি স্তম্ভের মাঝখানে শিকলের সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হতো। বাদশাহ সিংহাসনে বসে নিজের মাথা মুকুটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন। কিছু মুজাহিদ সুন্দর সুন্দর বাক্সে কিসরার পোশাক-পরিচ্ছদ পেলেন যার মধ্যে থাকা একেকটি মুক্তার দাম ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা। হযরত কাকা বিন আমর (রা.) এমন কিছু সিন্দুক পেলেন যাতে কিসরা, হেরাক্লিয়াস, চীনের খাকান এবং হিন্দুস্তানের মহারাজাদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিরল তলোয়ার, বর্ম এবং শিরস্ত্রাণ ছিল, যার প্রত্যেকটি নিজস্ব ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করত।

---

[১] সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ২৫ থেকে ২৮

[২] আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওযি: ৪/২০৬

[৩] আল-মুনতাজাম: ৪/২০৭, ২০৮

এই সব জিনিস হযরত সাদ-এর কদমে এনে রাখা হলে তাঁর মুখ থেকে বের হলো: “নিঃসন্দেহে এটি আমানতদার লোকদের একটি বাহিনী।” [১]

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো এই যে, একজন মুসলিম একটি ছোট সিন্দুক নিয়ে সেই অফিসারদের কাছে এলেন যারা হযরত সাদ-এর নির্দেশে গনিমতের মাল সংগ্রহ করছিলেন। সিন্দুকটি খোলা হলে দেখা গেল সেটি এমন দুর্লভ মুক্তা ও জহরত দ্বারা পূর্ণ ছিল যার মূল্য এ পর্যন্ত সংগৃহীত সমস্ত ধন-সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। গ্রহণকারী অফিসাররা অবাক হয়ে বললেন: “তুমি কি এর থেকে নিজের জন্য কিছুই নাওনি?”

উত্তর এলো: “আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর সাথে থাকার অনুভূতি না থাকত, তবে আমি এই সিন্দুকটি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতামই না।”

জিজ্ঞাসা করা হলো: “তুমি কে?” উত্তর দিলেন: “আমি এই কাজটি এজন্য করিনি যে তোমরা আমার প্রশংসা করবে। আমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি এই তাওফিকের জন্য এবং তাঁর সওয়াবের ওপর খুশি আছি।”

এই বলে তিনি নিজের গোত্রের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন। পরে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে তিনি ছিলেন হযরত আমির বিন আবদ কায়েস।

এই জিনিসগুলো গনিমতের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগে অন্তর্ভুক্ত করে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর ফারুক-এর খিদমতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “যেসব লোক এত মূল্যবান জিনিস হুবহু পাঠিয়ে দিয়েছে, তারা অবশ্যই আমানতদার।” হযরত আলী আল-মুরতাজা বললেন: “আমিরুল মুমিনিন! আপনি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, তাই আপনার প্রজারাও চরিত্রবান।” [২]

কালীন-এ নওবাহার:

এই সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে ইরানি বাদশাহদের বিশ্ববিখ্যাত ‘কালীন-এ নওবাহার’ও ছিল, যা নওশেরওয়ানের নির্দেশে তাঁর উজির বুজুর্গমেহর এজন্য তৈরি করিয়েছিলেন যাতে শীতকালেও বসন্তের আনন্দ উপভোগ করা যায়। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছিল ৯০ ফুট। গালিচাটি সোনার সুতো দিয়ে বোনা হয়েছিল, মুক্তা ও হীরা দিয়ে সাজানো হয়েছিল; রেশম ও সোনার পানি দিয়ে ফুল-পাতার এমন বিস্ময়কর কারুকাজ করা হয়েছিল যে চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। এতে রাস্তা ও খালের চিত্রায়নও ছিল।

ইরানি বাদশাহরা প্রায়ই গরমের মৌসুমে তাঁদের বিশেষ পারিষদদের নিয়ে এই গালিচায় মাহফিল জমাতেন, মদ্যপান করতেন এবং নিজেদের বসন্তকালে অনুভব করতেন। হযরত সাদ যখন এই গালিচা মদিনা মুনাওয়ারায় পাঠালেন, তখন হযরত উমর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িনদের একত্রিত করে এটি দেখালেন, সবাই এর সৌন্দর্য দেখে অবাক হলেন। হযরত উমর ফারুক পরামর্শ চাইলেন যে এটি নিয়ে কী করা যায়? কিছু লোক এই বিস্ময়কর বস্তুটিকে অক্ষত রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু হযরত আলী জোরালো কণ্ঠে এটি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করার পরামর্শ দিলেন। ফলে এটি কেটে সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। এর সামান্য অংশ যা হযরত আলী পেয়েছিলেন, তা বিশ হাজারে বিক্রি হয়েছিল। [৩]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩২, ৩৩৩

[২] আল-মুনতাজাম: ৪/২০৯

[৩] আল-মুনতাজাম: ৪/২০৯, ২১০। আপাতদৃষ্টিতে বিশ হাজার দিরহাম বোঝানো হয়েছে, দিনার নয়; তবে বর্তমান সময়ের হিসেবে এত দিরহামও চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকার কম নয়।

**কিসরার তাজ ও কঙ্কণ - নববী মুজিজা:**

গনিমতের মালে আসা ধনভাণ্ডারে কিসরার তাজ ও কঙ্কণ দেখে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে গেল। হুজুর (সা.) হিজরতের সফরের সময় তাঁর পিছু নেওয়া সুরাকা বিন মালিককে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন:

"তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাকে কিসরার কঙ্কণ, কোমরবন্ধ ও তাজ পরানো হবে।"

যখন তিনি (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তখন মুসলমানদের নিঃস্বতার এই অবস্থা ছিল যে, তাদের রাসূল ও তাদের নেতার নিজের স্বদেশে মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, তাঁরা নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে এক অপরিচিত ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন এবং জানী দুশমনরা সবদিকে তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমন অবস্থায় এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল তিনিই করতে পারতেন যাঁর দৃষ্টিতে মক্কাবাসীরাই নয়, বরং কায়সার ও কিসরার বিশাল সাম্রাজ্যের মালিকরাও আল্লাহর সাধারণ সৃষ্টির চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখত না এবং যাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল কেবল তাঁর আল্লাহর ওপর, যিনি তাঁকে পৃথিবীতে আসতে যাওয়া এই বিপ্লবের আগাম খবর দিয়ে দিয়েছিলেন।

মাত্র পনেরো বছর পর এই পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল এবং কিসরার ধনভাণ্ডার মুসলমানদের পদতলে ছিল।

হযরত উমর ফারুক (রা.) বিশ্ববাসীকে নববী বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করানোর জন্য হযরত সুরাকা বিন মালিক (রা.)-কে ডেকে এনে সাধারণ মজলিসে তাঁকে সেই কঙ্কণ, তাজ ও কোমরবন্ধ পরিয়ে দিলেন যেগুলোর আকাঙ্ক্ষা বড় বড় বাদশাহরা করতেন। সেই সময় হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে হযরত সুরাকা (রা.) তাকবির ধ্বনি দিলেন এবং বললেন: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি এই জিনিসগুলো খোদায়ীর দাবিদার কিসরার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একজন আরব গ্রাম্য ব্যক্তিকে পরিয়ে দিয়েছেন।" [১]

**জালুলার যুদ্ধ:**

মাদায়েন থেকে পালানোর পর ইয়াজদাগার্দ হুলওয়ানে আস্তানা গেড়ে আবারও সৈন্য সমাবেশ করছিল। ওদিকে হযরত উমর ফারুক (রা.) ইরাক বিজয়ের পূর্ণতা দানের জন্য হযরত সা'দ (রা.)-এর কাছে পূর্ণ পরিকল্পনা লিখে পাঠিয়েছিলেন, যা অনুযায়ী হযরত হাশিম বিন উতবা (রা.)-এর নেতৃত্বে বারো হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী অগ্রসর হয়ে জালুলায় পৌঁছাল। এখানে ইরানি সেনাপতি মেহরান ব্যূহ রচনা করে অবস্থান করছিল, যাকে ইয়াজদাগার্দের পক্ষ থেকে ক্রমাগত সাহায্য পাঠানো হচ্ছিল। মুসলমানরা শহরটি অবরোধ করল। আশি দিন পর্যন্ত ইরানিরা কেল্লাবন্দি হয়ে লড়াই করতে থাকল। অবশেষে একদিন তারা শহর থেকে বের হয়ে সারিবদ্ধ হলো। মুসলমানদের আহত করার জন্য তারা ময়দানের বিশেষ অংশগুলোতে কাঁটাযুক্ত গোলক বিছিয়ে দিয়েছিল, যেগুলোকে 'খাসাক' (ঘোকরু) বলা হতো। নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য তারা পরিখাও খনন করেছিল।

যা-ই হোক, যুদ্ধ যখন চরমে পৌঁছাল তখন হঠাৎ কালো আঁধি (ধূলিঝড়) বইতে শুরু করল, যার ফলে ইরানিরা দিশেহারা হয়ে শহরের দিকে পিছু হটল।

---

[১] আসাদুল গাবাহ, আলোচনা: সুরাকা বিন মালিক (রা.)

...হতে লাগল কিন্তু এই হুড়োহুড়িতে হাজার হাজার লোক পরিখায় পড়ে মারা গেল এবং হাজার হাজার লোক নিজেদেরই বিছানো কাঁটাযুক্ত গোলার মধ্যে আটকে গেল। এভাবে প্রায় এক লক্ষ ইরানি নিহত হলো, তাদের সেনাপতি মেহরান পলায়নরত অবস্থায় নিহত হলো এবং এই শহরটিও মুসলমানদের দখলে চলে এল।

এটি ১৬ হিজরি সনের জিলকদ মাসের ঘটনা। ইয়াজদগিরদ এই পরাজয়ের খবর শোনামাত্রই হালওয়ান থেকেও পালিয়ে গেল। মুসলমানরা হালওয়ান, মোসেল এবং তিকরিতের ওপরও বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দিল, এভাবে পুরো ইরাক ইসলামের ছায়াতলে চলে এল।

মুসলিম বিজয়ীরা স্থানীয় জনগণের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন, সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। ইরানি অভিজাত ও জমিদাররা কিসরার জুলুমপূর্ণ শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং নিজেরা এসে আনুগত্য প্রকাশ করল ও জিজিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। এভাবে চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো। [১]

**ইরাকের উৎপাদনের ব্যবস্থা:**

কিসরার শক্তি চূর্ণ হওয়ার পর হযরত উমর ফারুক (রা.) এখন বিজয়ের চেয়ে শাসনব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা এবং বিজিত অঞ্চলগুলোর আবাদ ও উন্নয়নের জন্য চিন্তিত ছিলেন। আপনি ইরাকের ভূমির উর্বরতার কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভূমির ইঞ্চি ইঞ্চি পরিমাপ করালেন, এই কাজ কয়েক মাসে সম্পন্ন হলো। এরপর আপনি ইরানি রাজপরিবারের লোকজনের, বিদ্রোহী ও পলাতকদের সম্পত্তি এবং অগ্নিকুণ্ড ও বনাঞ্চলের জমিগুলোকে আলাদা করে সেগুলোর আয় সরকারি তত্ত্বাবধানে জনগণের সেবার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। বাকি সমস্ত জমি স্থানীয় জমিদারদের কাছে থাকতে দিলেন এবং সেগুলোর ওপর উপযুক্ত খাজনা নির্ধারণ করে দিলেন, যার ফলে মানুষ পূর্ণ উদ্যমে চাষাবাদে আগ্রহী হলো এবং বড় বড় খালি এলাকাগুলো ফসল ও বাগানে সবুজ হয়ে উঠল। এক বছরে শুধু ইরাকের কৃষি উৎপাদনের খাজনা আট কোটি থেকে বেড়ে দশ কোটি দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। (বর্তমান সময়ের হিসেবে এই পরিমাণ প্রায় পঁচিশ আরব রুপির কাছাকাছি) [২]

হযরত উমর ফারুক (রা.) মুসলমানদের আলাদাভাবে আবাদ করার জন্য এবং সামরিক ছাউনি স্থাপনের জন্য ইরাকে সর্বোত্তম জলবায়ু সম্পন্ন জমি খুঁজে বের করে নিয়মিত নকশা অনুযায়ী বসরা ও কোফাহর মতো শহর নির্মাণ করালেন এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে সেখানে বসতি স্থাপন করালেন যাতে ঈমান, মা'রিফাত এবং ইলম ও হিকমতের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। [৩]

পরের বছর ইসলামী বাহিনী উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আল-জাজিরা, নাসিবিন, আরহা এবং আরমেনিয়া পর্যন্ত আক্রমণ চালাল। হযরত ইয়াজ বিন গানাম, হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা, হযরত আবু মুসা আশআরি এবং হযরত উসমান বিন আবিল আস (রা.) এই অভিযানগুলোতে অগ্রণী ছিলেন। [৪]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩৫ থেকে ৩৩৯

[২] আল-خراج للقاضی ابی یوسف (আল-খারাজ লিল কাযী আবু ইউসুফ), পৃ. ৩৬, ত. আল-মাতবাআ আল-আযহারিয়া মিসর

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৭ হিজরির অধীনে

[৪] পূর্বোক্ত সূত্র অনুযায়ী

## হুরমুজান..... তুসতারের যুদ্ধ

এখন পূর্বে ইসলামের গাজীরা ইরাকের সীমানা ছাড়িয়ে পারস্যের ময়দানে অশ্বারোহণ করছিলেন। ইরানীদের কেবল একজন রাজপুত্র ছিল যে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে লড়াই করে আসছিল। তার নাম ছিল হুরমুজান, যার ধূর্ততা, যুদ্ধংদেহী মনোভাব এবং নিষ্ঠুরতার অভিজ্ঞতা মুসলমানদের বারবার হয়েছিল। সে ইয়াজদগিরদের কাছে হাজির হলো, যে 'রে' নামক স্থানে অবস্থান করছিল এবং আবেদন করল: "যদি আপনি খুজিস্তান ও পারস্যের শাসনভার আমার হাতে অর্পণ করেন, তবে আমি মুসলমানদের এই তুফান থামিয়ে দেব।" ইয়াজদগিরদ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল, এরপর হুরমুজান খুজিস্তানে দুর্গ নির্মাণ করে এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করল।

হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে তার মোকাবিলার জন্য হযরত উতবা বিন গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিযুক্ত ছিলেন, যার সাহায্যের জন্য পরবর্তীতে হযরত নুয়াইম বিন মাসউদ, হযরত নুয়াইম বিন মুকাররিন এবং হযরত হারমালা বিন মারিতা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো সাহাবীগণও পৌঁছে গেলেন। এই ব্যক্তিবর্গ 'নহরে তিরি'-এর তীরে হুরমুজানকে ধরে ফেললেন এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাকে পরাজিত করলেন। হুরমুজান প্রাণ বাঁচিয়ে 'আহওয়াজ'-এ গিয়ে পৌঁছাল, কিন্তু তার ভয় ছিল মুসলমানরা তার থেকে এই এলাকাটিও ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই সে লস্কর প্রধান উতবা বিন গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এই শর্তে সন্ধি করল যে, 'আহওয়াজ' এলাকাটি তার কাছেই থাকতে দেওয়া হবে। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সন্ধি অনুমোদন করলেন। এভাবে কয়েক মাসের জন্য হুরমুজান মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। এই সময়ে সে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকল এবং অবশেষে মুসলমানদের সাথে কিছু প্রশাসনিক বিষয়ে মতভেদকে অজুহাত বানিয়ে সে যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিসরার হাজার হাজার বিচ্ছিন্ন সৈন্য এবং হাজার হাজার উৎসাহী অগ্নিপূজক তার চারপাশে সমবেত হলো।

হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তার এই তৎপরতার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি অবিলম্বে এর প্রতিকারের দিকে মনোযোগ দিলেন যাতে অন্য বিজিত এলাকাগুলোতেও এর নেতিবাচক প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে। তিনি এই অভিযানে উতবা বিন গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাহায্যের জন্য হারকুস বিন জুহাইরের নেতৃত্বে এক সতেজ বাহিনী পাঠালেন, যারা 'বাজারে আহওয়াজ'-এর সেতু পার হয়ে হুরমুজানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। হুরমুজান পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল এবং 'রাম'-এ গিয়ে আশ্রয় নিল। এখন সে আবারও সন্ধির আবেদন করল। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি আবারও উদারতা প্রদর্শন করে হুরমুজানের আবেদন কবুল করে নিলেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ইয়াজদগিরদের প্ররোচনায় হুরমুজান নতুন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং বসরার গভর্নর হযরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দিলেন।

থামানোর এবং লশকর বা বাহিনীর আমীর হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.)-কে বানানোর নির্দেশ পাঠালেন, সেই সাথে নাম উল্লেখ করে মহান সাহাবীদের তাঁর সাথে থাকার তাকিদ দিলেন। এভাবে এই বাহিনীতে হযরত নুমান বিন মুকাররিন এবং হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর কমান্ডে হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী, হযরত বারা বিন আযিব, হযরত আনাস বিন মালিক এবং তাঁর ছোট ভাই হযরত বারা বিন মালিক (রা.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। আহওয়াজের নিকটবর্তী 'আযবাক' নামক স্থানে খোলা ময়দানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো এবং হুরমুযান পিছু হটে তুস্তারে কেল্লাবন্দী হয়ে গেল। [১]

ইসলামী বাহিনী এক মাস পর্যন্ত 'তুস্তার'-এর আকাশচুম্বী প্রাচীর অবরোধ করে রাখল, উভয় পক্ষ থেকে পাথর ও তীরের বৃষ্টি হতে থাকল। হুরমুযান বিরতি দিয়ে দিয়ে অল্প অল্প সৈন্যের মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর তীব্র আক্রমণ করত এবং তাদের প্রচণ্ড আঘাত করত, কিন্তু হার-জিতের ফয়সালা হতে পারছিল না। [২] উভয় পক্ষ থেকে অনেকগুলো একক লড়াইও হলো। হযরত বারা বিন মালিক, মুজাযআহ বিন সাওর, হযরত রাবী বিন আমির (রা.) এবং হযরত কাব বিন সূর (রা.)-এর মতো বীররা এ ধরনের লড়াইয়ে একশ ইরানি বীরকে মৃত্যুর মুখে পাঠালেন। [৩]

এক রাতে ইরানিরা প্রাচীর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমানরা তাদের চাপের কারণে ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। হঠাৎ কারো হযরত বারা বিন মালিক (রা.)-এর কথা মনে পড়ল, যিনি বীরত্ব ও শক্তি ছাড়াও দোয়া কবুল হওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবী করীম (সা.) বলেছিলেন: "কিছু জীর্ণশীর্ণ ধূলিমলিন লোক এমন আছে যে, তারা যদি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কোনো কথা বলে, তবে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করে দেন। বারা বিন মালিকও তাদেরই একজন।" [৪]

নবীর জানবাজির (প্রাণপণ লড়াই) বদৌলতে মুসলমানরা ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কাযযাবের দুর্গে ঢুকে তার কাহিনী খতম করেছিল। মুসলমানরা তাঁকে ডেকে বলল: "বারা! আজ আল্লাহর নামে কসম খাও যেন আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করেন।" হযরত বারা (রা.) বললেন: "হে আল্লাহ! আজ তোমার নামে কসম করছি, আমাদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী করো এবং আমাকে তোমার রাসূল (সা.)-এর সাথে মিলিয়ে দাও।" [৫] এ কথা বলে তিনি ঝড়ের মতো ইরানিদের ওপর আক্রমণ করলেন, অন্য মুসলমানরাও তাঁর পেছনে জোরালো আক্রমণ করল এবং তাদের হটিয়ে দিয়ে পরিখা পার হয়ে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

এই সময়ে শহরবাসীদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমানদের শহরে প্রবেশ করার একটি গোপন পথ বলে দিল। এটি ছিল একটি ছোট খাল যার মাধ্যমে শহরে পানি প্রবেশ করত। কিছু মুসলমান সাঁতরে এর মাধ্যমে প্রাচীরের ভেতরে চলে গেলেন এবং পাহারাদারদের কাবু করে দরজা খুলে দিলেন। এটি ছিল ফজরের সময়, সূর্যোদয় হওয়ার আগেই শহর জয় হয়ে গেল। এই সময়ে হুরমুযান কেল্লায় ঢুকে পড়ল এবং সেখান থেকে মুসলমানদের তীরের নিশানা বানাচ্ছিল।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৬৩ থেকে ৩৬৮

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৬৮

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৫৯

[৪] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৮৫৪, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি বারা বিন মালিক (রা.)

[৫] উসদুল গাবাহ, যিকর: বারা বিন মালিক (রা.), আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৬৮

হযরত বারা ইবনে মালিক (রা.) দুর্গে আক্রমণ করলে হুরমুজান তাঁকে শহীদ করে দেন। হযরত মুজাযাহ ইবনে সাওর (রা.)-ও একইভাবে দুর্গে প্রবেশের চেষ্টার সময় হুরমুজানের হাতে শহীদ হন।

পরিশেষে হুরমুজান চিৎকার করে বললেন: "আমার তূণীরে একশটি তীর অবশিষ্ট আছে। আমার কাছে পৌঁছানোর আগে তোমাদের একশটি লাশ পড়বে। হ্যাঁ, যদি তোমরা আমাকে ওমর ফারুক (রা.)-এর কাছে জীবিত ও সহি-সালামত নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দাও, তবে আমার ব্যাপারে তিনি যে ফয়সালা করবেন তা আমি মেনে নেব।"

মুসলমানরা প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং হুরমুজান অস্ত্র সমর্পণ করলেন। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এই ঘটনা ২০ হিজরির। তাঁকে মদিনা মুনাওয়ারায় নিয়ে গিয়ে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খিদমতে পেশ করা হলো।

আমিরুল মুমিনীন তখন মসজিদে জমিনের ওপর ঘুমাচ্ছিলেন। কোনো দ্বাররক্ষী বা প্রহরী ছিল না। হুরমুজান জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: "তোমাদের আমির কোথায়?" তাঁকে বলা হলো: "এই তো তিনি।"

তিনি অবাক হয়ে বললেন: "তাঁর দ্বাররক্ষী ও দেহরক্ষীরা কোথায় গেল?" জানানো হলো: "তিনি কোনো দ্বাররক্ষী বা দেহরক্ষী রাখেন না।"

এই সময়ের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) জেগে উঠলেন। হুরমুজান ছিলেন একজন শাহজাদা, তিনি নিজের রেশমি পোশাক ও মুকুট পরিহিত ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর নির্দেশে তাঁকে সাধারণ পোশাক পরিয়ে সামনে আনা হলো। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে লজ্জা দিয়ে বললেন: "হুরমুজান! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম এবং আল্লাহর ফয়সালা দেখে নিলে তো।"

তিনি তোষামোদপূর্ণ ভঙ্গিতে বললেন: "জাহেলিয়াতের যুগে খোদা আমাদের সুযোগ দিয়েছিলেন, আমরা বিজয়ী ছিলাম; এখন খোদা আপনাদের সাথে হয়ে গেছেন, তাই আপনারা বিজয়ী হয়ে গেছেন।"

হযরত ওমর (রা.) বললেন: "আসলে সেই যুগে তোমরা আমাদের ওপর এই কারণে চেপে বসেছিলে যে, তোমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলে আর আমরা ছিলাম বিচ্ছিন্ন।"

হযরত ওমর (রা.) তাঁর ব্যাপারে আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কী বলেন? (হত্যা করা হবে কি না)। হুরমুজান যদিও আনাস (রা.)-এর ভাই বারা ইবনে মালিক (রা.)-এর হত্যাকারী ছিলেন, তবুও আনাস (রা.) অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়ে বললেন: "আমিরুল মুমিনীন! আপনি যদি তাঁকে হত্যা করেন, তবে তাঁর কওমের লোকেরা জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়বে।"

হযরত ওমর (রা.) বললেন: "আনাস! আমি বারা এবং মুজাযাহ (রা.)-এর হত্যাকারীকে কীভাবে ছেড়ে দিই!!"

এই সময় হুরমুজান পানি চাইলেন। পানি আনা হলে তিনি বললেন: "আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমি যখন পানি পান করতে শুরু করব, তখন আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলবেন।" তিনি (রা.) বললেন: "লা বা'সা আলাইকা হাত্তা তাশরাবাহু।" (যতক্ষণ না তুমি পানি পান করছ, ততক্ষণ তুমি নিরাপদ।)

এ কথা শোবামাত্রই তিনি পেয়ালাটি ফেলে দিলেন এবং বললেন: "এখন তো আপনি আমাকে প্রাণদান করলেন।"

হযরত ওমর ফারুক (রা.) অস্বীকার করলেন যে, আমার উদ্দেশ্য এমন ছিল না; কিন্তু স্বয়ং হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) আরজ করলেন: "এখন তাঁকে হত্যার আর কোনো অবকাশ নেই, আপনি তাঁকে 'লা বা'স' বলে দিয়েছেন।"

হযরত ওমর (রা.) বললেন: "এই বিষয়ে তোমার সাথে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো আর কেউ কি আছে?"

হযরত আনাস (রা.) গিয়ে হযরত জুবাইর (রা.)-কে নিয়ে আসলেন। তিনি সমর্থন করলেন যে, 'লা বা'স' (কোনো সমস্যা নেই) বলার মাধ্যমে প্রাণভিক্ষা প্রমাণিত হয়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে হযরত উমর ফারুক (রা.) হরমুজানকে—যিনি হযরত বারা ইবনে মালিক (রা.)-এর মতো সাহাবীর হত্যাকারী ছিলেন—এভাবে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু যখন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও হযরত আনাস (রা.)-এর সমর্থন করলেন, তখন তিনি (রা.) হরমুজানকে বললেন: "দেখো! আমি ধোঁকায় পড়ার মতো লোক নই, হ্যাঁ, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তবে ভিন্ন কথা।" হরমুজান তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল। হযরত উমর (রা.) খুশি হলেন এবং তাকে পুরস্কার হিসেবে দুই হাজার দিরহাম ও মদিনায় একটি বাড়িও দিয়ে দিলেন। [১]

গাসসানি রাজপুত্র..... জাবালা ইবনে আইহাম:

সেই দিনগুলোতে জাবালা ইবনে আইহাম নামক এক ইয়ামেনি রাজপুত্রও ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়ায় বসবাসকারী আরব খ্রিস্টানদের গোত্র বনু গাসসানের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং রাজপরিবারের শেষ রাজপুত্র ছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি রোমানদের সেনাপতিও ছিলেন। দীর্ঘকাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পর অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের সঙ্গী-সাথী, দেহরক্ষী ও দাসদের নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় আসেন। তার শান-শওকত দেখে মানুষ অবাক হচ্ছিল। এটি হিজরি ১৬ সালের ঘটনা।

আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) তাকে উৎসাহিত করলেন এবং তিনি মুসলিম সমাজের একটি অংশে পরিণত হলেন। কিন্তু জাহেলিয়াতের অহংকার ও দম্ভ তখনও তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। ফলে তিনি যখন হজের জন্য মক্কায় গেলেন, সেখানে তাওয়াফ করার সময় বনু ফাজারা গোত্রের এক ব্যক্তির পা তার ইহরামের চাদরের ওপর এমনভাবে পড়ল যে শরীর উন্মুক্ত হয়ে গেল। জাবালা রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তাকে এমন এক চড় মারলেন যে তার নাকের হাড় ভেঙে গেল। মজলুম ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ফরিয়াদ করলেন। তিনি জাবালাকে ডেকে পাঠিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলেন। সে উত্তর দিল: "হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন! আমি এমনটি করেছি এবং যদি কাবার পবিত্রতার খেয়াল না থাকত, তবে আমি আমার তলোয়ার তার মাথায় নামিয়ে দিতাম।" হযরত উমর ফারুক (রা.) বললেন:

"তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করেছ, এখন হয় এই ফরিয়াদিকে কোনোভাবে সন্তুষ্ট করো, অন্যথায় আমাকে তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ (বদলা) নিতে হবে।"

জাবালা তার বংশীয় মর্যাদা ও পদের কারণে এই ধারণা পোষণ করেছিলেন যে তিনি আইনের ঊর্ধ্বে হবেন, তাই এটি শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন: "এটি কীভাবে হতে পারে!! আমি রাজপুত্র আর সে একজন সাধারণ মানুষ!!" তিনি (রা.) বললেন: "ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে তোমরা উভয়ই সমান।" সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলল: "আমি তো ভেবেছিলাম মুসলমান হয়ে আমি আরও বেশি সম্মানিত হব।" হযরত উমর ফারুক (রা.) উত্তর দিলেন: "তুমি যা দেখছ এটাই সম্মান। এখন কিসাস দাও অথবা ফরিয়াদিকে সন্তুষ্ট করো।" জাবালা বলল: "যদি এই ব্যাপার হয় তবে আমি পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে যাব।" হযরত উমর (রা.) বললেন: "যদি এমনটি করো তবে ইসলাম ত্যাগ করার অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হবে।" জাবালা বুঝতে পারলেন যে হযরত উমর ফারুক (রা.) আইন ও ইনসাফের দাবি পূরণ করা ছাড়া তাকে ছাড়বেন না, তখন তিনি টালবাহানার পথ অবলম্বন করে চিন্তাভাবনার জন্য একদিন...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৬৯ থেকে ৩৭১; তারিখ খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃ. ১৪৭

...এর অবকাশ চাইলেন যা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রদান করলেন। অথচ তিনি সেই রাতেই তাঁর সাথীদের নিয়ে প্রস্থান করলেন। [১]

জাবালা বিন আইহামের আক্ষেপজনক পরিণতি:

জাবালা সেখান থেকে সরাসরি হেরাক্লিয়াসের কাছে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছালেন এবং খ্রিস্টান হওয়ার ঘোষণা দিলেন। হেরাক্লিয়াস তাকে জায়গির দিয়ে জীবিকার চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত করে দিলেন। জাবালা তাঁর বাকি জীবন সেখানেই বিলাসিতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। তিনি হযরত হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সেই কবিতাগুলো খুব পছন্দ করতেন যা তিনি জাহেলিয়াত যুগে আলে গাসসানের উত্থান সম্পর্কে বলেছিলেন। নিজের দুঃখ ভোলার জন্য তিনি এই কবিতাগুলো শুনতেন। [২] পাশাপাশি কখনো তিনি হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সেই কবিতাগুলোও স্মরণ করতেন যাতে এই বংশের পতনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছিল। [৩]

সেগুলোর মধ্যে কিছু কবিতা নিম্নরূপ:

لِلّٰهِ دَرُّ عِصَابَةٍ نَادَمْتُهُمْ ... يَوْمًا بِجِلِّقَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ

“আল্লাহ সেই দলের কল্যাণ করুন যাদের সাথে আমি প্রাচীনকালে একদিন জিলিক নামক স্থানে মদ্যপানের জন্য সঙ্গী হয়েছিলাম।”

أَوْلَادُ جَفْنَةَ حَوْلَ قَبْرِ أَبِيهِمُ ... قَبْرِ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيمِ الْمُفْضِلِ

“এরা হলো আলে জাফনাহ যাদের পিতার কবরের পাশে দানশীল ও মর্যাদাবান ইবনে মারিয়ার কবর রয়েছে।”

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عَلَيْهِمُ ... صَهْبَاءَ تُصْفَقُ بِالرَّحِيضِ السَّلْسَلِ

“যে কেউ বারিস নামক স্থানে তাদের কাছে আসে, তারা তাকে মিষ্টি ও প্রবহমান পানির মিশ্রিত শরাব পান করায়।”

بِيضُ الْوُجُوهِ كَرِيمَةٌ أَحْسَابُهُمْ ... شُمُّ الْأُنُوفِ مِنَ الطِّرَازِ الْأَوَّلِ

“তাদের চেহারা উজ্জ্বল এবং বংশমর্যাদা উচ্চ। তারা উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট প্রাচীন পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসারী।”

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابُهُمْ ... لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

“তাদের কাছে এত বেশি লোকজনের যাতায়াত যে তাদের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করা ছেড়ে দিয়েছে। তারা আগন্তুক কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করে না।”

(সূত্র: আল-ইকদুল ফারিদ: ৩১৩/১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩২৬, ৩৬৫, আল-ওয়াফি বিল ওফায়াত: ১১/৩২)

সেগুলোর মধ্যে কিছু কবিতা হলো:

لِمَنْ الدَّارُ أَقْفَرَتْ بِبُصْرَانَ ... بَيْنَ أَهْلِي الْيَرْمُوكِ فَالْقَمَّانِ

“বুসরান এবং ইয়ারমুকের উঁচু টিলাসমূহের মাঝে অবস্থিত আম্মান শহরে এই কার হাবেলি জনশূন্য হয়ে গেল?”

ذَاكَ مَغْنًى لِآلِ جَفْنَةَ فِي الدَّهْـ ... ـرِ مَحَاهُ تَقَلُّبُ الْأَزْمَانِ

“এটি তো এককালে আলে জাফনাহর আবাসস্থল ছিল, যাকে কালের আবর্তন মিটিয়ে দিয়েছে।”

قَدْ أَرَانِي هُنَاكَ دَهْرًا مَكِينًا ... عِنْدَ ذِي التَّاجِ مَجْلِسِي وَمَكَانِي

“আমি স্মরণ করি যে সেখানে আমি দীর্ঘকাল আবাদ ছিলাম। মুকুটধারী (বাদশাহর) কাছে আমার বসার স্থান ও মর্যাদা ছিল।”

تَبْكِ أُمُّهُمْ وَقَدْ ثَكِلَتْهُمْ ... لَمَّا حَلُّوا بِحَادِثِ الْجَوَلَانِ

“তাদের মায়েরা তাদের হারিয়ে কাঁদছে যখন তারা বিপদের আবর্তে নিপতিত হলো।”

وَذَا الْبَضْعُ فَالْوَلَائِدُ يَنْظِمْـ ... ـنَ سِرَاعًا أَكِلَّةَ الْمَرْجَانِ

“(এখন দারিদ্র্যের এই অবস্থা যে) ঈদ ঘনিয়ে এসেছে আর বালিকারা দ্রুত মুগ ডালের খাবার তৈরি করছে।”

(সূত্র: আল-ইকদুল ফারিদ: ৩১৩/১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩২৭, আল-ওয়াফি বিল ওফায়াত: ১১/৩৩)

---

[১] ফুতুহুল শাম লিল ওয়াকিদি: ১০০/১, ত. ইলমিয়্যাহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১১/৩৬৩, ৩৬৫

[২] সেগুলোর মধ্যে কিছু কবিতা নিম্নরূপ:

নিজের রাজ্য হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ তাকে ব্যথিত করত। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আল্লাহর সত্য দ্বীন ত্যাগ করার যন্ত্রণা কাঁটার মতো তার হৃদয়ে বিঁধত। সে নিজেও একজন বড় কবি ছিল। যখন তার মুসলমানদের সমাজে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ত, তখন সে দুঃখ ও শোকে নিমজ্জিত হয়ে অত্যন্ত বেদনাদায়ক কবিতা আবৃত্তি করত। হযরত উমর (রা.) একবার খুসামা বিন মুসাহিককে কায়সার হিরাক্লিয়াসের কাছে নিজের দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। হিরাক্লিয়াস সাক্ষাৎ ও প্রয়োজনীয় আলোচনার পর তাকে বললেন যে, তুমি জাবালার সাথেও দেখা করে নাও। খুসামা বিন মুসাহিক যখন জাবালার প্রাসাদে পৌঁছালেন, তখন দেখলেন তার শান-শওকত কায়সারের চেয়ে কম নয়। জাবালা তাকে খুব ভালোভাবে আপ্যায়ন করল। তারপর মজলিস সাজিয়ে তাকে হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর অনেক কবিতা শোনাল। এরপর হাসসান (রা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। খুসামা বিন মুসাহিক বললেন: “তিনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন।” জাবালা চুপ হয়ে গেল এবং তারপর নিজের অবস্থার ওপর এই কবিতাগুলো পড়ল:

تَنَصَّرَتِ الْأَشْرَافُ مِنْ أَجْلِ لَطْمَةٍ
وَمَا كَانَ فِيهَا لَوْ صَبَرْتُ لَهَا ضَرَرُ

অভিজাতরা কেবল একটি চড় থেকে বাঁচার জন্য খ্রিস্টান হয়ে গেল,

অথচ আমি যদি তা সহ্য করে নিতাম তবে তাতে কোনো ক্ষতি হতো না।

تَكَنَّفَنِي فِيهَا لَجَاجٌ وَنَخْوَةٌ
وَبِعْتُ لَهَا الْعَيْنَ الصَّحِيحَةَ بِالْعَوَرِ

এই বিষয়ে জেদ এবং অহংকার আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল,

আর আমি সুস্থ ও সুন্দর চোখকে (ইসলাম) অন্ধ চোখের (খ্রিস্টধর্ম) বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছি।

فَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَلَيْتَنِي
رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ عُمَرُ

হায় আফসোস! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন,

আর হায় আফসোস! আমি যদি সেই কথার দিকে ফিরে যেতে পারতাম যা উমর (রা.) বলেছিলেন।

وَيَا لَيْتَنِي أَرْعَى الْمَخَاضَ بِقَفْرَةٍ
وَكُنْتُ أَسِيرًا فِي رَبِيعَةَ أَوْ مُضَرُ

হায় আফসোস! আমি যদি কোনো মরুভূমিতে উট চরাতাম

এবং রবীআহ বা মুযার (এর কোনো যুদ্ধে) বন্দী হয়ে যেতাম।

وَيَا لَيْتَنِي بِالشَّامِ أَدْنَى مَعِيشَةٍ
أُجَالِسُ قَوْمِي ذَاهِبَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

হায় আফসোস! আমি যদি সিরিয়ায় অতি সাধারণ জীবন যাপন করতাম,

আমার কওমের সাথে বসতাম, যদিও আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যেত।

হায় আফসোস! সিরিয়ায় যদি আমার কাছে সাধারণ জীবনযাপনের সামান্য উপকরণ থাকত এবং আমি অন্ধ ও বধির হতাম, তবুও আমি আমার কওমের সাথে বসবাস করতে পারতাম।

অতঃপর জাবালার ওপর এক আবেগঘন অবস্থা ছেয়ে গেল, সে নিজের মুখে হাত রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল। যখন হাসসান বিন সাবিত (রা.) এ কথা শুনলেন, তখন তিনি তার জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও গম বোঝাই অনেকগুলো উট প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন এবং দূতকে বললেন: "হাসসানকে এগুলো দিয়ে দিও এবং তাকে বলো: 'আমি এগুলো আপনার জন্য উপহার হিসেবে পাঠিয়েছি। যদি তিনি ইন্তেকাল করে থাকেন, তবে এগুলো তার ওয়ারিশদের হাতে তুলে দিও এবং উটগুলো তার কবরের পাশে কুরবানি করে দিও।'"

কথোপকথনের সময় দূত জাবালাকে ইসলাম গ্রহণের উৎসাহ দিলেন, কিন্তু তার মান-মর্যাদা ও পদের মোহ এই সৌভাগ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

ফিরে এসে দূত হযরত উমর (রা.)-এর কাছে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ শোনালেন। হযরত উমর (রা.) বললেন: "সে তাড়াহুড়ো করেছে। সে নশ্বর দুনিয়াকে চিরস্থায়ী আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে তার এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি।"

অতঃপর হযরত উমর (রা.) হাসসান বিন সাবিত (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসতেই বললেন: "হে আমিরুল মুমিনিন, আলে জাফনার সুঘ্রাণ আসছে।" হযরত উমর (রা.) বললেন: "হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক তাদের ওখান থেকেই হয়ে এসেছেন।"

হাসসান বিন সাবিত (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন: "তাদের উপহারটি নিয়ে আসুন।" জাহেলিয়াতের যুগে আমি তাদের প্রশংসায় কাসিদা লিখেছিলাম, যার বিনিময়ে তারা কসম খেয়েছিল যে, যখনই আমার কোনো পরিচিত ব্যক্তি তাদের সাথে দেখা করবে, তারা অবশ্যই তার মাধ্যমে আমার কাছে উপহার পাঠাবে। [১]

জাবালা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। ৫৩ হিজরিতে সে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠাল যে, যদি দামেস্কের নিকটবর্তী গুতাহ অঞ্চলে অবস্থিত তার পৈতৃক প্রাসাদ ও জমিজমা তার নামে করে দেওয়া হয়, তবে সে সিরিয়ায় ফিরে আসবে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) (তার ইসলাম গ্রহণের আশায়) এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দূত আবদুল্লাহ বিন মাসআদাহ (রা.) যখন এই বার্তা নিয়ে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছালেন, তখন আলে গাসসানের এই শেষ রাজপুত্র তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করছিল। [২]

এটি অত্যন্ত ইবরত বা শিক্ষার বিষয় যে, একজন ব্যক্তি সত্যকে চিনেও তা থেকে বিমুখ হয়ে গেল। ইসলামে দাখিল হওয়ার পর পুনরায় এই মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলো। অহংকার ও দম্ভ তাকে এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। এজন্যই অহংকারকে 'উম্মুল আমরাদ' (রোগের জননী) বলা হয়।

এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে, যারা সত্যপন্থীদের সঙ্গ ত্যাগ করে, তারা সারা জীবন সব ধরনের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করলেও কখনো প্রকৃত মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। যারা জেনে-বুঝে সত্যপন্থীদের সঙ্গ ত্যাগ করে, তাদের পরিণতি দেখুন। তার কাছে ফিরে আসার এবং তওবা করার জন্য দীর্ঘ সময় ছিল, কিন্তু আফসোস! সে কেবল টালবাহানা করে গেছে এবং তওবা করেনি। এটি শয়তানের এক বড় ধোঁকা। শুধু আফসোস কোনো কাজে আসে না। যখন মানুষের কাছে নিজের ভুল স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তার উচিত কালক্ষেপণ না করে অবিলম্বে সত্যের দিকে ফিরে আসা এবং তওবা করা।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৩৬৫-৩৬৮; আল-মুনতাযাম ইবনুল জাওযি: ৫/২৫৯-২৬০; আল-ইকদুল ফারিদ: ৩/৩১৫; তারিখু দিমাস্ক: ৪২/৩৬৭-৩৭৮।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১১/৩৬৮-৩৬৯।

## উত্তর সিরিয়ায়

যে দিনগুলোতে কাদিসিয়া ও মাদায়েনে সাসানীয়দের সিংহাসন উল্টে যাচ্ছিল, সিরিয়ায় বাইজেন্টাইনদের সূর্যও অস্তমিত হচ্ছিল। ইয়ারমুক যুদ্ধের পর ১৫ হিজরি সনে হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) দ্রুত উত্তরের দিকে অগ্রসর হন এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে 'কিন্নাসরিন' আক্রমণের নির্দেশ দেন, যেখানে কায়সার হারাক্লিয়াসের প্রতিনিধি মিনাস স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) খোলা ময়দানে রোমানদের পরাজিত করে মিনাসকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেন এবং কিন্নাসরিন পদানত করে কায়সারের সন্ধানে সিরিয়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু কায়সার সিরিয়াকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে কনস্টান্টিনোপলে চলে গিয়েছিলেন। এরপর রোমানরাও বড় বড় দুর্গগুলো খালি করে দেয় এবং শহরগুলো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বিশেষ কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই সেই বছর সিরিয়ার উত্তর দিকের প্রদেশগুলো—হালাব এবং আন্তাকিয়াও জয় করে নেন। [১]

## বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

মোদ্দাকথা, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতের তিন বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সিরিয়ার হিমস, দামেস্ক, হালাব, আন্তাকিয়া এবং কিন্নাসরিনের মতো বড় বড় শহরগুলো বিজিত হয়ে গিয়েছিল। তবে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবস্থান এবং এর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এর বিজয়কে বিলম্বিত করা হচ্ছিল যাতে এখানে রক্তপাত ছাড়াই দখল করা সম্ভব হয়।

সিরিয়ায় মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর অধীনস্থ সেনাপতিদের মধ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-ও ছিলেন, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় থেকে ফিলিস্তিন রণাঙ্গনে নিয়োজিত ছিলেন। যখন কিবলা-ই আউয়াল পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণের সিদ্ধান্ত হলো, তখন হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) হিমস থেকে স্বয়ং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে ফিলিস্তিনে চলে আসেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর মতো সাহাবায়ে কেরামও এই রণাঙ্গনে সমবেত হন।

১৬ হিজরি সনে এই পবিত্র শহরটি অবরোধ করা হয়। স্থানীয় খ্রিস্টানরা প্রতিরোধকে নিরর্থক মনে করে সন্ধির শর্তাবলি পেশ করে। যেহেতু এই স্থানটি খ্রিস্টান, ইহুদি এবং মুসলমান—তিনটি সম্প্রদায়ের কাছেই অত্যন্ত পবিত্র মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, মুসলমানদের প্রধান স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এখানে সন্ধি চুক্তির অনুমোদন দেবেন যাতে পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়। মুসলমানরাও নিজেরা এই বরকতময় শহরে রক্তপাত চাচ্ছিলেন না, তাই অবিলম্বে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে দূত পাঠানো হলো। আপনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন, কারণ এতে এই সম্ভাবনা...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩৩ থেকে ৩২৬

এটিও ছিল যে, শুধুমাত্র একটি শহর বিজয়ের জন্য মুসলিম প্রধানের নিজে আসা খেলাফতের পদের প্রভাব ও গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ না করে, তবে হযরত আলী (রা.)-এর মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যিনি আমীরুল মুমিনীনকে বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়াকে উত্তম মনে করছিলেন।

অবশেষে ১৬ হিজরি সনের রজব মাসে হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত আলী (রা.)-কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মদিনা তাইয়্যেবা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে এমনভাবে রওনা হলেন যে, তিনি একাকী একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন, সাথে কোনো দেহরক্ষী দল ছিল না এবং দরবারী বা খাদেমদের কোনো বাহিনীও ছিল না। কোনো ছাতা ছিল না, ছিল না কোনো পাগড়ি; আরবের মরুভূমিতে তিনি এমনভাবে সফর করছিলেন যে সূর্যের প্রখর রশ্মি শরীরকে ঝলসে দিচ্ছিল। বিশ্রামের সময় তিনি উটের জিন নামিয়ে নিতেন এবং সেটিকে বালিশ বানাতেন, নিজের পশমী চাদর বিছিয়ে তার ওপর ঘুমিয়ে পড়তেন।

শামের সীমান্তে প্রবেশ করা পর্যন্ত আপনার জামা ময়লা হয়ে গিয়েছিল, এমনকি ছিঁড়েও গিয়েছিল। শামের আমীরদের নির্ধারিত দিনে দামেস্কের নিকটবর্তী 'জাবিয়া' নামক স্থানে আপনার (রা.) সাথে সাক্ষাতের জন্য সমবেত হওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসকে বাম দিকে রেখে উত্তর দিকে সফর করে সরাসরি 'জাবিয়া'র দিকে যাচ্ছিলেন। দামেস্কের মনোরম জনপদ, বাগান এবং ঘরবাড়ি দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন:

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ

(তারা কতই না বাগান ও ঝরনাধারা, এবং শস্যক্ষেত্র ও চমৎকার সব অট্টালিকা, আর আরাম-আয়েশের উপকরণ ছেড়ে গেছে যাতে তারা আনন্দিত ছিল। এভাবেই হয়েছিল এবং আমি অন্য এক জাতিকে এগুলোর উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম।) [১]

পথে এক ইহুদি হঠাৎ আপনাকে দেখল এবং সম্ভবত তার ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলল এবং বলল: "হে ফারুক! আপনিই বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয়ী।" [২]

হযরত উমর ফারুক (রা.) যখন শাম পৌঁছালেন, তখন মুসলিম সৈন্যরা আপনার অপেক্ষায় ছিল। আপনি কেবল একটি চাদর জড়িয়ে, পাগড়ি ও মোজা পরিহিত অবস্থায় নিজের উটের লাগাম ধরে পানির ঝরনা ও পুকুরগুলো পার হয়ে তাদের দিকে আসছিলেন। কেউ বলল: "আমীরুল মুমিনীন! এখানে শামের সেনাবাহিনী এবং খ্রিস্টান পাদ্রিরা আপনার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আর আপনার এই অবস্থা?" আপনি বললেন: "إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ" "আমরা সেই জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন, সুতরাং আমরা অন্য কোনো কিছুর মধ্যে সম্মান খুঁজব না।" [৩]

জাবিয়া পৌঁছালে মুসলমানরা আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। হযরত আবু উবাইদাহ, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) আপনাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আপনি এখানে সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে এক প্রভাবশালী ভাষণ দিলেন যাতে বললেন:

---

[১] সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ২৫ থেকে ২৮

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৬৫৫ থেকে ৬৫৯

[৩] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২০৭, ত: ইলমিয়্যাহ

https://t.me/BoierSomahar

“নিজের অন্তরকে সংশোধন করো, বাহ্যিক দিকও সংশোধিত হয়ে যাবে। প্রতিটি কাজ আখেরাতের নিয়তে করো, দুনিয়াও সুন্দর হয়ে যাবে। যে জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে যেন মুসলমানদের জামাতের সাথে থাকে, কারণ একাকী ব্যক্তির সাথে শয়তান শরিক হয়ে যায়।”

জাবিয়াতেই বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ আলোচনার জন্য আসলেন। যেহেতু হযরত উমর (রা.)-এর পোশাক ও সওয়ারি ছিল অত্যন্ত সাধারণ, তাই সেনাপতিরা চাইলেন যে আপনি সুযোগ অনুযায়ী ঘোড়ায় সওয়ার হন এবং উত্তম পোশাক পরিধান করে তাদের সামনে যান। কিন্তু তিনি (রা.) কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন:
“আল্লাহ তাআলা ইসলামের বদৌলতে আমাদের যে সম্মান দান করেছেন, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট।” [১]

হযরত উমর (রা.) ঐ ব্যক্তিদের দেওয়া পোশাক কেবল অল্প সময়ের জন্য পরিধান করেছিলেন, তাও কেবল এই কারণে যে সেই সময়ে তাঁর কামিজ ধোয়া হচ্ছিল এবং এর ছেঁড়া অংশে তালি লাগানো হচ্ছিল। এরপর তিনি সেই তালি লাগানো কামিজই পরিধান করলেন। [২]

এই সাধারণ বেশভূষায় তিনি কুদসের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করলেন, সন্ধির বিষয়গুলো নির্ধারিত হলো এবং নিম্নোক্ত চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা হলো:
“আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমরের পক্ষ থেকে ইলিয়া (বাইতুল মুকাদ্দাস) বাসীদের জন্য জান ও মালের নিরাপত্তা রয়েছে। তাদের গির্জা, ক্রুশ এবং পুরো জাতি সবাই নিরাপদ। তাদের উপাসনালয়গুলোকে কেউ আবাসস্থল বানাবে না, সেগুলো ধ্বংস করা হবে না, তাদের নির্মাণশৈলী ও সীমানায় কোনো কমতি করা হবে না, তাদের ক্রুশ ও সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করা হবে না এবং কাউকে কোনো ক্ষতি পৌঁছানো হবে না। বাইতুল মুকাদ্দাস বাসীদের ওপর আবশ্যক হবে যে তারা অন্যান্য শহরের অধিবাসীদের মতো জিযিয়া প্রদান করবে। তাদের ওপর এটিও আবশ্যক যে তারা রোমান (সৈন্য ও কর্মকর্তাদের) শহর থেকে বের করে দেবে।” [৩]

চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় অধিবাসীরা তিন দিনের মধ্যে রোমান সৈন্যদের শহর থেকে বের করে দিল এবং হযরত উমর (রা.) কিবলা-এ-আউয়াল যিয়ারতের জন্য রওয়ানা হলেন। পথে একটি খাল পড়লে আপনি মোজা খুলে হাতে নিলেন এবং উট থেকে নেমে পায়ে হেঁটে তা পার হলেন। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বিস্মিত হয়ে বললেন:
“আপনার এভাবে করা স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অশোভন হবে।”

তিনি (রা.) তাঁর বুকে হাত মারলেন এবং বললেন: “আবু উবাইদাহ! তুমি এমন কথা বলছ! ভুলে গেছ তোমরা দুনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যহীন, দুর্বল ও নিচু ছিলে, আল্লাহ কেবল ইসলামের বদৌলতে তোমাদের সম্মান দান করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা যখনই ইসলামকে ছেড়ে অন্য কোনো জিনিসে সম্মান খুঁজবে, আল্লাহ তোমাদের পুনরায় লাঞ্ছিত করে দেবেন।” [৪]

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৬৬৫, পূর্বোক্ত হাওয়ালা অনুযায়ী

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৬০৯

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৯/৬৬৭, দারু হাজার

তিনি মসজিদে গিয়ে মেহরাবে দাউদের কাছে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করলেন।

প্রথম কিবলা অর্থাৎ সাখরা মুকাদ্দাসাকে রোমানরা ময়লা ও অপবিত্রতার স্তূপে পরিণত করে রেখেছিল, এর একমাত্র কারণ ছিল এটি ইহুদিদের কিবলা ছিল; খ্রিস্টানরা ইহুদিদের ক্ষুব্ধ করার জন্য এই কাজ করত। হযরত উমর ফারুক যখন সাখরা মুকাদ্দাস তালাশ করতে লাগলেন, তখন হযরত কাব আহবার, যিনি একজন ইহুদি আলেম ছিলেন এবং ওই দিনগুলোতেই মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি আপনাকে ইশারায় জানালেন যে সাখরা মুকাদ্দাস এখানে। সাথে সাথে তিনি এই প্রস্তাব পেশ করলেন যে, এখানে নতুন মসজিদ এমনভাবে নির্মাণ করা হোক যাতে মেহরাব সাখরার পেছনে থাকে, যাতে একই সময়ে এখানকার মুসল্লিরা কাবার পাশাপাশি প্রথম কিবলার দিকেও মুখ করতে পারেন। কিন্তু হযরত উমর এটি অপছন্দ করলেন এবং পবিত্র পাথরের সামনে এমনভাবে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন যাতে মুসল্লিদের মুখ কাবার দিকে এবং পিঠ সাখরা মুকাদ্দাসার দিকে থাকে, যাতে ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্যের সামান্যতম সম্ভাবনাও না থাকে।

হযরত উমরের নির্দেশে সাখরা মুকাদ্দাসা থেকে ময়লা-আবর্জনা সরানো শুরু হলো। শুরুতে তিনি নিজেই নিজের চাদর বিছিয়ে তাতে ময়লা উঠাতে লাগলেন, অন্য লোকেরাও এগিয়ে এলেন। এভাবে এই স্থানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলো এবং সামনে মসজিদ নির্মাণ করা হলো যা আজ পর্যন্ত "মসজিদে উমর" নামে পরিচিত। একেই মসজিদে আকসা বলা হয়। [১]

হযরত উমর কিছুদিন শামে অবস্থান করলেন এবং এরপর ১৭ হিজরির শুরুতে পুনরায় মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে এলেন।

## কায়সারের শেষ চেষ্টা:

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর রোমানদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং কায়সার হিরাক্লিয়াস শামে পুনরায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে হতাশ ছিলেন, কিন্তু ১৭ হিজরিতে আল-জাজিরার শাসক ও অধিবাসীরা তাকে নিজেদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে নতুন করে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে উৎসাহিত করল। ফলে কায়সার তার এশীয় রাজধানী হিমস পুনরুদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা করার...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৯/৬৫৫, ৬৬৭, দার হিজর

একটি অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার পর্যালোচনা: হযরত উমর ফারুকের বাইতুল মুকাদ্দাস সফরের ব্যাপারে ওয়ায়েজগণ প্রায়ই বর্ণনা করেন যে:

- সফরে হযরত উমরের সাথে একজন গোলাম ছিল, তারা দুজনে পালাক্রমে উটের পিঠে সওয়ার হতেন।
- বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছানোর সময় হযরত উমর ফারুক উটের লাগাম ধরে হাঁটছিলেন এবং গোলাম সওয়ার ছিল, কারণ সওয়ার হওয়ার পালা তার ছিল।
- হযরত উমরকে এই অবস্থায় দেখেই বাইতুল মুকাদ্দাসের পাদ্রি ও সন্ন্যাসীরা শহরের চাবি আপনার হাতে তুলে দিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেন।
- আহলে কিতাবদের কিতাবে এটি লেখা ছিল যে, এই শহরের বিজয়ী উটের লাগাম ধরে আসবেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও ইতিহাসের কোনো কিতাবে আমি এমন কোনো অতি দুর্বল বর্ণনাও পাইনি যা দ্বারা উল্লিখিত ঘটনাগুলো প্রমাণিত হয়। জানা নেই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই বর্ণনা কোথায় পেলেন!! পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল এগুলো বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে, কারণ যদি কেউ প্রমাণ চেয়ে বসে তবে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। হ্যাঁ, এতটুকু নিশ্চিত যে, হযরত উমর ফারুক বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুই বছর পর যখন শাম সফর করেছিলেন, তখন নিজের গন্তব্য "আইলিয়া"-তে এমনভাবে পৌঁছেছিলেন যে তিনি নিজে উটের লাগাম ধরে পায়ে হাঁটছিলেন এবং আপনার গোলাম সওয়ার ছিল। যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচীন নাম "আইলিয়া" এবং "থাজু আইলিয়া"-র সাথে মিল রয়েছে, তাই সম্ভবত বর্ণনাকারীরা ওলটপালট করে ফেলেছেন এবং এভাবে এই বর্ণনাটিকে বাইতুল মুকাদ্দাস সফরের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হলো যা হিমস অবরোধ করল। আল-জাজিরার খ্রিস্টানরাও ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। এভাবে সিরিয়ায় মুসলমানদের বিজিত এলাকাগুলো চরম বিপদের মুখে পড়ল।

হযরত উমর (রা.) এই নতুন তুফান মোকাবিলার জন্য একদিকে আল-জাজিরার মহাসড়কগুলোতে সৈন্য মোতায়েন করে দিলেন এবং সেখান থেকে বের হওয়া ত্রিশ হাজার রোমান সৈন্যের সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। পাশাপাশি ইরাক থেকে সাহায্য আনিয়ে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মজবুত করলেন এবং নিজে সফর করে দামেস্কে উপস্থিত হলেন যাতে মুসলমানদের মনোবল অটুট থাকে। এই বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে রোমানরা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং পরিশেষে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) হিমস অবরোধকারী খ্রিস্টান বাহিনীকে খোলা ময়দানে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিলেন। এরপর সিরিয়ায় খ্রিস্টানদের পুনরায় বিদ্রোহ করার সাহস আর কখনো হয়নি। যেহেতু এই বিদ্রোহের ভিত্তি আল-জাজিরার দুষ্কৃতকারীরা স্থাপন করেছিল, তাই এরপর মুসলমানরাও আল-জাজিরা এবং তারপর আর্মেনিয়ার দিকে অগ্রসর হতে দেরি করেননি। [১] এই অভিযানের ধারাবাহিকতায় তিকরিত ও কায়সারিয়া বিজিত হয়। এগুলো ১৯ হিজরীর ঘটনা। কায়সারিয়া হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাতে বিজিত হয়েছিল। [২]

**হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর পদচ্যুতি এবং এর প্রকৃত কারণ:**

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের কিছুকাল পর ১৭ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের এই ভুল ধারণা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই ১৩ হিজরীতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে অপসারিত করেছিলেন। এছাড়া কারো কারো ধারণা যে, হযরত উমর ফারুক (রা.) শুরু থেকেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর বিরোধী ছিলেন অথবা তাঁকে অযোগ্য মনে করতেন, অথচ এই কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল। হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে সেনাপতির পদ থেকে তৎক্ষণাৎ অপসারিত করেননি, না তিনি তাঁর বিরোধী ছিলেন, আর না তাঁর যোগ্যতা ও সক্ষমতা নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল। সন্দেহ হবেই বা কীভাবে যখন স্বয়ং নবী আকরাম (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে "সাইফুন মিন সুয়ুফিল্লাহ" (আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি তলোয়ার) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

এই বিষয়ে প্রথম যে বিষয়টি বোঝার মতো তা হলো, হযরত উমর ফারুক (রা.) ১৩ হিজরীতে খলিফা হওয়ার পরপরই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর স্থলে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-কে প্রধান সেনাপতি করার যে আদেশ জারি করেছিলেন, তাতে হযরত খালিদ (রা.)-এর অপসারিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসত না। কারণ হযরত খালিদ (রা.) সাইয়্যিদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কর্তৃক মনোনীত অনেক সেনাপতির মতো একটি বাহিনীর আমির ছিলেন। এই সব বাহিনী আলাদা আলাদা আমিরের অধীনে সিরিয়ায় যুদ্ধ করছিল। যখন আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমানদের আধিক্যের কারণে মুসলমানদের সব বাহিনী এক জায়গায় সমবেত হলো, তখন প্রশ্ন উঠল যে, এখন সবাই কার অধীনে থাকবে? এই পর্যায়ে সবার ঐকমত্যে সাময়িক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩৯ থেকে ৩৫১

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৩১

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-কে প্রধান সেনাপতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থাটি সাময়িক হলেও ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধেও তা বহাল রাখা হয়েছিল। এই সময়ে হযরত উমর (রা) খলিফা হলে তিনি প্রয়োজন অনুভব করেন যে, সিরিয়া ফ্রন্টের বিভিন্ন ইসলামী বাহিনীর জন্য খেলাফত দরবার থেকে একজন প্রধান সেনাপতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। এর জন্য তিনি হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা)-কে নিযুক্ত করেন। যেহেতু হযরত খালিদ (রা) ছিলেন একজন সাময়িক বা অন্তর্বর্তীকালীন সেনাপতি, যিনি খেলাফত দরবার থেকে স্থায়ী প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত ছিলেন, তাই এই আদেশনামা আসার সাথে সাথেই তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আবু উবাইদাহ (রা)-এর অধীনে চলে আসেন এবং তার পূর্ববর্তী মর্যাদা অর্থাৎ একটি বিশেষ বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

হ্যাঁ, এটা সত্য যে হযরত উমর ফারুক (রা) পরবর্তীতে হযরত খালিদ (রা)-কে পদচ্যুত করেছিলেন; এটি ফারুকী খেলাফতের চতুর্থ বছর ১৭ হিজরীর ঘটনা। এর আসল কারণ ছিল এই যে, হযরত উমর ফারুক (রা) লক্ষ্য করেছিলেন যে হযরত খালিদ (রা) যে যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন, মুসলমানরা বিজয়ী হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, তিনি থাকলে মুসলমানদের পরাজয় হতে পারে না। হযরত উমর (রা) মুসলমানদের কেবল আকিদা ও আদর্শই নয়, বরং তাদের চিন্তা ও প্রবণতাকেও সঠিক রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি ভুল বিশ্বাসের কারণ হতে পারে এমন সামান্যতম বিষয়কেও সহ্য করতেন না। যখন তিনি এই আশঙ্কা অনুভব করলেন যে, হযরত খালিদ (রা)-এর এই খ্যাতি শুরুতে ব্যক্তিত্বপূজা এবং পরবর্তীতে ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণ হতে পারে, তখন তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব থেকে ইসলামের যথেষ্ট উপকার লাভের পর এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এখন 'সাইফুল্লাহ'-কে পদচ্যুত করতে কোনো ক্ষতি নেই। ইসলামের এই নিঃস্বার্থ সৈনিক নজিরবিহীন আনুগত্য প্রদর্শন করে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং পরবর্তীতে একজন সাধারণ সৈনিকের মতো যুদ্ধ করতে থাকেন।

কিছু ঐতিহাসিক পদচ্যুতির একটি কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) একজন কবির কাসিদা শুনে তাকে পুরস্কার হিসেবে এক হাজার দিরহাম দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) তা জানতে পেরে রাগান্বিত হয়ে বলেন:

"যদি তিনি বায়তুল মাল থেকে দিয়ে থাকেন তবে তা দুর্নীতি, আর যদি নিজের পকেট থেকে দিয়ে থাকেন তবে তা অপচয়।" [১]

কিন্তু এই বর্ণনাতেই সামনে এই স্পষ্টীকরণও রয়েছে যে, তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে হযরত খালিদ (রা) এই অর্থ নিজের পকেট থেকেই দিয়েছিলেন। স্পষ্টতই এটি কোনো গুনাহ ছিল না। হ্যাঁ, হযরত উমর ফারুক (রা) এটি পছন্দ করেননি কারণ তাঁর মেজাজ ছিল অত্যন্ত সতর্ক, তবে এর দ্বারা হযরত খালিদ (রা)-এর ওপর কোনো অভিযোগ বর্তায় না। আবার চমৎকার বিষয় হলো, হযরত খালিদ (রা) এই অনুপযুক্ত ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বায়তুল মালে সমপরিমাণ অর্থ জমা দেন, যাতে হযরত উমর (রা) অত্যন্ত খুশি হন। সবশেষে যে কথাটি সমস্ত সংশয় দূর করে দেয় তা হলো পদচ্যুতির সিদ্ধান্তের পর হযরত উমর (রা)-এর এই বাণী:

"হে খালিদ! তুমি আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।" [২]

শুধু তাই নয়, বরং হযরত উমর (রা) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর চরিত্র সম্পর্কে মুসলমানদের মনে থাকা সন্দেহ ও সংশয়...

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৫৯, ৩৬০

[২] প্রাগুক্ত (পূর্বোক্ত রেফারেন্স অনুযায়ী)

...থেকে বাঁচানোর জন্য পুরো রাজ্যে এই ঘোষণা করালেন:

“আমি খালিদকে কোনো অসন্তুষ্টি বা দুর্নীতির কারণে বরখাস্ত করিনি, বরং কথা হলো মানুষ তার ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ছিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে মানুষ কেবল তার ওপরই ভরসা করতে শুরু করবে, তাই আমি চেয়েছি মানুষ যেন জেনে নেয় যে সবকিছু করার সত্তা একমাত্র আল্লাহর এবং আমি চেয়েছি মানুষ যেন কোনো ফিতনায় লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যায়।” [১]

দুর্ভিক্ষ:

বিজয় ও বরকতের এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সময়ে মুসলিম উম্মাহকে দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাহস ও প্রজ্ঞার পরীক্ষা এবং তাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষাটি ছিল হিজরি ১৮ সনে ঘটা তীব্র দুর্ভিক্ষ, যার কারণে জাজিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, বৃষ্টি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং চারদিকে ধুলো উড়তে শুরু করেছিল। হযরত উমর (রা.) দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, যতদিন অনাবৃষ্টি ছিল তিনি ঘি, দুধ বা গোশত চেখেও দেখেননি। ক্ষুধার কারণে মানুষের অবস্থা এমন হয়েছিল যে চেহারার রঙ ছাইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল, তাই এই বছরকে ‘আমুর রামাদাহ’ (ছাইয়ের বছর) বলা হয়। অবশেষে হযরত উমর (রা.) মানুষকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন এবং সেই অনুযায়ী সিরিয়া ও ইরাকের গভর্নরদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে শস্যের কাফেলা আনালেন, হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) চার হাজার উট শস্য বোঝাই করে পাঠিয়েছিলেন।

সেই দিনগুলোতে মুযাইনা গোত্রের এক গ্রামবাসী ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে তার পোষা ছাগলটি জবাই করল, যা দেখতেও খুব দুর্বল ছিল। কিন্তু যখন চামড়া ছাড়ানো হলো, তখন ভেতর থেকে কেবল হাড় বের হলো। এটি দেখে গ্রামবাসীর মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল “হায় মুহাম্মদ (সা.)!” (ওহ, তিনি থাকলে এমন হতো না।) যখন সে ঘুমাল তখন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জিয়ারত লাভ করল, তিনি (সা.) বললেন:

“উমরকে আমার সালাম বলো এবং তাকে বলো তুমি তো অঙ্গীকার পালনকারী এবং কথার পাক্কা লোক, তোমার কী হলো, বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করো।”

সেই গ্রামবাসী হযরত উমর (রা.)-এর দরজায় পৌঁছাল এবং তার গোলামকে বলল:

“আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দূত, আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দাও।” হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে যখন সে হুজুর (সা.)-এর পয়গাম শোনাল, তখন হযরত উমর (রা.) বুঝে নিলেন যে এটি সালাতুল ইস্তিসকার সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করার দিকে ইঙ্গিত।

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী সালাতুল ইস্তিসকার জন্য মদিনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের নিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে গেলেন, হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-কে নিজের সাথে রাখলেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করলেন।

অল্প সময় পার হতেই দিগন্তে মেঘ দেখা দিল যাতে বজ্রপাতের সাথে এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল:

আতাকাল গাওসু আবা হাফসিন (হে আবু হাফস, তোমার কাছে সাহায্য এসে গেছে।) [২]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৫৯, ৩৬০

[২] আবু হাফস হযরত উমর (রা.)-এর কুনিয়াত।

হযরত উমর ফারুক (রা.) তখনও মদীনা তাইয়্যেবার জনপদে প্রবেশ করেননি যে প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করল। সমস্ত পুকুর ও গর্ত পানিতে ভরে গেল, পুরো আরবের খরা দূর হয়ে গেল, এদিকে শাম ও ইরাক থেকে শস্যের কাফেলাও এসে পৌঁছাল এবং মুসলমানরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। [১]

**আমওয়াসের প্লেগ:**

দ্বিতীয় বিপদ ও পরীক্ষা ছিল প্লেগের সেই মহামারি যা শাম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সূচনা হয়েছিল ১৮ হিজরির শেষভাগে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী জনপদ "আমওয়াস" থেকে এবং কয়েক মাস পর্যন্ত মানুষ এর কবলে ছিল। মুসলমানদের সামরিক ক্যাম্পও যা এই অঞ্চলে ছিল মহামারির কবলে পড়েছিল, প্রতিদিন অনেক জানাজা উঠছিল। মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন, কারণ নবী আকরাম (সা.)-এর কিছু বাণী থেকে প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়নের নিষেধাজ্ঞা জানা যায়। [২]

হযরত উমর (রা.) মহামারি আক্রান্ত লোকদের ব্যাপারে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে নিজে শাম গিয়ে ইসলামী বাহিনীকে অন্য কোনো এলাকায় স্থানান্তরের তাকিদ দিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) এই বলে ওজর পেশ করলেন যে এটি তো তাকদীর থেকে পলায়নের সমতুল্য।

হযরত উমর (রা.), হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-কে প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে বের করতে চাচ্ছিলেন, তাই তাকে পত্রে লিখলেন: "আমার একটি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যার ব্যাপারে আমি মৌখিকভাবে কথা বলতে চাই, সুতরাং কঠোর তাকিদের সাথে বলছি যে যখনই আমার এই চিঠি দেখবেন, তা হাত থেকে রাখামাত্রই অবিলম্বে আমার দিকে রওনা হয়ে যাবেন।"

হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বুঝে গেলেন যে হযরত উমর (রা.)-এর এই প্রয়োজন যার জন্য আমাকে মদীনা মুনাওয়ারায় ডাকছেন তা এটাই যে তিনি আমাকে প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে বের করতে চান। ফলে তিনি সাথীদের বললেন: "আমি আমীরুল মুমিনীন-এর প্রয়োজন বুঝে গেছি, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান যে বেঁচে থাকার নয়।"

এই বলে ফিরতি চিঠিতে লিখলেন: "আমীরুল মুমিনীন! আপনি যে প্রয়োজনের জন্য ডেকেছেন তা আমার জানা আছে। আমি এমন এক লশকর বা বাহিনীর মধ্যে বসে আছি যাদের থেকে মন সরছে না। আমি তাদের ছেড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আসতে চাই না যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমার এবং তাদের ব্যাপারে তাকদীরের ফয়সালা করে দেন, সুতরাং আমাকে হুকুম পালনে অক্ষম মনে করুন এবং লশকরে থাকতে দিন।"

হযরত উমর (রা.) চিঠিটি পড়লেন তখন তার চোখ ভিজে গেল। পাশে বসা সঙ্গীরা তাকে অশ্রুসিক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন: "কি আবু উবাইদাহ (ইন্তেকাল করেছেন?)"

---

[১] কানযুল উম্মাল, হা: ২৩৫৩৮; তারিখুত তাবারী: ৩/৯৮, ৯৯, ১০০; হায়াতুস সাহাবাহ (উর্দু অনুবাদ, মাওলানা ইহসানুল হক): ৩/৬৩০।

[২] বাকিয়্যাতু রিজযিন আও আযাবিন উরসিলা আলা তয়িফাতিন মিন বনী ইসরাঈল, ফা ইযা ওয়াকাআ বি আরদিন ওয়া আনতুম বিহা ফালা তাখরুজু মিনহা ওয়া ইযা ওয়াকাআ বি আরদিন ওয়া লাসতুম বিহা ফালা তাহবিতু আলাইহা। "এটি একটি আপদ বা আযাবের অবশিষ্টাংশ যা বনী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর নাযিল হয়েছিল, সুতরাং যখন এটি কোনো জমিনে আপতিত হয় আর তোমরা সেখানে থাকো, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না, আর যদি এটি কোথাও আপতিত হয় আর তোমরা সেখানে না থাকো, তবে সেখানে অবস্থান করো না।" (সুনানে তিরমিযী, হা: ১০৬৫, আবওয়াবুল জানায়েয, বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল ফিরারি মিনাত তউন)।

আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাহিদ (শাইখুল হাদীস জামিয়া ইমদাদিয়া ফয়সালাবাদ) সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "তাকমিলা মাআরিফুস সুনান"-এর প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত, তাত্ত্বিক এবং পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন, যা এই বিষয়ে সমস্ত শরয়ী ও ফিকহী দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে। বিদগ্ধজনরা অবশ্যই এটি অধ্যয়ন করবেন।

মৃত্যু হয়েছে?“ তিনি বললেন: “হয়নি তবে মনে হচ্ছে হতে চলেছে।”

তারপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-কে দ্বিতীয় পত্র লিখলেন: “আপনি লোকদের এমন এক নিচু জমিতে রেখেছেন যা নিচু এলাকায় অবস্থিত, এখন তাদের এমন কোনো উঁচু স্থানে নিয়ে যান যেখানকার আবহাওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।”

যখন এই পত্র হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.)-কে ডেকে বললেন: “আমীরুল মুমিনীন-এর এই পত্র এসেছে। এখন আপনি এমন একটি জায়গা খুঁজুন যেখানে নিয়ে গিয়ে লশকরকে রাখা যায়।”

হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.) জায়গা খোঁজার জন্য বের হওয়ার আগে ঘরে পৌঁছালে দেখলেন যে, তাঁর স্ত্রী প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তিনি ফিরে এসে হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-কে জানালেন। এটি শুনে তিনি নিজেই খোঁজে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং নিজের উটের পিঠে হাওদা বেঁধে নিলেন। তিনি কেবল উটের রেকাবে পা রেখেছেন এমন সময় তাঁর ওপরও প্লেগের আক্রমণ হলো। এই অবস্থায় তিনি বাহিনীকে জাবিয়ার দিকে নিয়ে গেলেন। ততক্ষণে হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) এই অসুস্থতাতেই ইন্তেকাল করলেন। তাঁর পর হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, হযরত ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ান, হযরত হারিস বিন হিশাম, হযরত সুহাইল বিন আমর, হযরত উতবা বিন সুহাইল এবং হযরত আমির বিন গাইলান (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিগণ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই উম্মতে মুসলিমার স্থিতিশীলতার জন্য এক একটি স্তম্ভের মতো ছিলেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন এই অবস্থা দেখলেন, তখন এভাবে বিপদগ্রস্ত স্থানে পড়ে থাকাকে সঠিক মনে করলেন না এবং বাহিনীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে গেলেন, এখানে আল্লাহ মুসলমানদের এই মহামারী থেকে মুক্তি দান করলেন, তবে ততক্ষণে প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সিরিয়া সীমান্তে মুসলমানদের জনশক্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা নিজেদের এলাকা রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার সামর্থ্য রাখতেন না।

হযরত উমর ফারুক (রা.) কিছুদিন পর তাঁর গোলাম ইয়ারফাকে সাথে নিয়ে একটি উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে এই বিপদগ্রস্তদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পুরো রাস্তায় কখনো হযরত উমর (রা.) সওয়ার হতেন আবার কখনো গোলাম। আয়লা (সিরিয়া) পৌঁছালে লোকদের জিজ্ঞেস করতে হলো যে, আমীরুল মুমিনীন কে? হযরত উমর (রা.) তখন উটনীর লাগাম ধরে ছিলেন। ইয়ারফা সওয়ার ছিল, আপনি যখন পরিচয় দিলেন তখন লোকেরা অবাক হয়ে গেল। হযরত উমর ফারুক (রা.) সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। মৃতদের উত্তরাধিকারী এবং রোগীদের সান্ত্বনা দিলেন। হযরত বিলাল (রা.)-ও এই লশকরে ছিলেন, হযরত উমর (রা.)-এর অনুরোধে একদিন তিনি আজান দিলেন। লোকেরা এমনিতেই প্লেগের আঘাতে মনমরা ছিল, এই অবস্থায় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ের পরিবেশ তৈরি হওয়ায় সবাই অঝোরে কেঁদে ফেললেন। সবচেয়ে বেশি কান্নারত ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা.), যিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

এখানেই হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নতুন করে বিন্যস্ত করলেন। হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.)-কে...

...জর্ডানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। প্লেগ মহামারীতে হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ইন্তেকালের পর দামেস্ক ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর জন্য একজন অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁরই ছোট ভাই হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-কে এই পদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর ২২ বছর পর্যন্ত দামেস্ক তাঁরই অধীনে ছিল। [১]

## মিশর বিজয়

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলের অভিযানগুলোর মধ্যে মিশর বিজয় বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী, যা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার ধারক এবং হযরত ইউসুফ, হযরত মুসা ও হযরত হারুন (আ.)-এর মতো নবীদের আবাসস্থল হওয়ার গৌরব রাখে। সেই সময়েও এটি বাণিজ্য ও কৃষির এক বিশাল কেন্দ্র ছিল।

মুসলমানরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে নিলেন, তখন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মনে মিশরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা এলো। পেশায় ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে ইসলামের পূর্বে তিনি মিশর সফর করেছিলেন এবং এর সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। মিশরের বেশিরভাগ এলাকা সমতল ছিল। কেবল নীল নদ এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত দুই-তিনটি বড় শহরকে পদানত করতে পারলেই পুরো দেশ দখলে আসা সম্ভব ছিল।

এখানে এটি জানা জরুরি যে, মিশরের কিবতি পাদ্রিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্তা সম্পর্কে রোমানদের আকিদার সাথে মতপার্থক্য পোষণ করতেন। এছাড়া কায়সারে রোমের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির একটি কারণ এটিও ছিল যে, মিশরের শাসক মুকাউকিস রোমানদের খুশি করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের (কিবতিদের) কষ্ট দিতেন, তাই মিশরের জনগণ তীব্রভাবে কোনো মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ছিল। মিশর জয় করা এজন্যও জরুরি ছিল যে, কায়সারে রোম মুকাউকিসকে সাথে নিয়ে যেকোনো সময় কেবল সিরিয়ার সীমান্তেই আক্রমণ করতে পারত না বরং বিজিত এলাকাগুলোতে বিদ্রোহও উসকে দিতে পারত। সুতরাং কায়সারের শক্তি নির্মূল করতে এবং সিরিয়ার প্রতিরক্ষা সুসংহত রাখতে মিশরকে পদানত করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

মোদ্দাকথা, পরিস্থিতি নিজেই মুসলমানদের সামরিক অভিযানের আহ্বান জানাচ্ছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) পীড়াপীড়ি করে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এই অভিযানের অনুমতি চাইলেন। হযরত উমর (রা.) এই অভিযানের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। দুর্ভিক্ষ এবং আমওয়াসের প্লেগ হিজাজ ও সিরিয়ার মুসলমানদের বেশ দুর্বল করে দিয়েছিল, তাছাড়া তখনও ইরানের রণাঙ্গনে কঠিন যুদ্ধ চলছিল এবং নতুন কোনো অভিযানের ঝুঁকি নেওয়া সতর্কতার পরিপন্থী ছিল। তবে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর পীড়াপীড়িতে আপনি লিখে পাঠালেন যে, অভিযান পরিচালনা করো কিন্তু মিশরের সীমান্তে প্রবেশের আগে যদি আমার দ্বিতীয় চিঠি পেয়ে যাও তবে ফিরে এসো।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) অনুমতি পাওয়ামাত্রই চার হাজার মুজাহিদ নিয়ে সিরিয়া থেকে মিশরের দিকে রওনা হলেন। এটি...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৮ হিজরির অধীনে; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৭৬ থেকে ৩৭৯।

এটি ১৯ হিজরির ঘটনা। কয়েক দিনের সফরের পর হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশনামা পাওয়া গেল যে ফিরে আসো। কিন্তু ততক্ষণে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করে সীমান্তবর্তী জনপদ 'আরিশ'-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল যে মিশরের অভিযানে সফলতা আসবে। মিশরের অধিবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার সেই নসিহত তাঁর মনে ছিল যা নবী আকরাম (সা.) করে গিয়েছিলেন, কারণ মিশরের অধিবাসীদের সাথে মুসলমানদের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। আরব মুস্তারিবার আদি পিতা হযরত ইসমাইল (আ.)-এর মাতা হাজেরা (রা.) মিশরের অধিবাসী ছিলেন। এছাড়া মিশরের স্থানীয় বাসিন্দা অর্থাৎ কিবতিদের এক নারী হযরত মারিয়া (রা.) হুজুর (সা.)-এর দাসী এবং তাঁর সাহেবজাদা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর মাতা ছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা.) এটিও জানতেন যে মিশরের বাদশাহ মুকাউকিস নবী আকরাম (সা.)-এর দাওয়াতি পয়গামের সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ নিলেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মন নিজের উত্তম আচরণের মাধ্যমে জয় করে নিলেন। মিশরের বড় পাদ্রি আবু মারিয়াম, যিনি সীমান্ত এলাকায় সৈন্য নিয়ে তাঁর মোকাবিলায় এসেছিলেন, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কথা এবং মিশরের অধিবাসীদের সম্পর্কে সদ্ব্যবহারের হাদিস শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন: "এত সুদূরপ্রসারী আত্মীয়তার খেয়াল কেবল পয়গম্বররাই রেখে থাকেন।"

অবশেষে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) আরিশ এবং বিলবিসের সীমান্তবর্তী দুর্গগুলো জয় করে নীল নদের তীরে মিশরীয়দের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন যাকে 'ব্যাবিলন' বলা হতো, মিশরের রাজা মুকাউকিস এখানেই দুর্গবন্দী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইউরোপ থেকে কায়সারের নির্দেশ এলো যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখো। মিশরের স্থানীয় কিবতি বাসিন্দারাও সন্ধি করতে চেয়েছিল কিন্তু রোমানদের চাপের কারণে তারা চুপ ছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) শহরটি অবরোধ করলেন যা পুরো সাত মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আপনার বড় তাবু যাকে আরবিতে 'ফুসতাত' বলা হয়, মিশরের দুর্গের সামনে স্থাপন করা হয়েছিল, এত দীর্ঘ সময় এখানে তাবু টানানো থাকার কারণে এর খুঁটিতে একটি কবুতর বাসা বেঁধে ফেলেছিল। এদিকে যুদ্ধ মাঝেমধ্যে চলছিল, দুর্গের মজবুতি এবং উচ্চতার কারণে সফলতা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। অবশেষে হযরত উমর (রা.) সাহায্যের জন্য জমাদিউল আখিরা ১৯ হিজরিতে বারো হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে পাঠালেন যার নেতৃত্ব হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম, হযরত উবাদা ইবনুস সামিত এবং হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.)-এর মতো সাহাবায়ে কেরামের হাতে ছিল।

একদিন হযরত জুবাইর (রা.) কিছু জানবাজদের সাথে মই লাগিয়ে একাই প্রাচীরের ওপর উঠে গেলেন এবং লড়াই করতে করতে ভেতরে নেমে দরজা খুলে দিলেন। এভাবে রবিউস সানি ২০ হিজরি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ফেরাউনদের এই তিলসমাতী কেন্দ্র ইসলামের সামনে মাথা নত করল। মুকাউকিসসহ এখানে সমস্ত কিবতি এবং রোমানদের নিরাপত্তা দেওয়া হলো।

মুকাউকিস সরাসরি আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে দুর্গবন্দী হলেন যা ভূমধ্যসাগরের তীরে মিশর রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর ছিল। যা হযরত ঈসা (আ.)-এর সোয়া তিনশ বছর আগে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আবাদ করেছিলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এখন এটি জয় করতে চেয়েছিলেন। কায়সার মুসলমানদের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ আলেকজান্দ্রিয়া রক্ষার জন্য একটি বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন দেখলেন তাবুতে কবুতর বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে...

গিয়েছেন, আপনি তাঁবুটি যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই রেখে দিলেন এবং সেনাবাহিনী নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছালেন।

শহরের অবরোধ অব্যাহত ছিল যখন রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলে তার নাতি কনস্টান্টিন সম্রাট হন, যিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ এবং অল্পবয়সী। তাই মিশরের শাসক মুকাউকিস তার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে কিবতিদের মতানুসারে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া তাদের হাতে তুলে দেন। এই উপলক্ষে যে সন্ধি চুক্তি হয়েছিল, তাতে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জিজিয়া প্রদানের শর্তে জান-মাল ও উপাসনালয়ের সুরক্ষা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। এটিও নির্ধারিত হয়েছিল যে, রোমানদের নৌবহর এবং সৈন্যরা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ফিরে যাবে এবং ভবিষ্যতে মিশরীয়রা তাদের নিজেদের দেশে প্রবেশ করতে দেবে না। সম্রাট কনস্টান্টিনকেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই চুক্তি মেনে নিতে হয় এবং নৌবহর ফিরিয়ে নিতে হয়। সম্রাট এবং তার প্রতিনিধি মুকাউকিসের ধর্মীয় কঠোরতা, অন্যায্য কর এবং অবিচারের কারণে মিশরের স্থানীয় মানুষ এক আযাবের মধ্যে নিপতিত ছিল। এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক ঔপনিবেশিক শক্তির কব্জা, যাতে কিবতিরা শতাব্দী ধরে আবদ্ধ ছিল। মুসলমানরা তাদের মুক্তি দিয়ে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের ফলে একদিকে এশিয়া মাইনর ব্যতীত সমগ্র এশিয়া মহাদেশ থেকে রোমানদের পূর্ণ দখলদারিত্ব শেষ হয়ে যায় এবং তাদের শক্তির ওপর এক মারাত্মক আঘাত লাগে, অন্যদিকে সিরিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান শক্তিশালী হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার পর মিশরের বাকি দুর্গগুলোও সামান্য প্রতিরোধের পর বিজিত হতে থাকে। হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.) যখন মিশরের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছালেন, তখন হযরত উমর ফারুক (রা.) সুসংবাদ শুনেই সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এরপর ঘোষণা দিয়ে মদিনাবাসীদের একত্রিত করলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-এর মুখ থেকে বিজয়ের ঘটনাবলী তাদের শোনালেন।

মিশর বিজয়ে হাজার হাজার রোমান ও কিবতি বন্দী হয়। হযরত উমর (রা.) এই বন্দীদের ব্যাপারে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, সবাইকে একত্রিত করে ইখতিয়ার দাও; যে চায় ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের ভাই হয়ে যাক, আর যে চায় পূর্বের ধর্মের ওপর অটল থেকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করুক, তাকে কেবল জিজিয়া দিতে হবে যা জিম্মিদের ওপর আবশ্যক। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এই নির্দেশ পালন করেন, ফলে একদিনেই প্রচুর সংখ্যক বন্দী মুসলমান হয়ে যান, যাতে মুসলমানরা অনেক আনন্দ প্রকাশ করেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এই বিজয়গুলো থেকে অবসর হয়ে ফেরাউনদের রাজধানী ‘ব্যাবিলন’-এ ফিরে আসেন, তখন তার তাঁবুটি তখনও দুর্গের সামনে একইভাবে পোঁতা ছিল যা কবুতরের খাতিরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এই ময়দানে জমির অংশ মেপে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন, ফলে শীঘ্রই মানুষ সেই স্থানে কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ি তৈরি করে নেয় এবং এই জনপদ তাঁবুর নামানুসারে ‘ফুসতাত’ নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে মিশরের রাজধানীর এই নামই হয়ে যায়। [১]

---

[১] চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে যখন বনু উবায়েদ ফুসতাতের কাছে কায়রো আবাদ করে, তখন রাজধানীর মর্যাদা ফুসতাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি উভয় যমজ শহরকে একত্রিত করে এক করে দেন এবং এভাবে ফুসতাত কায়রোর সাথে একীভূত হয়ে যায়।

কিছু দিন পর হযরত উমর (রা.) মিসরের রাজস্বের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে দক্ষিণ অংশের গভর্নর পদে বহাল রেখে উত্তর অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারহ (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। [১]

নীল নদের কনে:

সেই দিনগুলোতে মিসরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা ইতিহাসে ইসলামের সত্যতা, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মহিমা এবং মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতাকে বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। মিসরে এই নিয়ম ছিল যে, কিবতি মাসের ১২ তারিখ (২৫ মে) একজন কুমারী মেয়েকে কনের মতো সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে নীল নদে ফেলে দেওয়া হতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ছিল যে, এই প্রথা পালন না করলে নীল নদের পানি শুকিয়ে যায়।

তারা হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে এই প্রথা পালনের অনুমতি প্রার্থনা করল। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কঠোরভাবে তাদের নিষেধ করলেন এবং বললেন: “ইসলামে এর কোনো অবকাশ নেই।” আল্লাহ মুসলমানদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাই যখন প্রথাটি পালনের তারিখ পার হয়ে গেল, তখন নদীর পানি সত্যিই শুকিয়ে যেতে শুরু করল। জুন ও জুলাই মাস পেরিয়ে আগস্ট শুরু হয়ে গেল কিন্তু নদীতে পানি প্রবাহিত হলো না। খালগুলোও শুকিয়ে গেল এবং খেত-খামার অনাবাদী হয়ে পড়ল। স্থানীয় লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এই পরিস্থিতি হযরত উমর (রা.)-কে লিখে পাঠালেন। তিনি জবাবে লিখলেন: “তুমি যা করেছ তা একদম ঠিক করেছ। আমার এই চিঠির সাথে একটি চিরকুট আছে, সেটি নীল নদে ফেলে দিও।” হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) সেই চিরকুটটি দেখলেন, তাতে লেখা ছিল:

“আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে মিসরের নীল নদের প্রতি: হে নীল! যদি তুমি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হও তবে তোমার প্রতি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হও, তবে আমরা আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করছি যেন তিনি তোমার পানি প্রবাহিত করে দেন।”

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) রাতের বেলা সেই চিরকুটটি নীল নদে ফেলে ফিরে এলেন। স্থানীয় লোকজন দেশ ত্যাগের জন্য তাদের আসবাবপত্র গুছিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সকালে তারা দেখল যে নদীতে পানি ঢেউ খেলছে। মেপে দেখা গেল যে চব্বিশ ফুট পানি রয়েছে। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত নীল নদের পানি আর শুকায়নি। ফেরাউনদের এই কুপ্রথা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ঈমানি শক্তির বদৌলতে এমনভাবে মিটে গেছে যে এখন তা কেবল ইতিহাসের পাতায়ই অবশিষ্ট রয়েছে। [২]

---

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ২১০ থেকে ২১৩; তারিখুত তাবারী ৩: ১০৩; দারুল মাআরিফ, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০: ১০০; ফাতহে মিসর লিদ-দুকতুর জামাল আব্দুল হাদী, পৃষ্ঠা ১৩ থেকে ৩৬, দারুল ওয়াফা।

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০: ১১০, ২০ হিজরীর অধীনে।

## ইয়াজদগিরদের শেষ চেষ্টা - নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ

ইরাক ও পারস্য থেকে সাসানীয়দের আধিপত্য খতম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ইয়াজদগিরদ তখনও জীবিত ছিল। ইসফাহান, কিরমান এবং অন্যান্য স্থানে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে সে খোরাসানের কেন্দ্রীয় শহর 'মার্ভ'-এ পা রাখার সুযোগ পায়। পারস্যের অগ্নি উপাসনালয়ের যে আগুন সে নিজের সাথে সব জায়গায় নিয়ে ফিরছিল, তা সেখানে আবার প্রজ্বলিত করা হলো। মার্ভে একটি বিশাল অগ্নি উপাসনালয় নির্মাণ করে সে অগ্নি উপাসনার নামে মানুষকে উত্তেজিত করল এবং সাসানীয় সালতানাতের অধীনে থাকা দূর-দূরান্তের এলাকাগুলোতে ঘোষণা করে দিল যে, অগ্নি উপাসনার অস্তিত্ব রক্ষা, সাসানীয় বংশের সুরক্ষা এবং স্বদেশের সম্মানের খাতিরে যেন সবাই এক পতাকাতলে সমবেত হয়। এর ফলে চারদিকে এক শোরগোল পড়ে গেল। ইসফাহান ও তাবারিস্তান থেকে শুরু করে মাকরান ও সিন্ধুর মরুভূমি পর্যন্ত মানুষ দলে দলে তার কাছে সমবেত হতে লাগল। এমনকি দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হলো সাসানীয় বংশের বিখ্যাত শাহজাদা মাদান শাহ বিন হরমুজের হাতে। ইরানীদের পবিত্র পতাকা 'দিরাফশে কাভিয়ানি' সেনাপতির মাথার ওপর উড়ছিল। এই বাহিনী নাহাওয়ান্দে এসে তাবু গাড়ল, যার ফলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

হযরত উমর ফারুক (রা.) ইয়াজদগিরদের এই অসাধারণ প্রস্তুতির সংবাদে এতটাই চিন্তিত হলেন যে, তিনি মজলিসে শূরা ডেকে পরামর্শ চাইলেন। কাদিসিয়ার যুদ্ধের মতো এবারও কিছু সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ দিলেন যে, আমিরুল মুমিনীন নিজেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিন। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর মত ছিল যে, আমিরুল মুমিনীন কেন্দ্রে অবস্থান করবেন এবং প্রতিটি ফ্রন্ট থেকে এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠাবেন।

হযরত উমর (রা.) এই মত গ্রহণ করে কুফায় অবস্থানরত হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.)-কে নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করলেন। আমিরুল মুমিনীনের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে নাহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হলেন। মুসলমানদের একটি বাহিনী হযরত উমর (রা.)-এর কঠোর নির্দেশে পারস্য থেকে ইরানীদের জন্য আসা সাহায্যের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে কুফার ইসলামী বাহিনী কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন না হয়েই নাহাওয়ান্দে পৌঁছে গেল। ইসলামী বাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত মুগীরা বিন শুবা, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান, হযরত আমর বিন মাদি কারিব এবং হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.) দূত হিসেবে ইরানী সেনাপতি মাদান শাহর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু আলোচনা নিষ্ফল হয়।

অবশেষে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.) বাহিনীর অগ্রবর্তী দল বিন্যস্ত করলেন। তিনি তাঁর ভাই হযরত নুআইম (রা.)-কে ডান পার্শ্বে, হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে বাম পার্শ্বে এবং তাঁর অন্য ভাই হযরত সুওয়াইদ (রা.)-কে পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন।

ইরানীরা এই যুদ্ধের জন্য এক অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছিল। তারা পরিখা খনন করে তাতে অবস্থান নিয়েছিল এবং তীর...

তারা তীরের ফলা তাক করে বসে ছিল। পরিখার সামনে তারা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত 'খাসাক' (কাঁটাযুক্ত গোলক) বিছিয়ে দিয়েছিল, যার কারণে মুসলমানদের সামনে এগিয়ে আক্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। ইরানিরা যখন চাইত তাদের পরিখা থেকে মাথা তুলে মুসলমানদের ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করত এবং পুনরায় পরিখায় লুকিয়ে মুসলমানদের পাল্টা তীরন্দাজি থেকে নিরাপদ হয়ে যেত।

বেশ কয়েক দিন ধরে এই ধারা চলতে থাকে। মুসলমানরা কোনোভাবেই তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল থেকে বের করে আনতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। অবশেষে সবাই পরামর্শ করতে বসলেন। অনেক প্রস্তাব সামনে এল কিন্তু কোনোটিই কার্যকর মনে হলো না। পরিশেষে তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদ বললেন:

"আজ পর্যন্ত শত্রু আমাদের পিঠ দেখিয়ে পালাতে দেখেনি। আমার রায় হলো, আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ওপর একবার আক্রমণ করে পলায়ন করবে, যাতে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের পেছনে খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসে, তখন আমরা তাদের দেখে নেব।"

হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.) এই প্রস্তাবের প্রশংসা করে হযরত কাকা বিন আমর (রা.)-কে এই দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তিনি অশ্বারোহীদের নিয়ে ইরানিদের পরিখার যতটা সম্ভব কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তাদের ওপর প্রচণ্ড তীরন্দাজি করলেন। জবাবে ইরানিরা তীর ছুড়লে তারা হঠাৎ ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেন। ইরানিরা মনে করল যে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে এবং প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছে। তারা পরিখা থেকে বেরিয়ে তাদের পেছনে ছুটল। সাতজন করে বর্মধারী একেকটি শিকলে বাঁধা অবস্থায় পাহাড়ের মতো সামনে এগিয়ে আসছিল। মারদান শাহ সৈন্যদের আরও উৎসাহিত করার জন্য তাদের পেছনে পুরো ময়দানে কাঁটাযুক্ত গোলক ছড়িয়ে দিলেন যাতে ইরানিরা তাদের শত্রুকে খতম করেই দম নেয় এবং পালিয়ে পুনরায় পরিখায় লুকিয়ে পড়ার চিন্তা যেন মনেও না আনে। হযরত কাকা (রা.)-এর অশ্বারোহীরা অনেক দূর পর্যন্ত পিছু হটতে থাকলেন এবং ইরানিরা তীর বর্ষণ করতে করতে তাদের তাড়া করতে থাকল। ময়দানের অন্য প্রান্তে হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.) মূল বাহিনীর সাথে উপস্থিত ছিলেন। নিজের সাথীদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও জোহর পর্যন্ত তিনি পাল্টা আক্রমণের অনুমতি দিলেন না।

জোহরের নামাজ আদায় করে হযরত নুমান (রা.) ঘোড়ায় সওয়ার হলেন, বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন এবং দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ! আজ তোমার বান্দাদের সাহায্য করো, ইসলামকে বিজয়ী করে আমার চোখ জুড়াও এবং আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো।" তারপর সাথীদের বললেন: "আমি শহীদ হয়ে গেলে হুজাইফা বিন ইয়ামান আমির হবেন।"

এ কথা বলে মুসলমানদের যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী একে একে তিনটি তকবির বললেন এবং শত্রুর ওপর পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করে দিলেন। ইরানিরা যারা তাদের পরিখা থেকে বেশ দূরে বেরিয়ে এসেছিল, এখন খোলা ময়দানে লড়াই করতে বাধ্য হলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ মরণপণ লড়াই চালিয়ে গেল। লোহার সাথে লোহা সংঘর্ষের শব্দ মাইলের পর মাইল দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। প্রচুর রক্তপাতের ফলে ময়দানে এমন কাদা হয়ে গিয়েছিল যে ঘোড়াগুলো পিছলে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

এই সময়ে লশকর-এর আমির হযরত নুমান (রা.)-এর গায়ে একটি তীর বিঁধল, সাথে সাথে ঘোড়াটি পিছলে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেই চিৎকার করে বললেন: "কোনো মুসলমান যুদ্ধ ছেড়ে আমার দিকে মনোযোগী হবে না, আমি শহীদ হয়ে গেলে পরোয়া করো না।"

এদিকে তাঁর ভাই হযরত নুয়াইম বিন মুকাররিন (রা.) তাঁর কাছ থেকে পতাকা নিয়ে তৎক্ষণাৎ হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.)-এর

হাতে তুলে দিলেন, লড়াই সমানে চলতে থাকল, কেউ জানতে পারল না যে মুসলমানদের আমীর মৃত্যুশয্যায়।

রাতের বেলা ইরানিদের সাহস ফুরিয়ে গেল এবং তারা ময়দান থেকে পিছু হটতে শুরু করল, কিন্তু পরিখায় যাওয়ার রাস্তা কাঁটাদার প্রতিবন্ধক দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইরানিরা কাঁটায় আহত হয়ে পড়তে থাকল এবং মুসলমানরা তাদের খতম করতে থাকল। এভাবে প্রায় এক লক্ষ ইরানি নিহত হলো।

হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.)-এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ঘনিয়ে এসেছিল যখন তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হলো। তিনি বললেন: "আল্লাহর শোকর ও ইহসান, হযরত উমর ফারুককে এই সংবাদ পৌঁছে দিও।" এই বলে তিনি প্রকৃত স্রষ্টার কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন।

হযরত কাকা (রা.) নাহাওয়ান্দ থেকে পালিয়ে যাওয়া ইরানিদের "হামাদান" পর্যন্ত ধাওয়া করলেন এবং তা জয় করে ফিরে এলেন। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ২১ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। নাহাওয়ান্দে পরাজয়ের পর সাসানীয় বংশের শক্তি চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। হযরত উমর ফারুক (রা.) এই যুদ্ধ নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে তিনি দিনরাত ব্যাকুল হয়ে দোয়া করতেন। যখন তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদের সাথে হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দেওয়া হলো, তখন তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। এরপর দূতের কাছে জিজ্ঞেস করলেন: "আর কোন কোন ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন?" দূত কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম বললেন এবং বললেন: "তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক লোক শহীদ হয়েছেন যাদের আপনি চেনেন না।" হযরত উমর (রা.)-এর চোখ থেকে আবারও অশ্রু ঝরতে লাগল এবং তিনি বললেন: "উমর যদি ওই লোকদের না চেনে তাতে কী হয়েছে, আল্লাহ তো তাদের চেনেন, যিনি তাদের শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং উমরের চেনা বা না চেনাতে তাদের কী আসে যায়।" [১]

**ইয়াজদগিরদ আত্মগোপনে:**

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধের কারণগুলো বিবেচনা করে হযরত উমর (রা.) ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাসানীয় বংশ এবং তাদের শাসক ইয়াজদগিরদকে পুরো পারস্য ও খোরাসান থেকে বিতাড়িত করা না যাবে, ততক্ষণ ইরানিদের বিদ্রোহ শেষ হবে না। এই কারণে ২১ হিজরিতে তিনি পূর্ব দিকে সাধারণ অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং বেশ কয়েকটি বাহিনী গঠন করে তাদের বিভিন্ন পথে পাঠিয়ে দেন। এই বিন্যাস অনুযায়ী হযরত আহনাফ বিন কায়েস খোরাসান, হযরত সারিয়া বিন জানিম কিরমান, হযরত আসিম বিন আমর সিস্তান (দক্ষিণ আফগানিস্তান), হযরত হাকাম বিন উমাইর তাগলিবী মাকরান ও বেলুচিস্তানের দিকে যাত্রা করেন। হযরত মুগীরা বিন শুবা এবং হযরত উকবা বিন গাজওয়ান (রা.) আজারবাইজানের দিকে অগ্রসর হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত এলাকা জয় করে নেন। এছাড়া হযরত মুয়াইয়াদ বিন মুকাররিন (রা.) তাবারস্তান এবং হযরত আলা বিন হাদরামি (রা.) পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দেন।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৯৫ - ৩৫৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১১৭ থেকে ১২৩; আল-ইবার লিয যাহাবী: ২১ হিজরি।

সাবেক নবুওয়াতের দাবিদার তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদও এই যুদ্ধে শাহাদাতের সুধা পান করেন। মিথ্যা নবুওয়াত থেকে তওবা করে ইসলামের জন্য প্রাণ দেওয়া এই কথারই প্রমাণ ছিল যে, তুলাইহার তওবা সত্য ও কবুলযোগ্য ছিল। (তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী: ৩/২৯, ২৩০ ত তদমুরী)

ইয়াজদগিরদের সাথে শেষ যুদ্ধটি খোরাসানের মার্ভের নিকটবর্তী মুরগাব নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হযরত আহনাফ বিন কায়েস (রা.)। এখানে ইয়াজদগিরদকে সাহায্য করার জন্য চীনের খাকান স্বয়ং সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ইয়াজদগিরদ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। সাধারণ যুদ্ধের আগে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে মুসলমানদের বীরত্ব দেখে চীনের খাকান হতাশ হয়ে পড়েন এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। তখন ইয়াজদগিরদও চরম হতাশার অবস্থায় সাসানীয়দের ধনভাণ্ডার বোঝাই করে খাকানের আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য খোরাসান থেকে তুর্কিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে দরবারীরা এই বলে তার কাছ থেকে সমস্ত ধনভাণ্ডার ছিনিয়ে নেয় যে, "আমরা ইরানিদের সম্পদ তুর্কিস্তানে নিয়ে যেতে দেব না।"

ইয়াজদগিরদ কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে চীনের খাকানের রাজধানী ফারগানায় পৌঁছান এবং একজন শরণার্থীর মতো বছরের পর বছর সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) যখন তার পরিণতির খবর পেলেন, তখন তিনি একটি ঐতিহাসিক খুতবা প্রদান করেন যাতে তিনি বলেন:

"মনে রেখো! মজুসীদের (অগ্নিউপাসক) রাজত্বের অবসান হয়েছে। এখন তারা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের তাদের ভূমি, সম্পদ ও শহরগুলোর মালিক বানিয়েছেন যাতে তিনি তোমাদের কর্মের পরীক্ষা নিতে পারেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের চরিত্র পরিবর্তন করে ফেলো, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের দান করবেন।" [১]

## মাকরানে ইসলামী বাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়া হলো:

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের শেষ বছরগুলোতে পারস্য সংলগ্ন এলাকা এবং বেলুচিস্তানের কিছু জেলা বিজিত হয়েছিল। এরপর ছিল মাকরান ও কান্দাবিল এলাকা। বাহিনী যখন গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে এল, তখন হযরত উমর (রা.) এলাকার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বাহিনীর সেনাপতি সাহার আল-আবদি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় উত্তর দিলেন: "সেখানকার পানি স্বল্প, খেজুর বিস্বাদ এবং দস্যুরা সাহসী। যদি বিশাল বাহিনী পাঠানো হয় তবে তারা ক্ষুধায় মারা যাবে, আর যদি অল্প বাহিনী পাঠানো হয় তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

হযরত উমর (রা.) এটি শুনে আরও অগ্রযাত্রা স্থগিত করে দিলেন। [২]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩০৫ থেকে ৩০৭, ত. দারুল কিতাব আল-আরাবি।

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/১৮৩; উয়ুনুল আখবার লি ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারী: ২/২১৭; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩২৫।
বালাযুরী "ফুতুহুল বুলদান"-এ এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে সিন্ধু বিজয়ের জন্য হাকীম বিন জাবালার নেতৃত্বে "তালাই" (অনুসন্ধানী দল) পাঠানো হয়েছিল। ফিরে আসার পর হাকীম বিন জাবালা হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে সিন্ধু সম্পর্কে এই শব্দগুলো উল্লেখ করেন যা অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বেলুচিস্তান সম্পর্কে সাহার আল-আবদির দিকে নিসবত করেছেন। বালাযুরী এটি আলী বিন মুহাম্মদ (আবুল হাসান আল-মাদায়িনী)-এর বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি) সনদ থেকে বর্ণনা করেছেন (খলিফা বিন খাইয়াতও এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তবে সনদসহ)। সনদের দুর্বলতা ছাড়াও যৌক্তিকভাবেও (দিরায়াতান) এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, কারণ হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের বিজয়গুলোতে হাকীম বিন জাবালার কোনো উল্লেখযোগ্য উল্লেখ পাওয়া যায় না; বরং এই ব্যক্তি সাবায়ী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলনে অগ্রণী ছিল, যেমন দ্বিতীয় খণ্ডে এই ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে আসবে। এটিও স্পষ্ট যে, যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলা হয়েছে তা সিন্ধুর ওপর পুরোপুরি খাটে না; সিন্ধুর খেজুর সারা বিশ্বে বিখ্যাত, অথচ এই বর্ণনায় সেখানকার খেজুরকে বিস্বাদ বলা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটি বেলুচিস্তানের হতে পারে, সিন্ধুর নয়। পানির স্বল্পতার বৈশিষ্ট্যটিও সিন্ধুর তুলনায় বেলুচিস্তানের ওপর বেশি প্রযোজ্য কারণ সিন্ধুর বিশাল এলাকা সিন্ধু নদের কারণে শস্যশ্যামল, যেখানে বেলুচিস্তান নদী ও শহর থেকে একেবারেই বঞ্চিত এবং পানিশূন্য ও ঊষর। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, এই ঘটনাটি মাকরান ও বেলুচিস্তানের অভিযানের সাথে সম্পর্কিত এবং হযরত উমর (রা.)-এর আমলের, আর এই শব্দগুলো হাকীম বিন জাবালার নয় বরং সাহার আল-আবদির।

## হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগের মুসলিম বিশ্ব

এটি ২২ হিজরি সাল। হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের নবম বছর। ইসলামী খিলাফত যা "আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান" ইশতেহারের অধীনে অস্তিত্ব লাভ করেছিল, তা এখন পূর্বে পামির মালভূমি, পশ্চিমে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল (৩৬ লক্ষ ২১ হাজার বর্গকিলোমিটার) এলাকায় শরয়ী আইন কার্যকর রয়েছে। ইসলামের জীবন্ত দৃশ্যপট পবিত্র কুরআনের ওয়াদা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত বিশাল ভূখণ্ডে এমন এক মহান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে আল্লাহর সেই শাশ্বত দ্বীন কার্যকর, যা বান্দাদের জন্য আগাগোড়া হেদায়েত, রহমত এবং শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। প্রথমবারের মতো আল্লাহর বান্দারা তাঁর জমিনে পূর্ণ তৃপ্তি, প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে; তাদের নিজ রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই বিশাল রাষ্ট্রে কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায় না, কেউ দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে আত্মহত্যা করে না, কেউ অরাজকতা ও অবিচারের অভিযোগ করে না, কেউ কারো ওপর জুলুম করার সাহস করে না। যদি অলঙ্কারে সজ্জিত কোনো নারী এই সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একা সফরে বের হয়, তবে তার মনে সামান্যতম আশঙ্কাও জাগে না যে কেউ তার দিকে কুনজরে তাকাবে। ইনসাফের দাবির সামনে ধনী-দরিদ্র, সিপাহী ও অফিসার, বাদশা ও গোলাম, মুসলিম ও অমুসলিম সবাই সমান। মুসলমানদের কোনো বাদশা নেই, নেই কোনো শাহজাদা বা রাজপরিবার। তাদের প্রধান কেবল আমীরুল মুমিনীন, যিনি কোনো প্রহরী ছাড়াই সফর করেন, যার দরজায় কোনো দ্বারপাল নেই, যিনি তালি দেওয়া কাপড় পরেন এবং শুকনো রুটি খান। যার হৃদয়ে একদিকে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সেবার আবেগ উথলে ওঠে, আর অন্যদিকে আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতিতে তিনি কেঁপে ওঠেন। তিনি আল্লাহ তাআলাকে এতটাই ভয় পান যে প্রায়ই বলে ওঠেন, "হায়, আমি যদি ঘাসের একটি টুকরো হতাম! হায়, আমি যদি এই পরীক্ষা ও বিপদের জগতে জন্ম না নিতাম!" [১]

যখন তিনি নামাজ পড়ান, তখন তিলাওয়াতের সময় তাঁর কান্নার আওয়াজ কয়েক কাতার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হাশরের ময়দান, হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর আজাবের কথা শুনে তিনি কখনো কখনো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। [২]

এটি আমীরুল মুমিনীনের প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা, যেখানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। শুরার এই ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত হওয়ার পাশাপাশি আরবদের গোত্রীয় সভ্যতার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মানব প্রকৃতি...

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/২১২ থেকে ২৩৬; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১০৩-১০৪, ১৩১।

[২] হায়াতুস সাহাবা: ৩/৩২৩, ৩২৪, ত. আর-রিসালা।

https://t.me/BoierSomahar

...এবং সামাজিক মূলনীতিরও কাছাকাছি ছিল। শুরার গোত্রীয় প্রথাকে হযরত ফারুক আজম (রা.) একটি নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়েছিলেন, যাতে হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, হযরত উবাই ইবনে কাব, হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মতো সমকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১] আমিরুল মুমিনীনের কোনো প্রাসাদ নেই, কোনো দরবারও নেই। মসজিদে নববীই তাঁর কেন্দ্র, যেখানে তিনি নিজেও নামাজ পড়ান এবং মুসলমানদের সাথে মেলামেশা করেন। বিশেষ সিদ্ধান্তগুলো শুরায় উন্মুক্ত আলোচনার পর গ্রহণ করা হয় এবং দলিলের আলোকে যেকোনো বিষয়কে যাচাই করা হয়। [২]

সাধারণ মুসলমানদের কোনো বিষয়ে আস্থায় নিতে বা জনমত গঠন করতে অথবা কোনো বিশেষ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমিরুল মুমিনীন মাঝেমধ্যে নিজেই মসজিদে নববীতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জবাবদিহিতার ঐতিহ্য এতটাই সুদৃঢ় করা হয়েছিল যে, যেকোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে সমকালীন শাসকের পোশাক, আয়-ব্যয় এবং অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারত এবং আমিরুল মুমিনীন তাকে সন্তুষ্ট করা জরুরি মনে করতেন। প্রজাদের প্রয়োজনের জন্য সরকারপ্রধান নিজেই রাতে টহল দিতে দেখা যেতেন। পথে কোনো বৃদ্ধা নারী বকাঝকা করলেও তিনি কিছু মনে করতেন না। [৩]

আরবের শাসনব্যবস্থা এ পর্যন্ত অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে চলে আসছিল, যেখানে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যে পদ ও বিভাগের আধিক্য নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। হযরত উমর ফারুক (রা.) সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে শাসনব্যবস্থাকে উন্নত করার দিকেও পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে প্রশাসনের এক আদর্শ নমুনা পেশ করেছেন।

তিনি ইসলামি বিশ্বকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেছেন: মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, সিরিয়া, আল-জাজিরা, ফিলিস্তিন এবং মিসর। এরপর প্রতিটি প্রদেশের জন্য আলাদা আলাদা জেলা নির্ধারণ করেছেন। প্রতিটি স্থানে পূর্ণ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বেছে বেছে সেরা এবং যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাদের জন্য সম্মানজনক বেতন নির্ধারিত ছিল, তাই তারা জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে দিন-রাত দ্বীন ও মিল্লাতের সেবায় মগ্ন থাকতেন। মক্কা মোকাররমায় হযরত খালিদ বিন আস, কুফায় হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, বসরায় হযরত আবু মুসা আশআরি, সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া, আল-জাজিরায় হযরত ইয়াজ বিন গানাম এবং ইয়েমেনে হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া (রা.) খলিফার প্রতিনিধি ছিলেন। জবাবদিহিতা এবং নাগরিক শৃঙ্খলা ও প্রশাসনের বিভাগ (যাকে বর্তমানে পুলিশ বলা হয়) “আহদাস” নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ও পণ্ডিত সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৪]

এই গভর্নর, কর্মকর্তা এবং পদাধিকারীদের ওপর হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর কড়া নজর থাকত এবং যেকোনো নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাদের খেলাফত দরবারের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ ও শাস্তির ভয় লেগে থাকত। [৫]

---

[১] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ১০১, ১০২

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/ ২০২, ২০৩

[৩] তারিখুত তাবারী: ৩/ ২৩১; উসদুল গাবাহ, তর: আবু হুরায়রা (রা.)

[৪] তারিখুত তাবারী: ৩/ ২০৮; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১০৩

[৫] উসদুল গাবাহ, তর: মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ (রা.)

হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রথমবারের মতো 'বাইতুল মাল'-এর আনুষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করে ইসলামী সরকারের আয় ও অনুদান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে এই সম্পদ মুসলমানদের প্রয়োজনে সঠিকভাবে ব্যয় হতে থাকে। প্রতিটি প্রদেশের বাইতুল মালের জন্য প্রশস্ত ও মজবুত ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে প্রতিটি জিনিস এবং প্রতিটি সম্পদ নিজ নিজ স্থানে সংরক্ষিত থাকে। [১]

হযরত উমর (রা.) 'জনকল্যাণ' (যাকে আজ 'পৌরসভা' বলা হয়) বিভাগটিরও ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। যার অধীনে ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি প্রদেশে ও জেলায় সরকারি ভবন নির্মাণ, খাল খনন, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ এবং হাসপাতাল কায়েম করার কাজ অব্যাহত ছিল। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত মহাসড়ককে বিশেষভাবে নিরাপদ করে প্রতিটি স্থানে চৌকি, সরাইখানা এবং পানির পুকুর তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিটি প্রদেশের সদর দপ্তরে সরকারি হিসাবের দপ্তর, বাইতুল মাল এবং সরকারি মেহমানদের জন্য গেস্ট হাউসের আলাদা আলাদা ভবন রয়েছে। [২]

যদিও অপরাধের হার খুব কম ছিল, তবুও ভবিষ্যতের সমস্যার কথা বিবেচনা করে অপরাধীদের শাস্তির জন্য কারাগারও নির্মাণ করা হচ্ছিল। [৩]

ইরাকে কুফা, বসরা ও মসুল এবং মিশরে 'ফুসতাত' ও 'গিজা'-র মতো নতুন শহর বসানো হয়েছে, যাদের জৌলুস ও উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। [৪]

রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক আদমশুমারি করা হয়েছে, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের দুটি অংশে বিভক্ত করে একটি অংশকে নিয়মিত সেনাবাহিনীর মর্যাদা দিয়ে তাদের বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে, যখন অন্য অংশের মানুষ শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির মতো কাজে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তারা মূলত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে যেকোনো সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তলব করা যেতে পারে। এদেরকে 'মুতাতাওয়িআহ' বলা হয় এবং এরাও বার্ষিক বেতন পায়। এদের ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রতিটি অভাবী নাগরিক, এমনকি নারীদের জন্য সরকারি ভাতা নির্ধারিত রয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ভাতাও কমপক্ষে এক দিরহাম (আজকের হিসেবে প্রায় সাড়ে তিন রিয়াল বা দেড় হাজার রুপি)। যেসব নাগরিকদের সম্মানসূচক ও বৃত্তিমূলক ভাতা জারি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কেবল ধর্মীয় নিসবত (সম্পর্ক) ও জাতীয় খেদমতকে দুনিয়াবী মর্যাদার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। [৫]

মদীনা, কুফা, বসরা, মসুল, ফুসতাত এবং হিমসে বড় বড় সেনানিবাস নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে মুজাহিদদের বসবাসের জন্য ঘরও রয়েছে। উন্নত জাতের ঘোড়া পালনের জন্য আস্তাবল এবং চারণভূমিতে চারণভূমি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রতিটি আস্তাবলে চার চার হাজার ঘোড়া সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয়। [৬]

---

[১] তারিখুত তাবারী: ৫৯/৩; আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ২৫০, ২৫১; আল-ফারুক শিবলী নোমানী, পৃ. ২২৮।

[২] ফাতহুল বারী: ৬/৫।

[৩] তারিখুত তাবারী: ৫৯০/৩; আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ২৫০; মুজামুল বুলদান: বসরা, কুফা, মসুল, গিজা, ফুসতাত।

[৪] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ ডক্টর আকরাম জিয়া উমরী, পৃ. ৩৩৩; ত: মাকতাবাতুল ওবিকান রিয়াদ।

[৫] আল-ফারুক, আল্লামা শিবলী নোমানী, পৃ. ২৩২ ত: দারুল ইশাআত করাচি; এছাড়াও মুজামুল বুলদান-এ উল্লিখিত শহরগুলোর অবস্থা দেখুন।

[৬] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড: ৩৩০৫২, ত: আর-রশিদ।

আপন ও পরদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য গোয়েন্দা বিভাগও কাজ করছে। হযরত উমর ফারুক (রা.) মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং প্রতিপক্ষ শক্তির প্রস্তুতিও তাঁর নখদর্পণে থাকে। [১]

পুরো ইসলামি বিশ্বে ধর্মীয় ও ইলমি তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করা হয়েছে, নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জিকির ও তিলাওয়াত ছাড়াও দ্বীনের দাওয়াত ও ইলম প্রচারের পূর্ণ ব্যবস্থা দেখা যায়। নামাজের ওয়াক্তে তিল ধারণের জায়গা থাকে না, কোনো ব্যক্তি জামাতে নামাজ থেকে পিছিয়ে থাকে না, যদি কোনো ব্যক্তি কদাচিৎ এমন আচরণ করে তবে লোকেরা তাকে মুনাফিক হওয়ার সন্দেহ করে। [২]

এই সমাজে সাহাবায়ে কেরাম হলেন পেশোয়া ও পথপ্রদর্শক যারা ইলম ও আমলের মূর্ত প্রতীক। তাঁদের মজলিসগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহ, হিকমত ও মা'রিফাত এবং আখেরাতের চিন্তার সম্পদ বিতরণ করা হয়। সিরিয়ায় হযরত আবু দারদা, হযরত উবাদাহ বিন সামিত এবং হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান; বসরায় হযরত মাকাল বিন ইয়াসার, হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল, হযরত আবু মুসা আশআরি এবং হযরত ইমরান বিন হুসাইন; এবং কুফায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং তাঁদের সাথে সত্তর জন বদরী সাহাবায়ে কেরাম কুরআন ও হাদিস এবং ফিকহের আলো ছড়াচ্ছেন। [৩] এক একটি দরসে শত শত ছাত্র বসে, হযরত আবু দারদা (রা.)-এর দরসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬০০-এর বেশি। [৪]

শুধু মুসলমানই নয়, অমুসলিম নাগরিকদের (জিম্মি) অধিকারও পুরোপুরি সংরক্ষিত। তাদের জান-মাল, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজ্জত-আব্রু এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কোনো ঝুঁকি নেই, তাদের জান-মালকে মুসলমানদের জান-মালের সমান ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত উমর (রা.) প্রজাদের খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে দেখে তিনি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, জানা যায় যে সে ইহুদি। তার সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে: "জিজিয়া আদায়, দারিদ্র্য এবং বার্ধক্য।" হযরত উমর (রা.) তাকে সাথে নিয়ে গিয়ে তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে দেন। তারপর বায়তুল মালের খাজাঞ্চিকে বলেন: "এর মতো লোকদের খুঁজে বের করো এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করো।"

সেই সময় তিনি দরিদ্র অমুসলিমদের জিজিয়া মাফ করার ফয়সালা দিয়ে বলেন:

"এটা ইনসাফ নয় যে আমরা তাদের যৌবনে তাদের থেকে জিজিয়া নেব এবং বার্ধক্যে তাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব।" [৫]

---

[১] ফুতুহ আল-শাম লিল-আযদি, পৃ. ১৫৩

[২] আল-ইসাবাহ: ৩৩৫/২

এই শিক্ষক সাহাবীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ ইবনে সাদ পেশ করেছেন। তিনি 'আত-তাবাকাত আল-কুবরা'-র পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে মদীনা, মক্কা, তায়েফ, ইয়েমেন, সিরিয়া, কুফা ইত্যাদিতে অবস্থানকারী সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: তাবাকাত ইবনে সাদ: পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড।

[৩] সহীহ মুসলিম, খণ্ড: ১৫১৯, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল জামাআতি মিন সুনানিল হুদা।

[৪] গায়াতুন নিহায়া ফি তাবাকাতিল কুররা, ইবনুল জাযারি: ২০৬/১

[৫] আল-খারাজ লিল-কাযি আবু ইউসুফ, পৃ. ১৩৯, ত: আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়া

অমুসলিমদের ওপর কোনো অন্যায় হলে তাৎক্ষণিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়। মিশরের একজন কিবতি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পত্র পাঠিয়ে অভিযোগ করেন যে, মিশরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ছেলে তাকে প্রহার করেছে। হযরত উমর (রা.) ফরিয়াদী ও অভিযুক্ত উভয়কে মদিনায় ডেকে পাঠান এবং অন্যায় প্রমাণিত হওয়ার পর নিজের সামনেই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করান। [১]

সাহাবায়ে কেরাম অমুসলিমদের অসুস্থতায় তাদের দেখতেও যেতেন। [২] আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) একটি ছাগল জবাই করান এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তার গোশত নিজের ইহুদি প্রতিবেশীর কাছে পাঠান। কারো আপত্তির প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখার ব্যাপারে এত বেশি তাকিদ দিয়েছেন যে, আমাদের মনে হতে লাগল হয়তো উত্তরাধিকারের মধ্যেও তাদের অংশ নির্ধারিত হয়ে যাবে। [৩]

মোদ্দাকথা, চারদিকে শান্তি ও স্বস্তি বিরাজমান ছিল, মানুষ যেন জীবিত অবস্থায় জান্নাতের মতো জীবন অতিবাহিত করছিল। তাদের না ছিল কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়, না ছিল অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার আতঙ্ক। কিন্তু হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মনে তখনও এই চিন্তা কাজ করত যে, কোথাও কারো হক নষ্ট হচ্ছে না তো? রাষ্ট্রের কোনো প্রান্তে এমন কোনো মজলুম নেই তো যে আমার কাছে পৌঁছাতে পারছে না? [৪]

---

[১] জামেউল আহাদিস লিস-সুয়ূতী: ২৫/৩৭১

[২] আদ-দিরায়াহ ফি তাখরিজিল হিদায়াহ লি-ইবনে হাজার আল-আসকালানী: ২/২৩৯, ত. আল-মা'রিফাহ

[৩] আল-আদাবুল মুফরাদ লিল-ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী, পৃ. ১৫৮, ত. দারুল বাশায়ের

এই সমাজে আহলে জিম্মাদের সাথে আচরণের আরও পর্যালোচনার জন্য দেখুন আলী আয-যাহাবীর প্রবন্ধ: মুয়ামালাতু গায়রিল মুসলিমিন ফিল মুজতামায়িল ইসলামি, পৃ. ১১০ থেকে ১১২, ত. মাকতাবায়ে গারীব।

তাছাড়া শরয়ী রাষ্ট্রে জিম্মিদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন সালেহ বিন গানিম আস-সাদলানের "উজুবু তাতবিকিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ফি কুল্লি আসর", পৃ. ২৩০ থেকে ২৪০, ত. দারু বানসিয়া রিয়াদ।

[৪] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৪৩৩

https://t.me/BoierSomahar

**শাহাদাতের ঘটনা**

২৩ হিজরি সন শেষ হতে চলেছিল। ফারুক আজম (রা.) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আগামী বছর পুরো ইসলামি সাম্রাজ্য সফর করবেন। প্রতিটি প্রদেশে দুই মাস করে অবস্থান করে উন্মুক্ত দরবার করবেন যাতে কোনো নাগরিকের কোনো কষ্ট থাকলে তারা নির্দ্বিধায় তা বর্ণনা করতে পারে। [১] তিনি বলতেন: "যদি আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখেন, তবে আমি ইরাকের মিসকিনদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে যাব যে, আমার পরে তাদের আর কখনো কারো প্রয়োজন থাকবে না।" [২]

এগুলো ছিল সেই দিন যখন ইসলামের তলোয়ার পূর্ব ও পশ্চিম থেকে খরাজ আদায় করছিল, সত্যের জয়জয়কার হয়েছিল, দ্বীন-ই-মুবিন চারদিকে আমানত ও দিয়ানত, ন্যায় ও ইনসাফ, ভ্রাতৃত্ব এবং সহমর্মিতার ফুল ফুটিয়েছিল। মন্দের অন্ধকার মুখ লুকিয়ে দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বীনকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হতে দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন। এখন তাঁর মাত্র দুটি আকাঙ্ক্ষা বাকি ছিল: একটি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া, অন্যটি তাঁর আঙ (নেতা) রাসূল হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কদমে সমাহিত হওয়া।

**খলিফার দুআ:**

২৩ হিজরি সনে হজের জন্য তাশরিফ নিয়ে গেলেন। ফেরার পথে ওয়াদিয়ে আবতাহ-এ অবস্থান করলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলেন:

"ইলাহি! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার শক্তি দুর্বলতায় পরিণত হচ্ছে, আমার প্রজারা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, ভয় পাচ্ছি যে এখন না জানি তাদের হকের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হয়ে যায়।"

তারপর তিনি বারগাহে ইলাহিতে তাঁর উভয় আকাঙ্ক্ষা একসাথে পেশ করলেন:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَمَوْتًا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার পথে শাহাদাত এবং তোমার রাসূলের শহরে মৃত্যুর প্রার্থনা করছি।" [৩]

আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি বিষয় একসাথে ঘটা কঠিন ছিল। শাহাদাত এবং তাও আবার মদিনায়!! কীভাবে সম্ভব ছিল? এখন মদিনা তাইয়্যেবার ওপর কোনো বহিঃশক্তির আক্রমণের কোনো আশঙ্কা ছিল না, সেখানে যুদ্ধের প্রশ্নই আসত না। অন্যদিকে খিলাফতের ভারী দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.)-এর নিজের কোনো রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করাও কঠিন ছিল। আর যদি তিনি বাইরে কোনো রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করতেন এবং শহীদও হতেন, তবে সেক্ষেত্রে মদিনা তাইয়্যেবায় তাঁর মৃত্যু বা দাফন হতো না, কারণ মৃত ব্যক্তিকে দাফনের জন্য

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/২৩২

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৭০০, কিতাবুল মানাকিব, বাবু কিসসাতিল বাইয়াহ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/১০৭

অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত করা ইসলামি শরিয়তে অনুপযুক্ত।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর জন্য এই উভয় সৌভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। এর পরে যা ঘটেছিল, তা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর জন্য পুরোপুরি সৌভাগ্যের বিষয় ছিল, কিন্তু একই সাথে উম্মতের জন্য এটি ছিল এমন এক ট্র্যাজেডি যার তীব্র প্রভাব কমবেশি অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, আর এর আনুষঙ্গিক প্রভাব আজও অনুভূত হয়।

**তলে তলে ষড়যন্ত্র:**

ফারুকি যুগের শেষ বছরগুলোতে মুসলমানদের বিজয়ের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিসরার রাজত্ব একটি বিস্মৃত কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। কায়সারও তার এশীয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অংশ হারিয়েছিলেন। ইরানে মজুসিদের অগ্নিকুণ্ডগুলো নিভে গিয়েছিল। ইহুদিদের জাজিরাতুল আরব থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সিরিয়া ও মিশর থেকে অশুভ খ্রিস্টান প্রভাব মুছে যাচ্ছিল। এই বিজিত এলাকাগুলোতে কোনো একজন ব্যক্তিকেও জোরপূর্বক মুসলমান করা হয়নি। অধিকাংশ মানুষ যারা পূর্ববর্তী যুগে নিপীড়িত জীবন যাপন করছিল, তারা মুসলমানদের চরিত্র এবং ইসলামের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছিল। এমন অনেক লোক ছিল যারা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে অটল থেকেও মুসলমানদের প্রতি অনুগত ছিল।

যা-ই হোক, পৈতৃক ধর্মে অটল থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী ছিল যাদের জেদ ও হিংসার কোনো সীমা ছিল না। এই লোকেরা ইসলামকে কেবল এই কারণেই ঘৃণা করত যে, এই দ্বীন তাদের পৈতৃক সাম্রাজ্যগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের ওপর ভোগবিলাসের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই ইসলামি খিলাফতের উত্থান তাদের সহ্য হচ্ছিল না। তাদের মধ্যে কিছু ধূর্ত লোক মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য মৌখিকভাবে কালিমাও পড়ে নিয়েছিল এবং বাহ্যিকভাবে শান্তিপূর্ণ নাগরিকের মতো জীবন যাপন করছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। যেহেতু সমাজে প্রত্যেক কালিমা পাঠকারীকে আইনত মুসলিম নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো, তাই কোনো ঐতিহাসিক নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না যে, ইসলামের লেবাস পরে মুসলমানদের শিকড় কাটার জন্য উদ্যত সেই বিশ্বাসঘাতকরা কারা ছিল। তবে ইতিহাসে এক-দুজন ব্যক্তির উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায়, যাদের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে সন্দেহজনক।

**ঘাতক আক্রমণ... কেন... কীভাবে?**

তাদের মধ্যে একজন ছিল হরমুজান, যে কিসরা ইয়াজদগিরদের নিকটাত্মীয় ছিল এবং মদিনা মুনাওয়ারায় বসবাস করত। আজ চৌদ্দ শতাব্দী পর এই ব্যক্তির ইসলামে একনিষ্ঠ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ফয়সালা করা সম্ভব নয়, কারণ অন্তরের রহস্য আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে বাহ্যিক আলামত থেকে এই ব্যক্তির অবস্থা অবশ্যই সন্দেহজনক। এটা খুবই সম্ভব যে, এই ধরনের লোকদের সাথে ইয়াজদগিরদের যোগাযোগ বজায় ছিল, যে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল। নিজের হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে হতাশ হয়ে সে যেকোনো প্রতিশোধমূলক কৌশল অবলম্বন করতে পারত। এটা মোটেও অসম্ভব নয় যে, মজুসি রাজনীতিবিদরা মুসলিম বিশ্বে বসবাসকারী তাদের এজেন্টদের ব্যবহার করে মুসলমানদের তাদের মহান খলিফা থেকে বঞ্চিত করার পরিকল্পনা করছিল।

হযরত উমর ফারুক রা. হজ থেকে ফিরে এসে যথারীতি সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরোজ আবু লুলু নামক এক মজুসি দাস বসবাস করত। সে দুই বছর আগে (২১ হিজরি চলাকালীন) পারস্যের শেষ সীমানায় সংঘটিত ঐতিহাসিক নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল এবং দাস হিসেবে হযরত মুগিরা বিন শুবা রা.-এর অংশে এসেছিল। সে একাধারে কাঠমিস্ত্রি, চিত্রশিল্পী এবং কামার ছিল। বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরির জন্য সে খুব বিখ্যাত ছিল। হযরত উমর ফারুক রা. মদিনায় প্রাপ্তবয়স্ক অমুসলিম দাসদের থাকার অনুমতি দিতেন না, কিন্তু হযরত মুগিরা বিন শুবা রা.-এর এই সুপারিশে যে, এই দাসের দক্ষতা থেকে মদিনাবাসী উপকৃত হবে, ফিরোজকে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন।

সেই যুগে নিয়ম ছিল যে, এ ধরনের দক্ষ দাসদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সেবা নেওয়ার পরিবর্তে তাদের শিল্প ও কারুশিল্পের সুযোগ দেওয়া হতো। যে আয় হতো তা থেকে একটি নির্ধারিত অংশ মালিক গ্রহণ করতেন যাকে 'খরাজ' বলা হতো। হযরত মুগিরা বিন শুবা রা. ফিরোজের আয় থেকে দৈনিক দুই দিরহাম (প্রায় দুইশ টাকা) গ্রহণ করতেন কারণ তার ব্যবসা খুব ভালো চলছিল। ফিরোজের কাছে এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করা কষ্টকর মনে হতো, তাই একদিন সে হযরত উমর ফারুক রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, "আমার মালিক আমার কাছ থেকে অনেক বেশি খরাজ আদায় করেন।"

হযরত উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন: "কত আদায় করেন?" সে বলল: "দৈনিক দুই দিরহাম।" আপনি জানতে চাইলেন: "তুমি কোন কোন দক্ষতা দিয়ে উপার্জন করো?" সে বলল: "কাঠমিস্ত্রি, কামার এবং খোদাইয়ের কাজ দিয়ে।" এটি শুনে আপনি বললেন: "এই কাজগুলোর আয়ের তুলনায় আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ বেশি নয়।" ফিরোজ এই কথা বলতে বলতে চলে গেল: "তাঁর ন্যায়বিচার আমি ছাড়া সবার জন্য প্রশস্ত।"

তবে হযরত উমর রা. চাননি যে কোনো সাহায্যপ্রার্থী হতাশ হোক, তাই মনে মনে স্থির করেছিলেন যে হযরত মুগিরা রা.-এর কাছে খরাজ কমানোর সুপারিশ অবশ্যই করবেন। আপনি দুই-চার দিন পর ফিরোজকে কোথাও দিয়ে যেতে দেখে তার মন ভালো করার জন্য বললেন: "শুনেছি তুমি পবনচাক্কি [১] ভালো বানাতে পারো। আমাকে একটি বানিয়ে দেবে?" সে এক অদ্ভুত সুরে বলল, "এমন বানিয়ে দেব যে পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষ দেখতেই থাকবে।"

প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মূর্ত প্রতীক হযরত উমর ফারুক রা. সেই শীতল সুরের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ অনুভব করলেন, সঙ্গীদের বললেন: "শোনো! এই দাস আমাকে হুমকি দিয়ে গেল।" [২] তা সত্ত্বেও আপনি তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেননি। আপনি আইনের শাসনের প্রবক্তা ছিলেন। জানতেন যে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না এবং এখন পর্যন্ত ফিরোজের কোনো অপরাধ প্রমাণিত ছিল না। শাসকের এই অধিকার ছিল না যে নিজের সন্দেহ ও অনুমানের ভিত্তিতে কারও বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করবেন।

---

[১] পানচাক্কি এবং পবনচাক্কির মধ্যে পার্থক্য আছে। পবনচাক্কি মানে বাতাস, পবনচাক্কিতে বাতাসের শক্তি ব্যবহৃত হয়। পানচাক্কি হলো সেটি যা পানির শক্তিতে চলে। একে প্রবহমান পানির তীরে স্থাপন করা হয়।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৪, তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩৪ দার সাদির; উসদুল গাবাহ, তর: উমর বিন আল-খাত্তাব রা.

হযরত উমর (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড কি তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফল ছিল নাকি কোনো ষড়যন্ত্র?

সাধারণত ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, ফিরোজ যেন এই ভেবে রাগান্বিত হয়েছিল যে হযরত উমর (রা.) তার অভিযোগ শোনেননি, ফলে উত্তেজিত হয়ে সে খলিফাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই ঘটনার নেপথ্যের সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি, আর যদি কারো মন সেদিকে গিয়েও থাকে, তবে তা তাড়াহুড়োর কারণে তদন্তের সুযোগ পায়নি, যদিও এই বিষয়ের সমস্ত দিক ভালোভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিশেষ করে এই দিকটি যে, হত্যাকারী কি সত্যিই মাত্র সামান্য কয়েক দিরহামের জন্য এত বড় পদক্ষেপ নিয়েছিল?

হতে পারে বিষয়টি এমনই ছিল, কিন্তু ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং মানব মনস্তত্ত্ব, বিশেষ করে মানুষের আচরণ ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তি এখানে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এটা হতে পারে যে, একজন সাধারণ মানুষ অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে সামান্য বিষয়ে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু নিজের চেয়ে উচ্চমর্যাদার কোনো ব্যক্তির সাথে সে তখনই তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া করে যখন তার জীবন বিপন্ন হয় অথবা তার ওপর অসহনীয় জুলুম করা হয়, কারণ সে এ ধরনের ঝগড়ার পরিণাম জানে, সে সমস্ত বিপদ সামনে রেখেই এমন সাহস দেখায়। এখানে উত্তেজিত ব্যক্তির বিষয়টি কোনো সাধারণ কর্মকর্তার সাথে ছিল না। সে ছিল একজন গোলাম আর (হযরত উমর ছিলেন) সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল (১৩.৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার)-এর মুকুটহীন সম্রাট। সুতরাং এটা কীভাবে সম্ভব যে, এত বড় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারীর বিরুদ্ধে মাত্র সামান্য বিষয়ে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে?

মানব মনস্তত্ত্বের আরেকটি দিকও প্রণিধানযোগ্য। সাধারণত দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো মতবিরোধ, তর্ক-বিতর্ক ও গালিগালাজ বেড়ে হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এই উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ একজনের হাতে অন্যজন খুন হয়ে যায়। কিন্তু এ ধরনের ঝগড়ায় যদি মাঝখানে থামার সুযোগ পাওয়া যায়, তবে নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রাণহানি পর্যন্ত পৌঁছায় না। সামান্য বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে হত্যার পর্যায় তখনই আসে যখন মাঝখানে চিন্তা করার অবকাশ পাওয়া যায় না। যদি সময় পাওয়া যায়, তবে মানুষ নিজের বোকামি বুঝতে পারে এবং চরম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। এবার আলোচ্য ঘটনাটি পর্যালোচনা করা যাক। এখানে ফিরোজের হযরত উমর (রা.)-এর সাথে কথোপকথন এবং তারপর হত্যার প্রকৃত ঘটনার মধ্যে পুরো তিন দিনের ব্যবধান রয়েছে। [১] চিন্তা-ভাবনার জন্য এত দীর্ঘ সময় যথেষ্ট ছিল। সামান্য বিষয়ে উত্তেজিত হওয়া কোনো ব্যক্তি এত দীর্ঘ সময় উত্তেজিত থাকতে পারে না, অথচ ফিরোজ মানসিক রোগী হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং তার কারিগরি দক্ষতা, তার মেধা ও বুদ্ধিমত্তা এর প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তারপর বিশেষভাবে আমরা সেই কথোপকথনটি দেখি যা ফিরোজ ও হযরত উমর (রা.)-এর মধ্যে হয়েছিল, তাতেও আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো অবজ্ঞা, ধমক বা কঠোরতার ছাপ পাওয়া যায় না। এই কথোপকথনে এমন কোনো বিষয়ই ছিল না যাতে ফিরোজ উত্তেজিত হতে পারে।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/২৩৮।

স্পষ্টতই তিনি বাজারের একজন পেশাদার লোক ছিলেন, তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে দাসদের কাছ থেকে নেওয়া খরাজের হার কী হয়। যদি হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.) কোনো অস্বাভাবিক কঠোর কর নির্ধারণ করতেন, তবে হযরত উমর (রা.) অবশ্যই তা জিজ্ঞাসা করতেন, কারণ তিনিও বাজারের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু কর উপযুক্ত ছিল, তাই তিনি সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন যে, তোমার কাজের আয়ের তুলনায় এই খরাজ বেশি নির্ধারণ করা হয়নি। এই বিষয়টি বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হতে পারে ফিরোজ হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে এই ধারণা নিয়ে এসেছিল যে, তিনি বাজার ও শিল্পের বিষয়াদি সম্পর্কে অনবগত হবেন এবং তার অযৌক্তিক অভিযোগকে সঠিক মনে করে তার পক্ষে ফয়সালা দেবেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া লজ্জা বা বড়জোর হতাশার রূপ নিত। এমন হতে পারত না যে সে প্রাণ নেওয়ার পেছনে লেগে যাবে। এটি ঠিক তেমনই যেমন কেউ বলে যে, কোনো শ্রমিক মালিকের ওপর এই জন্য প্রাণঘাতী হামলা করেছে যে সে পূর্ণ মজুরি পাচ্ছিল, অথচ সে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক চেয়েছিল; অথবা কোনো কর্মচারী কারখানার মালিককে এই জন্য হত্যা করেছে যে সে সময়মতো বেতন পাচ্ছিল, অথচ সে সময়ের আগেই তা পেতে চেয়েছিল। স্পষ্টতই এমনটা হয় না।

সংক্ষেপে, পুরো বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সম্ভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফিরোজ হযরত উমর (রা.)-কে শহীদ করার সংকল্প আগেই করে রেখেছিল। প্রশ্ন জাগে, শেষ পর্যন্ত কেন? চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সংকল্পের পেছনে কোনো অত্যন্ত শক্তিশালী উদ্দীপক বিদ্যমান ছিল, যার উত্তেজনা এতটাই ছিল যে ফিরোজ নিজের জীবন যাওয়ার নিশ্চিত ঝুঁকি নিয়ে জনসমক্ষে আমীরুল মুমিনীন-এর ওপর হামলা চালায়। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যারা অবগত তারা জানেন যে, সাধারণত এমন চরম আক্রমণাত্মক পদক্ষেপে প্ররোচিত করার উদ্দীপক ধর্মীয় ও জাতীয় হয়ে থাকে। শাসকদের ওপর হামলার ডজন ডজন ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যাবে, প্রায় সবগুলোর পেছনেই কোনো জাতীয়, দেশীয় বা ধর্মীয় শত্রুতা সক্রিয় দেখা যাবে। ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে করা প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডে এমন তীব্র আবেগ থাকে না, বরং আক্রমণকারী সাধারণত লুকিয়ে আঘাত করে এবং পালানোর পথ নিরাপদ রাখে। কিন্তু ফিরোজের হামলা ছিল ধর্মীয় পর্যায় পর্যন্ত আত্মঘাতী ধরনের, যা কেবল জাতীয়, দেশীয় ও ধর্মীয় উত্তেজনার ওপরই ভিত্তি করে হতে পারে। এই জাতীয় আবেগের পরিচয় পাওয়া যায় এই থেকে যে, ফিরোজ মদিনায় নিয়ে আসা অল্পবয়সী মজুসী বন্দীদের মাথায় হাত বুলাত এবং কাঁদতে কাঁদতে বলত: “আরবরা আমার কলিজা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।” [১]

আমাদের ফিরোজের সেই হুমকিমূলক বাক্যটিও মনে রাখা উচিত। “আমি এমন এক বায়ুকল বানিয়ে দেব যে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা দেখতেই থেকে যাবে।” এমন অর্থবহ বাক্য কেবল সেই ব্যক্তিই বলতে পারে যে আগে থেকেই কিছু করার সংকল্প করেছে এবং নিজের অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা করে রেখেছে। তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় আসা ব্যক্তি এমন গভীর বাক্য বলে না, বরং সাধারণত সে প্রকাশ্যে বলে দেয় যে, ছাড়ব না, জান থেকে মেরে ফেলব।

একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো ফিরোজ যা কিছু করেছে, তা কি নিজের ইচ্ছায় করেছে নাকি এর পেছনে কোনো শক্তিও সক্রিয় ছিল? উভয় বিষয়ই হতে পারে, তবে কোনো বহিঃশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভাবনা বেশি; এর দুটি কারণ রয়েছে:

ফিরোজের মতো দাস, যে ইসলামী সমাজে প্রতিটি সুযোগ-সুবিধার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে করতে দুই বছর হতে চলেছিল,

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩৩৭, ত সাদার।

অন্যান্য অমুসলিমদের মতো তারও ইসলামী খিলাফত ও রাষ্ট্রের অনুগত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে কেবল এই সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতেই ব্যর্থ হয়নি, বরং এই রাষ্ট্র ও সরকারের একজন বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে। এ ধরনের চরিত্র সাধারণত সেই সব লোকেরই হয় যারা কোনো বিদেশি শক্তির হাতিয়ার বা গোয়েন্দা হয়ে থাকে। তাই এই সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, শুরু থেকেই ফিরোজ কোনো শক্তির এজেন্ট ছিল। এখন সেই শক্তি কোনটি হতে পারত!! মদিনা মুনাওয়ারায় বসবাসরত ইরানি রাজপুত্র হরমুজানের সাথে ফিরোজের গভীর সম্পর্ক এবং ফিরোজের নিজের সাবেক মজুসি (অগ্নিউপাসক) হওয়া এই সম্ভাবনাকে জোরালো করে যে, মজুসিদের পরাজিত রাজপরিবার তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিল এবং তাদের পক্ষ থেকেই সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রাণঘাতী হামলা করার দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হয়েছিল।

এই সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করলে এটাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, ফিরোজের হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর কাছে যাওয়া আসলে কোনো অভিযোগ জানানোর জন্য ছিল না, বরং তার আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত উমর (রা.)-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। ইতিহাস থেকে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে তার এই একটি বা দুটি সাক্ষাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা স্পষ্ট যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোনো অমুসলিম গোলাম যদি আমীরুল মুমিনীনের কাছে আসা-যাওয়া করত, তবে তাকে সন্দেহ করা যেত। তবে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই উপস্থিত হতো।

ফিরোজও এই অছিলায় হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ সমস্ত পরিস্থিতি ভালোভাবে দেখে নেয়। এই বিষয়টিও মাথায় রাখা উচিত যে, ফিরোজ এই প্রাণঘাতী হামলার জন্য এক বিশেষ ধরনের খঞ্জর সংগ্রহ বা তৈরি করেছিল যা মদিনা তাইয়্যেবা বা আরব সমাজে নতুন ছিল। এর দুটি ফলক ছিল এবং হাতল ছিল মাঝখানে। খঞ্জরটিকে বিষাক্তও করা হয়েছিল যাতে হামলা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা সর্বনিম্ন থাকে। [১] এই প্রস্তুতিগুলোও কোনো অসাধারণ পরিকল্পনার দিকে ইঙ্গিত করে।

**প্রাণঘাতী হামলা:**

বুধবার ২৬শে জিলহজ আমীরুল মুমিনীন নিয়ম অনুযায়ী ফজরের নামাজ পড়ানোর জন্য মেহরাবে তাশরিফ আনলেন। আপনি যখনই তাকবীরে তাহরিমা বললেন, এক কোণে লুকিয়ে থাকা ফিরোজ বেরিয়ে এল এবং আপনার পিঠে খঞ্জর দিয়ে একের পর এক ছয়টি আঘাত করল। ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক উমর ফারুক (রা.) কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি ছাড়াই গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। হামলাটি এতই আকস্মিক ছিল যে, পেছনের সারির লোকেরা কী হয়েছে তা কিছুই বুঝতে পারেনি। হযরত উমর (রা.)-এর কিরাতের আওয়াজ না আসায় পেছনের সারির লোকেরা কিছুক্ষণ পর্যন্ত 'সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!' বলে লোকমা দিতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে ঘাতক পালাতে শুরু করে। কিছু লোক বিষয়টি বুঝতে পেরে তাকে ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু সেদিন জানা গেল যে সে খঞ্জর চালনায় অত্যন্ত দক্ষ; মুহূর্তের মধ্যেই সে তার দিকে এগিয়ে আসা তেরো জন মানুষকে রক্তাক্ত করে দেয়, যাদের মধ্যে নয় জন আঘাত সহ্য করতে না পেরে শহীদ হয়ে যান। অবশেষে এক ব্যক্তি চাদর ছুড়ে তাকে জাপটে ধরেন, কিন্তু ফিরোজ ধরা দেওয়ার পরিবর্তে সেই মুহূর্তেই নিজের গলায় খঞ্জর চালিয়ে আত্মহত্যা করে।

খঞ্জর চালনায় ফিরোজের বিস্ময়কর দক্ষতাও তার বিদেশি এজেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাকে দৃঢ় করে, কারণ এই ধরনের কঠোর প্রশিক্ষণ তারাই গ্রহণ করে যাদেরকে সরকার বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো বিশেষ লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করে।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৪৯; তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১০৮, সংক্ষেপিত।

ঘাতকের আত্মহত্যাও একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছিল, যার ফলে তদন্তের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে হামলার নেপথ্যে কোন শক্তিগুলো ছিল। তবে এ থেকে অন্তত এতটুকু ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায় যে, কোনো অত্যন্ত জঘন্য ষড়যন্ত্রের পরই এত বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। যেহেতু তদন্তের ক্ষেত্রে এই ষড়যন্ত্রের হোতাদের চেহারা থেকে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যেত, তাই ফিরোজকে আগেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল যে এমন পরিস্থিতিতে সে তার প্রভুদের বাঁচাতে কী করবে?

---

আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা.) মেহরাবে পড়ে ছিলেন কিন্তু তখনও জ্ঞান ছিল। তিনি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর হাত ধরে তাঁকে সামনে এগিয়ে দিলেন যাতে তিনি নামাজ পড়ান। তিনি সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত নামাজ পড়িয়ে দিলেন। দুই ধার বিশিষ্ট খঞ্জর খলিফাতুল মুসলিমীনের পেট চিরে ফেলেছিল, কিন্তু সাহসের অবস্থা এমন ছিল যে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে ছিল। মানুষ যখন নামাজ শেষ করল, তখন আমিরুল মুমিনীনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল: "ইবনে আব্বাস! গিয়ে দেখো আমাকে আঘাতকারী কে?"

তিনি দেখে এসে জানালেন: "মুগীরা বিন শু'বার গোলাম!!"

হযরত উমর (রা.) বললেন: "আচ্ছা, সেই কারিগর?" আরজ করা হলো, "জি হ্যাঁ, সেই।"

তিনি বললেন, "আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, আমি তো তার ব্যাপারে ইনসাফের আচরণ করেছিলাম।"

তারপর বললেন: "সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি সেই আল্লাহর জন্য, যিনি কোনো ইসলাম গ্রহণকারী (কালেমা পাঠকারী)-র হাতে আমার মৃত্যু নির্ধারণ করেননি।" [১]

**শেষ অসিয়তসমূহ:**

হযরত উমর (রা.)-কে তুলে বাড়িতে আনা হলো। জখমের তীব্রতার কারণে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না, এ কারণে বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। তাঁকে খাদ্য হিসেবে প্রথমে নাবীজ এবং পরে দুধ দেওয়া হলো, কিন্তু সবকিছু পেটের জখমের পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এটি দেখে চিকিৎসকও জীবনের ব্যাপারে নিরাশা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও নামাজের সময় তাঁকে সচেতন করা হতো এবং তিনি বলতেন: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির ইসলামে কোনো অংশ নেই যে নামাজ ত্যাগ করে।"

সৃষ্টির সংশোধনের উদ্দীপনা এমন ছিল যে, এই অবস্থায়ও দেখতে আসা এক যুবকের লুঙ্গি (পায়জামা) টাখনুর নিচে দেখে অত্যন্ত স্নেহের সাথে বললেন: "বৎস! লুঙ্গি উপরে রেখো, এতে কাপড় পরিষ্কার থাকবে এবং এটি খোদাভীতির লক্ষণ।"

নিজের ওপর থাকা ঋণের হিসাব তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর মাধ্যমে করালেন, যা ছিয়াশি হাজার দিরহাম হলো। পুত্রকে তা পরিশোধের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন। [২]

এই সময়ে কেউ প্রশংসা করে বললেন যে, আপনি এত বড় সাহাবী এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক, এখন শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছেন। তিনি প্রশংসার কোনো প্রভাব গ্রহণ না করে আক্ষেপের সাথে বললেন: "আফসোস! যদি হিসাব সমান সমান হয়ে যেত, কোনো শাস্তিও হতো না আবার কোনো পুরস্কারও থাকতো না।" [৩]

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৭০০, কিতাবুল মানাকিব, কিসসাতুল বাইয়াত ওয়া মাকতালে উমর (রা.)।

[২] পূর্বোক্ত সূত্র।

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৩৭০০, কিতাবুল মানাকিব, কিসসাতুল বাইয়াত ওয়া মাকতালে উমর (রা.); আল-মুসনাদ: ৩/২২৬।

এই সময়ে আপনার উত্তরসূরির বিষয়টি সত্যিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সঙ্গীরা পরামর্শ দিলেন যে কাউকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করে দিন। আপনি বললেন: "أَكْرَهُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا" (আমি পছন্দ করি না যে জীবিত অবস্থায়ও এই বোঝা বহন করি এবং মৃত্যুর পরও)। [১]

যাইহোক, আপনার খিলাফত হস্তান্তরের চিন্তা অবশ্যই ছিল, তাই আপনি অত্যন্ত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ছয়জন প্রবীণ সাহাবী: হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হযরত তালহা, হযরত জুবাইর এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর সমন্বয়ে একটি দল মনোনীত করলেন এবং বললেন: "আমার মৃত্যুর পর তিন দিনের মধ্যে এই ব্যক্তিবর্গ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমির নির্বাচন করে নেবেন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর পর এই ছয়জন ব্যক্তিই সমগ্র উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যাদের প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন বলে সুপরিচিত ছিল। তাদের জীবদ্দশাতেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জবান থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। আশারায়ে মুবাশশারার সপ্তম ব্যক্তি যিনি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত সাঈদ বিন জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। কিন্তু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সতর্কতার অবস্থা এমন ছিল যে, তাকে এই শুরা থেকে আলাদা রাখা হয়েছিল কারণ তিনি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভগ্নিপতি এবং চাচাতো ভাইও ছিলেন। নিজের ছেলে আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে শুরায় শুধুমাত্র এই শর্তে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন যে তিনি কেবল পরামর্শ দিতে পারবেন, খিলাফতের জন্য মনোনীত হতে পারবেন না। [২]

**ওসিয়ত:**

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ মুহূর্তের আগে বলেছিলেন: "আমি আমার পরে নিযুক্ত হওয়া খলিফাকে ওসিয়ত করছি যে:

- তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরদের অধিকারগুলো চিনতে পারেন এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করেন।
- আমি তাকে আনসারদের সাথে—যারা আগে থেকেই দারুল ইসলাম ও ঈমানে থিতু হয়েছেন—উত্তম আচরণের ওসিয়ত করছি; তাদের মধ্যে যারা ভালো কাজ করে তাদের ভালোকে গ্রহণ করতে এবং যারা মন্দ করে তাদের মন্দকে ক্ষমা করে দিতে ওসিয়ত করছি।
- আমি শহরবাসীদের সাথে ভালো ব্যবহারের ওসিয়ত করছি, কারণ তারা ইসলামের দুর্গ, রাজস্বের উৎস এবং কাফেরদের জন্য ক্রোধের কারণ। তাদের সন্তুষ্টির সাথে তাদের কাছ থেকে কেবল অতিরিক্ত সম্পদই রাজস্ব হিসেবে নেওয়া হোক।
- আমি ওসিয়ত করছি যে গ্রাম্য বাসিন্দাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হোক, কারণ তারা আরবের মূল ভিত্তি এবং ইসলামের প্রাণশক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে রাজস্ব নেওয়া হোক এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে তা ব্যয় করা হোক।
- আমি ওসিয়ত করছি যে তিনি যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকা অমুসলিম নাগরিকদের খেয়াল রাখেন, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়, তাদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হয় এবং তাদের ওপর সহ্যের অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো হয়।" [৩]

---

[১] তারিখ দামেশক: ৪৪৮/৪৪

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৭০০, কিতাবুল মানাকিব, কিসসাতুল বাইয়াহ ওয়া মাকতালু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২০৮/১০

[৩] প্রাগুক্ত

**শেষ ইচ্ছা:**

হযরত উমর (রা.)-এর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি তাঁর মনিব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে সমাহিত হবেন। তিনি এই আবেদন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন। তিনি বললেন: "এই স্থানটি আমি নিজের দাফনের জন্য পছন্দ করেছিলাম, কিন্তু উমর ফারুককে নিজের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি।" এই বলে তিনি অনুমতি দিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) যখন এটি জানতে পারলেন, তখন বললেন: "এর চেয়ে বড় কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না।" [১]

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমীরুল মুমিনীন তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে বললেন: "আমার মাথা বালিশ থেকে সরিয়ে জমিনে রেখে দাও। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমার অবস্থার ওপর রহম করবেন। আল্লাহর কসম! আজকের দিনের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য যদি সম্ভব হতো, তবে আমি সারা দুনিয়া কুরবানি করে দিতাম।" [২]

**ওফাত:**

তিন দিন আহত অবস্থায় অতিবাহিত করার পর ১লা মহরম ২৩ হিজরিতে পৃথিবীর ইতিহাসের এই অতুলনীয় শাসক মহান আহবানে সাড়া দিলেন (ইন্তেকাল করলেন)। হযরত সুহাইব রুমি (রা.), যিনি তাঁর পরিবর্তে তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন, তিনি জানাজার নামাজ পড়ান। আপনি আপনার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী হুজরায়ে আয়েশা (রা.)-তে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর পাশে সমাহিত হলেন। [৩] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ১৩৯২; কিতাবুল জানাইয, বাবু মা জাআ ফি কবরি নবী (সা.)।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৩০, ৩২৯।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৩ হিজরির ঘটনাবলি; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩২৯, ৩৩০; তারিখুল খুলাফা, পৃ: ১০৯, তিবাক নওয়াজ।

হযরত উমর (রা.)-এর বয়স সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত হলো ৬৩ বছর, যেমনটি হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। (মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১৫১৫৫; আসাদুল গাবাহ: ৩/১৫৬, আল-ইলমিয়্যাহ)। তবে হাফেজ ইবনে হাজার একটি বর্ণনা নকল করেছেন যাতে হযরত উমর (রা.) নিজেই নিজের বয়স ৪৫ বছর বলেছিলেন। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁর বয়স ৫৮ বা ৫৯ বছরের বেশি হতে পারে না। হাফেজ ইবনে হাজার এই বর্ণনাটিকে সহীহ সনদ বলেছেন এবং একেই প্রাধান্য দিয়েছেন কারণ আমীরুল মুমিনীন নিজের বয়স সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভালো জানতেন। (তাহযীবুত তাহযীব: ৭/৩৩১, তিবাক হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য)।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ওফাতের তারিখ ১লা মহরম ২৪ হিজরি প্রসিদ্ধ কিন্তু এই তারিখের কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। এটি একটি সম্ভাবনা মাত্র, নিশ্চিত নয়। ইমাম আবু নুয়াইম আল-ইসফাহানি সনদের সাথে হযরত উমর (রা.)-এর ওফাতের তারিখ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বক্তব্যসমূহ একত্রিত করেছেন। (মারিফাতুস সাহাবাহ: ১/৩৩৭ থেকে ৩৯১)। একইভাবে আল্লামা ইবনুল জাওযী এবং হাফেজ ইবনে কাসীরও এই বক্তব্যগুলো একত্রিত করেছেন। (দেখুন: আস-সাফওয়াহ এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৩ হিজরির ওফাত)।

এ বিষয়ে আমাদের সামনে নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক বক্তব্যগুলো রয়েছে:

১. অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেন: জিলহজ মাসের শেষ হওয়ার চার দিন বাকি থাকতে বুধবার দিন তাঁকে শহীদ করা হয়। কেউ কেউ তিন দিন বাকি থাকার কথা বলেছেন।

২. হাফেজ ইবনে কাসীর এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, বুধবার হামলা হয়েছিল এবং ২৬শে জিলহজ তিন দিন আহত থাকার পর তাঁর ওফাত হয়। (অর্থাৎ শনিবার)।

৩. কিছু বর্ণনাকারী বলেন: ১লা মহরম তাঁকে দাফন করা হয়। (এখানে স্পষ্ট নয় যে ওই দিনই শাহাদাত হয়েছিল কি না। তবে ধারণা করা যেতে পারে যে ওফাত, জানাজা এবং দাফন খুব বেশি সময়ের ব্যবধানে হয়নি, যেমনটি সুন্নাহ পদ্ধতি। যদি ২৬শে জিলহজ হামলা হয়ে থাকে এবং চার দিন আহত থাকেন, তবে ১লা মহরম শাহাদাত ও দাফন হয়েছে)।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই বছর জিলহজ মাস ২৯ দিনের ছিল। হযরত উমর (রা.) তিন দিন আহত ছিলেন এবং ১লা মহরম শহীদ ও দাফন হয়েছেন। কিন্তু যদি মাস ৩০ দিনের হয়, তবে দুটি সুরত (অবস্থা) হতে পারে: হয় শাহাদাত শনিবার ৩০শে জিলহজ হয়েছে, অথবা যদি বুধবার আহত হয়ে থাকেন তবে শনিবার শহীদ হয়েছেন।

জানশীনী:

হযরত উমর ফারুক (রা.) ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচনের জন্য হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং হযরত জুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর সমন্বয়ে যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তার সদস্যরা একটি বাড়িতে আলাদাভাবে বসে পরামর্শ করতে থাকেন।

হযরত উমর (রা.)-এর ওসিয়ত অনুযায়ী হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) বাইরে সশস্ত্র পাহারায় ছিলেন, কাউকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হতে লাগল। হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) বলতেন: "এর কারণ এটি ছিল না যে শুরার সদস্যরা খিলাফতের পদের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, বরং তাদের প্রত্যেকেই এই পদটি অন্যকে অর্পণ করতে চাচ্ছিলেন।" [১]

তাঁর ধারণা সঠিক ছিল কারণ পরামর্শের পরবর্তী পর্যায়ে হযরত তালহা (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে, হযরত জুবায়ের (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে এবং হযরত সাদ (রা.) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর পক্ষে সরে দাঁড়ালেন। এখন খিলাফতের জন্য মাত্র তিনজন ব্যক্তি: হযরত উসমান, হযরত আলী এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) রয়ে গেলেন।

এই পরিস্থিতিতে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-কে বললেন: "আপনাদের দুজনের মধ্যে যে কেউ একজন নিজের অধিকার থেকে সরে দাঁড়ান এবং বিষয়টি ফয়সালার জন্য তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক, তিনি আল্লাহ এবং ইসলামকে সামনে রেখে নিজের অন্তরে যাকে সবচেয়ে উত্তম মনে করেন, তার ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন।"

হযরত উসমান এবং আলী (রা.)-কে নীরব দেখে তিনি নিজেই আবার বললেন: "আচ্ছা, তাহলে কি আপনারা ফয়সালা করার ক্ষমতা আমাকে অর্পণ করবেন? আল্লাহর কসম! আমি আপনাদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনে কোনো ত্রুটি করব না।"

হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.) এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে নিলেন। [২]

এখন হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে ফয়সালা হতে হতো, যার ক্ষমতা হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ-এর কাছে চলে এসেছিল। এই উভয় ব্যক্তি উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, রাসূল (সা.)-এর দীর্ঘদিনের সঙ্গী এবং সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) শুরা গঠন করার সময় নিজেই বলেছিলেন যে, "আমার মনে হয় মানুষ উসমান এবং আলীর মধ্য থেকে কাউকে প্রাধান্য দেবে।" [৩]

এটা স্পষ্ট ছিল যে, এই দুজনের মধ্যে যাকে নির্বাচন করা হতো তা উম্মতের জন্য কল্যাণকরই হতো। এদিকে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) ব্যক্তিগত বিবেচনার ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ফয়সালার ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলামী রাজনীতির মেজাজকে সামনে রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩০৯

[২] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭, কিতাবুল মানাকিব, বাবু কিসসাতিল বাইয়াতি ওয়াল ইত্তিফাকি আলা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়া ফিহি মাকতালু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩০৯

এই কথা তো স্থির হয়ে গিয়েছিল যে উম্মতের মধ্যে হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিক যোগ্য এই সময়ে আর কেউ নেই। এমনকি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) যখন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট নির্জনে জানতে চাইলেন: "যদি আপনি ছাড়া অন্য কাউকে খলিফা বানানো হয় তবে কে উত্তম হবে?" তখন তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই বললেন: "উসমান"। এই একই প্রশ্ন তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে করলে তিনি বললেন: "আলী"। [১]

এই দায়িত্বের নাজুকতা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) টানা তিন দিন ও রাত জনমত যাচাইয়ে ব্যস্ত রইলেন। এই সময়ে সালাত এবং সামান্য ঘুম ছাড়া তিনি কোনো মুহূর্ত অবসর বসেননি, সেই সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ ও ইস্তিখারার ব্যবস্থাও করেছেন। তিনি বড় বড় সাহাবী ছাড়াও মুহাজির ও আনসার এবং চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে গিয়ে আলাদা আলাদা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করেছেন যে, হযরত উসমান নাকি হযরত আলী—কাকে নির্বাচিত করা হবে? এই বিষয়ে সাধারণ মজলিসের ব্যক্তিবর্গ, ছাউনির মুজাহিদগণ, গ্রামের বেদুইন এবং মদিনায় আসা-যাওয়া করা কাফেলাগুলোর প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করে মতামত গ্রহণ করেছেন। সকলের ঐক্যমত্যের রায় এটাই ছিল যে, এই পদের জন্য হযরত উসমান (রা.) অধিক উত্তম। [২]

জনমতের এই ফয়সালা অপ্রত্যাশিত ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশাতেই উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে খিলাফতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ জানতেন যে, যখন মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম ইটটি তুলেছিলেন, তখন দ্বিতীয়টি হযরত আবু বকর (রা.) এবং তৃতীয়টি হযরত উসমান (রা.) তুলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই মুহূর্তে বলেছিলেন: "হাওলাউল খুলাফাউ মিম বা'দী" (এরা আমার পরে খলিফা হবে)। [৩]

সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ছিল: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে হযরত আবু বকরের সমকক্ষ কাউকে মনে করতাম না, তাঁর পরে হযরত উমর (রা.)-কে এবং তাঁর পরে হযরত উসমান (রা.)-কে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম।" [৪]

সব দিক থেকে নিশ্চিত হয়ে অবশেষে আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) চতুর্থ দিন ফজরের সালাতের পর মিম্বরে আসীন হলেন। প্রথমে হযরত আলী (রা.)-এর হাত ধরে বললেন: "আপনার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আত্মীয়তা এবং শুরুতে ইসলাম গ্রহণের মর্যাদা রয়েছে। আমি আপনার নিকট আল্লাহর নামে শপথ করে অঙ্গীকার নিচ্ছি যে, যদি খিলাফতের ফয়সালা আপনার পক্ষে করি তবে আপনি অবশ্যই ন্যায় ও ইনসাফ করবেন, আর যদি আমি উসমানকে আমির বানাই তবে আপনি সানন্দে তাঁর কথা শুনবেন ও মানবেন।" এরপর এই একই কথা তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে বললেন। উভয় ব্যক্তিই এই অঙ্গীকার করলেন।

---

[১] তারিখুত তাবারী: ২৩/৬

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৪৬

[৩] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা: ৪৫৩৩, সহীহ সনদে

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৯৭, ফাযায়েলুস সাহাবা, বাবু মানাকিবে উসমান (রা.)

একটি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মিকদাদ (রা.) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর খলিফা হওয়ার পক্ষে আওয়াজ তুলেছিলেন। (তারিখুত তাবারী: ২৩/৬) কিন্তু এটি শুধুমাত্র আবু মুখনাফের বর্ণনা, যে রাফেযী এবং মিথ্যাবাদী। তাই এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। অন্যান্য বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত যে, এই দুই ব্যক্তিও সবার সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর বায়আত করেছিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৪৬)

তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন: “হে আলী! আমি লোকদেরকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, তারা উসমানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সুতরাং আপনি কিছু মনে করবেন না।”

তারপর বললেন: “উসমান, হাত বাড়ান।” এবং তাঁর হাত ধরে এই বলে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলেন:

“আমরা আপনার নিকট আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এবং তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলিফার সুন্নাতের ওপর বায়আত করছি।”

হযরত আলী (রা.)-ও বায়আত করলেন এবং সেই সাধারণ সমাবেশে মুহাজির ও আনসারসহ সকল লোক একত্রিত হয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন।

বায়আতের এই পুরো ঘটনাটি দুটি সহীহ বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে [১] যা স্পষ্ট করে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না। হযরত আলী (রা.)-ও তা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

এই কারণেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন:

“হযরত উসমান গনী (রা.)-এর বায়আতের মতো মজবুত ও সুদৃঢ় বায়আত অন্য কোনো খলিফার হয়নি, যাতে সকলের ঐক্য ছিল।” [২]

---

এই সহীহ বর্ণনাগুলো নিম্নরূপ:

[১] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭০৪, কিতাবুল মানাকিব, কিসসাতুল বায়আতি ওয়াল ইত্তিফাকু আলা উসমান।

[২] সহীহ বুখারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭২০, কিতাবুল আহকাম, কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাস।

তবে এখানে সহীহ হাদীসের বিপরীতে আবু মুখনাফ প্রমুখের বর্ণনা কিছু ভিন্ন দৃশ্য দেখাচ্ছে। এই বর্ণনার কিছু অংশ থেকে এটি প্রকাশ পায় যে, হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে অনেক বাদানুবাদ হয়েছিল। হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত মিকদাদ এবং আরও অনেক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একে কারচুপি মনে করেছিলেন। এই বর্ণনায় হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর দিকে এটিও সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে হযরত আলী (রা.)-কে কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী শাসন করার শপথ নিতে বললে তিনি বলেছিলেন: “সাধ্যানুযায়ী করব।” তারপর হযরত উসমান (রা.)-কে একই শপথ নিতে বললে তিনি কোনো শর্ত ছাড়াই এই শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করেন, ফলে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) তাঁর পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দেন। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, হযরত আলী (রা.) শরীয়ত পালনের সংকল্পে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ), তাই তাঁকে খিলাফত দেওয়া হয়নি। এই বর্ণনায় আরও আছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে ফয়সালা হওয়ায় হযরত আলী (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: “এটি প্রথমবার নয় যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে দলাদলি করেছ, তোমরা এই ফয়সালা কেবল এই জন্য করেছ যাতে আগামীকাল তোমরা শাসক হতে পারো, যা-ই হোক আমরা ধৈর্য ধরব।” এই বলে আপনি বায়আত না করেই বেরিয়ে গেলেন, হযরত মিকদাদ (রা.), হযরত আম্মার (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-ও রাগান্বিত ছিলেন, হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) পরে বায়আত করেন। (তারিখে তাবারী, পৃষ্ঠা ৪৪৬, খণ্ড ৩)

যাই হোক, আবু মুখনাফ প্রমুখের এই বর্ণনাটি এর কলুষতা এবং সনদের দুর্বলতার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে যখন তা সহীহ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক, এই কারণেই গবেষকগণ এটি গ্রহণ করেননি।

[৩] আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, পৃষ্ঠা ৩৩০, আবু বকর আল-খাল্লাল, دار الراية رياض।

আলহামদুলিল্লাহ! এখানে পাণ্ডুলিপি বুধবার ২০ শাবান ১৪৩৪ হিজরী মোতাবেক ২৬ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হলো।

# হযরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত

## মহররম ২৪ হিজরী থেকে যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী পর্যন্ত

## (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)

https://t.me/BoierSomahar

## হযরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশ বংশের বনু উমাইয়া গোত্রের একজন সম্মানিত ও অত্যন্ত শরীফ ব্যক্তি ছিলেন। আমুল ফীল (হস্তীবর্ষ)-এর ছয় বছর পর তায়েফে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। [১] যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত ঘোষণা করেন, তখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু চৌত্রিশ বছরের টগবগে যুবক ছিলেন। তাঁর পিতা আফফান ইন্তেকাল করেছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি প্রচুর সম্পদ পেয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর পৈত্রিক পেশা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এক সচ্ছল জীবন অতিবাহিত করছিলেন। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত কানে পৌঁছামাত্রই তিনি নিজের সম্পদ, মর্যাদা এবং আরাম-আয়েশে ভরপুর জীবনকে বাজি রেখে কালিমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করে নেন। এভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সারির ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর চাচা হাকাম বিন আস তাঁকে কঠোরভাবে প্রহার ও নির্যাতন করেন, কিন্তু তিনি সত্য দ্বীনের ওপর অটল থাকেন। [২]

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আশারায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ সেই দশজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন, যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। [৩] তিনি নবুওয়াতের সেই ছয়জন বিশেষ সঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন বলে প্রমাণিত। [৪]

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু দুটি বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন: একটি হলো তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইবার জামাতা হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা হযরত রুকাইয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং যখন তিনিও ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি (সা.) ইরশাদ করেন: “যদি আমার আরও কোনো কন্যা থাকত, তবে তাকেও (উসমানের সাথে) বিবাহ দিতাম।” [৫] এভাবে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র মানুষ, যাঁর বিবাহে কোনো নবীর দুই কন্যা এসেছেন। এই কারণেই হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপাধি হলো যুন-নূরাইন। [৬]

এটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চরিত্রের উচ্চমর্যাদার সনদ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর পূর্ণ আস্থার বহিঃপ্রকাশ ছিল। কারণ কোনো শরীফ মানুষই তাঁর কন্যাদের কোনো হীনমনা বা ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারীর সাথে বিবাহ দিতে পছন্দ করেন না।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/২০৩। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংক্ষিপ্ত বংশপরম্পরা হলো: উসমান বিন আফফান বিন আবিল আস বিন উমাইয়া বিন আব্দুশ শামস বিন আব্দে মানাফ। আব্দে মানাফের এক পুত্র হাশেমের বংশ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং দ্বিতীয় পুত্র আব্দুশ শামসের বংশ থেকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান বিন হাকাম আপনার চাচাতো ভাই ছিলেন। মাতার দিক থেকে বংশপরম্পরা হলো: আরওয়াহ বিনতে কুরাইজ বিন রাবিয়াহ। আপনার নানী ছিলেন উম্মে হাকিম আল-বায়দা, যিনি জনাব আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৫৩, সাদির)

[২] আল-ইসাবাহ: ২/৪৬২; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৫৫, ত. সাদির।

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৬৪৯, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফি আল-খুলাফা।

[৪] সহীহ আল-বুখারী, হা: ১৩৯২, কিতাবুল জানাইয, বাব মা জাআ ফি কাবরিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/২১৪।

[৬] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৫৩৯।

হযরত ওসমান (রা.)-এর দ্বিতীয় এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি লজ্জা ও হায়ার দিক থেকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। নবী করীম (সা.) একবার বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তাঁর পায়ের নলা উন্মুক্ত ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আসলেন, তারপর হযরত ওমর ফারুক (রা.) আসলেন; নবী করীম (সা.) একইভাবে শুয়ে তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন। যখন এই দুই মহান ব্যক্তি চলে গেলেন, তখন হযরত ওসমান (রা.) দরজায় আসলেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম (সা.) তৎক্ষণাৎ উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর আগমনে আপনি বিচলিত হননি, কিন্তু হযরত ওসমান (রা.) আসলে আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন:
“আমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখে লজ্জা পাব না, যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়?” [১]

একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি বললেন: ওসমান অত্যন্ত লাজুক মানুষ, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে তিনি আমাকে এই অবস্থায় দেখে হয়তো নিজের কথাগুলো ব্যক্ত করতে পারবেন না। [২]

এই তীব্র লজ্জার কারণে হযরত ওসমান (রা.) কখনো পায়জামা খুলে গোসল করেননি, যদিও তিনি বন্ধ গোসলখানায় গোসল করতেন। [৩]
আপনি ইসলামের খাতিরে মক্কা মুকাররমা থেকে হাবশার দিকে হিজরত করেন। আপনার সম্মানিত স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রা.)-ও আপনার সাথে ছিলেন। [৪] কিছুকাল পর আপনি মক্কা মুয়াজ্জমায় ফিরে আসেন, তারপর যখন নবী করীম (সা.) মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত ওসমান (রা.) নিজের স্ত্রীর সাথে সেখানে চলে গেলেন। [৫]

হযরত ওসমান (রা.) আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেছেন। মদিনা মুনাওয়ারায় মুসলমানদের জন্য পানীয় জলের সরবরাহে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হযরত ওসমান (রা.) একজন ইহুদির কাছ থেকে চড়া দামে মিষ্টি পানির কূপ ‘বীরে রুমা’ কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। [৬] তাবুক যুদ্ধের সময় আপনি জিহাদের জন্য তিনশ উট সাজ-সরঞ্জামসহ পেশ করেন, এছাড়া এক হাজার দিনারও নবী করীম (সা.)-এর কোলে ঢেলে দেন। নবী করীম (সা.) খুশি হয়ে বললেন: “আজকের পর ওসমান যা-ই করুক না কেন, তার কোনো ক্ষতি হবে না।” [৭]

একবার নবী করীম (সা.) হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর সাথে ওহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন, হঠাৎ পাহাড়টি কাঁপতে শুরু করল। নবী করীম (সা.) পাহাড়কে আঘাত করে বললেন: “স্থির হও, তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুইজন শহীদ ছাড়া আর কেউ নেই।” [৮]

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৬৩১২, ফাযায়েলুস সাহাবা, ফাযায়েলে ওসমান (রা.), ত: দারুল জীল।

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৩৬১৩, ফাযায়েলুস সাহাবা, ফাযায়েলে ওসমান (রা.), ত: দারুল জীল।

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৩০/৩।

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৫৫০/২।

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২১৩/৩।

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৯১/৩।

[৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২১২/৩।

[৮] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৯৯, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে ওসমান (রা.)।

হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকেও আপনার (রা.) মর্যাদার সঠিক আন্দাজ করা যায়, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে দূত হিসেবে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর যখন আপনার শহীদ হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ল, তখন নবী আকরাম (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে উসমানের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য তাঁদের থেকে মৃত্যুর বায়াত গ্রহণ করলেন, যাকে বায়াতুর রিদওয়ান বলা হয়। কারণ এতে অংশগ্রহণকারীদের আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ফাতহে তাঁর সন্তুষ্টির সনদ দান করেছেন। [১]

এই কারণেই অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর পর হযরত উসমান (রা.)-কেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) তাঁর খিলাফতকালে যে ফিতনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন, সে সম্পর্কে স্বয়ং নবী আকরাম (সা.) ইরশাদ করেছিলেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে যে, আপনার (সা.) নিকট হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) একে একে আসলেন, আপনি (সা.) আপনার দ্বাররক্ষী হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর মাধ্যমে উভয়কে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) আসলেন, তখন বললেন: তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও, তবে এমন এক পরীক্ষার সাথে যা তাঁর ওপর আসবেই। [২]

একবার নবী আকরাম (সা.) আগত একটি ফিতনার কথা উল্লেখ করলেন, সেই সময় হযরত উসমান (রা.) চাদর মুড়ি দিয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবী আকরাম (সা.) তাঁর দিকে ইশারা করে বললেন: “সেদিন তিনি হকের ওপর থাকবেন।” [৩]

**খিলাফতের দায়িত্বসমূহ:**

হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব এমন এক পরিস্থিতিতে গ্রহণ করেছিলেন যখন ইসলামী খিলাফতের সীমানা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। খোরাসান, পারস্য, ইরাকে আজম, ইরাকে আরব, আল-জাজিরা, সিরিয়া, মিসর, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান পর্যন্ত এলাকাগুলো কয়েক বছর আগেই ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলোতে বহু জাতি বসবাস করত যাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং অভ্যাস ও মনস্তত্ত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এই সকলকে এক সুতোয় গেঁথে রাখা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, ইসলামী সরকারের ওপর তাদের আস্থা টলতে না দেওয়া এবং হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগের মতো আইনের শাসনের মান বজায় রাখা কোনো সহজ কাজ ছিল না। এরপর এর পাশাপাশি বিজয়ের যে ধারা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে শুরু হয়েছিল, তখনও তার সামনে বিশাল ময়দান বাকি ছিল। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর ক্রমাগত পিছু হটার অবস্থায় ছিল। এমতাবস্থায় ইসলামের শৌর্য-বীর্য ও প্রতাপ বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনীর অভিযানগুলোকে বেগবান করাও অত্যন্ত জরুরি ছিল।

**হুরমুজানের হত্যাকাণ্ড: একটি নাজুক বিষয়:**

যদিও বাহ্যিকভাবে সেই সময়ে মুসলমানদের এমন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে হযরত উসমান গনী (রা.)-এর জন্য শাসনকার্য...

---

[১] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮; তাফসীরে ইবনে কাসীর; সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৯৮, আল-মানাকিব, মানাকিবে উসমান (রা.); সুনানে আত-তিরমিযী, হা: ৩৭০২

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৯৫, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে উসমান (রা.)

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৮১১৮

প্রশাসনিক সমস্যাগুলো দুশ্চিন্তার কারণ হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু এর পাশাপাশি হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে এমন কিছু বাস্তবতাও ছিল যা থেকে তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এখন গোপনে আঘাত করার পরিকল্পনা করছে এবং তাদের পরবর্তী হামলাগুলো হবে গোপন প্রকৃতির। মদিনা মুনাওয়ারায় আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর একজন মজুসির হাতে নিহত হওয়া কেবল কোনো আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। যদি একটি বড় ভুল না হয়ে যেত, তবে এই ষড়যন্ত্রের রহস্য অবশ্যই দুনিয়ার সামনে চলে আসত। এটি এমন এক ভুল ছিল যার ফলে কেবল হযরত উমর (রা.)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে থাকা মূল পরিকল্পনাকারীদের হদিস চিরতরে হারিয়ে যায়নি, বরং এর কারণে হযরত উসমান (রা.)-কে খলিফা হওয়ার সাথে সাথেই একটি অত্যন্ত নাজুক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। যদি তিনি তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত দূরদর্শিতা কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান না বের করতেন, তবে পূর্ববর্তী খলিফার শাহাদাতের সাথে সাথেই আরেকটি ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত।

আপনি (রা.) সবেমাত্র খেলাফতের বায়আত গ্রহণ শেষ করেছেন, এমন সময় আপনার কাছে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মামলা পেশ করা হলো যে, তিনি একজন মুসলিম হরমুজানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে তাঁর বন্ধু হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা.) জানিয়েছিলেন যে, তিনি হযরত উমর (রা.)-এর ওপর হামলাকারী মজুসি আবু লুলুকে প্রাণঘাতী হামলার একদিন আগে হত্যার অস্ত্রসহ হরমুজানের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। সেই সময় হরমুজান ফিরোজকে এই খঞ্জরটি দিচ্ছিল। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা.) তাদের দেখে ফেললে তারা দুজনেই ঘাবড়ে যায় এবং খঞ্জরটি হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। পরের দিন সকালে এই খঞ্জর দিয়েই অভিশপ্ত আবু লুলু হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ওপর হামলা করে। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর কাছে যখন এই বিষয়টি প্রকাশ পায়, তখন হযরত উমর ফারুক (রা.) মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। পিতার মৃত্যু নিশ্চিত দেখে তিনি প্রতিশোধের নেশায় হরমুজানকে হত্যা করে ফেলেন, কারণ তাঁর তথ্য অনুযায়ী সে হামলার ষড়যন্ত্রে শরিক ছিল, কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তাঁর কাছে ছিল না। ফলে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে গ্রেফতার করে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়।

হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর এই মামলা হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে পেশ করা হলো। হযরত উসমান (রা.) প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে পরামর্শ চাইলেন। এখানে সোজাসাপ্টা কথা ছিল এই যে, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) একজন কালিমা পাঠকারীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন, সুতরাং তাঁকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হোক। কিছু সাহাবায়ে কেরামের রায়ও এটাই ছিল। অন্যদিকে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হত্যার ঘটনায় হরমুজানের সংশ্লিষ্টতার কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারছিলেন না, তাই মামলায় তাঁর অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে হযরত উসমান (রা.)-এর ফকিহসুলভ দৃষ্টি বিষয়টি যে গভীরতা দিয়ে দেখছিল, সাধারণ মানুষ তা থেকে অক্ষম ছিল। উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) যা কিছু করেছিলেন, তা এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে করেছিলেন যে হরমুজান হত্যার ষড়যন্ত্রে শরিক ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই বাণী তাঁর সামনে ছিল: “যদি আসমান ও জমিনের সমস্ত অধিবাসী একজন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে শরিক হয়, তবে আল্লাহ তাদের সবাইকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” [১] হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর এই উক্তিটিও প্রসিদ্ধ ছিল: “যদি সানআর সমস্ত অধিবাসী একজন মানুষের হত্যাকাণ্ডে শরিক হয় তবে...”

---

[১] “যদি আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ একজন মুমিনের রক্তপাতে শরিক হয়, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের উপুড় করে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৩৯৮, বাবুল হুকমি ফিদ দিমা)

“আমি তাদের কিসাসে সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেব।” [১]

সুতরাং উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, কারণ তার ধারণা ছিল যে হুরমুজান এই হত্যাকাণ্ডে সমান অংশীদার ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করেছিলেন এবং হুরমুজানের অপরাধের কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেননি, আবার আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকারও তার ছিল না, তাই তার এই পদক্ষেপ ভুল ছিল এবং তার তিরস্কার করা জরুরি ছিল। যেমন নবী করীম (সা.) হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যার জন্য তিরস্কার করেছিলেন যে যুদ্ধের ময়দানে তলোয়ার মাথার ওপর দেখে কালিমা পড়ে নিয়েছিল, কিন্তু হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) এই ভেবে তাকে হত্যা করেছিলেন যে হয়তো সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই কৌশল অবলম্বন করছে। নবী করীম (সা.) হযরত উসামা (রা.)-এর ওপর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন: “তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে?” [২]

তবে নবী করীম (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে কোনো শাস্তি দেননি, কারণ হযরত উসামা (রা.)-এর মনে নিজের কাজের একটি যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান ছিল যা তাকে সন্দেহের সুবিধা দিচ্ছিল এবং তার ওপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ স্থগিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল যে, তার মনেও নিজের কাজের একটি যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান ছিল। যদিও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া ভুল ছিল, কিন্তু তার ব্যাখ্যার কারণে তিনি সন্দেহের সুবিধা পাচ্ছিলেন। [৩] এই কারণেই এই মামলাটিকে সাধারণ মামলার মতো মনে করে আসামিকে ‘প্রাণের বদলে প্রাণ’-এর মূলনীতির ভিত্তিতে হত্যা করে ফেলা স্বয়ং আইনের সেই সতর্কতামূলক দিকগুলোর পরিপন্থী ছিল যা বিচার বিভাগের জন্য অবকাশ তৈরি করে থাকে। তাছাড়া হযরত উমর (রা.)-কে যেভাবে শহীদ করা হয়েছিল তার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্রের পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। ফিরোজের আত্মহত্যা এবং হুরমুজানের হত্যার পর তদন্তের সব পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিদেশি হস্তক্ষেপের প্রবল সম্ভাবনা তো নিজের জায়গায় ছিলই, যা হযরত উসমান (রা.)-এর দূরদর্শিতা থেকে নিশ্চয়ই গোপন ছিল না। এর ফলে হুরমুজানের মজলুম হওয়ার দিকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে হযরত উসমান (রা.) চিন্তা-ভাবনার পর একটি অত্যন্ত উপযুক্ত ফয়সালা প্রদান করেন যা শরীয়তের আইনের সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি এবং অনিশ্চয়তার অবস্থায় সবার নিকট প্রশংসার যোগ্য ছিল। তিনি হযরত...

---

[১] সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, বাব ইযা আসাবা ক্বাওমুন মিন রাজুলিন।

স্মর্তব্য যে, ফুকাহায়ে আহনাফ এই হাদীস এবং অন্যান্য শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে, তবে তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে যখন তাদের অপরাধ মারাত্মক হয়। কিন্তু যদি তারা কেবল হত্যায় সহযোগিতা করে থাকে, তবে শাসক তাদের জন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করবেন কিন্তু তাদের থেকে কিসাস নেওয়া হবে না। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ‘আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা’-তে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই ফতোয়াও নকল করেছেন যে, সহযোগীদের থেকে কিসাস নেওয়া যাবে না। তবে আহলে মদীনা মনে করেন যে সহযোগীদেরও হত্যা করা হবে। এরপর তিনি এর খণ্ডনে অনেক দলিল পেশ করেছেন। (আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা: ৩/৩০৩, আর-রাজুলু ইয়ামসিকুর রাজুলা হাত্তা ইয়াক্বতুলাহু, ত: আলমুল কুতুব)।

যাই হোক, এর দ্বারা এটি স্পষ্ট হয় যে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হুরমুজানকে কিসাসযোগ্য মনে করতেন না, বরং তার মনে এই বিষয়ে কিছু সন্দেহ বিদ্যমান ছিল।

[২] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব বা’সুন নবী (সা.) উসামা।

[৩] ফিকহ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো: “সন্দেহের কারণে হুদুদ ও কিসাস এবং শাস্তিসমূহ রহিত হয়ে যায়।” (আত-তাকরীর ওয়াত-তাহবীর লি ইবনিল আমীরুল হাজ্জ আল-হানাফী ম: ৮৭৯ হি: ২/২০২) অর্থাৎ কিসাস ও দণ্ডবিধি সন্দেহের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়।

উবাইদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে ‘কতলে খাতা’ (ভুলবশত হত্যা)-এর অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁকে রক্তপণ (দিয়াত) আদায়ের দায়িত্বশীল করা হয় এবং এরপর হযরত উসমান (রা.) নিজের পক্ষ থেকে এই বিশাল অংকের অর্থ উবাইদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে নিহতের উত্তরাধিকারীদের আদায় করে দেন।

এভাবে একদিকে যেমন ফরিয়াদী পরিবার ইনসাফ পেল, অন্যদিকে সেই সকল মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যারা হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতে আগে থেকেই শোকাহত ছিল এবং তাদের জন্য এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হতো যে, পিতার হত্যার পরপরই পুত্রকেও মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দেওয়া হতো। [১] কিছু বর্ণনা অনুযায়ী, হরমুজানের পুত্র হযরত উসমান (রা.)-এর ফয়সালার পর নিজেও উবাইদুল্লাহ (রা.)-কে ক্ষমা করে দিয়েছিল, যাতে মদিনাবাসী খুশি হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল। [২]

যারা হযরত উসমান (রা.)-এর ফয়সালার ওপর আপত্তি তুলেছিল, তারা শুধু বিদেশি ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাই নয় বরং ‘কতলে খাতা’-এর দিকটিও উপেক্ষা করছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) শরিয়ত, পরিস্থিতি, জনআবেগ, রাজনীতির মূলনীতি এবং ইনসাফের মানদণ্ড—সবকিছু বিবেচনা করে অত্যন্ত উপযুক্ত ফয়সালা দিয়েছিলেন যা ছিল ন্যায়সঙ্গত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। এভাবে নিজের খিলাফতের শুরুতেই তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি একজন আদর্শ নেতা ও পথপ্রদর্শকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

**প্রথম খুতবা:**

খলিফা হওয়ার পর তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যে প্রথম খুতবা প্রদান করেন তাতে ইরশাদ করেন:

“হে লোকসকল! তোমরা একটি অস্থায়ী ঘরে বসবাস করছ এবং তোমাদের জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো অতিবাহিত করছ। সুতরাং যে নেক কাজ তোমাদের সাধ্যে আছে তা মৃত্যুর আগেই করে ফেলো, তোমাদের সকালে যেতে হোক বা সন্ধ্যায়। সাবধান! দুনিয়ার জীবন প্রতারণায় ঘেরা। এটি যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়, প্রতারক শয়তান যেন তোমাদের আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে প্রতারিত না করে। যারা গত হয়ে গেছে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। কোথায় সেই দুনিয়াদার লোকগুলো, দুনিয়ার প্রেমিকরা! যারা দুনিয়াকে আবাদ করেছিল, উন্নতি করেছিল এবং দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করেছিল। দুনিয়া কি তাদের ছেড়ে দেয়নি? তোমরা দুনিয়াকে সেই গৌণ মর্যাদা দাও যা আল্লাহ তা’আলা একে দিয়েছেন এবং আখিরাতের অন্বেষী হও।” [৩]

হযরত উসমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে থেকে মক্কী জীবনের প্রাণান্তকর পরীক্ষা, হাবশা ও মদিনা মুনাওয়ারার হিজরত এবং মদিনা মুনাওয়ারায় ইসলামের চারাগাছ বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায় নিজের চোখে দেখেছিলেন। কাতিবে ওহী এবং হাফিজে কুরআন হওয়ার সুবাদে তিনি কালামুল্লাহর প্রতিটি শব্দের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিন-রাতের গভীর পর্যবেক্ষণ তাঁকে শরিয়তের মেজাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত করেছিল। তিনি সিদ্দিকে আকবরের যুগের ফিতনাগুলোর উত্থান ও পতনও দেখেছিলেন, সাইয়্যিদুনা ফারুক-এ-আজম (রা.)-এর বিজয়াভিযানের সোনালী যুগও তাঁর দেখা ছিল। ইসলামের প্রতিটি বিজয়ের পেছনে খিলাফতের কেন্দ্রে তাঁর পরামর্শ কার্যকর থাকত। তাই এখন শাসনের লাগাম হাতে নেওয়ার পর খলিফাকে যা করতে...

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/২১৭

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/২৩৩

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/১৫০, দারুল হিজর

উচিত ছিল, আপনি এ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। যদি ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে আপনার (রা.) জন্য খিলাফতের দায়িত্বসমূহ মোটেও ভারী ছিল না, কারণ এটি ছিল ইসলামের উত্থানের যুগ। পূর্ব ও পশ্চিমে ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর অগাধ প্রশাসনিক ও সংশোধনমূলক যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে উম্মতকে একটি আদর্শ সমাজ এবং একটি মজবুত প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর কাজ কেবল এতটুকুই ছিল যে, তিনি এই তৈরি করা সর্বোত্তম ব্যবস্থায় কোনো বিঘ্ন ঘটতে না দেন।

কিন্তু সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল (৩১ লক্ষ ২১ হাজার বর্গকিলোমিটার) পরিবেষ্টিত এত বড় সাম্রাজ্যের তৈরি করা ব্যবস্থার দেখাশোনা করাও নিশ্চিতভাবে একটি ভারী এবং মনোযোগ দাবি করা দায়িত্ব ছিল। মুসলমানদের আমির আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন এবং বান্দাদের সামনেও। এটি এতটাই কঠিন পরীক্ষা ছিল যে, হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর খিলাফতের শেষ বছরে, যখন তাঁর বয়স ষাট বছরও হয়নি, এই দোয়া করতে শুরু করেছিলেন: “হে আল্লাহ! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, শক্তি কমে গেছে, প্রজারা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং আমাকে এই অবস্থায় দুনিয়া থেকে তুলে নাও যে, আমার দ্বারা কারো হকের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি না হয় এবং কারো ওপর কোনো বাড়াবাড়ি না হয়।”

এদিকে খিলাফতের শুরুতে হযরত উসমান (রা.)-এর বয়স সত্তর বছর হয়ে গিয়েছিল। স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শক্তির দিক থেকেও তিনি হযরত উমর (রা.)-এর সমান ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি মুসলমানদের দেখাশোনা, তাদের অধিকার রক্ষা এবং খিলাফতের কেন্দ্রের স্থিতিশীলতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, যার পেছনে নিশ্চিতভাবে এক অসাধারণ ঈমানি শক্তি, ত্যাগ ও কোরবানির জজবা, ধৈর্য ও সহনশীলতার ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি কার্যকর ছিল।

ফিতনাসমূহের অনুভূতি:

উম্মতের অবস্থাকে আপনি যে দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখছিলেন, তাতে দুটি বিশেষ দিক আপনার সামনে চলে এসেছিল, যেগুলোর জন্য কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপনার দায়িত্ব ছিল: একটি দিক এই যে, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাহাদাত কোনো এক বিশাল ফিতনার পূর্বাভাস, যার সম্মুখীন এই উম্মতকে হতেই হবে।

হযরত উসমান (রা.)-এর অবগতিতে হযরত হুযাইফা এবং হযরত উমর (রা.)-এর সেই কথোপকথনও ছিল যাতে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “সেই ফিতনা সম্পর্কে বলুন যা ঢেউয়ের মতো উম্মতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।”

হযরত হুযাইফা (রা.)-এর উত্তর ছিল:
“আমিরুল মুমিনিন! আপনার এবং সেটির (ফিতনার) মাঝে একটি মজবুত দরজা আড়াল হয়ে আছে যা আপনার জীবন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।”

পরবর্তীতে হযরত হুযাইফা (রা.) নিজেই লোকদের বলেছিলেন যে, “সেই দরজা স্বয়ং হযরত উমর (রা.) ছিলেন, যাঁর মৃত্যুর পর ফিতনাসমূহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।” [২]

---

[১] তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১০৭, ত. নিযার

[২] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৭০৯৬, কিতাবুল ফিতান, আল-ফিতানুল্লাতি তামুজু কামাওজিল বাহর

তৃতীয় খলিফা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীসমূহ খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন: "এই সুসংবাদ এমন এক পরীক্ষার সাথে যা তাঁর নিকট অবশ্যই পৌঁছাবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকালের পূর্বে একবার হযরত উসমান গনি (রা)-কে নির্জনে ডেকে তাঁর সাথে কিছু গোপন কথা বলেছিলেন যার ফলে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন: "শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে একটি জামা (অর্থাৎ খেলাফতের পদ) দান করবেন। যদি মুনাফিকরা তোমার থেকে সেই জামাটি ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে তুমি তা কক্ষনো খুলবে না, যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে মিলিত হও।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর ওপর চাক্ষুষ দেখার চেয়েও বেশি বিশ্বাসী উসমান গনি (রা) এবং তাঁর উপদেষ্টা সাহাবায়ে কেরামের এতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, উমর ফারুক (রা)-এর পর শীঘ্রই ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। এই হাদিসগুলো ছাড়াও খোদ খলিফার মসজিদের মেহরাবে শহীদ হওয়া এবং তদন্তের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রকাশ করছিল যে, ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে এখন গোপন যুদ্ধ লড়তে বদ্ধপরিকর এবং তাদের পক্ষ থেকে ফিতনা-ফ্যাসাদ উসকে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। এরপর এ কথা তো নিশ্চিত ছিল যে, এই ফিতনাগুলোকে থামানো যাবে না। তবে এগুলোর মোকাবিলা করা এবং এগুলোর ক্ষতি কমানোর চেষ্টা করা জরুরি ছিল, এতে সফলতার আশা ছিল এবং রাসূলের সাহাবীগণ এই সীমা পর্যন্তই চেষ্টা করতে আদিষ্ট ছিলেন। এটাই ছিল সেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যার মোকাবিলা হযরত উসমান গনি (রা)-কে করতে হয়েছিল। আর নিঃসন্দেহে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই তিনি মানসিকভাবে এই ফিতনাগুলোর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁর নীতিমালায় এই প্রতিরক্ষামূলক লক্ষ্যকে সর্বদা বিবেচনায় রেখেছিলেন।

## হযরত উসমান গনি (রা)-এর সর্বোত্তম নীতিমালা

হযরত উসমান গনি (রা) আসন্ন ফিতনাগুলোর মোকাবিলা এবং খেলাফতের স্থিতিশীলতার জন্য যে নীতিমালা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোমলতা ও সহনশীলতার দিকটি প্রবল দেখা যায়, যাকে প্রাচ্যবিদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ নিছক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। তৃতীয় খলিফার নীতিমালা বোঝার জন্য আমাদের এই মৌলিক বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে, যেকোনো সরকার ফিতনা দমন দুইভাবে করতে পারে:

- কঠোরতা এবং নির্মূল করার নীতি গ্রহণ করে
- কোমলতা, আলাপ-আলোচনা এবং উন্মুক্ত জবাবদিহিতার পদ্ধতি অবলম্বন করে

কঠোর নীতি অবলম্বনের অর্থ হলো বিরোধী এবং ফিতনাবাজ লোকদের সমূলে নির্মূল করা। তাদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ এবং হত্যা করা যাতে অন্য লোকেরাও তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ফিতনা-ফ্যাসাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৬৯৫, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে উসমান (রা)

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৪৩৫৩ সহীহ সনদে

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৪৫৬৬ সহীহ সনদে

এই নীতি কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়। অনেক শাসক এর মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে তাদের ক্ষমতা ও সিংহাসন টিকিয়ে রেখেছেন। ইতিহাস সাক্ষী যে, ধরপাকড়, গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নীতি কোনো সরকার বা রাষ্ট্রকে কখনো স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করেনি; বরং এর ফলে সরকারগুলো পতনের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। কারণ যখন নাগরিকদের পক্ষ থেকে ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ পায়, তখন এই ধরপাকড়ের নীতির প্রতিক্রিয়ায় অনেক নিরপরাধ মানুষও এর কবলে পড়ে যায়। নাগরিকদের অধিকার হরণ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। সাধারণ কৌশলের কারণে অনেক মানুষ সরকারের কট্টর বিরোধী হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। তারপর সরকারের পক্ষ থেকে এর জবাবে ও প্রতিক্রিয়ায় আরও সহিংসতা দেখা দেয় এবং বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের পরিধিও বিস্তৃত হয়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়।

এর বিপরীতে কোমলতা, দয়া এবং আইনের বিধান অনুযায়ী জবাবদিহিতার পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সাময়িক ফিতনাবাজরা কিছুটা ছাড় পেলেও তারা সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করতে খুব একটা সফল হয় না। কারণ যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অধিকার সুরক্ষিত দেখে, তখন সে অহেতুক কোনো বিপজ্জনক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয় না। ফিতনাবাজদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি যারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে সরকারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, জবাবে শাসকদের আন্তরিক, সহানুভূতিশীল, অধিকার রক্ষাকারী এবং জবাবদিহিতা ও জিজ্ঞাসাবাদের স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত দ্বার দেখে তারা নিজেদের ভুল পথ বুঝতে পেরে তা থেকে বিরত থাকে। যারা অভ্যাসগত বিদ্রোহী বা বিদেশি শক্তির দালাল, তারা আইন অনুযায়ী শাস্তি পায় এবং তারা শাস্তি পেলেও সমাজে তার খুব একটা প্রভাব পড়ে না।

হযরত উসমান গনি তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং ঈমানি প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এমন এক কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন যার ফলে সেই প্রচ্ছন্ন ফিতনাবাজরা, যারা হযরত উমর ফারুক-এর শাহাদাতের পরপরই ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারত, তারা হযরত উসমান-এর খিলাফতের বারো বছরে তিল পরিমাণও সফল হতে পারেনি। এই পুরো সময়ে তারা এমন কোনো সুযোগ পায়নি যার মাধ্যমে তারা ফিতনার স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করতে পারত এবং মুসলমানদের খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে পারত।

বর্তমান যুগের কিছু তথাকথিত গবেষকের এই দাবি সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে, হযরত উসমান-এর কোমলতা ও ক্ষমাশীলতা ইসলামী খিলাফতে ফিতনা মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এমন লোকেরা এও দাবি করে যে, যদি হযরত উমর ফারুক থাকতেন তবে তিনি কঠোরতার সাথে এই ফিতনাগুলোকে দমন করতেন। অথচ বাস্তবতা হলো, হযরত উসমান যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা সময়ের বিচারে উপযুক্ত ছিল এবং এতে জ্যেষ্ঠ সাহাবি-দের পরামর্শও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি হযরত উমর ফারুক-এর শাসনকাল আরও দশ বছর স্থায়ী হতো, তবে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সম্ভবত তাঁর কর্মপন্থাও এর থেকে খুব একটা ভিন্ন হতো না।

নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ:

এই ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল যে, হযরত উসমান গনি হযরত উমর ফারুক-এর রাজনীতির ধারা সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। বাস্তবতা হলো, হযরত উসমান ফারুকী শাসনব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন এবং তাঁরই রাজনীতির ধারা অনুসরণ করেছিলেন। মুসলমানদের বিজয়াভিযান একইভাবে অব্যাহত ছিল, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কেন্দ্রগুলো আবাদ ছিল, মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হচ্ছিল।

https://t.me/BoierSomahar

প্রজারা সমস্ত অধিকার সমানভাবে পেতে থাকল, গভর্নর ও কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি অব্যাহত থাকল, পদস্থ ব্যক্তিদের অবহেলার জন্য জবাবদিহিতা চলতে থাকল এবং নিজ দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বরখাস্ত করা হতে থাকল।

কিন্তু এই সমস্ত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের টিকে থাকার পাশাপাশি উম্মত হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যে যে নতুন জিনিসটি দেখেছিল তা ছিল আচরণের পরিবর্তন, যা তিনভাবে প্রকাশ পেয়েছিল:

- ১. হযরত উমর (রা.)-এর আচরণ ছিল কঠোর; কারণ তাঁর স্বভাবে আল্লাহর প্রতাপের (জালাল) প্রাধান্য ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর আচরণ ছিল নরম ও মার্জিত। তাঁর মেজাজ ছিল নববী সৌন্দর্যের (জামাল) প্রতিফলন। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী, দয়ালু এবং সুরুচিসম্পন্ন মানুষ। এই মার্জিত কথা বলা এবং নম্র স্বভাবের পেছনে তাঁর ব্যবসায়িক জীবন এবং লেনদেনের অভিজ্ঞতারও প্রভাব ছিল, তিনি কাউকে ধমক দেওয়া বা ভয় দেখানোর অভ্যস্ত ছিলেন না। প্রয়োজনীয় কথা স্পষ্ট স্বরে, সংক্ষিপ্ত শব্দে এবং ভদ্রভাবে বলে দিতেন।

- ২. হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত উমর ফারুক (রা.) মানুষকে পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করতে অভ্যস্ত ছিলেন না, যার কারণ ছিল তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ততটা সচ্ছল ছিলেন না এবং বায়তুল মাল থেকে এ জাতীয় খরচ তাঁদের কাছে সতর্কতার পরিপন্থী ছিল। হযরত উসমান (রা.) সম্পদশালী ও সচ্ছল হওয়াকে ভালো মনে করতেন, একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তাঁর কাছে সম্পদের কোনো অভাব ছিল না এবং তিনি তা জমিয়ে রাখার পরিবর্তে খরচ করাকে প্রাধান্য দিতেন, ফলে সদকা ও খয়রাতও প্রচুর পরিমাণে করতেন এবং আগন্তুকদের এই ব্যক্তিগত পুঁজি থেকে উপহারও প্রদান করতেন।

(কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি বায়তুল মাল থেকে অনর্থক খরচ করতেন। মোটেও না, বায়তুল মাল থেকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি দিরহামও নিতেন না, এমনকি নিজের কোনো উদ্দেশ্যে কাউকে দিতেনও না। এমনকি পূর্ববর্তী খলিফাগণ বায়তুল মাল থেকে জীবনধারণের জন্য যে ভাতা গ্রহণ করতেন, তৃতীয় খলিফা সেটিও নিজের জন্য চালু করেননি।)

- ৩. আচরণের পরিবর্তনের তৃতীয় বহিঃপ্রকাশ ছিল এই যে, তিনি (রা.) উম্মতে মুসলিমার সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের জন্য জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুযোগ রেখেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে বিজয়ের এত আধিক্য ছিল না যে সম্পদের প্রাচুর্য থাকবে। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডার পদতলে এসে পড়েছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগকে আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করে মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করে তাঁর গভর্নর ও কর্মকর্তাদের জন্য সাদাসিধে জীবন পছন্দ করেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন যেন মুসলমানরা সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আরবের অনাড়ম্বর বেদুইন সংস্কৃতি বজায় রাখে। হযরত উমর (রা.) নিজে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন এবং ফকিরানা জীবন যাপন করতেন। হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে উম্মতকে এই সুযোগ দিয়েছিলেন যে, মানুষ আল্লাহর দেওয়া হালাল সম্পদ থেকে মুবাহ (বৈধ) এবং জায়েজ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, কারণ তাঁর দৃষ্টি কেবল সেইসব হাদিসের ওপর ছিল না যাতে দুনিয়াদারি ও আরামপ্রিয়তার নিন্দা করা হয়েছে, বরং তাঁর ফকিহসুলভ দৃষ্টি সেইসব কুরআনী দলিল এবং নববী বাণীর ওপরও ছিল যাতে হালাল নিয়ামতসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

“আপনি বলুন, আল্লাহর দেয়া সেই সৌন্দর্যকে কে হারাম করেছে যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন এবং পবিত্র রিযিকসমূহকে?” [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফরমান হলো:

“আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার ওপর নেয়ামত দান করেন, তখন তিনি পছন্দ করেন যে সেই নেয়ামতের প্রভাব যেন ব্যক্তির ওপর প্রকাশ পায়।” [২]

হযরত উমর ফারুক (রা.) যদিও মুসলমানদেরকে ভালো পোশাক এবং সাজসজ্জা থেকে বিরত রাখতেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল এই যে মুসলমানরা যেন এতে মগ্ন না হয়ে যায়, অন্যথায় তিনি নিজে নেয়ামতসমূহ উপভোগ করার বৈধতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন এবং বুঝতেন। এই কারণেই যখন তিনি বাইতুল মাকদিস বিজয়ের সময় তাঁর কিছু অফিসারকে দামী পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনি তাদের তিরস্কার করলেন। কিন্তু যখন জবাবে বলা হলো: “এখানে এই ধরনের পোশাক পরার প্রয়োজন রয়েছে”, তখন হযরত ফারুক আজম (রা.) নীরবতা অবলম্বন করলেন। [৩]

এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটিও ছিল যে, যদি বৈধ আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতো, তবে সেই সম্পদের কী ব্যবহার হতো যা বাইতুল মালের স্তূপে জমা থাকতো? আর যখন মানুষের মাঝে বণ্টন করা হতো, তখন তাদের কাছেও শস্যের মতো সম্পদের স্তূপ জমে যেত।

বাইতুল মালের এই আয় প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মতো লুটতরাজের মাধ্যমে ছিল না, বরং এর বড় অংশ ছিল সেই খরাজ (ভূমি কর) যা বার্ষিক ইরাক, পারস্য, খোরাসান এবং মিশর থেকে আসত এবং যার মূল্য আজকের হিসেবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। সেই সময় ইসলামী বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ছিল সম্ভবত এক কোটির মতো, যাদের জন্য এই সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। প্রয়োজনীয়তার সীমা তো হযরত উমর (রা.)-এর যুগে নির্ধারিত ভাতার ব্যবস্থার মাধ্যমেই বড় স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পূরণ হচ্ছিল। এর পরেও যখন বাইতুল মালে আরও উদ্বৃত্ত থাকতো, তবে কেন তা জনগণকে দেওয়া হবে না?

এখন স্পষ্ট যে, কাউকে যদি তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্থ দিয়ে আবার বাধ্য করা হয় যে সে তা খরচ না করে, তবে সেই বদান্যতার কোনো অর্থ থাকে না এবং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বহীন আচরণ হিসেবে গণ্য হবে যা ইসলামী সরকারের শান অনুযায়ী মোটেও মানানসই নয়। তাই হযরত উসমান (রা.) সমীচীন মনে করলেন যে, যেভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গনীমত এবং বিজিত অঞ্চলের ফসলের কর বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে, একইভাবে সরকারের পক্ষ থেকেও জনগণের ওপর মুক্তহস্তে খরচ করা উচিত এবং তাদেরকে বৈধতার গণ্ডির মধ্যে আরামদায়ক জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

ফলে হযরত উসমান (রা.) খলীফা হওয়ার পর যে প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল এই যে...

---

[১] সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩২

[২] শুআবুল ঈমান: ২১৩/৮, মা’র-রশদ

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৫৮/৯

বার্ষিক ভাতার সাথে ১০০ দিরহাম (আজকের হিসেবে যা প্রায় ২৫ হাজার টাকা) বৃদ্ধি করা হয়েছিল। [১]

হযরত উমর (রা.) রমজানুল মুবারক মাসে মানুষকে সাহরি ও ইফতার করানোর জন্য প্রত্যেক ঘরে ঘরে খাবার বিতরণ করতেন। যখন কেউ তাঁকে বলল, "আপনি কেন একটি গণভোজের ব্যবস্থা করেন না?" তিনি বললেন: "আমি মানুষকে ঘরে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়াতে চাই।"

হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মতো অর্থ বিতরণের পদ্ধতি বজায় রাখার পাশাপাশি সাহরি ও ইফতারের গণভোজের ব্যবস্থাও শুরু করেন এবং বলেন: "এটি মুসাফির, অপরিচিত এবং মসজিদে ইবাদতে রত ব্যক্তিদের জন্য।" [২]

এই যুক্তিসঙ্গত, সহানুভূতিশীল এবং উদার কর্মপদ্ধতির ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর প্রজাদের প্রতি এই দয়া ও মমতা দেখে মানুষের হৃদয় জয় করে নিলেন। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, এই পদক্ষেপগুলোর ফলে প্রজারা তাঁকে হযরত উমর (রা.)-এর চেয়েও বেশি ভালোবাসতে শুরু করেছিল। কারণ সেখানে যেমন ইনসাফ ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা ছিল, তেমনি তার সাথে ছিল উদারতা, দানশীলতা এবং নম্রতা যা শত্রুদেরও অনুরাগী করে তুলত। [৩]

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন: "আমি হযরত উসমান গনি (রা.)-কে ভাষণ দিতে দেখেছি, তখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি ছিলাম। আমি হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে সুন্দর ও সতেজ চেহারা কোনো পুরুষ বা নারীর দেখিনি। আমি শুনেছি হযরত উসমান (রা.) বলতেন: 'হে লোকসকল! আসুন এবং আপনাদের ভাতা গ্রহণ করুন।' অতঃপর লোকেরা আসত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করত। নির্দেশ হতো: 'হে লোকসকল! আসুন, কাপড় ও পোশাক নিয়ে যান।' তখন লোকেরা আসত এবং তাদের মাঝে পোশাক বিতরণ করা হতো। আল্লাহর কসম! আমার কানে এই পর্যন্ত পৌঁছেছে: 'হে লোকসকল! আসুন, ঘি এবং মধু গ্রহণ করুন।' মানুষের মাঝে ঘি ও মধু বিতরণ করা হতো। লোকেরা আসত এবং কস্তুরী ও আম্বরের মতো সুগন্ধি নিয়ে যেত। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে মানুষের মাঝে শত্রুতার নামগন্ধও ছিল না। দান ও পুরস্কারের বৃষ্টি বর্ষিত হতো। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো মুসলমান ছিল না যে অন্য মুসলমানের থেকে কোনো আশঙ্কা করত। যে কোনো শহরেই কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হতো, তাকে নিজের ভাই, বন্ধু, সাহায্যকারী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করত।" [৪]

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/৫৩

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/২৫৫

[৩] আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবনে কুতাইবা, পৃষ্ঠা ৩৫, ত: মাকতাবাতুন নীল

[৪] আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবনে কুতাইবা, পৃষ্ঠা ৩৫, ৩৬

## হযরত উসমান গনি (রা.)-এর জানবাজরা জিহাদের ময়দানে

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর চলে যাওয়ার পর জিহাদের ঝাণ্ডা অবনমিত হয়নি, বরং বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলের সামরিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

"কুফার সেনানিবাসে চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত থাকত, যাদের মধ্য থেকে প্রতি বছর দশ হাজার সৈন্য সীমান্তে এমনভাবে মোতায়েন করা হতো যে, ছয় হাজার 'আজারবাইজান'-এ এবং চার হাজার 'রে'-তে।" [১]

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম বছরই হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.), যিনি হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর সময় থেকে আল-জাজিরার গভর্নর ছিলেন, নিজের সেনাপতি সালমান বিন রাবিয়া (রা.)-কে বারো হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে আরমেনিয়া পাঠান, যা বিশাল এলাকা জয় করে প্রচুর গনিমতের মালসহ ফিরে আসে। [২]

### রোমান সেনাপতির তাঁবুতে:

একই বছর মুসলমানরা সিরিয়ার সীমান্তে রোমানদের এমন শিক্ষা দিয়েছিল যা তারা কখনো ভুলবে না। রোমানরা সাইয়্যেদুনা উমর (রা.)-এর শাহাদাতে মুসলমানদের দুর্বল মনে করে সিরিয়ার সীমান্তে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হযরত উসমান (রা.) সংবাদ পাওয়া মাত্রই ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-কে জরুরি চিঠি পাঠান যে, "আট থেকে দশ হাজার সৈন্য সিরিয়াবাসীদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিন।"

হযরত ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.) অবিলম্বে সালমান বিন রাবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করে সিরিয়ার সীমান্তে পাঠিয়ে দেন, যেখানে হযরত হাবিব বিন মাসলামা আল-ফিহরি (রা.) স্থানীয় সৈন্যদের নিয়ে সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলেন। ওদিকে সীমান্তে রোমান সেনাপতি আশি হাজার রোমান ও তুর্কিদের নিয়ে তাঁবু গেড়েছিল। হযরত হাবিব বিন মাসলামা (রা.) রণকৌশল পরিবর্তনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি শত্রুর ওপর অতর্কিত নৈশ অভিযানের (শবে খুন) সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন তিনি নিজের তাঁবু থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী মুহতারামা উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে ইয়াজিদ ডেকে বললেন: "তাহলে কোথায় দেখা হবে?" তিনি বললেন: "রোমান সেনাপতির তাঁবুতে অথবা জান্নাতে।"

যখন তিনি রাতের অন্ধকারে রোমানদের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন তাঁর স্ত্রীও ছদ্মবেশে জানবাজদের দলে শামিল হয়ে গেলেন। হযরত হাবিব বিন মাসলামা (রা.) বিদ্যুতের মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে রোমান সেনাপতির তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রী আগেই সেখানে উপস্থিত আছেন এবং শত্রুর সাথে লড়াই করছেন। অবশেষে রোমানরা পরাজিত হলো এবং মুসলমানরা বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে ফিরে এল। [৩]

---

[১] তারিখুত তাবারী: ৪/২৬৪

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/২৪৭

[৩] তারিখুত তাবারী: ৪/২৪৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৫০, ১৫১

এই পরাজয় সত্ত্বেও বাইজেন্টাইন রোমানদের এই প্রত্যাশা ছিল যে, হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পর মুসলমানদের শক্তি ও শৌর্যে অবশ্যই ভাটা পড়বে, তাই এখন তাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু সীমান্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। সিরিয়ার সীমান্তে পরাজিত হওয়ার পর তারা মিশরের উপকূলীয় শহর আলেকজান্দ্রিয়া দখলের পরিকল্পনা করেছিল। তাদের সেনাপতি ম্যানুয়েল সেখানে একটি বিশাল নৌবহর নিয়ে পৌঁছে যান। স্থানীয় রোমান বাসিন্দারা আগেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাই রোমানরা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয়।

মিশরের গভর্নর হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বেশিদিন বিজয়ের উৎসব পালনের সুযোগ দেননি এবং ২৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে পাল্টা আক্রমণ করে রোমান নৌবহরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং শহরে পুনরায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। [১]

আলেকজান্দ্রিয়ার স্থানীয় কিবতি বাসিন্দারা বিদ্রোহে রোমানদের সাথে শরিক ছিল না। তাই রোমানরা পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছিল। হযরত আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু যথাসম্ভব তাদের সেই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করে দেন। [২]

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের প্রাথমিক দুই বছরে সংঘটিত এই দুটি বড় যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থান ছিল রক্ষণাত্মক, যেখানে আক্রমণ ছিল শত্রুপক্ষের পক্ষ থেকে। তবে এগুলি ছাড়াও তাঁর খিলাফতের বিভিন্ন বছরে সীমান্তের ওপারে অনেক অভিযান পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর প্রকৃতি ছিল অনেকটা অতর্কিত হামলার মতো। মুসলমানরা সীমান্তে তাবু ফেলতেন এবং দ্রুতগামী ছোট ছোট অশ্বারোহী দল শত্রুর এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে তাদের খাদ্য ও রসদ লুট করত এবং নিরাপত্তা চৌকিগুলোতে আক্রমণ করত। এভাবে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে কোনো এলাকা বা দুর্গ দখল না করেই ফিরে আসত। এই ধরনের অভিযানের চারটি উদ্দেশ্য ছিল:

- নিজের শক্তির প্রভাব বজায় রাখা
- শত্রুর শক্তির পরিমাপ করতে থাকা
- শত্রুকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করা
- নিজের বাহিনীকে সক্রিয় রেখে সীমান্তকে নিরাপদ করা

প্রাচ্যবিদরা মুসলমানদের এই ধরনের অভিযানকে লুটতরাজ ও ডাকাতি হিসেবে অভিহিত করেন, অথচ এই ধরনের কর্মকাণ্ড বাইজেন্টাইনদের পক্ষ থেকেও অব্যাহত ছিল। সুতরাং দুই সরকারের মধ্যে এই যে সংঘাত ছিল তা 'যুদ্ধ' হিসেবেই গণ্য হবে, যার প্রকৃতি ছিল কিছুটা ভিন্ন। একে লুটতরাজ বা ডাকাতি হিসেবে অভিহিত করা রাজনীতির মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার লক্ষণ।

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ের পরিধি বিস্তারের উপযোগিতা ভালোভাবেই বুঝতেন, তবে তার আগে পরিণতির কথা বিবেচনা করাও জরুরি ছিল। হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের প্রথম সাত বছরে ইসলামী বাহিনী বন্যার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা বিজয়কে নির্দিষ্ট কিছু ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। পূর্বদিকের বিজয়কে তিনি খোরাসানের সমভূমিতে থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং বাহিনীকে পামির মালভূমি বা আমু দরিয়া অতিক্রম করে তুর্কিদের আবাসভূমি চীন ও মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে দেননি। সম্ভবত আপনার সামনে এই নবী-বাণী ছিল:

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২২৩

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/২৫৫

“তুর্কিদের ততক্ষণ ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা তোমাদের ছেড়ে রাখে।”

“যতক্ষণ তুর্কিরা তোমাদের না ঘাটায়, তোমরাও তাদের সাথে বিবাদে জড়াবে না।”

পশ্চিমে আপনি ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত অগ্রাভিযান সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সমুদ্রে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেননি। এই সতর্কতার একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুসলমানদের বাহিনীর শৃঙ্খলা, সাহস ও হিম্মত থাকা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) সমুদ্রের ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন; তাঁর আশঙ্কা ছিল যে মুসলমানরা সামুদ্রিক ঝড়ের শিকার না হয়ে পড়ে। সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানরা সামুদ্রিক সফর, জাহাজ চালনা এবং নৌযুদ্ধ সম্পর্কে পরিচিত ছিল না। হযরত উমর (রা.) নিজের সৈন্যদের এই মৃত্যুর উপত্যকায় ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাস্তবতাও এটাই ছিল যে, নৌযুদ্ধের জন্য যে ধরণের প্রশিক্ষিত অফিসার ও সৈন্য এবং যে ধরণের যুদ্ধজাহাজ ও নৌকার প্রয়োজন ছিল, ইসলামী বাহিনী তা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই সমুদ্রে জিহাদ করা নিজেকে নৌবিদ্যায় পারদর্শী শত্রুদের হাতে ডুবিয়ে দেওয়ার নামান্তর ছিল।

এই সতর্কতামূলক দিকটি হযরত উসমান (রা.)-এর সামনেও ছিল, তাই শুরুর কয়েক বছরে আপনার বেশি মনোযোগ ছিল সেই দুর্বলতাগুলো দূর করা এবং নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী করার ওপর।

তবে পশ্চিম দিকে মিশরের সাথে সংযুক্ত আফ্রিকায় অগ্রাভিযানের সুযোগ বিদ্যমান ছিল, তাই তৃতীয় খলিফা তাঁর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ২৫ হিজরিতে মিশরের ইসলামী বাহিনীকে পশ্চিম দিকে অগ্রাভিযানের অনুমতিই শুধু দেননি বরং সাহায্য পাঠিয়ে উৎসাহও প্রদান করেন।

## আফ্রিকার বিজয়সমূহ

মিশরের সীমানা সংলগ্ন উত্তর আফ্রিকার বিশাল এলাকা একজন রোমান শাসক জর্জির (গ্রেগরি)-এর অধীনে ছিল। প্রথমে সে কায়সারের (রোমান সম্রাট) অধীনস্থ গভর্নর ছিল কিন্তু রোমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার পর সে সম্প্রতি নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। তার রাজ্যের সীমানা মিশরের সীমান্ত থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (আজকাল এখানে তিউনিসিয়া, লিবিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কো অবস্থিত)।

তৃতীয় খলিফার অনুমতি পাওয়ার পর মিশরের গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.) বিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে সাহারা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে জর্জিরের শাসনাধীন সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করেন। এখানে বেশ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ হয়, শত্রুদের বড় একটি সংখ্যা নিহত ও বন্দী হয় এবং বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল অর্জিত হয়। অধিকাংশ গোত্র যারা জর্জিরের জুলুম-অত্যাচার এবং রোমানদের কঠোর আইনের কারণে অতিষ্ঠ ছিল, তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। কিছু এলাকা...

---

(১) আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তবারানী: ১৮১/১০, তবা মাকতাবা ইবনে তাইমিয়াহ।

এতে লোকেরা যুদ্ধ না করেই সন্ধি করে নিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশ্যও ছিল ইসলামের প্রচার ও বিজয় যা অনেকাংশেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি ফিরে আসলেন। [১]

জুরজীর (Gregory) মুসলমানদের এই বিজয়গুলো কীভাবে সহ্য করতে পারত। সে বড় পরিসরে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও পুরো উত্তর আফ্রিকা জয় করার পরিকল্পনা করছিলেন। ২৭ হিজরি সনে তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ বিষয়ে নিজের সংকল্প সম্পর্কে অবহিত করে অনুমতি চাইলেন। এটি ছিল একটি অসাধারণ অভিযান যার সফলতার ফলে মরক্কো পর্যন্ত ইসলামী পতাকা উড্ডীন হতে পারত এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মিশরও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারত।

পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও মসজিদে নববীতে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির জন্য নিরন্তর পরামর্শে ব্যস্ত থাকতেন, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও মজলিসে শুরায় পেশ করা হলো, অধিকাংশ সদস্য এই অভিযানের পক্ষে মত দিলেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অভিযানের গুরুত্ব বিবেচনা করে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ বেশ কয়েকজন বড় বড় সাহাবী কেরামকে সাহায্যের জন্য পাঠালেন। এই ব্যক্তিবর্গ যখন মিশরে পৌঁছালেন তখন মুসলমানরা অধীর আগ্রহে তাঁদের অপেক্ষায় ছিল, লস্কর যাত্রা শুরু করল এবং বারকায় পৌঁছাল যেখানে হযরত উকবা বিন নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু সীমান্ত বাহিনীর সাথে উপস্থিত ছিলেন। এখান থেকে ত্রিপোলি পর্যন্ত এলাকা হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ফারুকী যুগে জয় করে নিয়েছিলেন। মুসলমানরা এখন বিশ হাজার হয়ে গিয়েছিল, এই সীমানা অতিক্রম করে তারা জুরজীরের এলাকায় প্রবেশ করল, যে তার রাজধানী সুবাইতিলা থেকে এক মঞ্জিল সামনে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল।

অবশেষে উভয় বাহিনীর মোকাবিলা হলো। জুরজীরের বাহিনী ছয় গুণ বেশি ছিল কিন্তু মুসলমানরা বিন্দুমাত্র বিচলিত ছিল না কারণ কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধের ফলাফল এটি প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, মুসলমানরা সংখ্যার স্বল্পতা বা আধিক্যের জোরে নয় বরং ঈমান ও জিহাদের জযবার ভিত্তিতে লড়াই করে। যুদ্ধের আগে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জুরজীরকে ইসলাম গ্রহণ করার অথবা জিযিয়া প্রদান করার প্রস্তাব দিলেন, যা সে অত্যন্ত অহংকারের সাথে প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে থাকল, প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লড়াই হতো এবং এরপর উভয় পক্ষ নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে আসত।

এই সময়ে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে, যিনি এই রণাঙ্গন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রতীক্ষমাণ ছিলেন, একদল সতেজ মুজাহিদ এসে পৌঁছাল, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পঁচিশ বছর বয়সী যুবক হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। যেহেতু অল্প বয়স থেকেই তাঁর বরকতসমূহ প্রসিদ্ধ ছিল, তাই মুসলমানরা তাঁকে উৎসাহের সাথে স্বাগত জানিয়ে এত জোরে তাকবীরের ধ্বনি দিল যে, জুরজীর তা শুনে নিজের জায়গায় চমকে উঠল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানানো হলো যে, মুসলমানরা সাহায্য পেয়ে গেছে। জুরজীর চিন্তিত হয়ে পড়ল কিন্তু নিজের বাহিনীর মনোবল বাড়ানোর জন্য সে ঘোষণা করিয়ে দিল:

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ১০/২২৫

“যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমির আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারহকে হত্যা করবে, আমি তার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব এবং সাথে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাও দেব।”

এই ঘোষণায় তার বাহিনীর মধ্যে এক অসাধারণ উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো। এদিকে মুসলমানরা যখন এটি জানতে পারল, তখন তারা তাদের আমিরের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-ও সতর্কতা হিসেবে একদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত থাকলেন।

এই পরিস্থিতিতে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) মুসলমানদের সাহস যোগানোর জন্য সেনাপতিকে পরামর্শ দিলেন:

“আপনিও ঘোষণা করে দিন যে, যে ব্যক্তি জুরজিরকে হত্যা করবে, আমরা জুরজিরের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেব, এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাও দেব এবং তাকে জুরজিরের এলাকার শাসক হিসেবেও নিযুক্ত করব।”

সেনাপতির কাছে এই পরামর্শ পছন্দ হলো। যখন এই ঘোষণা দেওয়া হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন সাহসের সঞ্চার হলো, অন্যদিকে জুরজির ও তার বাহিনী ভীত হয়ে পড়ল। যেহেতু বেশ কয়েকদিন ধরে চলা এই যুদ্ধের কোনো ফয়সালা হচ্ছিল না, তাই হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) যুদ্ধকৌশল পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়ে বললেন:

“আগামীকালের যুদ্ধে আমরা কিছু সৈন্য তাঁবুতে রেখে দেব। যখন উভয় পক্ষ লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন এই সতেজ বাহিনীকে পাঠিয়ে ক্লান্ত শত্রুদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেব।”

সেনাপতিদের ঐকমত্যের পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.) এই পরামর্শও গ্রহণ করলেন।

নিয়ম অনুযায়ী পরের দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু হলে সেনাপতি নির্বাচিত অশ্বারোহীদের তাঁবুতে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। দ্বিপ্রহরের সময় যখন উভয় বাহিনী ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তখনও হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) জেদ ধরে যুদ্ধ থামতে দিলেন না। অবশেষে বিকেলের দিকে উভয় পক্ষ একেবারে ক্লান্ত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। তখন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) কিছু সতেজ সাহসী যোদ্ধাকে নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে পেছনের দিকে পৌঁছে গেলেন যেখানে জুরজির তার ঘোড়ায় সওয়ার ছিল এবং দুজন দাসী তাকে ময়ূরপঙ্খী পাখা দিয়ে বাতাস করছিল। সে এবং তার দেহরক্ষীরা আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে কয়েকজন অশ্বারোহীর সাথে আসতে দেখে মনে করল যে এরা শত্রুপক্ষের দূত বা এমন কেউ আসছে, তাই তারা পালানোর বা প্রতিরোধের চেষ্টা করল না। কিন্তু যখন তাদের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরতে দেখল তখন তারা ঘাবড়ে গেল। জুরজির তার ঘোড়াকে তাড়া দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) তার মাথার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তলোয়ার দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করলেন। তারপর সেটি বর্শার মাথায় গেঁথে তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে সেই দ্রুতগতিতেই ফিরে এলেন।

নিজেদের রাজার মৃত্যুতে কাফেরদের মনোবল ভেঙে গেল এবং দেখতে দেখতে পুরো বাহিনী পালিয়ে গেল। তাদের রাজকন্যা বন্দি হলো, যাকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-এর কাছে হস্তান্তর করা হলো। ইসলামী বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের রাজধানী সুবাইতিলা দখল করে নিল এবং আশেপাশের আরও বেশ কিছু দুর্গ জয় করল।

এই বিজয়গুলোতে স্থানীয় শাসকদের জমাকৃত কোষাগার থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে যা অর্জিত হলো, তা এত বেশি ছিল...

বিজয়ী বাহিনীর বিশ হাজার সৈন্যের প্রত্যেকে কমপক্ষে এক হাজার করে দিনার পেয়েছিলেন। [১]

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে শুরুতে দামেস্কের শাসক ছিলেন, এরপর হযরত উমর (রা.) তাকে পদোন্নতি দিয়ে পুরো শামের গভর্নর নিযুক্ত করেন, এভাবে তার শাসনাধীন এলাকার সীমানা মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। [২]

হযরত উসমান (রা.) তাকে এই পদে বহাল রাখেন। এ কথা সবাই স্বীকার করতেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) শামের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা যেভাবে দক্ষতার সাথে সামলে রেখেছিলেন তা ছিল তারই কৃতিত্ব। তিনি প্রতি গ্রীষ্মকালে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বাহিনী পাঠাতেন এবং তাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতেন।

আফ্রিকায় হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-এর বিজয়ের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-ও এই জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করেন এবং মুসলমানদের বিজয় পূর্ণ করার জন্য হযরত মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ (রা.)-কে প্রেরণ করেন, যিনি মরক্কোর সীমান্তে কুমুনিয়া (সুস) সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান জয় করেন। [৩]

---

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৩/২৬২ থেকে ২৬৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৭/২২৭, ২২৮।

এক দিনার ৪.২৫ গ্রাম সোনার হতো, সেই হিসেবে প্রত্যেকের অংশ আজকের হিসেবে এক কোটি টাকার বা এক লক্ষ দিরহামের চেয়ে বেশি ছিল। ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রা.) এই বিজয়ের খুমুস (বাইতুল মালের এক-পঞ্চমাংশ) নিজের কাছে রাখার পরিবর্তে আল-হাকাম অর্থাৎ মারওয়ান এবং তার পরিবারের জন্য দিয়েছিলেন। (তারিখুত তাবারী: ৪/২৫৬) কিছু বর্ণনায় আছে যে, খুমুস আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-কে দেওয়া হয়েছিল।

এতে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এক: এই লেনদেন কি মারওয়ানের সাথে করা হয়েছিল নাকি আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-এর সাথে?

এর উত্তর আল্লামা ইবনুল আসির দিয়েছেন যে, এই ঘটনা দুবার ঘটেছিল। একবার মারওয়ানের সাথে, আরেকবার আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-এর সাথে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর তাকে এটি দেওয়ার কী অধিকার ছিল? এটি কি স্বজনপ্রীতি ছিল না?

এর উত্তরে আল্লামা ইবনুল আসির বলেছেন যে, মারওয়ান খুমুসে আসা মালামাল পাঁচ লক্ষ দিনারে কিনে নিয়েছিলেন।

“ফাশতারা মারওয়ান বিখুমসি মিআতি আলফ।” (আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৩১৬, ৩১৭)

আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.)-কে আফ্রিকার গনিমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ নয় বরং খুমুসের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ) পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। কারণ আফ্রিকার অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল, তাই এই অভিযানের আগে তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

যাই হোক, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়গুলোকে এমনভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে মানুষ অস্থির হয়ে পড়েছিল। তারা যখন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে কৈফিয়ত চাইল, তখন তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে, “আমি আবদুল্লাহকে গনিমতের খুমুসের খুমুস (পঁচিশ ভাগের এক ভাগ) দিয়েছি, এটি শরীয়ত বিরোধী নয়। হযরত উমর (রা.)-এর মতো শাসকরাও এমন পুরস্কার দিতেন।” যাই হোক, যখন লোকেরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল, তখন তিনি সেই পুরস্কার ফেরত নিয়ে নিলেন।

এটিও প্রচার করা হয়েছিল যে, আপনি সরকারি তহবিল থেকে মারওয়ান বিন হাকামকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম উপহার দিয়েছেন। আপনি (রা.) স্পষ্ট করে দিলেন যে এটি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে দিচ্ছি, তখন লোকেরা সন্তুষ্ট হলো। (তারিখুত তাবারী: ৪/৩৩৫)

দ্রষ্টব্য: হযরত উসমান (রা.)-এর ওপর আরোপিত অভিযোগগুলোর বিস্তারিত উত্তর দ্বিতীয় খণ্ডে আসছে।

[২] খলিফা বিন খাইয়াত হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেন: “সুম্মা জামাআশ শামা কুল্লাহা লি মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান।” (তারিখু খলিফা, পৃ. ১৫৫)

[৩] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ২/৩১৫।

## নৌযুদ্ধসমূহ

এশিয়া মাইনর এবং আফ্রিকার রোমানদের সাথে বারবার যুদ্ধে ইউরোপ কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করছিল। তারা ইসলামি বাহিনীর পেছনে গোপনে বা প্রকাশ্যে সর্বদা উপস্থিত ছিল। ভূমধ্যসাগরে বাইজেন্টাইনদের নৌবহরের চলাচল মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায় একটি স্থায়ী হুমকি ছিল, তাই এখন সমুদ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয়দের মোকাবেলা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এর জন্য একটি নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এখন এক অনস্বীকার্য সত্যে পরিণত হয়েছিল।

সিরিয়ার উপকূলে হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) এবং মিশরে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.) প্রতিনিয়ত এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন এবং খোদ তৃতীয় খলিফাও এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ফলে হিজরি ২৮ সনের রজব মাসে যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর কাছে নৌ-জিহাদের অনুমতি চাইলেন এবং তাঁকে এই নিশ্চয়তা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন যে এই অভিযান কঠিন প্রমাণিত হবে না, তখন খেলাফত থেকে এই অভিযানের অনুমতি পাওয়া গেল। তবে হযরত উসমান গনি (রা.) ইসলামের এই প্রথম নৌবাহিনীর মনোবল অটুট রাখার জন্য অত্যন্ত হিকমতের সাথে কাজ করে এই শর্তারোপ করেন যে, আমীরুল লশকর যেন তাঁদের সাথে তাঁদের স্ত্রীদেরও নিয়ে যান। এই শর্তটি এজন্য ছিল যাতে আমীরুল লশকর সমুদ্রযাত্রার ঝুঁকিকে যথাসম্ভব নিরাপদ করার ব্যাপারে নিশ্চিত হন এবং নিছক আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের বিপদে না ফেলেন। এই হিকমতের মধ্যে এটিও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যে, নারীদের উপস্থিতিতে যে পুরুষরা প্রথমবারের মতো সমুদ্র অভিযানে যাচ্ছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়ে যাওয়া প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে এবং এভাবে সাহস ও মনোবলের পরিবেশ বজায় থাকবে।

সাইয়্যিদুনা মুয়াবিয়া (রা.) অনুমতি পেতেই সেরা যুদ্ধজাহাজ তৈরি করালেন। এই জিহাদের জন্য এমন সাহসী যুবকদের নিয়োগ করা হলো যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিল। হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ (রা.) ভূমধ্যসাগরের মানচিত্র এবং ইউরোপীয় জাহাজগুলোর যাতায়াতের পয়েন্টগুলো পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, মিশর ও সিরিয়ার উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে মুসলমানদের কোনো একটি সামরিক কেন্দ্র থাকা জরুরি। এর জন্য তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপকে বেছে নেন, যা সিরিয়ার উত্তর উপকূলের কাছে বাইজেন্টাইনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি ছিল।

হিজরি ২৮ সনের বসন্তকালে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর নৌ-সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন কায়েসের সাথে সিরিয়ার উপকূলীয় শহর 'আক্কা' থেকে প্রথম ইসলামি নৌবহর নিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর অবতরণ করেন। তাঁদের সাথে তাঁর স্ত্রী হযরত ফাখতাহ বিনতে কারাযাহ (রা.)-ও ছিলেন। একইভাবে হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রা.) তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.)-এর সাথে এই ঐতিহাসিক অভিযানে শামিল ছিলেন। [১]

হযরত আবু তালহা (রা.) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এই দিনগুলোতে তিলাওয়াত করতে করতে এই মুবারক আয়াতে পৌঁছালেন:

---

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৫৩, ১৫৪, খ. মাকতাবাতুল হিলাল।

ইন্‌ফিরূ খিফাফাঁও ওয়া সিকাল্লাও ওয়া জাহিদূ বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম ফী সাবীলিল্লাহি যালিকুম খাইরুল্লাকুম ইন কুনতুম তা'লামূন। [১]

"আল্লাহর পথে বের হও, চাই তোমরা হালকা হও বা ভারী, এবং আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে।"

এই আয়াত পাঠ করার পর তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। পরিবারের সদস্যদের বললেন: "আমার মনে হয় আমার রব চান যে আমরা বৃদ্ধ হই বা যুবক, জিহাদে বেরিয়ে পড়ি। হে সন্তানরা! আমার সরঞ্জাম প্রস্তুত করো, আমিও যাব।"

তাঁর সন্তানরা যুবক ছিল, তারা বলল: "আব্বাজান! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি নবী আকরাম ﷺ-এর সাথে জিহাদ করেছেন, এরপর হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর যুগেও জিহাদ করেছেন। এখন আপনি বিশ্রাম নিন, আমরা আপনার পরিবর্তে জিহাদ করব।" কিন্তু তিনি মানলেন না এবং এই অভিযানে শরিক হলেন। হযরত আবু তালহা (রা.) এই সমুদ্র সফরের সময় জাহাজে ইন্তেকাল করেন। আশেপাশে কোনো দ্বীপ ছিল না যেখানে তাঁকে দাফন করা যেত। নয় দিন পর উপকূল দেখা গেল, যেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর লাশ একেবারে সতেজ ছিল। [২]

এটি সেই জিহাদ ছিল যার দৃশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল এবং তিনি ﷺ বলেছিলেন: "আমি আমার উম্মতের কিছু লোককে দেখেছি তারা সমুদ্রের জাহাজে এমন শান-শওকতের সাথে সফর করছে যেন বাদশাহ তার সিংহাসনে বসে আছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই স্বপ্নের কথা শুনে হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন যেন তিনিও এই জিহাদে শামিল হতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এই তামান্না পূরণ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন, ফলে তিনিও এই নৌ-কাফেলায় শামিল ছিলেন। ফেরার পথে এক জায়গায় তাঁর খচ্চরটি চমকে ওঠে, তিনি পড়ে যান, ঘাড়ের হাড় ভেঙে যায় এবং তিনি ইন্তেকাল করেন। [৩]

ইসলামী বাহিনী সাইপ্রাসের (কুবরুস) উপকূলে অবতরণ করলে স্থানীয় সৈন্যরা যুদ্ধ না করেই অস্ত্র সমর্পণ করে এবং এই শর্তগুলোর ওপর সন্ধি হয়:

- সাইপ্রাসবাসী বার্ষিক সত্তর হাজার দিনার জিজিয়া প্রদান করবে।
- মুসলমানরা তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে।
- সাইপ্রাসবাসী মুসলমানদের রোমানদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযানের জন্য যাতায়াতের সুযোগ প্রদান করবে।
- মুসলমানদের রোমানদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকবে। [৪]

এই সন্ধি চার বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। সন্ধির মেয়াদ শেষ হতেই ৩২ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কনস্টান্টিনোপলের (কুসতুনতুনিয়া) দিকে...

---

[১] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪১; মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ২৫০৩; তাফসীর ইবনে আবি হাতিম: ২৩০/২৫, সূরা আত-তাওবাহ।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ২৮৮৭, কিতাবুল জিহাদ, বাব আদ-দুআ বিল জিহাদ ওয়াশ শাহাদাহ; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৬৮/২ থেকে ৪০৭। একটি বর্ণনা অনুযায়ী উম্মে হারাম (রা.)-এর কবর সাইপ্রাসে এবং তা "আল-মারআতুস সালিহা"-এর কবর নামে প্রসিদ্ধ। (আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওযী: ২৮৮/৫)।

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩৬৯/২।

নৌযাত্রা করলেন। তারা এশিয়া মাইনরের উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে পৌঁছালেন। তারপর তারা কনস্টান্টিনোপল প্রণালীতে গিয়ে তাবু স্থাপন করলেন যেখান থেকে কায়সারের রাজধানীর প্রাচীর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। [১]

রোম সম্রাট কনস্টান্টিন, আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরে মুসলমানদের ক্রমাগত সাফল্যে অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। ইসলামী বাহিনীর তাবু এখন তিনি নিজের দুর্গের বুরুজ থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সাইপ্রাসবাসীদের সাথে যোগসাজশ শুরু করলেন। সাইপ্রাসবাসীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রোমানদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করল এবং তাদের যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করল। এই সংবাদ পেয়ে সাইয়্যেদেনা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঁচশ জাহাজ নিয়ে সাইপ্রাস আক্রমণ করলেন এবং তলোয়ারের জোরে পুরো দ্বীপটি জয় করে নিলেন। তারা এখানে বারো হাজার সৈন্যকে তাদের পরিবার-পরিজনসহ পুনর্বাসিত করলেন যারা এখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এভাবে সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরের একটি শক্তিশালী ইসলামী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হলো। সাইপ্রাস বিজয় হিজরি ৩৩ সালের ঘটনা। [২]

**গাযওয়ায়ে যাতুস সাওয়ারি:**

হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলের সবচেয়ে বড় এবং বিপজ্জনক যুদ্ধ ছিল ‘যাতুস সাওয়ারি’, যা হিজরি ৩৪ সালে সংঘটিত হয়েছিল। সাওয়ারি হলো সারিয়া-এর বহুবচন যার অর্থ হলো ‘জাহাজের মাস্তুল’। [৩] যেহেতু এই যুদ্ধে উভয় বাহিনী তাদের নিজ নিজ জাহাজের মাস্তুলগুলো বেঁধে যুদ্ধ করেছিল, তাই এই যুদ্ধকে যাতুস সাওয়ারি অর্থাৎ মাস্তুলওয়ালা যুদ্ধ নাম দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি ছিল এই যে, কায়সার মুসলিম বিজয়ীদের পদধ্বনি নিজের বুকে অনুভব করে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে একটি বিশাল নৌবহর প্রস্তুত করলেন, যাতে অন্তর্ভুক্ত জাহাজের সংখ্যা পাঁচশ থেকে ছয়শ পর্যন্ত বলা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, রোমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের মোকাবিলায় এত বড় বাহিনী আর কখনো একত্রিত হয়নি। কায়সার চেয়েছিলেন ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের হস্তক্ষেপ চিরতরে বন্ধ করে দিতে। অবশেষে তিনি এই বিশাল নৌ-শক্তি নিয়ে ভূমধ্যসাগরে নামলেন এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হলেন।

---

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৩৩৩

[২] কনস্টান্টিনোপলের ওপর মুসলমানদের এটিই ছিল প্রথম অভিযান কিন্তু এতে যুদ্ধের প্রয়োজন পড়েনি বরং এর আগেই মুসলমানদের পুনরায় সাইপ্রাসের দিকে মুখ করতে হয়েছিল। গবেষকদের মতে, উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদিস ‘আউয়ালু জাইশিন মিন উম্মতি ইয়াগজুনা মাদিনাতা কাইসারা মাগফুরুন লাহুম’ থেকে এই অভিযানই উদ্দেশ্য, কারণ কনস্টান্টিনোপলের প্রথম অভিযান এটিই ছিল এবং এর কিছুদিন আগে উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহা জিহাদের সফরে ইন্তেকাল করেছিলেন, এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে তিনি এই জিহাদে তো যাবেন কিন্তু শরিক হতে পারবেন না। এই হাদিসের কিছু অংশ আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। একবার পুরো হাদিসটি সামনে রাখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

قال عمير: حدثنا ام حرام رضى الله عنها انها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام: قلت: يا رسول الله انا فيهم؟ قال: انت فيهم۔ ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم: اول جيش من امتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت: انا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا۔

উমাইর (বিন আসওয়াদ) বলেন, আমাদের উম্মে হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহা এই হাদিসটি শুনিয়েছেন যে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মতের যে বাহিনী সর্বপ্রথম সমুদ্রে জিহাদ করবে, তাদের জন্য (জান্নাত বা মাগফিরাত) ওয়াজিব। আমি আরজ করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন: তুমি তাদের মধ্যে আছো। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার উম্মতের প্রথম বাহিনী যারা কায়সারের শহরে জিহাদ করবে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আমি আরজ করলাম: আমি কি তাদের মধ্যেও আছি? তিনি বললেন: না। (সহীহ বুখারী, হা: ২৯২৪, কিতাবুল জিহাদ)

[৩] সমুদ্রগামী জাহাজ বা নৌকায় স্থাপিত সেই উঁচু স্তম্ভকে মাস্তুল বলা হয় যার ওপর পাল টাঙানো হয়।

ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ১৫৪

এই খবর শোনার সাথে সাথেই সিরিয়া থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং মিশর থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.) তাদের নৌ-শক্তি একত্রিত করলেন এবং বাইজেন্টাইনরা ইসলামী উপকূলে অবতরণ করার আগেই তারা সমুদ্রের বুক চিরে তাদের সামনে গিয়ে পৌঁছালেন। সাইপ্রাস এবং রোডস দ্বীপের মধ্যবর্তী তুরস্কের উপকূল 'কিলিকিয়া'-র কাছে রাতের বেলা উভয় নৌবাহিনীর মুখোমুখি মোকাবিলা হলো।

ইসলামি মুজাহিদদের জাহাজের সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশ। এই নৌবাহিনী গঠিত হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছিল, তাই নাবিকদের জাহাজ চালনার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং সৈন্যদেরও সামুদ্রিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। এর বিপরীতে বাইজেন্টাইনরা শতাব্দী ধরে সমুদ্রের অধিপতি ছিল, তাদের জাহাজ চালনার দাপট সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের নৌবহরও ছিল প্রায় তিন গুণ বড়। এ পর্যন্ত ইসলামি নৌবহরের কার্যক্রম এই সীমা পর্যন্তই ছিল যে, মুসলমানরা সমুদ্র যাত্রা করে কোনো উপকূলে অবতরণ করত এবং সেখানে দখল নিত, কিন্তু এবার যুদ্ধের ময়দান ছিল সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে পূর্ণ সাহসের সাথে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, রাতে কোনো পক্ষই একে অপরের ওপর আক্রমণ করবে না। ফলে সারা রাত মুসলমানরা নামাজ, দোয়া এবং তিলাওয়াত-এ মশগুল রইলেন, অন্যদিকে বাইজেন্টাইন নৌবাহিনী দামামা ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকল।

সকাল হলে মুজাহিদদের আমির হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.) জাহাজের মাস্তুলগুলোকে একে অপরের সাথে বেঁধে সারি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং মুজাহিদদের তাকিদ দিলেন যেন তারা অনবরত তিলাওয়াত ও জিকির করতে থাকেন। মুসলমানদের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয় ছিল এই যে, বাতাসের গতি ছিল তাদের দিকে, তাই শত্রুর জাহাজগুলো পাল তুলে দ্রুত তাদের দিকে আসতে পারত, অন্যদিকে ইসলামি নৌবাহিনী যদি সামনে এগোতে চাইত তবে তাদের জন্য পাল তোলা আরও ক্ষতিকর ছিল, কেবল বৈঠা চালিয়ে সামান্য গতিতে জাহাজ সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। এটি দেখে লশকর-এর আমির জাহাজের নোঙর ফেলার নির্দেশ দিলেন।

শত্রুর জাহাজগুলো সামনে এগিয়ে আসছিল, এমন সময় হঠাৎ আল্লাহ তায়ালার কুদরতে বাতাস মুসলমানদের অনুকূলে চলে এল এবং তাদের সাহস বেড়ে গেল। এই মুহূর্তে হযরত আবদুল্লাহ বিন সাদ (রা.) প্রতিপক্ষকে প্রস্তাব দিলেন যে, উভয় বাহিনী উপকূলে অবতরণ করুক এবং তাদের তলোয়ার চালনার নৈপুণ্য দেখিয়ে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করুক।

বাইজেন্টাইন কমান্ডাররা এই ধারণা করে যে, মুসলমানরা অনভিজ্ঞতার কারণে নৌ-যুদ্ধে ভীত হয়ে পড়েছে, অহংকারী সুরে জবাব দিল: "যুদ্ধ সমুদ্রেই হবে, সমুদ্রেই।"

এই জবাব শুনে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারহ (রা.) নোঙর তোলা এবং পাল খোলার নির্দেশ দিলেন। ইসলামি নৌবাহিনী রোমানদের দিকে অগ্রসর হলো এবং দেখতে দেখতেই প্রথম যুগের সেই নাবিকরা তাদের জাহাজগুলোকে প্রতিপক্ষের জাহাজের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করলেন। এর সাথে সাথেই উভয় পক্ষের সৈন্যরা তলোয়ার ও খঞ্জর নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমানরা এমন এক ভয়াবহ নৌ-যুদ্ধ লড়লেন যার কোনো নজির মেলে না। হাজার হাজার মানুষ কাটা পড়ে সমুদ্রে গিয়ে...

...পড়ে গেল এবং সমুদ্র রক্তে লাল হয়ে গেল। মুসলমানদেরও কয়েকশ লোক শহীদ হলেন, কিন্তু রোমানদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অনেক বেশি। এই সময়ে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয় এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধজাহাজগুলো খড়কুটোর মতো দুলতে থাকে। ততক্ষণে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যক রোমানকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে খোদ কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটও আহত হন এবং তিনি অবশিষ্ট সৈন্যদের পিছু হটার নির্দেশ দেন।

এভাবে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এক গৌরবময় বিজয় দান করেন। মুসলমানরা নিকটবর্তী উপকূলে অবতরণ করলে নিহত রোমানদের লাশগুলোও ভেসে ভেসে সেখানে জমা হতে থাকে, এমনকি জায়গায় জায়গায় লাশের স্তূপ জমে যায়।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে একটি অভিমত হলো যে, এটি ৩১ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। [১]

**কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনা:**

হযরত উসমান গনি (রা.) বহু বছর ধরে সম্রাটের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের ওপর কার্যকর আক্রমণের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। যেহেতু এই রণাঙ্গনে জিহাদকারী বাহিনীর জন্য হাদিসে ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম এর বিজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কনস্টান্টিনোপলের উপসাগর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়েছিলেন, কিন্তু তিন দিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত এই শহরের ভৌগোলিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, এই দিক থেকে আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু হযরত উসমান গনি (রা.)-এর সাহস এত প্রবল ছিল যে, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে পুরো ইউরোপ জয় করা হবে এবং তারপর স্থলপথে উত্তর দিক থেকে এসে কনস্টান্টিনোপল ঘেরাও করা হবে। এর জন্য তিনি এই নকশা তৈরি করেন যে, প্রথম পর্যায়ে স্পেন, তারপর ফ্রান্স এবং এরপর পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ করা হবে। এরপর পূর্ব ইউরোপ পদানত করে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌঁছানো হবে। সে অনুযায়ী তিনি আফ্রিকার সেনাপতি হযরত উকবা বিন নাফি (রা.)-কে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে চিঠিতে লেখেন: “নিঃসন্দেহে কনস্টান্টিনোপল আন্দালুসের পথ দিয়ে জয় করা সম্ভব।” [২]

ইসলামী বাহিনী ততদিনে মরক্কো দখল করে নিয়েছিল। স্পেন ও মরক্কোর মাঝে কেবল একটি সমুদ্রপথ ব্যবধান ছিল। এর আগে হযরত উসমান গনি (রা.)-এর নির্দেশে ২৭ হিজরিতে আফ্রিকার ইসলামী বাহিনী উপসাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে একটি আক্রমণ চালিয়েছিল এবং সফলভাবে ফিরে এসেছিল। [৩] এই আক্রমণটি নিয়মিত যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী ছিল না যেখানে এলাকা জয় করা হয়, বরং এটি ছিল একটি অতর্কিত হামলা যাতে শত্রুর শক্তি পরিমাপ করা যায়।

এটি ছিল ইউরোপে মুসলমানদের প্রথম পদক্ষেপ। হযরত উসমান (রা.) যদি এরপর অভ্যন্তরীণ ফিতনার সম্মুখীন না হতেন, তবে হয়তো কনস্টান্টিনোপল এবং তার আগে পুরো ইউরোপ সেই যুগেই বিজিত হতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ৩৪ হিজরির পর অভ্যন্তরীণ ফিতনাগুলো জিহাদের এই ধারাকে এমনভাবে থামিয়ে দেয় যে, পরবর্তী এক দশক পর্যন্ত ইসলামী সীমান্ত আর বিস্তৃত হতে পারেনি।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৮৮, ৩৮৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/২৩৬ থেকে ২৩৯

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৬৬

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৬৬

## পূর্ব রণাঙ্গন

উসমানী যুগে পশ্চিমের পাশাপাশি পূর্বেও বিজয়ের পরিধি বাড়তে থাকে। ২৯ হিজরিতে পারস্যবাসীরা বিদ্রোহ করলে তৃতীয় খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত বসরার নতুন গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) তাঁর অসীম দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান এবং তিনি বসরা থেকে পারস্যের কেন্দ্র ইস্তাখর আক্রমণ করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও সাহসিকতার সাথে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন এবং পারস্যে ইসলামী সরকারের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। [১]

৩০ হিজরিতে কাস্পিয়ান সাগরের (কাস্পিয়ান সি) নিকটবর্তী তাবারিস্তান অঞ্চলে জিহাদ সংঘটিত হয়। কুফার গভর্নর হযরত সাঈদ বিন আস (রা.) যখন এখানে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.)-এর মতো সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গী ছিলেন, যারা তীব্র যুদ্ধের পর তাবারিস্তান দখল করে নেন। [২]

এদিকে ইয়াজদগিরদের মৃত্যুর পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) পুরো খোরাসান ও এর আশপাশের এলাকা জয় করে পারস্যবাসীদের অনিষ্ট সমূলে উৎপাটন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ৩১ হিজরিতে বিভিন্ন জেলা জয় করে নিশাপুর অবরোধ করেন। অবশেষে এক মাস পর নিশাপুরের শাসক সন্ধি করে নেন। [৩]

## ইয়াজদগিরদের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল?

সাসানি বংশের শেষ শাসক, ইরানের প্রাক্তন সম্রাট ইয়াজদগিরদ পাঁচ বছর ধরে সিজিস্তান (দক্ষিণ আফগানিস্তান)-এ আত্মগোপন করে ছিলেন। ফারুকী যুগে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে ইরানীদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর তিনি ইসফাহানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং যখন সেখানকার পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে ওঠে, তখন তিনি ‘রে’ শহরে চলে যান। সেখানে তাবারিস্তানের গভর্নর এসে তাঁকে নিজের দুর্গে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু ইয়াজদগিরদ রাজি হননি এবং সিজিস্তানে চলে আসেন। মুসলিম সৈন্যরা তখনও তাঁর সন্ধানে ছিল।

সেই সময় তিনি সিজিস্তানবাসীদের প্রতিও হতাশ হয়ে মার্ভের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে এক হাজার লোকের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী এবং কয়েকজন আমীর ছিলেন। মার্ভে পৌঁছে তিনি স্থানীয় মজুসী শাসক মাহওয়াইহ এবং তাঁর আমীরের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চান, কিন্তু এই লোকেরা সাসানিদের পূর্ববর্তী জুলুম এবং মিথ্যা রাজনীতিতে এতটাই অতিষ্ঠ ছিল যে, তারা কেবল যে কোনো ধরনের সাহায্য করতে অস্বীকারই করেনি, বরং তুর্কিদের ডেকে এনে ইয়াজদগিরদের কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়। এই সংঘর্ষে ইয়াজদগিরদের সমস্ত সঙ্গী নিহত হন এবং তিনি নিজে ঘোড়ায় চড়ে একাকী মরুভূমির দিকে পালিয়ে যান। এই ঘটনাটি ৩১ হিজরির।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/৪৭, ৪৮

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৪৮০, ৪৮১

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৪৯০ থেকে ৪৯৩

আহত ঘোড়াটি পথে প্রাণ ত্যাগ করলে সে পায়ে হাঁটতে বাধ্য হয়। এই জরাজীর্ণ অবস্থায় সে মার্ভ থেকে দুই ফারসাখ (প্রায় দশ কিলোমিটার) দূরে মুরগাব নদীর তীরে একটি পানি-কলে পৌঁছায়। তার রাজকীয় পোশাক ও মুকুট দেখে পানি-কলের মালিক অবাক হয়ে যায় এবং তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়। ইতিমধ্যে মার্ভের শাসক মাহওয়িয়া ইয়াজদগিরদের সন্ধান পেয়ে যায়। সে কিছু সৈন্য পাঠায় যাতে ইয়াজদগিরদের মাথা কেটে নিয়ে আসা হয়। সেই সৈন্যরা প্রথমে কলওয়ালাকে মারধর করে ইয়াজদগিরদের অবস্থান জেনে নেয়, তারপর তাকে সাথে নিয়ে পানি-কলের সেই কুঠুরির কাছে পৌঁছে যায় যেখানে ইয়াজদগিরদ আত্মগোপন করেছিল।

সৈন্যরা কলওয়ালাকে বলল: "তুমিই ভেতরে গিয়ে তাকে হত্যা করো।"

সে ভেতরে গিয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন ইয়াজদগিরদকে কাবু করার চেষ্টা করল। সে ধড়ফড় করে জেগে উঠল এবং কলওয়ালার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল: "আমার এই আংটি ও কঙ্কণ নিয়ে নাও, আমাকে কিছু বলো না।"

কলওয়ালার কাছে এই জিনিসগুলোর মূল্য জানা ছিল না। সে বলল: "চার দিরহাম দাও, ছেড়ে দেব।"

ইয়াজদগিরদের কাছে দিরহাম ছিল না, সে নিজের একটি কানের দুল খুলে তাকে দিয়ে দিল।

এমন সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা তলোয়ার উঁচিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ইয়াজদগিরদ কাকুতি-মিনতি করে বলল:

"আমাকে হত্যা করো না, চাইলে তোমাদের শাসকের হাতে তুলে দাও অথবা আরবদের কাছে সোপর্দ করো।"

কিন্তু সৈন্যরা তা না শুনে তাকে সেখানেই হত্যা করল এবং লাশ মুরগাব নদীর খালে ফেলে দিল। এই লাশটি একজন স্থানীয় পাদ্রি নদীর তীরে ঝোপঝাড়ে আটকে থাকা অবস্থায় পান, যিনি তার রীতি অনুযায়ী তাকে দাফন করেন। এভাবেই সাসানীয়দের শেষ রাজা এক শিক্ষণীয় মৃত্যু বরণ করেন এবং কিসরা রাজবংশের কাহিনী শেষ হয়ে এমন এক উপাখ্যানে পরিণত হয় যা আজও দুনিয়াবী জাঁকজমক ও পার্থিব শান-শওকতের নশ্বরতার বিশ্বাস জন্মায়। [১]

**খুরাসান বিজয়:**

নিশাপুরের পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু সরখস তলোয়ারের জোরে এবং তুস সন্ধির মাধ্যমে জয় করেন। এরপর হেরাত ও বাদগিসও তাদের সামনে নতি স্বীকার করে। মার্ভের মজুসী শাসকও বার্ষিক বাইশ লক্ষ দিরহাম জিজিয়া দেওয়ার শর্তে সন্ধি করে নেয়। এরপর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রখ্যাত সেনাপতি হযরত আহনাফ বিন কায়েস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সামনে পাঠান, যিনি বলখ, জুযজান, ফারিয়াব, তুখার এবং তালকানের মতো দুর্গম এলাকাগুলোতে যোদ্ধা তুর্কি ও মজুসীদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেন এবং প্রতিটি স্থানে বিজয়ী হয়ে সেই সমস্ত এলাকায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। এর মধ্যে কিছু এলাকা যুদ্ধ ছাড়াই সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে বিজয়ী হয়। এভাবে একে একে কিরমান, সিজিস্তান, যরঞ্জ, কান্দাহার, যাবুল, গজনী এবং কাবুলও বিজয়ী হতে থাকে। এই বিজয়গুলোতে হযরত আকরা বিন হাবিস, হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরা, হযরত মুজাশে বিন মাসউদ এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন খাযিম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইসলামী সেনাপতিগণ অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৪৯০ থেকে ৪৯৩

মোদ্দাকথা, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির এবং তাঁর আমীরগণ দেড় বছরের মধ্যে পূর্ব দিকে ইসলামী শাসনের পরিধি কেবল গজনী ও কাবুল পর্যন্তই বিস্তৃত করেননি, বরং হিন্দুস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। [১]

এভাবে হযরত উসমান গনি-এর বরকতময় যুগে ইসলামী খিলাফতের সীমানা হিন্দুস্তানের সীমান্ত থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকার উপকূল এবং ভূমধ্যসাগরে পূর্ব ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ইসলামী রাষ্ট্র যা হযরত উমর ফারুক-এর শাসনকালে সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল (৫৬ লক্ষ ৩১ হাজার বর্গকিলোমিটার) পরিবেষ্টিত ছিল, উসমানী যুগে তা ৪৪ লক্ষ বর্গমাইল (৭০ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গকিলোমিটার) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। [২]

এভাবে তৃতীয় খলিফার বরকতময় সময়ে এক বিশাল এলাকা কুফর ও শিরকের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নোট: হযরত উসমান গনি-এর শাসনকালে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সরকার বিরোধী আন্দোলন, এর নেপথ্যে সাবায়ী ফিতনার ষড়যন্ত্র এবং হযরত উসমান গনি-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ “তারিখে উম্মতে মুসলিমা দ্বিতীয় খণ্ড”-এ হবে।

---

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২/৩৯৩ থেকে ৩৯৬

[২] হযরত উসমান যুন-নুরাইন, মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী শহীদ, পৃ: ৮০৩

https://t.me/BoierSomahar

# চতুর্থ অধ্যায়

## উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস (প্রথম অংশ)

## খিলাফতে রাশিদাহর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকসমূহ এবং ইসলামী রাজনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

https://t.me/BoierSomahar

## খোলাফায়ে রাশেদার যুগে রাজনীতির মূলনীতি

এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক সংবিধান প্রদান করেছে। এগুলো কিতাব ও সুন্নাহতে বিদ্যমান এমন কিছু মূলনীতি যা রাজনীতির উদ্দেশ্য, সরকারের লক্ষ্য, ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি এবং বিধান কার্যকর করা থেকে শুরু করে শাসকের নিয়োগ ও অপসারণ পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে ইসলাম সরকারের গঠন ও কাঠামোর ক্ষেত্রে নমনীয়তাও রেখেছে এবং মুসলিম উম্মাহকে এমন কোনো ধরাবাঁধা রাজনৈতিক পদ্ধতির অনুসারী করেনি যার ফলে উম্মাহ স্থবিরতার শিকার হয়ে প্রশাসনিক উদ্ভাবন থেকে বঞ্চিত হয় এবং অন্যান্য জাতির থেকে পিছিয়ে পড়ে। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রতিনিধি, আর প্রকৃত শাসন বা সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত, কারণ তিনিই মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং উভয় জগতের মালিক। তবে অন্যান্য সৃষ্টি এবং মানুষের মধ্যে এই দিক থেকে পার্থক্য হলো যে, সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী ও আকাশসহ সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর তাকভিনি নেযামের এমনভাবে অনুগত যে তাদের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে চলার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে তাকে সেই শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে সে আল্লাহর বিধান মেনে তাঁর বন্দেগি (বন্দেগি) ও নিয়াবতের হক আদায় করতে পারে। যে সমাজ আল্লাহর বন্দেগি গ্রহণ করে নেয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে পৃথিবীতে রাজনৈতিক নিয়াবতও দান করা হয়।

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খেলাফত দান করেছিলেন।” [১]

এখানে এই নিয়াবত সম্পর্কে ‘লাইয়াসতাখলিফান্নাহুম’ শব্দটি নিজেই বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুত এবং পছন্দনীয় সরকার মুমিন ও নেককার সমাজকে প্রদান করা হবে, তার কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে নয়। অন্য কথায়, এটি হবে ঈমানদারদের একটি যৌথ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য থাকবে না, বরং জমহুর মুসলিমিন এটি পরিচালনা করবে। এই ব্যবস্থা এবং পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো যে, সেখানে মানুষ নিজের ইচ্ছার মালিক এবং নিরঙ্কুশ স্বাধীন হয়। তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং এর সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে যা খুশি আইন ও বিধিবিধান নির্ধারণ করতে পারে, চাই তা আল্লাহর আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থীই হোক না কেন। পক্ষান্তরে একটি ঈমানী সমাজের সরকারে আল্লাহর বান্দারা নিজেদের ইচ্ছায়...

---

[১] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫।

নিজেদেরকে আল্লাহর সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের অনুসারী করে দেয়। তারা শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করার দুঃসাহস দেখায় না এবং তাদের সমস্ত নিয়ম-কানুন আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্থির করে। তারা স্বীকার করে যে, আমাদের সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমরা তাঁর বান্দা যারা তাঁর প্রতিনিধিত্বে জমিনের ব্যবস্থা সেই নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করব যা তাঁর কালাম এবং তাঁর রাসূলের বাণীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

## ইসলামী রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

কুরআন ও সুন্নাহতে ইসলামের দেওয়া মৌলিক সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো হলো:

১. সরকারের উদ্দেশ্য:

সরকারের উদ্দেশ্য হলো শরীয়ত বাস্তবায়ন করা যাতে সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়, কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অকল্যাণ রোধ করা হয়।

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ﴾

“এরা (ঈমানদাররা) এমন লোক যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে।” [১]

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখো।” [২]

২. খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য:

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফত হলো তা যা ঈমানদারদের পরামর্শের (শুরা) মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে এবং যাতে আল্লাহর হকের সাথে সাথে বান্দার হকসমূহ পুরোপুরি আদায় করা হয়, অন্যথায় তা রাজতন্ত্র ও সাধারণ সরকার।

- হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) ইসলামী ইমারত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন:

إِنَّ الْإِمْرَةَ مَا ائْتُمِرَ فِيهَا وَإِنَّ الْمُلْكَ مَا غُلِبَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ

(ইমারত হলো তা যার জন্য পরামর্শ করা হয় এবং রাজতন্ত্র হলো তা যা তলোয়ারের জোরে অর্জন করা হয়।) [৩]

- হযরত উমর (রা.) একবার হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন: “আমি কি বাদশাহ নাকি খলিফা?” তিনি বললেন: “যদি আপনি মুসলমানদের ভূমি থেকে একটি দিরহামও অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেন এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তবে আপনি বাদশাহ, অন্যথায় খলিফা।” এটি শুনে হযরত উমর (রা.) অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। [৪]

---

[১] সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪১

[২] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১১০

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৪/১১৩ ত. সাদির

[৪] “সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা.) তাকে বললেন: আমি কি বাদশাহ নাকি খলিফা? তখন সালমান (রা.) তাকে বললেন: যদি আপনি মুসলমানদের ভূমি থেকে এক দিরহাম বা তার কম বা বেশি সংগ্রহ করেন তারপর তা অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তবে আপনি বাদশাহ, খলিফা নন। তখন উমর (রা.) অশ্রু বিসর্জন দিলেন।” (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩০৬ ত. সাদির)

(৩) শুরার মৌলিক মর্যাদা:

- সরকার গঠন, আমীর নির্বাচন, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (তাদের কাজ তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।) [১]

হযরত উমর ফারুক (রা.) বলতেন: لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ (পরামর্শ ছাড়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় না।) [২]

- আরবাব-ই-হাল-ও-আকদ এবং উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ ছাড়া কারো শাসনের দাবি করা সঠিক নয়। হযরত উমর (রা.)-এর বাণী: "مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَالَّذِي بَايَعَهُ" (যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কারো হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে, তবে বাইয়াত সম্পন্ন হবে না—না বাইয়াতকারীর আর না যার হাতে বাইয়াত করা হয়েছে তার।) [৩]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফত শুরার মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার পর হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছিলেন:

"إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ بِآخَرَ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ، كَانُوا مُلُوكًا، يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رِضَى الْمُلُوكِ"

(হে আরব জাতি! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের একজন আমীর মারা গেলে তোমরা পরামর্শের মাধ্যমে অন্য একজনকে নিযুক্ত করবে। কিন্তু যখন তলোয়ারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হবে, তখন তারা বাদশাহ হয়ে যাবে। তারা বাদশাহদের মতো রাগান্বিত হবে এবং বাদশাহদের মতোই সন্তুষ্ট হবে।) [৪]

(৪) যোগ্যতার ভিত্তিতে পদাধিকারীদের নির্বাচন:

- রাজনৈতিক ও সামরিক পদের জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করা উচিত, যারা জ্ঞান, আমানতদারি এবং সততার গুণে গুণান্বিত। ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ "নবী বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে (তালুতকে) তোমাদের জন্য (আমীর) মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" [৫]

(৫) পদপ্রার্থীর নিরুৎসাহীকরণ:

- যে ব্যক্তি নিজে পদের আকাঙ্ক্ষী হয় তাকে কোনো পদ দেওয়া উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই নিয়তে আসা লোকদের বলেছিলেন:

"وَاللَّهِ لَا نُعْطِيهَا مَنْ طَلَبَهَا مِنْكُمْ"

"আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের মধ্যে এমন কাউকে এই পদ দেব না যে তা প্রার্থনা করে।" [৬]

---

[১] সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৩৮

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩২৭০৩; আল-রওদ; আস-সুনান আল-কুবরা লিল-নাসায়ী, হা: ৭১১৩

[৩] সহীহ বুখারী, হা: ৬৮৩০, কিতাবুল হুদুদ, বাব রাজমুল হুবলা

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৪৩৫৯, কিতাবুল মাগাযী, বাব যাহাব জারীর ইলাল ইয়ামান; মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হা: ৩২০২৩

[৫] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৪৭

[৬] মুসনাদ আবি দাউদ আত-তায়ালিসি, হা: ৫৩১

২. পদের আকাঙ্ক্ষা এবং তার অন্বেষণ, অন্বেষণকারী ও আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অযোগ্য হওয়ার দলিল হবে।

ইরশাদ নববী:

"إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ"

"আল্লাহর কসম! আমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে এই পদ দেই না যে তা প্রার্থনা করে বা তার আকাঙ্ক্ষা রাখে।" [১]

৩. না চেয়ে পাওয়া পদে বরকত হবে এবং পদের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত ব্যক্তিরা দায়িত্ব আরও ভালোভাবে পালন করতে পারবে।

"لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا"

"নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না। কারণ যদি তোমাকে চাওয়ার কারণে তা দেওয়া হয়, তবে তোমাকে তার ওপরই সোপর্দ করে দেওয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা দেওয়া হয়, তবে তাতে তোমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে।" [২]

শাসকদের আনুগত্য:

১. শরয়ী সীমার মধ্যে আমীর ও খলিফার প্রতিটি নির্দেশ পালনযোগ্য হবে। হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বলতেন:

"أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ"

"রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমি যেন শুনি এবং আনুগত্য করি, যদিও নির্দেশদাতা নাক-কান কাটা কোনো হাবশী গোলামই হোক না কেন।" [৩]

২. জনগণকে শাসকদের ভুল আচরণের ওপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত হয়।

ইরশাদ নববী: "যে ব্যক্তি তার শাসককে আল্লাহর নাফরমানি করতে দেখে সে যেন সেই গুনাহকে ঘৃণা করে, কিন্তু শাসকের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে না নেয়।" [৪]

একটি রেওয়ায়েতে আছে যে সাহাবীগণ আরজ করলেন: "আমরা কি তলোয়ারের জোরে এমন শাসকদের সরিয়ে দেব না?"

বললেন: "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করতে থাকে। তবে যখন তোমরা শাসকদের নাগওয়ার (অপছন্দনীয়) কাজ করতে দেখো তখন তাদের কাজের প্রতি (ঘৃণা পোষণ করো)।"

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৭১৪৯, কিতাবুল আহকাম, বাব মা ইউকরাহু মিনাল হিরসি আলাল ইমারাহ। ইসলামের সাধারণ নিয়ম ও শিক্ষা এটাই। এতে রাজনৈতিক দলাদলি, গোত্রপ্রীতি এবং সেই রেষারেষি থেকে সুরক্ষা রয়েছে যা দুনিয়ার রাজনীতিতে চলে আসছে। তবে কোনো অনিবার্য পরিস্থিতিতে যখন কেউ নিশ্চিত হয় যে এই জায়গায় আমি ছাড়া অন্য কেউ সামনে এলে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, তখন পদ প্রার্থনা করা জায়েজ। যেমন কুরআনে কারীমে আছে: "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন) আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন, নিশ্চয়ই আমি রক্ষণাবেক্ষণকারী ও এ বিষয়ে জ্ঞান রাখি। (সূরা ইউসুফ: ৫৫)। একইভাবে যেমন সালাতের জামাতের জন্য কোনো আলেম বা কারীর নিজে ইমামতির জন্য এগিয়ে যাওয়া; কিন্তু যেখানে একাধিক আলেম ও কারী উপস্থিত থাকেন এবং কোনো ইমাম আগে থেকে নির্ধারিত না থাকে, সেখানে ইমামতির জন্য নিজে অগ্রগামী হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

[২] সুনানে আবু দাউদ, হা: ২৯২৯, কিতাবুল ইমারাহ।

[৩] আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড: ৮, পৃ: ১৬০, ত: আল-ইলমিয়্যাহ।

[৪] সহীহ মুসলিম, হা: ১৮৫৪, কিতাবুল ইমারাহ, বাব খিয়ারুল আইম্মাহ ওয়া শিরারুহুম।

...ঘৃণা করো কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিও না। [১]

৭. শাসনকার্য অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব যার ওপর শাসকের মুক্তি বা ধ্বংস নির্ভরশীল:

শাসক যদি জেনেশুনে নিজের দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তার জন্য জান্নাত হারাম।

নবীজির বাণী হলো:

"مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"

"যে শাসক মুসলমানদের কোনো দলের দায়িত্বশীল হয় এবং এরপর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অবস্থায় মারা যায়, তবে আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।" [২]

৮. বিদ্রোহে লিপ্ত ব্যক্তি কঠোর শাস্তির যোগ্য:

বিদ্রোহ গুরুতর অপরাধ। শাসকের উপস্থিতিতে অন্য কোনো শাসকের বায়আত সঠিক হবে না বরং বায়আত গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়ই শাস্তির যোগ্য হবে। নবীজির বাণী হলো:

"إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا"

"যখন দুই খলিফার বায়আত করা হয়, তখন তাদের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করো।" [৩]

৯. ইজতিহাদী ভুল ক্ষমাযোগ্য:

সরাসরি দলিলবিহীন মাসআলা বা মুবাহ বিষয়সমূহের কোনো একটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শাসকের পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত প্রশাসনিক ত্রুটির জন্য কোনো গুনাহ হবে না যতক্ষণ না সে নিজে সঠিক ফয়সালার চেষ্টা করে।

"إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ"

"যখন শাসক সঠিক ইজতিহাদ করে তখন সে দ্বিগুণ সওয়াব পায়। আর যদি ইজতিহাদে ভুল করে তবে একটি সওয়াব পায়।" [৪]

১০. শাসকদের সংশোধন। আহলে ইলমদের দায়িত্ব:

আহলে ইলমদের দায়িত্ব হলো তারা শাসকদের ভুলত্রুটির ব্যাপারে সতর্ক করবেন এবং তাদের সংশোধন করবেন। হাদীসে আছে:

"ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ بَرِئَ"

"এরপর পরবর্তীতে এমন সব খলিফা আসবে যারা অজ্ঞতার সাথে আমল করবে এবং এমন কাজ করবে যার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, যে..."

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ৩৯১০, কিতাবুল ইমারাহ, অধ্যায়: উত্তম ও অধম ইমামগণ।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৭১৫১, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়: যাকে প্রজাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ৩৯০৫, কিতাবুল ইমারাহ, সংক্ষেপিত, দারুল জীল... বাহ্যিকভাবে এই বর্ণনা ইসলামের সহনশীলতা ও উদারতার পরিপন্থী মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশে বিদ্রোহী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে শাস্তি দিয়ে সময়মতো বিদ্রোহ দমন করার এবং পুরো দেশকে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচানোর হিকমত নিহিত রয়েছে।

[৪] আল-মুনতাকা মিনাস সুনানিল মুসনাদাহ লি ইবনি জারুদ, হা: ৯৯৬, ত: মুয়াসসাসাতুল কিতাব।

সে ঐ লোকদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে গেল। [১]

এটিও নববী ফরমান:

“তোমাদের উপর এমন সব শাসক চাপিয়ে দেওয়া হবে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারবে এবং তাদের সমালোচনা করবে। যে ব্যক্তি (তাদের মন্দ কাজকে অন্তর থেকে) মন্দ মনে করল সে নিরাপদ থাকল। যে ব্যক্তি (মৌখিকভাবে) সমালোচনা করল সেও রক্ষা পেল। তবে যে ব্যক্তি (মন্দ কাজে মনে মনে) সন্তুষ্ট থাকল এবং (তাদের মন্দ কাজে) অনুসরণ করল (সে ধ্বংস হয়ে গেল)।” [২]

খিলাফতে রাশেদার সোনালী যুগে এই সমস্ত ইসলামী মূলনীতিগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পুরোপুরি কার্যকর ছিল এবং এগুলোর অনুসরণের কারণে মুসলিম সমাজ ঈমান ও আমল এবং জ্ঞান ও নৈতিকতার চরম শিখরে ছিল।

---

[১] সহীহ ইবনে হিব্বান, হা: ৬৬৬০

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ৪৯০৭, কিতাবুল ইমারাহ, বাব: উমারাদের (শাসকদের) অন্যায়ের প্রতিবাদ করার আবশ্যকতা, ত: দারুল জীল

https://t.me/BoierSomahar

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে মুসলিম বিশ্ব

৩২ হিজরি পর্যন্ত মদিনা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এক-তৃতীয়াংশ শতাব্দী পার করেছিল। এই পুরো সময়ে রাষ্ট্রের পুরো ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হতো। হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছিলেন। এই সরকারের গঠন ও বৈশিষ্ট্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রধান ছিল:

(১) শুরাইয়াত (পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা):

ইসলামী খিলাফতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মজলিসে শূরা, যা হযরত উমর ফারুক (রা.) সংগঠিত করেছিলেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এর ক্ষমতা ও কার্যকারিতায় কোনো ঘাটতি আসেনি, বরং একদিক থেকে এর সক্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ হযরত উসমান (রা.)-এর কোমল স্বভাবের কারণে সবাই নিজের মতামত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করার পূর্ণ সুযোগ পেত। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একমাত্র খলিফা যাঁর খিলাফতের ঘোষণা মজলিসে শূরার সর্বোচ্চ পর্যায়ের ছয়জন ব্যক্তির কাউন্সিলের মাধ্যমে হয়েছিল, তাই তাঁর যুগে মজলিসে শূরা অত্যন্ত ক্ষমতাধর ও অত্যন্ত তৎপর ছিল।

(২) ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতিমালা:

নতুন খলিফা নির্বাচনে শূরার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শূরার সদস্য নির্বাচনে ইসলামে খেদমত এবং নববী সাহচর্যের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। হযরত উমর ফারুক (রা.) খলিফাদের নিয়োগের ব্যাপারে এই নীতিমালা নির্ধারণ করেছিলেন:

“খিলাফতের বিষয়টি বদরী সাহাবীদের জন্য থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকে। এরপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকবে যতক্ষণ তাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকে। এরপর অমুক অমুক যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের জন্য। তুলাকা (মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী), তাদের সন্তান এবং মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের খিলাফতে কোনো অংশ নেই।” [১]

(৩) পদাধিকারীদের নিয়োগ:

প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা এবং গভর্নরদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা খলিফার কাছে থাকত। বিভিন্ন শহর ও প্রদেশে আমিল এবং কর্মকর্তাদের নিয়োগ সর্বদা চরিত্র, যোগ্যতা, ইলমি সক্ষমতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার ভিত্তিতে হতো। পরহেজগার, আমানতদার, সাহসী এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হতো। নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই দেখা হতো যে আমিল যেন নির্ভরযোগ্য হন, উম্মতে মুসলিমার কল্যাণকামী হন এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর সম্মান থাকে। এজন্য উচ্চপদগুলোর জন্য সাহাবায়ে কেরামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো যারা এই গুণাবলীতে সুসজ্জিত ছিলেন।

---

[১] আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রা.) বলেছেন: “এই বিষয়টি (খিলাফত) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য, যতক্ষণ তাদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকে। তারপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য, যতক্ষণ তাদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকে। আর অমুক অমুকদের জন্য। এতে তুলাকা (মক্কা বিজয়ের দিন মুক্তপ্রাপ্ত), তুলাকাদের সন্তান এবং মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারীদের কোনো অংশ নেই।” (তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/১৮২; জামিউল আহাদিস লিস-সুয়ূতী, হা: ২১৫৬৮; কানযুল উম্মাল, হা: ১৪০৩৬; এবং হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে এর তাখরীজ করেছেন: ১৩/২০৮)।

৪. বদলি ও বরখাস্ত:

এটা জরুরি ছিল না যে কাউকে উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়ার পর তাকে স্থায়ীভাবে সেখানে বহাল রাখা হবে। জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে অনেক সময় কর্মকর্তাদের পরিবর্তনও করা হতো। এক খলিফার নিযুক্ত আমিলদের অন্য খলিফা চাইলে বহাল রাখতে পারতেন, কিন্তু যদি কারও দীর্ঘ মেয়াদে নিয়োগ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে হতো, তবে তাকে বরখাস্তও করা হতো। নিয়োগ ও বরখাস্তের আদেশ বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবীদের ওপরও জারি হতো, কিন্তু উম্মতে মুসলিমার কল্যাণকামনার চেতনা এবং খেলাফতের প্রতি সম্মান এমন ছিল যে, কেউ কখনো একে নিজের অহংকারের বিষয় বানাননি। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার পরে আমার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের এক বছরের বেশি মেয়াদে বহাল রাখা না হয়, কেবল হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত। তাকে আরও চার বছর এই পদে থাকতে দেওয়া হোক। [১] হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে অনুযায়ী আমল করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এরপর পুনরায় কুফার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনিও নিজের বরখাস্তের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেননি।

৫. কেন্দ্রীয় পদসমূহ:

প্রদেশগুলোতে কেন্দ্রীয় পদ ছিল চারটি:

- আমিল (গভর্নর)
- কাতিবে দিওয়ান (সেক্রেটারি) যিনি দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করতেন।
- ওয়ালীয়ে বায়তুল মাল (অর্থমন্ত্রী)
- আমিলে খারাজ (রাজস্ব মন্ত্রী - কালেক্টর) যিনি জমির ওপর খাজনা নির্ধারণ ও আদায় করতেন।

এই চারজন কর্মকর্তার প্রত্যেককে খলিফাগণ নিজে নিয়োগ দিতেন এবং তারা সকল বিষয়ে সরাসরি খলিফার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন। [২]

৬. আমিলের দায়িত্বসমূহ:

আমিলদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তারা একই সাথে সেনাপতি এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও শাসনের স্তম্ভ ছিলেন। নিজ এলাকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সামরিক কমান্ড উভয়ই তাদের অধীনে ছিল। তাদের নিজস্ব শুরা (পরামর্শ সভা) ছিল যেখানে সকল বিষয়ে আলোচনা হতো। জনগণের সমস্যা শোনার জন্য আদালত বসত। খাল খনন, সেতু নির্মাণ, কারাগার ব্যবস্থাপনা, নতুন শহর, বাজার এবং মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবাসন এবং কৃষিকাজের জন্য জমি বরাদ্দ—এই সব কাজ তাদের জিম্মায় ছিল। সীমান্তে শত্রুদের হাত থেকে প্রতিরক্ষা, তাদের অবস্থা ও সংকল্পের সংবাদ সংগ্রহ, দুর্গ শক্তিশালীকরণ, সেনাবাহিনীতে নিয়োগ ও প্রস্তুতি, বালকদের সামরিক প্রশিক্ষণ (যাতে ঘোড়সওয়ারি, তীরন্দাজি এবং সাঁতারের অনুশীলন বাধ্যতামূলকভাবে করানো হতো) তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/৩৯১, ত আল-রিসালাহ

[২] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৫৩ থেকে ১৫৬

শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার জন্য খেলাফতের দরবার থেকে অনুমতি নেওয়া জরুরি ছিল, তবে যদি নিজের সীমান্তে আগ্রাসন হতো তবে গভর্নর খলিফাকে জিজ্ঞাসা না করেই দেশ রক্ষায় বাধ্য ছিলেন। [১]

এই দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে আমিলদের জীবনধারণের জন্য সম্মানজনক বেতন দেওয়া হতো যাতে তারা জীবিকার চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে জনগণের সেবা করতে পারেন। বেতনের উচ্চ স্কেল বার্ষিক দুইশ দিনার পর্যন্ত পৌঁছে যেত। [২]

কখনো কখনো অর্থ বিভাগও গভর্নরের ওপর ন্যস্ত থাকতো, যেমন সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং জর্ডানে হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রা.) আর্থিক বিষয়ের হিসাব-নিকাশ নিজেই করতেন। কিন্তু সাধারণত বায়তুল মাল এবং রাজস্ব বিভাগ গভর্নরের এখতিয়ারের বাইরে থাকতো। ফলে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) যখন কুফার আমিল ছিলেন, তখন প্রাদেশিক কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। [৩] যখন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) কুফার আমিল হলেন, তখন খারাজ আদায়ের দায়িত্ব ছিল হযরত উসমান বিন হুনাইফ (রা.)-এর ওপর। [৪]

**৭) আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা:**

গভর্নরকেও বায়তুল মাল থেকে কিছু নিতে হলে তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হতো। অর্থের লেনদেনের ক্ষেত্রে বড় থেকে বড় ব্যক্তিত্বকেও ছাড় দেওয়া হতো না। এক এক দিরহামের হিসাব রাখা হতো যাতে মুসলমানদের সরকারি কোষাগারের একটি অণু পরিমাণও নষ্ট না হয়। যদি ভুলবশতও অর্থের হিসেবে গরমিল হতো তবে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো এবং কখনো কখনো খলিফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। হযরত উসমান (রা.)-ও এই বিষয়ে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না।

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), যিনি কুফার আমিল ছিলেন, প্রাদেশিক বায়তুল মাল তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কোষাগার থেকে কিছু অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে নিজের আর্থিক অবস্থার প্রতিকূলতার কারণে তিনি নির্ধারিত সময়ে এই অর্থ বায়তুল মালে ফেরত দিতে পারেননি। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর তাগাদা সত্ত্বেও যখন গভর্নর পরিশোধ করতে পারলেন না, তখন খলিফাকে অবহিত করা হলো। হযরত উসমান (রা.) হযরত সাদ (রা.)-এর মর্যাদা ও অবস্থান সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে তাকে বরখাস্ত করাই শ্রেয় মনে করলেন যাতে জনগণের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে না পড়ে যে, শাসকরা নিজেদের পদ ব্যবহার করে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করছেন। [৫]

উপরের এই প্রভাব নিচ পর্যন্ত পড়ত। তাই কর্মকর্তাদের এবং অধস্তনদের মধ্যেও সততা ও আর্থিক সতর্কতা সাধারণ বিষয় ছিল। কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে সততার উপদেশ বারবার দেওয়া হতো। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের শেষ বছর এক রণাঙ্গনে যুদ্ধরত কুলাইব জারমি (রা.) তার পুত্রকে নিজের ঘটনা এভাবে শোনাতেন:

---

১. আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ১১৭, ১১৮

২. আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ১৩০

৩. তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৩৯

৪. আল-খারাজ লিল-কাজি আবি ইউসুফ রহ., পৃ. ২৬

৫. আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৩৫৬/২

“আমরা ‘তৌজ’ অবরোধ করলাম। বনী সুলাইমের মুজাশে বিন মাসউদ (রা.) আমাদের আমীর ছিলেন। দুর্গটি বিজিত হলো। আমার জামাটি ছিল অত্যন্ত জীর্ণ ও পুরনো। আমি একজন অনারবের লাশের দিকে এগিয়ে গেলাম, তার কামিজটি খুললাম, সেটি পাথরের ওপর রেখে ভালো করে ঘষলাম, ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পরিধান করলাম। এরপর সুঁই-সুতা সংগ্রহ করলাম এবং একটি গ্রামে গিয়ে নিজের জামাটি সেলাই করালাম। এই সময়ে লশকর-প্রধান মুজাশে বিন মাসউদ দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন: ‘হে লোকসকল! গনিমতের মাল থেকে কোনো কিছু আত্মসাৎ করো না। যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে সেই জিনিসসহ উপস্থিত হবে, এমনকি তা যদি একটি সুতাও হয়।’ এটি শোনামাত্রই আমি সেই কামিজটি খুলে ফেললাম। এরপর নিজের জামাটিও ছিঁড়তে শুরু করলাম। হে বৎস, আল্লাহর কসম! আমি পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করলাম যেন একটি সুতাও ছিঁড়ে না যায়। এরপর গনিমতের মাল থেকে নেওয়া সেই কামিজ, সেই সুতা এবং সেই সুঁই—সবকিছু সেখানেই ফেরত দিয়ে আসলাম।” [১]

**৮. নির্দেশনা ও শাসন সম্বলিত পত্রাবলি:**

খলিফাদের পক্ষ থেকে গভর্নরদের নামে বিশেষ নির্দেশনাও সময়ে সময়ে জারি করা হতো এবং সাধারণ উপদেশনামা বা বিজ্ঞপ্তি (সার্কুলার) পাঠানো হতো। হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের শুরুতে গভর্নরদের প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল: “আল্লাহ শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা রক্ষক হয়, তাদের ট্যাক্স আদায়কারী হওয়ার নির্দেশ দেননি। সেই সময় দূরে নয় যখন তারা ট্যাক্স আদায়কারী হয়ে যাবে, রক্ষক থাকবে না। তখন লজ্জা, আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইনসাফের রীতি হলো এই যে, সর্বদা মুসলমানদের বিষয়াবলির ওপর নজর রাখা যে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার কী, তাদের অধিকার আদায় করো এবং দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করো, জিম্মিদের অধিকার আদায় করো এবং তাদের ওপর যা ধার্য আছে তা আদায় করো।” [২]

**৯. রাষ্ট্রের বিভাজন... কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর যোগাযোগ:**

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদেশগুলো মক্কা, মদিনা, বাহরাইন, ইয়েমেন, সিরিয়া, কুফা, বসরা এবং মিসরের ওপর مشتمل ছিল; আফ্রিকা মিসরের অধীনে ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে যখন আরমেনিয়া বিজিত হলো, তখন অনেকগুলো এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হলো। গভর্নরদের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করা হতো। হযরত উমর ফারুক (রা.) এই উদ্দেশ্যে দুই-তিনবার নিজে সিরিয়া সফর করেছিলেন। হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা.) প্রায়ই হজের জন্যও যেতেন, সেখানে গভর্নরদের পাশাপাশি সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে সাধারণ সমাবেশে সাক্ষাৎ হতো, মানুষকে তাদের অভিযোগ বর্ণনা করার সুযোগ দেওয়া হতো। [৩]

**১০. বাণিজ্যিক বিভাগ:**

আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বাণিজ্যিক বিভাগের বিশেষ দেখাশোনা করা হতো। হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.) নিজেরাও পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতেন। ভেজাল, মজুদদারি এবং অবৈধ পদ্ধতি...

---

[১] মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, খণ্ড: ৩৩৮২৮

[২] তারিখুত তাবারী: ৪/২৪৪, ২৪৫

[৩] আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃষ্ঠা: ১১৮, ১১৯

...থেকে সম্পদ উপার্জনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল, সুদি লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, মদ্যপানের মতো মদ বিক্রির ওপরও পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। বাজারে ব্যবসার জন্য বসার আগে ব্যবসার বিধানসমূহ শেখা আবশ্যক ছিল। [১]

(১১) নিযাম-ই-কাফালাত - ইদারাতুল উরাফা:

খিলাফত ব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল "আল-উরাফা", যা প্রজাদের ভরণপোষণ, জনপ্রতিনিধিত্ব এবং জাতীয় শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম উদাহরণ ছিল। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রজাদের প্রতিটি বড় সমাবেশ যেমন সেনাবাহিনী, কোনো শহরের জনসংখ্যা বা কোনো গোত্রের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে দশজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো, তাদের প্রত্যেককে "আরিফ" বলা হতো এবং তাদের দশ-দশজন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব ও তাদের অবস্থা দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করা হতো। এই অধীনস্থ ব্যক্তিরা একইভাবে আরও দশ-দশজন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের দায়িত্বশীল হতেন এবং তারা আরও দশ-দশজনের। এই ধারা চলতে থাকত, এভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত নারী ও শিশুসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের একটি সূত্রে গেঁথে যেত।

সরকারের যখন নতুন মুজাহিদদের প্রয়োজন হতো, তখন গোত্র বা শহরের "আরিফ" তৎক্ষণাৎ খবর নিচে পৌঁছে দিয়ে এই প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। সরকারি ঘোষণাগুলো এভাবেই প্রচারিত হতো। কোনো দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিকে নিজের ফরিয়াদ পৌঁছাতে হলে সে তার "আরিফ"-কে বলে দিত। সমস্যাটি তৎক্ষণাৎ উপরে পৌঁছে যেত এবং তার অভিযোগ দূর করা হতো। সরকারি কোষাগার ও বার্ষিক ভাতাগুলোও উরাফাদের মাধ্যমে বণ্টিত হতো এবং প্রত্যেক নাগরিক কোনো দৌড়ঝাঁপ ছাড়াই ঘরে বসে নিজের অংশ পেয়ে যেত। [২]

(১২) বিচার বিভাগ:

বিচার বিভাগ অত্যন্ত সক্রিয় ও ক্ষমতাধর ছিল। জনগণ তাৎক্ষণিক বিচার পেত, অধিকাংশ শহরে আমিলদের কাজির ক্ষমতাও অর্পণ করা হতো, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম এবং কিছু তাবেয়ী যারা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। যেহেতু চারদিকে শান্তি ও স্বস্তির রাজত্ব ছিল, তাই কাজির কাছে দু-একটি মামলা আসত, যা তারা দেরি না করে নিষ্পত্তি করে দিতেন। কিছু স্থানে আলাদাভাবে কাজি নিযুক্ত করা হতো, যেমন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কুফায় হযরত কাব বিন সুর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এই পদে নিযুক্ত করেছিলেন। [৩]

সাধারণত কাজি সাহেবগণ নিজেদের ঘরে বা মসজিদে মামলা শুনতেন এবং রায় দিতেন। আদালতের জন্য আলাদা কোনো ভবন ছিল না। [৪] এর কারণ ছিল এই যে, মামলা খুব কম আসত এবং সাধারণত তাৎক্ষণিক শুনানিতেই ফয়সালা হয়ে যেত। সাইয়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মদিনা তাইয়্যেবার কাজি ছিলেন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু, দুই বছরে তাঁর কাছে একটি মামলাও আসেনি। [৫] হযরত মালহান বিন রাবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কুফার কাজি নিযুক্ত হলে তিনি অবসরই বসে থাকতেন। তাঁর এক বন্ধু বলেন: "আমি চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন তাঁর কাছে যেতাম, কখনো কোনো মামলা তাঁর কাছে আসেনি।" [৬]

---

[১] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ১৩১, ১৩৮

[২] তারিখুত তাবারী: ৩/৩৮, ৩৯

[৩] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৭৯

[৪] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ১৮৯

[৫] তারিখুত তাবারী: ৩/৩২৬

[৬] উসদুল গাবাহ, তরজমা: মালহান বিন রাবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু

কাজীদের বেতন ছিল সম্মানজনক যাতে তারা ঘুষ গ্রহণের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং কাজী শুরাইহ (রা.)-এর মাসিক বেতন ছিল একশ একশ দিরহাম। [১]

**১২. ব্যক্তিগত জীবনে অনর্থক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা:**

যদিও আইন তার নিজ স্থানে অনমনীয় ছিল এবং বিচারাধীন মামলাগুলোতে কাউকে অনর্থক ছাড় দেওয়া হতো না, তবে সরকার জনগণের ব্যক্তিগত জীবনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হস্তক্ষেপ করে তাদের দোষত্রুটি, গোপন গুনাহ এবং আইন লঙ্ঘনের অনুসন্ধান চালানোর পক্ষপাতী ছিল না। বরং খলিফাদের পক্ষ থেকে কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করা হতো যে, যদি কারো গোপন গুনাহের কথা জানা যায়, তবে তা যেন গোপন রাখা হয় এবং চেষ্টা করা হয় যাতে গুনাহগার লজ্জিত হয়ে তওবা করে নেয়। সমাজে যেন সেই গুনাহ সংঘটনের শোরগোল না ছড়ায়। [২]

হযরত উমর (রা.)-এর সময় থেকে পুরো ইসলামী রাষ্ট্রে কর্মকর্তাদের প্রতি এই নির্দেশনা ছিল:

“মানুষকে সেই সব গুনাহ প্রকাশ করতে বলো না যেগুলোর ওপর পর্দা পড়ে আছে। হ্যাঁ, যখন মানুষ কোনো বিষয় আদালতে নিয়ে আসবে, তখন সরকারকে কোনো শিথিলতা ছাড়াই শাস্তির আইন কার্যকর করতে হবে।” [৩]

**১৩. আয়ের উৎসসমূহ:**

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় থেকে সরকারের আয়ের উৎস ছিল জাকাত, উশর, জিজিয়া, খারাজ এবং গনিমতের মাল। জাকাত মুসলমানদের নির্দিষ্ট সম্পদ যেমন সোনা, রুপা, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদির ওপর ধার্য হতো। এর হার ছিল আড়াই শতাংশ। উশরও মুসলমানদের ওপর ফরজ ছিল যা কৃষি ও খনিজ উৎপাদন থেকে নেওয়া হতো, এর হার ছিল পাঁচ থেকে দশ শতাংশ পর্যন্ত।

জিজিয়া এবং খারাজ অমুসলিমদের ওপর ধার্য হতো। খারাজ ছিল কৃষি উৎপাদনের খাজনা যার হার কোনো এলাকা বিজয়ের সময় স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে মিলে নির্ধারণ করা হতো, যেমন আজারবাইজানের অমুসলিমরা বার্ষিক ৮০ লক্ষ দিরহাম খারাজ প্রদান করত। জিজিয়া ছিল সেই অর্থ যা প্রত্যেক অমুসলিম নাগরিক সরকারের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে পরিশোধ করত। এই ট্যাক্সের হার ছিল অত্যন্ত সামান্য অর্থাৎ ধনীদের ওপর আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের ওপর চব্বিশ দিরহাম এবং দরিদ্রদের ওপর বারো দিরহাম বার্ষিক। (সময়ের প্রেক্ষাপটে এতে কমবেশি হতো)

অমুসলিমদের ওপর এছাড়া অন্য কোনো প্রকার ট্যাক্স ছিল না এবং এটিও বছরে মাত্র একবার পরিশোধ করতে হতো। যে অমুসলিম একেবারেই নিঃস্ব হতো, তার জিজিয়া মাফ করে দেওয়া হতো। এসব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের খলিফাগণ অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে, হযরত উমর (রা.) ইন্তেকালের পূর্বে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই অসিয়ত করেছিলেন:

---

[১] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ৪৭১। আজকের দিনের হিসাবে এটি প্রায় পঁচিশ হাজার রুপি হয়। যদি সেই সময়ের পণ্যের সস্তাদর এবং সভ্যতার সরলতাকে সামনে রাখা হয়, তবে এটি একটি বড় অংকের অর্থ ছিল যা একটি পরিবারকে সচ্ছল রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল।

[২] কিতাবুল উম্ম লিল ইমাম শাফেয়ী: ৬/১৬৯, ত. আল-মা’রিফাহ

[৩] মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হা: ১৭৯৩১, ত. আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান

“জিম্মিদের সাথে ভালো আচরণ বজায় রাখা হোক, তাদের সাথে করা চুক্তিগুলো মেনে চলা হোক, তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হোক এবং তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর আরোপ না করা হোক।”

শত্রুর ওপর তলোয়ারের জোরে বিজয় অর্জনের সময় যে ধন-সম্পদ হস্তগত হতো, তাকে ‘গনাইম’ বা ‘মাল গনিমত’ বলা হতো। এর আশি (৮০) শতাংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করা হতো এবং বিশ শতাংশ (বা এক-পঞ্চমাংশ) বাইতুল মালে জমা করা হতো। [১]

**(১৫) কৃষি উন্নয়ন - আর্থিক সমৃদ্ধি:**

আয়ের এই সীমিত উৎস থাকা সত্ত্বেও ইসলামী সরকার আর্থিকভাবে অত্যন্ত স্থিতিশীল ছিল। কৃষি অঞ্চলগুলোতে নতুন খাল খনন করে দূর-দূরান্তের জমিগুলোকে সবুজ ও সজীব করে তোলা হয়েছিল। বসরার নাগরিকদের মিষ্টি পানি সরবরাহের জন্য দজলা নদী থেকে নয় মাইল (সাড়ে ১৪ কিলোমিটার) দীর্ঘ খাল খনন করে শহর পর্যন্ত আনা হয়েছিল। [২]

কখনো কোনো প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্য প্রদেশের উদ্বৃত্ত উৎপাদন সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর যুগে মদিনায় দুর্ভিক্ষের সময় খলিজে আয়লা থেকে লোহিত সাগরে নৌকা পাঠানো হয়েছিল, যা খাদ্যশস্য মদিনার নিকটবর্তী বন্দর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। [৩]

জমিদার ও কৃষকরা তাদের পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পেতেন, তাই তারা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে চাষাবাদ করতেন। বৃষ্টি প্রায়ই সময়মতো হতো। রাজস্ব কর্মকর্তারা অত্যন্ত সৎ ছিলেন, তাই অর্থের কোনো তছরুপ হতো না। ফলাফল এই ছিল যে, প্রতি বছর বাইতুল মালে কোটি কোটি দিরহাম জমা হতো। [৪]

**(১৬) বাইতুল মালের ব্যয়সমূহ:**

সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া সম্পদ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার ব্যয়ের খাতগুলোতে খরচ করা হতো। জাকাতের অর্থ দরিদ্র, এতিম, বিধবা, মুসাফির, শিক্ষার্থী এবং মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। অন্যান্য সম্পদ দেশের প্রতিরক্ষা, প্রজাদের প্রয়োজন এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতনের জন্য ব্যয় করা হতো। জনকল্যাণমূলক কাজ অর্থাৎ রাস্তা, সেতু, খাল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা এবং নতুন শহর নির্মাণের জন্যও বার্ষিক বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হতো। [৫]

খুলাফায়ে রাশেদিন সরকারি সরঞ্জাম এবং বাইতুল মালের অর্থ সঠিক খাতে ব্যয় করার এবং তা নষ্ট হতে না দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। নিজেদের জন্য নির্ধারিত সামান্য ভাতা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যখন ইন্তেকাল হয়, তখন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদে কোনো দিনার বা দিরহাম ছিল না। একজন খাদেম এবং একটি উটনী ছাড়া...

---

[১] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ১৮৫ থেকে ১৯০

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৩৭, ত. আল-হিলাল

[৩] তারিখুল মদিনা ইবনে শাব্বাহ: ২/৭৪৫

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৬৬, ত. আল-হিলাল

[৫] তারিখুত তাবারি: ৩/২৫৬; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ২৬৯, ২৭১, ৩৪৭ থেকে ৩৫০, ৩৫৫, ত. আল-হিলাল

কোনো সরকারি জিনিসও আপনার ব্যবহারে ছিল না। এই দুটি জিনিসের ব্যাপারেও তিনি অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, অবিলম্বে পরবর্তী খলিফার কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। [১]

হযরত উমর (রা.) সাধারণত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বায়তুল মাল থেকে উন্নত মানের কাপড় বিতরণ করতেন এবং মুহাজিরদের অগ্রাধিকার দিতেন, কিন্তু নিজের ছেলে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-কে পেছনে রাখতেন এবং তাকে সাধারণ কাপড়ের যোগ্য মনে করতেন। [২] তিনি (রা.) বলতেন, যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি উটও নষ্ট হয়, তবে আমার ভয় হয় যে আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। [৩]

**হারামাইন শরিফাইন এবং মাসজিদসমূহের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ:**

খুলাফায়ে রাশেদিন পবিত্র স্থানসমূহ: হারামাইন শরিফাইন এবং কিবলা-এ-আউয়ালের খিদমত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সর্বদা সজাগ ছিলেন। এর আগে মাসজিদ নববী মাটির তৈরি ছিল, ছাদ ছিল খেজুরের ছালের এবং খুঁটিগুলো ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের। [৪]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মাসজিদ নববীর ওপর খেজুরের ডাল দিয়ে নতুন ছাদ নির্মাণ করান। [৫] হযরত উমর ফারুক (রা.) মাসজিদের আয়তন বৃদ্ধির জন্য হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর ঘর এতে অন্তর্ভুক্ত করে দেন। [৬] কাঁচা ইট দিয়ে নতুন দেয়াল তৈরি করান, মাসজিদুল হারামেও নির্মাণের কাজ করান। মাকামে ইব্রাহিম বায়তুল্লাহর সাথে লেগে ছিল, যার ফলে তাওয়াফকারীদের অসুবিধা হতো। হযরত উমর ফারুক (রা.) এটিকে সরিয়ে দূরে সরিয়ে দেন এবং এর চারপাশে বেষ্টনী স্থাপন করেন। [৭]

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে মাসজিদুল হারামে অসাধারণ সম্প্রসারণ হয়। [৮] মাসজিদ নববীতে হযরত উমর (রা.)-এর সম্প্রসারণ ও মেরামত সত্ত্বেও মাসজিদের অবয়ব সেই প্রাচীনই ছিল। হযরত উসমান (রা.) মাসজিদটিকে উন্নত পদ্ধতিতে নতুন করে নির্মাণ করান। চুন ও পাথরের মজবুত দেয়াল তৈরি করান যাতে খোদাই ও কারুকার্য করা হয়েছিল। সেগুন কাঠের টেকসই ছাদ দেওয়া হয়। আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। [৯] এই কাজ ২৯ হিজরির রবিউস সানি থেকে ৩০ হিজরির মহরম পর্যন্ত দশ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়, যার পর মাসজিদের দৈর্ঘ্য ২৩০ ফুট এবং প্রস্থ ২২৫ ফুট হয়ে যায়। দক্ষিণ দিকে মেহরাবে নববীর সামনে নতুন মেহরাব নির্মাণ করা হয় যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। [১০]

মাসজিদসমূহের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে সেগুলোকে নেক আমলের মাধ্যমে আবাদ করার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হতো। হারামাইন শরিফাইন এবং...

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৯২, তাবা সাদির

[২] আল-আমওয়াল লি ইবনে জানজুয়াহ: ২/৫৫১, তাবা মারকাজুল মালিক ফয়সাল

[৩] “লাও মাত্তা জামলুন দিয়াআন আলা শাত্তিল ফুরাতি লাখাশিতু আন ইয়াসআলানিল্লাহু আনহু” (তারিখুত তাবারি: ২/৫৬৬, তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/৩০৫)

[৪] সহিহ আল-বুখারি, হা: ৪৪৬, কিতাবুস সালাত, বাবু বুনইয়ানিল মাসজিদ

[৫] আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃ. ৩০৭, ৩৯৬

[৬] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৪৫১, কিতাবুস সালাত, বাবু ফি বিনাইল মাসাজিদ

[৭] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/২২০, তাবা সাদির

[৮] তারিখুত তাবারি: ৩/২৫১

[৯] সহিহ আল-বুখারি, হা: ৪৪৬, কিতাবুস সালাত, বাবু বুনইয়ানিল মাসজিদ

[১০] তারিখু মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদিল হারাম ওয়াল মাদিনাতুশ শরিফাহ লি ইবনে দিয়া আল-মাক্কি, পৃ. ৩৮১

কুফা, বসরা এবং মিশরের ফুসতাতের নবনির্মিত বিশাল ও প্রশস্ত জামে মসজিদগুলো কেবল মুসল্লিদের দ্বারাই পূর্ণ থাকত না, বরং সেগুলো জিকির ও ইবাদত, ইলম ও মা'রিফাত, ওয়াজ ও নসিহত এবং মুসলমানদের পারস্পরিক মিলনের কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত হতো। আদালতের রায় এবং সরকারি নির্দেশসমূহও এখানেই শোনানো হতো। [১]

**১৮) তরুণদের যোগ্যতার পরীক্ষা:**

গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো প্রবীণ সাহাবীদের কাছে থাকত, কিন্তু এর পাশাপাশি নতুন রক্তকেও পরীক্ষা করা হতো এবং তরুণদের মেধা প্রকাশের সুযোগ প্রদান করা হতো। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুফার আমিল নিযুক্ত করেন এবং মিশরে আবদুল্লাহ বিন আবি সারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাঁকে পুরো প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দেন। এই তরুণরা ইসলামী বিজয়ের পরিধি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। [২]

---

[১] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ. ২৯৯, ৩০০।

[২] এই বিজয়গুলোর বিবরণ ফারুকী যুগ এবং উসমানী যুগের অধীনে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

https://t.me/BoierSomahar

## খিলাফতে রাশিদাতে ইলমি তৎপরতা

সেই কল্যাণ ও বরকতের যুগে শিক্ষামূলক তৎপরতা তুঙ্গে ছিল। উচ্চ মর্যাদা তাকেই দেওয়া হতো যে ইলমে (জ্ঞানে) বিশিষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী আকরাম (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় প্রায় পনের বছর বয়সের ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহর অধিক ইলম অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু ইলমি উদ্দীপনার অবস্থা এই ছিল যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একজনের পর একজনের কাছে গিয়ে হাদীস মুখস্থ করতেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের বড় আলেমদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলেন এবং তাঁর চারপাশে ইলমের পিপাসুদের ভিড় জমে গেল [১] আর এই কারণেই তিনি হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মজলিসে শূরার বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের কাতারে শামিল হলেন, অথচ তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ-বাইশ বছর। [২]

হযরত উমর (রা.) মুসলমানদেরকে কিশোর বয়সেই শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়ার উৎসাহ দিয়ে বলতেন:
“সরদার হওয়ার আগে ইলম অর্জন করো।” [৩]
এর অর্থ ছিল যে, ইলম অর্জন করলে তবেই কিছু হতে পারবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, কর্মজীবনে পদার্পণ করার এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে ইলম অর্জন করে নাও, অন্যথায় পরে সময় বের করা কঠিন হবে।

ইলমি তৎপরতার বিভিন্ন শাখা ও বৈচিত্র্যময় দিকগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

(১) কুরআন মাজীদের হিফাজত:
সবচেয়ে বেশি জোর ছিল কুরআন মাজীদের শব্দের হিফাজত, এর সঠিক তিলাওয়াত এবং এর অর্থ বোঝার ওপর। হুজুর (সা.)-এর পবিত্র বাণী: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা শিক্ষা দেয়” সবার সামনে ছিল। [৪] শব্দের হিফাজতের ক্ষেত্রে সিদ্দিকী যুগে যে কাজ হয়েছে, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত ইবনে শিহাব যুহরীর বর্ণনা অনুযায়ী তার সারসংক্ষেপ এই যে, ইয়ামামার যুদ্ধে ক্বারী সাহাবীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহীদ হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আশঙ্কা বোধ করেছিলেন যে, হাফেজদের চলে যাওয়ার ফলে কুরআনের হিফাজতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, কারণ সেই সময় পর্যন্ত নির্ভরতা ছিল কুরআন হিফজ করার ওপর এবং পূর্ণাঙ্গ মাসহাফ (লিখিত কপি) বিদ্যমান ছিল না। তখন তাঁর নির্দেশে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)...

---

[১] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৬৩৯৩

[২] উসদুল গাবাহ, আল-ইসতিয়াব, জীবনী: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

[৩] উমর (রা.)-এর উক্তি: تفقهوا قبل ان تسودوا (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড: ২৬১১৬, ত: আর-রুশদ)

[৪] সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড: ৫০২৭, কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন

কুরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াতকে পূর্ণ সতর্কতার সাথে একত্রিত করেছেন এবং একটি সত্যায়িত সংকলন প্রস্তুত করেছেন। [১]

**(২) হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের অভিযান:**

এই সিলসিলায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন হযরত উসমান গনি (রা.), যিনি উম্মতকে কুরআন মাজীদের একটি পাণ্ডুলিপি এবং একটি লিখনশৈলীর (রসমুল খত) ওপর ঐক্যবদ্ধ করেছেন। তাঁর মনে এই পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা তখন আসে যখন আজারবাইজান সীমান্তে জিহাদরত ইসলামী সেনাপতি হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.) মদীনায় এসে তাঁকে জানালেন যে, লোকদের মধ্যে কুরআন কারীমের তিলাওয়াত নিয়ে মতভেদ দেখা দিচ্ছে। এক আয়াত কেউ একভাবে পড়ছে, আবার কেউ অন্যভাবে। এর দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, ইসলাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন কওমের লোক তাদের নিজস্ব ঢঙে কুরআন মাজীদ নকল করছিল এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়তে শুরু করেছিল। তাই এই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে, কোথাও তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতো কুরআনও যেন বিভিন্ন প্রকারের না হয়ে যায়।

হযরত উসমান (রা.) এই আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদ লিখন ও প্রচারের কাজ সরকারি তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন। এই কাজ পুনরায় জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে সংকলিত সত্যায়িত পাণ্ডুলিপিটি সামনে রাখেন। এই পাণ্ডুলিপির প্রতিটি শব্দ পুনরায় যাচাই ও বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার পর, পূর্ণ সতর্কতার সাথে এর কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করা হয় যা তৎকালীন বিশ্বের সমস্ত প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে বেসরকারিভাবে লিখিত অন্যান্য কুরআনী পাণ্ডুলিপিগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়, কারণ সেগুলোর বিশুদ্ধতা সত্যায়িত ছিল না। সরকারি পাণ্ডুলিপিকে 'মুসহাফে উসমানী' এবং এর লিখনশৈলীকে 'রসম-এ-উসমানী' বলা হয় এবং আজ পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমা এর মাধ্যমেই উপকৃত হচ্ছে। [২]

**(৩) কুরআন মাজীদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ:**

খুলাফায়ে রাশেদীন কুরআন মাজীদ পড়া ও পড়ানোকে সাধারণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের একটি বিশাল দল এই খিদমতে নিয়োজিত ছিল। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর পক্ষ থেকে গ্রামগুলোতে কুরআন কারীমের তিলাওয়াত তদারকি করার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছিল। [৩]

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বসরায় এত বেশি ছাত্র তৈরি করেছিলেন যে, সেখানে ক্বারীগণের একটি স্থায়ী শ্রেণী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। [৪] কুফার ইলমী জৌলুস সবার চেয়ে বেশি ছিল যেখানে বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী তিনশ এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সত্তরজন সাহাবায়ে কেরাম বসবাস করতেন। [৫]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪৯৮৬, কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন, বাব জামউল কুরআন।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৪৯৮৭, কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন, বাব জামউল কুরআন; ফাতহুল বারী: ৯/১৭-২১, ত: দারুল মা'রিফাহ। সেই সময়ে রসমুল খতে কোনো নুকতা এবং যের-যবর ইত্যাদি ছিল না। আরবরা কোনো কষ্ট ছাড়াই আরবী ইবারত পড়ে নিত। নুকতা এবং হরকত (যের-যবর) দেওয়ার প্রচলন বনু উমাইয়াদের যুগে শুরু হয়, কারণ অনারব মুসলিমদের জন্য নুকতাহীন হরফ চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল।

[৩] আল-ইসাবাহ: ২৯৯/১, তরজমা: আউস বিন খালিদ, ত: আল-ইলমিয়্যাহ।

[৪] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ: ২৯৭, ২৯৮।

[৫] আন উবাইদাহ বিন ইবরাহীম কল হবাতাল কুফাতা সালাসামায়াতিন মিন আসহাবিশ শাজারাহ ওয়া সাবউনা মিন আহলি বদর (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৯/৬ ত: সাদির)।

সাহাবায়ে কেরামের এই সোনালী যুগে কুরআন মাজীদ পড়ানো এবং মুখস্থ করানোর ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কাব এবং হযরত সালেম মাওলা আবু হুজাইফা (রা.) সবার চেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন, কারণ এই চারজনের ব্যাপারে স্বয়ং হুজুর (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাদের কাছ থেকে কুরআন মাজীদ শেখা হোক। [১] হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-ও কুরআনের একজন প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। [২] হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত দক্ষ হাফেজ ছিলেন, প্রতিদিন একটি খতম করতেন। [৩] হযরত আলী (রা.)-এর কিরাত এবং হিফজে দক্ষতা সুপরিচিত। [৪] প্রথম সারির সেই কারীদের মধ্যে যারা হুজুর আকরাম (সা.)-এর কাছ থেকে কুরআন শিখেছিলেন, হযরত আবু দারদা, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন সায়েব (রা.)-ও সর্বোত্তম কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৫]

তাবেয়ীগণও হাফেজ ও কারী হয়ে এই ইলমকে সামনে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। তাদের মধ্যে মুগীরা বিন আবি শিহাব, আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ, আলকামা বিন কায়েস, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী, আবদুল্লাহ বিন আইয়াশ, আবু রাজা আল-আতারি, আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী, হাসান বসরী, ঈসা বিন আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা, মুজাহিদ বিন জাবর, ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার এবং সাঈদ বিন জুবায়ের (রা.) অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিলেন। [৬]

কুরআন মাজীদের শব্দের সাথে সাথে এর আহকাম এবং আয়াতের তাফসীরও শেখানো হতো। কোনো আয়াতের সেই তাফসীরই নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো যা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হতো। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর নিয়ম ছিল যে তিনি একটি আয়াতের শব্দগুলো লেখাতেন এবং তারপর দীর্ঘক্ষণ তার তাফসীর বোঝাতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) উম্মতে মুসলিমার সবচেয়ে বড় মুফাসসিরে কুরআন হিসেবে খ্যাতি রাখতেন, কিন্তু তাফসীরের ক্ষেত্রে নিজের রায় এবং খেয়াল দেওয়া থেকে বিরত থাকাকেই পছন্দ করতেন। চেষ্টা এটাই করা হতো যে যদি তাফসীর সংক্রান্ত কোনো হাদীস জানা থাকে তবে তা বর্ণনা করা হোক অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করা হোক। [৭]

**সুন্নত সংরক্ষণের প্রচেষ্টা:**

সুন্নতের মতন অর্থাৎ হাদীসের শব্দগুলো মুখস্থ করার প্রবল আগ্রহও সাধারণ ছিল। হুজুর (সা.) নিজের জীবদ্দশায় হাদীস লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেননি যাতে কোথাও কুরআন মাজীদের পাতা এবং হাদীসের পাতা মিলেমিশে না যায়, কিন্তু এখন এই ভয় ছিল না। কুরআন মাজীদ পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলিত হয়ে গিয়েছিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে হাদীস লেখার ধারাও ব্যাপক হয়ে গেল। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) সবচেয়ে বেশি লেখার গুরুত্ব দিতেন। তার সেই কপি 'সহীফা সাদিকা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। একইভাবে হযরত সাদ বিন উবাদাহ, হযরত সামুরা বিন জুনদুব, হযরত আবু মুসা আশআরী এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা (রা.)-এর লিখিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি থেকে মানুষ অনেক উপকৃত হয়েছে। [৮]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৭৫৮, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিব সালেম।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৮১০, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিব জায়েদ বিন সাবিত।

[৩] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১/৮৭, ত: মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

[৪] মারিফাতুল কুররা আল-কিবার লিজ-জাহাবী: পৃ: ১৩, ত: আল-ইলমিয়া।

[৫] মারিফাতুল কুররা আল-কিবার লিজ-জাহাবী, পৃ: ১১, ১৫, ২১, ২২, ২৩।

[৬] মারিফাতুল কুররা আল-কিবার লিজ-জাহাবী, পৃ: ২৫ থেকে ৩০।

[৭] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ: ৩০৭।

[৮] আসরুল খিলাফাতুর রাশিদাহ, পৃ: ৩০৩ থেকে ৩০৯।

হাদিস শেখার জন্য সাহাবীগণ নিজেরা দূর-দূরান্তের সফর করতেন। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী একটি হাদিসের জন্য শাম এবং একটির জন্য মিশর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। [১]

মসজিদগুলোতে হাদিসের মজলিস সাধারণ বিষয় ছিল। মসজিদে নববীতে হযরত আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ বিন উমর এবং জাবির বিন আবদুল্লাহর হালকাসমূহ প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত আয়েশা তাঁর হুজরা থেকে পর্দার আড়ালে হাদিস বর্ণনা করতেন। কুফায় ইবনে মাসউদ, বসরায় আনাস বিন মালিক, মিশরে আবদুল্লাহ বিন আমর এবং শামে আবু দারদার হালকাসমূহ মানুষের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। [২]

**৫) ফিকহের প্রতি মনোযোগ:**

দ্বীন ইসলামে ইলমের উচ্চ ধারণা এবং খলিফাদের পক্ষ থেকে এর প্রসারে বিশেষ আগ্রহ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ইলমকে মুসলিম তাহজীব ও তামাদ্দুনের এমন এক অপরিহার্য উপাদানে পরিণত করেছিল যে, প্রত্যেক মুসলিমকে ইলমের অনুরাগী মনে হতো। ইসলামের পূর্বে আরবদের জ্ঞান কেবল কিছু ধর্মীয় কাহিনী এবং কাব্যচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলাম যখন কুরআন ও সুন্নাহর আলো দান করল, তখন জীবন এক নতুন অর্থ খুঁজে পেল। মানুষ প্রতিটি কাজ এই চিন্তা করে করতে লাগল যে, এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন নাকি অসন্তুষ্ট। প্রতিটি বিষয়কে জায়েজ বা নাজায়েজের দিক থেকে দেখা হতে লাগল। অনেক বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট ফয়সালা বিদ্যমান ছিল। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মদ্যপান এবং মিথ্যা অপবাদ হারাম হওয়া স্পষ্ট ছিল, এগুলোর শরয়ী শাস্তিও নির্ধারিত ছিল যা 'হুদুদ' নামে পরিচিত। কিছু অপরাধ গুরুতর ছিল কিন্তু সেগুলোর শাস্তি নির্ধারণের ক্ষমতা শাসকদের দেওয়া হয়েছিল, যেমন সমকামিতা, জাদুবিদ্যা, নামাজ ত্যাগ করা ইত্যাদি। এগুলোর শাস্তি 'তাযীরাত' নামে পরিচিত ছিল। কিছু গুনাহ অত্যন্ত কঠোর ছিল কিন্তু সেগুলোর জন্য শাস্তি দেওয়া সরকারের দায়িত্ব ছিল না। যেমন মিথ্যা, কুনজর, হিংসা, চোগলখোরি ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ মানুষকে এগুলোর মন্দ দিক সম্পর্কে সচেতন করতেন।

কিছু সমস্যার ধরণ ছিল নতুন। সময়ের পরিবর্তন, পরিস্থিতির রূপান্তর, উপায়-উপকরণ এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এমন সব নতুন ঘটনার জন্ম দিচ্ছিল যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো স্পষ্ট ফয়সালা ছিল না। মানুষ এসব সমস্যার ব্যাপারে শরয়ী বিধান জানতে চাইত। এখন যাদের কুরআন ও সুন্নাহর ইলম নসিব হয়েছিল, তারা আয়াত ও হাদিসের শব্দাবলীতে চিন্তা-গবেষণা করতে লাগলেন যে, এগুলোর মাধ্যমে নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কীভাবে বের করা যায়। এই ব্যক্তিবর্গই ফুকাহা নামে পরিচিত হলেন। এদের মধ্যে আধুনিক বা নতুন সমস্যার সমাধান দানকারী যাদের আহলে ফতোয়া বলা হয়, তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশের অধিক। যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান গনি, হযরত আলী আল-মুরতাজা, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত যায়েদ বিন সাবিত, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। [৩]

---

[১] আর-রিহলা ফি তলাবিল হাদিস লিল খতিব আল-বাগদাদী, পৃ: ৩২, ৩৩, তবা আল-ইলমিয়্যাহ।

[২] আসরুল খিলাফাহ আর-রাশিদা, পৃ: ২৭৮; মিনহাজুল মুহাদ্দিসীন ফিল করনিল আউয়ালিল হিজরি ওয়া হাত্তা আসরিনাল হাযির, আলী আবদুল বাসিত মাযীদ, পৃ: ১৮৭; আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ লিমা ফি কিতাব "আদওয়া আলাস সুন্নাহ" মিনায যালাল ওয়াত তাযলীল ওয়াল মুজাযাফাহ, আবদুর রহমান আল-ইয়ামানী, পৃ: ৩৬; এছাড়া আল-ইসাবাহ, আল-ইসতিয়াব এবং উসদুল গাবাহ-তে উল্লিখিত সাহাবীদের জীবনী দেখুন।

[৩] আসরুল খিলাফাহ আর-রাশিদা, পৃ: ৩১২।

**ইফতা:**

ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে ফতোয়া প্রদানকারী একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বিদ্যমান ছিল যাদের কাছে মানুষ মাসআলা জিজ্ঞাসা করত। তাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আবু মুসা আশআরী, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হযরত জায়েদ বিন সাবিত এবং হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহুম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান গনি এবং হযরত আলী আল-মুরতাজা রাদিআল্লাহু আনহুম ফুকাহা এবং ফতোয়া প্রদানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন। [১]

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কিছু তাবেয়ীও অত্যন্ত দক্ষ ফকিহ, মুফতি এবং কাজী ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত কাব বিন সুর এবং হযরত শুরাইহ রাহিমাহুল্লাহ খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাব বিন সুর রাহিমাহুল্লাহ বসরার এবং শুরাইহ রাহিমাহুল্লাহ কুফার কাজী ছিলেন। [২]

**(১) কাব্য ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাজ্ঞান:**

বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখা ও শেখানোর জন্য এবং এর শব্দভাণ্ডার মনে রাখার জন্য আরব কবিদের কালামও শোনা ও শোনানো হতো। হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু তাকিদ দিতেন যেন আরব কাব্য পাতায় সংরক্ষিত রাখা হয়, কারণ কুরআন ও সুন্নাহর নুসুস বোঝার ক্ষেত্রে আরবি অভিধানের গুরুত্ব প্রমাণিত।

মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত এবং বিশেষ করে জিহাদী অভিযানের ঘটনাবলী এমনভাবে মুখস্থ করা হতো যেমন কুরআন ও হাদিস। বিদেশী ভাষা শেখার গুরুত্বও অনুভূত হয়েছিল। হযরত জায়েদ বিন সাবিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশে হিব্রু, সুরিয়ানি, হাবশি এবং কিবতি ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহুও আহলে কিতাবদের ভাষা জানতেন। হযরত মুগিরা বিন শুবা রাদিআল্লাহু আনহু ফারসি জানতেন। [৩]

---

[১] ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন, ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়া: ১/১০ থেকে ১২, তবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[২] তাবাকাতে ইবনে সাদ, জীবনী: কাব বিন সুর, শুরাইহ বিন আল-হারিস

[৩] আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃষ্ঠা ৩১৩ থেকে ৩২১

https://t.me/BoierSomahar

## বিজয়ের যুগ - সাহাবীগণের যুগ

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এক নজরে

১১ হিজরী ..... ৩২ হিজরী

### ১১ হিজরী:

- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত ..... রবিউল আউয়াল (মে ৬৩২ খ্রি.)
- উসামার বাহিনীর যাত্রা ..... রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে (জুন ৬৩২ খ্রি.)
- চল্লিশ দিন পর উসামার বাহিনীর বিজয়ী প্রত্যাবর্তন ..... জমাদিউল আউয়ালের শুরুতে (জুলাই ৬৩২ খ্রি.)
- হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ ..... ১০ জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ৬৩২ খ্রি.)
- হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ইন্তেকাল ..... রমজান (নভেম্বর ৬৩২ খ্রি.)
- হযরত উম্মে আয়মান রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ইন্তেকাল ..... রমজান (নভেম্বর ৬৩২ খ্রি.)
- মুসাইলামা কাযযাবের নিহত হওয়া ..... যিলহজ (ফেব্রুয়ারি ৬৩৩ খ্রি.)

### ১২ হিজরী:

- ইরানে সৈন্য অভিযান। যাতুস সালাসিল যুদ্ধ ..... মহররম (মার্চ ৬৩৩ খ্রি.)
- যিলজাহ-এর যুদ্ধ ..... সফর (এপ্রিল ৬৩৩ খ্রি.)
- হীরা বিজয় ..... রবিউল আউয়াল (জুন ৬৩৩ খ্রি.)
- ফিরাযের যুদ্ধ ..... যিলকদ (জানুয়ারি ৬৩৪ খ্রি.)
- রাসূলের জামাতা হযরত আবুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল ..... যিলহজ (ফেব্রুয়ারি ৬৩৪ খ্রি.)

### ১৩ হিজরী:

- সিরিয়ায় সৈন্য অভিযানের সূচনা ..... মহররম (মার্চ ৬৩৪ খ্রি.)
- হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইরাক থেকে সিরিয়া যাত্রা ..... মহররম (মার্চ ৬৩৪ খ্রি.)
- আজনাদাইন যুদ্ধ ..... জমাদিউল আউয়াল (জুলাই ৬৩৪ খ্রি.)
- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল ..... ২২ জমাদিউল আখিরা (২৪ আগস্ট ৬৩৪ খ্রি.)

হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সূচনা ..... ২২ জুমাদাল আখিরা (২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রি.)

ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ ..... ২৯ জুমাদাল আখিরা (১ সেপ্টেম্বর ৬৩৪ খ্রি.)

জাসরের যুদ্ধ ..... শাবান (অক্টোবর ৬৩৪ খ্রি.)

বুওয়াইবের যুদ্ধ ..... রমজান (নভেম্বর ৬৩৪ খ্রি.)

দামেস্ক অবরোধের সূচনা ..... মহররম (ফেব্রুয়ারি ৬৩৫ খ্রি.) ..... পৃষ্ঠা ৫১২

দামেস্ক বিজয় ..... ১৫ রজব (আগস্ট ৬৩৫ খ্রি.)

ফাহলের যুদ্ধ ..... যিলকদ (ডিসেম্বর ৬৩৫ খ্রি.)

হিমস বিজয়, রোমান রাজধানী, বালবাক বিজয় ..... যিলকদ (ডিসেম্বর ৬৩৫ খ্রি.)

বসরা শহর নির্মাণের সূচনা ..... রবিউস সানি (মে ৬৩৬ খ্রি.) ..... পৃষ্ঠা ৫১৫

ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ ..... ৫ রজব (২৩ আগস্ট ৬৩৬ খ্রি.)

কাদিসিয়ার যুদ্ধ ..... শাওয়াল (নভেম্বর ৬৩৬ খ্রি.)

মাদায়েন বিজয়, কিসরার রাজধানী ..... সফর (মার্চ ৬৩৭ খ্রি.) ..... পৃষ্ঠা ৫১৬

কুফা শহর নির্মাণের সূচনা ..... রজব (জুলাই ৬৩৭ খ্রি.)

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ..... রজব (জুলাই ৬৩৭ খ্রি.)

জালুলার যুদ্ধ ..... যিলকদ (নভেম্বর ৬৩৭ খ্রি.)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পদচ্যুতি ..... (৬৩৮ খ্রি.) ..... পৃষ্ঠা ৫১৭

সিরীয় খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ এবং তা দমন ..... (৬৩৮ খ্রি.)

রামাদার দুর্ভিক্ষ ..... (৬৩৯ খ্রি.) ..... পৃষ্ঠা ৫১৮

https://t.me/BoierSomahar

- প্লেগ আমওয়াস ..... (৬৩৯ খ্রি.)

- হযরত আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, হযরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ইন্তেকাল

**৫১৯:**

- কায়সারিয়া বিজয় ..... (৬৪০ খ্রি.)

- তিকরিত বিজয় ..... (৬৪০ খ্রি.)

- আমর ইবনুল আস (রা.)-এর মিশরের অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা ..... (৬৪০ খ্রি.)

**৫২০:**

- মিশর বিজয় ..... রবিউস সানি (মার্চ ৬৪১ খ্রি.)

- রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মৃত্যু ..... শাওয়াল (সেপ্টেম্বর ৬৪১ খ্রি.)

- আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ..... জিলকদ (অক্টোবর ৬৪১ খ্রি.)

- উবাই ইবনে কাব (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... (৬৪১ খ্রি.)

- তুসতার বিজয়, হরমুজানের গ্রেফতারি ..... (৬৪১ খ্রি.)

**৫২১:**

- নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ ..... রবিউস সানি (মার্চ ৬৪২ খ্রি.)

- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... জমাদিউস সানি (মে ৬৪২ খ্রি.)

- পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে ইসলামী বাহিনীর সাধারণ অভিযান ..... (৬৪২ খ্রি.)

- উম্মুল মুমিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... (৬৪২ খ্রি.)

- উসাইদ বিন হুদাইর (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... (৬৪২ খ্রি.)

- হযরত বিলাল হাবশী (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... (৬৪২ খ্রি.)

**৫২২:**

- আজারবাইজান বিজয় ..... (৬৪৩ খ্রি.)

- ত্রিপোলি (লিবিয়া) বিজয় ..... (৬৪৩ খ্রি.)

- খোরাসান বিজয় ..... (৬৪৩ খ্রি.)

https://t.me/BoierSomahar

প্রথম খণ্ড

ইস্তাখর, কেরমান, সিজিস্তান, মাকরান বিজয় (৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২২

কাতাদা বিন নুমান আনসারী (রা.)-এর ইন্তেকাল (৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২২

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রা.)-এর ইন্তেকাল (৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২২

হযরত উমর (রা.)-এর ওপর প্রাণঘাতী হামলা — বুধবার, ২৬ জিলহজ (৩ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২২

উমর ফারুক (রা.)-এর দাফন — ১লা মহররম (৭ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২৩

উসমান বিন আফফান (রা.)-এর খিলাফত — মহররম (নভেম্বর ৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২৩

হামাদান বিজয় — ১২ জুমাদাল উলা (১৯ মার্চ ৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২৩

আর্মেনিয়া জিহাদ (১৯ মার্চ ৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২৩

আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্রোহ দমন — রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ৬৪৪ খ্রি.) ..... ৫২৫

কুফায় ওয়ালিদ বিন উকবা (রা.)-এর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ (৬৪৫ খ্রি.) ..... ৫২৫

মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ (৬৪৬ খ্রি.) ..... ৫২৬

প্রথম ইসলামী নৌবাহিনী প্রস্তুতি (৬৪৬ খ্রি.) ..... ৫২৬

আফ্রিকা জিহাদ, রাজা জর্জির হত্যা (৬৪৭ খ্রি.) ..... ৫২৭

ইউরোপে প্রথম পদক্ষেপ — আন্দালুসে প্রথম নৌ অভিযান (৬৪৭ খ্রি.) ..... ৫২৭

প্রথম নৌ অভিযান, সাইপ্রাস বিজয় (৬৪৮ খ্রি.) ..... ৫২৮

https://t.me/BoierSomahar

ইতিহাস উম্মতে মুসলিমা

৫২৯:

- বসরা ও পারস্যে আবদুল্লাহ বিন আমের (রা.)-এর নিয়োগ ..... (৬৪৯ খ্রি.)
- মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ শুরু ..... রবিউস সানি (জানুয়ারি ৬৫০ খ্রি.)

৫৩০:

- মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন ..... মহররম (সেপ্টেম্বর ৬৫০ খ্রি.)
- পারস্য ও খোরাসানে নতুন বিজয়, ইয়াজদাগার্দের পশ্চাদ্ধাবন ..... (৬৫০ খ্রি.)
- খোরাসানে আহনাফ বিন কায়েসের বিজয়সমূহ ..... (৬৫০ খ্রি.)

৫৩১:

- ইয়াজদাগার্দের শোচনীয় মৃত্যু এবং আল-সাসানের অবসান ..... (৬৫১ খ্রি.)
- নিশাপুর বিজয় ..... (৬৫১ খ্রি.)
- হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... (৬৫১ খ্রি.)

৫৩২:

- হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কনস্টান্টিনোপল উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া ..... (৬৫২ খ্রি.)
- হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... (বয়স ৮২ বছর)
- হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবু যর গিফারি, আবুদ্দারদা (রা.)-এর ইন্তেকাল ..... রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন

৫৩৩:

- সাইপ্রাসে বিদ্রোহ এবং পুনরায় দখল ..... (৬৫৩ খ্রি.)
- হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-এর ইন্তেকাল

৫৩৪:

- গাজওয়ায়ে জাতুস সাওয়ারি (মাস্তুলের যুদ্ধ) ..... (৬৫৪ খ্রি.)
- হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)-এর ইন্তেকাল

৬৪২

## ইতিহাসের শিক্ষা

- সাহাবায়ে কেরামের যুগের বিজয় ও সাফল্যের এই ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, যখন মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা তার সঙ্গী হয় এবং বাতিল শক্তিগুলো সব জায়গায় পিছু হটতে বাধ্য হয়।

- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দৃঢ় সংকল্প প্রমাণ করেছে যে, দ্বীনের অস্তিত্বের প্রশ্নে কোনো আপস হতে পারে না। একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য এটা শোভা পায় না যে, তার জীবদ্দশায় আল্লাহর দ্বীনে কোনো ফাটল ধরবে।

- খতমে নবুওয়াতের আকিদা ইসলামের মৌলিক বিষয়। এর অস্বীকারকারীদের ইসলামে কোনো স্থান নেই। খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সাথে সাথেই তাদের দমন করা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। এই বিষয়ে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না।

- ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য অসাধারণ প্রশাসনিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতি জরুরি। হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন এমনই একজন অসাধারণ প্রশাসক।

- প্রশাসনে নতুনত্ব আনা, শৃঙ্খলা রক্ষার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং কাজগুলোকে সহজভাবে সর্বোত্তম ছাঁচে ঢেলে সাজানো সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। উমর ফারুক (রা.) ছিলেন এই চিন্তাধারার প্রবর্তক। মুসলমানদের সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য সরলতার পাশাপাশি প্রশাসনিক ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে নতুনত্বের সন্ধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশের দিকে মনোযোগ দেওয়া। তাদের সুযোগ-সুবিধা, প্রবণতা এবং বৈধ আগ্রহের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করলে সমাজে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইসলামী আইনের সীমার মধ্যে থেকে জনগণের জন্য নমনীয়তা বজায় রাখা উচিত। হযরত উসমান (রা.)-এর কর্মপদ্ধতি এক্ষেত্রে আমাদের জন্য উদাহরণ।

- শরীয়ত বিরোধী কাজ, বিশেষ করে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার কারণগুলোর মুসলিম সমাজে কোনো স্থান নেই। সমাজ এসব কলুষতা থেকে মুক্ত হলেই প্রকৃত উন্নতি করতে পারে, যেমনটি ছিল সাহাবায়ে কেরামের যুগের সমাজ।

- ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রতিটি সমাজের মৌলিক প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরামের সরকারগুলোর এটিই ছিল প্রথম অগ্রাধিকার। তাই মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই তাদের ওপর খুশি ও সন্তুষ্ট ছিল।

- শাসকের মনোযোগ কেবল বিজয়ের ওপর নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজিত এলাকাগুলোতে দ্বীন জিন্দা হওয়া, জনগণ নিরাপদ থাকা, জুলুম নির্মূল হওয়া, মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরি হওয়া, প্রশাসন উচ্চমানের হওয়া, সম্পদের বণ্টন স্বচ্ছ হওয়া, মৌলিক প্রয়োজন থেকে কেউ বঞ্চিত না হওয়া, শিক্ষা সাধারণ হওয়া, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রবণতাগুলো প্রগতিশীল হওয়া এবং সংশোধন ও প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয় হওয়া। সাহাবায়ে কেরামের শাসনকালে এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হতো।

উম্মতে মুসলিমার ওপর সাহাবায়ে কেরামের অনেক বড় অবদান রয়েছে। তাঁদের কোরবানি, আত্মত্যাগ, জিহাদের জযবা এবং দ্বীনের দাওয়াতের কারণেই আজ আমরা মুসলমান। এই মহান ব্যক্তিদের অবদান স্মরণ রাখা সৌভাগ্যের লক্ষণ। এর বিপরীতে তাঁদের দুর্বলতা খুঁজে বের করে তাঁদের ওপর আপত্তি তোলা অকৃতজ্ঞতা, নাশুকরি এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়।

সাহাবায়ে কেরামের জীবন আমাদের জন্য আদর্শ। দ্বীনের জন্য তাঁদের কোরবানি দেখে উম্মত হিসেবে এই জযবা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক যে, আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করব। যদি অন্তরে এই চিন্তা জাগ্রত না হয়, তবে তা ঈমানের অবক্ষয় এবং বিবেকের মৃত্যুর লক্ষণ।

সাহাবায়ে কেরামের জীবন আমাদের জন্য দুইভাবে পরীক্ষা:

- এক. এই হিসেবে যে, আমরা কি তাঁদের অনুসরণ করে ইশক ও মহব্বতের পরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস করব, নাকি নিজের নফসকে খুশি রাখতেই মগ্ন থাকব?

- দুই. এই হিসেবে যে, আমরা কি সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত উজ্জ্বল আদর্শের ওপর ঈমান রাখব, নাকি তাঁদের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক তথ্যের ওপর বিশ্বাস করব? প্রথম সুরতটি হেদায়েতের দরজা খুলে দেয় এবং দ্বিতীয় সুরতটি সুদূরপ্রসারী গোমরাহির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

**পঞ্চম অধ্যায়**

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

রিসালাতের যুগ এবং খিলাফতে রাশেদার যুগের মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

## রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার

## উম্মাহাতুল মুমিনীন রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণকে কুরআন কারীম 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' (মুমিনদের মাতা) হিসেবে ঘোষণা করেছে। যে সৌভাগ্যবতী ব্যক্তিত্বগণ এই মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁদের নাম নিম্নরূপ:

- উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহা
- উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা রাযিয়াল্লাহু আনহা

এভাবে উম্মাহাতুল মুমিনীনের সংখ্যা এগারো জন, যাঁদের মধ্যে দুইজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন; অর্থাৎ: হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। বাকি নয়জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

উম্মতে মুসলিমার ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, এটি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁর বিবাহে এককালীন চারজনের অধিক নারী থাকতে পারতেন। কোনো উম্মতীর জন্য এককালীন চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নয়।

নিচে উম্মাহাতুল মুমিনীনের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত লেখা হলো।

## উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)

হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী এবং উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত নারী। তিনি কুরাইশদের একটি বণিক পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর পুণ্য ও পবিত্রতার কারণে মানুষ তাঁকে 'তাহিরা' (পবিত্রা) বলে ডাকত। [১]

তাঁর প্রথম বিবাহ আতিক বিন আইজ মাখজুমির সাথে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি আবু হালা বিন জুরাহ তামিমি-র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আরবের বিখ্যাত 'হারবুল ফিজার' যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন তাঁর পিতা ও স্বামী উভয়ই এতে অংশগ্রহণ করেন এবং দুজনেই নিহত হন। দুজনেই ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ঘরের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁদের ওপরই ছিল। পিতা ও স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত খাদিজার ওপর কঠিন সময় নেমে আসে, তাই তিনি নিজের আত্মীয়দের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচন করে তাঁর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে শুরু করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমানতদারি, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার চর্চা তখন মক্কায় ব্যাপক ছিল। আপনি 'সাদিক' ও 'আমিন' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। হযরত খাদিজা এই সুখ্যাতির কথা বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রস্তাব পাঠান যে, তিনি যদি তাঁর ব্যবসার মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় যান, তবে তাঁকে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা গ্রহণ করেন এবং হযরত খাদিজার গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে ব্যবসার মালামালসহ রওনা হন। এই বছর ব্যবসার মুনাফা বিগত বছরগুলোর তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছিল। হযরত খাদিজা বিধবা হওয়ার পর অনেক লোক তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু কুদরতের ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সিরিয়ার ব্যবসায়িক সফর থেকে ফিরে এলেন, তখন হযরত খাদিজা বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা গ্রহণ করেন এবং বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত তারিখে আবু তালিব, হযরত হামজা এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে হযরত খাদিজার বাসভবনে যান। হযরত খাদিজাও তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যকে ডেকেছিলেন। অতঃপর তাঁদের সবার উপস্থিতিতে আবু তালিব এভাবে নিকাহর খুতবা পাঠ করেন:

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর এবং হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধারা, মা'দ ও মুজার বংশোদ্ভূত করেছেন। তিনি আমাদের তাঁর ঘরের রক্ষক এবং তাঁর হারামের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। তিনি আমাদের এমন এক ঘর দান করেছেন যা হজের কেন্দ্র এবং যা শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান। আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদের মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হে লোকসকল! আমার ভাতিজা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর সাথে কার তুলনা হতে পারে? নিঃসন্দেহে তাঁর কাছে ধন-সম্পদ নেই, কিন্তু ধন-সম্পদ তো একটি ক্ষণস্থায়ী ছায়া এবং একটি পরিবর্তনশীল বস্তু। হে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ! আপনারা মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মীয়তা সম্পর্কে জানেন। তিনি খুওয়াইলিদের কন্যা খাদিজাকে বিবাহ করতে চান এবং আমার সম্পদ থেকে বিশটি উট মোহর..."

---

[১] পিতার দিক থেকে তাঁর বংশলতিকা হলো: খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আবদুল উযযা বিন কুসাই। মাতার দিক থেকে বংশলতিকা হলো: খাদিজা বিনতে ফাতিমা বিনতে যায়েদা বিন আসম (জুনদুব) বিন হাশিম বিন রাওয়াহা বিন হুজর বিন আবদ বিন মুয়াইস বিন আমির বিন লুয়াই। (উসদুল গাবাহ: ৭/৮০, তিব্বুল উলামা)

নির্ধারণ করেন। আল্লাহর কসম! আমার ভাতিজা অত্যন্ত শান ও মর্যাদার অধিকারী।

আমর বিন আসাদের পরামর্শে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা মোহর নির্ধারিত হলো। এভাবে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাসুলের স্ত্রী হয়ে পুরো মুসলিম উম্মাহর শ্রদ্ধেয় মা হয়ে গেলেন। সে সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল ২৫ বছর, আর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী হযরত খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। [১]

হযরত খাদিজা সর্বপ্রথম হুজুর ﷺ-কে সত্যায়ন করেন, তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং ইসলামের জন্য নিজের সম্পদ উৎসর্গ করে দেন। তিনি মক্কী জীবনের সেই সমস্ত কষ্টের সময়গুলোতে তাঁর সাথে শরীক ছিলেন, যা সহ্য করার জন্য পাহাড়ের মতো কলিজার প্রয়োজন ছিল। [২] এজন্যই হুজুর ﷺ তাঁকে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ নারী বলতেন। তাঁর ﷺ এরশাদ হলো: "খাইরু নিসায়িহা খাদিজাতু বিনতে খুওয়াইলিদ" (উম্মাহর শ্রেষ্ঠ নারী হলেন খাদিজা)। [৩]

একবার যখন তিনি হুজুর ﷺ-এর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে মানুষের বেশে দেখা করেন। পরবর্তীতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুজুর ﷺ-এর কাছে আরজ করেন যে, তাঁকে জান্নাতে একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন। [৪]

হুজুর ﷺ-এর এক পুত্র ইব্রাহিম ছাড়া বাকি সব সন্তান হযরত খাদিজার গর্ভেই জন্ম নেন। তিনি জীবিত থাকাকালীন হুজুর ﷺ অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেননি। ১০ম নববী বর্ষের রমজান মাসে হযরত খাদিজা ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল ৬০ বা ৬৫ বছর, আর সে সময় হুজুর আকরাম ﷺ-এর বয়স ছিল ৪৯ বছর। এই বিয়োগান্তক ঘটনায় হুজুর ﷺ এতটাই শোকাহত হয়েছিলেন যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। [৫] পরবর্তীতেও হুজুর ﷺ তাঁর এই দুঃখের সাথী স্ত্রীকে স্মরণ করতেন। কোনোদিন ঘরে খাবারের প্রাচুর্য থাকলে খাদিজার বান্ধবীদের বাড়িতে খাবার পাঠাতেন। [৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বলতেন: "রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে আমি কাউকে নিয়ে এত ঈর্ষা বোধ করিনি যতটা হযরত খাদিজাকে নিয়ে করেছি, কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুব বেশি স্মরণ করতেন।" [৭]

হুজুর ﷺ ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগের কথা উল্লেখ করতেন এবং বলতেন: "আমি তাঁর মতো আর কাউকে পাইনি। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন মানুষ কুফরিতে অটল ছিল। তিনি তখন আমাকে সত্যায়ন করেছিলেন যখন মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলছিল। তিনি তাঁর সম্পদ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছিলেন যখন মানুষ আমাকে তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই আমাকে সন্তান দান করেছেন, অন্য কোনো স্ত্রীর মাধ্যমে নয়।" [৮] রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ওয়া আরদাহা।

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১/১৩২ ত. সাদির... এক মত অনুযায়ী হযরত খাদিজার বয়স ছিল ৩৫ বছর (আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ: ১/২০৪; আল-হিলইয়াহ; তারিখুল খামিস: ১/২৬৪, ত. দার সাদির)। কিছু আলেম তাঁর অধিক সন্তান হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে একেই অধিক বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন, কারণ সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সের পর সন্তান কম হয়।

[২] আল-ইসাবাহ: ৮/১০০।

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৩০, কিতাব ফাদায়িলুস সাহাবা, বাব ফাদায়িলু খাদিজা, ত. দারুল জিল।

[৪] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৩২, কিতাব ফাদায়িলুস সাহাবা, বাব ফাদায়িলু খাদিজা, ত. দারুল জিল।

[৫] আল-ইসাবাহ: ৮/১০৩; দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৩৫২, ৩৫৩ ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[৬] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৩০, ২৪৩১, কিতাব ফাদায়িলুস সাহাবা, বাব ফাদায়িলু খাদিজা, ত. দারুল জিল।

[৭] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৮১৭, বাব তাজউইজুন নবী ﷺ খাদিজা...।

[৮] উসদুল গাবাহ: ৭/৮০; আদ-দুরর: খাদিজা, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

## উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদাহ বিনতে জামআ রাদিআল্লাহু আনহা

হযরত সাওদাহ রাদিআল্লাহু আনহার সম্পর্ক ছিল কুরাইশের শাখা বনু আমেরের সাথে। [১] তিনি প্রথমে সাকরান বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু নামক এক সাহাবীর বিবাহবন্ধনে ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। এদিকে হযরত খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও একজন জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল। উসমান বিন মাজউন রাদিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকিম রাদিআল্লাহু আনহা একদিন উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: "আপনার একজন দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মতো সঙ্গীর প্রয়োজন!!"

আপনি বললেন: "হ্যাঁ! ঘর-সংসারের ব্যবস্থাপনা এবং সন্তানদের দেখাশোনা সবকিছু খাদিজাই সামলে রাখত।" খাওলা রাদিআল্লাহু আনহা শুনে সাওদাহ রাদিআল্লাহু আনহার কাছে গেলেন এবং তাঁর পিতামাতার সাথে বিয়ের কথা বললেন। হিজরতের তিন বছর আগে তাঁর সাথে বিবাহ হয় এবং মক্কাতেই বিদায় (রখসতি) হয়। এটি রমজান ১০ নবুওয়ী সালের ঘটনা।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর অনেক প্রশংসা করতেন এবং বলতেন: "তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে আমার এমন পছন্দ নেই যে তাঁর দেহে আমার প্রাণ থাকত।" তিনিও হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে অনেক ভালোবাসতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ বছরগুলোতে তিনি নিজের পালার দিনটি আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহাকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আমার পরে ঘরে অবস্থান করবে। হযরত সাওদাহ রাদিআল্লাহু আনহা এই নির্দেশের ওপর এত কঠোরভাবে আমল করেছিলেন যে, সারা জীবনে আর কখনো হজ্জ বা উমরার জন্যও বের হননি। ঘরেই অবস্থান করতেন। বলতেন: "হজ্জ ও উমরা করে ফেলেছি, এখন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ঘরেই থাকব।"

আত্মমর্যাদাবোধের অবস্থা এমন ছিল যে, নিজের হাতের কামাই ব্যবহার করতেন। তায়েফ থেকে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার জন্য আসত, তিনি সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করে দিতেন এবং আয়ের বড় অংশ সদকা করে দিতেন। কোনো উপহার পেলেও তা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতেন।

মেজাজে কৌতুকবোধও ছিল। একবার হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু দিরহামের একটি থলি পাঠালেন। হযরত সাওদাহ রাদিআল্লাহু আনহা বাহককে জিজ্ঞেস করলেন: "এতে কী আছে?" সে বলল: "দিরহাম।" বললেন: "দেখতে তো খেজুরের থলির মতো মনে হচ্ছে!" তারপর তিনি সেই সমস্ত দিরহাম মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিলেন।

---

[১] আনিস সাওদাহ "অর্থ কালো এবং কৃষ্ণবর্ণ। পিতার দিক থেকে বংশপরম্পরা হলো: সাওদাহ বিনতে জামআ বিন কায়েস বিন আব্দু শামস বিন আব্দু উদ বিন নাসর বিন মালিক বিন হাসল বিন আমের বিন লুয়াই। মাতার দিক থেকে বংশপরম্পরা হলো: সাওদাহ বিনতে শামুস বিন কায়েস বিন জায়েদ বিন আমর বিন লাবিদ বিন খাদাশ বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৬৫)

তিনি তাঁর কথাবার্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাসাতেন। একবার নফল সালাতে তিনি তাঁর ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে তিনি বলতে লাগলেন: “রুকু এত দীর্ঘ ছিল যে আমার মনে হচ্ছিল আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করবে। তাই আমি আমার নাক ধরে রেখেছিলাম।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি শুনে হেসে দিলেন। [১]

কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রসিকতাকে গম্ভীর সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিতেন। একবার তিনি আরজ করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা মারা যাই, তবে আপনার আগে উসমান ইবনে মাজউন আমাদের জানাজা পড়িয়ে দেবেন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “হে জামআর কন্যা! যদি তুমি মৃত্যুর হাকিকত জানতে পারতে, তবে জানতে পারতে যে তা তোমার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বিষয়।” [২]

তাঁর ইন্তেকাল ফারুকী খিলাফতের শেষ দিকে ২৩ হিজরিতে হয়েছিল। একটি বর্ণনা ৫৪ হিজরিরও রয়েছে, তবে তার সত্যতা নিশ্চিত করা যায়নি। [৩]

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওয়া আরদাহা

---

[১] আল-ইসাবাহ: ৮/১৯৭, ১৯৮

[২] আয-যুহদ ওয়ার-রাকাইক লি-আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, হা: ২৫০

[৩] উসদুল গাবাহ: ৭/১৫৭

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বিনতে আবু বকর (রা.)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল উম্মে রুমান বিনতে আমির। হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর উসমান বিন মাজউন (রা.)-এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কথা বললেন যে, "আপনি কি আর বিবাহ করবেন না?" রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সাথে?" হযরত খাওলা (রা.) বললেন, "কুমারীদের মধ্যে আয়েশা এবং বিধবাদের মধ্যে সওদা বিনতে জামআ।" রাসূলুল্লাহ (সা.) উভয়ের সাথে বিবাহের পয়গাম পাঠানোর অনুমতি দিলেন, ফলে হযরত খাওলা (রা.)-এর মধ্যস্থতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) উভয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। [১]

এই বিবাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ছিল। বিবাহের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মুল মুমিনীনকে বলেছিলেন:

"أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَ نِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ يَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ"

"তোমাকে স্বপ্নে তিন রাত পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা রেশমি কাপড়ের এক টুকরোতে তোমার ছবি নিয়ে আসতেন এবং বলতেন যে ইনি আপনার স্ত্রী।" [২]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহ হিজরতের তিন বছর পূর্বে হয়েছিল এবং বিদায় (রুখসতি) বদর যুদ্ধের পরপরই ২ হিজরিতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ভাগ্নে আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-এর নামে তাঁর কুনিয়াত 'উম্মে আবদুল্লাহ' নির্ধারণ করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর সাথে নয় বছর অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ের মধ্যে ইলম ও প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হন। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন: "যখনই আমাদের কোনো বিষয়ে সন্দেহ হতো, আমরা আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর কাছে সে বিষয়ে জ্ঞান পেতাম।" একারণেই বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। [৩]

তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন:

"فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ"

"সমস্ত নারীদের ওপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন সমস্ত খাবারের ওপর সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব।" [৪]

হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন ওহী নিয়ে আসতেন, তখন তাঁকে সালাম পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন:

"يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ"

"হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল, তিনি তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।" [৫]

---

[১] আসাদুল গাবাহ: ৭/১৮২, ত ত ইলমিয়্যাহ।

[২] সহীহ মুসলিম: কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব ফি ফাযলি আয়েশা (রা.)।

[৩] মাজমা' মুসলিম: কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব ফি ফাযলি আয়েশা (রা.)।

[৪] সহীহ মুসলিম: কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব ফি ফাযলি আয়েশা (রা.)।

[৫] সহীহ মুসলিম: কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব ফি ফাযলি আয়েশা (রা.)।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: “وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ” (তাঁর ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। [১] উম্মুল মুমিনীন ছিলেন ইসলামি বিশ্বের মাতা এবং ইলমি ও আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠপোষক। পুরো উম্মতে মুসলিমার মধ্যে আপনার চেয়ে বড় বিদুষী ও মহীয়সী নারী আর কেউ ছিল না। গণিত ও মিরাস শাস্ত্রে আপনার এমন দক্ষতা ছিল যে, সাহাবী ও তাবিঈগণ মিরাসের মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার কাছে আসতেন। উরওয়াহ বিন জুবায়ের বলেন যে, আমি ফিকহ, চিকিৎসা, কবিতা এবং মিরাস শাস্ত্রে উম্মুল মুমিনীনের চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। [২] আপনি তাফসীর ও হাদীসের শিক্ষা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে লাভ করেছিলেন। কবিতা ও নসব শাস্ত্র আপনার সম্মানিত পিতার কাছ থেকে শিখেছিলেন। [৩] আপনার থেকে কমবেশি আড়াই হাজার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [৪]

আপনি একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিদেশি মেহমানদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চিকিৎসার জন্য চিন্তিত হতেন। উম্মুল মুমিনীনের স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি সেই রোগ ও ওষুধের তথ্য জেনে নিতেন এবং তা মুখস্থ করে ফেলতেন। এভাবে আপনি একজন দক্ষ চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। [৫]

যুহদ ও দানশীলতায় আপনি ছিলেন আপনার উপমা। হাজার হাজার দিরহাম ও দিনার সকালে আসত এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হতো। একবার এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া এল, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সব সদকা করে দিলেন; নিজে রোজা ছিলেন, কিন্তু খেয়ালই হলো না। এক নারী বললেন: “সন্ধ্যার ইফতারের জন্য যদি একটি দিরহামও বাঁচিয়ে রাখতেন, তবে গোশত দিয়ে ইফতার করতে পারতেন।” তিনি বললেন: “তুমি যদি সেই সময় মনে করিয়ে দিতে তবে তো কথা ছিল।” [৬]

ফাসাহাত ও বালাগাতের অবস্থা এমন ছিল যে, বড় বড় বাগ্মী আপনার কথা শুনে স্বীকার করতেন যে, ভূপৃষ্ঠে আপনার চেয়ে অধিক প্রাঞ্জল ও বাগ্মী আর কেউ নেই। [৭]

৫৮ হিজরীতে উম্মুল মুমিনীন অসুস্থ হন এবং রমজানের রাতে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তারাবিহ নামাজের পর জানাজার নামাজ পড়ান। [৮]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর এমন অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো নারী সাহাবীর নেই, যেমন:

- তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর কন্যা। রাসূলুল্লাহ (সা.)...

---

[১] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৫৩, দারুল জীল; সুনানে আবু দাউদ, হা: ৫২৩২; সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৮৭৬

[২] আল-ইসাবাহ: ২৩৩/৮

[৩] “هذه القرآن تلقته عن رسول الله ﷺ وكذلك الحلال والحرام وهذا الشعر والنسب والاخبار سمعتها من ابيك” (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯৭/২)

[৪] তাঁর ২২১০টি হাদীস ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদে সংকলন করেছেন। দেখুন: মুসনাদ আহমদ, হা: ২৪০১০ থেকে ২৬২১৩

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮৩, ১৮২/২, দারুর রিসালাহ

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮৭, ১৮৬/২

[৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯১/২, দারুর রিসালাহ

[৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯৩/২

তিনি এটি প্রকাশ্যে প্রকাশ করতেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন: 'আয়েশা'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'আর পুরুষদের মধ্যে?' বললেন: 'তার পিতা'। [১]

- রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি (রা.) ব্যতীত অন্য কোনো কুমারী মেয়েকে বিবাহ করেননি।
- ইন্তেকালের সময় হুজুর (সা.)-এর পবিত্র মাথা আপনি (রা.)-এর কোলে ছিল।
- হুজরায়ে আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-তে নবী (সা.)-কে দাফন করা হয়েছে।
- নবী (সা.)-এর ওপর সেই সময়েও ওহী নাযিল হতো যখন তিনি (সা.) আয়েশা (রা.)-এর লেপের মধ্যে থাকতেন। অন্য কোনো স্ত্রীর এই মর্যাদা অর্জিত হয়নি।
- আপনার (রা.) পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হতে থাকবে। সালাফে সালেহীনদের বক্তব্য হলো, যদি হযরত আয়েশা (রা.)-এর আর কোনো ফযীলত নাও থাকত, তবুও ইফকের ঘটনায় যেভাবে কুরআন হাকীম তাঁর নির্দোষিতা বর্ণনা করেছে, তা তাঁর ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদার অকাট্য দলিল।
- এক সফরে আপনার (রা.) হার হারিয়ে গিয়েছিল, তা খোঁজার সময় ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেল। সেখানে পানি ছিল না, আল্লাহ ওহী পাঠিয়ে তায়াম্মুমের পদ্ধতি জানিয়ে দিলেন। উম্মতের জন্য তায়াম্মুমের এই সহজতা উম্মুল মুমিনীনের কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকা এক বরকত।
- আপনি (রা.) সেই ছয়-সাতজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদের থেকে প্রচুর পরিমাণে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আপনার (রা.) বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা দুই হাজার দুইশ দশ (২২১০)।
- আপনার (রা.) ইলমী কামালিয়াত সমস্ত নারী সাহাবী এবং অধিকাংশ পুরুষ সাহাবীর চেয়েও বেশি। বড় বড় সাহাবীগণ মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলাসমূহে আপনার থেকে উপকৃত হতেন। হযরত আতা বিন আবি রাবাহ (রা.) বলেন: "হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ এবং সর্বোত্তম রায় (মতামত) প্রদানকারী নারী।" [২]

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ওয়া আরদাহা

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩৬৬২, কিতাবুল মানাকিব, বাব: লাও কুনতু মুত্তাখিযান খলীলান।

[২] উসুদুল গাবাহ: ৭/১৮৬, তাবা ইলমিয়্যাহ।

উম্মুল মুমিনীনের পিতৃবংশ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর জীবনীর আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে। মাতৃবংশীয় বংশপরম্পরা হলো: আয়েশা বিনতে উম্মে রুমান বিনতে আমির বিন উয়াইমির বিন আব্দু শামস বিন আত্তাব বিন উযাইনা বিন সুবাই বিন দাহমান বিন হারিস বিন গানাম বিন মালিক বিন কিনানাহ।

## উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর কন্যা এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর আপন বোন। হযরত হাফসা (রা.) তাঁর চেয়ে ছয় বছরের বড় ছিলেন। তাঁদের উভয়ের মা ছিলেন হযরত যয়নব বিনতে মাজউন (রা.)। [১]

হযরত হাফসা (রা.)-এর জন্ম নবী করীম (সা.)-এর নবুওয়াত ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্বে ঐ সময়ে হয়েছিল যখন কুরাইশরা কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণে ব্যস্ত ছিল। হযরত হাফসা (রা.) যখন বুঝমান বয়সে পৌঁছান, তখন তাঁর পিতা হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে হযরত হাফসা (রা.) অত্যন্ত পবিত্র পরিবেশে লালিত-পালিত হন। [২]

আপনি অত্যন্ত বাগ্মী ও সুবক্তা ছিলেন, সাহিত্যিক রুচিবোধ সম্পন্ন এবং অত্যন্ত বিদুষী ও ইবাদতগুজার নারী ছিলেন। তিনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ খুনায়েস বিন হুযাফা সাহমী (রা.)-এর সাথে হয়েছিল, যিনি নবী করীম (সা.)-এর প্রাথমিক পর্যায়ের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তিনি মুসাইলামা কাযযাবের হাতে শহীদ হওয়া আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রা.)-এর ভাই ছিলেন।)

খুনায়েস বিন হুযাফা (রা.) প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন এবং পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর হযরত হাফসা (রা.)-এর সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হন, আর কিছুকাল পর মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)-এর পাশে দাফন করা হয়। এভাবে হযরত হাফসা (রা.) যৌবনেই বিধবা হয়ে যান। স্বামীর বিচ্ছেদ তাঁর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু তিনি সবরের পথ ছাড়েননি। হযরত উমর (রা.) তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। [৩]

হযরত হাফসা (রা.)-এর ইদ্দত পূর্ণ হলে হযরত উমর (রা.) কন্যার ঘর বসানোর চিন্তায় মগ্ন হলেন এবং উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান শুরু করলেন। প্রথমে হযরত উসমান (রা.)-এর কথা মনে এল, কারণ তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রা.) কয়েকদিন আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন।

হযরত উমর (রা.) এই মহান ব্যক্তিদের অনাগ্রহে অসন্তুষ্ট হলেন এবং মনে কষ্ট পেলেন। বিষয়টি যখন নবী করীম (সা.) পর্যন্ত পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন: "চিন্তা করো না, হাফসা উসমানের চেয়ে উত্তম স্বামী পাবে এবং উসমান হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী পাবে।"

---

[১] আল-ইসতিআব: ১৮১১/৩। পিতার দিক থেকে বংশপরম্পরা হলো: হাফসা বিনতে উমর বিন আল-খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উযযা বিন রিয়াহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরত বিন রাযাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুআই... মাতার দিক থেকে বংশপরম্পরা হলো: হাফসা বিনতে যয়নব বিনতে মাজউন বিন ওয়াহাব বিন হুযাফা (উসদুল গাবাহ, তরজমা: হাফসা বিনতে উমর রা.)।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২২৭/২, তবাকাতুল কুবরা, আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ২৬৩/২।

[৩] আল-ইসতিআব: ১৮১১/৩, তবা' দারুল জীল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

কিছু দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই হযরত হাফসা (রা.)-কে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই বরকতময় বিবাহ সম্পন্ন হয়। এটি হিজরতের তৃতীয় বছরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মোহর চারশ দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। বিবাহের পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে বললেন:

“যখন তুমি হাফসার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেছিলে এবং আমি কোনো উত্তর দিইনি, তখন সম্ভবত তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছিলে।”

তিনি বললেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন: “এর কারণ কেবল এটাই ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর (হযরত হাফসা) কথা উল্লেখ করতে শুনেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। (এজন্য তোমার প্রস্তাবের ওপর আমি নীরব ছিলাম) যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে বিবাহ না করতেন, তবে আমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিতাম।” [১]

হযরত হাফসা (রা.) সেই পাঁচজন উম্মাহাতুল মুমিনিনের একজন ছিলেন যাদের কুরাইশ হওয়ার গৌরব অর্জিত ছিল। অর্থাৎ হযরত সাওদা, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত উম্মে হাবিবা এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.)।

ইবাদত ও রিয়াযতেও হযরত হাফসা (রা.) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সওম ও সালাতের আধিক্যের অবস্থা এমন ছিল যে, স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেছিলেন: “إِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ” (নিশ্চয়ই তিনি অধিক রোজা পালনকারী ও অধিক তাহাজ্জুদ আদায়কারী নারী)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতেন, খেদমতের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। নিজের পিতা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর আরাম-আয়েশেরও পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। [২]

লেখাপড়ার উচ্চ রুচি ছিল। কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানে তিনি প্রচুর অংশ পেয়েছিলেন। আপনার থেকে প্রায় ষাটটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা আপনার ইলমি রুচির প্রমাণ।

আপনার (রা.) বুদ্ধিমত্তার আন্দাজ এই ঘটনা থেকে করা যায় যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “ইনশাআল্লাহ তাআলা, তাদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং হুদায়বিয়ার সময় গাছের নিচে আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করেছে।”

এটি শুনে হযরত হাফসা (রা.) প্রশ্ন করলেন যে, আল্লাহ তাআলার ইরশাদ রয়েছে: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا (তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে এই জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে না)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আল্লাহ তাআলা এর সাথে এটিও তো বলেছেন: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (অতঃপর আমি মুত্তাকিদের নাজাত দেব এবং জালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব)।” [৩]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪০০৫, কিতাবুল মাগাযী, বাবু শুহুদিল মালাইকাতি বদরান; আসাদুল গাবাহ: হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর জীবনী।

[২] আসাদুল গাবাহ: ৭/৬৭ ত আল-ইলমিয়্যাহ।

[৩] হযরত হাফসা (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়াল-জওয়াবে উল্লিখিত আয়াতগুলো সূরা মারইয়ামের আয়াত (৭১, ৭২)।

“তারা হাঁটু গেড়ে পড়ে থাকত।” [১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কোনো কারণে হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এক তালাক দিয়েছিলেন; হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এতে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন যে তিনি এক মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং বললেন: “আমাকে জিবরাঈল আমীন বলেছেন: ‘হাফসার তালাক প্রত্যাহার করে নিন, কারণ তিনি অত্যন্ত রোজা পালনকারী, ইবাদতগুজার ও পরহেজগার নারী এবং জান্নাতেও তিনি আপনার স্ত্রী হবেন।’” [২]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন: “আজওয়াজে মুতাহহারাতের মধ্যে তিনিই আমার সমকক্ষ ছিলেন।” [৩]

হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কুরআন মাজীদ সংকলনের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্য থেকে কুরআন সংরক্ষণের জন্য হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নির্বাচন করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজীদের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। এই পাণ্ডুলিপি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিল। এরপর তাঁর পরে হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসে। তিনি এর সংরক্ষণের দায়িত্ব হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর অর্পণ করেন। এই কপিটি প্রায় পনের বছর পর্যন্ত তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। যখন হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে এর সাধারণ প্রচারের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে সেই কুরআনী পাণ্ডুলিপিটি চাইলেন, এর অনুলিপি তৈরি করিয়ে আবার তাঁকে ফেরত দিলেন। হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমার পরে এই কুরআন মাজীদ যেন আমার ভাই আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হেফাজতে দেওয়া হয়। এভাবে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণে তাঁর অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। [৪]

নিজের পিতার মতো তাঁর স্বভাবেও বীরত্ব ও সাহস ভরপুর ছিল, তাই তিনি কারো কাছে নতি স্বীকার করতেন না। সারা জীবন নফল রোজার গুরুত্ব দিতেন। ইন্তেকাল যখন হলো, তখনও সেই দিনগুলোতে তিনি একটানা রোজা রাখছিলেন। [৫]

দানশীলতার অবস্থা এই ছিল যে, পিতার কাছ থেকে মিরাসে তিনি গাবার কিছু জমি পেয়েছিলেন, মৃত্যুর আগে সেটিও সদকা করে দেন।

সঠিক মতানুসারে ইন্তেকাল ৪৫ হিজরীতে হয়েছে। একটি মত ২৭ হিজরীর কথা বলে, যা গবেষণার পরিপন্থী। তাঁর জানাজার নামাজ মদীনার গভর্নর মারওয়ান পড়িয়েছেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুও জানাজার নামাজে শরিক ছিলেন। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। ভাইদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আসিম, আর ভাতিজাদের মধ্যে হযরত সালিম, হযরত হামজা এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁকে কবরে নামান। [৬]

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওয়া আরদাহা

---

[১] মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ২৬৪৩০

[২] আল-আহাদ ওয়াল-মাসানি লি ইবনে আবি আসিম, খণ্ড: ৩০৫২, তাবা দারুর রায়াহ রিয়াদ

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২২৭, তাবা আর-রিসালাহ

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/৩৮২

[৫] “মা মাতাত হাফসাতু হাত্তা মা তুফতির” (আল-ইসাবাহ: ৮/৮৬ তাবা দারু সাদির)

[৬] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/৮৬ তাবা সাদির। সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২২৯ তাবা আর-রিসালাহ

## হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার আসল নাম ছিল হিন্দ। তাঁর পিতা আবু উমাইয়া মক্কার বিখ্যাত নেতা ও দানবীর ছিলেন। সফরে বের হলে তিনি পুরো কাফেলার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজেই নিতেন। তাঁর স্নেহের কোলে হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত আদর-যত্নে লালিত-পালিত হন। বিখ্যাত সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দুধভাই ছিলেন। [১]

তিনি তাঁর স্বামীর সাথে একেবারে শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) আবু সালামা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই এবং একজন দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামী-স্ত্রী হাবশার দিকে হিজরত করেন। কিছুদিন পর তাঁরা উভয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। [২] উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাঝেমধ্যে হাবশার সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করতেন এবং বলতেন যে, সেখানে খ্রিস্টানদের গির্জা “মারিয়া”-তে ছবি ও মূর্তি থাকত। [৩]

তাঁর মদীনায় হিজরতের ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যখন মুসলমানরা মদীনার দিকে হিজরত করেন, তখন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহাও তাঁর স্বামী এবং দুগ্ধপোষ্য পুত্র সালামার সাথে মক্কা থেকে বের হন। তাঁর পরিবারের লোকেরা পিছু ধাওয়া করে তাঁদের থামিয়ে দেয়। তাঁর স্বামী বাধ্য হয়ে তাঁদের এবং সন্তানকে রেখে একাকী মদীনায় চলে যান। এদিকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে সন্তানকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের, আত্মমর্যাদাশীল ও সংবেদনশীল ছিলেন। স্বামী ও সন্তানের বিচ্ছেদে তিনি প্রতিদিন নির্জন প্রান্তরের দিকে বেরিয়ে যেতেন এবং অঝোরে কাঁদতেন। তাঁর পরিবারের লোকদের মধ্যে কোনো অনুভূতি না জাগলেও কিছু লোক তাঁর কান্নাকাটি দেখে প্রভাবিত হয়ে তাঁর পরিবারের লোকদের লজ্জা দেয়। অবশেষে বংশের লোকেরা সন্তানকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেয়। তাঁর সাহসের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি উটের পিঠে চড়ে এই দীর্ঘ পথে একাই বেরিয়ে পড়েন। সৌভাগ্যবশত পথে কাবার চাবি রক্ষক উসমান বিন তালহা দেখা পান, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি কিন্তু অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল মানুষ ছিলেন। তিনি মঞ্জিলে মঞ্জিলে সাথে চলে তাঁকে মদীনার সামনে পৌঁছে দেন। যেহেতু তাঁর পরিবারের ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি বিখ্যাত ছিল, তাই মদীনার অধিবাসীরা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, তিনি সত্যিই আবু উমাইয়ার মেয়ে যিনি এত কষ্টকর সফর পাড়ি দিয়ে এসেছেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় কিছুদিন স্বামীর সান্নিধ্য নসিব হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আদর্শ ভালোবাসা ছিল। আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে লাগা কিছু ক্ষত খারাপের দিকে যায়। সেই দিনগুলোতে উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন: “শুনেছি যে, যদি কোনো নারী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ না করেন এবং স্বামী জান্নাতী হন, তবে আল্লাহ উভয়কে জান্নাতে একত্রিত করবেন। তো আসুন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, আপনি আমার পরে কোনো বিবাহ করবেন না, আর আমিও আপনার পরে কোনো বিবাহ করব না।”

---

[১] পৈতৃক বংশলতিকা হলো: হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া বিন মুগীরা বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মাখজুম। মায়ের দিক থেকে বংশলতিকা হলো: হিন্দ বিনতে আতিকা বিনতে আমির বিন রাবিআ বিন মালিক বিন জাযিমা বিন আলকামা (আসাদুল গাবাহ, তরজমা উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০৩/২, ত. আর-রিসালাহ।

[৩] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৩৪, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি ফিল বিয়াহ।

আবু সালামা (রা.) বললেন: “তুমি কি আমার কথা মানবে?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

তিনি বললেন: “দেখো! আমি যদি তোমার আগে মারা যাই, তবে তুমি অবশ্যই দ্বিতীয় বিবাহ করে নিও।”

একথা বলে তিনি দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! আমার পরে উম্মে সালামাকে আমার চেয়ে উত্তম একজন মানুষ দান করুন, যে তাকে দুঃখ দেবে না এবং কষ্ট দেবে না।” [১]

উম্মে সালামা (রা.) ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে?

আবু সালামা (রা.) তাঁকে এই হাদিস শোনালেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে, যখন কারো ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন সে যেন ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পড়ে এবং এই দোয়া করে: ‘আল্লাহুম্মা ইনদাকা আহতাসিবু মুসিবাতি ফাজুরনি ফিহা ওয়া আবদিলনি খাইরাম মিনহা’।”

(হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আমার বিপদের প্রতিদান চাই। আমাকে এর সওয়াব দান করো এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করো।)

কিছুদিন পর আবু সালামা (রা.)-এর মুমূর্ষু অবস্থা হলো, সেই শেষ মুহূর্তে তিনি এই দোয়া করছিলেন:

“হে আল্লাহ! আমার পরে আমার পরিবার-পরিজনের জন্য তুমিই উত্তম অভিভাবক হও।”

এরপর তিনি ইন্তেকাল করলেন। [২]

তাঁর মৃত্যুতে উম্মে সালামা (রা.) অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়লেন। আক্ষেপ ও দুঃখের সাথে তাঁর মুখ থেকে এই কথাগুলো বের হলো:

“আফসোস, প্রবাসে মৃত্যু হলো। আমি এমনভাবে বিলাপ করব যা স্মরণ রাখা হবে।” [৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন এবং ধৈর্যের উপদেশ দিলেন। [৪]

উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো দোয়া পড়তে লাগলেন: “আল্লাহুম্মা ইনদাকা আহতাসিবু মুসিবাতি ফাজুরনি ফিহা ওয়া আবদিলনি খাইরাম মিনহা”, কিন্তু এর শেষ শব্দগুলোর ওপর তাঁর আস্থা আসছিল না, সবসময় এই খেয়াল আসত যে আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে। উম্মে সালামা (রা.) তখন গর্ভবতী ছিলেন। দিন পূর্ণ হলে তিনি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। [৫]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২০৩, মুআসসাসাতুর রিসালাহ। তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/৮৭, দারু সাদির।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৬৬৬৯।

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২১২৭, কিতাবুল জানাইজ, বাবু বুকায়ি আলাল মাইয়্যিত।

[৪] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৫৯৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৬৬৬৯।

[৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/৮৯, দারু সাদির।

ফায়দা: এই সময়ে উম্মে সালামা (রা.)-এর চারজন সন্তান ছিল: সালামা, উমর, যয়নব এবং দুররা। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪৭০)। আর-রিসালাহ-তে আছে যে, উমর বিন আবি সালামা দুই ছেলের মধ্যে বড় ছিলেন, তিনি তাঁর মায়ের বিবাহ পড়িয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে ইসহাকের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে প্রমাণ করেছেন যে সালামা সবার বড় ছিলেন এবং তিনিই বিবাহ পড়িয়েছিলেন। (আল-ইসাবাহ: ৪/১২৬)। কিন্তু একটি বর্ণনা অনুযায়ী উম্মে সালামা (রা.) উমর বিন আবি সালামাকে নিজের ওলি বানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: হে উমর, ওঠো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিবাহ দাও। (সুনানে নাসাঈ মুজতাবা, হাদিস: ৩২৩৫, কিতাবুন নিকাহ, বাবু নিকাহিল ইবনি লি-উম্মিহি)। শেখ আলবানী এই বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। তবে সনদের দিক থেকে আমি দেখেছি যে এর সনদে কোনো রাবী দুর্বল নয়, বরং ইবনে উমর (মুহাম্মদ বিন উমর বিন আবি সালামা) গ্রহণযোগ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে মকবুল। সুতরাং এই বর্ণনাটি অন্তত হাসান পর্যায়ের। হতে পারে সালামা বড় ছিলেন কিন্তু উমর বিন আবি সালামা ছোট হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ পড়িয়েছিলেন। যাই হোক, এরপর উমর বিন আবি সালামা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লালন-পালনে বড় হন। আপনি তাঁকে খাওয়ার আদব শেখাতেন: বিসমিল্লাহ পড়ে খাও, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৫৩৮৮, কিতাবুল আশরিবা, বাবু আদাবিত তায়াম; সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১৮৫৮)। ধারণা করা হয় যে তিনি তখন বালেগ হওয়ার কাছাকাছি ছিলেন কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই (অর্থাৎ সাত বা আট বছরের মধ্যে) তাঁর বিবাহ হয়েছিল; এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রোজাদার কি চুম্বন করতে পারে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৩২, কিতাবুস সিয়াম, বাবু কুবলাতি ফিস সাওম)। হযরত আলী (রা.) যখন মদিনা থেকে ইরাকে স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন, তখন হযরত উম্মে সালামা (রা.) সাথে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন। তিনি তাঁর পরিবর্তে তাঁর ছেলে উমর বিন আবি সালামাকে পাঠিয়েছিলেন। উমর বিন আবি সালামা মুয়াবিয়া এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগ পেয়েছিলেন এবং ৮৩ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৪০৫, আর-রিসালাহ)।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

হিসসা আউয়াল

কিছু সময় পর ৪ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে আপনি ﷺ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি উত্তরে বলে পাঠালেন: 'আমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল, বয়সও অনেক হয়ে গেছে এবং আমি সন্তান-সন্ততি বিশিষ্ট।' [১]

এই অজুহাতও পেশ করলেন: 'আমার মুরুব্বিদের মধ্যে কেউ এখানে নেই।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সমস্ত বিষয় সত্ত্বেও তাকে বিবাহ করা পছন্দ করলেন। সন্তানদের ব্যাপারে বললেন যে তাদের লালন-পালন হয়ে যাবে, বয়সের ব্যাপারে বললেন যে আমি তো তোমার চেয়েও বেশি বয়সের, মুরুব্বিদের না থাকার জবাবে আপনি বললেন যে তোমার মুরুব্বিদের মধ্যে কেউই এই বিবাহে অসন্তুষ্ট হবে না। ফলে তিনি রাজি হয়ে গেলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হলো। [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দুটি যাঁতা, একটি মটকা এবং খেজুরের ছাল ভর্তি একটি বালিশ দিলেন। অন্যান্য স্ত্রীদেরও এই আসবাবপত্রই দেওয়া হয়েছিল। [৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে তাকে একটি হুজরায় পাঠিয়ে দিলেন, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:

'আমি দেখলাম সেখানে একটি কলসিতে সামান্য কিছু যব আছে, একটি যাঁতা আছে, একটি হাঁড়ি আছে এবং চর্বির তেলের একটি কুপী আছে। আমি যব বের করে তা যাঁতায় পিষলাম, তারপর তা হাঁড়িতে চড়িয়ে দিলাম এবং তেল মিশিয়ে সালন তৈরি করলাম। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরিবারের বাসর রাতের খাবার।' [৪]

হাদীস বর্ণনাকারীরা এই ঘটনা শুনিয়ে বলতেন: 'আরবের সরদারের মেয়ে, রাসূলদের সরদারের বিবাহে আসলেন, রাতের শুরুতে তিনি কনে ছিলেন এবং শেষ রাতে নিজেই যাঁতা পিষছিলেন।' [৫]

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি ছিলেন অনন্য। হুদায়বিয়ার সন্ধির সফরে তিনি সাথে ছিলেন। যখন কুরাইশদের সাথে আলোচনায় স্থির হলো যে এই বছর উমরা করা হবে না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে ইহরাম খোলার, কোরবানি করার এবং মাথা মুণ্ডানোর নির্দেশ দিলেন। যেহেতু চুক্তির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল, তাই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ব্যক্তিরাও দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন, উমরা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কষ্ট ছিল তার ওপর বাড়তি। তাই কেউ আগে বাড়ার সাহস পাচ্ছিলেন না। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন দেখলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন যে আপনি নিজে আগে বেড়ে আপনার পশু জবেহ করুন এবং মাথা মুণ্ডিয়ে নিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সঠিক পরামর্শের ওপর আমল করলেন। আপনাকে দেখে সবাই পাগলের মতো উঠে দাঁড়ালেন এবং আপনার অনুসরণ করে ইহরাম খুলে ফেললেন। [৬]

---

[১] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি, খণ্ড: ২৩/ ৪৭৩, তাবা মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া কায়রো

[২] সুনানে নাসাঈ আল-মুজতাবা, হা: ৩২৫৩, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ইনকাহিল ইবনি লি-উম্মিহি; মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৪২১, ২৬৬৬৯

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৬২৯

[৪] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/ ৯১, তাবা সাদির

[৫] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/ ৯১

[৬] সহীহ আল-বুখারী, হা: ২৭৩১, কিতাবুল শুরুত, বাবুশ শুরুতি ফিল জিহাদ

হাদিস মুখস্থ করার প্রতি তাঁর এতই আগ্রহ ছিল যে, একদিন তিনি চুলের বেণী করাচ্ছিলেন, এমন সময় মসজিদে নববী থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠস্বর ভেসে এল: "হে লোকসকল!" উম্মুল মুমিনীন তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে থেকেই পুরো খুতবা শুনতে থাকলেন। [১]

জ্ঞানের প্রতি এই প্রবল আগ্রহের কারণে তিনি ফকিহ সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলেন। [২] উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে জ্ঞান ও মর্যাদার দিক থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার পরেই ছিল তাঁর স্থান। বিশেষ করে পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলাসমূহ তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর থেকে ৩৭৮টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। [৩] এবং অধিকাংশ বর্ণনা বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে অর্থাৎ বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বিদ্যমান। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনগণ তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। মদিনার শাসক মারওয়ান লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিতেন এবং বলতেন: "উম্মুল মুমিনীনদের উপস্থিতিতে আমরা কেন অন্য কারো কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করব।" [৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবীগণও মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হতেন। [৫] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন যে, যদি তাঁর ফতোয়াসমূহ একত্রিত করা হয় তবে একটি পুস্তিকা তৈরি হয়ে যাবে। [৬]

তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কারী এবং সুকণ্ঠী ছিলেন, কুরআন মাজিদ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণে তিলাওয়াত করতে পারতেন। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত যে রাসুলুল্লাহ ﷺ কীভাবে কিরাত পাঠ করতেন, তবে তিনি সেভাবেই তিলাওয়াত করে দেখাতেন। [৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিল যে, এক সফরে হযরত বিলাল এবং হযরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহৃত পানি পান করতে দেখে পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দিলেন: "তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু বাঁচিয়ে রেখো।" তাঁরা অবশিষ্ট পানি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [৮]

তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু চুল বরকত হিসেবে সংরক্ষণ করেছিলেন। মানুষকে তিনি সেগুলো জিয়ারত করাতেন। [৯]

হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা সমস্ত আজওয়াজে মুতাহহারাতের পর ৬৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [১০] তাঁর পুত্র উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কবরে নামান। [১১]

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ওয়া আরদাহা।

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৫৩৬

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২০৩, ত: আর-রিসালাহ

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১০, ত: আর-রিসালাহ

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৬৯৬

[৫] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৫৮৬, ২৫৯৭৩

[৬] ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন: ১/১০, ত: আল-ইলমিয়্যাহ

[৭] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৫৮৩

[৮] সহিহ আল-বুখারি, হা: ৩৩২৮, কিতাবুল মাগাজি, বাব গাজওয়ায়ে তায়েফ

[৯] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৫৩৫

[১০] আল-ইসাবাহ: ৮/৩১২... যদিও একটি বর্ণনা ৫৯ হিজরি এবং একটি ৬১ হিজরিরও রয়েছে, তবে ৬৩ হিজরির বর্ণনাটিই অগ্রগণ্য। কারণ ১২ই জিলহজ ৬৩ হিজরিতে হাররার ঘটনা ঘটে, এরপর তিন দিন পর্যন্ত মদিনায় লুটতরাজ চলে। অতঃপর মুসলিম বিন উকবা ৬৩ হিজরির শুরুতে মদিনাবাসীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক বায়আত গ্রহণ করলে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা একে সবচেয়ে বড় গোমরাহি বলে অভিহিত করেন। (আল-ইসাবাহ: ৮/৪৮০, ত: আল-ইলমিয়্যাহ) এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি ৬৩ হিজরির শুরুর দিকে জীবিত ছিলেন এবং এরপর একই বছর তাঁর মৃত্যু হয়।

[১১] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৮/৯৬, ত: সাদির

নোট: তাবাকাতের এই বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল ৮৪ বছর। এই বর্ণনা অনুযায়ী ৩ হিজরিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর। কিন্তু আল্লামা জিরিকলি তাঁর জন্ম হিজরতের ২৮ বছর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। (আল-আলাম: ৯/১৮) এই হিসেবে বিবাহের সময় তাঁর বয়স হবে ৩২ বছর। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহের প্রস্তাবের জবাবে তাঁর এই কথা বলা যে, "আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে", প্রমাণ করে যে এই বর্ণনাটিই অগ্রগণ্য। অন্যথায় ২৪ বছর তো বিবাহের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত বয়স। এই দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হবে ৯২ বছর।

## উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাতো বোন ছিলেন। [১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবাহ নিজের আযাদকৃত গোলাম এবং পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর দাসত্বের ছাপ লেগে ছিল, তাই হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা এই প্রস্তাব পছন্দ করেননি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের পালনার্থে তখন রাজি হয়ে যান।

প্রায় এক বছর পর্যন্ত তিনি হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিবাহবন্ধনে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের স্বভাবের মিল হয়নি, ক্রমাগত মনোমালিন্য চলতে থাকে। অবশেষে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে বিরত রাখেন, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনোভাবেই মিল হলো না এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ পর্যন্ত তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন।

যেহেতু তিনি যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিবাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় করেছিলেন, তাই যখন তাঁর তালাক হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গতভাবেই মনে করলেন যে, তাঁর যতটুকু মনোভঙ্গ হয়েছে, তার প্রতিকার তখনই হতে পারে যদি তিনি নিজেই তাঁকে বিবাহ করে নেন। কিন্তু বাধা ছিল এই যে, আরবের লোকেরা পালক পুত্রকে আপন পুত্রের সমান মনে করত। তাই আশঙ্কা ছিল যে লোকেরা বলবে: পুত্রবধূর সাথে বিবাহ করেছেন। যেহেতু এটি জাহেলিয়াত যুগের একটি প্রথা ছিল যা দূর করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অর্পিত দায়িত্বও ছিল, তাই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হলো:

“وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا” [২]

“স্মরণ করুন যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে বলছিলেন যার ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং যার ওপর আপনিও অনুগ্রহ করেছেন যে, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর আপনি আপনার মনে সেই কথা গোপন রাখছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন। আর আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন অথচ আল্লাহ তাআলাই এর অধিক হকদার যে আপনি তাঁকে ভয় করবেন। অতঃপর যখন যায়েদ সেই মহিলার সাথে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা তাঁর সাথে আপনার বিবাহ করিয়ে দিলাম, যাতে মুমিনদের ওপর তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা না থাকে যখন তারা তাদের থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে নেয়। আর আল্লাহর ফয়সালা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।”

---

[১] তাঁর পিতৃবংশীয় নসব হলো: যয়নব বিনতে জাহাশ বিন রিয়াব বিন ইয়ামুর বিন সাবরা বিন মুররা বিন কাসীর বিন গানাম বিন দুদান বিন আসাদ বিন খুযাইমা। এই পরিবার বনু আসাদ নামে পরিচিত ছিল। মায়ের দিক থেকে নসব হলো: যয়নব বিনতে উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। (উসদুল গাবাহ, জীবনী: যয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা)

[২] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৭

যেহেতু জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এর নিকাহর নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছিলেন, তাই এই নিকাহতে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক ছিল না এবং আলাদাভাবে নিকাহর কোনো অনুষ্ঠানও হয়নি। বরং আল্লাহর নির্দেশ 'যাওয়াজ্‌নাকাহা' (আমি তাকে আপনার সাথে নিকাহ করিয়ে দিয়েছি)-এর মাধ্যমে নিকাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। এই ঘটনা ৫ হিজরীর। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। [১]

এভাবে মানুষ জানতে পারল যে, পালক পুত্র আসল সন্তানের মর্যাদা রাখে না এবং তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর (বিয়ে করা) হারাম নয়। যারা একে শরীয়তসম্মতভাবে হালাল হওয়া সত্ত্বেও হারাম মনে করত, তারা বাস্তবতা জানতে পারল এবং জাহেলিয়াতের এই প্রথা বিলুপ্ত হলো। এই প্রাচীন প্রথাটি বিলোপ করা তখনই সম্ভব ছিল যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে তা করে দেখাতেন। তাই এই নিকাহ উম্মতের জন্য অত্যন্ত রহমত ও বরকতের কারণ হয়েছে এবং শত শত বছরের একটি কুপ্রথা থেকে মানবতা মুক্তি পেয়েছে। [২]

এই নিকাহ সম্পর্কে কিছু অনুপযুক্ত বর্ণনাও প্রসিদ্ধ আছে যা অত্যন্ত দুর্বল। কিছু ঐতিহাসিক ও মুফাসসির সেগুলো সমালোচনা ছাড়াই উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু গবেষকগণ দলীলসহ সেগুলো খণ্ডন করেছেন।

হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এর মধ্যে অনেক গুণ ছিল যা তাঁকে অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনদের থেকে স্বতন্ত্র করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু উমায়মাহ-এর কন্যা ছিলেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে তাঁর চেয়ে নিকটাত্মীয় আর কেউ ছিল না। তাঁর নিকাহর নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছিলেন। পবিত্র স্ত্রীদের প্রত্যেকেরই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে অধিক নৈকট্যের আশা থাকত, কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর পর এই সৌভাগ্য জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এরই সবচেয়ে বেশি নসিব হয়েছিল। এজন্য হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলতেন যে, তিনি আমার সমকক্ষ ছিলেন।

জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) অত্যন্ত নেককার, রোজা পালনকারী এবং ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ নারী ছিলেন। রাতের বেলা জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন: "ইন্নাহা আওয়াহাহ" (নিঃসন্দেহে তিনি কান্নাকাটি ও দোয়ায় মগ্ন থাকেন)।

দানশীলতা ও বদান্যতায় তিনি সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। নিজের হাতের পরিশ্রমে উপার্জন করতেন এবং আল্লাহর পথে সদকা করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন বলেছিলেন: "তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে বেশি লম্বা, সে-ই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে।" উম্মাহাতুল মুমিনীনগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর একে অপরের হাত মেপে দেখতেন। হযরত সাওদা (রা.) দীর্ঘদেহী ছিলেন, তাই তাঁর হাতই সবচেয়ে লম্বা ছিল। ধারণা করা হয়েছিল যে, তিনিই সবার আগে ইন্তেকাল করবেন। জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) তুলনামূলকভাবে খাটো ছিলেন, তাই তাঁর দিকে কারো খেয়াল যায়নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে তিনিই সবার আগে ইন্তেকাল করেন। এটি ২০ হিজরীর ঘটনা। তখন সবাই বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীতে 'হাতের দৈর্ঘ্য' দ্বারা 'দানশীলতা' উদ্দেশ্য ছিল এবং এই গুণে নিঃসন্দেহে জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। [৩]

রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ওয়া আরদাহা।

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১১ থেকে ২১৭।

[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীর সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৭।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১১ থেকে ২১৮।

**তারিখে মিল্লাতে মুসলিমা** (মুসলিম জাতির ইতিহাস) — প্রথম খণ্ড

## উম্মুল মুমিনীন রামলা বিনতে আবি সুফিয়ান, হযরত উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা

হযরত উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা কুরাইশ নেতা হযরত আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহুর কন্যা এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর আপন বোন ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল রামলা, তবে তিনি উম্মে হাবিবা উপনামে (কুনিয়াত) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো বোন হতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ঈমান আনেন এবং নিজের স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তবে উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা ইসলামের ওপর অটল থাকেন। [১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবাসে তাঁর অসহায়ত্ব এবং ইসলামের ওপর অবিচল থাকার কথা জানতে পেরে হাবশার বাদশাহ নাজাশীর কাছে পয়গাম পাঠান যে, তাঁর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হোক; যদি তিনি রাজি হন তবে যেন তাঁর সাথে আমার নিকাহ পড়িয়ে দেওয়া হয়। হযরত উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই সৌভাগ্য গ্রহণ করেন এবং নাজাশী দরবারে রিসালাতের উকিল হয়ে চার হাজার দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে এই নিকাহ সম্পন্ন করান।

নিকাহের কিছুদিন পর নাজাশী উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহাকে শুরাহবিল ইবনে হাসানা রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। [২]

উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহার ঈমানি গায়রাত বা আত্মমর্যাদাবোধ এমন ছিল যে, তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের আগে একবার কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির দূত হয়ে মদিনায় আসেন। এই সময় তিনি নিজের মেয়ের ঘরেও আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানায় বসতে উদ্যত হলে উম্মে হাবিবা দ্রুত বিছানাটি গুটিয়ে ফেলেন যাতে পিতা তার ওপর বসতে না পারেন। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: “এটি আল্লাহর রাসূলের বিছানা আর আপনি একজন অপবিত্র মুশরিক।” [৩]

উম্মুল মুমিনীন হওয়ার মর্যাদা লাভের পাশাপাশি হযরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর বোন হওয়ার কারণে মুসলিম বিশ্বে তাঁর অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ ও বিনয়ী জীবন অতিবাহিত করেন। ৪৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, শেষ মুহূর্তে হযরত আয়েশা এবং হযরত উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহুমাকে আলাদাভাবে ডেকে বললেন: “সতীন হওয়ার কারণে আমাদের মাঝে হকের ব্যাপারে যে কমবেশি হয়েছে, দোয়া করো আল্লাহ যেন তা ক্ষমা করে দেন।” উম্মাহাতুল মুমিনীন অত্যন্ত উদারতার সাথে বললেন: “যা কিছু হয়েছে আল্লাহ ক্ষমা করুন।” তখন তিনি তৃপ্তি পেলেন। [৪]

উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা ইলম ও ফজিলতে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর থেকে ৬৫টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যা তাঁর ইলমি যোগ্যতার প্রমাণ। [৫]

রাদিআল্লাহু তা’আলা আনহা ওয়া আরদাহা।

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৯৬, ত. সাদির। হযরত উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহার পিতৃবংশের সিলসিলা হলো: রামলা বিনতে সাখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। মায়ের দিক থেকে বংশধারা হলো: রামলা বিনতে সাফিয়া বিনতে আবুল আস। আবুল আস-এর মাধ্যমে তাঁর বংশধারা হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে মিলে যায়।

[২] মুসনাদে আহমদ: ২৭৩০৮। পর্দার ঘটনা।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৯৯, ত. সাদির।

[৪] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/১০০।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২১৯, আর-রিসালাহ।

## উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.)

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বনু মুস্তালিকের সর্দার হারিস বিন আবি যিরার-এর কন্যা ছিলেন। [১] ৫ হিজরীতে গাযওয়ায়ে মুরাইসীতে তিনি বন্দী হন, এই যুদ্ধে তাঁর স্বামী মুসাফি বিন সাফওয়ান নিহত হন। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বন্দী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সুপারিশ করলেন যে আমার কন্যাকে মুক্ত করে দেওয়া হোক, তখন আপনি হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-কে ইখতিয়ার (পছন্দ করার সুযোগ) দিলেন যে তিনি চাইলে চলে যেতে পারেন, আর চাইলে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তাঁর জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারত। তিনি বললেন: “আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।” এভাবে তিনি আপনার (সা.) নিকাহে আসলেন। এই খুশিতে মুসলমানরা তাঁর গোত্রের বন্দীদের মুক্ত করে দিলেন। এই উত্তম আচরণের কারণে তাঁর পিতামাতাসহ পুরো গোত্রের লোক মুসলমান হয়ে গেল। সাইয়্যেদা জুওয়াইরিয়া (রা.) অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিলেন। ফজরের নামাযের পর জায়নামাজে বসে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। [২] তাঁর মৃত্যু ৫৬ হিজরীতে হয় এবং মদীনার শাসক মারওয়ান বিন আল-হাকাম জানাযার নামায পড়ান। [৩]

রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহা ওয়া আরযাহা

---

**উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রা.)**

হযরত সাফিয়্যাহ (রা.)-এর সম্পর্ক ছিল একটি ইসরাঈলী পরিবারের সাথে যার বংশপরম্পরা হযরত হারুন (আ.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর পিতা হুয়াই বিন আখতাব বনু নাযীরের ইহুদীদের সর্দার ছিল যে গাযওয়ায়ে বনু নাযীরে নিহত হয়। একইভাবে তাঁর স্বামী কিনানা বিন আবিল হুকাইকও চরম ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী ছিল। গাযওয়ায়ে খায়বারে সেও নিহত হয়। হযরত সাফিয়্যাহ (রা.)-এর কাছে ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি ঈমান নিয়ে আসলেন। আপনি (সা.) তাঁর সাথে নিকাহ করলেন। এটি ৭ হিজরীর ঘটনা। সে সময় তাঁর বয়স ছিল সতেরো বছর। [৪] ৫০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। [৫]

রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহা ওয়া আরযাহা

[১] হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর গোত্র বনু খুযাআ-এর একটি শাখা ছিল। বংশলতিকা নিম্নরূপ: জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস বিন আবি যিরার বিন হাবীব বিন আইয বিন মালিক বিন জাযীমা (মুস্তালিক) বিন সাদ বিন আমর বিন রাবীআ (আসাদুল গাবাহ, তরজমা: জুওয়াইরিয়া রা.)।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৬১, ২৬২, ত. আর-রিসালাহ।

[৩] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৫৫৫, আবওয়াবুদ দাওয়াত।

[৪] তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী তাদমুরী: ৩/১৯০; বাশার: ২/৩৮১।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৩২, ত. আর-রিসালাহ।

হযরত সাফিয়্যাহ (রা.)-এর বংশলতিকা নিম্নরূপ: সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই বিন আখতাব বিন সা’ইয়াহ বিন সা’লাবা বিন উবাইদ বিন কাব বিন খাযরাজ বিন আবি হাবীব (আসাদুল গাবাহ: ৭/১৬৮)।

## উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমাহ হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা

হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমাহ তাঁর দানশীলতার কারণে ‘উম্মুল মাসাকীন’ (মিসকীনদের মাতা) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমে তিনি তুফাইল বিন হারিসের বিবাহে ছিলেন, তিনি তাকে তালাক দিয়ে দেন; এরপর তাঁর ভাই উবাইদাহ বিন হারিসের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনিও বদর যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান [১]। সাধারণ সীরাতকার ও ঐতিহাসিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর বিবাহের তারিখ ৩ রমজান ৩ হিজরী উল্লেখ করেছেন [২]। বাসর যাপনের মাত্র আট মাস পর তাঁর ইন্তেকাল হয় [৩]। হযরত খাদিজার পর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর [৪]।

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওয়া আরদাহা।

---

**উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস হিলালিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা**

হযরত মায়মুনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচী, উম্মুল ফযলের বোন এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের আপন খালা ছিলেন। প্রথমে তিনি মাসউদ বিন আমর নামক এক ব্যক্তির বিবাহে ছিলেন, তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলে আবু রুহমের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহে আসেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ স্ত্রী। তাঁর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আর কোনো বিবাহ করেননি [৫]। ৭ হিজরীতে উমরাতুল কাযার জন্য যাওয়ার পথে ‘সারাফ’ নামক জনপদে বিবাহের আকদ হয়। ফেরার পথে বাসর যাপন হয়। ৫১ হিজরীতে হজ্জের সফরে এই একই স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং সেই শামিয়ানার নিচেই তাঁকে দাফন করা হয় যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল [৬]।

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওয়া আরদাহা।

[১] আল-ইসাবাহ: ৮/৯১, ৯২; আল-ইসতিআব: ৩/১৮৫৩।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/১১৫... তবে অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি শেষ নারী যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহে আসেন। (আরও দেখুন: মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৬৭১৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা, দারুর রিসালাহ: ২/২৫৩; মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: ১৩৯৯৫, আল-মাজলিসুল ইলমি পাকিস্তান; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ২৪/৭৫, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়্যাহ কায়রো। আল-কিন্দি তাঁকে একাদশতম এবং শেষ স্ত্রী হিসেবে গণ্য করেছেন। আস-সুলুক ফি তাবাকাতিল উলামা ওয়াল মুলুক: ১/৭৬, সানা)।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/১১৫, দার সাদর।

[৪] আল-ইসাবাহ: ৮/৯১, ৯২; আল-ইসতিআব: ৩/১৮৫৩।

বংশপরম্পরা হলো: যয়নব বিনতে খুযাইমাহ বিন আল-হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আব্দ মানাফ বিন হিলাল বিন আমির বিন সা’সাআ।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৩৫, দারুর রিসালাহ।

হযরত মায়মুনার বংশপরম্পরা হলো: মায়মুনা বিনতে আল-হারিস বিন হাযন বিন বুজাইর বিন হারাম।

মায়ের দিক থেকে বংশপরম্পরা হলো: মায়মুনা বিনতে হিন্দ বিনতে আওফ বিন আল-হারিস বিন হামাতাহ বিন জুরাশ।

**আজওয়াজে মুতাহহারাতদের সাথে কোনো উম্মতির বিবাহ কেন বৈধ ছিল না?**

কুরআন মাজীদের নির্দেশ অনুযায়ী হুজুর ﷺ-এর দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর কোনো উম্মতির জন্য আজওয়াজে মুতাহহারাতদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি ছিল না। এ বিষয়ে আল্লাহর এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল:

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“আর তোমাদের জন্য এটিও বৈধ নয় যে, তোমরা তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদের কখনো বিবাহ করবে। আল্লাহর নিকট এটি অত্যন্ত গুরুতর (পাপের) বিষয়।” [১]

এই নির্দেশের পেছনে কী কী হিকমত ছিল? উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যার সারকথা হলো তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল:

•

১. কুরআন মাজীদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা মুসলমানদের মা:
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।) [২]
এই সম্মানকে অবমাননা থেকে রক্ষা করার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

•

২. একজন মুসলিম নারীর বিবাহ জান্নাতে সেই পুরুষের সাথেই হবে যিনি দুনিয়াতে তাঁর শেষ স্বামী ছিলেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে হুজুর ﷺ-এর সাহচর্য নির্ধারিত। তাই এটি স্থির করে দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁরা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবেন না। [৩]

•

৩. আম্বিয়ায়ে কেরাম দুনিয়া থেকে পর্দা করা সত্ত্বেও এক বিশেষ হায়াত বা জীবন লাভ করেন এবং রূহে মুবারকের সাথে ভৌত দেহের এক বিশেষ সংযোগও থাকে। এই কারণে হুজুর ﷺ-এর ওফাতের পরেও আজওয়াজে মুতাহহারাতদের সাথে বিবাহের সম্পর্ক কিছু কারণে অবশিষ্ট ছিল। উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ না হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. বলেন:
“রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাতের মর্যাদা এমন যেমন কোনো জীবিত স্বামী ঘর থেকে অনুপস্থিত থাকেন। এই কারণেই হুজুর ﷺ-এর মিরাস বণ্টন করা হয়নি।” [৪]

---

[১] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৩

[২] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬

[৩] হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, যদি তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী হতে পছন্দ করো তবে আমার পরে বিবাহ করো না, কারণ জান্নাতে নারী তার শেষ স্বামীর জন্য হবে। এই কারণেই নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য তাঁর পরে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে কারণ তাঁরা জান্নাতে তাঁরই স্ত্রী। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২ / ৩০৮ ত. আর-রিসালাহ)

[৪] মাআরিফুল কুরআন: ৭ / ২০৩

## সীরাতে নববী এবং বহুবিবাহ

মুস্তাশরিকগণ (প্রাচ্যবিদরা) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীদের সংখ্যাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের সত্যতার ওপর আক্রমণ করে আসছে। কিছু হিন্দু পণ্ডিতও এ ব্যাপারে সংকীর্ণমনা প্রদর্শন করেছেন। কেবল আপত্তির খাতিরে করা আপত্তির তো কোনো জবাব হতে পারে না; তবে সুস্থ বিবেকের অধিকারী লোকদের সন্তুষ্টির জন্য এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা যথেষ্ট হবে।

১. ইসলামের আগেও বিশ্বের অধিকাংশ ধর্ম এবং অধিকাংশ অঞ্চলে একের অধিক বিবাহের প্রচলন ছিল। আরব, হিন্দুস্তান, ইরান, মিসর, ইউনান (গ্রিস) এবং ব্যাবিলন প্রভৃতির ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, প্রতিটি জাতির অভিজাতদের একাধিক স্ত্রী থাকত। বর্তমান বাইবেল অনুযায়ী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর সাতশ স্ত্রী এবং তিনশ উপপত্নী ছিল [১]। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর নিরানব্বই জন স্ত্রী ছিল, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম-এর তিন জন এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর চার জন করে স্ত্রী ছিল [২]।

বহুবিবাহের প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তাকে আজও অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘকাল ধরে ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বহুবিবাহের বিরোধিতা করে আসছিল, কিন্তু এখন তারা এর প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছে এবং সেখানেও এই প্রাকৃতিক অবকাশকে সাধারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একজন খ্রিস্টান পণ্ডিত জন ড্যাভেনপোর্ট বাইবেলের সমর্থনে বহুবিবাহের পক্ষে বেশ কিছু উদ্ধৃতি পেশ করে লিখেছেন: “বহুবিবাহ কেবল পছন্দনীয়ই নয়, বরং খোদা এতে বিশেষ বরকত দিয়েছেন।”

যদি দেখা যায়, তবে ইসলাম বহুবিবাহের প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তাকে সবচেয়ে উপযুক্ত রূপ দিয়েছে। ইসলামের আগে বিবাহের সংখ্যার কোনো সীমা ছিল না; বাদশাহদের অধীনে চার-চার হাজার নারী থাকত। খ্রিস্টান পাদ্রিরা অনবরত বহুবিবাহে অভ্যস্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানিতে এর সাধারণ প্রচলন ছিল। শাহ ফিলিপ এবং তার উত্তরসূরিদের অনেক স্ত্রী ছিল। হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অসীম সংখ্যক বিবাহকে বৈধ মনে করে। শ্রী কৃষ্ণ জি, যাকে হিন্দুদের মধ্যে মহান অবতার মনে করা হয়, তার শত শত স্ত্রী ছিল। মনু জি, যিনি হিন্দুদের বড় নেতা, ধর্মশাস্ত্রে লিখেছেন যে, যদি একজন ব্যক্তির চার বা পাঁচজন স্ত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে একজনের সন্তান হয়, তবে বাকিরাও সেই সন্তানের মা বলে গণ্য হবে [৩]।

ইসলামের আগে কোনো ধর্ম বা আইন বিবাহের সংখ্যার ওপর কোনো সীমা আরোপ করেনি। ইসলাম এই সংখ্যাকে সর্বোচ্চ চারে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আর তাকিদ দিয়েছে যে, সবার মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে, আর যদি সেই সামর্থ্য না থাকে তবে একজনের বেশি রাখা জুলুম। এই হুকুম অনুযায়ী চারের অধিক স্ত্রী বিবাহে রাখা হারাম হয়ে গেল। যেসব সাহাবী চারের অধিক বিবাহ করেছিলেন, তারা অতিরিক্ত স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিলেন।

---

[১] বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, রাজাবলি: ১১/৩।

[২] বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, আদিপুস্তক: ৩০/৩৯।

[৩] মনু শাস্ত্র, অধ্যায়: ৯, শ্লোক: ১৮২।

তারিখ উম্মত মুসলিমা

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের সংখ্যা কেন চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার বেশ কিছু কারণ ও হিকমত রয়েছে, যেমন:

- ১. উম্মাহাতুল মুমিনীন অন্য নারীদের মতো নন। স্বয়ং কুরআনের ইরশাদ হলো: يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ (হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও) [১]। তাঁরা সমগ্র উম্মতের মা। রাসূল ﷺ-এর পর তাঁরা কারো নিকাহে আসতে পারতেন না। তাই জরুরি ছিল যে, আজওয়াজে মুতাহহারাতের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-কে কিছু বিশেষত্ব প্রদান করা হোক। ফলে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা রাসূল ﷺ-এর জন্য বিশেষত্ব হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

- ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক জীবনের অবস্থা, যা উম্মতের জন্য জীবনবিধান, তা আজওয়াজে মুতাহহারাতের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারত। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র উম্মতে মুসলিমা থেকে নির্বাচন করে এগারোজন নারীকে আপনার ﷺ ঘরের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যদি এমনটা না হতো, তবে পারিবারিক জীবনের শরয়ী বিধানসমূহ আমাদের কাছে কীভাবে পৌঁছাত?

- ৩. কিছু নিকাহের একটি উদ্দেশ্য ছিল গোত্রগুলোর সাথে আত্মীয়তা তৈরি করে তাদের দ্বীনের নিকটবর্তী করা। ফলে এই উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সফল হতে থাকে। যেমন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর সাথে নিকাহের কারণে তাঁর পুরো গোত্র বনু মুস্তালিক ইসলাম গ্রহণ করে।

- ৪. কিছু নারীর স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন এবং রাসূল ﷺ তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁদের সাথে নিকাহ করেছিলেন, যেমন হযরত হাফসা (রা.) এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.)। তাঁদের পর উল্লিখিত মসলহাতের ভিত্তিতে আরও নিকাহ করা হয়। সেই সময় যদি সাধারণ শরয়ী নিয়ম কার্যকর করা হতো, তবে আরও নিকাহ করার সময় চারজন ব্যতীত বাকি আজওয়াজে মুতাহহারাতকে তালাক দিয়ে আলাদা করতে হতো এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন হওয়ার কারণে তাঁরা অন্য কোথাও নিকাহও করতে পারতেন না। তাহলে ধারণা করুন, এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের মনে কতটা আঘাত লাগত। তাই তাঁদের এই শোক থেকে বাঁচাতে রাসূল ﷺ-কে চারের অধিক নিকাহের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর হাবীব ﷺ এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ।

- ৫. বহুবিবাহকে যারা নফসের খাহেশ বা কামলিপ্সার ওপর চাপিয়ে দেয়, তারা ভেবে দেখুক যে, রাসূল ﷺ যদি চাইতেন তবে আরবের যত কুমারী নারী চাইতেন তাদের সাথে নিকাহ করতে পারতেন, কিন্তু আপনার নিকাহে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ব্যতীত কোনো কুমারী নারী ছিলেন না। প্রত্যেকেই ছিলেন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা। এরপর মোবারক জীবনের ৫৩ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মাত্র একজন স্ত্রীর ওপরই তুষ্ট ছিলেন। বাকি সব নিকাহ শেষ দশ বছরে হয়েছে। যদি নফসের খাহেশের সামান্যতম কোনো বিষয় থাকত, তবে এই নিকাহগুলো যৌবনে হওয়া উচিত ছিল, বার্ধক্যে নয়।

- ৬. মক্কী জীবনে যখন কাফেররা ইসলামের চরম বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল, সেই সময়েও তারা নফসের খাহেশের বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর ওপর কোনো অপবাদ দেয়নি। যদি অপবাদের সামান্যতম সুযোগ থাকত, তবে আরবের কাফেররা তা বাড়িয়ে চড়িয়ে বর্ণনা করত। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবন সবার সামনে ছিল। তাই কেউ এমনটা ভাবতেও পারত না। সুতরাং বহুবিবাহের বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর ওপর কটূক্তি কেবল সেই করতে পারে যে বিবেকের অন্ধ এবং বিদ্বেষগ্রস্ত।

---

[১] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩২

## আওলাদে আতহার

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল পুত্রসন্তান শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। সেই সময় বর্ণনা সংরক্ষণকারী সাহাবীগণের জামাত তৈরি হয়নি, তাই পুত্রসন্তানদের সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

সম্মানিত পুত্রগণ:

নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ মত হলো এই যে, তাঁর তিনজন সাহেবজাদা ছিলেন:

১. কাসেম

২. আবদুল্লাহ (যাঁকে তৈয়ব ও তাহের উপাধিতেও ডাকা হতো।)

৩. ইব্রাহিম

কাসেম ও আবদুল্লাহ হযরত খাদিজা رضی اللہ عنہا-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই আবদুল্লাহরই অন্য নাম ছিল তৈয়ব ও তাহের। [১] আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত কাসেম জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুনিয়াত 'আবুল কাসেম' তাঁরই সম্পর্কের ভিত্তিতে ছিল।

হযরত ইব্রাহিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মে ওয়ালাদ মারিয়া কিবতিয়া رضی اللہ عنہا-এর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বশেষ সন্তান। হযরত ইব্রাহিম ব্যতীত সকল সন্তান হযরত খাদিজা رضی اللہ عنہا-এর গর্ভজাত ছিলেন এবং অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো সন্তান হয়নি। [২]

ইব্রাহিমের জন্ম ৮ হিজরীর জিলহজ মাসে (মক্কায়) হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তম দিনে দুটি দুম্বা কুরবানী করেন, আকীকা করেন [৩] এবং নিজের প্রপিতামহের নামানুসারে তাঁর নাম 'ইব্রাহিম' রাখেন। মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী জনৈক কামার আবু সাইফ رضی اللہ عنہ-এর স্ত্রী উম্মে সাইফ শিশুর ধাত্রী নিযুক্ত হন। নবী করীম ﷺ এই পুত্রকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে আবু সাইফ رضی اللہ عنہ-এর ঘরে যেতেন, যা হাপরের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। হযরত আনাস رضی اللہ عنہ আগে আগে দৌড়ে যেতেন এবং আবু সাইফ رضی اللہ عنہ-কে বলতেন যে, হাপর চালানো বন্ধ করো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করতেন, শিশুকে কোলে নিতেন, ঘ্রাণ নিতেন এবং চুমু খেতেন। [৪]

ইব্রাহিম তখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন যখন তিনি কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সাইফ رضی اللہ عنہ-এর ঘরে গেলেন, শিশুকে কোলে নিলেন যার অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিষ্পাপ প্রাণটি নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ থেকে অশ্রুর...

---

[১] কোনো কোনো সীরাত লেখক বলেন যে, তৈয়ব ও তাহের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুইজন সাহেবজাদা ছিলেন যারা হযরত কাসেম ও হযরত আবদুল্লাহ ছাড়াও ছিলেন।

[২] উয়ুনুল আসার, ইবনে সাইয়্যেদুন নাস: ২/৩৫৬, ৩৫৭, দারুল কলম।

[৩] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১১/২১।

[৪] সহীহ মুসলিম, হা: ৬০৭০; সহীহ বুখারী, হা: ১৩০৩।

অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) সাথে ছিলেন, তিনি বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কাঁদছেন?”

তিনি বললেন: “এটি তো রহমতের নিদর্শন।” তারপর কলিজার টুকরো সন্তানের লাশের দিকে মনোনিবেশ করে বললেন:

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

(চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে, হৃদয় ব্যথিত। তবে আমরা তা-ই বলব যাতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল সন্তুষ্ট হন। হে ইব্রাহিম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোকাহত।) [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন: “ইব্রাহিমের মৃত্যু দুগ্ধপানকালীন সময়ে হয়েছে, তাই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করে দিয়েছেন যারা তার দুগ্ধপানের সময়কাল পূর্ণ করবে।” [২]

এই ঘটনাটি ১০ হিজরির ১০ই রবিউল আউয়াল (মক্কী) তারিখের। ইব্রাহিমের বয়স ছিল সতেরো মাস। [৩]

ইব্রাহিমের ইন্তেকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আরবদের মধ্যে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল যে, সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যুর লক্ষণ। ফলে মানুষ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, ইব্রাহিমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই কুসংস্কার খণ্ডন করার জন্য একটি খুতবা প্রদান করেন যাতে তিনি বলেন: “সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এগুলোতে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা এগুলোতে গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত আদায় করবে যতক্ষণ না তা গ্রহণমুক্ত হয়।” [৪]

**মর্যাদাবান কন্যাগণ:**

কন্যাদের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই, সর্বসম্মতিক্রমে তারা ছিলেন চারজন:

- জয়নব (রা.)
- রুকাইয়াহ (রা.)
- উম্মে কুলসুম (রা.)
- ফাতিমাতুয যাহরা (রা.)

চারজনই বড় হয়েছেন, বিবাহিত হয়েছেন, ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরত করেছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পেশ করা হলো।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ১৩০৩, কিতাবুল জানাইয; সহীহ মুসলিম, হা: ২৩১৫

[২] সহীহ মুসলিম, হা: ২৩১৬

[৩] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ: ১১/৩১

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ১০৬০, কিতাবুল কুসূফ

## হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কন্যাদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। নবুওয়াতের দশ বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের প্রাথমিক কঠিনতম পরীক্ষার দিনগুলো নিজের চোখে দেখেন। [১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বাজারে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, তখন লোকেরা তাঁর ওপর ধুলোবালি নিক্ষেপ করত এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেখানে পৌঁছে যেতেন এবং তাঁর প্রিয় পিতাকে সান্ত্বনা দিতেন। [২]

তাঁর বিবাহ তাঁর খালাতো ভাই আবুল আস বিন রবী-এর সাথে হয়েছিল। আবুল আস-এর আসল নাম ছিল লাকীত। তিনি হযরত খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বোন হালা-এর পুত্র ছিলেন। তিনি মক্কার অত্যন্ত ভদ্র যুবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের সময় তিনি হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে মদীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর তিনি নিজে ব্যবসার জন্য শামে চলে যান।

হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবীদের সাথে হিজরত করে মদীনায় যেতে পারেননি। পরে রওনা হয়েছিলেন কিন্তু কুরাইশ কাফেররা জোরপূর্বক তাঁকে থামিয়ে দেয়, যাতে হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আহত হন এবং তাঁর পাঁজরের হাড় ভেঙে যায়।

আবুল আস বদর যুদ্ধে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কাছ থেকে এই ওয়াদা নেন যে, ফিরে গিয়ে তিনি হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেবেন। আবুল আস সেই ওয়াদা পূরণ করেন। তিনি হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নেওয়ার জন্য যায়েদ বিন হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং তাঁর দুই সন্তান আলী ও উমামাহ-কে সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মদীনায় রওনা করে দেন। [৩]

৬ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে যায়েদ বিন হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাম থেকে ফিরে আসা একটি কাফেলার ওপর আক্রমণ করেন যাতে আবুল আসও বন্দী হন। মদীনায় পৌঁছে তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আশ্রয় বহাল রাখেন এবং হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর অনুরোধে আবুল আসকে তাঁর মালামালও ফেরত দিয়ে দেন।

আবুল আস মক্কায় চলে যান এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির পাঁচ মাস আগে মদীনায় ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। [৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে উল্লেখ করতেন এবং বলতেন: “সে আমার সাথে যা বলেছে সত্য বলেছে। যে ওয়াদা করেছে তা পূরণ করেছে।” [৫]

হযরত যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। [৬] উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্য থেকে উম্মে সালামাহ এবং সাওদা বিনতে জামআ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে গোসল দেন। উম্মে আতিয়্যাহ আনসারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং উম্মে আয়মান (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও কাফন-দাফনের কাজে শরিক ছিলেন। [৭] রাযিয়াল্লাহু আনহা ওয়া আরযাহা।

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/৩২৬, ত্বর আল-রিসালা।

[২] মাজমাউয যাওয়াইদ লিল-হাইসামি, খণ্ড ৬: ৯৮২৮, ৯৮২৭। [৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/২৩, ত্বর আল-রিসালা।

[৪] তারিখু দিমাশক: ২/৫০৩, ৫০৪। এই বর্ণনায় যায়েদ বিন হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরিবর্তে যায়েদ বিন হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গোলামের কথা উল্লেখ আছে যা বর্ণনাকারীর ভুল কারণ সেই সময় উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তারিখু দিমাশক (১০/৬৭)-এর অন্য একটি বিস্তারিত বর্ণনায় আছে যে, এই কাজ যায়েদ বিন হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

[৫] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সাদ: ৩৩/৮, ত্বর সাদির।

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/৫০৬... আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। [৭] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সাদ: ৩৬, ৩৫/৮, ত্বর সাদির।

## হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা

হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির সাত বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কেবল নিকাহ হয়েছিল, বিদায় (রুখসতি) হয়নি। যখন সূরা লাহাব নাযিল হলো, তখন আবু লাহাবের প্ররোচনায় সে তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। [১]

এরপর রাসূলুল্লাহ [সা.] হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকাহ হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে করিয়ে দেন। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হাবশায় হিজরত করেন, তখন হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহাও তাঁর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ [সা.] বলতেন:
“হযরত লুত [আ.]-এর পর এই দম্পতিই প্রথম পরিবার, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেছে।” [২]

হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা কিছুকাল পর স্বামীর সাথে হাবশা থেকে ফিরে মক্কায় আসেন এবং এরপর মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ [সা.] যখন বদর যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন, তখন হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ ছিলেন। তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কারণে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ [সা.] তাঁকে হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার সেবা করার জন্য মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। যেদিন বদর বিজয়ের খবর মদীনায় পৌঁছাল, সেদিনই হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। [৩]

রাসূলুল্লাহ [সা.] বদর থেকে ফিরে যখন ঘরে আসলেন, তখন মহিলাদের হযরত রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুতে কাঁদতে দেখলেন। হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের কঠোরভাবে নিষেধ করতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ [সা.] তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং মহিলাদের সম্বোধন করে বললেন:
“শয়তানি বিলাপ থেকে বেঁচে থেকো। হৃদয়ের দুঃখ এবং চোখের (অশ্রু) আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তা দয়ার নিদর্শন। যা জিহ্বা থেকে (অভিযোগ বা বিলাপ) অথবা হাত থেকে (বুক চাপড়ানো ইত্যাদি) হয়, তা শয়তানের পক্ষ থেকে।” [৪]

তিনি কন্যার কবরের পাশে তাশরীফ নিলেন। হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাও সাথে ছিলেন, তিনি বোনের কবরের পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ [সা.] নিজের চাদরের কোণা দিয়ে তাঁর চোখের পানি মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। [৫]

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম যখন রাসূলুল্লাহ [সা.]-কে কন্যার মৃত্যুতে সমবেদনা জানালেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন:
“اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ” (আলহামদুলিল্লাহ! কন্যাদের দাফন করা সৌভাগ্যের বিষয়)। [৪]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৩৬... উতবা পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/৪৫১, আর-রিসালাহ; আত-তারিখুল আওসাত লিল বুখারী: ১/১৯, দারুল ওয়ায়ী।

[৩] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৩৭, দার সাদির।

[৪] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ১১/৩৬৬, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া।

[৫] ইরশাদে নববীর উদ্দেশ্য হলো, কন্যাদের মৃত্যুতে সবর করা সওয়াব ও সম্মানের বিষয়। জনৈক কবি এই কবিতাটিও বলেছিলেন: “...الْقَبْرُ أَخْفَى سِتْرٍ لِلْبَنَاتِ وَدَفْنُهَا يُرْوَى مِنَ الْمَكْرُمَاتِ” (কবর কন্যাদের জন্য সবচেয়ে গোপন পর্দা... এবং তাদের দাফন করা সম্মানের বিষয় হিসেবে বর্ণিত হয়)। (যাহরুল আকম ফিল আমছালি ওয়াল হিকাম: ২/২৩০)। তবে এটা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ) জাহেলিয়াত যুগের লোকদের মতো হতে পারে না, যারা কন্যাদের জীবন্ত কবর দিত।

## হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা

উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় কন্যা। সম্ভবত এটি তাঁর উপনাম (কুনিয়াত), তাঁর আসল নাম বর্ণিত হয়নি। তাঁর বিবাহ আবু লাহাবের পুত্র উতাইবাহর সাথে হয়েছিল। পিতার নির্দেশে সে বাসর হওয়ার পূর্বেই তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। যদিও আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতবাহও হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক দিয়েছিল, কিন্তু উতাইবাহ কেবল তালাকই দেয়নি বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ধৃষ্টতার সাথে বলল: "আমি আপনার দ্বীনকে অস্বীকার করি। আমি আপনার মেয়েকে তালাক দিয়েছি। না সে আমাকে পছন্দ করে, না আমি তাকে।" এরপর সেই হতভাগা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে এই বদদোয়া বের হলো যে, "হে আল্লাহ! তার ওপর তোমার কোনো হিংস্র প্রাণী লেলিয়ে দাও।"

কিছুদিন পর কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আবু লাহাব ও উতাইবাহও এই কাফেলায় ছিল। 'জারকা' নামক স্থানে রাতে যাত্রাবিরতির সময় একটি সিংহ চলে এল। সে মানুষের মুখগুলো দেখতে লাগল এবং শুঁকতে শুঁকতে উতাইবাহর কাছে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ তার মাথা চিবিয়ে ফেলল। উতাইবাহ সেই মুহূর্তেই মারা গেল এবং সিংহটি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল যে কোথাও তার হদিস পাওয়া গেল না। [১]

হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বোন হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর ৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। [২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিবাহ সম্পর্কে বলেছিলেন: "আমি আল্লাহর ওহীর নির্দেশে উম্মে কুলসুমকে উসমানের সাথে বিবাহ দিয়েছি।" [৩] হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছয় বছর অতিবাহিত করেন। ৯ হিজরীর শাবান মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজ পড়ান। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে লাশ কবরে নামান। [৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের কিনারে বসে ছিলেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল, সেই সময় তিনি বলেছিলেন: "যদি আমার তৃতীয় কোনো মেয়ে থাকত, তবে তাকেও আমি উসমানের বিবাহে দিতাম।" [৫]

সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবগুলোতে হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনবৃত্তান্তও খুব সংক্ষেপে পাওয়া যায়, তবে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এই সামান্য ঝলকগুলোতেও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

---

[১] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ২/৩৩৮, ৩৩৯, ত. আল ইলমিয়্যাহ।

[২] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৩৭, ত. সাদির।

[৩] আত-তারিখুল কাবীর লিল বুখারী: ৩/৩০৮, ত. হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য।

[৪] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, অধ্যায়: মান ইয়াদখুলু কাবরাল মারআহ। বর্ণনায় কন্যার নাম উল্লেখ নেই। কোনো কোনো স্থানে এই ঘটনা হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার দাফনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু গবেষকগণ এটি খণ্ডন করেছেন কারণ যখন হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দাফন করা হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে ছিলেন। (উমদাতুল কারী: ৮/১৫৩, ত. আত-তুরাস), তাই এটি হযরত উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহার দাফনের ঘটনা, যেমনটি ইমাম তাহাবী রহ.-এর উক্তি। (শারহু মুশকিলিল আসার: ২৫১২, ত. আর-রিসালাহ)।

[৫] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ২/৩৩৮। কিছু বর্ণনায় রয়েছে: "লাও কুন্না আশরান লা-যাওয়াজতুহুন্না উসমান" (ইবনে সাদ: ৮/৩৮)। তাবাকাত ইবনে সাদ ও আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ একে দলিল হিসেবে পেশ করেছে, তবে ইবনে আবি আসিম একে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। (আস-সুন্নাহ লি-ইবনে আবি আসিম, হা: ১২৯১, ১৩০১)। কিন্তু প্রথম বর্ণনায় উসমান বিন খালিদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাখজুমী পরিত্যক্ত (মাতরুক)। (তাকরীবুত তাহযীব, নং: ৪৪৬৩) এবং দ্বিতীয়টিতে মুহাম্মদ বিন হারুন বিন ইসহাককে মিথ্যাবাদী ও জালকারী বলা হয়েছে। (আল-কামিল ফিদ দুয়াফা, নং: ১৪৪৮)। তাই প্রথম বর্ণিত রেওয়ায়েতটিই সংরক্ষিত যা বর্ণনা করা হয়েছে।

## হযরত ফাতিমা আয-যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা

আপনার নাম ছিল ফাতিমা। যাহরা এবং বাতুল ছিল আপনার উপাধি। বাতুল এই জন্য বলা হয় যে, নিজের ফজল ও কামালের কারণে দুনিয়ার নারীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন, অথবা এই জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন। চরিত্রের নূরানিয়াতের কারণে যাহরা বলা হতো। নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। সকল কন্যাদের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন। [১]

অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত আদবসম্পন্ন এবং সাহসী ছিলেন, নিজের সম্মানিত পিতার অনেক খেয়াল রাখতেন। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার পাশে সালাত আদায় করছিলেন, তখন আবু জেহেলের কথায় এক কাফের উটের নাড়িভুঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে এল এবং যখন আপনি সিজদায় গেলেন তখন আপনার গর্দান মুবারকের ওপর রেখে দিল। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কেউ সংবাদ দিলে তিনি দৌড়ে আসলেন, নাড়িভুঁড়ি ঠেলে আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্দান থেকে ফেলে দিলেন, তারপর কাফেরদের খুব গালমন্দ করলেন। [২]

হিজরতে মদিনার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে নিকাহর পয়গাম আসল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন কিন্তু এমন সময়ে মেয়ের থেকেও মতামত নেয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন। তাকে বললেন: “আলী তোমার কথা বলছিল?” হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা চুপ থাকলেন। ফকিহগণ এখান থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, কুমারী মেয়ের নীরবতা সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে।

নিকাহর ফয়সালা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন: “মোহর কী হবে?”

বললেন: “আমার কাছে তো মোহরের জন্য কিছুই নেই।”

আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমার সেই বর্মটি কোথায় যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম?”

আরজ করলেন: “সেটি তো আছে।” ইরশাদ হলো: “তাহলে ওটাকেই মোহর বানিয়ে নাও।”

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি উটও ছিল, সেটিও বিক্রি করে দেয়া হলো। ৪৮০ দিরহাম পাওয়া গেল। এই অর্থকে মোহর নির্ধারণ করে নিকাহ হয়ে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববী থেকে কিছুটা দূরে একটি ঘর নিলেন।

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৯/৮, ত. সাদির; সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩১৫/৩, ত. আর-রিসালা।

[২] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওজু, বাব: ইজা উলকিয়া আলা জাহরিল মুসাল্লি কাজার; সহীহ মুসলিম: কিতাবুল জিহাদ: বাব: মা লাকিয়ান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন আজা।

সহীহ মুসলিমের এই হাদিসটি এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মাধ্যমে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়সের বিষয়টি সমাধান হয়ে যায়। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকাল সর্বসম্মতিক্রমে ১১ হিজরিতে হয়েছে, কিন্তু জন্ম সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে যা ইতিহাসবিদদের দুর্বল সূত্রের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে। তিনটি মত বেশি প্রসিদ্ধ:

- কুরাইশদের হাতে কাবা পুনর্নির্মাণের সময় জন্ম হয়েছে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৫ বছর বয়সের ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৯/৮; আল-ইসাবাহ: ২৬৩/৮)। এটি হিজরতের পূর্ণ ১৮ বছর আগের ঘটনা। সুতরাং রমজান ১১ হিজরিতে ইন্তেকালের সময় বয়স ছিল ২৮ বছর ৬ মাস, নিকাহর সময় (শাওয়াল ২ হিজরিতে) বয়স ছিল ১৮ বছর ৭ মাস।
- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪১ বছর বয়সের সময় জন্ম হয়েছে (আল-ইসাবাহ: ২৬৩/৮)। এই হিসেবে নিকাহর সময় বয়স ছিল ১৫ বছর ৭ মাস এবং ইন্তেকালের সময় ২৩ বছর ৬ মাস।
- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪৫ বছর বয়সের সময় জন্ম হয়েছে (আল-ইসাবাহ: ২৬৩/৮)।

সাধারণত ঐতিহাসিক এবং সীরাত লেখকদের নিকট দ্বিতীয় মতটিই প্রসিদ্ধ, এই জন্য হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিকাহর সময় বয়স... বাকি পরবর্তী পৃষ্ঠায়।

বরের ঘরে কিছুই ছিল না, কিছু নারী সাহাবী বিদায়ের আগে কিছু প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন যা ছিল নিম্নরূপ: খেজুরের ছাল ভর্তি দুটি বিছানা, দুটি বালিশ, পানি পান করার একটি পেয়ালা, একটি মশক, একটি তখত, দুটি যাঁতা, দুটি মটকা। এরপর বিদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। উম্মে আয়মান (রা.) কনেকে ঘরে পৌঁছে দিলেন। কামরায় মাটির একটি চবুতরা ছিল যার ওপর একটি পশুর চামড়া বিছানো ছিল। স্বামী-স্ত্রী রাতে তার ওপর ঘুমাতেন। দিনের বেলা সেই চামড়াতেই ভুসি ভরে সেই উটনীকে খাওয়ানো হতো যার ওপর ঘরের জন্য পানি বহন করে আনা হতো। [১]

দৃঢ় প্রমাণাদি স্পষ্ট করে যে, বিদায় অনুষ্ঠান ২ হিজরীর রমজানের শেষ দিকে অথবা ২ হিজরীর শাওয়ালের শুরুতে হয়েছিল। [২]

বিদায়ের পর আনসারগণ হযরত আলী (রা.)-কে বললেন: “ওয়ালিমা তো অবশ্যই হওয়া উচিত।” এর জন্য হযরত সাদ (রা.) একটি দুম্বা পেশ করলেন, অন্য কিছু আনসারী কয়েক সা’ যব সংগ্রহ করলেন। এভাবে ওয়ালিমার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

---

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট হাশিয়া)

সাড়ে পনেরো বছর বলেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৯/৩৮৬)। হাফেজ যাহাবী (রহ.) তার ওফাতের সময় বয়স ২৯ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/১২১)। মুরসাল হিসেবে এই বর্ণনাটি (যেখানে হযরত ফাতিমার বয়স নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে) দুর্বল বর্ণনার তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

(১) এটি স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার তিন বছর পর নবুওয়াতের চতুর্থ বছর থেকে শুরু হয়েছিল এবং কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতন এর পরেই শুরু হয়েছিল। সুতরাং এই নির্যাতনের সময়কাল নবুওয়াতের সেই সময় থেকে শুরু হয় যা ৫ম নবুওয়াতী বর্ষে শুরু হয়েছিল। যখন মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও নিরাপদ ছিলেন না।

(২) প্রবল ধারণা এই যে, এই ঘটনা হযরত হামজা (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে ঘটেছিল, কারণ তাদের ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের এই সাহস ছিল না এবং মুসলমানরা কাবাঘরে প্রকাশ্যে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে শুরু করেছিলেন। অথবা এই ব্যক্তিবর্গ নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ লিস সালিহী আশ-শামী ২/৪০৭)। তাই প্রবল ধারণা এই যে, এই ঘটনাটি হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জন্মের আগে ঘটেছিল, কারণ তার জন্মের বছরটি ছিল নবুওয়াতের চতুর্থ বা পঞ্চম বছর। এই কথাটি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের কলিজার টুকরোকে কষ্টে দেখেও তাকে এই কঠিন পরিস্থিতিতে কুয়া খুঁড়তে পাঠিয়ে দেবেন। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, কুয়া খননের ঘটনাটি নবুওয়াতের প্রথম দিকের হতে পারে, তবে প্রথম উক্তি অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বয়স তখন প্রায় নয় বছর হবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হওয়ার কারণে তাকে ‘ছোট মেয়ে’ বলা যেতে পারে। যদিও এই বর্ণনায় তার জন্য ‘জুওয়াইরিয়া’ (ছোট মেয়ে) শব্দ এসেছে, যার প্রয়োগ নয় বছরের মেয়ের ওপর অনায়াসেই হতে পারে।

(বর্তমান পৃষ্ঠার হাশিয়া)

[১] হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহ সংক্রান্ত এই বিস্তারিত বিবরণ তবাকাত ইবনে সাদ (৮/২৩, ২২)-এর কয়েকটি ধারাবাহিক বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

[২] সাধারণ বর্ণনানুসারে নিকাহ সফর মাসে হয়েছিল এবং বিদায় অনুষ্ঠান যিলহজ মাসে হয়েছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৫/৮৩)। অর্থাৎ নিকাহ ও বিদায়ের মাঝে এগারো মাসের ব্যবধান ছিল। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায় না। যাই হোক, যদি যিলহজ মাসে বিদায় ধরা হয় তবে তা নিশ্চিতভাবেই ২ হিজরীর যিলহজ ছিল, কারণ মদীনার পরিবেশ অনুযায়ী... বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) ওয়ালিমার খরচের জন্য জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে আনার এবং তা বিক্রি করার ইচ্ছা করেছিলেন, এমতাবস্থায় একটি উটনী গনীমতের মাল থেকে এবং অন্যটি বদরের মালের অংশ হিসেবে পেয়েছিলেন। হযরত হামজা (রা.) মদ্যপ অবস্থায় এই উটনীগুলোকে জবাই করে দিয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী ৫/৭৩, কিতাবুল মাগাযী, বাবু জাময়িল হাতাব; সহীহ মুসলিম ২/১৬৯, কিতাবুল আশরিবা, বাবু তাহরীমিল খামর)। এটি স্পষ্ট যে, এটি মদ হারাম হওয়ার এবং ওহুদ যুদ্ধের আগের ঘটনা। (হযরত হামজা (রা.) ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)। এর দ্বারা কিছু ঐতিহাসিকের এই উক্তি ভুল প্রমাণিত হয় যে, নিকাহ ওহুদ যুদ্ধের পরে হয়েছিল। একইভাবে তবাকাত ইবনে সাদে বর্ণিত কিছু বর্ণনায় রজব ১ হিজরীতে নিকাহ হওয়ার যে কথা রয়েছে তাও ভুল প্রমাণিত হয়, কারণ ওহুদ যুদ্ধ ২ হিজরীর পরে হয়েছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৫/৩০৫; ওজহুমাত তাবারী ও ইবনুল জাওযী ও যাহাবী)।

এর দ্বারা এটিও প্রমাণিত হয় যে, নিকাহ বদর যুদ্ধের (১৭ রমজান) পরে হয়েছিল। কারণ এই বর্ণনায় হযরত আলী (রা.) বলেন যে, তিনি একজন স্বর্ণকারের সাথে ব্যবসা করার ইচ্ছা করেছিলেন যাতে নিকাহ ও বিদায়ের (শাওয়াল) খরচ মেটানো যায়। যেহেতু এই যুদ্ধের পর তিনি উটনীগুলো লাভ করেছিলেন, তাই এর আগে ব্যবসার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর যুদ্ধের পর স্বর্ণকারের সাথে ব্যবসার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না।

এছাড়া এই ঘটনা থেকে এটিও জানা যায় যে, হযরত আলী (রা.) ওয়ালিমার ব্যবস্থা কেন করতে পারছিলেন না, কারণ যে উপায়ে তিনি তা করতে চেয়েছিলেন তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিদায়ের সময় তার কাছে কিছুই ছিল না, যা ছিল তা বিক্রি করে নগদ অর্থ জমা করেছিলেন। তাই আনসারগণ তার জন্য ওয়ালিমার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হযরত আলী (রা.)-এর ঘর নববী গৃহ থেকে দূরে ছিল, আপনি (সা.) চেয়েছিলেন যে মেয়ের ঘর কাছে হয়ে যাক। হুজুর (সা.)-এর একজন প্রতিবেশী হারিসা বিন নুমান আনসারী (রা.) ছিলেন, তিনি এর আগেও আপনি (সা.)-এর পরিবারের জন্য কিছু ঘর খালি করে দিয়েছিলেন। যখন আপনি (সা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বললেন যে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে চাই, তখন তিনি বললেন: "আপনি হারিসা বিন নুমানকে বলুন, তিনি আমাদের কাছে কোনো ঘর দিয়ে দিন।"

আপনি (সা.) বললেন: "তিনি আমাদের আগে থেকেই ঘর দিয়েছেন, এখন তাঁকে পুনরায় বলতে আমার লজ্জা লাগছে।" হযরত হারিসা (রা.) যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তৎক্ষণাৎ নিজের ঘর খালি করে দূরে চলে গেলেন এবং এরপর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন: "আল্লাহর রাসূল! আমি জানতে পেরেছি যে আপনি ফাতিমাকে কাছে নিয়ে আসতে চান, এই তো আমার ঘরগুলো হাজির। আমি এবং আমার সম্পদ, সবকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। আপনি যা গ্রহণ করবেন তা আমাদের কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় যা আপনি ছেড়ে দেবেন।" হুজুর (সা.) খুশি হয়ে বললেন: "তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।"

এরপর হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমা, হুজুর (সা.)-এর প্রতিবেশী হিসেবে চলে আসলেন। [১]

সরওয়ারে দো আলম (সা.)-এর প্রিয় কন্যা হওয়া সত্ত্বেও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ এবং কষ্টসাধ্য। ঘরে নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করতেন, নিজে কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করতেন, কুয়া থেকে পানির মশক ভরে আনতেন যার ফলে শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজে যাঁতা ঘুরিয়ে আটা পেষণ করতেন যার ফলে হাতে ফোসকা পড়ে যেত। দারিদ্র্যের কারণে ঘরের কাজে কোনো সাহায্যকারী রাখারও সামর্থ্য ছিল না।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কিছু গোলাম আসলো, হযরত আলী (রা.)-এর মনে হলো যে ঘরের কাজে সাহায্যের জন্য একজন গোলাম নিয়ে নেওয়া হোক। তাঁর কথায় হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলেন কিন্তু লজ্জার কারণে কিছু বলতে পারলেন না এবং চুপচাপ ফিরে আসলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নবী আকরাম (সা.)-কে জানালেন যে ফাতিমা এসেছিলেন।

পরে হযরত আলী (রা.) গিয়ে বিষয়টি আরজ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কিছু দিতে পারব না; কারণ আহলে সুফফা ক্ষুধার্ত, আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি তাদের জন্য খরচ করব, আমি এই গোলামদের বিক্রি করে তাদের মূল্য তাদের ওপর খরচ করব।"

রাতে আপনি মেয়ের ঘরে তাশরিফ আনলেন এবং বললেন: "যা তোমরা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চেয়ে উত্তম কিছু বলব না? যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও। এটি তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম।" হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন: "আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর সন্তুষ্ট।" [২]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/২২, ত. সাদির

[২] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৩১, ফাযায়েলুস সাহাবা লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, হা: ১২০৮

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেছেন: “আমি কথা ও কথোপকথনে ফাতিমা (রা.)-এর চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসতেন, তখন তিনি তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁকে স্বাগত জানাতেন।” [১]

আরও বর্ণিত হয়েছে: “তাঁর হাঁটার ভঙ্গি ছিল হুবহু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো।” [২]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিজের কন্যার প্রতি ভালোবাসার আন্দাজ এই কথা থেকে লাগানো যেতে পারে যে, তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেছিলেন: “ফাতিমা আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। যে তাকে পীড়া দিল, সে আমাকে পীড়া দিল।” [৩]

এক রাতে তিনি ইরশাদ করলেন:

“এইমাত্র আসমান থেকে এমন একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন, যিনি এই রাতের আগে কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি তাঁর রবের কাছে অনুমতি চাইলেন যেন আমাকে সালাম করতে পারেন এবং আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, ফাতিমা জান্নাতী নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা হবেন।” [৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালে ফাতিমা (রা.) এতই শোকাহত হলেন যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁকে আর কখনো হাসতে দেখা যায়নি। ছয় মাস পর ১১ হিজরীর রমজান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল ২৮ বা ২৯ বছর। [৫]

একটি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দিকা (রা.), দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) এবং তৃতীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রা.) জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন। রাতের বেলা বাকী’তে দাফন করা হয়। হযরত আলী, হযরত আব্বাস এবং ফজল বিন আব্বাস (রা.) তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন। [৬]

---

[১] সুনানে আবু দাউদ, হা: ৫২১৭, কিতাবুল আদব, মা জাআ ফিল কিয়াম।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাবু ফাযায়িলি ফাতিমা বিনতুন নবী (সা.)।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাযায়িলুস সাহাবা, বাবু ফাযায়িলি ফাতিমা বিনতুন নবী (সা.)।

[৪] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৭৮১, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবিল হাসান ওয়াল হুসাইন, ইসনাদুহু হাসান।

[৫] ফাতিমা (রা.)-এর জন্ম হয়েছিল যখন (রাসূলুল্লাহ সা.-এর বয়স) আটাশ বছর ছিল, আর কুরাইশরা কাবা নির্মাণ করছিল, এবং কুরাইশরা নবী (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সাত বছর ছয় মাস আগে কাবা নির্মাণ সম্পন্ন করেছিল। (আল-মু’জামুল কবীর লিত-তাবারানী, হা: ২২/৩৯৮, ৩৯৯, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া কায়রো)।

[৬] মারিফাতুস সাহাবা লি-আবি নুআইম: ৬/৩১৮৫, হা: ৩১৯২, ত. দারুল ওয়াতান; আল-ইসতিয়াব: ৪/১৮৯৩; আল-ইসাবাহ: ৮/২৫, ২৬।

## নওয়াসে এবং নওয়াসিয়াঁ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশ তাঁর কন্যাদের সন্তানদের অর্থাৎ দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের মাধ্যমেই চলেছে। নিচে পবিত্র কন্যাদের সন্তানদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

### হযরত যয়নব (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর সন্তানাদি:

হযরত যয়নব (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর এক পুত্র ছিল যার নাম ছিল আলী। এক কন্যা ছিল যার নাম ছিল উমামা।

উমামা (রাযিআল্লাহু আনহা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ভালোবাসতেন। উমামা (রাযিআল্লাহু আনহা) আপনার ﷺ সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, কখনো কখনো সালাত আদায়কালে তিনি আপনার ﷺ কাঁধে চড়ে বসতেন। আপনি ﷺ অত্যন্ত কোমলতার সাথে তাঁকে নামিয়ে দিতেন। তাঁর মা হযরত যয়নব (রাযিআল্লাহু আনহা) ৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মাতৃহীন শিশুটির প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপহার হিসেবে একটি স্বর্ণের হার আসলো। সমস্ত আযওয়াজে মুতাহহারাত সমবেত ছিলেন এবং উমামা (রাযিআল্লাহু আনহা) ঘরের এক কোণে মাটি দিয়ে খেলছিলেন। আপনি ﷺ বললেন: “আমি এই হারটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে দেব।” সকলের ধারণা ছিল যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-কে এটি দান করবেন, কিন্তু আপনি ﷺ উমামা (রাযিআল্লাহু আনহা)-কে ডাকলেন এবং সেই হারটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন। [১]

হযরত ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) উমামা (রাযিআল্লাহু আনহা)-কে বিবাহ করেন। হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন শাহাদাত বরণ করেন, তখন মুগীরা বিন নওফলের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মুগীরা-এর ঔরসে হযরত উমামা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর একটি পুত্র সন্তান জন্মায় যার নাম ছিল ইয়াহইয়া। [২]

হযরত যয়নব (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর পুত্র আলী বিন আবিল আস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে বড় দৌহিত্র ছিলেন। তিনি হিজরতে মদীনার সাত-আট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আরবের প্রথা অনুযায়ী তিনি তাঁর শৈশবকাল একটি গ্রামীণ জনপদ বনু গাযির-এ অতিবাহিত করেন। যেহেতু সেই সময় পর্যন্ত তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেননি, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: “আমি তাঁর লালন-পালনের অধিক হকদার।” [৩]

আলী বিন আবিল আস (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উটনীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। [৪]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৩০, ত. সাদির; উসদুল গাবাহ: ৭/২০, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] উসদুল গাবাহ: ৭/২০

[৩] উসদুল গাবাহ: ৩/১১৮; আল-ইসাবাহ: ৩/২৬৯, জীবনী: আলী বিন আবিল আস (রাযিআল্লাহু আনহু)

[৪] আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী: ২৩/২৩৩, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া কায়রো

একটি বর্ণনা অনুযায়ী শৈশবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী বড় হয়ে ইয়ারমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। [১]

**হযরত রুকাইয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তানাদি:**

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত রুকাইয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন দৌহিত্র হয়েছিল যার নাম রাখা হয়েছিল আবদুল্লাহ। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী আবদুল্লাহর ইন্তেকাল তাঁর মায়ের ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১ হিজরীতে হয়েছিল। তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। [২]

**হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তানাদি:**

হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সন্তানদের মধ্যে তিন ছেলে হাসান, হুসাইন ও মুহসিন এবং দুই মেয়ে উম্মে কুলসুম ও যয়নাব ছিলেন। মুহসিনের শৈশবে ইন্তেকাল হয়ে যায়। বাকি সন্তানরা বড় হন এবং তাঁদের মাধ্যমেই বংশধারা চলে। [৩]

উম্মে কুলসুমের বিবাহ ১৭ হিজরীতে হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হয়েছিল। তাঁদের থেকে একটি মেয়ে রুকাইয়্যাহ এবং একটি ছেলে যায়েদ জন্মগ্রহণ করেন। [৪]

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অগাধ ভালোবাসা ছিল যার সাক্ষ্যে প্রচুর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে, তাঁদের গুণাবলীতে হাদীসের কিতাবসমূহে স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। (এই উভয়ের বিস্তারিত অবস্থা দ্বিতীয় খণ্ডে আসছে।)

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৌহিত্র ও দৌহিত্রী মোট আটজন ছিলেন:

১. আলী বিন আবুল আস

৩. আবদুল্লাহ বিন উসমান

৫. হুসাইন বিন আলী

৭. উম্মে কুলসুম বিনতে আলী

২. উমামাহ বিনতে আবি আল-আস

৪. হাসান বিন আলী

৬. মুহসিন বিন আলী

৮. যয়নাব বিনতে আলী

---

[১] আল-ইসাবাহ: ৩/৩৬৯, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] আল-ইসাবাহ: ৫/১২, ১৭, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

একটি বর্ণনা এই যে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত রুকাইয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার আবদুল্লাহ নামে আরও একজন পুত্র হয়েছিল যাঁকে আবদুল্লাহ আসগর বলা হতো। তিনি ৬-৭ বছর বয়স পেয়েছিলেন। (মুরুজুজ জাহাব: ৩/৫৭, ৬৭, ত. আল-জামিআতুল লুবনানিয়্যাহ)

এই কথাটি মাসউদী বর্ণনা করেছেন এবং তাও সনদবিহীন। ইতিহাস ও বংশলতিকার অন্য কোনো উৎসে এর উল্লেখ নেই।

[৩] আত-তাবয়ীন ফী আনসাবি কুরাইশ লি-ইবনে কুদামাহ, পৃ. ১৩৩

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/৫০২, ত. আর-রিসালাহ; উসদুল গাবাহ: ৭/৩৭৭

## চাচা এবং ফুফুরা

হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা ছিলেন তেরোজন:

- ১. সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু
- ৩. আবু তালিব - আসল নাম ছিল আবদে মানাফ।
- ৫. যুবাইর
- ৭. যিরার
- ৯. মুসআব - "আইদাক" উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।
- ১০. হারিস
- ১১. মুকাউউইম
- ১২. মুগীরা
- ১৩. নাজল বা হাজলা
- ২. হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু
- ৪. আবু লাহাব - আসল নাম ছিল আবদে উজ্জা।
- ৬. আবদুল কাবা
- ৮. কুসাম

কিছু আলিমের মতে, হারিসের নামই মুকাউউইম ছিল। একইভাবে মুগীরার নাম ছিল নাজল বা হাজলা, এভাবে মোট এগারোজন চাচা হন, যাদের মধ্যে কেবল হযরত আব্বাস এবং হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু ছিলেন ছয়জন যাদের নাম হলো:

- ১. সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা
- ৩. বাররাহ
- ৫. উমাইমাহ
- ২. আতিকা
- ৪. আরওয়া
- ৬. উম্মে হাকীম বায়দা

হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। আরওয়া এবং আতিকার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ আছে। [১]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৮/৩১ থেকে ৩৩, ত. সাদির

## আকাবির সাহাবা... আশারা মুবাশশারা

সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো আশারা মুবাশশারার এবং আশারা মুবাশশারার মধ্যে খুলাফায়ে রাশিদুন সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ:

- ১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৩. হযরত উসমান গনি রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ২. হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৪. হযরত আলী আল-মুরতাজা রাযিয়াল্লাহু আনহু

এই চারজনের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব এই ক্রম অনুযায়ী। তাঁদের পর নিচের ছয়জন ব্যক্তির মর্যাদা:

- ৫. হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৭. হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৯. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৬. হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ৮. হযরত জুবাইর বিন আল-আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু
- ১০. হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু

এই ব্যক্তিদের আশারা মুবাশশারা এই জন্য বলা হয় যে, তাঁরা ফযীলত ও মর্যাদায় অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় অভিন্ন:

- ১. তাঁরা সবাই মুহাজির।
- ২. সবাই কুরাইশী।
- ৩. সবাই নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে সেই সময়ে ঈমান এনেছিলেন যখন মুসলমানদের ওপর পরীক্ষার পাহাড় ভেঙে পড়ছিল, এই কারণে তাঁরা ﴿السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾-এর অন্তর্ভুক্ত।
- ৪. তাঁদেরকে একই মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। [১]

---

[১] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৭৪৭, ৩৭৪৮, ৩৭৫৭, কিতাবুল মানাকিব।

গুরুত্বপূর্ণ নোট:

যদিও জান্নাতের সুসংবাদ আরও কিছু সাহাবায়ে কেরামকেও বিভিন্ন সময়ে আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁদেরকে আশারা মুবাশশারার মধ্যে গণ্য করা হয় না। কারণ তাঁদের মধ্যে উল্লিখিত চারটি গুণ একত্রে নেই। সুতরাং আশারা মুবাশশারা একটি পরিভাষা যা বিশেষ গুণসম্পন্ন সাহাবীদের জন্য নির্দিষ্ট।

## আশারা মুবাশশারার পরিচিতি

আশারা মুবাশশারার মধ্যে প্রথম চারজন হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর গুণাবলি ও কার্যাবলি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর হযরত আলী (রা.)-এর বিস্তারিত জীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে আসছে। তাই এখানে এই মহান ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। তবে আশারা মুবাশশারার অবশিষ্ট ছয়জন ব্যক্তির অবস্থা পেশ করা হলো।

□□□

### আমীনুল উম্মাহ

### আমের বিন আবদুল্লাহ..... আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)

হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) ইসলামী ইতিহাসের সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যারা নবী করীম (সা.)-এর বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন এবং যারা প্রতিটি ময়দানে প্রথম সারির সৈনিক হয়ে ইসলামের জন্য লড়াই করেছেন। ফারুকী যুগে সিরিয়া বিজয়ের সময় তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইয়ারমুকের চূড়ান্ত যুদ্ধ তাঁরই নেতৃত্বে লড়া হয়েছিল। তাঁর মর্যাদার আন্দাজ এই কথা থেকে লাগানো যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য তৈরিতে তাঁর মতামতের বড় ভূমিকা ছিল।

তাঁর আসল নাম আমের বিন আবদুল্লাহ, তিনি তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) আবু উবাইদাহ নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর দাদা জাররাহ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ নামে অভিহিত হতেন। তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনু ফিহর গোত্রের সাথে। রাসূলুল্লাহ (সা.) দারুল আরকামকে কেন্দ্র বানানোর আগেই তিনি নববী আদর্শের সাথে যুক্ত হয়ে 'আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন' (প্রথম অগ্রগামীদের) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, হযরত ওসমান বিন মাজউন, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হযরত উবাইদাহ বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং হযরত আবু সালামাহ (রা.) একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যে দশজন সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ (সা.) একই মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি নাম হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর।

তিনি হাবশার (আবিসিনিয়া) দিকে প্রথম হিজরতে শামিল ছিলেন, কিন্তু বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে মক্কাতেই অবস্থান করেন। এরপর মদিনায় হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেন। মদিনা মুনাওয়ারায় মুয়াখাত (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন)-এর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)-এর ভাই বানিয়ে দেন। [১]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৫-৬, ত. আর-রিসালাহ।

জিহাদের কিছু অভিযানে তাঁকে আমির বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে যাওয়া একটি বাহিনী যা উপকূলে মোতায়েন ছিল, দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল। এই সময়ে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হলো এবং একটি বিশাল মাছ উপকূলে এসে পড়ল। আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে দ্বিধায় ছিলেন যে এটি মৃত কি না। তারপর নিজের ফকিহসুলভ দূরদর্শিতার মাধ্যমে সাথীদের বললেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত। আল্লাহর পথে বের হয়েছি। এটি খাও।" তিনশ জনের এই বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত এই খোদায়ী মেহমানদারিতে তৃপ্ত হলো এবং ফেরার সময় এর গোশতের মজুদ সাথে ছিল যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গ্রহণ করেছিলেন এবং একে গায়েবি সাহায্য হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। [১]

আপনার মা উমাইমাহ বিনতে গানাম রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামের দৌলতে ধন্য হয়েছিলেন কিন্তু পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের সময় পিতা ও পুত্রের মুখোমুখি লড়াই হলো। হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে পিতাকে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ দিতে থাকলেন কিন্তু যখন তিনি আক্রমণের জন্য অনড় থাকলেন তখন হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের তলোয়ার দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। ঈমানি আত্মমর্যাদার এই প্রদর্শনীতে এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। [২]

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

(যারা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে আপনি তাদের এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা বা পুত্র বা ভাই বা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন।) [৩]

আপনার বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণের মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। পবিত্র চেহারায় লৌহ শিরস্ত্রাণের সুরক্ষামূলক শিকলের কড়াগুলো বিঁধে গিয়েছিল। এমন কোনো সরঞ্জাম ছিল না যা দিয়ে সেগুলো টেনে বের করা যায়। আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের দাঁত দিয়ে সেই কড়াগুলো টেনে বের করলেন, এই প্রচেষ্টায় তাঁর সামনের দুটি দাঁত ভেঙে পড়ে গেল। এই সৌভাগ্যের প্রভাব এমন হলো যে তাঁর চেহারা আগের চেয়েও বেশি সুন্দর হয়ে গেল।

বলা হতো: "দাঁত ভেঙে যাওয়ার পরেও আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বেশি সুন্দর আর কাউকে দেখা যায় না।" [৪]

বিজয়ের দিনগুলোতে নাজরানের পাদ্রিরা দরবারে রিসালতে আবেদন করল:
"اِبْعَثْ اِلَيْنَا رَجُلًا اَمِيْنًا" (আমাদের কাছে কোনো নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মানুষ পাঠিয়ে দিন।)
আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "لَا بْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلًا اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ"
(আমি তোমাদের কাছে এমন একজন আমানতদার পাঠাবো যে আমানতদার হওয়ার হক আদায় করে দেবে।)
তারপর হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৪৩৬০, কিতাবুল মাগাজি, গাজওয়া সাইফুল বাহর; সহীহ মুসলিম, হা: ৫১০৯, আস-সাইদ ওয়াজ-জাবাইহ, ইবাহাতু মাইতাতিল বাহর

[২] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১/১৫৪, ত: মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া; আল-ইসাবাহ: ৩/৪৭৬

[৩] সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২২

[৪] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল-বায়হাকী: ৩/২৬২, ২৬৩

এভাবে তিনি ‘আমিনুল উম্মাহ’ (উম্মতের বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত হন। এটি তাঁর প্রতি নবী আকরাম ﷺ-এর পূর্ণ আস্থার প্রমাণ। [১]

একদা তিনি (নবী ﷺ) বলেছিলেন:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

(নিশ্চয়ই প্রত্যেক উম্মতের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে আর এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলেন আবু উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ।) [২]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে প্রথমে বাইতুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর তাঁকে সিরিয়ায় প্রেরিত বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করেন। সিরিয়া বিজয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সমগ্র সিরিয়ার সেনাপতি ও বাহিনীর প্রধান সেনাপতি বানিয়েছিলেন। [৩]

সিরিয়া বিজয়ের পর মুসলমানদের কাছে ধন-সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। এর ফলে জীবনযাত্রায় নবুওয়াতের যুগের তুলনায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, তবে নিজের পদ ও মর্যাদার খাতিরে কিছু সওয়ারি ও গোলাম সাথে রাখতেন। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি কাঁদতেন।

একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন: ‘নবী আকরাম ﷺ একবার মুসলমানদের অর্জিত বিজয়সমূহের কথা উল্লেখ করে আমাকে বলেছিলেন: যদি জীবন তোমাকে সুযোগ দেয়, তবে তোমার জন্য মাত্র তিনজন খাদেমই যথেষ্ট হবে। একজন তোমার সেবার জন্য, একজন সওয়ারির দেখাশোনার জন্য এবং একজন ঘরের কাজের জন্য। আর তিনটি সওয়ারিই যথেষ্ট হবে। একটি সফরের জন্য, একটি মাল বহনের জন্য এবং একটি তোমার গোলামের জন্য। কিন্তু আজ আমার ঘর গোলামে এবং আমার আস্তাবল সওয়ারিতে পূর্ণ। এই অবস্থায় আমি নবী আকরাম ﷺ-কে কী মুখ দেখাব? অথচ তিনি আমাদের অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী সেই হবে, যে সেই অবস্থায় থাকবে যে অবস্থায় আমি তাকে রেখে যাব।’ [৪]

হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। তাঁর অংশে যে গনিমতের মাল আসত, তিনি তার বেশিরভাগই আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিতেন। একবার হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন খাদেমের মাধ্যমে তাঁকে চার হাজার দিনার পাঠান, সাথে খাদেমকে তাকিদ দেন যে, সে যেন দেখে তিনি কী করেন। আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ সেই সব দিনার সদকা করে দিলেন। খাদেম ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন:

‘আল্লাহর শোকর, যিনি মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন যাদের আমল এই প্রকার।’ [৫]

হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া সফরে গেলে আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলেন যে তিনি অত্যন্ত দরবেশসুলভ অবস্থায় আছেন। এক...

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৭৪৪, কিতাবুল মানাকিব; আত-তারিখুল আওসাত: ১/৪০

[২] সুনান আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদিস হাসান সহীহ

[৩] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ১৩৩

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৬৯৬

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/১৭, ত. আর-রিসালাহ

সাধারণ একটি উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন যার রশিও ছিল অত্যন্ত সাধারণ। হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং দেখলেন ঘরের আসবাবপত্র বলতে কেবল একটি বিছানা, পানির মশক এবং একটি পেয়ালা। বাকি সব ছিল জিহাদের সরঞ্জাম অর্থাৎ একটি তলোয়ার, একটি ঢাল এবং সওয়ারির জিন। হযরত উমর ফারুক (রা.) বললেন: "আপনি এখানকার আমির। কিছু প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তো রাখতে পারতেন।"

তিনি বললেন: "হে আমিরুল মুমিনীন! আমাদের জীবনধারণের জন্য এটাই যথেষ্ট হয়ে যায়।"

হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: "আপনার খাবার কোথায়?"

তিনি কিছু পেষা যব এনে সামনে রাখলেন। এটি দেখে হযরত উমর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

"হে আবু উবাইদাহ! তোমাকে ছাড়া আমাদের সবাইকে দুনিয়া বদলে দিয়েছে।" [১]

তাঁর এই গুণাবলির কারণেই উমর ফারুক (রা.) বলতেন:

"আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল এটাই যে, হায়! আবু উবাইদাহর মতো মানুষদের দিয়ে যদি আমার ঘর পূর্ণ থাকত।" [২]

তাঁর কথা সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। যুদ্ধের আগে তিনি মুসলমানদের উৎসাহিত করতেন, জিহাদ ও শাহাদাতের মর্যাদার মাধ্যমে গুনাহ মাফের আশা দেখাতেন। সারিবদ্ধ সৈন্যদের মাঝে ঘুরে ঘুরে বলতেন:

"কত মানুষ এমন আছে যাদের পোশাক পরিষ্কার কিন্তু তাদের দ্বীন মলিন। কত মানুষ এমন আছে যারা নিজেদের সম্মানিত করার চেষ্টায় নিজেদের অপমানিত করছে। হে লোকসকল! অতীতের গুনাহসমূহকে বর্তমানের নেক আমল দিয়ে ধুয়ে ফেলো।" [৩]

আবু উবাইদাহ (রা.) অত্যন্ত মুত্তাকি, আল্লাহভীরু এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিনয়, নম্রতা এবং আখেরাতের চিন্তার কারণে মাঝেমধ্যে বলতেন: "হায়! আমি যদি কোনো দুম্বা হতাম যাকে মানুষ জবেহ করে গোশত খেয়ে নিত এবং ঝোল পান করে নিত।" কখনো বলতেন: "হায়! আমি যদি চুলার ছাই হতাম যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত।" [৪]

উদ্দেশ্য এই যে, আখেরাতের হিসাব থেকে বাঁচার কোনো উসিলা হয়ে যেত।

১৮ হিজরিতে জর্ডান ও সিরিয়ায় ভয়াবহ প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে যাতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। আমিনুল উম্মতও এর কবলে পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। [৫]

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরদাহু।

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৭, ত ত্বরুর রিসালাহ

[২] মুস্তাদরাকে হাকেম, খণ্ড: ৫১৩৩

[৩] আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারিখ লি আবি ইউসুফ ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাউয়ি: ২/৪৭, ত ত্বরু মুআসসাসাতুর রিসালাহ

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/১৮, ত ত্বরুর রিসালাহ

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/২৩, ত ত্বরুর রিসালাহ

তারিখে মিল্লাতে মুসলিমা

রাসূলের দরবারের জানসার... জীবিত শহীদ

আল-ফায়্যাজ... পয়গম্বরের ভায়রা... সিদ্দিকে আকবরের জামাতা

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সত্যনিষ্ঠ জানসারদের একজন, যাদের বীরত্ব, কোরবানি এবং দ্বীনি আত্মমর্যাদার ওপর ইসলামী ইতিহাস গর্ব করে। তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনু তাইম শাখার সাথে। তিনি আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন এবং আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সেই পাঁচজন ব্যক্তির একজন ছিলেন যারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেই ছয়জন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর শাহাদাতের পূর্বে খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

হযরত তালহা রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহুর জামাতা হওয়ার গৌরবও অর্জন করেছিলেন। আপনার মাতার নাম ছিল সা'বা বিনতে আব্দুল্লাহ আল-হাদরামি। তিনি একজন ইয়েমেনি নারী ছিলেন এবং হযরত আলা বিন আল-হাদরামি রাদিআল্লাহু আনহুর বোন ছিলেন। [১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষার জন্য উহুদ যুদ্ধে তিনি যে আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার বিবরণ হাদীস ও সীরাতের পাতায় পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর জখমের কারণে মূর্ছা ভাব আচ্ছন্ন ছিল। তালহা রাদিআল্লাহু আনহু তাঁকে নিজের পিঠে বহন করে উল্টো পায়ে নিরাপদ স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মুশরিকরা যখনই কাছে আসত, তালহা রাদিআল্লাহু আনহু লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দিতেন এবং পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতেন। এই সময়ে কুরাইশদের তীরগুলো হাতের তালু দিয়ে ঠেকাতে ঠেকাতে সারা জীবনের জন্য একটি হাত অবশ হয়ে যায়। মাথা ফেটে গিয়েছিল। পুরো শরীরে ৭৫টি জখম হয়েছিল। এই অবস্থায়ও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। [২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বীরত্ব দেখে বললেন: "أَوْجَبَ طَلْحَةُ" (তালহা জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।) [৩]

সেদিন হযরত তালহা রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর আহত হাতের যন্ত্রণা অনুভব করে "হাস হাস" বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যদি তুমি হাস হাস বলার পরিবর্তে বিসমিল্লাহ বলতে, তবে জান্নাতে তৈরি তোমার ঘর এই দুনিয়ায় থাকা অবস্থাতেই দেখে নিতে।" [৪]

শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদ পাহাড়ের একটি পাথরের ওপর আরোহণ করতে চাইলেন, তখন বর্মের ওজনের কারণে উঠতে পারছিলেন না। হযরত তালহা রাদিআল্লাহু আনহু নিচে বসে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওপর কদম মোবারক রেখে পাথরের ওপর আরোহণ করলেন। [৫]

---

[১] আল-ইসাবাহ: ৩/৬৩০, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৩, ত. আর-রিসালাহ

[৩] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৭৩৯

[৪] আল-ইসাবাহ: ৩/৩৩১

[৫] উসদুল গাবাহ: ৩/৮৩ ত. আল-ইলমিয়্যাহ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলতেন: “তালহা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা কুরবানির হক আদায় করে দিয়েছে।” [১]

তিনি আরও বলেছেন:

“مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّهِيدِ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ”

(যে ব্যক্তি জমিনের ওপর বিচরণকারী কোনো জীবিত শহীদকে দেখতে চায়, সে যেন তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে দেখে নেয়।) [২]

একটি হাদিসে আছে: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বিচরণকারী কোনো জান্নাতিকে দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।” [৩]

একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, হযরত তালহা (রা.) চারটি বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর বোন ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সহধর্মিণী। সে অনুযায়ী হযরত তালহা (রা.)-এর এক স্ত্রী হলেন হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর (রা.), যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা (রা.)-এর বোন। দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হামনাহ বিনতে জাহাশ (রা.), যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর বোন। তৃতীয় স্ত্রী হযরত ফারিআহ বিনতে আবি সুফিয়ান (রা.), যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.)-এর বোন। চতুর্থ স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যাহ বিনতে আবি উমাইয়্যাহ (রা.), যিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর বোন। [৪]

হযরত তালহা (রা.) পেশায় ব্যবসায়ী এবং অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায়িক ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তবে বদর যুদ্ধের সময় তিনি সিরিয়ার ব্যবসায়িক সফরে গিয়েছিলেন, তাই এতে শরিক হতে পারেননি। এই বঞ্চনার জন্য তাঁর অনেক আক্ষেপ ছিল। তবে নবী করীম ﷺ তাঁর এই উৎসর্গিত প্রাণ সাথীর প্রতি এতটাই খেয়াল রাখতেন যে, বদরের গনিমতের মালে তাঁর জন্যও অংশ রেখেছিলেন এবং তাঁকে যুদ্ধের সওয়াবেও অংশীদার হিসেবে গণ্য করেছিলেন। [৫]

দানশীলতা ও উদারতার অবস্থা এমন ছিল যে, প্রতিটি অভিযানে তিনি সাহাবী ও সাথীদের ওপর দুহাত খুলে খরচ করতেন। নেকি ও কল্যাণের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে নবুওয়াতের দরবার থেকে ওহুদ যুদ্ধের সময় ‘তালহাতুল খাইর’, ‘গাজওয়ায়ে যিল উশাইরাহ’-তে ‘তালহাতুল ফায়্যাদ’ এবং ‘খয়বর যুদ্ধে’ ‘তালহাতুল জুদ’ উপাধি লাভ করেন। [৬]

জিহাদের এক সফরে রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পানি পছন্দ করলেন। হযরত তালহা (রা.) সেই কূপটি কিনে সদকা করে দিলেন। এই উপলক্ষে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন:

“مَا أَنْتَ يَا طَلْحَةُ إِلَّا فَيَّاضٌ”

(হে তালহা! তুমি নিশ্চয়ই অনেক বড় দাতা ও উদার।) [৭]

---

[১] সুনান আত-তিরমিজি, হা: ৩৭৪২

[২] সুনান আত-তিরমিজি, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি তালহা

[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ, হা: ১৩৮০৩

[৪] আল-ইসাবাহ: ৩/৩৩২, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/২৫, ত. আর-রিসালাহ

[৬] আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১/১১২, ত. মাকতাবা ইবনে তাইমিয়্যাহ কায়রো

[৭] আল-ইসাবাহ: ৩/৩৩০, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

খুলাফায়ে রাশেদীন

একবার ‘হাযরামাউত’-এর ব্যবসা থেকে সাত লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জিত হলো। পুরো রাত এপাশ-ওপাশ করে কাটালেন। স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন:

“যে ব্যক্তির ঘরে এত টাকা থাকে, সে তার রবের কাছে কী আশা নিয়ে ঘুমাবে?”

স্ত্রী বললেন: “সকাল হতেই পাত্র ভরে ভরে বন্ধুদের মাঝে বণ্টন করে দিন।”

তিনি বললেন: “সত্যিই তুমি নেক পিতার নেক মেয়ে।” সকাল হতেই মুহাজির ও আনসারদের মাঝে সেই সমস্ত টাকা বিলিয়ে দিলেন। এমনকি ঘরের খরচের জন্য সাত লক্ষের মধ্যে মাত্র এক হাজার অবশিষ্ট থাকল।

একবার এক গ্রামবাসী আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাইল। তিনি সেই দিনগুলোতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তিন লক্ষ দিরহাম দিয়ে একটি জমি ক্রয় করেছিলেন। তিনি তা বিক্রি করে পুরো মূল্য তার হাতে তুলে দিলেন। [১]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময় শুরু হতেই হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাবেক খলিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কিসাসের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন, যাঁকে নিরপরাধ অবস্থায় মদিনা মুনাওয়ারায় শহীদ করা হয়েছিল। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে তাঁর মুখোমুখি হলেন। কিসাসের মাসআলায় সাহাবীদের এই দুই জামাতের মতামতের মধ্যে ফিকহি ও ইজতিহাদি মতপার্থক্যও ছিল। তবুও উভয় পক্ষ যথাসম্ভব যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন, তবে এরই মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের হাঙ্গামার কারণে জঙ্গে জামাল সংঘটিত হয়, যার শুরুতেই হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে যান। [২]

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরদাহু

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩১, ত. আর-রিসালা... বর্তমান সময়ের হিসেবে এটি কমবেশি সাত কোটি টাকা হবে।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৮৬, এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সীরাতের অধীনে আসবে।

https://t.me/BoierSomahar

**তারিখে উম্মতে মুসলিমা — প্রথম খণ্ড**

## হাওয়ারী রাসূল... জামাতা সিদ্দীক আকবর

## হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফাতো ভাই এবং অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তাঁর শৈশব পিতৃহীন অবস্থায় কেটেছে। তাঁর মা হযরত সাফিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত সাহসী ও ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে এমনভাবে লালন-পালন করেছিলেন যে, ভয় ও আতঙ্কের শব্দগুলো তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাওয়ারী অর্থাৎ বিশেষ দেহরক্ষী ছিলেন। তিনি সেই দশজন সাহাবীর একজন যাঁদের রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি সেই ছয়জন ব্যক্তির মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদের হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাহাদাতের সময় খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ষোলো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর চাচা তাঁর ওপর কঠোর নির্যাতন চালাতেন; তাঁকে চাটাইয়ে মুড়িয়ে ধোঁয়া দিতেন, কিন্তু তাঁর দৃঢ়তায় কোনো বিচ্যুতি আসেনি। [১]

তিনি ইসলাম গ্রহণের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত পর্যন্ত আত্মোৎসর্গের হক আদায় করতে থাকেন। তিনি তখনো বালক ছিলেন যখন কুরাইশদের হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বন্দি হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এ কথা শুনেই তিনি তলোয়ার হাতে উন্মাদের মতো দাঁড়িয়ে যান। যে-ই দেখত সে-ই অবাক হতো যে, এই বালক তলোয়ার হাতে কোথায় ছুটে যাচ্ছে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখা মিলল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে?” হযরত যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, “আমি খবর পেয়েছিলাম যে আপনাকে বন্দি করা হয়েছে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আবেগপূর্ণ ভালোবাসায় খুশি হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এটিই ছিল প্রথম তলোয়ার যা ইসলামের জন্য কোষমুক্ত হয়েছিল। [২]

যৌবনে তিনি এত দীর্ঘকায় ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন যে, ঘোড়ায় সওয়ার হলে তাঁর পা মাটিতে ঠেকত। [৩]

তাঁর বাহুতে শক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, খন্দকের যুদ্ধে যখন একজন বর্মধারী অশ্বারোহী তাঁর মোকাবিলায় এল, হযরত যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মাথায় তলোয়ার দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তলোয়ারটি ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং শরীরের হাড় কেটে ঘোড়ার জিন পর্যন্ত পৌঁছে গেল। [৪]

তিনি হিজরতে হাবশা এবং হিজরতে মদীনা—উভয়টিরই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

বদর যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীতে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। বাম পার্শ্বে একমাত্র অশ্বারোহী ছিলেন মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ডান পার্শ্বে একমাত্র অশ্বারোহী ছিলেন হযরত যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু, যিনি হলুদ রঙের পাগড়ি পরিহিত ছিলেন।

---

[১] আল-ইসাবাহ: ৩৫৯/২, ত. আল-ইলমিয়্যাহ।

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ১৯৫২০, ত. আল-রুশদ।

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪১, ৪২/১, ত. আল-রিসালাহ।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৫১/১, ত. আল-রিসালাহ।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: “إِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَزَلَتْ عَلَى سِيمَاءِ الزُّبَيْرِ” “ফেরেশতারাও জুবাইরের পোশাকে অবতীর্ণ হয়েছে।” [১]

মদিনায় হিজরতের কিছুকাল আগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হিজরতের পর তাঁদের ঘরে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। মুহাজিরদের মধ্যে এটিই ছিল প্রথম পুত্রসন্তান, যার জন্য অনেক আনন্দ উদযাপন করা হয়েছিল। [২]

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বনু কুরাইজা গোত্রের ইহুদিদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য বললেন: “বনু কুরাইজার খবর কে নিয়ে আসবে?” হযরত জুবাইর (রা.) তৎক্ষণাৎ নিজেকে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই উপলক্ষে বললেন: “إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ” (প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারি থাকে, আমার হাওয়ারি হলো জুবাইর)। [৩]

এই যুদ্ধেই এক পর্যায়ে তাঁর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলেন: “আমার মা-বাবা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।” [৪]

খায়বারের যুদ্ধে ইহুদি বীর মারহাব নিহত হওয়ার পর তার ভাই ইয়াসির মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। হযরত জুবাইর (রা.) তার সাথে লড়াই করতে বের হন এবং তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। [৫]

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। [৬]

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জুবাইর (রা.)-কে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন: “الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ” (জুবাইর জান্নাতি)।

হযরত উসমান গনি (রা.) একবার হযরত জুবাইর (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন: “إِنَّهُ لَأَخْيَرُهُمْ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ” (নিশ্চয়ই তিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন)। [৭]

তাঁর সারা জীবন একজন মুজাহিদের মতো কেটেছে। তাঁর শরীরে, বিশেষ করে বুক ও কাঁধে গভীর ক্ষতের চিহ্ন গর্তের মতো রয়ে গিয়েছিল যা জিহাদে তাঁর লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে কখনো কোনো বাহিনীর আমির বানাননি বা অন্য কোনো বড় পদ দেননি। খুলাফায়ে রাশেদিনের আচরণও তাঁর সাথে এমনই ছিল। হযরত জুবাইর (রা.) নিজের মর্যাদা ও অবস্থানের...

---

[১] মুসনাদ আল-বাজার, হা: ২৩৩৮; আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১/১২০, ত: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া কায়রো

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৩/২৬৫, ত: আর-রিসালাহ

[৩] উসদুল গাবাহ: ২/৩০৭

[৪] মুসনাদ আহমাদ, হা: ১৪০৯; সুনান ইবনে মাজাহ, হা: ১২৩

[৫] সিরাত ইবনে হিশাম: ২/৩৩৩

[৬] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩২৮০, কিতাবুল মাগাজি, বাবু আইনা রাকাযান নবী (সা.) আর-রায়াহ

[৭] সুনান আত-তিরমিজি, হা: ৩৭৩১

...যিনি একজন সাধারণ অফিসারের মতো জিহাদে অংশ নিতেন, যা তাঁর পূর্ণ ইখলাসের এক স্পষ্ট দলিল। [১]

ইয়ারমুকের বিজয়ে তাঁর শাহাদাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং বিস্ময়কর বীরত্ব ও সাহসিকতার এক বিশাল ভূমিকা ছিল। সেদিন তিনি রোমানদের আড়াই লক্ষ সৈন্যের বাহিনীর এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করেন এবং তাদের চিরে অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যান। এরপর অন্য দিক থেকে কাতারগুলো উল্টে দিয়ে একইভাবে ফিরে আসেন। এই সময়ে এক স্থানে রোমানরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাদের আক্রমণে জুবায়ের (রা.) আহত হন, কিন্তু সিংহের মতো লড়াই করে তাদের ছিন্নভিন্ন করে রাগান্বিত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন। ততক্ষণে তাঁর কাঁধে ঘাড়ের কাছে একটি অত্যন্ত গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। বদরে প্রাপ্ত ক্ষতের পর ঘাড়ের এটি ছিল দ্বিতীয় ক্ষত যা কখনো শুকায়নি। তাঁর ছোট সন্তানরা সেই গর্তগুলোতে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করত। যুদ্ধে অত্যধিক ব্যবহারের কারণে তাঁর তলোয়ারের ধার খাঁজকাটা হয়ে গিয়েছিল। [২]

হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) হযরত জুবায়ের (রা.)-এর প্রশংসায় বলতেন:

أَقَامَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَهَدْيِهِ ... حَوَارِيُّهُ وَالْقَوْلُ بِالْفِعْلِ يُعْدَلُ

“তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ ও আদর্শের ওপর অটল ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এমন একজন হাওয়ারী (সাথী) যাঁর কথা ও কাজ অভিন্ন।”

هُوَ الْفَارِسُ الْمَشْهُورُ وَالْبَطَلُ ... الَّذِي يَصُولُ إِلَى مَا كَانَ يَوْمُ مُحَجَّلُ

“তিনি এমন এক প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ও বীর যে, সেদিন তিনি আক্রমণ করতেন যখন মানুষ ভয়ে লুকিয়ে বেড়াত।”

إِذَا كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ حَشَّهَا ... بِأَبْيَضَ سَبَّاقٍ إِلَى الْمَوْتِ يَرْفُلُ

“যখন যুদ্ধ তার আগুন প্রজ্বলিত করত, তখন তিনি তলোয়ার হাতে সবার আগে মৃত্যুর দিকে ছুটে যেতেন।” [৩]

হিজরতের পরের প্রাথমিক বছরগুলো চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। গাযওয়ায়ে বনু নাযীরের পর বন্টিত জমিগুলোর মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে একটি বাগান দান করেছিলেন, যার ফলে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়। [৪]

আল্লাহ বিজয়ের যুগে অনেক সচ্ছলতা দান করেছিলেন। তাঁর এক হাজার গোলাম ছিল যারা উপার্জন করে তাঁকে দিত, কিন্তু হযরত জুবায়ের (রা.) এতটাই দানশীল, দয়ালু ও উদারমনা ছিলেন যে, গোলামদের উপার্জনের একটি পয়সাও ঘরে আনতেন না, বরং সমস্ত টাকা সদকা করে দিতেন। [৫]

ফারুকী যুগে মিশর বিজয়ে তিনি আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সহযাত্রী ছিলেন। ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ে আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। [৬]

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩১২৯, কিতাব ফারযুল খুমুস, বাব বারাকাতুল গাজী ফী মালিহি হাইয়্যান ওয়া মাইয়্যিতান।

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৩৯৭৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব কতলু আবী জাহল।

[৩] উসদুল গাবাহ: ২/৩০৭।

[৪] সহীহ বুখারী, হা: ৩১৫১, কিতাব ফারযুল খুমুস, বাব মা কানা আন-নাবিয়্যু (সা.) ইউ'তিল মুআল্লাফাহ।

[৫] আল-ইসাবাহ: ১/৫৪৬, ত. ইলমিয়্যাহ।

[৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃ: ২১০, ত. আল-হিলাল।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

হযরত উসমান (রা) একবার কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন; বারবার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। হজে যাওয়া থেকেও তিনি বিরত থাকলেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসিয়ত করলেন কিন্তু কোনো উত্তরসূরি নির্ধারণের ফয়সালা করলেন না। তবে মানুষের মধ্যে উত্তরসূরি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এক প্রতিনিধি এসে হযরত উসমান (রা)-কে বললেন: "আপনি আপনার উত্তরসূরি নিযুক্ত করুন।"

হযরত উসমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন: "মানুষ কি এমন কথা বলছে?"

প্রতিনিধি আরজ করলেন: "জি হ্যাঁ।" তিনি জানতে চাইলেন: "তারা কার কথা বলছে?"

প্রতিনিধি চুপ থাকলেন। এবার দ্বিতীয় এক প্রতিনিধি এসে একই কথা বললেন এবং তিনিও উক্ত প্রশ্নে চুপ হয়ে গেলেন।

হযরত উসমান (রা) নিজেই আন্দাজ করে বললেন: "সম্ভবত তারা জুবাইর সম্পর্কে বলছে?" উত্তর এলো: "জি হ্যাঁ।"

হযরত উসমান (রা) বললেন: "আল্লাহর কসম! তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বাধিক প্রিয়জনদের একজন।" [১]

হযরত আলী (রা)-এর যুগে জঙ্গে জামাল (জামাল যুদ্ধ) সংঘটিত হয়, যাতে মুসলমানরা একে অপরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু হযরত জুবাইর (রা) সময়মতো সতর্ক হয়ে যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একপাশে চলে যান। বসরা থেকে ২১ মাইল দূরে আমর বিন জারমুজ নামক এক হতভাগা তার দলবল নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে শহীদ করে দেয়। তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর। এটি ৩৬ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসের ঘটনা। [২]

তিনি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিলেন যে তাঁর কাছে কোনো দিনার বা দিরহাম ছিল না। হ্যাঁ, জমিজমা অনেক ছিল। তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা)-কে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দিতে। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা) ঋণের হিসাব করে দেখলেন তা ছিল ২২ লক্ষ। [৩]

আল্লাহর ওপর হযরত জুবাইর (রা)-এর ভরসা এমন ছিল যে তিনি পুত্রকে তাকিদ দিয়েছিলেন: "যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে আমার মাওলার (প্রভু) কাছে সাহায্য চেয়ো।" আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা) বুঝতে পারলেন না যে মাওলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "আপনার মাওলা কে?" তিনি বললেন: "আল্লাহ।"

---

[১] সহীহ আল-বুখারী, হা: ৩৭১৭, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিব আল-জুবাইর...। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথম বছর ছিল ২৪ হিজরি। এই বছর এই রোগটি ব্যাপক ছিল বিধায় একে 'আম-উর-রুআফ' (নাক দিয়ে রক্ত পড়ার বছর) বলা হতো। (তারিখ ইবনে জুরআ দামেশকী, পৃ. ১৮৩, ইত্যাদি, মুজামুল লুগাত আদ-দামেশক)। এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে সেই যুগে খিলাফতের যোগ্যতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবারের নিকটবর্তী হওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই মূলনীতি আজও এই রূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত যার আল্লাহর দরবার ও রিসালাতে কবুলিয়ত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যে শরীয়তের অধিক অনুসারী এবং ইসলামের অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী।

নোট: উল্লিখিত বর্ণনা থেকে হযরত আলী (রা)-এর চতুর্থ খলিফায়ে রাশেদ হওয়ার অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা শুধু এটি প্রতীয়মান হয় যে সেই সময় কিছু লোক হযরত জুবাইর (রা)-কে খলিফা হিসেবে দেখতে চাইতেন; এবং হযরত উসমান (রা)-এর ঝোঁকও তাঁর দিকে ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর উত্তর থেকে প্রমাণিত হয় যে হযরত জুবাইর (রা) অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, অথবা হযরত আলী (রা)-এর যোগ্যতা তাঁর চেয়ে কম ছিল। হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদা তিন খলিফার পর সবার চেয়ে বেশি। তাঁর খিলাফতের ওপর স্বতন্ত্র দলিল রয়েছে যা আকিদার কিতাবসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরাও এই বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ পেশ করব।

[২] আল-ইসতিআব: ৫১৫/২; আল-আলাম লিল-জারকালী: ৩৩/৩।

[৩] সহীহ বুখারীতে 'আলফ আলফ ওয়া মিআতাই আলফ' শব্দগুলো রয়েছে (হা: ৩১২৯, কিতাব ফারদুল খুমুস, বাব বারাকাতুল গাজী ফী মালিহি হাইয়্যান ওয়া মাইয়্যিতান)। কিছু অনুবাদক এর অনুবাদ ২২ লক্ষ করেছেন। একইভাবে কিছু মনীষী (৩৬ হিজরির মৃত্যু আলোচনায়) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া-তে এই শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন 'জামি মা তারাকা মিন আদ-দাইন ওয়াল-অসিয়্যাহ ওয়াল-মিরাস তিসআ ওয়া খামসীন আলফ আলফ' (ঋণ, অসিয়ত ও উত্তরাধিকার মিলিয়ে মোট যা রেখে গেছেন তা ছিল ৫৯ মিলিয়ন)। ৫৯ কোটির যে অংক লেখা হয়েছে তা সঠিক নয়। আলফ আলফ মানে এক মিলিয়ন, এক লক্ষ নয় (দশ লক্ষ)। (মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল-মুআসিরাহ: ২১২৫/৩)। হযরত মাওলানা জহুরুল বারী আজমী সহীহ বুখারীর অনুবাদে আলফ আলফ-কে দশ লক্ষ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। (দ্রষ্টব্য: তাফহীমুল বুখারী: ২০৬/২)।

ইবনে হাযম বলেন যে, হযরত যুবাইর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর যখন এই ঋণের কথা জানা গেল, তখন হাকীম বিন হিযাম (রা.) আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: “ভাতিজা! আমার ভাইয়ের ওপর কত ঋণ ছিল?”

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) পুরো পরিমাণ জানাননি বরং ঋণের কিছু অংশ প্রকাশ করেছিলেন, এতে হাকীম বিন হিযাম (রা.) চিন্তিত হয়ে বলতে লাগলেন: “আমার মনে হয় না যে তোমরা এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। সুতরাং প্রয়োজন পড়লে আমার সাহায্য নিও।”

কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীতে যখন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বিক্রি করা শুরু করলেন, তখন খুব ভালো দাম পাওয়া গেল। যেমন গাবার জমি যা হযরত যুবাইর (রা.) এক লক্ষ সত্তর হাজারে কিনেছিলেন, তা ষোল লক্ষে বিক্রি হলো।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) ঘোষণা করে দিলেন যে, যার আমার পিতার কাছে ঋণ পাওনা আছে, সে যেন তা গ্রহণ করে। যখন ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল, তখন বংশীয় উত্তরাধিকারীরা জেদ ধরলেন যে এখন মিরাস বণ্টন করা হোক, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বললেন: “আল্লাহর কসম! চার বছর পর্যন্ত হজের মৌসুমে ঘোষণা করাব যে যার ঋণ পাওনা আছে সে এসে যেন তা নিয়ে যায়। এরপর মিরাস বণ্টন করা হবে।”

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রা.) বলেন যে, আমি যখনই ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হতাম, তখনই তৎক্ষণাৎ দোয়া করতাম: “যুবাইরের মাওলা! এই ঋণ পরিশোধ করে দিন।” অমনি ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যেত।

চার বছর পর্যন্ত যখন কোনো পক্ষ থেকে কোনো দাবি অবশিষ্ট থাকল না, তখন অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। এতে এত বরকত হলো যে প্রত্যেক স্ত্রীকে বারো লক্ষ করে দেওয়া হলো। বিক্রিত এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত সম্পত্তির মোট মূল্য পাঁচ কোটি দুই লক্ষ হলো। [১]

হযরত যুবাইর (রা.)-এর সাথে হযরত তালহা (রা.)-এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। উভয়ই কুরাইশী ছিলেন, উভয়ই আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বয়স কাছাকাছি ছিল, একসাথে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, উভয়ই ভায়রা-ভাই ছিলেন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর জামাতা ছিলেন, আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতা, বীরত্ব ও জানবাজির দিক থেকে সমমনা ছিলেন, উভয়ই ব্যবসায়ী ছিলেন। উভয়ই সারাজীবন একসাথে ছিলেন এবং জঙ্গে জামালে শহীদ হন। হাদিস, সীরাত ও ইতিহাসে উভয়ের নামও একসাথেই নেওয়া হয়ে থাকে এবং আজ পর্যন্ত এই দুটি নাম একসাথে জুড়ে আছে। রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ওয়া আরযাহুমা।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৩১২৯, কিতাবুল ফরযুল খুমুস, বাব বারাকাতুল গাযী ফী মালিহি হাইয়্যান ওয়া মাইয়্যিতান।

নোট ১: এই পরিমাণ দিরহামে। টাকায় হিসাব করলে কমবেশি ১০০ কোটি টাকা হয়ে যাবে। হযরত যুবাইর (রা.)-এর ওপর যে ঋণ ছিল তা অর্থাৎ ২২ লক্ষ দিরহাম, যা আজকের হিসেবে ৫৫ কোটি টাকার কাছাকাছি হবে। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিদের কাছে সম্পদ যেভাবে আসত, সেভাবেই অকাতরে আল্লাহর পথে খরচও হতো।

নোট ২: বুখারীর এই বর্ণনায় মিরাস বণ্টন এবং হিসাবের নিয়মে কিছু জটিলতা আছে, তাই হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন:

- ২২ লক্ষ ঋণ পরিশোধ করা হলো। (আলফু আলফ ওয়া মিআতা আলফ)
- অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত হিসেবে খরচ করা হলো। যা এক কোটি ৯২ লক্ষ ছিল। (তিসআতা আশারা আলফু আলফ ওয়া মিআতাই আলফ)
- অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হলো যা ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ছিল। (সামানিয়া ওয়া সালাসূন আলফু আলফ ওয়া আরবাআ মিআতা আলফ)
- এতে মরহুমের চার স্ত্রীর প্রত্যেকে বারো বারো লক্ষ পেলেন। (আলফু আলফ ওয়া মিআতা আলফ দিরহাম)
- ঋণ, অসিয়ত এবং মিরাসের মোট পরিমাণ ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ছিল। (তিসআ ওয়া খামসূন আলফু আলফ ওয়া সামানি মিআতা আলফ) অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি দিরহামের কাছাকাছি।

## প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্তম্ভ

## হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু আনহু

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম আটজন ব্যক্তির অন্যতম এবং দরবারে রিসালাতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। আপনি সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আপনি সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হিসেবে গণ্য হতেন। [১]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আপনার নাম ছিল আবদে আমর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নাম রেখেছিলেন আবদুর রহমান। [২]

আপনার বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনু জুহরা গোত্রের সাথে। আপনি হস্তী বাহিনীর ঘটনার দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল আউফ বিন আবদে আউফ এবং মাতার নাম ছিল সাফিয়্যাহ। আপনার পবিত্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা এমন ছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগেও আপনি কখনো মদ স্পর্শ করেননি।

আপনি সেই দশজন মহান ব্যক্তির একজন যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। আপনি সেই ছয়জন ব্যক্তির একজন যাদেরকে হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু নিজের পরে খলিফা নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। এছাড়াও আপনি সেই পাঁচজন ব্যক্তির একজন যারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু-এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আপনি দীর্ঘদেহী, ফর্সা এবং অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। আপনার চোখ ছিল ডাগর এবং চোখের পাপড়ি ছিল সুন্নাহ অনুযায়ী ঘন। [৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত ঘোষণার সময় আপনার বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। আপনি হাবশার প্রথম হিজরতে শামিল হয়েছিলেন কিন্তু দ্রুতই ফিরে আসেন এবং কয়েক বছর পর বাকি সাহাবায়ে কেরামের সাথে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। [৪]

মদিনা মুনাওয়ারায় আপনি রিক্তহস্তে পৌঁছেছিলেন। সেখানে হযরত সাদ বিন রাবী আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু-এর সাথে আপনার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেওয়া হয়। তিনি কেবল নিজের অর্ধেক সম্পদই উপহার হিসেবে পেশ করেননি বরং এও বলেছিলেন যে, “আমার দুইজন স্ত্রী আছে, আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তাকে বিবাহ করে নিন।” কিন্তু হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন:

“আল্লাহ আপনার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে বরকত দান করুন। আমাকে শুধু বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দিন।”

সেখানে প্রথম দিন কিছু খেজুর ও পনির কেনাবেচা করে নিয়ে আসলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এতটুকু সঞ্চয় হলো যে তিনি বিবাহ করলেন এবং মোহর হিসেবে খেজুরের আঁটির সমান স্বর্ণ প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিবাহের কথা জানতে পারলেন তখন বললেন:

“ওয়ালিমা করো, চাই তা একটি ছাগল দিয়ে হলেও।” [৫]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৭৩-৭৫, ত. আর-রিসালা

[২] মারিফাতুস সাহাবা লি আবি নুআইম আল-আসবাহানি: ৩/৩৫৩, ১/১১, ত. দারুল ওয়াতান

[৩] আল-ইসাবাহ: ২/২৯৩ ত. আল-ইলমিয়্যাহ; মারিফাতুস সাহাবা লি আবি নুআইম আল-আসবাহানি: ৩/৩৫৩

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৭৩-৭৫, ত. আর-রিসালা

[৫] সহীহ আল-বুখারী: ৫০৬৭, কিতাবুন নিকাহ, বাবু আল-ওয়ালিমা; আল-মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানি: ১/২৫২

**তারেখে উম্মতে মুসলিমা** (প্রথম খণ্ড)

বনু নাজ্জার গোত্রে আপনার আগমনের সংবাদ শুনে মানুষ দলে দলে আসতে শুরু করল। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত ও বিদগ্ধ সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তাদের আনন্দের কোনো সীমা ছিল না। তারা যেখানেই ছিলেন, সেখান থেকে ছুটে আসলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁর প্রতি নিজেদের ভক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভক্তি ও ভালোবাসার প্রশংসা করলেন এবং তাদের জন্য দুআ করলেন।

মদিনা মুনাওয়ারায় আপনার আগমনের মাধ্যমে এক নতুন জীবনের সূচনা হলো। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এমন এক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলো যার উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছানোর পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন তা হলো একটি মসজিদ নির্মাণ।

মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করা হলো, তা ছিল দুই এতিম বালক সাহল ও সুহাইলের। তারা জায়গাটি দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং এর মূল্য পরিশোধ করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। এই মসজিদের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। এর দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং ছাদ ছিল খেজুর পাতার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সাধারণ শ্রমিকদের মতো পাথর ও ইট বহন করতেন। সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁকে কাজ করতে দেখতেন, তখন তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে যেত।

আশারা মুবাশশারার নামসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক

২. হযরত উমর ফারুক

৩. হযরত উসমান গনি

৪. হযরত আলী মুরতাজা

৫. হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ

৬. হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম

৭. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ

৮. হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস

৯. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ

১০. হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ

তো কখনো অস্বীকার করতেন না। তিনি ছিলেন মদিনাবাসীদের অর্থনৈতিক অভিভাবক। তিনি মদিনার এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার ঋণ পরিশোধ করতেন, এক-তৃতীয়াংশকে ঋণ দিতেন এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার (সিলাহ রেহমি) করতেন। [১] দাস ও দাসীদের ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন এবং তাদের দোয়া নিতেন। তিনি নিজের জীবনে এভাবে ত্রিশ হাজার দাস পরিবারকে মুক্ত করেছিলেন। [২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দুমাতুল জান্দালের দিকে একটি সারিয়্যাহ (অভিযান) প্রেরণ করলেন, তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং নিজ হাতে তাঁর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন। সেই সাথে অনুমতি প্রদান করলেন যে, যদি তুমি বিজয় লাভ করো তবে সেখানকার শাসকের কন্যার সাথে বিবাহ করতে পারো। বিজয়ের পর আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু শাসকের কন্যা 'তামাজুর'-কে বিবাহ করেন। তাঁর সাহেবজাদা হযরত আবু সালামাহ তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মাহাতুল মুমিনীনদের খরচের ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন:

"الَّذِي يُحَافِظُ عَلَىٰ أَزْوَاجِي مِنْ بَعْدِي هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ"

"আমার পরে আমার পবিত্র স্ত্রীগণের দেখাশোনা করবে সে-ই হবে সত্যবাদী ও অতি নেককার।" [৪]

উম্মাহাতুল মুমিনীনদের খেদমতের যে হক হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আদায় করেছেন, তা আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। একবার তিনি একটি বিশাল জায়গির ক্রয় করলেন এবং তা বনু জুহরার অভাবী লোক, মুহাজির এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে তাঁর অংশ পৌঁছালে তিনি বললেন: 'আল্লাহ ইবনে আউফকে জান্নাতের সালসাবিল ঝরনা থেকে পান করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলে গিয়েছিলেন যে, নেককার ও সত্যবাদী লোকেরাই তোমাদের খেয়াল রাখবে।' [৫]

একবার তিনি চল্লিশ হাজার মূল্যের একটি বাগান উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। [৬]

এই ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি দরিদ্রদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন। যদিও নবুওয়াতের জবান থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তবুও নিজের পরিণাম সম্পর্কে ভীত থাকতেন। একবার ইফতারের জন্য বসলেন এবং বলতে লাগলেন:

'মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে গেলেন এবং তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, (তাঁকে) তাঁর নিজের চাদরেই কাফন দেওয়া হয়েছিল (সেই চাদরটি এতটাই ছোট ছিল) যে যদি তাঁর মাথা ঢাকা হতো তবে পা খুলে যেত, আর যদি পা ঢাকা হতো তবে মাথা খুলে যেত।'

তারপর বললেন: 'হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে গেলেন এবং তিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এরপর দুনিয়া আমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে যতটা প্রশস্ত করা যায়। সুতরাং আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমাদের নেক আমলের প্রতিদান যেন আমাদের দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া না হয়।' [৭]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৮৮/১

[২] হিলয়াতুল আউলিয়া: ৯৯/১

[৩] উসদুল গাবাহ: ৩৭৫/৩

[৪] আল-ইসাবাহ: ২৯২/৩

[৫] মুস্তাদরাক হাকিম, হা: ৫৩৫৪

[৬] সুনান আত-তিরমিজি: হা: ৩৭৫০, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিব আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু

এই কথা বলে তিনি এত কাঁদলেন যে খাবার ছেড়ে দিলেন। [১]

একবার রুটি এবং গোশতের সালন সামনে এলে তিনি কেঁদে ফেললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন কাঁদলেন? তিনি বললেন:

“مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَلَا أَهْلُهُ مِنْ خُبْزِ الشعيرِ”

(রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত যবের রুটি পেট ভরে খাননি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরাও না।) [২]

একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিনার দিয়ে একটি জমি কিনলেন, সাথে সাথে সম্পদের এই প্রাচুর্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: “মনে হচ্ছে আমি ধ্বংস হয়ে যাব, কারণ আমিই কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।” তিনি বললেন: “আল্লাহর পথে খরচ করুন।” [৩]

একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করছেন। জাগ্রত হয়ে বললেন: “আমার মনে হয় জান্নাতে নিঃস্ব লোকেরাই (আগে) যাবে।” [৪]

কিছু রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) হিসাব-নিকাশের কারণে তাঁর সাথীদের থেকে পিছিয়ে থাকবেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু এই রেওয়ায়েতগুলো দেখে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর শান ও মর্যাদার ব্যাপারে সন্দেহ করা ঠিক নয়; কারণ এই ধরণের রেওয়ায়েতগুলো সনদের দিক থেকে যয়ীফ (দুর্বল), অথচ আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর জান্নাতী হওয়া অন্যান্য সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। যদি এই যয়ীফ রেওয়ায়েতগুলোকে আক্ষরিকভাবে সঠিক ধরে নেওয়া হয়, তবুও সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা ভুল হবে। হাফেজ যাহাবী (রহ.) এই রেওয়ায়েতগুলোর সনদের ওপর জেরা করার পর বলেন:

“যাই হোক, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর হিসাব-নিকাশের কারণে তাঁর সাথীদের থেকে পিছিয়ে থাকা এবং হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা একটি রূপক এবং প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যথায় জান্নাতে তাঁর মাকাম (মর্যাদা) হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.)-এর চেয়ে নিচে নয়।” [৫]

সিদ্দিকী, ফারুকী এবং উসমানী যুগে তিনি মদিনাতেই অবস্থান করেন এবং কেন্দ্রীয় শূরার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তাঁর ওপর সাহাবায়ে কেরামের আস্থা এবং নেতৃত্বের প্রতি তাঁর নির্লোভ মানসিকতার আন্দাজ এই কথা থেকে লাগানো যায় যে, খলিফা নির্বাচনের জন্য উমর ফারুক (রা.) কর্তৃক গঠিত ছয় সদস্যের শূরার মধ্যে শেষ পর্যন্ত তাঁকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

তিনি চাইলে খেলাফত নিজের নামে অথবা তাঁর নিকটাত্মীয় হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নামে করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি পূর্ণ সততার সাথে উম্মতে মুসলিমার স্বার্থকে সামনে রাখেন এবং নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করার পরিবর্তে সাধারণ জনমত যাচাইয়ের পর হযরত উসমান (রা.)-কে এই পদের জন্য প্রস্তাব করেন।

---

[১] উসুদুল গাবাহ: ৩/৩৭৫

[২] আল-ইসাবাহ: ২/২৯২

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ২৬৩৮৯

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৮১, ত ত-রিসালাহ, হাসান সনদে

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৮১, ত ত-রিসালাহ

## তারিখে উম্মতে মুসলিমা

মৃত্যুর পূর্বে অসিয়তনামাতেও তিনি মহান উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। জিহাদের জন্য এক হাজার ঘোড়া ওয়াকফ করার, পঞ্চাশ হাজার দিনার দান করার এবং প্রত্যেক বদরী সাহাবীকে চারশ করে দিনার উপহার দেওয়ার অসিয়ত করেছিলেন। [১]

শেষ পর্যন্ত আপনার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। শেষ বয়সে যারা আপনাকে দেখেছেন তাদের বক্তব্য হলো, গায়ের রঙে লালিমা ফুটে উঠত। মাথা ও দাড়ির চুলে মেহেদি বা খেজাব লাগানোর অভ্যাস ছিল না। [২]

আপনি ৩২ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, কোনো এক ব্যক্তি আপনাকে বলেছিলেন যে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরে আপনাকে খলিফা নিযুক্ত করতে চান। একথা শুনে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর চরম অস্থিরতা ছেয়ে গেল। তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন এবং রিয়াজুল জান্নাহতে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন: ‘হে আল্লাহ! এমন পরিস্থিতি আসার আগেই আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন।’ এই দোয়ার ছয় মাস পর আপনি ইন্তেকাল করেন। আপনি ৭৫ বছর বয়স পেয়েছিলেন। জানাজার নামাজ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়িয়েছেন। আপনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। [৩]

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ওয়া আরদাহু

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৯০/১, ত. আর-রিসালাহ

[২] মারিফাতুস সাহাবাহ লি-আবি নুয়াইম আল-আসফাহানি, খণ্ড: ৪৬০

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৮৮/১, ত. আর-রিসালাহ

পিকরে ইখলাস... মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ... সারাপা ইস্তিগনা

**হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)**

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) সেই প্রাথমিক মুসলমানদের একজন যারা মক্কায় তাওহীদের ডাক শোনামাত্রই তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি কুরাইশ বংশের বনু আদি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন। তাঁর পিতা যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগের সেই সুস্থ স্বভাবের লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ইব্রাহিমী মিল্লাতের অনুসারী ছিলেন। তিনি মূর্তিপূজা থেকে বিমুখ ও তাওহীদের ওপর অটল ছিলেন এবং মূর্তির নামে জবেহ করা পশুর গোশত খেতেন না। [১]

যায়েদ বিন আমর ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু নবী করীম (সা.) তাঁর নাজাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন: “তিনি কিয়ামতের দিন একাই একটি উম্মত হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন।” [২]

সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম (সা.)-এর সান্নিধ্যে লেগে থাকেন। তাঁর স্বভাব গাম্ভীর্য, অল্পভাষিতা এবং নিঃস্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ ছিল। এ কারণে তিনি নিজেকে কখনো জাহির করেননি। তবে গাযওয়াত ও জিহাদে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর দুধভাই ছিলেন হযরত উবাই বিন কাব (রা.)।

তিনি সমস্ত গাযওয়াতে নবী করীম (সা.)-এর সহযাত্রী ছিলেন। বদর যুদ্ধে তাঁকে কুরাইশ কাফেলার গোয়েন্দাগিরির কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যদিও তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তবুও নবী করীম (সা.) তাঁকে বদরী যোদ্ধাদের সমান গনীমতের মাল থেকে অংশ দান করেছিলেন।

খিলাফতে রাশেদার যুগে সিরিয়া বিজয়ের অভিযানে তিনি হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)-এর সহযাত্রী ছিলেন। বিশেষ করে ইয়ারমুকের যুদ্ধ এবং দামেস্ক বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। [৩] হিজরতের পর তাঁর আবাসস্থল মদিনাতেই ছিল। তাঁর আয়ের উৎস ছিল আকীক নামক স্থানের একটি জায়গির। [৪] পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) তাঁকে ইরাকেও একটি জায়গির দিয়েছিলেন। [৫]

আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে আরওয়া নামক এক মহিলা, যার জমি তাঁর জায়গিরের সাথে সংযুক্ত ছিল, দাবি করল যে সাঈদ (রা.) তার কিছু জমি দখল করে নিয়েছেন। মদিনার গভর্নর মারওয়ান তদন্ত শুরু করলে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) মারওয়ানকে বললেন: “তুমি কি মনে কর যে আমি এই মহিলার ওপর জুলুম করেছি, অথচ আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমিও অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে।” [৬]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/১২৪, ত. আর-রিসালাহ।

[২] মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩, পৃ: ৫৮৫৫।

[৩] উসদুল গাবাহ: ২/৪৭৬।

[৪] মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ১, পৃ: ১৬৩৩।

[৫] সহীহ বুখারী, হা: ৩১৯৮, কিতাবু বাদইল খালক, বাবু ফি সাবয়িল আরদিন।

তাঁর মর্যাদা ও মর্তবা এ থেকেও স্পষ্ট যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.) তাঁর জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য তাঁর প্রতিই ওসিয়ত করেছিলেন। [১] একইভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-ও এই ওসিয়ত করেছিলেন। [২]

সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর জীবনের অধিকাংশ সময় নীরবতা ও নির্জনতায় অতিবাহিত হয়েছে। যার আন্দাজ এ থেকে করা যায় যে, আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত খুব কম সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতও মাত্র কয়েকটি।

হযরত সাঈদ (রা.) ৫১ হিজরিতে মদিনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী আকীকে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁকে গোসল দেন, সুগন্ধি লাগান এবং জানাজার নামাজ পড়ান। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) তাঁর কবরে নামেন। [৩]

রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরদাহু

---

[১] তারিখুল আওসাত লিল বুখারী: ১/১১২, ত ত দারুল ওয়ায়ি

[২] মুস্তাদরাক হাকেম, খণ্ড: ৬৭৬৭। তবে এর পর উম্মে সালামা (রা.) আরও কয়েক বছর জীবিত ছিলেন যেখানে সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) ৫১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। উম্মে সালামা (রা.) তাঁর ইন্তেকালের আট বছর পর ৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (আল-ইসাবাহ: ৮/৪০৭)

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: আসহাবে বদর, জীবনী: সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)। সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/১৪৫ থেকে ১৪৫, ত ত আর-রিসালাহ

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)

ফাতেহে ইরান... আসাদুল আরব... খালু রাসূলুল্লাহ ﷺ

**হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় তাওহীদের ডাক পৌঁছানোর পর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কয়েকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল সতেরো বছর। তাঁর পিতার আসল নাম ছিল মালিক, তাই তাঁকে সাদ ইবনে মালিকও বলা হয়। তাঁর মাতার নাম ছিল হামনাহ বিনতে সুফিয়ান [১]।

হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মামা বলা হতো কারণ তিনি কুরাইশ বংশের বনু জুহরা শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহীয়সী মাতা হযরত আমিনার পরিবার। আরবরা মায়ের পরিবারের লোকদের মামা বলে থাকে। হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমিনার চাচার নাতি ছিলেন অর্থাৎ হযরত আমিনা ছিলেন ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা। ওয়াহাবের এক ভাই ছিলেন উহাইব বা ওহাইব, যিনি হযরত সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দাদা ছিলেন। এভাবে বনু জুহরার সাথে মাতুল সম্পর্কের কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মামা হতেন। এজন্য একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বের সাথে বলেছিলেন:

“هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ” (“ইনি আমার মামা, কারো এমন মামা থাকলে সে যেন আমাকে দেখায়।”) [২]

আপনি শুরু থেকেই ইসলামের জন্য কুরবানি দিয়ে এসেছেন। আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন আপনার মা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং বললেন যে, যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ না করো তবে আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যাব। একজন অনুগত ও বাধ্য সন্তান হিসেবে এটি আপনার জন্য অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা ছিল কিন্তু আপনি অটল রইলেন, যার প্রেক্ষিতে এই কুরআনী আয়াত নাযিল হয়:

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

“আর যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বাধ্য করে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না।” [৩]

আপনি অত্যন্ত সাহসী ও যোদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের খাতিরে সর্বপ্রথম হাত তোলা এবং রক্ত ঝরানোর গৌরবও আপনারই অর্জিত হয়েছিল। এটি ছিল মক্কা মুকাররমায় ইসলামের দাওয়াতের একেবারে প্রাথমিক সময়। আপনি একটি গিরিপথে লুকিয়ে ইবাদত করছিলেন, তখন কিছু মুশরিক এসে ইসলাম নিয়ে উপহাস করতে শুরু করল। আপনি তা সহ্য করতে পারলেন না এবং কোনো বিপদের পরোয়া না করে একটি বড় হাড় তুলে নিয়ে এত জোরে আঘাত করলেন যে, এক মুশরিকের মাথা ফেটে গেল [৪]।

---

[১] আল-মুনতাকাম লি-ইবনুল জাওযী: ২৮১/৫

[২] সুনান আত-তিরমিযী, হা: ৩৭৫২, কিতাবুল মানাকিব

[৩] তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৮

[৪] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল, ফাদায়িলু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু

আপনার সাহসিকতা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা দেখে হিজরতের পর জিহাদের কিছু প্রাথমিক অভিযানের নেতৃত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। এমনই এক অভিযানে আপনি শত্রুর ওপর তীর চালিয়েছিলেন। এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম তীর নিক্ষেপ ছিল [১]। আপনি আরবের একজন স্বীকৃত লক্ষ্যভেদী ছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার সময় আপনি এমন নিপুণ তীরন্দাজি প্রদর্শন করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই ঐতিহাসিক বাক্যটি বলেছিলেন:

“হে সাদ! তীর চালাও, তোমার জন্য আমার পিতা ও মাতা উৎসর্গিত হোন।” [২]

আপনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন, দোয়া করলেই তা দ্রুত কবুল হতো। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দোয়ার বরকত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সা’দ (রা.)-এর জন্য দোয়া করেছিলেন: “হে আল্লাহ! সাদ যখন আপনার কাছে দোয়া করে, তখন আপনি তা কবুল করুন।” [৩]

বিদায় হজের সময় আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলেন। মক্কায় পৌঁছে আপনি এত কঠোর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, বেঁচে থাকার আশা ছিল না এবং এই ভেবে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, যে শহর থেকে আল্লাহর জন্য হিজরত করেছেন, সেখানেই যদি মারা যান তবে হিজরতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে। সাথে সাথে এই সংকল্পও করেছিলেন যে, নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে দেখতে আসলেন এবং বুঝালেন যে, কেবল এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অসিয়ত করাই যথেষ্ট। সাথে সাথে এই সান্ত্বনাও দিলেন যে, আপনি এখনো জীবিত থাকবেন এবং মানুষের উপকার করবেন [৪]।

সেই সময় হযরত সা’দ (রা.)-এর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। কেবল একটি মেয়ে ছিল, যার জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। এই অসুস্থতার অবস্থায় তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! আমার সন্তানদের বড় হওয়া পর্যন্ত আমার হায়াত দীর্ঘ করে দিন।” এই দোয়া কবুল হলো এবং হযরত সা’দ (রা.) দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং আরও ৪৫ বছর জীবিত থাকলেন। তার পুত্রসন্তানও হয়েছিল, যাদের যৌবন তিনি নিজ চোখে দেখে গেছেন [৫]।

আপনি খুব কম বদদোয়া করতেন, কিন্তু যখনই কাউকে সাহাবীদের অবমাননা করতে দেখতেন, তখন তা সহ্য করতে পারতেন না। এমন অবস্থায় যখনই মুখ থেকে কোনো বদদোয়া বের হতো, তা কার্যকর হতো। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে হযরত আলী (রা.)-কে মন্দ বলছে। নিষেধ করার পরও যখন সে বিরত হলো না, তখন আপনি তার ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করলেন। কিছুক্ষণ পরই একটি উট এসে তাকে পিষে ফেলল। একবার আপনি এক ব্যক্তিকে হযরত তালহা ও জুবায়ের (রা.)-এর সমালোচনা করতে দেখলেন। নিষেধ করার পরও সে না থামলে আপনার মুখ থেকে বদদোয়া বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরই একটি পাগল উট এসে তাকে ছিঁড়ে ফেলল [৬]।

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৩০/৩, দার সাদির।

[২] সুনানে তিরমিজি, হা: ৩৭৫৩, আবওয়াবুল মানাকিব।

[৩] সুনানে তিরমিজি, হা: ৩৭৫১, আবওয়াবুল মানাকিব।

[৪] সহিহ বুখারি, হা: ১২৯৫, কিতাবুল জানাইয, বাব রিদা আল্লাহ...।

[৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১১৭/১, আর-রিসালা... সন্তান উমর বিন সাদ ও আমির বিন সাদ বিখ্যাত।

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১১৬/১।

এক ব্যক্তি জনসমক্ষে আপনার বিরুদ্ধে খেয়ানত এবং অবিচারের অভিযোগ আরোপ করল। আপনি বললেন: “হে আল্লাহ! যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তাকে অন্ধ করে দিন, তাকে দরিদ্র করে দিন এবং তার আয়ু দীর্ঘ করে দিন।” সেই ব্যক্তির সাথে পরবর্তীতে এমনই ঘটেছিল। [১]

আপনি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। গায়ের রঙ গন্দমি এবং চুল কোঁকড়ানো ছিল। আপনি আশারায়ে মুবাশশারা, আসহাবে বদর এবং উমর ফারুক (রা.) কর্তৃক গঠিত ছয় সদস্যের শুরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আপনি হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে কিসরার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাদিসিয়ার ময়দানে ইরানীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সাসানি সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন এবং দজলা নদী অলৌকিকভাবে পার হয়ে কিসরার রাজধানী মাদায়েন দখল করেছিলেন। আপনি ইরাকে কুফা শহর আবাদ করেছিলেন এবং সেখানকার গভর্নরও ছিলেন। [২]

আপনার মহত্ত্ব, আভিজাত্য, ইসলামের জন্য ত্যাগ এবং বীরত্বপূর্ণ গুণাবলী এমন ছিল যে আপনি খিলাফতের সম্মানের যোগ্য হতে পারতেন। কিন্তু আপনি কখনো এর আকাঙ্ক্ষা করেননি। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে আপনাকে কুফার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর আপনি হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এরপর সারা জীবন রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরে ছিলেন। জামাল, সিফফিন এবং তাহকিম-এর সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

হুসাইন বিন খারিজা নামক এক তাবেয়ী ছিলেন, যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সৃষ্ট মতভেদের দিনগুলোতে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে কোন দলের সাথে থাকবেন। অবশেষে তিনি এই দুআ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে সেই সত্য পথ দেখিয়ে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। স্বপ্নে দেখলেন যে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে একটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এই দেয়াল টপকে সামনে গেলে কিছু লোক দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন: “আপনারা কারা?”

তারা বললেন: “আমরা ফেরেশতা নই।”

জিজ্ঞেস করলেন: “শহীদরা কোথায়?” তারা বললেন: “আরও উপরে যান।”

তিনি সিঁড়ি দিয়ে আরও উপরে গেলেন এবং দেখলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.) অবস্থান করছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে বলছিলেন: “আমার উম্মতের জন্য ইস্তিগফার করুন।”

হযরত ইব্রাহিম (আ.) বলছিলেন: “আপনি কি জানেন না তারা আপনার পরে কী করেছে? রক্ত ঝরিয়েছে এবং নিজেদের ইমামকে হত্যা করেছে। তারা কেন এমন করল না যেমন আমার বন্ধু সাদ করেছিল।”

হুসাইন বিন খারিজা যখন জাগ্রত হলেন, তখন তিনি এই স্বপ্ন হযরত সাদ (রা.)-কে শোনালেন। তিনি খুশি হয়ে বললেন:

“সেই ব্যক্তি ব্যর্থ ও আশাহত যে ইব্রাহিম (আ.)-এর বন্ধু নয়।”

হুসাইন বিন খারিজা জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি কোন দলে অন্তর্ভুক্ত?” বললেন: “কারো দলেই নয়।”

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৭৫৫, বাবু উজুবিল কিরাআতি লিল ইমাম।

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৯৩, ত: আর-রিসালাহ; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/৮৩।

হুসাইন বললেন: “আমাকে কী পরামর্শ দিচ্ছেন?”

হযরত সা’দ [রা.] জিজ্ঞেস করলেন: “তোমার কাছে কি ছাগল আছে?” তিনি বললেন: “জি না।”

তিনি বললেন: “ছাগল কিনে এই ফিতনা থেমে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো এক জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করো।” [১]

ইসলামি বিশ্বে আপনার ভক্ত-অনুরাগীদের এক বিশাল বলয় ছিল। কিছু সঙ্গী আপনাকে বলেছিলেন যে, আপনি যদি খিলাফতের প্রার্থী হন তবে এক লক্ষ তলোয়ার আপনার সমর্থনে কোষমুক্ত হতে পারে। কিন্তু আপনার উত্তর ছিল: “আমি সেই এক লক্ষ তলোয়ারের মধ্যে কেবল এমন একটি তলোয়ার চাই যা কাফিরকে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে কিন্তু মুমিনের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।” [২]

আপনার জীবনের শেষ বিশ বছর নির্জনে অতিবাহিত হয়েছে। মদিনা মুনাওয়ারা থেকে সাত মাইল (সোয়া এগারো কিলোমিটার) দূরে আকিক নামক স্থানে নিজের প্রাসাদে বসবাস করতেন। এই সময়ে কতই না বিপ্লব এসেছে কিন্তু আপনি নিজের জায়গা থেকে নড়েননি। আপনার ছেলে উমর বিন সা’দ একবার বললেন:

“মানুষ সেখানে খিলাফত ও শাসনের জন্য কাড়াকাড়ি করছে আর আপনি এখানে আলাদা হয়ে বসে আছেন।”

আপনি বললেন: “বৎস! আমি নবী আকরাম [সা.]-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা এমন বান্দাকে পছন্দ করেন যে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী, অখ্যাত এবং পরহেজগার হয়।” [৩]

সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস [রা.] এই নির্জনবাসের অবস্থাতেই অবশেষে ৫৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আপনি আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে ইন্তেকালকারী সর্বশেষ ব্যক্তি। [৪]

রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরযাহু

□□□

---

[১] মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২৬

[২] তারিখ দামেশক লি ইবনে আসাকির: ২০ / ২৮৭

[৩] সহীহ মুসলিম, হা: ২৯৬৫, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকায়েক, ত: দারুল জীল...

উমর বিন সা’দ-এর এই ধারণা সঠিক বলে মানা যায় না। সেই সময় হযরত আলী [রা.] এবং হযরত মুয়াবিয়া [রা.]-এর মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য চলছিল। এই সাহাবীদের মতপার্থক্য নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছিল, ধন-সম্পদ বা পদের জন্য নয়। হ্যাঁ, তাদের চারপাশে সমবেতদের মধ্যে কিছু ফিতনাবাজ লোকও ছিল। উমর বিন সা’দ-এর উক্তির প্রয়োগ সেই ফিতনাবাজদের ওপর সঠিক হতে পারে, সাহাবীদের ওপর কখনোই নয়। মনে রাখতে হবে যে, এই উমর বিন সা’দ-ই হযরত হুসাইন [রা.]-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাই তার নিজের চরিত্র এমন ছিল না যে তার কোনো কথাকে আমরা হুবহু সত্য বলে গ্রহণ করব। পিতাকে নির্জনবাসের জন্য তিরস্কার করাও দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। যেখানে হযরত সা’দ [রা.]-এর উত্তর ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ।

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১ / ১১৯, ত: আর-রিসালাহ

## কতিপয় মহান সাহাবীর আলোচনা

এখন আমরা আশারায়ে মুবাশশারা ছাড়াও আরও কয়েকজন মহান সাহাবীর অবস্থা তুলে ধরছি যারা ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এমন সাহাবী অনেক রয়েছেন তবে আমরা নমুনা হিসেবে এখানে মাত্র পাঁচজন সাহাবীর অবস্থা উল্লেখ করছি। ইনশাআল্লাহ আরও কিছু সাহাবীর অবস্থা দ্বিতীয় খণ্ডে পেশ করা হবে।

ইলমে নববীর উত্তরাধিকারী... মুফাসসিরে কুরআন... ফকিহে উম্মত

### হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার একজন মেষ ও ছাগল চরানো বালক ছিলেন যিনি অল্প বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সাহচর্য থেকে অপরিসীম ফয়েজ হাসিল করেন। ঐ সময় মক্কায় মাত্র কয়েকজন লোক মুসলমান হয়েছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত গোপনভাবে দেওয়া হচ্ছিল। [১]

তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনু হুযাইল গোত্রের সাথে। তাঁর মা উম্মে আবদ-ও মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁর দিকে সম্বন্ধ করেই সাহাবীদের মাঝে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে “ইবনে উম্মে আবদ” বলা হতো।

তাঁর ঈমানী সাহসিকতার অবস্থা এমন ছিল যে, ইসলাম গ্রহণের পর সাথীদের নিষেধ করা সত্ত্বেও একদিন মসজিদে হারামে গিয়ে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত শুরু করে দেন। মুশরিকরা তা শুনে সহ্য করতে পারল না এবং তাঁকে এত মারল যে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল পর্যন্ত ফুলে গেল। ফিরে আসার পর সাথীরা দুঃখ ও আফসোস প্রকাশ করলেন কিন্তু তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! এই লোকগুলো আমার দৃষ্টিতে আজ যতটা তুচ্ছ হয়েছে, আগে কখনো এমন ছিল না। তোমরা বললে আমি কাল আবার গিয়ে তাদের সামনে তাওহীদের ঘোষণা দেব।”

সাথীরা বললেন: “না, এতটুকুই যথেষ্ট যে তুমি তাদের অপছন্দ সত্ত্বেও তাদের কুরআনের আওয়াজ শুনিয়ে এসেছ।” [২]

মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে শামিল হন। [৩]

হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ের বয়সও ছিল কাছাকাছি। মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে করিয়ে দিয়েছিলেন। [৪]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৪৬৪, ত. আর-রিসালাহ।

[২] উসদুল গাবাহ, জীবনী: আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

[৩] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ: ৩/১৫১। হাবশার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় হিজরতে অংশগ্রহণের কথাটি সঠিক নয় যেমনটি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

[৪] রাওয়াহুল হাকিম: আখী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইনায যুবাইর বিন আওয়াম ওয়া আবদুল্লাহ বিন মাসউদ। (রেওয়ায়েত নম্বর: ৫৩৭২, সনদ সহীহ)

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

প্রথম অংশ

একটি বর্ণনা অনুযায়ী মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর সাথেও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হয়েছিল। মদিনায় হিজরত করে তিনি শুরুতে মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেছিলেন। [১] হিজরতের পর একটি বর্ণনা অনুযায়ী সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী আনাস বিন মালিক (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। [২]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) শারীরিকভাবে খাটো, রোগা ও দুর্বল ছিলেন কিন্তু মেধা ও স্মৃতিশক্তিতে তিনি ছিলেন অনন্য। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে তিনি একটি গাছে (ডাল বা ফল পাড়তে) চড়লেন। তাঁর সরু পা দেখে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা হাসতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন:
"তোমরা এই মানুষের ওপর কেন হাসছ? আল্লাহর মিযানে (পাল্লায়) তাঁর ওজন ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি।" [৩]

শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বদর যুদ্ধসহ অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহল বদর যুদ্ধে তাঁর হাতেই নিহত হয়েছিল। আনসারদের কিছু যুবক তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে তাকে খুঁজতে বের হলেন। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে তার দাড়ি ধরলেন এবং বললেন: "তুই-ই কি সেই পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ আবু জাহল?" [৪]
এরপর তিনি তার মাথা কেটে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পেশ করলেন। [৫]

হুনাইন যুদ্ধে যখন মুসলমানরা পিছু হটছিল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারপাশ ঘিরে থাকা একনিষ্ঠ যোদ্ধাদের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৬]
খুলাফায়ে রাশেদীনের পর তিনি তাঁর সময়ে কুরআন মাজীদ এবং এর তাফসীরের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন: "আমি কুরআন মাজীদ সম্পর্কে সবার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। যদি আমি জানতাম যে কারো কাছে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান আছে এবং উটের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব, তবে আমি অবশ্যই সেখানে যেতাম।" [৭]

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: "এই মুহূর্তে সাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশি কুরআন মাজীদের আলেম আর কেউ নেই। তবে আমি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই।" [৮]
এটি কেবল তাঁর নিজের অভিমত ছিল না, বরং আবু মাসউদ বদরী (রা.)-এর মতো প্রবীণ সাহাবীরাও সাক্ষ্য দিয়ে বলতেন:
"রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর তাঁর চেয়ে বড় কুরআনের আলেম আর কেউ নেই।" [৯]

---

[১] আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ: ৩/১৫১, ১৫২, ত: সাদির।

[২] আল-ইসাবাহ: ৩/৪০০, তরজমা: আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সুরত হলো এই যে, হিজরতের আগে হযরত যুবাইর (রা.)-এর সাথে, হিজরতের পরপরই হযরত মুআয (রা.)-এর সাথে এবং মদিনায় অবস্থানের পর হযরত সা'দ (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব হয়েছিল। আনাস বিন মালিক (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব গাযওয়া বনু কুরাইযায় সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর শাহাদাতের পর হয়েছিল। কারণ হিজরতের সময় আনাস (রা.) নাবালেগ ছিলেন এবং একজন নাবালেগের সাথে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনা খুব কম।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা: ৯২০।

[৪] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১৩২৭।

[৫] দালায়েলুন নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী: ৩/৮৬।

[৬] উসদুল গাবাহ, তরজমা: আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)। [৭] সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৮৬।

[৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১/৩৫১, ত: আর-রিসালাহ। [৯] সহীহ মুসলিম, হা: ২৩৮৩, কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবাহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলতেন:

“যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ সেভাবেই পড়তে চায় যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনে উম্মে আবদ-এর মতো পড়ে।” [১]

তাঁর ইলমী যোগ্যতা দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথম দিনই বলেছিলেন: “ইন্নাকা গুলাইমুন মুআল্লাম” অর্থাৎ তুমি একজন শিক্ষিত বালক। [২]

তিনি তেমনই প্রমাণিত হলেন। সত্তরটিরও বেশি সূরার শিক্ষা সরাসরি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে লাভ করেছেন। এটি তাঁর এমন এক বৈশিষ্ট্য যা অন্য কেউ অর্জন করতে পারেনি। [৩]

এই পড়া কেবল শব্দ উচ্চারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه নিজেই বলতেন যে, আমরা যখন দশটি আয়াত শিখতাম, তখন সেগুলোর মর্ম ও অর্থ না বুঝে পরবর্তী দশটি আয়াত পড়তাম না। [৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কিরাত এত পছন্দ করতেন যে, একবার নিজেই ফরমায়েশ করলেন যে আমাকে আল্লাহর কালাম শোনাও। তিনি আরজ করলেন:

“আপনাকে কী শোনাব, আপনার ওপরই তো তা নাযিল হয়েছে।”

বললেন: “আমার মন চায় যে অন্য কারো কাছ থেকে শুনি।”

দরবারে রিসালাতের খাদেম তিলাওয়াত শুরু করলেন। এই আয়াতে পৌঁছালেন:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

“তখন কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী ﷺ) আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব।” [৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইশারা করে থামিয়ে দিলেন। দেখা গেল তাঁর ﷺ চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। [৬]

তিনি অত্যন্ত সুকণ্ঠী ছিলেন, কুরআন মাজীদ অত্যন্ত আগ্রহ ও সুমধুর স্বরে প্রচুর তিলাওয়াত করতেন। রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত, তখন তিনি নফল নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেখবর হয়ে নিচু স্বরে তিলাওয়াত করে যেতেন। দূর থেকে মনে হতো যেন মৌমাছি গুনগুন করছে। [৭]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে তিনি এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, সারাজীবন সবসময় সাথে সাথে থাকতেন। পবিত্র ঘরে তাঁর সবসময় যাতায়াতের অনুমতি ছিল। এই কারণেই মদিনায় আসা নতুন মেহমান সাহাবীগণ শুরুতে তাঁকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারেরই একজন সদস্য মনে করতেন। [৮]

সফরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগত খিদমত সাধারণত তিনিই আঞ্জাম দিতেন। বিছানা পাতা, মিসওয়াক... [৯]

---

[১] সুনান ইবনে মাজাহ, হা: ১৩৮

[২] মুসনাদে আহমদ, হা: ৩৫৯৮

[৩] সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩/৪৬১

[৪] সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩/৪৯০

[৫] সূরা আন-নিসা: ৪১

[৬] সহীহ বুখারী, হা: ৫০৫৫, কিতাব ফাদায়িলুল কুরআন, বাব আল-বুকা ইনদা কিরাআতিল কুরআন

[৭] সিয়ার আলামুন নুবালা: ৩/৪৯২, আল-রিসালা

[৮] সহীহ মুসলিম, হা: ২৪৬০, ফাদায়িলুস সাহাবা, বাব ফাদায়িল আবদুল্লাহ বিন মাসউদ

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

পবিত্রতা ও ওযুর পানি পেশ করা এবং জুতা সামনে রাখা তাঁর দায়িত্ব ছিল। [১]

ইসলাম ধর্মের একটি বড় অংশ, বিশেষ করে ফিকহি মাসআলার এক অমূল্য ভাণ্ডার তাঁর মাধ্যমেই উম্মতে মুসলিমার কাছে পৌঁছেছে। ফিকহে হানাফীর দলীলসমূহের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের পর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ সবচেয়ে বেশি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর সিদ্দীকী আমলের দুই বছর তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। এই সময়ে ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) ও বিদ্রোহের ধারা শুরু হয়েছিল এবং মদীনা মুনাওয়ারাও বিপদের মুখে ছিল। মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় কিছু ক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনা হেফাজতের দায়িত্ব আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর ন্যস্ত করেন। [২] ফারুকী আমলে সিরিয়া বিজয়ের ঘটনা তাঁর জিহাদী চেতনাকে পুনরায় জাগ্রত করে এবং তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এই সময়ে হিজাজে অসংখ্য মানুষ তাঁর ইলমি মজলিসের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবির বিন আবদুল্লাহ এবং আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মতো তরুণ সাহাবীগণও ছিলেন, যারা পরবর্তীতে শরীয়তের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন। আবু হুরায়রা এবং আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মতো বড় মাপের সাহাবীগণও তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, কারণ এই ব্যক্তিবর্গ খায়বার বিজয়ের পর মদীনায় এসেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের তুলনায় দরবারে নবুওয়াত থেকে উপকৃত হওয়ার বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন। [৩]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ওপর অত্যন্ত আস্থা রাখতেন। কিছু বন্ধু তাঁর খাটো আকৃতি দেখে কৌতুক বোধ করতেন, কিন্তু উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: “কুনাইয়িফুন মুলিয়া ইলমান” (তিনি ইলমে ভরপুর একটি ছোট আধার)। [৪]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু যখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দেখা হতো, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত এবং তিনি হাসতে শুরু করতেন। [৫]

যেহেতু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পায়ের নলা অস্বাভাবিকভাবে চিকন ছিল, তাই তিনি লুঙ্গি টাখনুর চেয়ে বেশি উঁচুতে পরতেন যাতে দেখতে কারো কাছে খারাপ না লাগে। একদিন তিনি এক ব্যক্তির লুঙ্গি নিচে ঝুলতে দেখে তাকে তা উপরে তোলার কথা বললেন। সে জবাবে তাঁকেই সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাল যে, আপনার লুঙ্গিও তো উঁচুতে হওয়া উচিত।

তিনি বললেন: “আমি এজন্য নিচে রাখি যে, আমি নামাজে ইমামতি করি এবং আমার পায়ের নলা খুব চিকন।” হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই ব্যক্তির আপত্তির কথা জানতে পেরে চাবুক নিয়ে তার খবর নিলেন এবং বললেন: “তুমি ইবনে মাসউদকে বাধা দাও!” [৬]

তাঁর ইলমি মাকাম এবং দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার কথা বিবেচনা করে হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মদীনায় নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন ইরাকে কুফা শহর আবাদ হলো এবং সেখানে আর্থিক ব্যবস্থাপক, শিক্ষক ও ফকীহদের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু...

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ, ৩/৫৩; ত. দার সাদির

[২] তারিখ খলিফা: ১১ হিজরীর অধীনে

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৬১, ত. আর-রিসালাহ

[৪] কিতাবুল আসার লিল-কাযী আবি ইউসুফ, পৃ. ১৩৩, ত. আল-ইলমিয়্যাহ; তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৫৬ দার সাদির

[৫] তাবাকাত ইবনে সাদ: ৩/১৫৬

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৯২, ত. আর-রিসালাহ

কুফাবাসীদের নামে নিম্নোক্ত বার্তার সাথে তাঁকে সেখানে পাঠানো হলো:

“আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে তোমাদের শিক্ষক ও উজির বানিয়ে পাঠাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ব্যাপারে নিজের ওপর তোমাদের প্রাধান্য দিয়েছি।” [১]

কুফায় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কমবেশি চৌদ্দ বছর অতিবাহিত করেন। এটি ছিল পূর্বদিকের প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক কেন্দ্র। সমস্ত মুসলিম কর্মকর্তা, সৈন্য, সরকারি কর্মচারী এবং ভাতা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ আপনার তত্ত্বাবধানে থাকত। গণিত ও অর্থনীতির কোনো বিদ্যাপীঠে না পড়েও একজন ক্বারী ও ফকিহ এত বড় প্রশাসনিক কাজ এমন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে থাকা যে, চৌদ্দ বছরে এক পয়সার হিসাব এদিক-সেদিক হওয়ার অভিযোগও উঠতে পারেনি, একে একটি কারিশমা বা অলৌকিক ঘটনাই বলা যেতে পারে।

কুফায় আপনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো কুরআনের তাফসির এবং ইসলামি ফিকহ প্রচার করা, যার সুযোগ বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে আপনি ভালোভাবে পেয়েছিলেন। বড় বড় মেধাবী তাবেয়িগণ আপনার থেকে উপকৃত হয়েছেন, যাদের মধ্যে আলকামা বিন কাইস, মাসরুক, আল-আসওয়াদ, উবাইদাহ আস-সালমানি, কাইস বিন আবি হাজিম, জির বিন হুবাইশ এবং তারিক বিন শিহাব (রহ.) অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। এই ব্যক্তিদের মাধ্যমেই পরবর্তীতে কুফায় তাফসির ও ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। [২]

২৩ হিজরিতে হযরত উমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের আসনে বসেন। এই সময়ে ইরাকে বিশেষ করে কুফায় অনেক কর্মকর্তা পরিবর্তিত হন, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে তাঁর কর্মদক্ষতার কারণে বহাল রাখা হয়।

অবশেষে ৩২ হিজরিতে হযরত উসমান গনি (রা.) তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং সেই সাথে মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার নির্দেশ দেন। পদচ্যুতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অধিকাংশ বর্ণনায় হযরত উসমান (রা.) সহ কিছু সাহাবীর সাথে তাঁর মনোমালিন্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই বর্ণনাগুলো দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অব্যাহতি একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। কোনো অসন্তুষ্টির কারণেই কাউকে পদচ্যুত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া সেই সময় তাঁর বয়স ষাট বছর হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া পদচ্যুতির একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

এতটুকু নিশ্চিত যে, কুফাবাসীদের মধ্যে তাঁর ভক্তরা যারা তাঁর পদচ্যুতির কারণে ব্যথিত ছিলেন, তারা জেদ ধরেছিলেন যে আপনি মদিনায় যাবেন না। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) চাননি যে নির্দেশ পালনে অবহেলা করে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের কারণ হতে, তাই তিনি বললেন: “আনুগত্য করা আমাদের দায়িত্ব। আমি এটা পছন্দ করি না যে আমি ফিতনার দরজা খুলি।” [৩]

আপনি উমরার ইহরাম বেঁধে হিজাজের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, পথে রাবাযার প্রান্তরে হযরত আবু যর গিফারি (রা.)-এর জানাজায় শরিক হওয়ার সুযোগ পেলেন। উমরার পর মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন এবং কয়েক মাস পর ইন্তেকাল করেন। [৪]

---

[১] তাবাকাত ইবনে সাদ: ১৩/৩, সাদির

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৬১, ৩৬২, ত. আর-রিসালাহ

[৩] আল-ইসাবাহ: ২/৩০১, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৯৮, ২/৪৭৭, ত. আর-রিসালাহ

প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত উসমান (রা.) দুই বছর তাঁর বেতন বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল এবং অন্যান্য বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। হাফেজ যাহাবী (রহ.) আসল বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এবং অনেক সাহাবী হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে সচ্ছল হয়ে গিয়েছিলেন, তাই হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁরা নিজেরাই সরকারি ভাতা গ্রহণ করা ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং বেতন বাজেয়াপ্ত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। [১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুবাইর বিন আওয়াম (রা.)-এর সাথে করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের উভয়ের এই সম্পর্ক আপন ভাইদের চেয়েও বেশি মজবুত ছিল। এমনকি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) মৃত্যুর সময় তাঁর অসিয়তনামা সহ সমস্ত আর্থিক বিষয়ের দায়িত্বশীল এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের অভিভাবক হিসেবে তাঁকেই নিযুক্ত করে যান। জুবাইর বিন আওয়াম (রা.) তাঁর মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রা.)-কে পরামর্শ দেন যে, তিনি নিজে থেকে যে বেতন নেওয়া ত্যাগ করেছিলেন, তা একত্রিত করে তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের দিয়ে দেওয়া হোক। হযরত উসমান (রা.) তেমনই করলেন এবং সেই অর্থ যা পনেরো হাজার দিরহাম (আজকের প্রায় ৩৫-৪০ লক্ষ টাকা) ছিল, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করে দিলেন। [২]

হযরত আলী (রা.) যখন কুফাকে কেন্দ্রবিন্দু বানালেন, তখন সেখানে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর ছাত্ররা তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তাঁদের উস্তাদের গুণাবলী শোনালেন। হযরত আলী (রা.) বললেন: “তিনি এমনই ছিলেন বরং এর চেয়েও উত্তম। তিনি কুরআন পড়েছেন, এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছেন। তিনি দ্বীনের ফকীহ এবং সুন্নাহর আলিম ছিলেন।” [৩]

রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আরযাহু।

□□□

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৪৮৭, ত ত রিসালাহ

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৪৯৮

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ: ৩/১৫৬, সাদির

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

অংশ: প্রথম

**রাসূল-প্রেমিক... আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক**

**হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)**

একেবারে শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারী এবং ইসলামের খাতিরে পাহাড়সম বিপদ-আপদ সহ্যকারী একজন মহান মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু সায়িব। মাতার নাম ছিল নুহাইলা বিনতে আনবাস। তিনি সেই সময়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন যখন মাত্র তেরোজন ব্যক্তি মুসলমান ছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি, অর্থাৎ তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর আপন মামা ছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগেও তিনি মদ্যপান থেকে বিরত থাকতেন। তিনি বলতেন:
“আমি কেন এমন কাজ করব যার ফলে বুদ্ধি লোপ পায় এবং নিচ প্রকৃতির লোকেরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে?” [১]

যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) ও ইবাদতে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে দুনিয়া ত্যাগ এবং তাবাত্তুল (বিবাহ বর্জন) করার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুমতি দেননি [২] এবং অধিক পরিমাণে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [৩]

হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) মক্কাবাসীদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার দিকে হিজরত করেন। সেখানে যখন সংবাদ পেলেন যে মক্কার কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তিনি ফিরে আসেন। মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলেন। পুনরায় হাবশার দিকে সফর করা কঠিন ছিল, তাই তিনি বিখ্যাত মুশরিক নেতা ওয়ালিদ বিন মুগিরার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হন।

এদিকে মুসলমানদের ওপর কঠোরতা নেমে আসছিল। হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) এটি সহ্য করতে পারছিলেন না যে, তাঁর দিন-রাত শান্তিতে কাটবে আর বাকি মুসলমানরা চরম কষ্টের মধ্যে থাকবে। তিনি বলতে লাগলেন: “আমার বন্ধুদের জীবন বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে কাটছে আর আমি একজন কাফিরের আশ্রয়ে আরামে জীবন যাপন করছি, আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমার ভেতরে কোনো ত্রুটি রয়েছে।”

এই বলে তিনি ওয়ালিদকে তার আশ্রয় ফিরিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর আরবের বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন রাবিয়াহ, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, মক্কাবাসীদের কোনো এক মজলিসে কবিতা শুনিয়ে বলছিলেন:
اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ (আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।)
হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) বললেন: “সত্য বলেছ।”
লাবিদ দ্বিতীয় পঙক্তিটি পড়লেন: “وَ كُلُّ نَعِيْمٍ لَّا مَحَالَةَ زَائِلٌ” (প্রত্যেক নেয়ামতই অবশ্যই ধ্বংসশীল।)
হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়াজ তুললেন: “ভুল! জান্নাতের নেয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী।”

---

[১] আসাদুল গাবাহ: ৩/৫৮৯

[২] সহীহ বুখারী, হা: ৫০৭৩, কিতাবুন নিকাহ, বাব কারাহিয়াতুত তাবাত্তুল

[৩] আয-যুহদ ওয়া আর-রাকাইক লি-আবদুল্লাহ বিন আল-মুবারক, হা: ১১০৬

এটি শুনে লবীদ উপস্থিতদের বললেন:

“আল্লাহর কসম, আপনাদের মজলিসের লোকেরা আগে তো এমন অপ্রীতিকর কথা বলতেন না। এই পরিবর্তন কবে থেকে শুরু হলো?”

এক ব্যক্তি বলল: “এ নির্বোধ, এর সাথে এমন আরও কিছু লোক আছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।”

লবীদ পুনরায় সেই কবিতাটি পড়লেন। হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) আবার একইভাবে বাধা দিলেন। কথা বেড়ে গেল। সেই ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে সামনে এগিয়ে এল এবং আপনার চেহারায় এমন জোরে চড় মারল যে চোখ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং দাগ পড়ে গেল।

কেউ বলল: “আপনি যখন ওয়ালিদের আশ্রয়ে ছিলেন তখন আপনার চোখ নিরাপদ ছিল, ভুল করেছেন যে তার নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে গেছেন।”

হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন: “আমি তো আমার দ্বিতীয় চোখটিও দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আল্লাহ তাআলার আশ্রয় আমার জন্য অধিক শক্তিশালী।” [১]

হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) হাবশায় হিজরতের পর মদিনায় হিজরতের গৌরবও লাভ করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর শীঘ্রই ২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং যাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

নবী আকরাম (সা.) তাঁর মরদেহে তিনবার চুম্বন করেন যখন চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। [২]

তারপর বললেন: “হে উসমান! তুমি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় গেলে যে দুনিয়ার কোনো কিছু দ্বারা কলুষিত হওনি।” [৩]

হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)-এর স্ত্রী তাঁর মৃত্যুতে বলেন:

يَا عَيْنُ جُوْدِيْ بِدَمْعٍ غَيْرِ مَمْنُوْعٍ ... عَلَى رَزِيَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ
عَلَى امْرِأٍ بَاتَ فِيْ رِضْوَانِ خَالِقِهِ ... طُوْبَى لَهُ مِنْ فَقِيْدِ الشَّخْصِ مَدْفُوْنِ

“হে চোখ! উসমান বিন মাজউনের দুর্ঘটনায় অনবরত অশ্রু বিসর্জন করো, এমন এক ব্যক্তির জন্য যিনি তাঁর স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য রাত অতিবাহিত করতেন, সুসংবাদ তাঁর জন্য যাঁর বরকতময় দেহ কবরের সোপর্দ করা হয়েছে।”

আনহযরত (সা.) আপনার কবরে চিহ্নের জন্য একটি পাথর রাখিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি মাঝে মাঝে সেখানে তাশরিফ নিতেন।

এক সাহাবী স্বপ্নে দেখলেন যে হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)-এর জন্য একটি নহর প্রবাহিত হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সা.) শুনে বললেন: “এটি তাঁর আমলের ফল।” [৪]

রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরযাহু

---

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া: ১/১০৩, হুততুস সাআদাহ, উসদুল গাবাহ: ৩/৫৮৯

[২] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জানায়েয, বাবু তাকবিলিল মাইয়্যিত; আল-ইসতিয়াব: ৩/১০৫৩

[৩] উসদুল গাবাহ: ৩/৫৮৯

[৪] উসদুল গাবাহ: ৩/৫৮৯

প্রথম মুহাজির... আনসারদের শিক্ষক... পয়গম্বরের পতাকাবাহী

**হযরত মুসআব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত মুসআব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুনিয়াত ছিল আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর গণনা আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন-দের মধ্যে হয়। তিনি মক্কার সবচেয়ে সুন্দর এবং বিলাসিতার মধ্যে বসবাসকারী যুবক ছিলেন। দামী পোশাক পরিধান করতেন। [১]

তিনি সেই দিনগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করেন যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামকে তাবলিগের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন। এই সময়টি ছিল ইসলামের গোপন দাওয়াত এবং গ্রহণকারীদের ওপর নির্যাতনের। যখন তাঁর পরিবার তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন তাঁকে বেড়ি পরিয়ে দিল। যে সময় মুসলমানরা হাবশার দিকে হিজরত করতে শুরু করল, তখন হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও পালিয়ে হাবশার দিকে হিজরত করতে সফল হলেন। [২]

কিছুকাল পর ফিরে এলেন। মদিনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আনসারদের শিক্ষা এবং নামাজের ইমামতির জন্য সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর তাবলিগের মাধ্যমে সেখানে ঘরে ঘরে ইসলামের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি সর্বপ্রথম মদিনায় হিজরতকারী সৌভাগ্যবান সাহাবী। মক্কার এই ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান সেখানে অত্যন্ত অভাব-অনটনের জীবন অতিবাহিত করেন। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন এমতাবস্থায় হযরত মুসআব বিন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত হলেন, শরীরে একটি ছোট চাদর ছিল যাতে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বের অবস্থার কথা স্মরণ করে অশ্রুসিক্ত হলেন। [৩]

হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু গাজওয়ায়ে বদরে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এরপর গাজওয়ায়ে উহুদে শরিক হন। এই যুদ্ধে নববী পতাকা তাঁরই হাতে ছিল, এখানে তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু বীরত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর শাহাদাতের কারণে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আনহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন, কারণ তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু আকার-আকৃতিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সদৃশ ছিলেন।

শাহাদাতের সময় তাঁর মালিকানায় মাত্র একটি চাদর ছিল, যখন তা দিয়ে তাঁর পা ঢাকা হতো তখন মাথা খুলে যেত এবং যদি মাথা ঢাকা হতো তবে পা প্রকাশ হয়ে যেত। পরিশেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের ওপর ইযখির ঘাস দিয়ে দাও।” [৪]

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরদাহু

---

[১] আল-ইসাবাহ: ৬/৯৮, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

[২] আল-ইস্তিআব: ৪/১৪৭৩

[৩] উসদুল গাবাহ: ৫/১৭৫

[৪] আল-ইসাবাহ: ৬/৯৮, ত. আল-ইলমিয়্যাহ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

আনসারদের নেতা, আত্মমর্যাদাশীল ও উৎসর্গকারী

**হযরত সাদ বিন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু**

হযরত সাদ বিন মুয়াজ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু আউস গোত্রের বনু আবদুল আশহাল শাখার নেতা ছিলেন। রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারণে জাহেলিয়াত যুগে মক্কার কুরাইশ এবং ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটতম আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নেতৃত্বের গুণাবলীতে সমৃদ্ধ এবং আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। শারীরিক দিক থেকে তিনি দীর্ঘদেহী ও চওড়া কাঁধের অধিকারী ছিলেন। তিনি বাগ্মিতা ও বক্তৃতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। মদিনা মুনাওয়ারায় ইসলাম প্রচারে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের গোত্রকে লক্ষ্য করে বলেন:

“كَلَامُ رِجَالِكُمْ وَ نِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُسْلِمُوا”

“তোমাদের পুরুষ ও নারীদের আমার সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম যতক্ষণ না তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।”

এই কথা শুনে পুরো গোত্র ওই দিনই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। [১]

তাঁর সাহাবিয়াতের সময়কাল মাত্র ছয় বছর, কিন্তু সীরাত ও হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর কৃতিত্ব অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে আনসারদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। বদরের যুদ্ধের আগে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, ‘কী করা উচিত?’ তখন তিনি আনসারদের নেতা হিসেবে পুরো জাতির প্রতিনিধিত্ব করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন:

“لَئِنْ سِرْتَ حَتَّى تَأْتِيَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ، وَلَا نَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُتَّبِعُونَ ..... فَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَسَالِمْ مَنْ شِئْتَ وَعَادِ مَنْ شِئْتَ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ.”

“যদি আপনি বারক আল-গিমাদ পর্যন্তও যান, তবে আমরা আপনার সাথে চলব। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো হব না যারা মূসা আলাইহিস সালাম-কে বলেছিল: ‘আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসে রইলাম।’ বরং আমরা বলছি যে, আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা আপনাদের সাথে আছি। আপনি যার সাথে চান সম্পর্ক যুক্ত করুন, যার সাথে চান সম্পর্ক ছিন্ন করুন, যার সাথে চান সন্ধি করুন, যার সাথে চান যুদ্ধ করুন; আমাদের সম্পদ থেকে যা খুশি গ্রহণ করুন।” [২]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ওপর যখন অপবাদ দেওয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবাদ দানকারীদের শাস্তি...

---

[১] আল-ইসাবাহ: ৩/১৭

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, হা: ৩৬৬৬০ ত. আর-রুশদ; সহীহ মুসলিম, হা: ৪৭২১, কিতাবুল জিহাদ বাব গাযওয়ায়ে বদর

[ফয়সালা] দেওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ চাইলে সাদ বিন মুয়াজ (রা) সবার আগে দাঁড়িয়ে এই বীরত্বপূর্ণ উত্তর দিলেন: “আমার রায় হলো আপনি এই লোকদের শিরশ্ছেদ করে দিন। যদি তারা আউস গোত্রের হয় তবে আমরাই তাদের ঘাড় কেটে দেব। আর যদি তারা আমাদের খাযরাজ ভাইদের মধ্য থেকে হয়, তবে আপনি যা নির্দেশ দেবেন আমরা তা পালন করব।” [১]

খন্দকের যুদ্ধে তাঁর কবজিতে একটি তীর লাগে, যা একটি ধমনী কেটে দেয়। এই জখমই প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়। [২]

যখন সাদ (রা)-কে তীর লাগল এবং রক্ত থামছিল না, তখন সাদ (রা) দোয়া করলেন:
“হে আল্লাহ! যতক্ষণ না আমি বনু কুরাইজার পরিণাম দেখে নিজের চোখ জুড়াই, ততক্ষণ যেন আমার মৃত্যু না হয়।”
দোয়া কবুল হলো এবং রক্ত সেই মুহূর্তেই থেমে গেল।

রাসুলুল্লাহ (সা) সাদ বিন মুয়াজ (রা)-কে এতই ভালোবাসতেন যে, তাঁর জখম থেকে রক্ত ঝরতে দেখে তাঁকে নিজের কোলে তুলে নিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, মসজিদের এক কোণে তাঁর জন্য একটি তাবু খাটানো হোক যাতে কাছ থেকে তাঁর দেখাশোনা করা যায়। [৩]

বনু কুরাইজার ইহুদিরা খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নিয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সা) যখন শাস্তির জন্য তাদের অবরোধ করলেন, তখন তারা সাদ বিন মুয়াজ (রা)-এর সাথে জাহেলি যুগের পুরনো বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করে তাঁকে সালিশ নিযুক্ত করার প্রস্তাব দিল। সাদ (রা) আহত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ফয়সালা দিলেন: “তাদের পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক।” রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন: “তুমি সেই ফয়সালাই করেছ যা আল্লাহ করেছেন।” [৪]

এই ফয়সালার পর রক্ত পুনরায় প্রবাহিত হতে শুরু করল এবং তিনি মদিনায় পৌঁছে খন্দকের যুদ্ধের এক মাস পর শাহাদাত বরণ করলেন। এই উপলক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন: “সাদ (রা)-এর জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য আসমান থেকে সত্তর হাজার এমন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছেন যারা এর আগে কখনো জমিনে অবতীর্ণ হননি।”

সাদ (রা) দীর্ঘদেহী এবং ভারী শরীরের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর জানাজার খাট ছিল অত্যন্ত হালকা। লোকেরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন: “ফেরেশতারা জানাজার খাট বহন করছেন।” তাঁর ইন্তেকালের পর জিবরাঈল (আ) এসে আরজ করলেন:
“এই ব্যক্তি কে যার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আরশ কেঁপে উঠেছে!!”

রাসুলুল্লাহ (সা) সারা জীবন বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর এই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করতেন। একবার অত্যন্ত নরম রেশমি কাপড় এল। সাহাবায়ে কেরাম তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন: “তোমরা কি এই কাপড়ে বিস্ময় প্রকাশ করছ? জান্নাতে সাদ বিন মুয়াজের রুমালগুলো এর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর ও নরম।” [৫]

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ওয়া আরদাহু

---

[১] মুসনাদে আবি ইয়ালা, হা: ৪৯৩১, দারুল মামুন; সহিহ বুখারি: ৪৬২১, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবু তাদিলিন নিসা।

[২] আল-ইসতিয়াব: ৬০৩/২।

[৩] আসাদুল গাবাহ: ৪৬১/২।

[৪] সহিহ বুখারি, হা: ৩৮০৪, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি সাদ বিন মুয়াজ (রা)।

[৫] সহিহ মুসলিম, হা: ৬৫০২, কিতাবুল ফাদাইলুস সাহাবা, বাবু ফাদাইলি সাদ বিন মুয়াজ (রা)।

প্রথম খণ্ড

**তারিখ উম্মতে মুসলিমা**

**আল্লাহর তলোয়ার..... জিহাদের ময়দানের অশ্বারোহী**

**সাইফুল্লাহ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)**

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বিশ্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি আল্লাহর একটি নিদর্শন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি মুজিজা ছিলেন। তিনি মানব ইতিহাসের একমাত্র জেনারেল ছিলেন যিনি শত শত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কখনও পরাজয় বরণ করেননি। তিনি কুরাইশ বংশের বনু মাখজুম শাখার সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরার পুত্র ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)-এর ভাগ্নে ছিলেন। ৮ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় পঁয়তাল يس বছর।

ইসলাম গ্রহণের কিছুকাল পরেই তিনি সিরিয়ার মুতাহ নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর তিন নেতার শাহাদাতের পর মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন এবং রোমানদের শতগুণ বড় বাহিনীর মোকাবিলায় অবিচল থাকেন। তিনি নিজে এত তীব্রভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে তাঁর হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। [১]

অবশেষে তিনি কোনো বড় ধরনের প্রাণহানি ছাড়াই রোমানদের পিছু হটতে বাধ্য করে মুজাহিদদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন। এই কৃতিত্বের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবার থেকে তাঁকে “সাইফুল্লাহ” (আল্লাহর তলোয়ার) উপাধি প্রদান করা হয়। [২]

হযরত খালিদ (রা.) মক্কা বিজয়, গাযওয়ায়ে তায়েফ, গাযওয়ায়ে হুনাইন এবং গাযওয়ায়ে তাবুকে তাঁর নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে মুরতাদ এবং খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দমন এবং ইরাক বিজয়ের সূচনায় তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলতেন: “কোনো নারী খালিদের মতো পুত্র জন্ম দিতে পারে না।” [৩]

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সিরিয়া বিজয়ের সময় তিনি প্রতিপক্ষের ওপর তাঁর যুদ্ধবিদ্যার এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে বিশ্ব তাঁকে অপরাজেয় মনে করতে শুরু করেছিল। তিনি তাঁর টুপিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকটি চুল মুবারক সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এর বরকত সম্পর্কে তিনি এভাবে বর্ণনা করতেন:

“এই টুপি পরে আমি যে যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছি, তাতেই বিজয় নসিব হয়েছে।” [৪]

তিনি একজন প্রাঞ্জল ও বাগ্মী বক্তা ছিলেন। জিহাদী অভিযানের সময় তাঁর ভাষণগুলো মুজাহিদদের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করত।

---

[১] সহীহ বুখারী, হা: ৪২৬৫, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়ায়ে মুতাহ

[২] সুনানে তিরমিযী, হা: ৩৮৪৬; আল-ইসাবাহ: ২/১৬৪

[৩] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ২/৩০০

[৪] মুস্তাদরাকে হাকিম, হা: ৫২৯৬

ছিলেন এবং তাদের মহিমান্বিত আক্রমণে শত্রু কেঁপে উঠত। পারস্যবাসীদের মুখোমুখি হয়ে এই সিংহপুরুষ তাদের কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন:

“আমার সাথে এমন এক জাতি রয়েছে যাদের কাছে মৃত্যু ঠিক তেমনই প্রিয় যেমন তোমাদের কাছে মদ।” [১]

জিহাদের উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের আত্মার সাথে মিশে গিয়েছিল। বর্ম পরিধানের কারণে তাদের জামা মরিচা ধরা হয়ে যেত। তলোয়ার কোমরে বাঁধা থাকত। শত্রুকে ভীত করার জন্য কখনও কখনও রক্তমাখা তীর নিজের পাগড়িতে গুঁজে নিতেন। [২]

তিনি বলতেন: “কোনো নতুন বধূর সাথে রাত কাটানোর তুলনায় আমার কাছে এটি অনেক বেশি পছন্দনীয় যে, আমি সারা রাত মুজাহিদদের একটি দলের সাথে তুষারপাতের মধ্যে সফর করি এবং ভোরবেলা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।” [৩]

মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া তাদের কাছে একটি খেলার মতো ছিল। শাহাদাত ছিল তাদের অন্তরের কামনা এবং সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, এই তামান্না পূরণের খাতিরে কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটেননি। বলতেন:

“আমি এই ভেবে কখনও পলায়ন করিনি যে, হয় আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন, অথবা বিজয়ের সম্মান।” [৪]

আল্লাহর ওপর ভরসার অবস্থা এমন ছিল যে আপনার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে বিষ আনা হলো। আপনি বিসমিল্লাহ পড়ে তা নির্ভয়ে পান করে নিলেন এবং আপনার সামান্যতম ক্ষতিও হলো না। তিনি এমন মকবুল দোয়া ছিলেন যে, একবার এক ব্যক্তি মদের মশক নিয়ে এল। আপনার মধুর প্রয়োজন ছিল, দোয়া করলেন আল্লাহ যেন একে মধু বানিয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই মদ মধুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। [৫]

সারা জীবন জিহাদে কাটিয়েছেন, এটাই ছিল তাঁর আত্মার খোরাক। একেই তিনি আখেরাতের পাথেয় এবং নিজের নাজাতের মাধ্যম মনে করতেন, বলতেন: “আল্লাহর তাওহিদের ইকরার করার পর আমার কাছে এর চেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক আমল আর কোনোটি নেই যে আমি একটি পুরো রাত এমনভাবে কাটিয়েছি যে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি মাথার ওপর ঢাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমরা ভোরের আবছা অন্ধকারের অপেক্ষা করছিলাম যাতে কাফেরদের ওপর আক্রমণ করতে পারি।” [৬]

তিনি ইলমের খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁর থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই আক্ষেপ ছিল যে, জিহাদি ব্যস্ততার কারণে ইলম শেখার বেশি সুযোগ পাননি। বলতেন: “জিহাদ আমাকে বেশি পড়াশোনা করা থেকে বিরত রেখেছে।” [৭]

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আশঙ্কায় যে মুসলমানদের ভরসা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের সেনাপতির ওপর না হয়ে যায়, তাঁকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন। [৮]

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৭২

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৭৮, ত. আর-রিসালাহ

[৩] মাজমাউয যাওয়াইদ লিল হাইসামি, হা: ১৫৮৮৫, এর বর্ণনাকারীগণ সহিহ-এর বর্ণনাকারী

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৭৫

[৫] আল-ইসাবাহ: ২/১৮/২ সহিহ সনদে

[৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৮১

[৭] মাজমাউয যাওয়াইদ লিল হাইসামি, হা: ১৫৮৮৬, এর বর্ণনাকারীগণ সহিহ-এর বর্ণনাকারী

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/১৩৫ ত. দারুল হিজর

## অংশ: প্রথম | তারিখ উম্মতে মুসলিমা

হযরত উমর (রা.) তাঁর যোগ্যতার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, তাই কিছুকাল পর তাঁকে আল-জাজিরার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এক বছর পর তিনি পদত্যাগ করে চলে আসেন। ২১ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাজার সিরিয়ার হিমস শহরে অবস্থিত। [১]

মৃত্যুর সময় পৃথিবীর এই সাহসী মানুষের চোখে অশ্রু ছিল। তিনি বলছিলেন:

“আমি মৃত্যুকে সেই সব জায়গায় খুঁজেছি যেখানে তা পাওয়া যেতে পারত। আমি এত যুদ্ধ করেছি যে শরীরের সামান্য জায়গাও এমন নেই যেখানে তলোয়ার, তীর বা বর্শার আঘাত নেই। কিন্তু আফসোস যে, তা সত্ত্বেও বিছানায় মারা যাচ্ছি।” [২]

তাঁর (রা.) জীবন ছিল সাদাসিধে ও মুজাহিদসুলভ। যা হাতে আসত তা আল্লাহর পথে মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। মৃত্যুর আগে নিজের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়াও আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ওয়াকফ করার অসিয়ত করে যান। [৩]

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পুরো মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত শোকের সাথে শোনা যায়। পুরুষ তো বটেই, এমনকি নারী ও দাসীরাও অশ্রুসিক্ত ছিল। মদিনা মুনাওয়ারার এক দাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কবিতাটি পড়ছিল:

أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ أَلْفٍ مِنَ الْ قَوْمِ إِذَا مَا كُبِتْ وُجُوهُ الرِّجَالِ

“হে খালিদ! যখন পুরুষদের চেহারার রঙ বদলে যেত, তখন আপনি একাই দশ লক্ষের চেয়ে বেশি কার্যকর প্রমাণিত হতেন।”

হযরত উমর (রা.) এই কবিতা শুনে বললেন: “একেবারে সত্য বলেছে, তিনি এমনই ছিলেন।” [৪]

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আরদাহ।

---

[১] মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৫২৮৬। একটি বর্ণনা এই যে, তাঁর মৃত্যু ২১ হিজরিতে মদিনায় হয়েছিল। (মুস্তাদরাক হাকিম, খণ্ড: ৫২৮৭) তবে হাফেজ যাহাবী (রহ.) হিমসে মৃত্যু এবং সেখানেই দাফনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যেখানে তাঁর মাজার মানুষের মিলনস্থল। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৮৩, ত: আর-রিসালাহ)

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৭৯, ত: আর-রিসালাহ

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৮১

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১/৩৮২

## মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

## প্রথম খণ্ড

### ইসলামের তরুণদের প্রতি সম্বোধন

প্রাচ্যের কবি ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল (মরহুম)

হে মুসলিম তরুণ! তুমি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ,
তুমি কোন আকাশের একটি খসে পড়া তারা?

তোমাকে সেই জাতি ভালোবাসার কোলে লালন-পালন করেছে,
যারা দারা (পারস্য সম্রাট)-এর রাজমুকুটকে পায়ের নিচে পিষ্ট করেছিল।

সভ্যতা সৃষ্টিকারী, বিশ্ব শাসনের বিধান প্রণেতা,
সেই আরবের মরুভূমি অর্থাৎ উট চালকদের দোলনা।

নিঃস্ব অবস্থায়ও সেই আল্লাহর বান্দারা এতই আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন যে,
ভিক্ষুকের ভয়ে দাতার দান করার সাহস হতো না।

সংক্ষেপে আমি তোমাকে কী বলব যে সেই মরুচারীরা কী ছিলেন?
বিশ্বজয়ী, বিশ্বশাসক, বিশ্বরক্ষক এবং বিশ্বশোভা।

তোমার পূর্বপুরুষদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক হতে পারে না,
কারণ তুমি কেবল কথার মানুষ আর তারা ছিলেন কর্মের মানুষ; তুমি স্থবির আর তারা ছিলেন গতিশীল।

পূর্বপুরুষদের থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি,
(যার ফলে) আকাশ আমাদের সুরাইয়া (নক্ষত্রপুঞ্জ) থেকে জমিনে আছড়ে ফেলেছে।

https://t.me/BoierSomahar

## আহলে নজর সাহাবী

শায়েরে ইসলাম জনাব আছর জৌনপুরী

আহলে হুনর সাহাবী, আহলে নজর সাহাবী
অন্ধকার রাতগুলোতে ভোরের নূর সাহাবী

শত্রুদের মোকাবিলায় বক্ষ-ঢাল সাহাবী
নিজেদের মধ্যে দয়ালু এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহাবী

যাঁর ছায়ায় এখনও ঈমানদাররা বসবাস করেন
সত্যের বাগানের এমন এক বৃক্ষ সাহাবী

তবেই তো আজ পর্যন্ত সুন্নাতের নূর জাগ্রত আছে
প্রদীপের মতো সারা জীবন জ্বলেছেন সাহাবী

হে বাতিলের কাফেলা, তুমি কেন পথ হারিয়েছ?
সত্যের আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ সাহাবী

https://t.me/BoierSomahar

# মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

## প্রথম অংশ

## গ্রন্থপঞ্জি

## প্রথম খণ্ড থেকে তৃতীয় খণ্ড

https://t.me/BoierSomahar

**বর্ণ: আলিফ**

ক্রমিক নং ..... কিতাবের নাম ..... লেখক

১. আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ ..... যাকারিয়া আল-কাযভিনী

২. আবজাদুল উলুম ..... সিদ্দিক হাসান খান কান্নৌজি

৩. আবুল হাসান আল-আশআরী ..... হাম্মাদ বিন মুহাম্মদ আল-আনসারী

৪. আবু বকর আস-সিদ্দিক ওয়া বানুহু ..... মাহমুদ আব্দুল ফাত্তাহ শরাফ উদ্দিন

৫. আবু হানিফা হায়াতুহু ওয়া আসরুহু ..... মুহাম্মদ আবু জাহরা

৬. ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারা বি-যাওয়ায়েদিল মাসানিদিল আশারা ..... শিহাবুদ্দিন বুসিরি আল-কিনানি

৭. ইতহাফুস সায়িল বিমা ফিত তাহাবিয়্যাহ মিন মাসায়িল - শারহুল আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ ..... সালিহ বিন আব্দুল আজিজ আল আশ-শাইখ

৮. ইতহাফুল মাহারা বিল ফাওয়াইদিল মুবতাকারা মিন আতরাফিল আশারা ..... ইবনে হাজার আসকালানী

৯. ইত্তিআযুল হুনাফা বি-আখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যিনাল খুলাফা ..... তাকিউদ্দিন আল-মাকরিজি

১০. ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যাহ ..... ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ

১১. আহসানুত তাকাসিম ফি মা'রিফাতিল আকালিম ..... আবু আব্দুল্লাহ আল-মাকদিসি আল-বাশারি

১২. আহসানুল ফাতাওয়া ..... মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী

১৩. আহকামুল কুরআন ..... আল-জাসসাস আর-রাজি

১৪. ইহয়াউ উলুমিদ্দিন ..... আবু হামিদ আল-গাজালি

১৫. আখবারু আবি হাফস উমর বিন আব্দুল আজিজ ..... আবু বকর মুহাম্মদ বিন আল-হুসাইন আল-আজুরি

১৬. আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি ..... আল-হুসাইন বিন আলী আস-সাইমারি

১৭. আখবারুল উলামা বি-আখবারিল হুকামা ..... আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ আল-কিফতি

১৮. আখবারুল মুসাব্বিহিন মিন তারিখ ইবনে আবি খাইসামা ..... আবু বকর ইবনে আবি খাইসামা

১৯. আখবারুল ওয়াফিদাত মিনান নিসা আলা মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান ..... আব্বাস বিন বাক্কার

২০. আখবারু বিন উবাইদ ওয়া সিরাতুহুম ..... মুহাম্মদ বিন আলী সাহবাঈ আল-কুম্মি

২১. আখবারুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ ..... লেখক: অজ্ঞাত, গবেষক: আব্দুল আজিজ আদ-দুরি

২২. আখবারুল কুদাত ..... আবু বকর ওয়াকি বাগদাদী

২৩. আখবারু মক্কা (তারিখ মক্কা) ..... আবু আব্দুল্লাহ আল-ফাকিহি

২৪. আখবারু মক্কা ওয়া মা জাআ ফিহা মিনাল আসার ..... আবুল ওয়ালিদ আল-আযরাকি

২৫. আখলাকে জালালী ..... জালালুদ্দিন দাওয়ানি

২৬. উর্দু দায়েরা মাআরিফ ইসলামিয়া ..... লেখক গোষ্ঠী

২৭. ইরশাদুস সারি লি-শারহি সহীহিল বুখারী ..... আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-কাসতালানি

https://t.me/BoierSomahar

মৃত্যু সালখণ্ডসমূহপ্রকাশকপ্রকাশকাল**{বর্ণ আলিফ}**৬৮২ হিজরী১দার সাদির, বৈরুতউল্লেখ নেই১৩০৭ হিজরী১দার ইবনে হাজম১৪২৩ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ১৩১৮ হিজরী১আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা১৩৯৩ হিজরী - ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দসমসাময়িক১মাকতাবাতুল আদাব, কায়রোউল্লেখ নেই১৩৯৪ হিজরী - ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ১দারুল ফিকর আল-আরাবি১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ৮২০ হিজরী৮দারুল ওয়াতান, রিয়াদ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দসমসাময়িক১মাকতাবা শামিলাউল্লেখ নেই৮৫২ হিজরী১৯মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা মুনাওয়ারা১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ৮৪৫ হিজরী৩লাজনাতু ইহয়ায়িত তুরাসিল ইসলামি, মিশরউল্লেখ নেই৭৫১ হিজরী১দারু আলমিল ফাওয়াইদ১৪২১ হিজরী৩৮০ হিজরী১দার সাদির, বৈরুত১৪১১ হিজরী - ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ১৩২২ হিজরী১০এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচি১৩৪৫ হিজরী৭৬০ হিজরী৩দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ৫০৫ হিজরী৪দারুল মারিফাহ, বৈরুতউল্লেখ নেই৩৬০ হিজরী১মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত১৪০০ হিজরী - ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ৩৩২ হিজরী১আলমুল কুতুব, বৈরুত১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ৬৩৬ হিজরী১দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ৭৬৯ হিজরী১দারুল ওয়াতান১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ২২২ হিজরী১মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ৫২৮ হিজরী১দারুস সাহওয়াহ, কায়রোউল্লেখ নেইতৃতীয় হিজরী শতাব্দী১দারুত তালিআহ, বৈরুতউল্লেখ নেই৩০২ হিজরী৩আলমুল কুতুব, বৈরুত১৩৬৭ হিজরী - ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ৬৭২ হিজরী৫দারুল খুদর, বৈরুত১৪১৩ হিজরী২৫০ হিজরী২দারুল আন্দালুস লিন নাশর, বৈরুতউল্লেখ নেই৯০৮ হিজরী১শেখ মুবারক আলী তাজের কুতুব, লাহোর১৩০২ হিজরীউল্লেখ নেই২৪দানিশ গাহ, পাঞ্জাব১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ৯৩৭ হিজরী১০আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ, মিশর১৩২৩ হিজরী

**প্রথম খণ্ড**

ক্রমিক নং ..... গ্রন্থের নাম ..... লেখক

২৮. ইরশাদুল কাসি ওয়াদ দানি ইলা তারাজিমি শুয়ুখিত তাবারানি ..... আবুল হাইব নায়েফ বিন সালাহ আল-মানসুরি

২৯. আসাদুল গাবাহ ..... ইবনুল আসির আল-জাযারি

৩০. আসমাউল মুদাল্লিসিন ..... জালালুদ্দিন সুয়ুতি

৩১. উসুলুস সুন্নাহ (নিসবা) ..... ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

৩২. উসুলু মাজহাবিদ শিয়াতিল ইমামিয়া আল-ইসনা আশারিয়া আরদুন ওয়া নাকদুন ..... ডক্টর নাসির বিন আব্দুল্লাহ আল-কুফারি

৩৩. আদওয়া আলাল হিন্দ (তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ) ..... আব্দুশ শাকুর আস-সামারি

৩৪. ইতিকাদু আহলিস সুন্নাহ (শারহু উসুলিল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ) ..... হিবাতুল্লাহ বিন হাসান আবু কাসিম আত-তাবারী আর-রাজি আল-লালাকায়ি

৩৫. ইতিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমিন ওয়াল মুশরিকিন ..... ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি

৩৬. ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন ..... ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ

৩৭. আকাবিলুশ শাতাত ফি তাওয়িলিল আসমায়ি ওয়াস সিফাত ..... মারয়ি বিন ইউসুফ আল-মাকদিসি আল-হাম্বলি

৩৮. ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৩৯. ইকমালুল মুয়াল্লিম বি ফাওয়াইদি মুসলিম (শারহু সহিহ মুসলিম) ..... কাযি আইয়াজ ইয়াহসুবি আস-সাবতি

৪০. ইকমালু তাহজিবিল কামাল ..... আলাউদ্দিন মুগলাতাই

৪১. আল-আহাদু ওয়াল মাসানি ..... আবু বকর ইবনে আবি আসিম আশ-শাইবানি

৪২. আল-ইবানাহ আন শরিয়াতিল ফিরকাতিন নাজিয়াহ ..... ইবনে বাত্তাহ আল-উকবারি

৪৩. আল-ইহতিজাজ (ইহতিজাজে তাবারাসি) ..... আবু মনসুর আত-তাবারাসি

৪৪. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ..... আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি

৪৫. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ..... আবু ইয়ালা আল-ফাররা

৪৬. আল-আখবারুত তিওয়াল ..... আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি

৪৭. আল-ইখতিয়ারু লি-তালিলিল মুখতার ..... আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদ আল-মাওসিলি, আবুল ফজল আল-হানাফি

৪৮. আল-আজনাবিয়্যাহ ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৪৯. আল-আদাবুল মুফরাদ ..... ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি

৫০. আল-ইরশাদ ফি মারিফাতি উলামাইল হাদিস ..... আবু ইয়ালা খলিলি আল-কাযওয়িনি

৫১. আল-ইসতিকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা ..... শিহাবুদ্দিন আদ-দুরয়ি আস-সালাউয়ি

৫২. আল-ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব ..... ইবনে আব্দুল বার আল-কুরতুবি

৫৩. আল-আসরারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওদুআহ ..... মোল্লা আলি কারি

৫৪. আল-আশরাফ ফি মানাযিলিল আশরাফ ..... ইবনুল আবিদ দুনিয়া

৫৫. আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ ..... ইবনে হাজার আল-আসকালানি

মৃত্যুর বছরখণ্ডসমূহপ্রকাশকপ্রকাশের বছরসমসাময়িক১দার আল-কিয়ান, রিয়াদউল্লেখ নেই২৩০ হিজরি৮দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ৯১১ হিজরি১দার আল-জিলউল্লেখ নেই২৩১ হিজরি১দার আল-মানার, সৌদি আরব১৪১১ হিজরিসমসাময়িক৩দার আল-ফিকর১৪১৩ হিজরি১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ১দার আল-আহদ আল-জাদিদ, মিশর১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ৩১৮ হিজরি৪দার তাইয়্যেবা, রিয়াদ১৪০২ হিজরি৬০৬ হিজরি১দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুতউল্লেখ নেই৭৫১ হিজরি৪দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ১০৩৩ হিজরি১মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত১৪০৬ হিজরি৭৪৮ হিজরি২দার আলম আল-কুতুব, বৈরুত১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ৫৩২ হিজরি৮দার আল-ওয়াফা, মিশর১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ৭৬২ হিজরি১২আল-ফারুক আল-হাদিসিয়্যাহ১৪২২ হিজরি - ২০০১ খ্রিস্টাব্দ২৮৭ হিজরি৬দার আর-রায়াহ, রিয়াদ১৪১১ হিজরি - ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ৪৮৭ হিজরি৩দার আর-রায়াহ লিন-নাশর, সৌদি আরব১৪১৮ হিজরিপঞ্চম হিজরি শতাব্দী২মাতাবিউন নুমান আন-নাজাফ আল-আশরাফ১৩৮৬ হিজরি - ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ৪৫০ হিজরি১দার আল-হাদিস, কায়রোউল্লেখ নেই৪৫৮ হিজরি১দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ১৪২১ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ৩৮২ হিজরি১দার ইহয়া আল-কুতুব আল-আরাবি১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ৬৮৩ হিজরি৫মাতবা হালাবি, কায়রো১৩৫৬ হিজরি - ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ৭২৮ হিজরি১দার আল-খরাজ, জেদ্দা১৪২০ হিজরি - ২০০০ খ্রিস্টাব্দ২৫৬ হিজরি১দার আল-বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত১৪০৯ হিজরি - ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ৪৩৬ হিজরি৩মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ১৪০৯ হিজরি১৩১৫ হিজরি৩দার আল-কিতাবউল্লেখ নেই৪৬৩ হিজরি১০দার আল-জিল, বৈরুত১৪১২ হিজরি - ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ১০১২ হিজরি১মুয়াসসাসাতুর রিসালাহউল্লেখ নেই২৮১ হিজরি১মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ১৪১১ হিজরি - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ৮৫২ হিজরি৮দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ১৪১৫ হিজরি

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-এ উম্মত-এ মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

৫৬ ..... আল-আসনাম ..... হিশাম বিন মুহাম্মদ আল-কালবি

৫৭ ..... আল-আদদাদ ..... আবু বকর ইবনুল আনবারি

৫৮ ..... আল-ইতিসাম ..... ইব্রাহিম বিন মুসা আল-শাতিবি

৫৯ ..... আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদিস ..... আবু বকর বায়হাকি

৬০ ..... আল-ইতিকাদ ফি মা ইতিকাদ - শারহুল উমদাহ ফি আকিদাহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ..... আবুল বারাকাত আন-নাসাফি

৬১ ..... আল-আলাকুল খাতিরা ফি যিকর উমারাউশ শাম ওয়াল জাজিরা ..... ইবনে শাদ্দাদ আল-হালাবি

৬২ ..... আল-আলাম ..... খায়রুদ্দিন আয-যিরিকলি

৬৩ ..... আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মাত তারিখ ..... শামসুদ্দিন আস-সাখাভি

৬৪ ..... আল-আগানি ..... আবুল ফারাজ ইসফাহানি

৬৫ ..... আল-ইকতিফা বিমা তাদাম্মানাহু মিন মাগাযি রাসুলুল্লাহ ﷺ ওয়াছ ছালাছাতিল খুলাফা ..... আবুল রাবি আল-কালাই

৬৬ ..... আল-ইকমাল ফি যিকর মান লাহু রিওয়ায়াহ ফি মুসনাদিল ইমাম আহমাদ সিওয়া মান যুকিরা ফি তাহযিবিল কামাল ..... শামসুদ্দিন আল-হুসাইনি আশ-শাফিঈ আদ-দিমাশকি

৬৭ ..... আল-উম্ম (কিতাবুল উম্ম) ..... মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফিঈ

৬৮ ..... আল-ইমাম আশ-শাফিঈ ..... মুহাম্মদ আবু জাহরা

৬৯ ..... আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ ..... ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি

৭০ ..... আল-আমওয়াল ..... ইবনে জানজুওয়াইহ

৭১ ..... আল-ইনতিসার লিস-সাহবি ওয়াল আলি মিন ইফতিরাআতিল সামাভি আদ-দাল ..... ইব্রাহিম বিন আমির আল-রুহাইলি

৭২ ..... আল-ইনতিকা ফি ফাদাইলিল ছালাছাতিল আইম্মাতিল ফুকাহা ..... ইবনে আব্দুল বার আল-মালিকি

৭৩ ..... আল-আনসাব ..... আব্দুল কারিম বিন মুহাম্মদ আস-সামআনি

৭৪ ..... আল-ইনসাফ ফিমা ইয়াজিবু ইতিকাদাহু ওয়ালা ইয়াজুযুল জাহলু বিহি ..... আবু বকর ইবনুল বাকিল্লানি

৭৫ ..... আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ লিমা ফি কিতাব “আদওয়া আলাস সুন্নাহ” মিনায যালাল ওয়াত তাদলিল ওয়াল মুজাযাফাহ ..... আব্দুর রহমান বিন ইয়াহইয়া আল-ইয়ামানি

৭৬ ..... আল-আওয়াইল ..... আবু হিলাল আল-আসকারি

৭৭ ..... আমালিল কালি ..... আবু আলি আল-কালি

৭৮ ..... ইমাম আবু হানিফা কি তাদউইন-এ কানুন-এ ইসলামি ..... ডক্টর হামিদউল্লাহ

৭৯ ..... ইমতাউল আসমা ..... তাকিউদ্দিন মাকরিজি

৮০ ..... ইমদাদুল ফাতাওয়া ..... মাওলানা আশরাফ আলী থানভী

৮১ ..... আনসাবুল আশরাফ ..... আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাযুরি

৮২ ..... ইনসানি দুনিয়া পার মুসালমানো কে উরুজ-ও-যাওয়াল কা আসার ..... মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

৮৩ ..... আনওয়ারুন নুজুম (মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী-এর মাকতুবাত-এ কাসেমির উর্দু অনুবাদ) ..... মাওলানা আনওয়ারুল হাসান শিরকোটি

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (প্রথম অংশ)

ওফাতের সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

৪৩ হিজরী ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৩২৮ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৭৯০ হিজরী ১ দারু ইবনে আফফান, সৌদি আরব ১৪১২ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫৮ হিজরী ১ দারুল আফাক, বৈরুত ১৪০১ হিজরী

৭১০ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যাহ ফি তুরাসিল মিশর ১৩৩৪ হিজরী - ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

৬৮৩ হিজরী ৩ মানশুরাত ওয়াজারাতিস সাকাফাহ, সিরিয়া ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৬২ হিজরী ৮ দারুল ইলম লিল-মালাঈন ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৯০২ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩৫৬ হিজরী ২৪ দারুল ফিকর, বৈরুত উল্লেখ নেই

৬৩৩ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৩২০ হিজরী

৬১৫ হিজরী ১ জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, করাচি উল্লেখ নেই

৪৬৪ হিজরী ৮ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৫২ হিজরী - ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ ১ দারুল ফিকরিল আরাবি ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

৫৬০ হিজরী ১ মাকতাবাতুল আনজিল, মিশর ১৩২২ হিজরী - ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৫১ হিজরী ১ মার্কাজুল মালিক ফয়সাল, সৌদি আরব ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৩ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৫৬২ হিজরী ১৩ দাইরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, দাক্ষিণাত্য ১৩৮২ হিজরী - ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ

৫০৩ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যাহ উল্লেখ নেই

১৩৮৬ হিজরী ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

৩৯৫ হিজরী ১ দারুল বাশির ১৪০৮ হিজরী

৩৯১ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল আসরিয়্যাহ ১৩৩৩ হিজরী - ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ

২০০২ খ্রিষ্টাব্দ ১ উর্দু একাডেমি, সিন্ধু ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮৪৫ হিজরী ১৫ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৩৩ হিজরী - ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ ৬ মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচি ১৪৩১ হিজরী - ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

৪৭৯ হিজরী ১৩ দারুল ফিকর, দামেস্ক ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ১ মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম করাচি উল্লেখ নেই

১৩৯৬ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

কুরআন লিমিটেড, লাহোর উল্লেখ নেই

**তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)**

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত (সৈয়দ সুলাইমান নদভী) ..... ৮৪
আওজাযুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা ইমাম মালিক (শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী) ..... ৮৫
ঈসারুল হক আলাল খালক (ইযযুদ্দীন আল-ইয়ামানী) ..... ৮৬
ঈযাহুল আদিল্লাহ ফী কাতয়ি হুজাজিল মুয়াত্তিল (বদরুদ্দীন আল-কিনানী আল-হামাবী আশ-শাফেয়ী) ..... ৮৭
ঈযাহু শাওয়াহিদুল ঈযাহ (আবুল কাসিম আল-কাইসী) ..... ৮৮

**হরফ-এ-বা**

আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযুদ দাকায়েক (ইবনে নুজাইম আল-মিসরী) ..... ৮৯
আল-বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর (আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী) ..... ৯০
আল-বাদউ ওয়াত তারিখ (আল-মুতাহার বিন তাহির আল-মাকদিসী) ..... ৯১
আল-বুলদান (কিতাবুল বুলদান) (আহমদ বিন ইসহাক ইয়াকুবী) ..... ৯২
আল-বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ (বদরুদ্দীন আইনী) ..... ৯৩
আল-বায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব (ইবনে আযারী আল-মাররাকুশী) ..... ৯৪
আল-বায়ান ফী মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফেয়ী (ইয়াহইয়া আল-ইমরানী আল-ইয়ামানী) ..... ৯৫
বুহুস ফী তারিখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ (আকরাম যিয়া আল-উমরী) ..... ৯৬
বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে (আলাউদ্দীন আবু বকর আল-কাসানি) ..... ৯৭
বাযলুল মাজহুদ ফী হাল্লি আবি দাউদ (মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী) ..... ৯৮
বুগইয়াতুত তালাব ফী তারিখি হালাব (কামালুদ্দীন ইবনুল আদীয়ম) ..... ৯৯

**হরফ-এ-তা**

আল-আজউয়িবাতুল ফাযিলাহ লিল আসইলাতিল আশারাতিল কামিলাহ (মাআ তালীকাত শায়খ আবদিল ফাত্তাহ) (মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী) ..... ১০০
তারিখুল ইসলামি (ডক্টর মাহমুদ শাকের) ..... ১০১
তুহফাতুত তাহসীল ফী যিকরি রুওয়াতিল মারাসীল (আবু যুরআ আল-ইরাকী) ..... ১০২
তানভীরুল ঈমান উর্দু তরজমা তাতহীরুল জানান (মূল লেখক: ইবনে হাজার হাইতামী, অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল শাকুর) ..... ১০৩
তারিখুল ইসলামিল আম (আলী ইব্রাহিম হাসান) ..... ১০৪
তারিখুল আন্দালুস মিনাল ফাতহিল ইসলামি হাত্তা সুকুতি গারনাতা (ডক্টর আবদুর রহমান আলী আল-হাজ্জী) ..... ১০৫
আত-তারিখুল আওসাত (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী) ..... ১০৬
আত-তারিখুল কাবীর (মাআ হাওয়াশি মাহমুদ খলীল) (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী) ..... ১০৭
আত-তারিখুল কাবীর লি ইবনি আবি খাইসামা আস-সাফারুস সালিস (আবু বকর আহমদ ইবনে আবি খাইসামা) ..... ১০৮
আত-তারিখুল কাবীর লি ইবনি আবি খাইসামা আস-সাফারুস সানি (আবু বকর আহমদ ইবনে আবি খাইসামা) ..... ১০৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা - প্রথম খণ্ড

মৃত্যুর সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

৭৩ হিজরি ১ মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, করাচি ১৯৯৭ খ্রি.

১৩০২ হিজরি ১৭ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪২৩ হিজরি - ২০০৩ খ্রি.

৮৩০ হিজরি ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৯৮৭ খ্রি.

৭৩৩ হিজরি ১ দারুস সালাম লিত-তিবাআহ ওয়ান-নাশর, মিশর ১৪১০ হিজরি - ১৯৯০ খ্রি.

৬০০ হিজরির পূর্বে ১ দারুল গারব আল-ইসলামি ১৪০৮ হিজরি - ১৯৮৭ খ্রি.

**বর্ণ 'বা'**

৯৭০ হিজরি ৮ দারুল কিতাব আল-ইসলামি উল্লেখ নেই

৭৪৫ হিজরি ১০ দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২০ হিজরি

৩৫৫ হিজরি ৬ মাকতাবাতুস সাকাফাহ আদ-দ্বীনিইয়াহ, মিশর উল্লেখ নেই

২৯২ হিজরি ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২২ হিজরি

৮৫৫ হিজরি ১৩ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২০ হিজরি - ২০০০ খ্রি.

৬৯৬ হিজরি ২ দারুস সাকাফাহ, বৈরুত ১৯৮৩ খ্রি.

৫৫৮ হিজরি ১৩ দারুল মিনহাজ, জেদ্দা ১৪২১ হিজরি - ২০০০ খ্রি.

সমসাময়িক ১ বিসাত, বৈরুত ১৯৭২ খ্রি.

৫৮৭ হিজরি ৷ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪০৭ হিজরি - ১৯৮৬ খ্রি.

১৩৪৬ হিজরি ২০ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৬৬০ হিজরি ১২ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

**বর্ণ 'তা'**

•

১ হালাব উল্লেখ নেই

২০১৪ খ্রি. ২২ আল-মাকতাব আল-ইসলামি, বৈরুত ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৫ খ্রি.

৮২৬ হিজরি

•

মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৫৯৪ হিজরি ১ আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, লাহোর উল্লেখ নেই

বিংশ শতাব্দী

•

মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ ১৯২৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪০২ হিজরি - ১৯৮২ খ্রি.

২৫৬ হিজরি ২ দারুন নববী, দারুত তুরাস, হালাব, কায়রো ১৩৯৭ হিজরি - ১৯৭৭ খ্রি.

২৫৬ হিজরি ৮ মাতবাআহ উসমানিয়াহ, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য উল্লেখ নেই

২৭৯ হিজরি ৩ আল-ফারুক আল-হাদিসাহ, কায়রো ১৪২৭ হিজরি - ২০০৬ খ্রি.

২৭৯ হিজরি ২ আল-ফারুক আল-হাদিসাহ, কায়রো ১৪২৭ হিজরি - ২০০৬ খ্রি.

প্রথম অংশ

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

১১০. আত-তাবসির ফি আদ-দিন ওয়া তাময়িজ আল-ফিরক আন-নাজিয়াহ আন আল-ফিরক আল-হালিকিন ..... তাহির বিন মুহাম্মদ আল-ইসফারাইনি

১১১. আত-তাহরির ওয়া আত-তানভির ..... শেখ মুহাম্মদ বিন তাহির বিন আশুর

১১২. আত-তুহফাত আল-কুদসিয়্যাহ ফি মুখতাসার তারিখ আন-নাসরানিয়্যাহ ..... আবু মুহাম্মদ আসিম আল-মাকদিসি

১১৩. আত-তাযকিরাত আল-হামদুনিয়্যাহ ..... ইবনে حمدون বাহাউদ্দিন আল-বাগদাদি

১১৪. আত-তারগিব ওয়া আত-তারহিব ..... আবদুল আজিম আল-মুনযিরি

১১৫. আত-তাশরি আল-জিনাই আল-ইসলামি মুকারানান বিল কানুন আল-ওয়াদয়ি ..... আবদুল কাদির আওদাহ

১১৬. আত-তাদিল ওয়া আত-তাজরিহ লিমান খারাজা লাহু আল-বুখারি ফিল জামি আস-সহিহ ..... আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি

১১৭. আত-তাফসির আল-ওয়াসিত ..... ওয়াহবাহ আয-জুহাইলি

১১৮. আত-তাকরিব ওয়া আত-তায়সির ..... ইয়াহইয়া বিন শরাফ নববী

১১৯. আত-তাকরির ওয়া আত-তাহবির আলা তাহরির আল-কামাল ইবনুল হুমাম ..... ইবনে আমির হাজ ইবনুল মুওয়াক্কিত আল-হানাফি

১২০. আত-তাকয়িদ ওয়া আল-ইদাহ শারহ মুকাদ্দিমাহ ইবনে সালাহ ..... জয়নুদ্দিন আল-ইরাকি

১২১. আত-তাকমিল ফিল জারহ ওয়া আত-তাদিল ওয়া মা'রিফাত আস-সিকাত ওয়া আদ-দুয়াফা ওয়া আল-মাজাহিল ..... ইবনে কাসির দিমাস্কি

১২২. আত-তালখিস আল-হাবির ফি তাখরিজ আহাদিস আর-রাফেয়ি আল-কাবির ..... ইবনে হাজার আল-আসকালানি

১২৩. আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিন আল-মাআনি ওয়া আল-আসানিদ ..... ইবনে আবদিল বার আল-কুরতুবি

১২৪. আত-তানবিহ ওয়া আল-ইশরাফ ..... আবুল হাসান আলী আল-মাসউদি

১২৫. আত-তানবিহ ওয়া আর-রাদ্দ আলা আহলিল আহওয়া ওয়া আল-বিদা ..... আবু আল-হুসাইন আল-মালাতি আল-আসকালানি

১২৬. তাজ আল-আরুস মিন জাওয়াহির আল-কামুস ..... মুরতাজা আয-জাবিদি

১২৭. তারিখ-ই-ইসলাম ..... শাহ মঈনুদ্দিন নদভী

১২৮. তারিখ দিমাস্ক (৮০ খণ্ড, ২০ সূচি) ..... হাফিজ ইবনে আসাকির

১২৯. তারিখ-ই-সিন্ধ ..... আবদুল হালিম শারার

১৩০. তারিখ-ই-সিন্ধ (গবেষণা: ডক্টর উমর বিন মুহাম্মদ দাউদপোতা) ..... মীর মাসুম শাহ ভাক্কারি

১৩১. তারিখ ইবনে খালদুন ওয়া মুকাদ্দিমাহ ..... আবদুর রহমান ইবনে খালদুন

১৩২. তারিখ ইবনে মঈন (রিওয়ায়াত আদ-দুরি) ..... ইয়াহইয়া বিন মঈন

১৩৩. তারিখ ইবনে ইউনুস আল-মিসরি ..... আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস আল-মিসরি

১৩৪. তারিখ আবি যুরআহ আদ-দিমাস্কি ..... আবু যুরআহ আদ-দিমাস্কি

১৩৫. তারিখ-ই-ইসলাম ..... আকবর শাহ নজিবাবাদি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — প্রথম খণ্ড

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

৫৭১ হিজরী ১ আলম আল-কুতুব, লেবানন ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ৩০ তিউনিস ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামেলা উল্লেখ নেই

৫৬২ হিজরী ৩০ দার সাদির, বৈরুত ১৩৯৭ হিজরী

৬৫৬ হিজরী ৪ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হিজরী

৪৭৩ হিজরী ২ দার আল-কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত উল্লেখ নেই

৪৭৩ হিজরী ৩ দার আল-লিওয়া, রিয়াদ ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

১ দার আল-ফিকর ১৩২২ হিজরী

৬৭৬ হিজরী ১ দার আল-কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৮৭৯ হিজরী ৩ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮০৬ হিজরী ১ মাকতাবা আস-সালাফিয়্যাহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৩৮৯ হিজরী - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৭ হিজরী ৪ মারকাজুন নুমান, ইয়েমেন ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫২ হিজরী ৪ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৩ হিজরী ২৪ উইজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউন আল-ইসলামিয়্যাহ, আল-মাগরিব ১৩৮৭ হিজরী

৩২৬ হিজরী ১ দার আল-সাদি, কায়রো

৭৩ হিজরী ১ আল-মাকতাবা আল-আযহারিয়্যাহ, মিশর উল্লেখ নেই

১২০৫ হিজরী ৪০ দার আল-হিদায়াহ উল্লেখ নেই

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ ২ দার আল-ইশাআত উল্লেখ নেই

৫৭১ হিজরী ৮০ দার আল-ফিকর ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ ১ দিল গুদাজ প্রেস, লখনউ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩২ হিজরী ১ মারকাজ তাহকিকাত, ইসফাহান উল্লেখ নেই

৮০৮ হিজরী ৮ দার আল-ফিকর, বৈরুত ১৪০৮ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

২৩৩ হিজরী ৪ মারকাজ আল-বাহস আল-ইলমি, মক্কা আল-মুকাররামা ১৩৯৯ হিজরী - ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩৮ হিজরী ২ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২১ হিজরী

২৮১ হিজরী ১ মাজমা আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, দামেস্ক উল্লেখ নেই

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী ৩ নাফিস একাডেমি, করাচি ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

১৩৬ ..... তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম (তাহকীক বাশার) - অধিকাংশ স্থানে তারিখুল ইসলাম তাদমুরি সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু স্থানে বাশার সংস্করণও ব্যবহার করা হয়েছে। “ত তাদমুরি” প্রথমটির এবং “ত বাশার” দ্বিতীয়টির সংকেত। ..... শামস উদ্দিন আয-যাহাবি

১৩৭ ..... তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম (তাহকীক তাদমুরি) ..... শামস উদ্দিন আয-যাহাবি

১৩৮ ..... তারিখুল খুলাফা ..... জালাল উদ্দিন সুয়ুতি

১৩৯ ..... তারিখুল খামিস ফি আহওয়ালি আনফাসি নাফিস ..... হুসাইন বিন মুহাম্মদ আদ-দিয়ার বাকরি

১৪০ ..... তারিখুত তাবারী (তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক) ..... ইবনে জারির আত-তাবারী

১৪১ ..... তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস ..... ডক্টর খলিল ইব্রাহিম আস-সামাররাই

১৪২ ..... তারিখুল ফিকর আদ-দ্বীনি আল-জাহিলি ..... মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-ফায়ুমি

১৪৩ ..... তারিখুল মদিনা ..... উমর বিন শাব্বাহ

১৪৪ ..... তারিখ-ই-আন্দালুস ..... মাওলানা রিয়াসাত আলী নদভী

১৪৫ ..... তারিখ-ই-বাররে সাগির ..... প্রফেসর এম. এ. জামিল

১৪৬ ..... তারিখ-ই-বাগদাদ, দাজিউলা ..... খতিব আবু বকর আল-বাগদাদী

১৪৭ ..... তারিখ-ই-দাওয়াত ওয়া আজিমত ..... সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

১৪৮ ..... তারিখ-ই-দামেস্ক ..... ইবনুল কালানিসি, হামজা বিন আসাদ

১৪৯ ..... তারিখু ফালাসিফাতিল ইসলাম ..... মুহাম্মদ লুতফি জুমআ

১৫০ ..... তারিখু মক্কাতুল মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদুল হারাম ওয়াল মদিনাতুশ শরিফাহ ওয়াল কবরুশ শরিফ ..... ইবনে জিয়া আল-মাক্কি আল-হানাফি

১৫১ ..... তারিখ-ই-হিন্দ ..... ডক্টর মাকসুদ চৌধুরী

১৫২ ..... তারিখু ইয়াকুবি ..... আহমদ বিন ইসহাক ইয়াকুবি

১৫৩ ..... তালিফাতে রাশিদিয়া ..... মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহি

১৫৪ ..... তাবয়ীদুস সাহিফা বি মানাকিবি আবি হানিফা ..... জালাল উদ্দিন আস-সুয়ুতি

১৫৫ ..... তাতাম্মাতু সাওয়ানিল হিকমাহ ..... ইবনে ফান্দাক

১৫৬ ..... তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম ..... ইবনে মিসকাওয়াইহ

১৫৭ ..... তাহরিরু উলুমিল হাদিস ..... আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুদি

১৫৮ ..... তুহফাতুল ফুকাহা ..... আবু বকর আলাউদ্দিন আস-সামারকান্দি

১৫৯ ..... তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া (উর্দু) ..... শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী, অনুবাদ: মাওলানা খলিলুর রহমান নোমানী মাজাহেরি

**তারীখে উম্মতে মুসলিমা**

**প্রথম খণ্ড**

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৭৩৮ হি. ১৫ দারুল গারব আল-ইসলামী ২০০৩ খ্রি.

৭৩৮ হি. ৫২ দারুল কুতুব আল-আরাবি, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৯১১ হি. ১ মাকতাবাতু নিযার ১৪২৫ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৯৬৬ হি. ২ দারু সাদির উল্লেখ নেই

৩১০ হি. ১১ দারুল মাআরিফ মিসর ও দারুত তুরাস বৈরুত ১৩৮৭ হি.

সমসাময়িক ১ দারুল কুতুব আল-জাদিদাহ, বৈরুত ২০০০ খ্রি.

১৩২৭ হি. ১ দারু ফিকর আল-আরাবি ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.

২৬২ হি. ৪ সাইয়্যেদ হাবিব জেদ্দা ১৩৯৯ হি.

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী ১ মাক্কী দারুল কুতুব, লাহোর ২০০৩ খ্রি.

৭৯৭ হি. ১০ জামিল পাবলিশার্স, করাচি ১৯৮৬ খ্রি.

৬৩ হি. ২৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হি.

১২১৯ হি. ৮ মজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচি উল্লেখ নেই

৫৫৫ হি. ১ দারুল ইহসান, দামেস্ক ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

বিংশ শতাব্দী ঈসায়ী ১ মুয়াসসাসাতু হিন্দাউয়ি, মিসর ২০১২ খ্রি.

৮৫৩ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৯৮৬ খ্রি. ১ মাকসুদ এন্ড সন্স, করাচি ১৯৮৫

৩৯২ হি. ১ মাকতাবাতু শামিলা

•

১৩২৩ হি. ১ ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৯১১ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

৫৬৫ হি. ১ মাকতাবাতু শামিলা

•

৩২১ হি. ৭ সরুশ, তেহরান ২০০০ খ্রি.

•

২ মুয়াসসাসাতুর রায়্যান, বৈরুত ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৫২০ হি. ৩ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

•

১ আলমি মজলিসে তাহাফফুজে ইসলাম, পাকিস্তান উল্লেখ নেই

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

বইয়ের নাম (লেখক) ..... ক্রমিক নং

আল-তাহকীক আল-মুনিফ আর-রুতবা লিমান সাবাতা লাহু শারাফ আস-সুহবা (সালাহউদ্দীন আলাই আদ-দিমাশকী) ..... ১৬০

তাদরীব আর-রাবী ফী শারহি তাকরীব আন-নাওয়াবী (জালালউদ্দীন সুয়ূতী) ..... ১৬১

তাযকিরাত আল-হুফফাজ (তাবাকাত আল-হুফফাজ) (হাফিজ যাহাবী) ..... ১৬২

তারতীব আল-মাদারিক ওয়া তাকরীব আল-মাসালিক (কাজী আইয়াজ বিন মুসা আল-মালিকী) ..... ১৬৩

তরজুমানুল কুরআন (মাওলানা আবুল কালাম আজাদ) ..... ১৬৪

তাতহীর আল-ইতিকাদ (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আস-সানআনী আমীর ইয়ামানী মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী) ..... ১৬৫

তাজীল আল-মানফায়াহ বি-যাওয়াইদ রিজাল আল-আইম্মাহ আল-আরবাআহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী) ..... ১৬৬

তাজীম কাদর আস-সালাত (মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী) ..... ১৬৭

তাফসীর ইবনে আবী হাতিম (ইবনে আবী হাতিম আর-রাযী) ..... ১৬৮

তাফসীর ইবনে কাসীর (হাফিজ ইবনে কাসীর দিমাশকী) ..... ১৬৯

তাফসীর আল-আলূসী (তাফসীর রূহুল মাআনী) (শিহাবউদ্দীন মাহমুদ আলূসী) ..... ১৭০

তাফসীর আর-রাযী (মাফাতিহুল গায়েব) (امام ফখরউদ্দীন আর-রাযী) ..... ১৭১

তাফসীর আত-তাবারী (জামি আল-বায়ান) (ইবনে জারীর আত-তাবারী) ..... ১৭২

তাফসীর আল-কুরতুবী (আল-জামি লি-আহকাম আল-কুরআন) (শামসউদ্দীন আল-আনসারী আল-কুরতুবী) ..... ১৭৩

তাফসীর সালাবী (আবু ইসহাক আস-সালাবী) ..... ১৭৪

তাফসীর আবদুর রাজ্জাক (আবদুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম আস-সানআনী) ..... ১৭৫

তাফহীমুল বুখারী (মাওলানা যুহুরুল বারী আল-আযমী) ..... ১৭৬

তাকরীব আত-তাহযীব (ইবনে হাজার আসকালানী) ..... ১৭৭

তাকরীর বুখারী শরীফ (শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজির মাদানী) ..... ১৭৮

তাকভীম আহদে নববী (আলী মুহাম্মদ খান) ..... ১৭৯

তাকভীম তারীখী (মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী) ..... ১৮০

তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম (মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী) ..... ১৮১

তালখীস আল-মুতাশাবিহ ফী আর-রাসম (খতীব আবু বকর আল-বাগদাদী) ..... ১৮২

তালখীস কিতাব আল-ইস্তিগাসা (আল-ইস্তিগাসা, আর-রাদ্দ আলাল বাকরী লি-ইবনে তাইমিয়া) (হাফিজ ইবনে কাসীর আদ-দিমাশকী) ..... ১৮৩

তালকীহ ফুহুম আল-আসার ফী উয়ূন আত-তারীখ ওয়াস সিয়ার (আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী) ..... ১৮৪

তামহীদ আল-আওয়াইল ওয়া তালখীস আদ-দালাইল (আবু বকর বাকিল্লানী) ..... ১৮৫

তাহযীব আল-আসার (ইবনে জারীর আত-তাবারী) ..... ১৮৬

তাহযীব আল-আসমা ওয়াল লুগাত (মুহিউদ্দীন শারাফ আন-নাওয়াবী) ..... ১৮৭

https://t.me/BoierSomahar

**মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস**

**প্রথম খণ্ড**

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৭৬ হিজরী

•

দারুল আসিমা, রিয়াদ ১৪১০ হিজরী

৯১১ হিজরী ২ দারুত তিব উল্লেখ নেই

৭৪৮ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩৩ হিজরী ৮ মাতবাআতু ফাদালা, মরক্কো ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ৩ ইসলামী একাডেমি, লাহোর উল্লেখ নেই

১১৮২ হিজরী - ১২৫০ হিজরী ১ মাতবাআতু সাফির, রিয়াদ ১৪২৩ হিজরী

৮৫২ হিজরী ২ দারুল বাশাইর, বৈরুত ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

২৯২ হিজরী ২ মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৬ হিজরী

৩৩৭ হিজরী ৩ মাকতাবাতু নিযার, সৌদি আরব ১৪১৯ হিজরী

৭৭১ হিজরী ৯ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৫ হিজরী

১২৭০ হিজরী ১৬ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৬০৬ হিজরী ৩২ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২০ হিজরী

৩১০ হিজরী ২৪ দারু হাজার ১৪২২ হিজরী

৫৬১ হিজরী ১০ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৩৮৩ হিজরী - ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪২৭ হিজরী ১০ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি ১৪২২ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৪১১ হিজরী ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৯ হিজরী

সমসাময়িক ৩ দারুন নাশর, করাচি উল্লেখ নেই

৮৫২ হিজরী ১ দারুর রশিদ, সিরিয়া ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

১৩০৩ হিজরী ৪ মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি উল্লেখ নেই

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ ১ ডক্টর নূর মুহাম্মদ ইউসুফ জাই, করাচি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ ইদারা-ই তাহকিকাত-ই ইসলামিয়া, ইসলামাবাদ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ২ মাকতাবাতু দারুল উলুম, করাচি উল্লেখ নেই

৪৬৩ হিজরী ১ তলাস লিদ দিরাসাত ওয়ান নাশর, দামেস্ক ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭১ হিজরী ১ মাকতাবাতুল গুরবা আল-আসারিইয়াহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪১৭ হিজরী

৫৯৭ হিজরী ১ শারিকাতু দারুল আরকাম, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, লেবানন ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩১০ হিজরী ৩ মাতবাউল মাদানি, কায়রো উল্লেখ নেই

৬৭৬ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

https://t.me/BoierSomahar

প্রথম খণ্ড ..... তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

১৮৮. তাহযীবুত তাহযীব ..... ইবনে হাজার আসকালানী

১৮৯. তাহযীবুল কামাল ..... আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী

১৯০. তাহযীবুল লুগাহ ..... আবু মনসুর আল-আযহারী আল-হারাবী

১৯১. তাওযীহুল আফকার লি-মা'আনি তানকীহিল আনযার ..... আমীর ইযযুদ্দীন সানআনী

১৯২. তাওযীহুল মুশতাবিহ ফী যাবতি আসমায়িল রুওয়াত ওয়া আনসাবিহিম ওয়া আলকাবিহিম ওয়া কুনা-হুম ..... আবু বকর ইবনে নাসিরুদ্দীন

**হরফ-ই-সা (ث)**

১৯৩. আস-সিকাত (মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালিল আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস) ..... আবুল হাসান আহমদ বিন সালেহ আল-ইজলী আল-কুফী

১৯৪. আস-সিকাত লি-ইবনে হিব্বান ..... ইবনে হিব্বান আল-বুসতী

১৯৫. আস-সিকাতু মিম্মান লাম ইয়াকা' ফীল কুতুবিস সিত্তাহ ..... কাসিম বিন কুতলুবুগা

১৯৬. সিমারুল কুলুব ফিল মুদাফি ওয়াল মানসুব ..... আবু মনসুর আস-সা'আলাবী

**হরফ-ই-জীম (ج)**

১৯৭. আল-জামি' লি-ইবনে ওয়াহাব ..... আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব

১৯৮. আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ..... ইবনে আবী হাতিম আর-রাযী

১৯৯. আল-জিহাদ ..... আবু বকর ইবনে আবী আসিম আশ-শায়বানী

২০০. আল-জাওয়াবুস সহীহ লি-মান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ ..... আহমদ বিন আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

২০১. আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ ..... আবদুল কাদির মুহিউদ্দীন আল-হানাফী

২০২. আল-জাওহারাতুন নাইয়্যিরাহ আলা মুখতাসারিল কুদুরী ..... আবু বকর বিন আলী আল-হাদ্দাদী আয-যাবীদী

২০৩. আল-জাওহারাহ ফী নাসাবি আন-নাবী ওয়া আসহাবিহিল আশারাহ ..... মুহাম্মদ বিন আবী বকর আল-বিররী আল-তিলমিসানী

২০৪. জামিউল আহাদীস ..... জালালুদ্দীন সুয়ূতী

২০৫. জামিউল উসুল ফী আহাদীসির রাসূল ..... মাজদুদ্দীন ইবনুল আসীর আল-জাযারী

২০৬. জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান ..... হাফিজ ইবনে কাসীর

২০৭. জামিউল মাসায়িল ..... আহমদ বিন আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

২০৮. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি ..... ইবনে আবদুল বার

২০৯. জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফী যিকরিল উলাতিল আন্দালুস ..... আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদী

২১০. জামউল কুরআন হিফযান ওয়া কিতাবাতান ..... ডক্টর আলী বিন সুলাইমান আল-উবাইদ

২১১. জামহারাতু আনসাবিল আরব ..... ইবনে হাযম আয-যাহেরী

২১২. জাওয়ামিউস সিরাতিল নাবাবিয়্যাহ ..... ইবনে হাযম আয-যাহেরী

**তারিখ উম্মতে মুসলিমা**

**প্রথম খণ্ড**

মৃত্যুর বছর ..... খণ্ডসমূহ ..... প্রকাশক ..... প্রকাশের বছর

৮৫২ হি. ..... ১২ ..... মাতবা নিজামি, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ..... ১৩২৬ হি.

৭২৪ হি. ..... ৩৫ ..... মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ..... ১৪০০ হি. - ১৯৮০ খ্রি.

৩৭০ হি. ..... ৮ ..... দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি ..... ২০০১ খ্রি.

১১৮২ হি. ..... ২ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪১৭ হি. - ১৯৯৬ খ্রি.

৮৩২ হি. ..... ১০ ..... মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ..... ১৯৯৩ খ্রি.

**বর্ণ 'সা' (ث)**

২৬১ হি. ..... ২ ..... মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মুনাওয়ারা ..... ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.

৩৯৩ হি. ..... ৯ ..... মাতবা নিজামিয়া দাক্ষিণাত্য ..... ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খ্রি.

৮৬৯ হি. ..... ৮ ..... মারকাযুন নুমান, ইয়েমেন ..... ১৪৩২ হি. - ২০১১ খ্রি.

৩২৯ হি. ..... ১ ..... দারুল মাআরিফ, কায়রো ..... উল্লেখ নেই

**বর্ণ 'জিম' (ج)**

১৯৭ হি. ..... ১ ..... দারুল ওয়াফা ..... ১৪২৫ হি. - ২০০৫ খ্রি.

৩২৭ হি. ..... ৯ ..... দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি ..... ১৯৫২ খ্রি.

২৮৭ হি. ..... ২ ..... মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ..... ১৪০৯ হি.

৭২৮ হি. ..... ৬ ..... দারুল আসিমা, রিয়াদ ..... ১৪১৩ হি.

৭৭৫ হি. ..... ২ ..... মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি ..... উল্লেখ নেই

৮০০ হি. ..... ২ ..... আল-মাতবাআতুল খায়রিয়্যাহ ..... ১৩০০ হি.

৬৩৫ হি. ..... - ..... দারুর রিফায়ি, রিয়াদ ..... ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৯১১ হি. ..... ১৩ ..... ডক্টর হাসান আব্বাস জাকি ..... মাকতাবা শামিলা

২০৬ হি. ..... ১২ ..... মাকতাবাতু দারিল বায়ান ..... ১৩৯২ হি. - ১৯৭২ খ্রি.

৭৭৪ হি. ..... ১০ ..... দারু খিজর, বৈরুত ..... ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৭২৮ হি. ..... ৬ ..... দারু আলমিল ফাওয়াইদ ..... ১৪২২ হি.

৩৬৩ হি. ..... ২ ..... দারু ইবনিল জাওজি, সৌদি আরব ..... ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৩৮৮ হি. ..... ১ ..... আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ..... ১৯৯৬ খ্রি.

- ..... ১ ..... মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা মুনাওয়ারা ..... উল্লেখ নেই

৪৫৬ হি. ..... ১ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৪৫৬ হি. ..... ১ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... উল্লেখ নেই

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

{বর্ণ 'হা'}

২১৩. আল-হাবি আল-কাবির শারহ মুখতাসার আল-মুজানি ..... ইমাম আলী বিন মুহাম্মদ আল-মাওয়ার্দি

২১৪. আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মদিনাহ ..... মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শায়বানি

২১৫. আল-হিসবাহ ওয়াস সিয়াসাহ ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

২১৬. আল-হায়ওয়ান (কিতাবুল হায়ওয়ান) ..... আমর বিন বাহর, আবু উসমান আল-জাহিজ

২১৭. হুসনুল মুহাদারা ..... জালালুদ্দিন সুয়ূতী

২১৮. হাকিকাতুস সুন্নাহ ওয়াল বিদআহ ..... জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী

২১৯. হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া ..... আবু নুয়াইম আসফাহানি

২২০. হায়াতুস সাহাবা (আরবি) ..... মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী

{বর্ণ 'খা'}

২২১. আল-খারাজ (কিতাবুল খারাজ) ..... কাজী আবু ইউসুফ

{বর্ণ 'দাল'}

২২২. দিরাসাত তারিখিয়্যাহ ..... আকরাম জিয়া উমারি

২২৩. দালাইলুন নুবুওয়াহ ..... আবু বকর আল-বাইহাকী

২২৪. আদ-দিরায়াহ ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়াহ ..... ইবনে হাজার আসকালানি

২২৫. দিওয়ানুল হামাসাহ ..... আবু তাম্মাম

২২৬. দুওয়ালুল ইসলাম ..... শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

২২৭. দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস ..... মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইনান আল-মিসরি

২২৮. আদ-দিবাজুল মুজাহহাব ফি মা'রিফাতি আয়ানি উলামাইল মাজহাব ..... ইবনে ফারহুন আল-মালিকি

২২৯. আদ-দারারি ফিজ জারারি (তাযকিরাতুল আবা ওয়া তাসলিয়াতুল আবনা) ..... ইবনে আদিম আল-হালাবি

২৩০. আদ-দিবাজুল মুজাহহাব ফি মা'রিফাতি আয়ানি উলামাইল মাজহাব ..... ইবনে ফারহুন আল-মালিকি

২৩১. আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ ..... মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি

{বর্ণ 'যাল'}

২৩২. আয-যুররিয়াতুত তাহিরাহ ..... আবু بشر আল-আনসারি আদ-দুলাবি

{বর্ণ 'রা'}

২৩৩. আর-রিহলাহ ফি তালাবিল হাদিস ..... আবু বকর খতিব বাগদাদী

২৩৪. আর-রাহীকুল মাখতুম ..... মাওলানা সফিউর রহমান মুবারকপুরী

২৩৫. আর-রাদ্দু আলা মান কালা বি-ফানিল জান্নাতি ওয়ান নার ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — প্রথম খণ্ড

মৃত্যু সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

**বর্ণ ‘হা’ (ح)**

৩৫০ হিজরী ১৯ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ ১৩৯৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

১৮৯ হিজরী ৪ আলম আল-কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী

৭৩৮ হিজরী ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

২৫৫ হিজরী ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২৩ হিজরী

৯১১ হিজরী ২ দার ইহয়া আল-কুতুব আল-আরাবিয়্যাহ ১৩৮৭ হিজরী - ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ

৯১১ হিজরী ১ মাতাবি’ আর-রশিদ ১৪০৯ হিজরী

৩৩০ হিজরী ১২ আস-সাআদাহ ১৩৯৩ হিজরী - ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৮২ হিজরী ৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

**বর্ণ ‘খা’ (خ)**

১৮২ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যাহ, মিসর উল্লেখ নেই

**বর্ণ ‘দাল’ (د)**

সমসাময়িক ১ আল-মাজলিসুল আ’লা, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪৫৮ হিজরী ৭ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪০৫ হিজরী

৮৫২ হিজরী ২ দার আল-মা’রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

২২১ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৭৩৮ হিজরী ২ দার সাদির, বৈরুত ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

১৩০৬ হিজরী ৫ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৭৯৯ হিজরী ২ দারুত তুরাস, কায়রো উল্লেখ নেই

৬৬০ হিজরী ১ দারুল হিদায়াহ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৯৯ হিজরী ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মুয়াসসাসাতু ইকরা, কায়রো ১৪২৭ হিজরী - ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ

**বর্ণ ‘যাল’ (ذ)**

৩১০ হিজরী ১ আদ-দারুস সালাফিয়্যাহ, কুয়েত ১৪০৭ হিজরী

**বর্ণ ‘রা’ (ر)**

৩৬৩ হিজরী ১ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৩৯৫ হিজরী

৩০৬ হিজরী ১ আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, লাহোর ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৮ হিজরী ১ দারুল ফাসিলাহ, রিয়াদ ১৪১৬ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

২৩৬ আর-রাসায়েল ..... আমর বিন বাহর আবু উসমান আল-জাহিজ

২৩৭ আর-রাফ’ ওয়াত তাকমিল ..... মাওলানা আব্দুল হাই লখনভী

২৩৮ আর-রওদুল উনুফ (তাহকীক: উমর আবদুস সালাম সালামি) ..... আবুল কাসিম আস-সুহাইলি

২৩৯ আর-রওদুল বাসিম ফি তারাজিম শুয়ুখিল হাকিম ..... তালিফ: বিন সালাহ আল-কুন্তুরি

২৪০ আর-রওদুল মিতার ফি খবরিল আকতার ..... আবু আব্দুল্লাহ আল-হিময়ারি

২৪১ আর-রিয়াদুন নাদরাহ ফি মানাকিবিল আশারাহ ..... মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী

২৪২ রাসুল হুসাইন ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

২৪৩ রিজালুল কাশশি (ইখতিয়ারু মা’রিফাতির রিজাল) নতুন সংস্করণ ..... লেখক: মুহাম্মদ বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ আল-কাশশি (মৃত ৩৫০ হি.) বিন্যাস ও পরিমার্জন: আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হাসান আত-তুসী (মৃত ৪৬০ হি.)

২৪৪ রিজালুল কাশশি (ইখতিয়ারু মা’রিফাতির রিজাল) পুরাতন সংস্করণ ..... লেখক: মুহাম্মদ বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ আল-কাশশি (মৃত ৩৫০ হি.) বিন্যাস ও পরিমার্জন: আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হাসান আত-তুসী (মৃত ৪৬০ হি.)

২৪৫ রাহমাতুল্লিল আলামিন (তিন খণ্ড) ..... কাজী সালমান মনসুরপুরী

২৪৬ রাদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুররিল মুখতার ..... মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদিন আদ-দিমাশকি

২৪৭ রিসালাতু আবি দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ ..... ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানি

২৪৮ রিসালাতু তুরুকি হাদিসি মান কুনতু মাওলাহু ..... হাফিজ যাহাবী

২৪৯ রাফ’উল আস্তার ..... ইজ্জুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আস-সানআনী আমির ইয়ামানি

২৫০ রওদাতুল আখইয়ার আল-মুন্তাখাব মিন রাবিউল আবরার ..... মুহিউদ্দীন আল-খতিব আবুল কাসিম

২৫১ আর-রিয়াদুন নুফুস ..... আবু বকর আব্দুল্লাহ আল-মালিকি

**হারফ যা**

২৫২ আয-যুহদ (কিতাবুয যুহদ) ..... আহমদ বিন হাম্বল

২৫৩ আয-যুহদুল কাবীর ..... আবু বকর বায়হাকী

২৫৪ আয-যুহদ ওয়ার রাকায়েক (কিতাবুয যুহদ) ..... আব্দুল্লাহ বিন মুবারক

২৫৫ যাদুল মা’আদ ফি হাদয়ি খায়রিল ইবাদ ..... ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ

২৫৬ যাহরুল আকম ফিল আমসাল ওয়াল হিকাম ..... নুরুদ্দীন আল-ইউসি

**হারফ সিন**

২৫৭ আস-সুন্নাহ ..... আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ ১)

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৩৫৫ হিজরী ৪ মাকতাবাতু খানজী, কায়রো ১৩৮৩ হিজরী - ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩০ হিজরী ১ কুতুবুল মাতবুয়াত আল-ইসলামিয়া, হালাব ১৪০৭ হিজরী

৫৮১ হিজরী ৭ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ২ দারুল আসিমা লিন-নাশর, রিয়াদ ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৯০০ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতু নাসির লিস-সাকাফাহ, বৈরুত ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ

৬৯৩ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৭২৮ হিজরী ১

১ মুয়াসসাসাতুন নাশরিল ইসলামি - কোম, ইরান ১৪২৭ হিজরী

১ দানিশগাহ, মাশহাদ

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ ২ মারকাযুল হারামাইন আল-ইসলামি, ফয়সালাবাদ ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

১২৫২ হিজরী ৬ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১২ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৪৬৫ হিজরী ১ দারুল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৭৩৮ হিজরী ১ মাকতাবা শামিলা

১১৮৩ হিজরী ১ আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত ১৪০৫ হিজরী

৯৩০ হিজরী ১ দারুল কলাম আল-আরাবি, হালাব ১৪২৩ হিজরী

৪৬০ হিজরী পরবর্তী ২ দারুল গারব আল-ইসলামি ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

(حرف ز) - বর্ণ ‘যা’

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৩২১ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫৮ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতুল কুতুবুস সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

১৮১ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৬৭১ হিজরী ৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

১১০২ হিজরী ৩ আশ-শারিকাতুল জাদিদাহ - আল-মাগরিব ১৪০১ হিজরী - ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ

(حرف س) - বর্ণ ‘সীন’

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

২৯০ হিজরী ২ দারু ইবনে কাসির, দামেস্ক ১৪০২ হিজরী

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

২৫৮ ..... আস-সুনান আল-কুবরা লিন-নাসায়ী ..... আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী

২৫৯ ..... আস-সুনান আস-সাগীর ..... আবু বকর আল-বাইহাকী

২৬০ ..... আস-সুনান আল-কুবরা লিল-বাইহাকী ..... আবু বকর আল-বাইহাকী

২৬১ ..... আস-সিরাহ আল-হালাবিয়্যাহ ..... বুরহান উদ্দিন হালাবী

২৬২ ..... আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ..... আবুল হাসান আলী আন-নাদভী

২৬৩ ..... আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ..... ইবনে হিব্বান আল-বুসতী

২৬৪ ..... আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ..... মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী

২৬৫ ..... আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ আস-সহীহাহ: মুহাওয়ালাহ লি-তাতবীক কাওয়াইদ আল-মুহাদ্দিসীন ফী নাকদ রিওয়ায়াত আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ..... ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমারী

২৬৬ ..... আস-সিরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ মিন আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ..... হাফিজ ইবনে কাসীর

২৬৭ ..... আস-সিরাহ ওয়াদ দাওয়াহ ফীল আহদিল মাদানী ..... আহমদ গালুশ

২৬৮ ..... আস-সাইফুল মাসলুল আলা মান সাব্বার রাসূল ..... তাকী উদ্দিন বিন আব্দুল কাফী আস-সুবকী

২৬৯ ..... সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সিরাতি খাইরিল ইবাদ ..... মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী

২৭০ ..... সিমতুন নুজুম আল-আওয়ালী ফী আনবাউল আওয়াইল ওয়াত তাওয়ালী ..... আব্দুল মালিক আল-ইসামী আল-মাক্কী

২৭১ ..... সুনান ইবনে মাজাহ ..... মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ, ইবনে মাজাহ কাজভিনী

২৭২ ..... সুনান আবু দাউদ ..... আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিস্তানী

২৭৩ ..... সুনান আত-তিরমিযী ..... মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী

২৭৪ ..... সুনান আদ-দারাকুতনী ..... আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী

২৭৫ ..... সুনান আদ-দারিমী ..... আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আদ-দারিমী

২৭৬ ..... সুনান সাঈদ বিন মনসুর ..... সাঈদ বিন মনসুর শু'বাহ আল-খুরাসানী

২৭৭ ..... সুনান নাসায়ী (আল-মুজতাবা) ..... আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী

২৭৮ ..... সুয়ালাতুল আজুররী লি-আবি দাউদ ..... আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী

২৭৯ ..... সিয়ারু আলামিন নুবালা ..... শামস উদ্দিন আয-যাহাবী

২৮০ ..... সিরাত ইবনে ইসহাক ..... মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার আল-মাদানী

২৮১ ..... সিরাত ইবনে হিশাম ..... আব্দুল মালিক বিন হিশাম

২৮২ ..... সিরাতুন নবী ..... আল্লামা শিবলী নোমানী

২৮৩ ..... সিরাত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ..... মুফতি মুহাম্মদ শফী

২৮৪ ..... সিরাত খুলাফায়ে রাশেদীন ..... মাওলানা আব্দুল শাকুর লখনভী ফারুকী

২৮৫ ..... সিরাত উমর বিন আব্দুল আজিজ ..... আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম আল-মিসরী

তারিখ উম্মতে মুসলিমা ..... প্রথম খণ্ড

মৃত্যুর সাল ..... খণ্ডসমূহ ..... প্রকাশক ..... প্রকাশের সাল

৩০৩ হিজরী ..... ১২ ..... মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ..... ১৪২১ হিজরী - ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫৮ হিজরী ..... ৪ ..... জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া, করাচি ..... ১৪১০ হিজরী - ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫৮ হিজরী ..... ১০ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১০২৩ হিজরী ..... ৩ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৩২৭ হিজরী

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ..... ১ ..... দোহা, কাতার ..... ১৪০০ হিজরী

৩৫৩ হিজরী ..... ২ ..... আল-মাকতাবাতুস সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত ..... ১৩১৭ হিজরী

সমসাময়িক ..... ১ ..... দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ..... ১৪২৯ হিজরী - ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ..... ২ ..... মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ..... ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৩ হিজরী ..... ৪ ..... দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ..... ১৩৯৫ হিজরী - ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ..... ১ ..... মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ..... ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬১ হিজরী ..... ১ ..... দারুল ফাতহ, আম্মান, জর্ডান ..... ১৪২১ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

৯৩২ হিজরী ..... ১২ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

১১১১ হিজরী ..... ৪ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ..... ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৭ হিজরী ..... ২ ..... দারু ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ ..... উল্লিখিত

৭২৫ হিজরী ..... ৪ ..... আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সাইদা, বৈরুত ..... উল্লিখিত

৪৬৯ হিজরী ..... ৫ ..... মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো ..... ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

৩৮৫ হিজরী ..... ৫ ..... মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ..... ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪৫৫ হিজরী ..... ৪ ..... দারুল ফিকর, সৌদি আরব ..... ১৩১২ হিজরী

৪২৭ হিজরী ..... ২ ..... দারুস সালাফিয়্যাহ, বোম্বে ..... ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৩ হিজরী ..... ৮ ..... মাকতাবাতুল মাতবুয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, হালাব ..... ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

- ..... ১ ..... আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা ..... ১৩৯৯ হিজরী - ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

৭৩৮ হিজরী ..... ২৫ ..... মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ..... ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৫১ হিজরী ..... ১ ..... দারুল কলম, বৈরুত ..... ১৩৯৮ হিজরী - ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

২১৩ হিজরী ..... ২ ..... মাতবা' মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, কায়রো ..... ১৩৭৪ হিজরী - ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ ..... ৭ ..... দ্বীনি কুতুবখানা, লাহোর ..... ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৯৬ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ ..... ১ ..... দারুল ইশাআত, করাচি ..... উল্লিখিত

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ ..... ১ ..... কুতুবখানা মাজিদিয়া, মুলতান ..... উল্লিখিত

২১৩ হিজরী ..... ১ ..... আলমুল কুতুব, বৈরুত ..... ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)

বইয়ের নাম ও লেখক ..... ক্রমিক নং

**হরফ শীন (ش)**

সীরাত ওয়া মানাকিব উমর বিন আব্দুল আজিজ - ইবনুল জাওযী ..... ২৮৬

শাযারাতুয যাহাব ফী খবর মান যাহাব - ইবনে ইমাদ আল-হাম্বলী ..... ২৮৭

শরীয়ত ও তরিকত কা তালাযুম - শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া মুহাজির মাদানী ..... ২৮৮

আশ-শাযাল ফাইয়াহ মিন উলূম ইবনে আস-সালাহ - আবি ইসহাক আল-আবনাদী ..... ২৮৯

আশ-শরীয়াহ - আবু বকর আল-আজুরী আল-বাগদাদী ..... ২৯০

আশ-শিফা বি তারিফ হুকুকিল মুস্তফা - আল-কাজী আইয়াজ বিন মুসা আল-ইয়াহসুবি ..... ২৯১

আশ-শামারিয ফী ইলমিত তারিখ - জালালুদ্দীন সুয়ূতী ..... ২৯২

আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ (শামাইলে তিরমিযী) - মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী ..... ২৯৩

আশ-শিয়া ওয়াত তাশাইয়ু - ইহসান ইলাহী জহীর ..... ২৯৪

শারহু আকাইদিন নাসাফী - সা'দুদ্দীন তাফতাযানী ..... ২৯৫

শারহু আরবাঈন আন-নববীয়্যাহ - মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন ..... ২৯৬

শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ আলফিয়াতুল ইরাকী - আল-হাফিয যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী ..... ২৯৭

শারহুয যারকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ - আবু আব্দুল্লাহ যারকানী আল-মালিকী ..... ২৯৮

শারহুস সুন্নাহ - আবু মুহাম্মদ ইবনুল ফাররা আল-বাগাবী ..... ২৯৯

শারহুস সুন্নাহ - ইসমাইল বিন ইয়াহইয়া আল-মুযানী ..... ৩০০

শারহু সহীহ মুসলিম (আল-মিনহাজ) - ইমাম শরফ আন-নববী ..... ৩০১

শারহু উকূদি রাসমিল মুফতী - আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী ..... ৩০২

শারহু মুশকিলিল আসার - আবু জাফর আত-তহাবী ..... ৩০৩

শারহু মাআনিল আসার - আবু জাফর আত-তহাবী ..... ৩০৪

শারহু নুখবাতিল ফিকার - মোল্লা আলী কারী ..... ৩০৫

শারাফুল মুস্তফা - আবু সা'দ আল-খারকুশী ..... ৩০৬

শুআবুল ঈমান - আবু বকর বায়হাকী ..... ৩০৭

শাহাদাতে ইমাম হুসাইন ও কিরদারে ইয়াজিদ (মাওলানা আনোয়ারুল হাসান শেরকোটি কর্তৃক উর্দু অনুবাদ) - মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী ..... ৩০৮

**হরফ সোয়াদ (ص)**

আস-সিহাহ তাজুল লুগাহ - আবু নাসর আল-জাওহারী আল-ফারাবী ..... ৩০৯

আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা আলা আহলির রাফয ওয়াদ দলাল ওয়ায যান্দাকা - ইবনে হাজার হাইতামী ..... ৩১০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ ১)

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

৫৯৭ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২২ হিজরী - ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

**বর্ণ: শীন (ش)**

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

১০৮৯ হিজরী ১১ দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ ১ মাকতাবাতুশ শাইখ, করাচি ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮০২ হিজরী ২ মাকতাবাতুর রুশদ ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৩৬০ হিজরী ৫ দারুল ওয়াতান, সৌদি আরব ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৫২৩ হিজরী ২ দারুল ফিকর ১৪০৯ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

৯১১ হিজরী ১ মাকতাবাতু আদাব উল্লেখ নেই

৭২৯ হিজরী ১ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

১৩০৭ হিজরী ১ ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ, লাহোর ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭৯২ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা, করাচি ১৪৩০ হিজরী

১২২১ হিজরী ১ দারুশ শারকিল মুয়াসসির ১৩৯৬ হিজরী - ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

৮০২ হিজরী ২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২৩ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

১২২ হিজরী ১২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

৫১৬ হিজরী ১৩ আল-মাকতাবুল ইসলামি, দামেস্ক ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৬৩ হিজরী ১ মাকতাবাতুল গুরবা আল-আসারিইয়াহ, সৌদি আরব ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬৬ হিজরী ৬ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৩৯২ হিজরী

১২৫৭ হিজরী ১ মাকতাবাতুল বুশরা ১৪৩০ হিজরী

৩২১ হিজরী ১৬ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৩২১ হিজরী ৫ আলমুল কুতুব ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

১০১৩ হিজরী ১ দারুল আরকাম, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩০৭ হিজরী ২ দারুল বাশাইরুল ইসলামিয়্যাহ, মক্কা ১৪২২ হিজরী

৪৫৮ হিজরী ১৪ মাকতাবাতুর রুশদ ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৯৭ হিজরী ১ তাহরিক খুদ্দাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, লাহোর উল্লেখ নেই

**বর্ণ: সাদ (ص)**

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

৩৯৩ হিজরী ৬ দারুল আলাম, বৈরুত ১৪০৭ হিজরী - ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

৯৭৪ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)

সাব্বুল আজাব আলা মান সাব্বাল আসহাব (আল্লামা মাহমুদ আলূসী) ..... ৩১১
সহীহ আল-বুখারী (মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী) ..... ৩১২
সহীহ মুসলিম (মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী) ..... ৩১৩
সিফাতুস সাফওয়া (আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী) ..... ৩১৪
সিফাতুন নিফাক ওয়া যাম্মুল মুনাফিকীন (আবু জাফর আবু বকর আল-ফিরইয়াবী) ..... ৩১৫
সিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস (আবু আবদুল্লাহ আল-হিময়ারী) ..... ৩১৬

হরফ দ্বদ (ض)

আদ-দুয়াফাউল কাবীর (আবু জাফর আল-উকাইলী আল-মাক্কী) ..... ৩১৭
আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরূকূন (আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী) ..... ৩১৮
আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরূকূন (আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী) ..... ৩১৯

হরফ ত (ط)

আত-তাবাকাতুস সানিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ (তাকিউদ্দীন তামীমী) ..... ৩২০
তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান ওয়াল ওয়ারিদীনা আলাইহা (আবুশ শায়খ আল-আসবাহানী) ..... ৩২১
তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) জুয মুতাম্মিমুস সাহাবাহ আত-তাবাকাতুল খামিসাহ (মুহাম্মদ বিন সাদ) ..... ৩২২
তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) জুয মুতাম্মিমুস সাহাবাহ আত-তাবাকাতুর রাবিআহ (মুহাম্মদ বিন সাদ) ..... ৩২৩
তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) (মুহাম্মদ বিন সাদ) ..... ৩২৪
নোট: অধিকাংশ স্থানে তাবাকাত ইবনে সাদ-এর দার সাদির সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।
তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) (মুহাম্মদ বিন সাদ) ..... ৩২৫
তাবাকাতুল আতিব্বা (ইবনে আবি উসাইবিয়া) ..... ৩২৬
তাবাকাতুল উমাম (কাজী ইবনে সাঈদ আল-আন্দালুসী) ..... ৩২৭
তাবাকাতুল আউলিয়া (ইবনে মুলাক্কিন আল-মিসরী) ..... ৩২৮
তাবাকাতুল হানাবিলা (আবু আল-হুসাইন ইবনে আবি ইয়ালা) ..... ৩২৯
তাবাকাতুস সূফিয়্যাহ (আবদুর রহমান আস-সুলামী নিশাপুরী) ..... ৩৩০
তাবাকাতুল ফুকাহা (আবু ইসহাক শিরাজী) ..... ৩৩১
তাবাকাতুল ফুকাহা আশ-শাফিইয়্যাহ (ইবনে আস-সালাহ) ..... ৩৩২
তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন (তারীফু আহলিত তাকদীস বি-মারাতিবিল মাওসূফীনা বিত-তাদলীস) (ইবনে হাজার আসকালানী) ..... ৩৩৩
তাবাকাতুল মুফাসসিরীন (জালালুদ্দীন সুয়ূতী) ..... ৩৩৪
তাবাকাতুল মুফাসসিরীন (আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-আদনাবী) ..... ৩৩৫

https://t.me/BoierSomahar

মৃত্যুর সন ..... খণ্ড ..... প্রকাশক ..... প্রকাশের সন

১৩৩২ হি. ..... ১ ..... আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ..... ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৪৬৭ হি. ..... ৯ ..... দারুত তওকুন নাজাত ..... ১৪২৩ হি.

৪২১ হি. ..... ৫ ..... দারুল জিল ..... ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৫৯৭ হি. ..... ২ ..... দারুল হাদিস কায়রো, মিশর ..... ১৪২১ হি. - ২০০০ খ্রি.

৩০১ হি. ..... ১ ..... দারুল ইহয়াউত তুরাস, মিশর ..... ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

৯০০ হি. ..... ১ ..... দারুল জিল, বৈরুত ..... ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

হরফ যদ (ض)

৩২২ হি. ..... ৪ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত ..... ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৩০৩ হি. ..... ১ ..... দারুল ওয়ায়ি, হালব ..... ১৩৯৬ হি.

৫৯৭ হি. ..... ৩ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪০৬ হি.

হরফ ত (ط)

১০১০ হি. ..... ১ ..... মাকতাবা শামিলা ..... -

৪৬৯ হি. ..... ৪ ..... মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ..... ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

২৩০ হি. ..... ২ ..... মাকতাবাতুস সিদ্দিক, তায়েফ ..... ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৩০ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুস সিদ্দিক, তায়েফ ..... ১৪১৬ হি.

২৩০ হি. ..... ৮ ..... দারু সাদির ..... ১৯৬৮ খ্রি.

২৩০ হি. ..... ৮ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪১০ হি. - ১৯৯০ খ্রি.

৬৬৮ হি. ..... ১ ..... মাকতাবা শামিলা ..... -

৪৬২ হি. ..... ১ ..... বৈরুত ..... ১৯১৩ খ্রি.

৮০৩ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ..... ১৪১৫ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৫২৬ হি. ..... ২ ..... দারুল মারিফাহ, বৈরুত ..... উল্লেখ নেই

৪১৩ হি. ..... ১ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৪৭৬ হি. ..... ১ ..... দারুর রায়িদুল আরাবি, বৈরুত ..... ১৯৭০ খ্রি.

৬২৩ হি. ..... ২ ..... দারুল বাশাইরুল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত ..... ১৯৯৩ খ্রি.

৮৫২ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল মানার ..... ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৯১১ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতু ওয়াহবা কায়রো ..... ১৩৯৬ হি.

একাদশ হিজরি শতাব্দী ..... ১ ..... মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, সৌদি আরব .....

১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

[হরফ আইন]

৩৩৬ আল-আশির মিনাল মাশয়খাতিল বাগদাদিয়্যাহ ..... আবু তাহির আস-সিলাফি

৩৩৭ আল-ইবার ফি খবর মান গাবার ..... হাফিজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

৩৩৮ আল-আরশ ..... হাফিজ যাহাবি

৩৩৯ আল-উর্ফ আশ-শাযি শারহ সুনান আত-তিরমিযি ..... মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি

৩৪০ আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ ..... উমর বিন মুহাম্মদ আবু হাফস আন-নাসাফি

৩৪১ আল-ইকদ আল-ফারিদ ..... আবু উমর ইবনে আবদে রাব্বিহি

৩৪২ আল-আকিদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (আলবানীর টীকা সহ) ..... আবু জাফর আত-তাহাবি

৩৪৩ আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানি

৩৪৪ আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল-হাররানি

৩৪৫ আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল ..... আহমদ বিন হাম্বল

৩৪৬ আল-উলুউ লিল-আলিয়্যিল গাফফার ..... হাফিজ যাহাবি

৩৪৭ আল-ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ ..... মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনে আশ-শাইখ আল-বাবরতি

৩৪৮ আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম ..... আবু বকর ইবনুল আরাবি

৩৪৯ আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ..... ইবনুল ওয়াযির আল-কাসিমি

৩৫০ আল-উয়ুন ওয়াল হাদাইক ফি আখবারিল হাকাইক (জুয খিলাফাতুল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক) সাথে ইবনে মিসকাওয়াইহ-এর তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম ..... অজ্ঞাত

৩৫১ আরিদাতুল আহওয়াযি বি-শারহ সহিহ আত-তিরমিযি ..... ইবনুল আরাবি আল-মালিকি

৩৫২ আসরুল খিলাফাহ আর-রাশিদা - মুহাওয়ালা লি-নাকদির রিওয়ায়াতিত তারিখিয়্যাহ ওয়াফকা মানাহিজিল মুহাদ্দিসিন ..... আকরাম জিয়া উমারি

৩৫৩ উমদাতুত তালিব ফি আনসাব আলে আবি তালিব ..... ইবনে ইনাবাহ জামালুদ্দিন আল-হুসাইনি

৩৫৪ উমদাতুল কারি ..... বদরুদ্দিন আইনি হানাফি

৩৫৫ আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ ..... ইব্রাহিম বিন ইসহাক ইবনুস সুন্নি

৩৫৬ আহদে নববীর ময়দানে জং (নবী যুগের যুদ্ধক্ষেত্রসমূহ) ..... ডক্টর হামিদুল্লাহ হায়দ্রাবাদি

৩৫৭ আউনুল মাবুদ শারহ সুনান আবি দাউদ ..... শরাফুল হক সিদ্দিকী আজিমাবাদি

৩৫৮ উয়ুনুল আখবার ..... ইবনে কুতাইবাহ আদ-দিনাওয়ারি

৩৫৯ উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা ..... ইবনে আবি উসাইবিয়াহ

৩৬০ উয়ুনুর রাসায়িল ওয়াল আজউইবাহ আনিল মাসায়িল ..... শাইখ আব্দুল লতিফ বিন আব্দুর রহমান আলে শাইখ

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)

হরফ আইন (ع)

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৫৬৭ হিজরী ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৭৩৮ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৭৩৮ হিজরী ১ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি, আল-জামিআতুল ইসলামিয়্যাহ, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৫৩ হিজরী ৫ দারুত তুরাসিল আরাবি ১৪২৫ হিজরী - ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩ হিজরী ১ কিসমুত শারহ আহকামুন নিসওয়াহ মাতবুআ আল-মাকতাবাতুল বাশরি ১৪৩০ হিজরী - ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩২৮ হিজরী ৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী

৪২১ হিজরী ১ আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত ১৪১২ হিজরী

৫২৮ হিজরী ১ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৮ হিজরী ১ আদওয়াউস সালাফ ১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

২২১ হিজরী ৩ দারুল কায়ানি, রিয়াদ ১৪২৩ হিজরী

৭৩৮ হিজরী ১ মাকতাবা আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৬ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৬ হিজরী ১০ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

৫৩৩ হিজরী ১ দারুল জিল, বৈরুত ১৩৯৭ হিজরী - ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ

৮৩০ হিজরী ৯ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

অজানা ১ লাইডেন, হল্যান্ড ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ

৫৩৩ হিজরী ১৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতুল ওবাইকান ১৪৩০ হিজরী - ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

৮৩৮ হিজরী ২ মাতবাআ হায়দারিয়া, নাজাফ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫৫ হিজরী ২৫ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি উল্লেখ নেই

৪৬৩ হিজরী ১ দারুল মুক্কবিলাহ লিত-তাক্বাফাতিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ ১ ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

১৩২৯ হিজরী ১৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৫ হিজরী

২৭৬ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হিজরী

২৬৮ হিজরী ১ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, বৈরুত উল্লেখ নেই

১২৯৩ হিজরী ২ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ উল্লেখ নেই

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

**হরফ গাইন (غ)**

৩৬১ ..... আল-গায়া ফি শারহিল হিদায়া ফি ইলমিদ দিরায়া ..... শামসুদ্দিন আস-সাখাভী

৩৬২ ..... গায়াতুল মাকসাদ ফি যাওয়াইদিল মুসনাদ ..... নূরুদ্দিন আল-হাইসামি

**হরফ ফা (ف)**

৩৬৩ ..... আল-ফারুক ..... আল্লামা শিবলী নোমানী

৩৬৪ ..... আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ..... আহমদ বিন আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

৩৬৫ ..... আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া (ফাতাওয়া আলমগিরি) ..... ভারতের ফকীহগণের একটি কমিটি

৩৬৬ ..... আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল ..... সাইফ বিন উমর তামীমী

৩৬৭ ..... আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়া ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়া ..... ইবনুত তিকতাকা, মুহাম্মদ বিন আলী ইবনে তাবাতাবা

৩৬৮ ..... আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক ..... আবু মনসুর আব্দুল কাহের আল-ইসফারাইনী আল-বাগদাদী

৩৬৯ ..... আল-ফুরকুল লুগাবিয়্যাহ ..... আবু হিলাল আল-আসকারী

৩৭০ ..... আল-ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ..... ইবনে হাজম আল-জাহেরী

৩৭১ ..... আল-ফুসুল ফিল উসুল ..... ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস আর-রাযী

৩৭২ ..... আল-ফুসুল ফিস সিরাহ ..... হাফেজ ইবনে কাসীর

৩৭৩ ..... আল-ফিকহুল আবসাত ..... ইমাম আবু হানিফা

৩৭৪ ..... আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ..... ওয়াহবাহ আয-যুহাইলি

৩৭৫ ..... আল-ফিকহুল আকবার ..... ইমাম আবু হানিফা

৩৭৬ ..... আল-ফিকহুল আকবার ..... ইমাম আবু হানিফা

৩৭৭ ..... আল-ফিকহুল মুয়াসসার ফি দাউইল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ..... একদল লেখক

৩৭৮ ..... আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ..... আব্দুর রহমান আল-জাযীরি

৩৭৯ ..... আল-ফিহরিস্ত ..... ইবনে নাদীম আল-বাগদাদী

৩৮০ ..... ফাতাওয়া ইবনুস সালাহ ..... ইবনুস সালাহ

৩৮১ ..... ফাতাওয়া রশীদিয়া ..... মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী

৩৮২ ..... ফাতাওয়া উসমানী ..... মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী

৩৮৩ ..... ফাতহুল বারী ..... হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী

৩৮৪ ..... ফাতহুল বারী ..... ইবনে রজব হাম্বলী

৩৮৫ ..... ফাতহুল কাদির ..... কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম সিওয়াসী

৩৮৬ ..... ফাতহুল কাদির ..... মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী

https://t.me/BoierSomahar

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)

মৃত্যু সাল ..... খণ্ড ..... প্রকাশক ..... প্রকাশকাল

হরফ গাইন (غ)

৯০২ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতু আওলাদিশ শাইখ লিত-তুরাস ..... ২০০১ খ্রি.

৮০৭ হি. ..... ৪ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

হরফ ফা (ف)

১৯১২ খ্রি. ..... ১ ..... দারুল ইশাআত ..... ১৯৯১ খ্রি.

৭৩৮ হি. ..... ৬ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ..... ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.

প্রায় ১০০ হি. ..... ৬ ..... দারুল ফিকর ..... ১৪১০ হি.

২০০ হি. ..... ১ ..... দারুন নাফায়েস ..... ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.

৭০৯ হি. ..... ১ ..... দারুল কলম আল-আরাবি, বৈরুত ..... ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

৩২৯ হি. ..... ১ ..... দারুল আ ফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত ..... ১৯৭৭ খ্রি.

৩৯৫ হি. ..... ১ ..... দারুল আলম ওয়াশ-শাকাহ, মিসর ..... উল্লেখ নেই

৩৫৬ হি. ..... ৫ ..... মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ..... উল্লেখ নেই

৭৭০ হি. ..... ৪ ..... ওয়াজারাতুল আওকাফ আল-কুয়েতিয়্যাহ ..... ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.

৭৭৪ হি. ..... ১ ..... মুয়াসসাসাতু উলূমিল কুরআন ..... ১৪০৩ হি.

১৫০ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাতুল আরাবিয়্যাহ ..... ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.

২০১৫ খ্রি. ..... ১০ ..... দারুল ফিকর, দামেস্ক ..... উল্লেখ নেই

১৫০ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাতুল আরাবিয়্যাহ ..... ১৯৯৯ খ্রি.

১৫০ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল ফুরকান, আল-ইমারাতুল আরাবিয়্যাহ ..... ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.

সমসাময়িক ..... ১ ..... মাজমাউল মালিক ফাহাদ ..... ১৪২৩ হি.

১৩৬০ হি. ..... ৫ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.

২৩৮ হি. ..... ১ ..... দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ..... ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.

৬২৩ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম ..... ১৪০৭ হি.

১৩২৩ হি. ..... ১ ..... দারুল ইশাআত ..... ২০০৩ খ্রি.

সমসাময়িক ..... - ..... মাকতাবাতু মাআরিফুল কুরআন, করাচি ..... ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.

৮৫২ হি. ..... ১৩ ..... দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ..... ১৪১৭ হি.

৭৯৫ হি. ..... ৯ ..... দারুল হারামাইন, কায়রো ..... ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.

৮২১ হি. ..... ১০ ..... দারুল ফিকর ..... উল্লেখ নেই

১২৫০ হি. ..... ৬ ..... দারু ইবনে কাসীর ..... ১৪১৩ হি.

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

৩৮৭. ফাতহুল মুগীস বি-শারহি আলফিয়াতিল হাদীস ..... শামসুদ্দীন আস-সাখাভী

৩৮৮. ফাতহু মিসর ..... ইউহান্না আব্দুল হাদী

৩৮৯. ফাতহ নামা সিন্দ (চাচ নামা) ..... আবু হামিদ আল-কুফী

৩৯০. ফিতনা মাকতালে উসমান ..... মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ শাবান আল-আসামী

৩৯১. ফিতনা-ই ইস্তিশরাক ..... আল্লামা শামসুল হক আফগানী

৩৯২. আল-ফুতুহুল বুলদান ..... আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাযুরী

৩৯৩. ফুতুহুশ শাম আল-আযদী ..... মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আযদী

৩৯৪. ফুতুহুশ শাম লিল-ওয়াকিদী ..... মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদী

৩৯৫. ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব ..... আব্দুর রহমান বিন আব্দুল হাকাম আবুল কাসিম আল-মিসরী

৩৯৬. ফাজরুল ইসলাম ..... আহমদ আমিন

৩৯৭. ফিরাকুশ শিয়া ..... হাসান বিন মুসা আন-নওবাখতী

৩৯৮. আল-ফাদাইহুল বাতিনিয়্যাহ ..... ইমাম গাযালী

৩৯৯. ফাদাইলুস সাহাবা ..... ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

**হরফ ক্বাফ**

৪০০. আল-কামুসুল মাজীদ (আরবি থেকে উর্দু) ..... ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভী

৪০১. কায়েদাহ ফিল মুয়াররিখীন ..... তাজউদ্দীন আস-সুবকী

৪০২. কিসসাতুল হাযারাহ ..... উইলিয়াম জেমস ডুরান্ট, অনুবাদ: ডক্টর যকী নাজীব

৪০৩. কিসসাতুল আরব ফী ইস্পানিয়া (দ্য স্টোরি অফ মুরস ইন স্পেন) অনুবাদ: আলী হাযিম বেক ..... স্ট্যানলি লেন-পুল

৪০৪. আল-কিসাস মিনাত তারিখ ..... আলী আত-তানতাভী

৪০৫. কাদায়াল মারআ ফিল মুতামারাত আদ-দুওয়ালিয়্যাহ ..... ডক্টর ফুয়াদ বিন আব্দুল কারীম

৪০৬. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস (ইলাউস সুনান খণ্ড: ১৮) ..... মাওলানা যফর আহমদ উসমানী

৪০৭. কুতুল কুলূব ..... আবু তালিব আল-মাক্কী

**হরফ কাফ**

৪০৮. কাইফা নাকরাউ তারিখাল আল ওয়াল আসহাব ..... আব্দুল কারীম বিন খালিদ আল-হারবী

৪০৯. আল-কাশিফ ফী মারিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিল সিত্তাহ ..... হাফিজ যাহাবী

৪১০. আল-কাফী ফী ফিকহিল ইমাম আহমদ ..... ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী

৪১১. আল-কামিল ফিত তারিখ ..... ইবনে আসীর আল-জাযারী

৪১২. আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাব ..... আবুল আব্বাস আল-মুবররাদ

তারীখে মিল্লাতে ইসলামিয়া — প্রথম খণ্ড

মৃত্যু সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

৯০৩ হিজরী ৪ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, মিসর ১৪২৪ হিজরী — ২০০৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল ওফা ১৯৯৯ খ্রি.

৭১৩ হিজরী ১ মজলিসে মাখতুতাত ফারসিয়া ও দাকান ১৯৪৫ খ্রি.

সমসাময়িক ২ ইমাদাতুশ শুউনিল ইলমিয়্যাহ, আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারা ১৪২৩ হিজরী — ২০০৩ খ্রি.

১৩০৩ হিজরী ১ সিদ্দিকী ট্রাস্ট, করাচি উল্লেখ নেই

৫৬৯ হিজরী ১ দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বৈরুত ১৯৮৮ খ্রি.

১২৫ হিজরী ১ ব্যাপটিস্ট মিশন, কলকাতা ১৮৫৩ খ্রি.

৫২০ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হিজরী — ১৯৯৭ খ্রি.

৫২৫ হিজরী ১ মাকতাবাতুস সাকাফাতুদ দ্বীনিয়্যাহ ১৪১৫ হিজরী

৫৬৩ হিজরী ১ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৯৩৩ খ্রি.

তৃতীয় হিজরী শতাব্দী ১ মাকতাবাতু হায়দারিয়া, নাজাফ উল্লেখ নেই

৫০৫ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতু দারুস সাকাফাহ, কুয়েত উল্লেখ নেই

৩৩১ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৩ হিজরী — ১৯৮৩ খ্রি.

**হরফ ‘ক্বাফ’ (ق)**

মৃত্যু সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

১৯৯৫ খ্রি. ১ ইদারা ইসলামিয়াত, লাহোর ১৪১১ হিজরী — ১৯৯০ খ্রি.

৭৭৬ হিজরী ১ দারুর রাইদ, বৈরুত ১৪১০ হিজরী — ১৯৯০ খ্রি.

১৯৮১ খ্রি. ৪২ দারুল জিল, বৈরুত ১৪০৮ হিজরী — ১৯৮৮ খ্রি.

১৯৩১ খ্রি. ১ কালিমাত আরাবিয়্যাহ, কায়রো ১৯৩৩ খ্রি.

১৩২০ হিজরী ১ দারুল মানারাহ, সৌদি আরব ১৩২৭ হিজরী

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

১৩৯৩ হিজরী ১ দারুল ফিকর ১৪২১ হিজরী — ২০০১ খ্রি.

৩৮৬ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪২৬ হিজরী — ২০০৫ খ্রি.

**হরফ ‘কাফ’ (ک)**

মৃত্যু সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

সমসাময়িক ১ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ ১৪২৩ হিজরী — ২০০২ খ্রি.

৫৩৮ হিজরী ২ দারুল ক্বিবলাহ, জেদ্দা ১৪১৩ হিজরী — ১৯৯২ খ্রি.

৬২০ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৩ হিজরী — ১৯৯৩ খ্রি.

৬৩০ হিজরী ১০ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৪১৭ হিজরী — ১৯৯৭ খ্রি.

২৮৫ হিজরী ৪ দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো ১৪১৭ হিজরী — ১৯৯৭ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

৪১৩ ..... আল-কামিল ফি দুয়াফা আল-রিজাল ..... আবু আহমদ ইবনে আদি

৪১৪ ..... আল-কিফায়াহ ফি ইলম আল-রিওয়ায়াহ ..... খতিব বাগদাদী

৪১৫ ..... আল-কুনা ওয়াল-আসমা ..... মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী

৪১৬ ..... আল-কাওয়াকিব আল-দারারি ফি শারহ সহীহ আল-বুখারী ..... শামস আল-দীন আল-কিরমানি

৪১৭ ..... আল-কাওসার আল-জারি ইলা রিয়াদ আহাদিস আল-বুখারী ..... আহমদ বিন ইসমাইল আল-কুরানি

৪১৮ ..... কিতাব আল-আসার ..... কাজী আবু ইউসুফ

৪১৯ ..... কিতাব আল-আযকিয়া ..... আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী

৪২০ ..... কিতাব আল-উলাত ওয়া কিতাব আল-কুদাত (কিতাব উলাত মিসর) ..... আবু উমর আল-কিন্দি

৪২১ ..... কিতাব সুলাইম বিন কায়েস আল-হিলালী (তাহকীক: বাকির আনসারী) ..... সুলাইম বিন কায়েস আল-হিলালী

৪২২ ..... কাশফ আসরার আল-বাতিনিয়্যাহ ওয়া আখবার আল-কারামিতাহ ..... মুহাম্মদ বিন মালিক ইয়ামানি

৪২৩ ..... কাশফ আল-আস্তার আন যাওয়াইদ আল-বাযযার ..... নূর আল-দীন হাইসামি

৪২৪ ..... কাশফ আল-যুনুন মিন আসামি আল-কুতুব ওয়াল-ফুনুন (মা ইদাহ আল-মাকনুন) ..... হাজী খলিফা কাতিব চালাবি

৪২৫ ..... কাশফ আল-মুশকিল মিন হাদিস আল-সহীহাইন ..... আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী

৪২৬ ..... কানয আল-দাকায়িক ..... আবদুল্লাহ বিন আহমদ হাফিজ আল-দীন আল-নাসাফি

৪২৭ ..... কানয আল-উম্মাল ..... আল্লামা আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী

[বর্ণ: লাম]

৪২৮ ..... লুবাব আল-আনসাব ..... ইবনে ফান্দাক বায়হাকী

৪২৯ ..... লুবাব আল-নুকুল ফি আসবাব আল-নুযুল ..... জালাল আল-দীন সুয়ূতী

৪৩০ ..... লিসান আল-আরব ..... ইবনে মানযুর আফ্রিকী

৪৩১ ..... লিসান আল-মিযান ..... ইবনে হাজার আসকালানী

৪৩২ ..... লাওয়ামি আল-আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ ..... আবুল আউন আসফারিনী হাম্বলী

[বর্ণ: মীম]

৪৩৩ ..... আল-মামুন ..... শিবলী নোমানী

৪৩৪ ..... আল-মুবদি ফি শারহ আল-মুকনি ..... বুরহান আল-দীন ইবনে মুফলিহ

৪৩৫ ..... আল-মুবদি ফি শারহ আল-মুকনি ..... বুরহান আল-দীন আবু ইসহাক ইব্রাহিম

৪৩৬ ..... আল-মাবসুত ..... মুহাম্মদ বিন আহমদ আবু সাহল আল-সারাকসী

৪৩৭ ..... আল-মুত্তাফিক ওয়াল-মুফতারিক ..... খতিব বাগদাদী

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

মৃত্যু সাল খণ্ড সংখ্যা প্রকাশক প্রকাশকাল

৩৬৫ হি. ৯ আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৪৬৩ হি. ১ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, মদিনা মুনাওয়ারা উল্লেখ নেই

৪২১ হি. ২ ইমাদাতুল বাহস আল-ইলমি আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

৭৪৬ হি. ২৫ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খ্রি.

৮৯৩ হি. ১১ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত ১৪২৯ হি. - ২০০৮ খ্রি.

১৮২ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ উল্লেখ নেই

৫৯৭ হি. ১ মাকতাবাতুল গাজালি উল্লেখ নেই

৩৫৫ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

অজানা ১ ইনতিশারাত দালিল মা, তেহরান ১৩২৮ হি.

৭৪০ হি. ১ মাকতাবাতুস সামি, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৮০৭ হি. ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৩৯৯ হি. - ১৯৭৯ খ্রি.

১০৬৭ হি. ৬ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৯৩১ খ্রি.

৫৯৭ হি. ৪ দারু আলমিল কুতুব, রিয়াদ উল্লেখ নেই

৭০১ হি. ১ দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ ১৪৩২ হি. - ২০১১ খ্রি.

৯৭৫ হি. ১৬ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খ্রি.

**{হরফে লাম}**

৫৬৫ হি. ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

৫৯১ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

১১৭ হি. ১৫ দারু সাদির, বৈরুত ১৩৯৩ হি.

৮৫২ হি. ৭ মাতবাআ নিজামি, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩৯০ হি. - ১৯৭১ খ্রি.

১১৮৮ হি. ১ মুয়াসসাসাতুল খাফেকাইন ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.

**{হরফে মীম}**

১৯১৩ খ্রি. ১ দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়, ইউপি ১৮৮৯ খ্রি.

৮৮৪ হি. ৮ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৮৮৪ হি. ৮ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৪৪৩ হি. ৩০ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

৪৬৩ হি. ৩ দারুল কাদিরি, দামেস্ক ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

প্রথম খণ্ড - তারিখ উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

৪৩৮ ..... আল-মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম ..... আবু বকর আদ-দিনাওয়ারি আল-মালিকি

৪৩৯ ..... আল-মাজরুহিন মিনাল মুহাদ্দিসিন ওয়ায যুয়াফা ওয়াল মাত্রুকিন ..... ইবনে হিব্বান আল-বুস্তি

৪৪০ ..... আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব ..... মুহিউদ্দিন শরাফ আন-নববী

৪৪১ ..... আল-মাহাসিন ওয়াল মাসাবি ..... ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ বায়হাকি

৪৪২ ..... আল-মুহাব্বার ..... মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-হাশেমি আবু জাফর আল-বাগদাদি

৪৪৩ ..... আল-মুহতাযারিন ..... ইবনে আবিদ দুনিয়া

৪৪৪ ..... আল-মুহাররার ফিল ফিকহ আলা মাযহাবি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ..... মাজদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৪৪৫ ..... আল-মিহান ..... আবুল আরব আত-তামিমি

৪৪৬ ..... আল-মুখতার মিন নাওয়াদিরিল আখবার ..... মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ইসমাইল আল-মুকরি আল-আবিয়ারদি

৪৪৭ ..... আল-মুখতাসারুল কাবির ফি সিরাতির রাসুল ..... আব্দুল আজিজ বিন ইবনে জামাআ আল-কিনানি

৪৪৮ ..... আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার ..... আবুল ফিদা

৪৪৯ ..... আল-মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ ..... মুহিউদ্দিন আল-কাফিয়াজি

৪৫০ ..... আল-মারাসিল ..... ইবনে আবি হাতিম

৪৫১ ..... আল-মুরকাবাতুল উলইয়া ফিমান ইয়াসতাহিক্কুল কাযা ওয়াল ফুতইয়া (তারিখ কুযাতুল আন্দালুস) ..... আবুল হাসান আন-নাবাহি

৪৫২ ..... আল-মুযহির ফি উলুমিল লুগাহ ওয়া আনওয়াউহা ..... জালালুদ্দিন সুয়ূতি

৪৫৩ ..... আল-মাসায়িল ওয়াল আজউইবা ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৪৫৪ ..... আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন ..... হাকিম নিশাপুরি

৪৫৫ ..... আল-মুসলিমুন ওয়া কিতাবাতুত তারিখ ..... ডক্টর আব্দুল আলিম আব্দুর রহমান খিজর

৪৫৬ ..... আল-মাসাহিফ ..... আবু বকর বিন আবি দাউদ সিজিস্তানি

৪৫৭ ..... আল-মুসাফফা শারহুল মুয়াত্তা মাআল মুসাউওয়া ..... শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি

৪৫৮ ..... আল-মাআরিফ ..... ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি

৪৫৯ ..... আল-মাআলিমুল আসিরা ফিস সুন্নাহ ওয়াস সিরাহ ..... মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হাসান শাররাব

৪৬০ ..... আল-মুজামুল আওসাত ..... আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬১ ..... আল-মুজামুস সাগির ..... আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬২ ..... আল-মুজামুল কাবির ..... আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬৩ ..... আল-মুজামুল কাবির আল-মুজাল্লাদ আস-সানি আশারা ওয়ার রাবি আশারা ..... আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৪৬৪ ..... আল-মাআরিফাতু ওয়াত তারিখ ..... ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাউয়ি

৪৬৫ ..... আল-মুঈন ফি তাবাকাতিল মুহাদ্দিসিন ..... হাফিজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ উম্মতে মুসলিমা | অংশ: প্রথম

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

৩৩৩ হিজরী ১০ জামিয়াতুত তারবিয়াতুল ইসলামিয়া, বাহরাইন ১৪১৯ হিজরী

৩৫২ হিজরী ৩ দারুল ওয়ায়ি, হালাব ১৩৯৬ হিজরী

৭৬৭ হিজরী ১ দারুল ফিকর উল্লেখ নেই

৪২০ হিজরী ১ মাকতাবাতু শামিলা উল্লেখ নেই

৪২৫ হিজরী ১ দারুল আ ফাক, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩৮১ হিজরী ১ দারু ইবনে হাজম, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

২৫২ হিজরী ২ মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩৩ হিজরী ১ দারুল উলুম, রিয়াদ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

সপ্তম হিজরী শতাব্দী ১ দারুল কাত্তান, বাগদাদ ১৪৩২ হিজরী - ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৭ হিজরী ১ দারুল বাশির, আম্মান ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩৬ হিজরী ৪ আল-মাতবাআতুল হুসাইনিয়া, মিশর উল্লেখ নেই

৮৭৯ হিজরী ১ আলমুল কুতুব ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

৪২৭ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৩৯৭ হিজরী

৭৯৩ হিজরী ১ দারুল আ ফাকুল জাদিদাহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৯১০ হিজরী ২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৭২৮ হিজরী ১ আল-ফারুকুল হাদিসিয়্যাহ ১৪২৪ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৫ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১১ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ আল-মা’হাদুল আলামি লিল-ফিকরিল ইসলামি ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

৪১৬ হিজরী ১ আল-ফারুকুল হাদিসিয়্যাহ, মিশর ১৪২৩ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১১৬৭ হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় একত্রে মাতবা ফারুকি, দিল্লি ১২৯৩ হিজরী

৫২৬ হিজরী ১ আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ, কায়রো ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪১১ হিজরী

৩৬০ হিজরী ১০ দারুল হারামাইন, কায়রো উল্লেখ নেই

৩৬০ হিজরী ২ দারু গাম্মার, বৈরুত ১৪০৫ হিজরী - ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

৩৬০ হিজরী ২৫ মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৩৬০ হিজরী ২ ডক্টর সাদ বিন আব্দুল্লাহ উল্লেখ নেই

২৭৭ হিজরী ৩ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০১ হিজরী - ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ

৫২৮ হিজরী ১ দারুল ফুরকান, জর্ডান ১৪০৩ হিজরী

**তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা** (প্রথম খণ্ড)

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

৪৬৬ ..... আল-মুগনি ফিল দুয়াফা ..... শামস উদ্দিন আয-যাহাবি

৪৬৭ ..... আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব ..... ডক্টর জাওয়াদ আলী

৪৬৮ ..... আল-মাকালাত ওয়াল ফিরাক ..... সাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আশআরি আল-কুমি

৪৬৯ ..... আল-মুকতাবিস মিন আনবাউল আন্দালুস ..... ইবনে হাইয়ান আল-কুরতুবি

৪৭০ ..... আল-মাকসাদুল আলি ফি জাওয়াইদ মুসনাদ আবি ইয়ালা ..... নূর উদ্দিন আল-হাইসামি

৪৭১ ..... আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া ..... ইমাদ আলী জুমুআহ

৪৭২ ..... আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ..... মুহাম্মদ বিন আব্দুল কারিম আশ-শাহরাস্তানি

৪৭৩ ..... আল-মুনতাখাব মিন জাইলিল মুদাইয়্যাল ..... মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারী

৪৭৪ ..... আল-মুনতাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল ..... ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি

৪৭৫ ..... আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম ..... আব্দুর রহমান ইবনুল জাওজি

৪৭৬ ..... আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা ..... আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালাফ আল-বাজি আল-আন্দালুসি

৪৭৭ ..... আল-মুনতাকা মিনাস সুনানিল মুসনাদাহ ..... ইবনুল জারুদ নিশাপুরি

৪৭৮ ..... আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল ..... হাফিজ যাহাবি

৪৭৯ ..... আল-মুনাম্মাক ফি আখবার কুরাইশ ..... মুহাম্মদ বিন হাবিব আল-বাগদাদি আবু জাফর আল-বাগদাদি

৪৮০ ..... আল-মাওয়াইজ ওয়াল ইতিবার বি জিকরিল খিতাত ওয়াল আসার (আল-খিতাত আল-মাকরিজি) ..... তাকি উদ্দিন আল-মাকরিজি

৪৮১ ..... আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাজাহিব ..... একদল লেখক - তাহকিক: মানি বিন হাম্মাদ আল-জুহানি

৪৮২ ..... আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ ..... একদল ফকিহ

৪৮৩ ..... আল-মাওসুআতুল মুজাজাহ ফিত তারিখিল ইসলামি ..... আবু সাঈদ আল-মিসরি

৪৮৪ ..... আল-মুকিজাহ ফি ইলমি মুসতালাহিল হাদিস ..... হাফিজ যাহাবি

৪৮৫ ..... মাআসিরুল ইনাফাহ ফি মায়ালিমিল খিলাফাহ ..... আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দি

৪৮৬ ..... মা-যা খাসিরাল আলাম বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন ..... সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

৪৮৭ ..... মাজাল্লাতুস সিরাহ ..... প্রবন্ধ: প্রফেসর নিসার আহমদ

৪৮৮ ..... মাজমাউল আনহুর ফি শারহি মুলতাকাল আবহুর ..... আব্দুর রহমান শাইখি জাদাহ দামাদ আফান্দি

৪৮৯ ..... মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ ..... নূর উদ্দিন আল-হাইসামি

৪৯০ ..... মুজমাল উসুল আহলুস সুন্নাহ ..... শাইখ নাসির আব্দুল কারিম আল-আকল

৪৯১ ..... মাজমুউল ফাতাওয়া ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানি

৪৯২ ..... মুহাদারাতুল উদাবা ওয়া মুহাওয়ারাতুশ শুআরা ওয়াল বুলাগা ..... আবুল কাসিম আর-রাগিব আল-ইসফাহানি

৪৯৩ ..... মুখতাসারুত তুহফাতুল ইসনা আশারিয়্যাহ (শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভি) ..... সংক্ষেপক ও পরিমার্জক: আল্লামাতুল ইরাক মাহমুদ আল-আলুসি

**তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)**

মৃত্যু সন ..... খণ্ড ..... প্রকাশক ..... প্রকাশকাল

৭৩৮ হি. ..... ২ ..... মাকতাবা শামিলা ..... -

১৩০৮ হি. ..... ২০ ..... দারুস সাকি ..... ১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.

২২৯ হি. ..... ১ ..... মাতবা হায়দারি, তেহরান ..... ১৩২১ হি.

৩৬৯ হি. ..... ১ ..... আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়া, কায়রো ..... ১৩৯০ হি.

৮৬০ হি. ..... ৪ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ..... ১ ..... সিলসিলাতুত তুরাসিল ইসলামি ..... ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.

৫২৮ হি. ..... ৩ ..... মুয়াসসাসাতু কালামি ..... উল্লেখ নেই

৩১০ হি. ..... ১ ..... মুয়াসসাসাতুল আ'লামি, বৈরুত ..... ১৯৩৯ খ্রি.

৬২০ হি. ..... ১ ..... দারুর রায়াহ ..... উল্লেখ নেই

৫৯৭ হি. ..... ১৯ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ..... ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৫৪৬ হি. ..... ৭ ..... মাতবাআতুস সাআদাহ, মিসর ..... ১৩৩২ হি.

৬৩০ হি. ..... ১ ..... মুয়াসসাসাতুল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, বৈরুত ..... ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

৭৩৮ হি. ..... ১ ..... মাকতাবা শামিলা ..... উল্লেখ নেই

৫২৫ হি. ..... ১ ..... আলমুল কুতুব, বৈরুত ..... ১৯৮৫ খ্রি.

৮৩৫ হি. ..... ৪ ..... দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ..... ১৪১৮ হি.

সমসাময়িক ..... ২ ..... দারুন নাদওয়াতিল আলামিয়্যাহ ..... ১৪২০ হি.

- ..... ৪৫ ..... ওয়াজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত ..... ১৪২৭ হি.

সমসাময়িক ..... ১৬ ..... মাকতাবা শামিলা ..... -

৭৩৮ হি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, হালাব ..... ১৪১৩ হি.

৮২১ হি. ..... ৩ ..... মাতবাআতু হুকুমাতিল কুয়েত ..... ১৯৮৫ খ্রি.

১৪২০ হি. - ১৯৯৯ খ্রি. ..... ১ ..... মাকতাবাতুল ঈমান, কায়রো ..... উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ..... ... ..... জাওয়ার একাডেমি পাবলিকেশন্স, করাচি ..... রমজান ১৪২২ হি.

১০৭৮ হি. ..... ২ ..... দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি ..... উল্লেখ নেই

৮৯৬ হি. ..... ১০ ..... মাকতাবাতুল কুদসি, কায়রো ..... ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

সমসাময়িক ..... ১ ..... মাকতাবা শামিলা ..... -

৭৩৮ হি. ..... ৩৫ ..... মাজমাউল মালিক ফাহাদ ..... ১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.

৫০২ হি. ..... ২ ..... শারিকাতু দারিল আরকাম, বৈরুত ..... ১৪২০ হি.

১৩৩২ হি. ..... ১ ..... আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যাহ, কায়রো ..... ১৩৮২ হি.

প্রথম খণ্ড

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

৪৯৪ ..... মুখতাসার তারিখে দামেশক ..... ইবনে মানযুর আল-আফ্রিকি

৪৯৫ ..... মুখতাসার সিরাতুর রাসূল ..... শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব

৪৯৬ ..... মুখতাসার কিয়ামুল লাইল ..... মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযি (সংক্ষেপক: আল-মাকরিযি মৃত্যু ৮৪৫ হিজরী)

৪৯৭ ..... মুখতাসার আল-মুযানি ..... আবু ইব্রাহিম আল-মুযানি

৪৯৮ ..... মিরাতুল জানান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান ..... আব্দুল্লাহ বিন আসআদ আল-ইয়াফেয়ি

৪৯৯ ..... মিরাতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান ..... সিবত ইবনুল জাওযি

৫০০ ..... মিরাতুয যামান ফি তাওয়ারিখিল আইয়ান ..... সিবত ইবনুল জাওযি

৫০১ ..... মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতুল মাসাবিহ ..... মোল্লা আলী কারী আল-হারাবি

৫০২ ..... মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার ..... আলী বিন আল-হুসাইন আল-মাসউদি

৫০৩ ..... মারউইয়াতু গাযওয়াতিল খন্দক ..... ডক্টর ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-মাদখালি

৫০৪ ..... মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার ..... শিহাবুদ্দিন ইবনে ফাদলুল্লাহ আল-উমারি আল-কুরাশি

৫০৫ ..... মুসতাখরাজ আবি আওয়ানা ..... আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল-ইসফারায়িনি

৫০৬ ..... মুসনাদে আহমদ ..... ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

৫০৭ ..... মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা ..... আবু বকর ইবনে আবি শায়বা

৫০৮ ..... মুসনাদে ইবনুল জাদ ..... আলী ইবনুল জাদ আল-জাওহারি

৫০৯ ..... মুসনাদে আবি দাউদ আত-তায়ালিসি ..... আবু দাউদ সুলাইমান বিন দাউদ আত-তায়ালিসি

৫১০ ..... মুসনাদে আবু আওয়ানা ..... আবু আওয়ানা ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-ইসফারায়িনি

৫১১ ..... মুসনাদে আবি ইয়ালা ..... আবু ইয়ালা তামিম আল-মাওসিলি

৫১২ ..... মুসনাদুল বাযযার (আল-বাহরুয যাখখার) ..... আবু বকর আল-আহমাদ আল-বাযযার

৫১৩ ..... মুসনাদুল হারিস (বুগইয়াতুল বাহিস আন যাওয়াইদি মুসনাদিল হারিস) ..... আল-হারিস ইবনে আবি উসামা ও নূরুদ্দিন আল-হাইসামি

৫১৪ ..... মুসনাদুল হুমায়দি ..... আব্দুল্লাহ বিন আয-যুবাইর আল-হুমায়দি

৫১৫ ..... মুসনাদুর রুয়ানি ..... আবু বকর মুহাম্মদ বিন হারুন আর-রুয়ানি

৫১৬ ..... মুসনাদুশ শামিয়্যিন ..... আবুল কাসিম আত-তাবারানি

৫১৭ ..... মুসনাদুল ফারুক ..... হাফিজ ইবনে কাসির

৫১৮ ..... মুসনাদুশ শাফেয়ি ..... মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফেয়ি

৫১৯ ..... মুসনাদুশ শিহাব ..... আবু আব্দুল্লাহ ইবনে হাইয়ুন আল-কুদায়ি

৫২০ ..... মাশাহিরু উলামাইল আমসার ..... ইবনে হিব্বান আল-বুসতি

৫২১ ..... মুসতালাহুল হাদিস ..... মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন

**তারিখ উম্মতে মুসলিমা** — প্রথম খণ্ড

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

১১০ হিজরী ২৯ দারুল ফিকর, দামেস্ক ১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

২০৬ হিজরী ১ ওয়াজারাতিশ শুউনিল ইসলামিয়া, সৌদি আরব ১৪১৮ হিজরী

২৯৩ হিজরী ১ হাদিস একাডেমি, ফয়সালাবাদ ১৪০৮ হিজরী - ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

২৬৩ হিজরী ১ দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

২৭৮ হিজরী ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪১২ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৬৫৩ হিজরী ২৩ আর-রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, দামেস্ক ১৪৩৪ হিজরী - ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৫৩ হিজরী ২৩ আর-রিসালাতুল আলামিয়্যাহ, দামেস্ক ১৪৩৪ হিজরী - ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

১০১২ হিজরী ৯ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২৪ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩২ হিজরী ৫ আল-জামিআতুল লুবনানিয়্যাহ ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ ইমাদাতুল বাহসিল ইলমি, জামিআ ইসলামিয়া মদিনা মুনাওয়ারা ১৪২৪ হিজরী

৭৩৯ হিজরী ২৭ আল-মাজমাউস সাকাফি, আবুধাবি ১৪২৪ হিজরী

৩১২ হিজরী ২০ আল-জামিআতুল ইসলামিয়া, সৌদি আরব ১৪৩৫ হিজরী - ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৩১ হিজরী ৪৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪২১ হিজরী - ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

৩৩৫ হিজরী ২ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

২৩০ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতু নাদের, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৪ হিজরী ৪ দারু হাজার, মিসর ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩১৬ হিজরী ৫ দারুল মারিফাহ, বৈরুত উল্লিখিত

৩০৭ হিজরী ১৩ দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেস্ক ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৯২ হিজরী ১৮ মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

২৮২ হিজরী - ৮০৭ হিজরী ২ মারকাজু খিদমাতিস সুন্নাহ, মদিনা ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ

৪১৫ হিজরী ২ দারুল কলাম, সিরিয়া ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

৩০৭ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুল কুরতুবিয়্যাহ, কায়রো ১৪১২ হিজরী

৩৬০ হিজরী ৪ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৭৭ হিজরী ২ দারুল ওয়াফা, মানসুরা ১৪১১ হিজরী - ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

২০৩ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৪০০ হিজরী

২৫৩ হিজরী ২ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৪০২ হিজরী - ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫৩ হিজরী ১ দারুল ওয়াফা, মানসুরা ১৪১১ হিজরী - ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

৪২১ হিজরী ১ মাকতাবাতুল ইলম ১৪১৫ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

https://t.me/BoierSomahar

মুসতালাহুল হাদিস — মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন ..... ৫২২

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ — আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ ..... ৫২৩

নোট: মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ-এর পুরাতন পাণ্ডুলিপি ১৫ খণ্ডে এবং এতে হাদিস নম্বরও নতুন সংস্করণ থেকে আলাদা; অর্থাৎ মাকতাবাতুর রুশদ-এর নতুন সংস্করণে মোট হাদিস সংখ্যা ৩৭৯৩৩টি, যেখানে ১৫ খণ্ডের পুরাতন সংস্করণে মোট হাদিস সংখ্যা ৩৯০৯৮টি।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক মা'আ জামে' মা'মার বিন রাশিদ — আবদুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম ..... ৫২৪

মা'আল আইম্মাতিল ইশরিনা ফিল উসুল ওয়াল ফুরু' — ডক্টর আলী বিন হামিদ আস-সালুস ..... ৫২৫

মা'আরিফুল হাদিস — মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী ..... ৫২৬

মা'আরিফুল কুরআন — মুফতি মুহাম্মদ শফি ..... ৫২৭

মুয়ামালাতু গাইরিল মুসলিমিনা ফিল মুজতামায়িল ইসলামি — ডক্টর রাওদাহ আলী আদ-দাহবি ..... ৫২৮

মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান — মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি ..... ৫২৯

মু'জাম ইবনুল আরাবি — আবু সাঈদ ইবনুল আরাবি ..... ৫৩০

মু'জামুল উদাবা (ইরশাদুল আরিব ইলা মা'রিফাতিল আদীব) — ইয়াকুত আল-হামাউয়ি ..... ৫৩১

মু'জামুল উদাবা (আল-ইরশাদ আল-আনরিব ইলা মা'রিফাতিল আদীব) — ইয়াকুত আল-হামাউয়ি ..... ৫৩২

মু'জামুল বুলদান — ইয়াকুত আল-হামাউয়ি ..... ৫৩৩

মু'জামুস সাহাবাহ — আবুল কাসিম আল-বাগাউয়ি ..... ৫৩৪

মু'জামু শুয়ুখিত তাবারানি — আকরাম বিন মুহাম্মদ আল-আসারী ..... ৫৩৫

মু'জামু মা ইস্তা'জামা মিন আসমায়িল বিলাদি ওয়াল মাওয়াদি' — আবু উবাইদ আল-বাকরি আল-আন্দালুসি ..... ৫৩৬

মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার — আবু বকর আল-বাইহাকি ..... ৫৩৭

মা'রিফাতুস সাহাবাহ — আবু নুয়াইম আল-আসফাহানি ..... ৫৩৮

মা'রিফাতুল কুররা আল-কিবার — হাফেজ জাহাবি ..... ৫৩৯

মাগাজি — মুহাম্মদ বিন উমর আল-ওয়াকিদি ..... ৫৪০

মুফারিযুল কুরুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব — ইবনে ওয়াসিল আল-হামাউয়ি ..... ৫৪১

মাকাতিলুত তালিবিন — আবুল ফারাজ আল-আসফাহানি ..... ৫৪২

মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়াখতিলাফুল মুসাল্লিন — আবুল হাসান আল-আশআরি ..... ৫৪৩

মাকামে হুসাইন ওয়া ইয়াজিদ — মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আলভী ..... ৫৪৪

মাকামে সাহাবাহ — মুফতি মুহাম্মদ শফি উসমানী ..... ৫৪৫

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা — প্রথম খণ্ড

মৃত্যু সন খণ্ড সংখ্যা প্রকাশক প্রকাশকাল

১৩২১ হি. ১ মাকতাবাতুল ইলম, কায়রো ১৪১৫ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.

৩৩৫ হি. ৭ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৪০৯ হি.

২১১ হি. ১১ মজলিস-ই-ইলমি, পাকিস্তান ১৪০৩ হি.

সমসাময়িক ১ দারুল ফযিলাহ, রিয়াদ ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৩৯৭ হি. - ১৯৭৭ খ্রি.

দারুল ইশাআত, করাচি ২০০৭ খ্রি.

১৩৯৬ হি. - ১৯৭৭ খ্রি. ৮ ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি উল্লেখ নেই

সমসাময়িক ১ মাকতাবাতু গারিব ১৯৯৩ খ্রি.

সমসাময়িক ১ দারুল আন্দালুস, মিশর ১৪২৯ হি. - ২০০৮ খ্রি.

৩৩০ হি. ৩ দারু ইবনে জাওজি, সৌদি আরব ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

২৬২ হি. ৭ দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৬২ হি. ৫ দারুল গারব আল-ইসলামি, বৈরুত ১৪১৩ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.

২৬২ হি. ৭ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৫ খ্রি.

৩১৭ হি. ৫ মাকতাবাতু দারুল ইয়ান, কুয়েত ১৪২১ হি. - ২০০০ খ্রি.

সমসাময়িক ১ আদ-দারুল আসারিয়া, জর্ডান ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

৩৮৭ হি. ৪ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হি.

২৫৮ হি. ১৫ দারুল ওয়াফা, কায়রো ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

৩৩০ হি. ৭ দারুল ওয়াতান লিন-নাশর, রিয়াদ ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

৭৩৮ হি. ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৭ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

৩০৭ হি. ৩ দারুল ইলমি ১৪০৯ হি. - ১৯৮৯ খ্রি.

৬৯৭ হি. ৫ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল-কাওমিয়্যাহ, কায়রো ১৩৭৭ হি. - ১৯৫৭ খ্রি.

৩৫৬ হি. ১ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

৩২৩ হি. ২ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

সমসাময়িক ১ মজলিস-ই-দাওয়াতুল হক, পাকিস্তান উল্লেখ নেই

১৩৯৭ হি. - ১৯৭৭ খ্রি. ১ ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি ২০০৫ খ্রি.

https://t.me/BoierSomahar

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

ক্রমিক নং ..... বইয়ের নাম ..... লেখক

৫৪৬ ..... মুকাদ্দিমা যাহরুর রুবা আলা সুনানিন নাসায়ী আল-মুজতাবা ..... জালালুদ্দিন সুয়ূতী

৫৪৭ ..... মাকতুবাত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (উর্দু অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ জাওয়ার হুসাইন শাহ থেকে) ..... শেখ আহমদ সিরহিন্দি

৫৪৮ ..... মিন কালামি আবি যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন মাঈন বি-রিওয়ায়াতি তাহমান ..... ইয়াহইয়া বিন মাঈন

৫৪৯ ..... মানাকিব আবি হানিফা ওয়া সাহিবাইহি ..... হাফেজ শামসুদ্দিন আয-যাহাবী

৫৫০ ..... মানাকিব আবি হানিফা কারদারী ..... মুহাম্মদ বিন শিহাব আল-কারদারী

৫৫১ ..... মানাকিব আবি হানিফা মাক্কী ..... মুওয়াফফাক বিন আহমদ আল-মাক্কী আল-খতিব খাওয়ারিজম

৫৫২ ..... মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববীয়্যাহ ..... আহমদ বিন আব্দুল হালিম বিন আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী

৫৫৩ ..... মিনহাজুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন ফিল ফিকহ ..... ইমাম শরফ আন-নববী

৫৫৪ ..... মিনহাজুল মুহাদ্দিসীন ফিল করনিল আউয়ালিল হিজরি হাত্তা আসরিনাল হাদির ..... আলী আব্দুল বাসিত মজিদ

৫৫৫ ..... মানহাজুস সালিকীন ওয়া তাওদিহুল ফিকহ ফিদ দ্বীন ..... আব্দুর রহমান বিন নাসির আল-সাদী

৫৫৬ ..... আল-মুয়াত্তা ইমাম মালিক ..... ইমাম মালিক বিন আনাস

৫৫৭ ..... মুজাযুত তারিখ আল-ইসলামী ..... আহমদ মাহমুদ আল-আসীরী

৫৫৮ ..... মাওসুআতু আকওয়ালি আহমদ বিন হাম্বল (একদল লেখকের সংকলন) ..... আহমদ বিন হাম্বল

৫৫৯ ..... মাওসুআতু আকওয়ালিদ দারাকুতনী ফি রিজালিল হাদিস ওয়া ইলালিহি (একদল লেখকের সংকলন) ..... আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী

৫৬০ ..... মাওসুআতু মাওয়াকিফিস সালাফ ফিল আকিদাহ ওয়াল মানহাজ ওয়াত তারবিয়াহ ..... আবু সাহল মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল-মাগরাবী

৫৬১ ..... মিজানুল ইতিদাল ফি নাকদির রিজাল ..... শামসুদ্দিন আয-যাহাবী

বর্ণ: ন

৫৬২ ..... আন-নিবরাস আলা শারহিল আকাইদ ..... আব্দুল আজিজ ফারহারী মুলতানী

৫৬৩ ..... আন-নুজুমুয যাহেরা ফি আহওয়ালি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা ..... ইউসুফ বিন তাগরি বারদী

৫৬৪ ..... আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ..... বদরুদ্দিন আয-যারকাশী আশ-শাফেয়ী

৫৬৫ ..... আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ ..... ইবনে হাজার আল-আসকালানী

৫৬৬ ..... নাসিবিয়াত তাহকীক কে ভেস মে ..... মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী

৫৬৭ ..... নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ..... সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

৫৬৮ ..... নুখবাতুল ফিকার ..... হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী

৫৬৯ ..... নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক ..... আশ-শরীফ আল-ইদ্রিসী আত-তালিবী

৫৭০ ..... নাসাবু কুরাইশ ..... মুসআব বিন আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী

৫৭১ ..... নাফহুত তীব মিন গুসনিল আন্দালুস আর-রাতীব ..... শিহাবুদ্দিন আল-মাক্কারী

৫৭২ ..... নুকুশ রাসূল নম্বর ২য় খণ্ড প্রবন্ধ: সিরাতুন্নবী তাওহীদের আলোকে ..... মাওলানা ইসহাক আন-নবী আলভী (রামপুর, ভারত)

https://t.me/BoierSomahar

**তারিখ উম্মতে মুসলিমা (প্রথম খণ্ড)**

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

৯১১ হিজরী ১ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত উল্লেখ নেই

১০৩২ হিজরী ৩ ইদারা মাজলিসিয়া, করাচি উল্লেখ নেই

২৩৩ হিজরী ১ দারুল মামুন, দামেস্ক উল্লেখ নেই

৪৬৪ হিজরী ১ লাজনাতু ইহয়ায়িত তুরাসিল উসমানিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩০৮ হিজরী

৮২৭ হিজরী ২ মাকতাবা নিযামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হিজরী

৫২৮ হিজরী ২ মাকতাবা নিযামিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৩২১ হিজরী

৭২৮ হিজরী ৯ জামিয়া আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

৫৬৭ হিজরী ১ দারুল ফিকর ১৪২৫ হিজরী - ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবা শামিলা উল্লেখ নেই

৭৬৩ হিজরী ১ দারুল ওয়াতান ১৪২১ হিজরী - ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

৭৯ হিজরী ১ মুয়াসসাসাতু জায়েদ বিন সুলতান, আমিরাত ১৪২৫ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১ মাকতাবা আল-মালিক ফাহাদ ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩১ হিজরী ৪ দারুন নাশর, আলমুল কুতুব ১৪১৭ হিজরী - ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩৮৫ হিজরী ২ আলমুল কুতুব ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

সমসাময়িক ১০ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, কায়রো উল্লেখ নেই

৪৪৮ হিজরী ৪ দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত ১৩৮৩ হিজরী - ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

**বর্ণ ‘ন’ (حرف ن)**

মৃত্যু সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশকাল

আহমদ: ১২৩৯ হিজরী ১ মাকতাবা রশিদীয়া, কোয়েটা উল্লেখ নেই

৮৭২ হিজরী ১৬ দারুল কুতুব, কায়রো উল্লেখ নেই

৭৯৩ হিজরী ৩ আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ ১৪১৯ হিজরী - ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

৮৫২ হিজরী ২ ইমাদাতুল বাহাসিল ইলমি, সৌদি আরব ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৪২০ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ ১ দারুত তাকওয়া, লাহোর

•

১৪২০ হিজরী - ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ১ মজলিস নাশরিয়াতে ইসলাম উল্লেখ নেই

৮৫২ হিজরী ১ দারুল হাদিস, কায়রো ১৪১৮ হিজরী - ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

৫৬০ হিজরী ২ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৩০৯ হিজরী

৪৩২ হিজরী ১ দারুল মা’রিফ, কায়রো উল্লেখ নেই

১০৩১ হিজরী ৮ দারু সাদির, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

•

১৩ পরিচালক: মুহাম্মদ তুফায়েল - ইদারা ফরোগে উর্দু, লাহোর ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

ক্রমিক নং ..... কিতাবের নাম ..... লেখক

৫৭৩. নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব ..... শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি

৫৭৪. নিহায়াতুল আরাব ফি মা'রিফাতি আনসাবিল আরব ..... আহমদ বিন আলী আল-কালকাশান্দি

৫৭৫. নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব ..... আবুল মা'আলি ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি

৫৭৬. নাহজুল বালাগাহ ..... সাইয়্যেদ শরীফ রাযি

৫৭৭. নাওয়াদিরুল খুলাফা (আ'লামুন নাস বিমা ওয়াকা'আ লিল বারামিকাহ মা'আ বনী আব্বাস) ..... মুহাম্মদ দিয়াব আল-ইতলিদি

৫৭৮. নূরুল আবসার ফি সিরাতি সাইয়্যিদিল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ..... মাওলানা হাফিজুর রহমান সাইয়্যেদ হারভী

৫৭৯. নাইলুল আওতার ..... মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানি আল-ইয়ামানি

{হরফ ওয়াও}

৫৮০. আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত ..... সালাহুদ্দিন আস-সাফাদি

৫৮১. আল-ওয়াসিত ফিল মাযহাব ..... আবু হামিদ আল-গাজালি

৫৮২. আল-ওয়াফায়াত ..... ইবনে কুনফুয

৫৮৩. ওয়াসিলাতুল ইসলাম বিন-নাবি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ..... ইবনে কুনফুয আল-কুসান্তিনি

৫৮৪. ওয়াসায়াল উলামা ইনদা হুদুরিল মাউত ..... ইবনে জবর আল-আফরিগি

৫৮৫. ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তফা ..... আলী বিন আবদুল্লাহ আস-সামহুদি

৫৮৬. ওয়াফায়াতুল আইয়ান ..... ইবনে খাল্লিকান

৫৮৭. ওয়াক'আতু সিফফিন ..... নাসর বিন মুযাহিম

{হরফ হা}

৫৮৮. আল-হিদায়াহ ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদি ..... বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানি

৫৮৯. হাদিয়াতুল আরিফিন ..... ইসমাইল বিন মুহাম্মদ সালিম আল-বাবানি আল-বাগদাদি

{হরফ ইয়া}

৫৯০. আল-ইয়াহুদ ফিল আলামিল কাদীম ..... ডক্টর মুস্তফা কামাল আবদাল আলিম

৫৯১. আল-ইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির শারহু নুখবাতিল ফিকার ..... আল্লামা আবদুর রউফ মুনাভি

https://t.me/BoierSomahar

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

মৃত্যুর সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

৭৩৩ হিজরী ৩৩ দারুল কুতুব ওয়াত ওয়াসায়েকুল কাওমিয়্যাহ, কায়রো ১৩২৩ হিজরী

৮২১ হিজরী ১ দারুল কুতুব আল-লুবনানিয়্যাহ ১৪০০ হিজরী - ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ

৭৪৮ হিজরী ২০ দারুল মিনহাজ ১৪২৮ হিজরী - ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

৪৩৬ হিজরী ৪ আল-মাতবাআতুল আদাবিয়্যাহ, বৈরুত ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ

চতুর্থ হিজরী শতাব্দী ১ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪২৫ হিজরী - ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ ১ মা'হাদুল খলীল আল-ইসলামী উল্লেখ নেই

১২৫০ হিজরী ৮ দারুল হাদীস, মিশর ১৪১৩ হিজরী - ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

**হরফ 'ওয়াও' (و)**

৭৬৩ হিজরী ২৯ দারু ইহয়ায়িত তুরাস ১৪২০ হিজরী - ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ

৫০৫ হিজরী ৭ দারুস সালাম, কায়রো ১৩১৭ হিজরী

৮১০ হিজরী ১ দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৮১০ হিজরী ১ দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী - ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

৭৬৯ হিজরী ১ দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

৯১১ হিজরী ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৪১৯ হিজরী

৬৮১ হিজরী ৭ দারু সাদির ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ

৪১২ হিজরী ১ দারুল জীল, বৈরুত ১৪১০ হিজরী - ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ

**হরফ 'হা' (ه)**

৫৯৩ হিজরী ৪ দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী উল্লেখ নেই

১৩৯৯ হিজরী ২ দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত উল্লেখ নেই

**হরফ 'ইয়া' (ى)**

সমসাময়িক ১ দারুল কলম, দামেস্ক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

১০৩১ হিজরী ২ মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

https://t.me/BoierSomahar

# মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

## প্রথম খণ্ড

## নোট

https://t.me/BoierSomahar

## মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের ছয়টি অংশ এক নজরে

•

ইতিহাসের মূলনীতি, পূর্ববর্তী নবীগণ (আ.) এবং তাঁদের সমসাময়িক সাম্রাজ্যসমূহ, ইসলামপূর্ব বিশ্বের অবস্থা, সীরাতে নববী (সা.), খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, বিজয়াভিযানের কাল (হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফত, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফত, হযরত উসমান গনি (রা.)-এর খিলাফত), উম্মাহাতুল মুমিনীন, আশারায়ে মুবাশশারা এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি, ইতিহাসের শিক্ষা।

•

ঐতিহাসিক বর্ণনা যাচাই ও পর্যালোচনার মূলনীতি, মতভেদের যুগ, হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত, জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন, হযরত হাসান (রা.)-এর খিলাফত, আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত, ইয়াজিদের শাসনকাল, হযরত হুসাইন (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর সংগ্রাম, কারবালা ও হাররার বিয়োগান্তক ঘটনা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর খিলাফত ও শাহাদাত, ফিতনার যুগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, প্রথম হিজরি শতাব্দীতে উম্মাহর ইলমি ও নৈতিক তরবিয়তকারী প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবিঈগণের পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

•

বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ, আইম্মায়ে আরবা এবং মহান মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের অবদান, বিভিন্ন ফিরকার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস, বাতিল ফিরকাদের শাসনকাল, গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

•

সিসিলির ইতিহাস, ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ, তাতারীদের আক্রমণ, আইয়ুবী সালতানাত, মামলুক সালতানাত, তাতারীদের মাঝে ইসলাম প্রচার, উপমহাদেশীয় ইতিহাস, উসমানীয় সাম্রাজ্য: প্রতিষ্ঠা ও সুসংহতকরণের যুগ, আন্দালুসের ইসলামী রাষ্ট্র: প্রতিষ্ঠা থেকে মুরাবিতুন ও মুওয়াহহিদুন যুগ পর্যন্ত, মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারী ইমাম, মুজাদ্দিদ, ফকীহ এবং সূফীগণের সংগ্রামের আলোচনা।

•

আন্দালুসের ইসলামী রাষ্ট্রের পতন ও বিলুপ্তি, উসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত, ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য: বাবর থেকে বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত।

•

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ, পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অমুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের ইলমি ও কারিগরি অবদানের ওপর এক নজরে আলোকপাত।

---

ব্লক এ-১, গুলিস্তান-ই-জোহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯ | ০৩২১-২০০০৮৭০

almanhalpublisher@gmail.com

almanhalpublisher@hotmail.com

www.almanhalpublisher.com

https://t.me/BoierSomahar